আল ফাতওয়া

আল হামাউইয়্যাহ আল কুবরা

[অনুবাদ ও টীকা]

মূলঃ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ-সম্পাদনা ও টীকা
প্রফেসর ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ আল-কুবরা

[অনুবাদ ও টীকা]

মূল: শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ
(৬৬১-৭২৯হি.)

মূল ভাষ্যের অনুবাদক
শাইখ মো. নাসির উদ্দীন খান
প্রভাষক, দারুন নাজাত কামিল মাদরাসা
ডেমরা, ঢাকা।

অনুবাদ-সম্পাদনা ও টীকা
প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রকাশনায়
কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (সিডব্লিউআই)
৩৯/১ মাদানী গার্ডেন (মাদরাসা রোড), উত্তর আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর,
মোবাইল: +৮৮ ০১৫৭৫ ৫৪৭৯৯৯

ILM Publication Inc.
147 West 12th Street, Deerpark, New York 11729, USA,
Phone: 347 488 2777, 631 667 0352
Email: editor.ilmpublication@gmail.com, Web: ilmpublication.com

প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০২২

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুস সুন্নাহ
প্রধান অফিস: কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী
শাখা অফিস: নর্থব্রুক হল রোড, (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬

অনলাইন পরিবেশক: www.rokomari.com, www.wafilife.com

প্রচ্ছদ ও গ্রন্থসজ্জা
বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা-১২১২, +৮৮ ০১৭১৫ ৭৬৪৯৯৩

নির্ধারিত মূল্য: ৫০০ (পাঁচশত) টাকা / USD 15 $

ISBN: 978-984-35-1815-6

978-984-35-1815-6

AL-FATWA AL-HAMAWIYYAH AL-KUBRA Edited by Professor Dr. Abu Bakar Md. Zakaria. Published by Community Welfare Initiative (CWI), Gazipur, Bangladesh and ILM Publication Inc, New York 11729, USA.

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ

বিস্তারিত সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা

মূল কিতাব শুরু

প্রকাশকের কথা

সকল হামদ আল্লাহর জন্য, যিনি এ উম্মতের আকীদা-বিশ্বাস ও তার যাবতীয় প্রমাণাদিকে কুরআন ও সুন্নাহর অধীন করে দিয়েছেন। সর্বোত্ত দুরূদ ও শান্তি কামনা করছি সেই রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি পদে রবের ব্যাপারে বান্দার চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও আচরণ কীরূপ হবে তার বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করে দিয়েছেন।

আকীদা-বিশ্বাস এমন একটি মৌলিক স্তম্ভ, যা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের দেখানো পথে দৃঢ়পদ না হলে যেকোনো সময় ঈমানের ঘরে ভ্রষ্টতার স্রোত ভাঙ্গন ধরাতে পারে। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের কিছু আগ পর্যন্ত এ দীনকে সংরক্ষণ করবেন তাই তিনি প্রতি যুগেই এ দীনের হিফাযতের জন্য এমন একদল সত্যবাদী মুমিন-মুখলিস বান্দাকে প্রস্তুত রেখেছেন, যারা এ দীনের মধ্যে বাতিলের অনুপ্রবেশ কিংবা জাহেলদের অপব্যাখ্যার সামনে বাধার বিন্ধাচল হয়ে দাঁড়াবেন, সকল প্রকার ভ্রষ্টতা থেকে দীনকে হিফাযতের জন্য সর্বস্ব নিয়োগ করবেন।

যুগে যুগে দুনিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে বাতিল গোষ্ঠী, দল ও ফির্কারসমূহ নানা ভ্রান্ত আকীদা নিয়ে নিজেদের হক বলে আওয়াজ তুলেছে। তন্মধ্যে ইসলামের আকীদার ওপর সবচেয়ে বড় যে ঘূর্ণিঝড়টি বয়ে গেছে তা হচ্ছে সেসব সন্দেহের ডামাঢোল যা গ্রিক-দার্শনিক, সাবেয়ীরা পিটিয়েছে, আর সেটার ক্ষতিকর দিক জেনে বা না জেনে সেসব পথভ্রষ্ট দার্শনিকদের অনুসারী কালামশাস্ত্রবিদরা বাজিয়েছে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, উম্মতে মুসলিমাহকে নিয়ে গিয়েছে পথভ্রষ্টতার দ্বারপ্রান্তে।

কিন্তু আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত সত্যবাদী মুমিন-মুখলিস বান্দারা তাদের সেসব আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করেছেন। তারা স্ব স্ব অঞ্চল ও ভাষায় মুনাযারা, গ্রন্থ রচনা, বক্তৃতার মাধ্যমে তথাকথিত দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের ভয়াল আক্রমণকে শিশাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে মুকাবিলা করেছেন।

উম্মতের যেসব সিপাহসালার তাদের সর্বস্ব নিয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ। যখন চতুর্দিকে মূর্খতা ছড়িয়ে পড়েছিল, বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রসার লাভ করেছিল, মতভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সহীহ আকীদার চিহ্নসমূহ মিটে যেতে আরম্ভ করেছিল, সালাফদের মতাদর্শ নিশ্চিহ্ন হতে যাচ্ছিল, বাতিল পুরো ময়দান দখল করে বসেছিল, তাদের বিকৃত চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল, তাদের বিষ-বাষ্প সবদিকে বিদ্যুতের মত প্রচার করে চলেছিল, সময়ের শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য ও সার্বিক সহযোগিতা আশ'আরী সম্প্রদায় তাদের মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস দিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' হওয়ার মিথ্যা দাবি করে এক ধ্বংসাত্মক অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তখন এ তীব্র অন্ধকারে বিশাল আকার ধারণ করে একটি তারকা উদিত হয়ে উক্ত অন্ধকারকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সে তারকাটি আর কেউ নয়, আমাদের ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ।

আলোর দিশা পেয়ে শাইখুল ইসলামের কাছে লোকেরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলো। তিনি তাদেরকে জবাব দিতে শুরু করলেন। তেমনি একটি প্রশ্ন ছিল এ পুস্তিকাটির মূল বিষয়। শামদেশ তথা বর্তমান সিরিয়ার 'হামাহ' অঞ্চল থেকে কিছু লোক শাইখুল ইসলামকে আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করে সেখানে কী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে, কোন মানহাজের ওপর চলতে হবে তা নির্ধারণ করে দিতে বলেন, সেই প্রশ্নের জবাবেই শাইখুল ইসলাম এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

আর শাইখুল ইসলামের রচিত সেই গ্রন্থটিকে বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামিক স্কলার, দেশবরেণ্য আলেম, সহস্রাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ও সম্পাদক প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া হাফিযাহুল্লাহ প্রতিটি কথার সাথে যুগে যুগে মুসলিম স্কলারগণের ভাষ্য ও বক্তব্য রেফারেন্সসহকারে যোগ করে একে করে তুলেছেন এক মুক্তোর খনি। হাজারো গ্রন্থ থেকে মুক্তোতুল্য তথ্যাবলি দিয়ে অলংকৃত করে সাধারণ পাঠকদের জন্য "ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ আল-কুবরা- অনুবাদ ও টীকা" নামে তিনি শাইখুল ইসলামের ফতোয়াটিকে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন।

আমরা গ্রন্থটি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশি। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করার পাশাপাশি গ্রন্থকার থেকে শুরু করে এটি মুদ্রণযোগ্য হয়ে আসার কর্মপরম্পরায় যারা সময় ও মেধা ব্যয় করেছেন সকলের জন্য 'আরশে আযীমের মালিকের কাছে সর্বোত্তম জাযা প্রার্থনা করছি।

পরিশেষে একটিই প্রার্থনা, হে 'আরশের অধিপতি! আপনি এই গ্রন্থটিকে আমাদের সকলের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

উপ-পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, সি.ডব্লিউ.আই

'আল-ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ আল-কুবরা'
এর অনুবাদক ও সম্পাদক এর
ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল হামদ আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই ভালোবাসা মিশ্রিত প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমাদের আত্মার যাবতীয় অনিষ্ট থেকে, আমাদের কর্মকাণ্ডের যাবতীয় পাপ থেকে, যাকে আল্লাহ হিদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত দেয়ার কেউ নেই। আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾ [النساء: ١]

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।" [সূরা আন-নিসা: ০১]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [آل عمران: ١٠٢]

"হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থায় মারা যেও না।" [সূরা আলে ইমরান: ১০২]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আল-আহযাব: ৭০-৭১]

তারপর কথা হলো...,

এ উম্মতের ওপর আল্লাহর অসীম নি'আমত হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে সর্বশেষ ও সর্বোত্তম রাসূল প্রদান করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব দিয়েছেন, তাদের দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, যে দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য একমাত্র অবশ্য পালনীয় করে মনোনীত করেছেন, যা ব্যতীত কারো কাছ থেকে অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না, যে দীনকে আগের ও

পরের সবার জন্য পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন, যাতে এর মাধ্যমে তাদের ওপর তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ও দা'ঈদের সাওয়াবের অধিকারী করতে পারেন।

আল্লাহর অগণিত নি'আমতের মধ্যে একটি হচ্ছে তিনি এ উম্মতের আকীদা-বিশ্বাস ও তার যাবতীয় প্রমাণাদিকে কুরআন ও সুন্নাহর অধীন করে দিয়েছেন, যা অত্যন্ত প্রকাশ্য ও স্পষ্টভাবে সেগুলোকে এমনভাবে প্রমাণ করেছে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষেও তা বুঝা ও তা আকঁড়ে ধরা সহজ করে দিয়েছেন। সেখানে কোনো ধাঁধাঁ বা অস্পষ্টতার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, "আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" [সূরা আল-কামার: ১৭]

যেহেতু কিয়ামতের কিছু আগ পর্যন্ত এ দীনকে আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণ করবেন তাই তিনি প্রতি যুগেই এ দীনের হিফাযতের জন্য একদল সত্যবাদী মুমিন-মুখলিস বান্দাকে প্রস্তুত রেখেছেন, তাদেরকে হক্ক বুঝার সুযোগ দিয়েছেন, হক্কের জন্য জীবনের দামী ও উত্তম সবকিছু ব্যয় করার মন-মানসিকতা দিয়েছেন। তারা এ দীনের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন, বাতিলের অনুপ্রবেশ কিংবা জাহেলদের অপব্যাখ্যা প্রবেশ করাতে চাইবে, তাদের সামনে এরা বাঁধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়াবে, সেসব ভ্রষ্টতা থেকে দীনকে হিফাযতের জন্য সর্বস্ব নিয়োগ করবে, যার মাধ্যমে সেসব লোকের যাবতীয় সর্বনাশা কর্মকাণ্ড থেকে দীনকে পবিত্র রাখবেন, যাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে, ফলে তারা স্পষ্ট প্রমাণাদি দেখার পরও তা থেকে চোখ বুঁজে থাকবে, স্পষ্ট নিদর্শনাবলি শোনা থেকে কানে তালা দিয়ে রাখবে, নিজেরা এমন কঠিন পথে চলবে যা সম্পূর্ণভাবে সমস্যাসঙ্কুল। এভাবে তারা পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে হারিয়ে যাবে, যদিও তারা মনে করছে তারা উত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করছে, দৃঢ়পথে চলার চেষ্টা করছে।

এসব পথভ্রষ্ট, দিকহারা লোকদের বিরুদ্ধে সর্বদা আল্লাহর ওয়াদাকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত গোষ্ঠী, নাজাতপ্রাপ্ত দল সর্বদা সোচ্চার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা হকের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করেছে, তারা সর্বদা থেকেছে বিখ্যাত, প্রকাশ্য ও দলীল-প্রমাণে বিজয়ী সম্প্রদায়, তারা সারা দুনিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে বাতিল গোষ্ঠী, দল ও ফির্কারসমূহের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। ফলে বাতিলের প্রাসাদ ও ঘর ধ্বংস ও পর্যুদস্ত হয়েছে।

ইসলামের আকীদার ওপর সবচেয়ে বড় যে ঘূর্ণিঝড়টি বয়ে গেছে তা হচ্ছে সেসব সন্দেহের ডামাঢোল যা গ্রিক-দার্শনিক, সাবেয়ীরা পিটিয়েছে, আর সেটার ক্ষতিকর দিক জেনে বা না জেনে সেসব পথভ্রষ্ট দার্শনিকদের অনুসারী কালামশাস্ত্রবিদরা বাজিয়েছে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, উম্মতে মুসলিমাহকে পথভ্রষ্টতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।

কিন্তু আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর বাহিনীর লোকেরা তাদের সেসব আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করার জন্য অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা প্রত্যেক অঞ্চল থেকেই তথাকথিত দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের ভয়াল আক্রমণকে মুকাবিলা করার জন্য পরস্পর শিশাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়েছে। তারা উক্ত রোগ বিস্তার লাভ করার আগেই তার মূলোৎপাটনে ছিল সোচ্চার। তারা তাদের বিরুদ্ধে মুনাযারা করেছে, কিতাব রচনা করেছে, আলোচনা করেছে; যার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের সামনে এ বিশাল বিপদের ভয়াবহতা ও তাদের

ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি প্রকাশ করে দিয়েছে। ফলে আল্লাহর সাহায্যের সু বাতাস সেসব বাতিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

উম্মতের যেসব সিপাহসালার তাদের সর্বস্ব নিয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ। যখন চতুর্দিকে মূর্খতা ছড়িয়ে পড়েছিল, বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রসার লাভ করেছিল, মতভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সহীহ্ আকীদার চিহ্নসমূহ মিটে যেতে আরম্ভ করেছিল, সালাফদের মতাদর্শ নিশ্চিহ্ন হতে যাচ্ছিল, সেগুলো কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিল, সালাফী মানহাজের লোকদের পক্ষে কোনো লোকই দাঁড়ানোর চিন্তা করা বাদ দিয়েছিল, বাতিল পুরো ময়দান দখল করে বসেছিল, তারা যা ইচ্ছা করা ও বলার মতো স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করে যাচ্ছিল, তাদের বিকৃত চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল, তাদের বিষ-বাষ্প সবদিকে বিদ্যুতের মত প্রচার করে চলেছিল।

এ সময় আশ'আরী সম্প্রদায় তাদের মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করা শুরু করেছিল, তাদের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল, শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য ও সার্বিক সহযোগিতা পাচ্ছিল, তাদের মতামতকে আলেম ও সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরছিল, নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' হওয়ার মিথ্যা দাবি করে যাচ্ছিল, আর সে মিথ্যা দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, নিজেদেরকে একমাত্র সত্য বলে প্রচার করতে নেমেছিল, ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, কেউ তাদের সমালোচনা কিংবা ভুল ধরার সামান্যতম সাহসও প্রকাশ করার হিম্মত রাখছিল না, যদি কেউ তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার দুঃসাহস দেখাতো তখনই তাকে বিভিন্নভাবে খারাপ বিশেষণের বানে জর্জরিত করছিল। কখনও কাফের আবার কখনও দীনবিরোধী আখ্যা দিচ্ছিল।

এ তীব্র অন্ধকারে, বিশ্বের এর ধ্বংসাত্মক অবস্থায় একটি আলো বিশাল আকার ধারণ করে উক্ত অন্ধকারকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, একটি তারকা উদিত হয়ে সে অন্ধকারকে খানখান করে দিয়েছিল, সে আলো ও সে তারকাটি আর কেউ নয়, আমাদের ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে আমাদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। "নিশ্চয় আমরা যিকির নাযিল করেছি, আর নিশ্চয় আমরা তা যথাযথ সংরক্ষণকারী।" এ হিফয ও সংরক্ষণের একটি মাধ্যম হচ্ছে এমন কিছু লোক জোগাড় করে দিয়েছেন যারা কুরআন, সুন্নাহকে সংরক্ষণ করেছেন, যারা কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার প্রসার করেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সকল প্রকার বিকৃতি, মিথ্যাচার ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ।

শাইখুল ইসলাম যখন এ ধরাধামের প্রতি চোখ খুলে তাকালেন তখন দেখলেন সবকিছু বিপর্যস্ত ও সমস্যাগ্রস্ত, সেসবকে সংস্কার ও নতুন রূপ দেয়া জরুরী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি একা কী করবেন? কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন যে পরিণাম সুনির্ধারিত, ফলাফল

অবশ্যম্ভাবী। তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে তাকে হক নিয়ে দাঁড়াতেই হবে, হক যিনি বলেন, তিনি একাই উম্মত বা জাতি। এ পথের একাকিত্ব, বন্ধু-বান্ধবহীনতা তাকে তাঁর ইঙ্গিত কাজ থেকে পিছপা করেনি, একাই সকল প্রকার অনাচার, শির্ক, বিদ'আত, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বদিক থেকে হামলা করলেন। তাদের কেল্লা ও দূর্গগুলোতে আঘাত হানলেন। এসবের পিছনে কাজ করেছে তাঁর মজবুত ঈমান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইচ্ছাশক্তি। মানুষদের তিনি কুরআন ও সুন্নাহর অসি ও মসির মাধ্যমে সঠিক পথের আহ্বান জানালেন, তাদেরকে ডাকলেন এ দু'টির পরিচ্ছন্ন সুমিষ্ট পানিতে অবগাহন করার জন্য, যাতে নেই কোনো পঙ্কিলতা, যাতে কারও ময়লার বালতি পড়ে হয়নি তা কলঙ্কিত।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর এ সংস্কার ও তাজদীদী কর্মকাণ্ডকে বাতিল সহজভাব গ্রহণ করেনি, বাতিল তখন তার সকল কেল্লা থেকে একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও মারমুখি হয়ে একের পর এক আঘাতে জর্জরিত করতে লেগে গেল। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা বুঝতে পারলো যে, তাদের কাঁচের তৈরী প্রসাদ শীশাঢালা প্রাচীরের সামনে ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছে, তাদের ওপরই তাদের গৃহের ছাদ ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে, যমীন তাদের নিয়ে ডেবে যাচ্ছে।

আল্লাহর শপথ, তিনি ইসলামের ইতিহাসে উম্মতে মুসলিমাহকে অন্ধকার অবস্থায় সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য লোকদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিলেন বেশি প্রসিদ্ধ। এক. আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে পড়া দীন ত্যাগের বড় ফিতনাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। দুই. ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ যিনি জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফির্কার আক্রমনের বিরুদ্ধে পর্বতসম দাঁড়িয়েছিলেন। তিন. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, যিনি বড় ফিতনার যুগে, দীনত্যাগকারী, শরী'আতের বিধান বাস্তবায়ন পরিত্যাগকারী মোগল-তাতারদের বিরুদ্ধে সব রকমের জিহাদ করেছেন। জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, আশ'আরিয়্যাহ, মাতুরিদিয়্যাদের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। শিয়াদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তাসাওউফপন্থী বাতিল ব্যক্তি ও ফির্কার যাবতীয় সন্দেহের অপনোদন করেছেন।

তার মত এমন ব্যক্তিত্ব শত্রুবিহীন থাকবে এটা অস্বাভাবিক; তাই তো দেখতে পাই তৎকালীন এসব ফির্কার লোকের তার বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষেপিয়ে তুলে। তার বিরুদ্ধে শত প্রকার ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে আরম্ভ করে, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নূরকে ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পূর্ণ করবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

শাইখুল ইসলামের কাছে লোকেরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। তিনি তাদেরকে জবাব দিতে থাকেন। তেমনি একটি প্রশ্ন ছিল এ পুস্তিকাটির মূল বিষয়। শামদেশ তথা বর্তমান সিরিয়ার 'হামাহ' অঞ্চল থেকে কিছু লোক শাইখুল ইসলামকে 'আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করে সেখানে কী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে, কোন মানহাজের ওপর চলতে হবে তা নির্ধারণ করে দিতে বলেন, যার কারণে শাইখুল ইসলাম এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

এ গ্রন্থটি রচনাকাল সম্পর্কে সকল বর্ণনা প্রায় ঐক্যসূত্রে বলে যে, সেটা ছিল হিজরী ৬৯৮ সালের রবিউল মাসের শুরুতে।

শাইখুল ইসলাম বলেন, 'আমাকে অনেকদিন আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সময়টি ছিল ৬৯০ হিজরী এর কিছু পরে, তখন 'হামাহ' এলাকা থেকে আল্লাহর গুণ সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদীস বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি তখন সেটার উত্তর অন্যদের থেকে নিতে বলি, কিন্তু তারা বারবার চাইল, আমিই যেন সেটার জবাব দিই, অতঃপর আমি সে জবাবটি লিখেছিলাম যোহর ও আসরের মাঝখানে একটি বসায়'.....।[১]

তাছাড়া ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ও ইমাম ইবন আব্দিল হাদীও উল্লেখ করেছেন যে, শাইখুল ইসলাম এ ফতোয়াটি লিখেছেন যোহর ও আসরের মধ্যকার সময়ে, কোনো এক বসায়।[২]

গ্রন্থে আলোচিত বিশেষ বিষয়সমূহ

এ গ্রন্থে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

১- সিফাত সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতির দলীলভিত্তিক বর্ণনা।

২- সিফাতে খবরিয়্যাহ বা কুরআন ও সুন্নায় সাব্যস্ত আল্লাহর গুণাবলির বিষয়ে আলোচনা, যাতে তিনি আশ'আরী-মাতুরিদীদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন এবং আহলুস সুন্নাতের মতাদর্শকে সাব্যস্ত করেছেন।

৩- সিফাতের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণি ও তাদের বক্তব্যের সারকথা পেশ করা ও তার মধ্যে যা বাতিল তার অসারতা প্রমাণ করা।

গ্রন্থের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য বিষয়সমূহ

এ গ্রন্থে যেসব বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে নিম্নোক্তরূপ দাঁড়ায়,

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের অধ্যায়টি যথাযথ ও সুদৃঢ় করার পরেই কেবল দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেছেন। আর আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। বরং তা দীনের মূল, অন্তর যা অর্জন না করে কখনো প্রশান্ত হতে পারে না।

২- সাহাবায়ে কিরামের মতো বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ আকীদার বিষয়াবলি, বিশেষ করে আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে না জেনেই ঈমানদার হয়েছেন এমনটি অসম্ভব বিষয়।

৩- যারা বলে 'সালাফদের পদ্ধতি নিরাপদ, খালাফদের পদ্ধতি বিজ্ঞতা ও সুদৃঢ়' তাদের এ বক্তব্যের খণ্ডন। যাতে শাইখুল ইসলাম এটি স্পষ্ট করেছেন যে, যারা এ উপরোক্ত

---

১. নাক্বদুত তা'সীস; ইবন আব্দুল হাদী, আল-উকূদুদ দুররিয়্যাহ, পৃ. ১৯৮-২০১; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১৪/৪); ইবন হাজার, আদ-দুরারুল কামিনাহ (১/১৫৫)।

২. ইবন আব্দুল হাদী, আল-উকূদুদ দুররিয়্যাহ, পৃ. ৬৭; ইবনুল কাইয়্যেম, আসামাউ মুয়াল্লিফাতি শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃ. ২০।

বক্তব্যটি দিয়েছে তারা সম্পূর্ণ ভুলের ওপর রয়েছে। কারণ, তারা সালাফদের ইলমের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেনি, সালাফগণকে অজ্ঞ বানিয়েছে, সালাফদের ওপর আল্লাহর নাম ও গুণ না বুঝার অপবাদ চাপিয়েছে, এর বিপরীতে তারা খালাফ তথা কালামশাস্ত্রবিদদেরকে আলেম বানিয়েছে, তাদের মতামতকে অকাট্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর এখানেই রয়েছে যত পথভ্রষ্টতা।

৪- খালাফ তথা কালামশাস্ত্রবিদরা যে সারা জীবন বিভ্রান্তির পথে চলেছে সেটার প্রমাণ হিসেবে শেষ জীবনে এসে বড় বড় কালামশাস্ত্রবিদদের দ্বারা সেটার স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

৫- উপরোক্ত ভূমিকার পরে আল্লাহর গুণাবলির আলোচনা করেন। প্রথমেই আল্লাহর 'উলু' বা ঊর্ধ্বে থাকার গুণটি কুরআন, সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত করেন, তারপর তা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য, তাবে'য়ীদের আছার, সকল গ্রহণযোগ্য ইমামগণের কথা থেকে তুলে ধরেন।

৬- তারপর আল্লাহর 'উলু' বা ঊর্ধ্বে হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন। বরং এটাও সাব্যস্ত করেন যে, আল্লাহর ঊর্ধ্বে থাকা অত্যাবশ্যক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যা ফিত্বরাত বা মানব মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি সর্বদা স্বীকৃতি প্রদান করে।

৭- তারপর তিনি বলেন, কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীন থেকে একটি বাণীও পাওয়া যাবে না, যা আল্লাহর ঊর্ধ্বে না থাকার ওপর প্রমাণবহ।

৮- তারপর তিনি যারা সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে তাদের বক্তব্যে খণ্ডন করার দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন। তাদের বক্তব্যের কী অর্থ দাঁড়ায় সেটা তুলে ধরার মাধ্যমে সেসব বক্তব্যের অসারতা প্রকাশ করে দেন। কারণ, যারা সিফাত অস্বীকার করে তাদের বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায়, 'হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা আল্লাহর মারেফাত লাভ, তাঁর জন্য কী গুণ থাকা আবশ্যক আর কী গুণ তাঁর থেকে না করতে হবে তার জন্য কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালেহীনের বক্তব্যের দ্বারস্ত হয়ো না, বরং সেটার জন্য তোমাদের বিবেকের দাবির দিকে প্রত্যাবর্তন কর'। নাউযুবিল্লাহ, তাদের এ বক্তব্য যে সম্পূর্ণরূপে বাতিল তার প্রমাণ হচ্ছে,

- এর মাধ্যমে এটা আবশ্যক হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সত্তার গুণাবলি বর্ণনা থেকে পিছপা হয়েছিলেন যিনি তাকে পাঠিয়েছেন।
- আরও আবশ্যক হয় যে, আল্লাহর কিতাব মানুষের জন্য হিদায়াতের আধার নয়, তাতে হিদায়াত নেই, তাতে অন্তরের আরোগ্য নেই, তাতে নূর নেই, বিবাদের সময়কার সমাধানও তাতে নেই।
- আরও আবশ্যক হয় যে, মানুষদেরকে নবুওয়াত ও রিসালাত ব্যতীত ছেড়ে দেয়াই উত্তম কাজ হতো; কারণ তাদের বক্তব্য অনুযায়ী নবুওয়াত ও রিসালাতের আগে ও পরের অবস্থা একই পর্যায়ের।

এসব কারণে যারা কুরআন ও সুন্নায় আসা সিফাতসমূহ অস্বীকার করে তাদের বক্তব্য

সম্পূর্ণরূপে বাতিল।

৯- তারপর শাইখুল ইসলাম সিফাত নিষ্ক্রীয়কারীদের মূল উৎস ও সূত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান দেন যে, সিফাত অস্বীকার করার পটভূমি ছিল অমুসলিম এলাকায়। প্রথম তা শুরু করেছিল জা'দ ইবন দিরহাম, তার থেকে তা গ্রহণ করেছিল জাহম ইবন সাফওয়ান, ফলে তার দিকেই তা সম্পৃক্ত হয়; কারণ সে এটার প্রচার-প্রসার করেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, জা'দ ইবন দিরহাম সেটা গ্রহণ করেছিল বায়ান ইবন সাম'আন থেকে, সে তা নিয়েছিল লাবীদ ইবন আ'সাম এর বোনের ছেলে ত্বালূত থেকে, আর ত্বালূত তা নিয়েছিল লাবীদ ইবন আ'সাম ইয়াহূদী থেকে, যে ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করেছিল। আরও বলা হয়ে থাকে যে, জা'দ ছিল হাররানের অধিবাসী, যা ছিল সাবেয়ী ধর্মমত ও তথাকথিত দার্শনিক লোকদের চারণভূমি। তাই হতে পারে জা'দ ইবন দিরহাম সেখান থেকেই তা গ্রহণ করে থাকবে।

১০- তারপর শাইখুল ইসলাম বর্ণনা করেন যে, আজ আশ'আরী, মাতুরিদী ও অন্যান্য ফির্কার মাঝে যেসব তা'ওয়ীল নামীয় অপব্যাখ্যা পাওয়া যায়, আর যা ইবন ফুওরাক এর 'তাওয়ীলাত' গ্রন্থে ও রাযীর 'আসাসুত তাকদীস' গ্রন্থে দেখা যায়, তা হুবহু সেসব তা'ওয়ীল তথা অপব্যাখ্যা যা ইতোপূর্বে বিশর আল-মিররীসী প্রচার-প্রসার করেছিল। আর তৎকালীন আলেমগণ 'বিশর আল-মিররিসী' এর মতামত খণ্ডন করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

১১- তারপর শাইখুল ইসলাম সেসব গ্রন্থের নাম বর্ণনা করেন, যাতে আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

১২- তারপর শাইখুল ইসলাম আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের বক্তব্যের সারকথা তুলে ধরে বলেন, 'আল্লাহকে সেসব গুণ দিয়ে গুণান্বিত করা হবে, যা দিয়ে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন আর যা দিয়ে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গুণান্বিত করেছেন এবং যা দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহকে গুণান্বিত করেছেন। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য অতিক্রম করা যাবে না।'

তারপর শাইখুল ইসলাম উপরোক্ত মূলনীতিটির ব্যাখ্যা করেন এবং সেসব নীতির বর্ণনা করেন যার ওপর সালাফে সালেহীনের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর তা হচ্ছে,

- আল্লাহর গুণাবলি 'তাওক্বীফী' বা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই কেবল অর্জিত হতে হবে।
- আল্লাহ তা'আলা যেসব গুণাবলি দিয়ে তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন তা হক্ব ও যথাযথ, তার প্রকৃত অর্থেই নিতে হবে, সেখানে কোনো ধাঁধা কিংবা অস্পষ্টতা নেই। যেভাবে বক্তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝা যায় সেভাবেই এগুলোর অর্থ বুঝা যায়।
- এসব গুণাবলি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে চারটি নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে।

সুতরাং আল্লাহর জন্য গুণ সাব্যস্ত করার সময় দুটি অবস্থান থেকে দূরে থাকতে হবে:

এক. তামসীল, সৃষ্টির কারও গুণের মত করে সাব্যস্ত করা যাবে না।

দুই. তাকয়ীফ, ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না।

আর আল্লাহকে সৃষ্টির কারও গুণ থেকে মুক্ত করার সময়েও দুটি অবস্থান থেকে দূরে থাকতে হবে:

এক. তাহরীফ, বিকৃতি সাধন করা যাবে না। অর্থ কিংবা শব্দ, কিংবা উভয়টি।

দুই. তা'ত্বীল, অর্থশূন্য কিংবা নিষ্ক্রীয়করণ করা যাবে না।

- সালাফগণের মতাদর্শ নিষ্ক্রীয়করণ কিংবা সাদৃশ্যতা প্রদান এ দুটি নীতির মাঝে সম্পূর্ণ আলাদা বিশুদ্ধ এক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১৩- তারপর শাইখুল ইসলাম এটা সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন যে, নিষ্ক্রীয়কারী ও সাদৃশ্য প্রদানকারী উভয় সম্প্রদায়ই নিষ্ক্রীয়করণ ও সাদৃশ্য প্রদানকে একসাথ করেছে।

- তন্মধ্যে যারা নিষ্ক্রীয়করণ করেছে, তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রকৃত অর্থ না বুঝে সেটাকে সৃষ্টির নাম ও গুণাবলির মত বুঝেছে, তারপর তারা অস্বীকার ও নিষ্ক্রীয়করণ করতে শুরু করে দিয়েছে।
- আর যারা সাদৃশ্য প্রদান করেছে, তারা স্রষ্টাকে সৃষ্টির মতো মনে করে বসেছে, এভাবে তারা আল্লাহ তা'আলা যে প্রকৃত গুণাবলির হক্বদার ছিল তা থেকে তাঁকে নিষ্ক্রীয় করেছে।

১৪- তারপর শাইখুল ইসলাম বর্ণনা করেন যে, কুরআন, সুন্নাহ বিরোধী ফির্কাসমূহ যেমন, দার্শনিক, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিদিয়া ফির্কাসমূহ, তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির যাই অস্বীকার করেছে, এ ব্যাপারে তাদের কমন বক্তব্য হচ্ছে, 'এগুলো বিবেক বিরোধী'। অথচ তারাই আবার এ বিবেক বিরোধী হওয়ার নীতি নির্ধারণে নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধে লিপ্ত, একদল যা বিবেক বিরোধী মনে করে অপরদল তা বিবেক বিরোধী মনে করে না। তাই শাইখুল ইসলাম বলেন, 'তাহলে কোন বিবেক দিয়ে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যকে মূল্যায়ণ করা হবে?'

১৫- তারপর শাইখুল ইসলাম বর্ণনা করেন যে, এ ব্যাপারে আবশ্যক হচ্ছে নবুওয়াতী নীতির অনুসরণ। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ যা বর্ণনা করেছেন তা বলা, রাসূল যা বলেছেন তা গ্রহণ করা।

১৬- তারপর শাইখুল ইসলাম বর্ণনা করেন যে, যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী তারা তিনটি উপদলে বিভক্ত:

এক. 'আহলুত তাখয়ীল' বা ধারণাবাদী গোষ্ঠী, তারা হচ্ছে তথাকথিত দার্শনিক ও তাদের অনুসারী কিছু কালামশাস্ত্রবিদ ও সূফী সম্প্রদায়। তাদের মত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ওপর ঈমান ও আখেরাতের

ওপর ঈমানের ব্যাপারে যা যা বলেছেন সবই খেয়াল বা প্রশস্ত ধারণা প্রদান করেছেন, যাতে জনগণ তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে, তিনি হক্ক বর্ণনা করেননি। (নাউযুবিল্লাহ)।

দুই. 'আহলুত তাওয়ীল' বা অপব্যাখ্যাকারী গোষ্ঠী। এরা হচ্ছে কালামশাস্ত্রবিদ সম্প্রদায়। তাদের মত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত ভাষ্যসমূহের অর্থ বর্ণনা করেননি, সৃষ্টির কাউকেও সেগুলোর অর্থ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেননি, বরং 'তিনি চেয়েছেন, তারা যেন গবেষণা করে তা থেকে হক্ক অর্থ বিবেক দিয়ে বের করে নেয়, তারপর সিফাত সংক্রান্ত সেসব ভাষ্যকে তাদের সাধ্যমত অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়'। (নাউযুবিল্লাহ)।

তারপর শাইখুল ইসলাম বলেন, এ ফাতাওয়া (আল-হামাওয়িয়্যাহ) দ্বারা কেবল এ সম্প্রদায়ের মতামত খণ্ডন করাকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

তিন. 'আহলুত তাজহীল' বা আজ্ঞেয়বাদী গোষ্ঠী। যারা বলে থাকে যে, আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত এসব ভাষ্যের অর্থ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তিনিই কেবল তা জানেন। তাদের মতের অর্থ দাঁড়ায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও এগুলোর অর্থ জানতেন না, অনুরূপভাবে জিবরীলও তা বুঝতেন না।

১৭- তারপর শাইখুল ইসলাম প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে 'তাওয়ীল' শব্দের তিন অর্থের বিস্তারিত দালিলিক বর্ণনা তুলে ধরেন। আরও বর্ণনা করেন যে, কালামশাস্ত্রবিদরা 'তা'ওয়ীল' দ্বারা যা বুঝে থাকে ও বুঝিয়ে থাকে তা হচ্ছে, 'শব্দকে তার প্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থ থেকে ফিরিয়ে অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থের দিকে ধাবিত করা'। অথচ এটি কোনোভাবেই কুরআন ও সুন্নায় আসা তা'ওয়ীল শব্দের অর্থ নয়।

১৮- তারপর শাইখুল ইসলাম পূর্বের ও পরের ইমামগণ থেকে আল্লাহর সিফাতসংক্রান্ত অনেকগুলো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। আর সেগুলোতে নিজের টীকা সংযোজন করেন। তিনি প্রখ্যাত চার মাযহাবের ইমামগণের বক্তব্য আনয়ন করেন। আশ'আরী মতবাদের প্রাথমিক যুগের লোকদের বক্তব্যও উল্লেখ করেন। এমনকি তাসাওউফ এর বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের বক্তব্যও নিয়ে আসেন।

১৯- এসব বক্তব্য আনয়ন করার পর শাইখুল ইসলাম আল্লাহর 'ঊর্ধ্বে থাকা' ও 'আরশের উপর উঠা' এ গুণ দুটোর ওপর দলীল আনয়ন করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা' গুণটির ওপর দলীল-প্রমাণাদি তুলে ধরেন। তারপর এ 'সাথে থাকা' গুণের সাথে ঊর্ধ্বে থাকা ও আরশের উপর থাকা' গুণের সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি স্পষ্ট করতে সক্ষম হন যে, এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; কারণ 'সাথে থাকা' কোনো ভাষাতেই সর্বদা স্পর্শ করা, কিংবা পাশাপাশি অবস্থান করা আবশ্যক করে না। বরং সেটির অর্থ অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

২০- তারপর শাইখুল ইসলাম স্পষ্ট করেন যে, 'ফিস সামায়ি' বা 'আসমানে থাকা' এর অর্থ

আসমান তাকে ঘিরে থাকা বুঝায় না। যে কেউ তা ধারণা করবে সে যদি তা অন্য কারো থেকে বর্ণনা করে তবে মিথ্যা বলেছে, আর যদি নিজে তার রব্ব সম্পর্কে এমন বিশ্বাস করে তবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২১- এরপর শাইখুল ইসলাম একটি বিখ্যাত মাসআলার সমাধান করেছেন, তা হচ্ছে: কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য কি না? তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, 'প্রকাশ্য অর্থ' কথাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ্য শব্দ; যাতে হক্ক অর্থ ও বাতিল অর্থ উভয়টি নেয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ প্রকাশ্য অর্থ বলতে কী বুঝানো হচ্ছে তা স্পষ্ট না করা হবে তখন এককথায় সেটার উত্তর দেয়া যাবে না।

২২- তারপর শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ সিফাত সংক্রান্ত কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহের 'প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা বা না করা'র ব্যাপারে তাবৎ মানুষের ছয়টি অবস্থান তুলে ধরেন:

- দুটি গোষ্ঠী বলে, তারা প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে থাকে, যদিও তাদের বক্তব্য এক নয়। এরা দু' ভাগে বিভক্ত:

এক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহ, যারা সে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে যা আল্লাহর জন্য উপযোগী এবং যা কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট।

দুই. মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্য প্রদানকারী গোষ্ঠী, যারা এগুলোকে সৃষ্টির মতো করে প্রকাশ্য অর্থ নির্ধারণ করে থাকে।

- আরও দুটি গোষ্ঠী বলে, তারা প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণের বিরোধী, যদিও তাদের বক্তব্য এক নয়। এরা দু' ভাগে বিভক্ত:

এক. সেসব মু'তাত্তিলা বা নিষ্ক্রীয়কারী সম্প্রদায়, যারা কোনো না কোনোভাবে এগুলোকে সিফাত বা গুণ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, নিজেরা তা'ওয়ীল করে অপ্রকাশ্য অর্থ দাঁড় করায়। যেমন, জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়। আর আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক। এদেরকে বলা হয় আহলুত তা'ওয়ীল।

দুই. সেসব গোষ্ঠী, যারা এসব ভাষ্যের প্রকাশ্য অর্থ করাকে অস্বীকার করে বলে এর অর্থ, তবে তারা এ ব্যাপারে একমত যে, এগুলো দ্বারা সিফাত সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। তারা এগুলোর কোনো অর্থই সাব্যস্ত করে না। যেমন, আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক। এদেরকে বলা হয় আহলুত তাফওয়ীদ্ব।

- আরও দুটি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা এ ব্যাপারে মৌনতা বা চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করেছে। যদিও তাদের উভয়ের বক্তব্য এক নয়। এরা দু' ভাবে বিভক্ত:

এক. যারা বলে, এগুলো দ্বারা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার সাথে উপযোগী অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে আবার এগুলো দ্বারা আল্লাহর গুণাবলি উদ্দেশ্য নাও হতে পারে।

দুই. যারা বলে, এ ব্যাপারে হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলতে চায় না। তারা কেবল এসব আয়াতের তেলাওয়াত ও এসব হাদীসের পাঠ ও খতম করার মাধ্যমেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

বস্তুত এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ব্যতীত প্রতিটি গোষ্ঠীই বাতিল ও পথভ্রষ্ট। এরা আল্লাহর তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের অধ্যায়ে বিভ্রান্ত, দিকভ্রষ্ট ও কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে।

২৩-কিতাবের শেষে এসে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ কালামশাস্ত্র ও ও যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদেরকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন:

এক. যারা কালামশাস্ত্রে নিজেদেরকে প্রবিষ্ট করায়নি। এরা নিরাপত্তা ও প্রশান্তিতে রয়েছে।

দুই. যারা **কালামশাস্ত্রে** নিজেদেরকে প্রবিষ্ট করিয়েছে, তার শেষে পৌঁছেছে। এরা কালামশাস্ত্রের অসারতা বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য শেষ জীবনে সেটা থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েছে ও আফসোস করেছে।

তিন. যারা **কালামশাস্ত্রের** মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। এরা সবচেয়ে বিপদে রয়েছে। আগের দু' শ্রেণি যতটুকু নিরাপত্তা প্রাপ্ত তারা ততটুকু নিরাপদ হতে পারেনি। তারা নিজেরা কালামশাস্ত্র বুঝতে সক্ষম হয়নি, কেবল তাদের বড় বড় উস্তাদদের বুঝকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্তি বাড়াবাড়ি ও মতকে নিয়ে অতি ধারণার বশবর্তী হয়ে পথভ্রষ্টতায় অবস্থান করে নিয়েছে।

২৪-অতঃপর শাইখুল ইসলাম এরপর দুনিয়া নষ্ট করা চার শ্রেণির লোকের কথা উল্লেখ করেছেন: অর্ধ কালামশাস্ত্রবিদ, যার দ্বারা দীন ও আকীদা নষ্ট হয়। অর্ধ ভাষাবিদ, যার দ্বারা ভাষা নষ্ট হয়। অর্ধ ফকীহ, যার দ্বারা দেশ ও শরী'আত বিনষ্ট হয়। অর্ধ ডাক্তার, যার দ্বারা মানুষের শরীর বিনষ্ট হয়।

২৫-তারপর শাইখুল ইসলাম আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে পথভ্রষ্টতার আসল কারণসমূহ বর্ণনা করেন। আর সবশেষে পথভ্রষ্টদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য কায়োমনেবাক্যে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার আহ্বান জানানোর মাধ্যমে তাঁর গ্রন্থটির সমাপ্তি টানেন।

ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ সম্পর্কে কালামশাস্ত্রবিদদের অবস্থান

ইলমুল কালাম এর পরিচিতি

আল-কালাম' অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক ইত্যাদি। গ্রীক 'লগস' শব্দ থেকে কালাম শব্দটি গৃহীত হয়েছে। লগস শব্দটির অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, পরিকল্পনা ইত্যাদি। লগস শব্দ থেকে লজিক শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা। সম্ভবত মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরব পণ্ডিতগণ লজিক শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে 'ইলমুল কালাম' (কথাশাস্ত্র) পরিভাষা ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এই অর্থে

'ইলমুল মানতিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থও 'কথাশাস্ত্র'। মোটকথা 'ইলমুল কালাম' বা 'ইলমুল মানতিক' বলতে 'দর্শনশাস্ত্র' বা 'তর্কশাস্ত্র' ভিত্তিক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা বুঝানো হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি-তর্ক দিয়ে তারা অনেক কথা বলেছেন। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ, মানুষ যুক্তি বা জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে বা নিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে পারে না। এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে একমত হতে পারেননি। তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অন্ধের হাতি দেখার মতোই হয়েছে।[৩]

ইলমুল কালাম কীভাবে ও কখন মুসলিমদের মাঝে প্রসারিত হয়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলিম সমাজে 'ইলমুল কালাম' দর্শনশাস্ত্র বা 'ইলমুল মানতিক' তর্কশাস্ত্রের কোনো পরিচিতি ছিল না। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে বিশেষত ১৩২ হিজরী (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক দর্শন প্রচার লাভ করে। তখন মূলধারার তাবে'য়ীগণ ও তাদের অনুসারীগণ আকীদাহ-বিশ্বাস বা গাইবী বিষয়ে 'ইলমুল কালাম' তথা দার্শনিক বিতর্ক কঠিনভাবে অপছন্দ করতেন। কারণ, তারা বিশ্বাস করতেন যে আকীদাহ-বিশ্বাস বা গাইবী বিষয়ে ওহী তথা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর নির্ভর করা এবং ওহীর নিদের্শনাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়াই মুমিনের মুক্তির পথ। তারা আল-কুরআন, সহীহ হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে আকীদাহ চর্চা করেছেন। এর বিপরীতে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর আকীদাহ চর্চা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি তারা সঠিক আকীদাহ প্রমাণের জন্যও দর্শননির্ভর বিতর্ক নিষেধ করেছেন। কারণ, সালাফে সালেহীনের আকীদাহ চর্চা ও ইলমুল কালামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ওহী এবং আক্বল-এর।

সালাফে সালেহীনের আকীদাহ চর্চা ওহী নির্ভর, বিশেষত কুরআন, হাদীস ও 'আছার' বা সাহাবীগণের বক্তব্য নির্ভর। পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের আকীদাহ চর্চা 'আক্বল' বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শননির্ভর। সালাফে সালেহীনের বক্তব্য সর্বদা নিম্নরূপ: "তোমার বিশ্বাস এরূপ হতে হবে; কারণ কুরআনে, হাদীসে বা সাহাবীগণের বক্তব্যে এরূপ বলা হয়েছে।" পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের বক্তব্য নিম্নরূপ: "তোমাকে এরূপ বিশ্বাস করতে হবে; কারণ জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তি এটিই প্রমাণ করে।"

ইলমুল কালাম চর্চার কিছু ক্ষতিকর দিক

ইলমুল কালাম' 'ইলমুল মানতিক' তথা দর্শনশাস্ত্র চর্চা মুসলিমদের কাঁধে চাপার ফলে কাদারিয়া, জাবারিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশ'আরী, মাতুরিদী ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদের

৩. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ, আল-ফিকহুল আকবর, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ১৪৮।

জন্ম হয়। ফলে ওহী তথা কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের অনুসারী, সহীহ আকীদায় বিশ্বাসী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ বিভিন্ন সময় এরূপ বাতিল ফিরকা দ্বারা নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে নির্যাতন করার ঘটনা কার অজানা? পথভ্রষ্ট মু'তাযিলা ফিরকার আলেম, হানাফী মাযহাবের অনুসারী, বিচারপতি আহমাদ ইবন আবী দুআদ এর নির্দেশে আব্বাসী খলিফা মু'তাসিমের সম্মুখে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। এই সম্মানিত ইমামকে দীর্ঘদিন বন্দী রাখা হয়েছে। তার অপরাধ কী ছিল? তিনি মু'তাযিলা পথভ্রষ্টদের কুফরী আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন না। মু'তাযিলা পথভ্রষ্টরা বিভিন্ন রকমের ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী ছিল, তারা বলতো: কুরআন সৃষ্ট বা মাখলুক এবং আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে না। আর ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলতেন: "কুরআন আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর সিফাত-গুণ। আল্লাহ যেমন সৃষ্ট নন তাঁর কালামও সৃষ্ট নয়। আর কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আখেরাতে মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলাকে দেখবেন"। মূলত এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সহীহ আকীদাহ। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহও তা-ই।

আফসোসের বিষয় এই যে, বহু পূর্বকাল থেকেই কিছুলোক নিজেদেরকে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র মাযহাবের অনুসারী বলে দাবি করে আসছেন। অথচ তারা ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র সহীহ আকীদায় বিশ্বাসী নন। এমনকি যারা ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র সহীহ আকীদায় বিশ্বাসী তাদেরকে এই নামদারী হানাফীরা বাতিল বলে ফাতোয়া দিয়ে নির্যাতন করে থাকেন। পথভ্রষ্ট মু'তাযিলা ফিরকার আলেম, হানাফী মাযহাবের অনুসারী, বিচারপতি আহমাদ ইবন আবী দুআদ-এর নাম এই দাবির চমৎকার উদাহরণ। এই নরাধম হানাফী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র সহীহ আকীদায় বিশ্বাসী ছিল না। বরং ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ যিনি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ন্যায় সহীহ আকীদায় বিশ্বাসী, তাকে এই হতভাগা বিচারপতি 'মুশরিক' বলে কতলের নির্দেশ দিয়েছিল। এমনকি এই নরপশু নিজে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ'র রক্তের দায় বহন করার ঘোষণা দিয়েছিল।[৪]

ইলমুল কালাম' দর্শনশাস্ত্র চর্চা মুসলিম সমাজে চেপে বসার কারণে পরবর্তীতে আশ'আরী মাতুরিদী নামে ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদের আলেমরা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার অনেক সিফাতকে অস্বীকার করেন। এমনকি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার যেসব সিফাত বা গুণাবলিকে স্বীকার করেন সেসব সিফাতকেও তারা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অস্বীকার করেন। হানাফী, মালিকী ও শাফে'য়ী মাযহাবের কিছু লোক আশ'আরী মাতুরিদী আকীদাহ গ্রহণ করে ফেলেন। আর তারা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুমুল্লাহ'র সত্য-সঠিক সহীহ আকীদাকে বর্জন করেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন। তবে অধিকাংশ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ তাদের ইমাম

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৬।

আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ'র সহীহ আকীদায় অটল থাকেন।

আশ'আরী মাতুরিদীরা আল্লাহ তা'আলার যেসব সিফাত বা গুণাবলিকে অস্বীকার করেন সেসবের কয়েকটি হলো: আল্লাহ তা'আলার চেহারা, হাত, 'আরশের উপরে উঠা, শেষ রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, ক্রোধ, সন্তুষ্টি, ভালোবাসা ইত্যাদি। এসব অস্বীকার করার কারণ হলো, আকীদাহ চর্চার ক্ষেত্রে তাদের ওপর 'ইলমুল কালাম' তথা দর্শন নামক অপছায়া পড়েছে।

দর্শন-কালামশাস্ত্রের নিন্দায় ইমামগণের বক্তব্য

সালাফে সালেহীন ইমামগণ 'ইলমুল কালাম' দর্শনশাস্ত্র বা 'ইলমুল মানতিক' তর্কশাস্ত্রের নিন্দা করে গিয়েছেন। যেমন, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র পুত্র হাম্মাদ বলেন: এক শুক্রবারে আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) আমার হাত ধরে মসজিদে প্রবেশ করেন।... তিনি দীন (আকীদাহ) বিষয়ে বিতর্কে (কালাম চর্চায়) লিপ্ত একদল মানুষের নিকট দিয়ে গমন করেন এবং আমাকে বলেন: বেটা! যে ব্যক্তি এ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করবে সে যিনদীক (ধর্মত্যাগী ও ধর্ম অবমাননাকারী) বলে আখ্যায়িত হবে এবং ইসলামের পরিমণ্ডল থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। এভাবে সে এমন অবস্থায় পৌঁছাবে যে, তার দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না।...হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা বলেন: আমি এরূপ বিতর্কের বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলাম। শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর এ কথার পরে আমি এ জাতীয় বিতর্ককে পরিত্যাগ করি।

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্র নূহ ইবন আবী মারইয়াম বলেন: "আমি আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে বললাম: মানুষেরা ইলমুল কালামে (স্রষ্টার অস্তিত্ব, অনাদিত্ব ও বিশেষণ প্রমাণে) 'আরদ্ব' (অমৌল-পরনির্ভর) 'জিসম' (দেহ) ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর বিষয়ে আপনার মত কী?

তিনি বলেন: এগুলো দার্শনিকদের কথাবার্তা। তোমার দায়িত্ব হাদীসের ওপর নির্ভর করা এবং পূর্ববর্তীদের (সাহাবী-তাবে'য়ীদের) তরীকা অনুসরণ করা। সাবধান! সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে; কারণ তা বিদ'আত।"

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্রগণও ইলমুল কালাম চর্চা নিষেধ করতে থাকেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ (১৮৯ হি.) তাঁর ছাত্র ইলমুল কালামের বিশেষজ্ঞ ও মু'তাযিলী পণ্ডিত বিশর আল-মাররীসী (২১৮ হি.)-কে বলেন: "কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ইলমুল কালামে সুখ্যাতির অর্থ তাকে যিনদীক বা অবিশ্বাসী-ধর্মত্যাগী বলা হবে।"

ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন: "যে ব্যক্তি ইলমুল কালাম শিক্ষা করবে সে যিনদীকে পরিণত হবে।"

ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২০৪ হি.) বলেন "যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তাদের বিষয়ে আমার আদেশ এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে মহল্লায় মহল্লায় ও গোত্র-গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে

হবে: যারা কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি।"[৫]

এভাবে প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের সকল প্রসিদ্ধ আলেম, ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন।

পরবর্তী যুগে ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমামের অনুসারী অনেক আলেম আহলুস সুন্নাতের আকীদাহ ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালাম চর্চা করেছেন। বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির উত্তর প্রদানের প্রয়োজনেই তারা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। তবে তারা ইলমুল কালামের 'দার্শনিক অপছায়া' থেকে বের হতে পারেননি। তাদের আলোচনায় সর্বদা কুরআন, হাদীস বা ওহীর বক্তব্যের চেয়ে যুক্তি-তর্ক ও দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে।

ইমামগণ বা সালাফে সালেহীনের আকীদাহ চর্চা ওহী নির্ভর, বিশেষত হাদীস ও 'আছার' বা সাহাবীগণের বক্তব্য নির্ভর। পক্ষান্তরে ইলমুল কালাম 'আক্বল' অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শননির্ভর।

'ইলমুল কালাম' এর বিপরীতে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ভূমিকা

শাইখুল ইসলাম, মুজাদ্দিদ, ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র যামানায় 'ইলমুল কালাম' দর্শনশাস্ত্র বা 'ইলমুল মানতিক' তর্কশাস্ত্র খুব গুরুত্ব সহকারে চর্চা করা হতো। অথচ এ বিদ্যার উৎস কুরআনও নয় হাদীসও নয়। এমনকি মক্কা-মদীনা থেকে আগতও নয়। বরং ইউনান গ্রীক থেকে আমদানী কৃত শুদ্ধ ও ভুলে ভরা কিছু পেচানো কথাবার্তা মাত্র।

হিজরী সপ্তম শতাব্দিতে দর্শন-কালামশাস্ত্রের তোড়জোড় খুব বেশি ছিল। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দিতেও এর প্রভাব ছিল। 'এমনকি মুসলিমগণ কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন ছেড়ে গ্রীক দর্শন বা কালামশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হওয়া (এবং এর ফলে সালাফে সালেহীনের সহীহ আকীদাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে দলে দলে বিভক্তি) ৬৫৬ হিজরীতে তাতারীদের দ্বারা বাগদাদ ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাইখুল ইসলাম ইবন দাকীকুল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ এই কারণটি চিহ্নিত করেছেন'।

হিজরী সপ্তম শতাব্দিতে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ দর্শন-কালামশাস্ত্রের জয়-জয়কার সর্বত্র দেখতে পান। ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ দর্শন-কালামশাস্ত্র শুধু পড়েননি বরং এর ভেতরকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কেও অবগত বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দর্শন-কালামশাস্ত্রের দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি অতি নিপুণ হাতে লিপিবদ্ধ করেন। দার্শনিকদের কাল্পনিক অট্টালিকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প সৃষ্টি করেন। কালামবিদ তথা মুতাকাল্লিমীনের চোখে আঙ্গুলি দিয়ে তাদের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দেন।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ কালামশাস্ত্রের মূলনীতিগুলোর মধ্যে বেশ কিছু মূলনীতিকে সংজ্ঞা, প্রমাণ ও যুক্তিগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি এই ব্যাপারে বৃহদাকারের গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার লিখিত 'দারউ তা'আরুদিল আক্বল ওয়ান নাক্বল' গ্রন্থটির ভূমিকায় উল্লিখিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ

---

৫. প্রাগুক্ত।

আলোচনা রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম বলেন, আমি বহু পূর্ব থেকেই জানি যে, ইউনানী মানতিক মেধাবীদের কোনো প্রয়োজনে আসবে না আর মেধাহীনদেরও কোনো উপকার সাধন করবে না। তবে আমি আগে মনে করতাম যে, মানতিকের সূত্রাবলি সঠিক। পরে আমার নিকট ধরা পড়ল যে, মানতিকের অনেক সূত্রাবালিতে ভুলও রয়েছে। এ ব্যাপারে আমি লিখেছিও বটে।

আমি যখন আলেক্সান্দ্রিয়াতে ছিলাম তখন এমন অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা তর্কশাস্ত্রবিদদের ভয়ানক মুকাল্লিদ-অন্ধ অনুসারী। ফলে আমি তাদেরকে এই শাস্ত্রের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করি। আমি এই বিষয়ে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে এক বৈঠকে মানতিকের ব্যাপারে একটি রচনা লিপিবদ্ধ করেছিলাম। 'ইলমুল কালাম' 'ইলমুল মানতিক' তথা দর্শনশাস্ত্র ভিত্তিক আকীদাহ চর্চার ফলে কাদারিয়া, জাবরিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশ'আরী, মাতুরিদী ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি হয়। ফলে কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর, সহীহ আকীদায় বিশ্বাসী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ বাতিল ফিরকা দ্বারা নির্যাতিত-নিপীড়িত হন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ'র ন্যায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহও 'ইলমুল কালাম' 'ইলমুল মানতিক' তথা দর্শনশাস্ত্র ভিত্তিক আকীদাহ চর্চাকারী বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত আলেমদের দ্বারা নির্যাতিত হন। তিনি আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদার আলেমদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বহুবার কারাগারে আবদ্ধ হয়েছেন। এমনকি বিশ্ববিখ্যাত এই মুজাদ্দিদ আলিমে-দীন কারাগারেই মারা গেছেন। কারণ, আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদার পথভ্রষ্ট আলেমগণই তখন কাজী-বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ এবং তার পূর্বপুরুষগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম ইমাম, বিশ্ববরেণ্য আলেম, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ'র অনুসারী ছিলেন। ফলে তারা আকীদাহ ও আমল উভয় ক্ষেত্রে সত্য-সঠিক বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তখনো চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেননি। সিরিয়ার একটি শহর 'হামাত' থেকে আল্লাহ তা'আলার সিফাত-গুণাবলি সম্পর্কে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের ভিতরে 'ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ' নামে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এ পুস্তকটি রচনা করেন। তিনি এতে আল্লাহর সিফাত-গুণাবলি বিষয়ে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক সালাফে সালেহীনের অনুসৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ লিপিবদ্ধ করেন। বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ, সালাফে সালেহীন, চার ইমামের আকীদাহ এবং ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ'র মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আকীদাহ হামাউইয়্যাহ এবং আকীদাতুল ওয়াসিত্বিয়াহ নামে দু'টি কিতাব রচনা করার পর বলেন: "যারা আমার বিরোধিতা করছেন, আমি তাদের সকলকে তিন বৎসরের সময় দিলাম; তারা যদি আমার লিখিত আকীদাহ'র একটি হরফও 'কুরুনে সালাসা'-সোনালী তিন যুগের লোকদের একজনেরও বিপরীত বলে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি তা থেকে রুজু-প্রত্যাবর্তন করবো।"

আহলুল কালামের মাঝে শাইখুল ইসলামের লেখা ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ আল-কুবরার প্রতিক্রিয়া

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে ফাতাওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ লেখার পর 'ইলমুল কালাম' দর্শনশাস্ত্রের কালো ছায়ায় গড়ে উঠা আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদায় বিশ্বাসী বিদ'আতী আলেমরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যান। কারণ, তারা দীর্ঘদিন যাবৎ সাধারণ মুসলিমগণকে এই বিভ্রান্ত আকীদাহ শিক্ষা দিয়ে আসছেন। এখন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীন ও চার ইমামের সহীহ্ আকীদাহ প্রচার করলে তারা বিপদে পড়বেন। তাদের গোমরাহী প্রকাশ পেয়ে যাবে। তারা জনগণের আক্রোশে পড়বেন। জনগণকে সঠিক ইসলামী আকীদাহ'র পরিবর্তে বিদ'আতী আকীদাহ্ শিখানো হলো কেন এর কৈফিয়ত দিতে হবে। তাদেরকে গণ-আদালতে আসামী হিসেবে দাঁড়াতে হবে। অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়ে আশ'আরী-মাতুরিদীর ভ্রান্ত আকীদাহ বর্জন করে সালাফে সালেহীনের সঠিক আকীদাহ্ গ্রহণ করতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, জনসাধারণ জেনে যাবে যে, আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদাহ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ নয়। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ্ও নয়। ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহও নয়। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহও নয়। বরং তাদের আকীদাহ্ হলো সালাফে সালেহীনের সঠিক ইসলামী আকীদাহ, যা ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সত্য প্রকাশ পেলে আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদাহ'য় বিশ্বাসী আলেমগণ বিপদে পড়বেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ীন, বিখ্যাত চার ইমাম তথা সালাফে সালেহীনের সহীহ ইসলামী আকীদাহ'র বিপরীতে জনসাধারণকে আশ'আরী-মাতুরিদীর বিদ'আতী আকীদাহ শিক্ষা দেয়ার অভিযোগ উঠবে। তখন আলেমরা কী বলে গণবিদ্রোহ থেকে নাজাত লাভ করবেন? বিদ'আতী আলেমরা এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। তারা নিজেদেরকে গণবিদ্রোহ থেকে বাঁচানোর জন্য ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। এ ব্যাপারে তারা দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন:

এক. সরাসরি বিরোধিতা

শাইখ আলামুদ্দীন আল-বিরযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ৬৯৮ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং মাস ব্যাপী চলতে থাকে।

আন্দোলনকারী বিদ'আতীরা ইমামের বিরুদ্ধে সিরিয়ার নায়েব সুলতানের নিকট নালিশ দিতে চাইল। কিন্তু তারা জানে যে, নায়েব সুলতান ইমামের জ্ঞান সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণি-মুক্তা আহরণকারী। কারণ, কিছুদিন পূর্বে নুজুমীরা ইমামের বিরুদ্ধে নায়েব সুলতানের নিকট নালিশ দিয়েছিল। কিন্তু পরিণাম ফল সম্পূর্ণ উল্টো হয়েছে।

ঘটনাটি হলো এই যে, ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ নুজুমী-জ্যোতিষী বা তারকা দেখে ভবিষ্যতের

সংবাদ প্রদানকারীদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের বিভিন্ন অবস্থার কারণে মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি ঘটে না। তাছাড়া নক্ষত্র দেখে কেউ কারো ভবিষ্যতের কোনো কথা বলতে পারে না। জ্যোতিষীরা আনুমানিক কথা বলে থাকে। ফলে তাদের একশ' কথার মধ্যে এক-দু'টি কথা কখনো বাস্তবে পরিণত হয়। জ্যোতিষীদের কথা ও কাজে বিশ্বাস করা তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়। তাওহীদপন্থী মুসলিমরা জ্যোতিষীদের কথা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন না।

ফলে জ্যোতিষীরা নায়েব সুলতান আমীর সাইফুদ্দীন জাগান এর নিকট ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র বিরুদ্ধে নালিশ দেয়। সুলতান তাকে তলব করেন। তিনি সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়ে নুজুমী-জ্যোতিষীদের অসারতা ফুটিয়ে তুলেন। এতে নায়েব সুলতান সন্তুষ্ট হন এবং ইমামের প্রতি উচ্চধারণা পোষণ করেন এবং মাঝে মাঝে তাকে ইলমী বিষয়ে আলাচনা শুনিয়ে ইসলামী জ্ঞান দানের অনুরোধ জানান।

উল্লিখিত ঘটনার কারণে বিদ'আতীরা নায়েব সুলতানের নিকট ইমামের বিরুদ্ধে নালিশ দেয়ার সাহস পায়নি। তারা দামেশকের কাজী-বিচারক ও ফকীহ-মুফতীগণের নিকট গিয়ে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা-বার্তা বর্ণনা করে তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

তারা বলে যে, তিনি বলেন, আল্লাহর জিসিম-দেহ রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ ইমামের বক্তব্য হলো আল্লাহর গুণাবলি কুরআন-হাদীসে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কোনো রকম বিকৃতি, অস্বীকৃতি বা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না। আবার কোনো গুণের ধরন-গঠন মুখে প্রকাশ বা অন্তরে কল্পনাও করা যাবে না। এমনকি কোনো গুণকে মাখলুক বা সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে উপমা-তুলনা বা সাদৃশ্য পেশ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহর মতো কোনো কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি তেমনই, যেমন তাঁর জন্য শোভনীয়। যেমন, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে উঠার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে উঠেছেন এ কথা আমাদের জানা আছে। তবে উপরে উঠার ধরন-গঠন আমাদের অজানা। জানা বিষয়ে ঈমান রাখা ওয়াজিব। আর অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত।

শাইখুল ইসলামের বিরোধী চক্রের সাথে জালালুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন কাজী হুসামুদ্দীন রুমী হানাফী (মৃত্যু ৭৪৫ হি.) একমত হন। তিনি বিরোধী চক্রের সাথে দারুল হাদীস আশরাফিয়া মাদ্‌রাসায় এসে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহকে সেখানে উপস্থিত হতে লোক পাঠান। কিন্তু জালালুদ্দীন হানাফীর ডাকে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ সাড়া দেননি। বরং তিনি কাজীকে তার দায়িত্ব কর্তব্যের পরিধি দেখিয়ে দেন। তিনি তাকে লিখে পাঠান যে, কে কোন আকীদাহ পোষণ করে তা আপনার বিচারের আওতাধীন বিষয় নয়। সুলতান তো আপনাকে মানুষের ঝগড়া-বিবাদ ফায়সালার দায়িত্ব দিয়েছেন মাত্র।

ইমামের লিখিত চিরকুট হানাফী কাজীর নিকট পৌঁছলে বিদ'আতীরা তাকে উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করলো। তারা বললো, কাজী সাহেব! দেখুন, তিনি আপনার ডাকে সাড়া

দেননি। বরং আপনাকে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হানাফী কাজী তখন 'ইবন তাইমিয়্যাহর আকীদাহ সঠিক নয়' বলে শহরে প্রচার করার আদেশ দিলেন। ফলে তার আদেশে শহরের কোথাও কোথাও তা প্রচার করা শুরু হলো।

নায়েব সুলতান সাইফুদ্দীন জাগান সঙ্গে সঙ্গে একদল পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন। তারা প্রচারকারী ও তাদের সঙ্গী সাথীদেরকে বেত্রাঘাত করতে থাকেন। তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়ে আত্মরক্ষা করে।

অতঃপর নায়েব সুলতান এই অপকর্মের হোতা ও তার সঙ্গীদেরকে দরবারে তলব করেন। হতভাগা বিদ'আতীরা নায়েব সুলতানের দরবারে হাযির হতে সাহস পায়নি। নায়েব সুলতানের আদেশে সরকারি লোকজন তাদেরকে সারা শহরে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু তারা ভয়ে আত্মগোপন করে ফেলে। তারা নিরুপায় হয়ে বদরুদ্দীন আতাবাগীর শরণাপন্ন হয়। তারা তার বাড়িতে গিয়ে ঘটিত বিষয় থেকে দায়মুক্ত করে দিতে নিবেদন জানায়। বদরুদ্দীন আতাবাগী নায়েব সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর বিষয়টি মীমাংসা করে দেন।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ নিয়ে প্রথম বৈঠক

৬৯৮ হিজরী সনের ১৩ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ জুমু'আর সালাতের পর জামে উমাওয়ীতে তাফসীর পেশ করেন। তিনি সেদিন সূরা আল-কামারের ৪নং আয়াত "নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী" এই আয়াতের তাফসীর পেশ করেছিলেন। সেদিন তাফসীরে বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। তখন ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ প্রসঙ্গটি দামেশকের সবচেয়ে বহুল আলোচিত বিষয় হিসেবে স্থান পায়।

তিনি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে কী আকীদাহ পোষণ করেন বা তিনি আকীদায়ে হামাওয়িয়্যাহ পুস্তকে কী লিখেছেন তা জানার জন্য সকলের মধ্যে কৌতুহল দেখা দেয়। তাই ১৪ই রবিউল আউয়াল শনিবার কাজী ইমামুদ্দীন শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ'র বৈঠকখানায় দামেশেকের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে শাইখুল ইসলাম মুজাদ্দিদে যামান মুজতাহিদ ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ উপস্থিত হয়ে তার লিখিত আকীদায়ে হামাওয়িয়্যাহ পুস্তকের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সকাল বেলা বৈঠক আরম্ভ হয় এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত বৈঠক চলতে থাকে। দীর্ঘ বৈঠকে তার পুস্তক পাঠ করা হয়। যেখানেই কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় সেখানেই তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

তার ব্যাখ্যাকে হাকিম-বিচারকের পক্ষ থেকে অথবা উপস্থিত কারো তরফ থেকে কোনো ধরনের ইনকার বা প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। পরিশেষে কাজী ইমামুদ্দীন শাফে'য়ী একথা ঘোষণা করলেন যে, কেউ যদি শাইখুল ইসলামের আকীদাহ'র ব্যাপারে কটুক্তি করে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

কেননা তাঁর লিখিত আকীদাহ আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক। তিনি আকীদাহ হামাওয়িয়্যাহ পুস্তকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম,

তাবে'য়ীন, মুজতাহিদ ইমামগণ তথা সালাফে সালেহীনের সঠিক ইসলামী আকীদাহ লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেদিন বিরোধী চক্র তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল প্রকার ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত করতে কোনো ধরনের ত্রুটি করেনি। তিনি উপযুক্ত উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তাকে কী ধরনের শাস্তি দেয়া হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা জমজমাট ছিল। তাদের মুখ থেকে এমন জঘন্য উক্তি বের হচ্ছিল যা প্রকাশ করাও লজ্জাজনক। তবে উক্ত ঘটনার পরিণাম ফল শাইখুল ইসলামের জন্য খুবই লাভজনক হয়েছে বলে নেক ও উত্তম লোকদের ধারণা, যা লিখতে চাইলে স্বতন্ত্র পুস্তক হবে।

বিরোধীরা সোচ্চার হয়ে উঠলো

উপরে যা আলোচনা করা হলো তা ছিল ৬৯৮ হিজরী সনের কথা। ৭০৫ হিজরী সনে বিরোধীরা আবার নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ইতোমধ্যে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কিসরোয়ান পর্বতবাসী শিয়াদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে বীর-বাহাদুরী ও বিচক্ষণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি ভ্রান্ত পীর-ফকীরের ঝুলি-ঝালা ও গোপন কারামত সব ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি পাথর পূজার ছোট বড় বহু আস্তানা উচ্ছেদ করে শির্ক নির্মূলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দর্শন-কালামশাস্ত্রের বহু মূলনীতির ভ্রান্ততা ফুটিয়ে তুলে গ্রন্থ রচনা করেছেন। জ্যোতিষীদের মিথ্যা বাহাদুরী জনসাধারণ ও সরকারি মহলে প্রকাশ করেছেন। খারেজী, রাফেযী, জাহমিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ, কাদারিয়্যাহ, আশ'আরী, মাতুরিদী ইত্যাদি ভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে লিখনী, বক্তৃতা ও বাহাস-বিতর্ক করে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মিথ্যাকে ভূলুণ্ঠিত করার সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন। তাই এসব আকীদার ধারক-বাহকরা মিসর সরকারের উচ্চ মহলের সাথে একত্রিত হয়ে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা মিসরের বিচারপতি ও উলামায়ে কিরামকে শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা চালায়। সে প্রচার করে যে, তিনি বিদ'আতী, খারাপ আকীদাহ'র লোক। সকলে মিলে মিসরের সুলতানের নিকট ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র বিরুদ্ধে নালিশ দেন। মিসরের সুলতান তখন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র আকীদাহ-বিশ্বাস তদন্ত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠক

মিসরের সুলতান সিরিয়ার নায়েব সুলতানকে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র আকীদাহ-বিশ্বাস ভালোভাবে পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের ফরমান লিখে পাঠান। মিসরের সুলতানের ফরমান পেয়ে সিরিয়ার নায়েব সুলতান ৭০৫ হিজরী সনের ৮ই রজব সোমবার দামেশকে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ পরীক্ষা করার জন্য মুনাযারাহ-অনুসন্ধান বৈঠকের আয়োজন করেন। উক্ত বৈঠকে মিসরের আমীর চার মাযহাবের কাজী ও তাদের সহযোগী, মুফতী, মাশায়েখ, আলেম-উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ

জানান। নায়েব সুলতানের সভাপতিত্বে সরকারি ভবনে বৈঠক শুরু হয়। সে বৈঠকেও শাইখুল ইসলাম তাদেরকে লা জাওয়াব করে দেন।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ নিয়ে তৃতীয় বৈঠক

প্রথম দিনের অসমাপ্ত বৈঠক তিনদিন পর ১২ রজব শুক্রবার দ্বিতীয় দফা বর্ধিত আকারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শাইখ সাফী উদ্দীন হিন্দী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহিম শাফে'য়ী আল-মুতাকাল্লিম (মৃত্যু ৭১৫ হি.)-কে শাইখুল ইসলামের সাথে বাহাস করতে আনা হয়। তিনি সেদিন বিরোধীদের শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাদের মাঝে দর্শন-কালামশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি শাইখুল ইসলামের সাথে সাধ্যমতো বাহাস করেন। কিন্তু শাইখুল ইসলামের সাথে বেশি সময় টিকতে পারেননি। শাইখুল ইসলাম তাকে অপারগ ও নিশ্চুপ করে দেন। এভাবে হেরে গিয়ে তারা অন্যভাবে এগিয়ে আসল।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: মিথ্যাচার করে গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি

এ পদ্ধতির প্রথম লেখক হিসেবে ধরা হয় ইবন জাহবলকে। তার পূর্ণ নাম হচ্ছে, শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন ইসমা'ঈল ইবন তাহের ইবন জাহবল আশ-শাফে'য়ী। ইবন জাহবল চেষ্টা করেছিলেন শাইখুল ইসলামের ফাতাওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ এর রদ্দ করতে। তার এ গ্রন্থটি শাইখুল ইসলামের শত্রু ও সালাফী আকীদার শত্রু তাজউদ্দীন আস-সুবুকী তার ত্বাবাকাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা গ্রন্থে পুরোপুরি নিয়ে আসেন। কিন্তু যারা সহীহ আকীদাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা এ গ্রন্থ পড়লে সহজেই সেটার অসারতা বুঝতে পারবেন। গ্রন্থটিকে তিনি একটি ভূমিকা ও তিনটি অংশে বিভক্ত করেন। ভূমিকাতে যারা আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত করবে তাদেরকে 'হাশাওয়িয়্যাহ' উপাধি দিয়ে অযথা মিথ্যারোপ করতে থাকে। তারপর যখন মূল আলোচনায় আসল, তখন প্রথমেই তার ধারণা মোতাবেক আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ তুলে ধরল, যা কখনও দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হয়নি, কেবল দাবি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বরং কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের আছার এর বিরোধিতা করে কালামশাস্ত্রবিদদের আকীদাকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর শাইখুল ইসলামের ওপর রদ্দ করার অযাচিত চেষ্টা করেছে। যাতে তিনি কোনো দলীল না এনে শাইখুল ইসলামের আনীত আয়াত, হাদীস, আছার এর বিবেকপ্রসূত জবাব প্রদান করেছে। কখনও কখনও সালাফদের কথার বিপরীতে সূফী সম্প্রদায়ের অসমর্থিত কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। এ গ্রন্থে লেখকের বড় অস্ত্র হচ্ছে শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে অসত্য তথ্য প্রদানের অভিযোগ প্রদান ও বিবেকপ্রসূত আপত্তি উপস্থাপন।

আলহামদুলিল্লাহ, পরবর্তীতে শাইখ আহমাদ ইবন ইবরাহীম ইবন ঈসা তার 'তানবীহুন নাবীহ ওয়াল গাবী' গ্রন্থে ইবন জাহবল এসব সন্দেহ ও অপবাদের বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন।

তাছাড়া শাইখুল ইসলাম নিজেও তার 'জাওয়াবুল ই'তিরাদ্বাতুল মিসরিয়্যাহ আলাল ফাতওয়াল হামাওয়িয়্যাহ' গ্রন্থে সেসব সন্দেহের উত্তর দিয়েছেন। যদিও সেটি সরাসরি

উক্ত গ্রন্থের রদ্দ নয়। কিন্তু শাইখুল ইসলাম তখনকার সময়ের লোকদের কিছু সন্দেহের উত্তর প্রদান করেছেন অথবা হতে পারে শাইখুল ইসলাম নিজেই ইবন আহবলের সেসব অপবাদের উত্তর দিয়েছেন।

শাইখুল ইসলামের বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা অভিযোগ প্রদান করেছে তার সারকথা হচ্ছে,

১- তিনি আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত করার মাধ্যমে তাকে সৃষ্টির মুখাপেক্ষী করেছেন।

২- তিনি আল্লাহকে 'আরশের উপর সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আল্লাহকে সৃষ্টির মুখাপেক্ষী করেছেন।

৩- তিনি আল্লাহকে আসমানের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছেন।

৪- তিনি আল্লাহ তা'আলাকে সীমাবদ্ধ করেছেন।

৫- তিনি আল্লাহর এসব গুণাবলি সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আল্লাহকে সৃষ্টির সদৃশ সাব্যস্ত করেছেন।

৬- তিনি নিজেও অপব্যাখ্যা করেছেন।

এসব সন্দেহ ও অপবাদের উত্তর আমরা শাইখুল ইসলামের গ্রন্থ থেকেই প্রদান করব:

আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠা, 'আরশের উপর অবস্থান করা ও এ জাতীয় অন্যান্য সিফাতে খবরিয়্যাহ এর ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহর ওপর আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগ ও তার জবাব

দুর্ভাগ্যবশত শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহর মত এ মর্দে মুজাহিদের ওপর মিথ্যাচারের পর মিথ্যাচার করা হয়েছে। কেউ তাকে দেহবাদী মুজাসসিমা বলেছে। কেউ তাকে বলেছে মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্য স্থাপনকারী। কেউ বলেছে, তিনি আল্লাহকে 'আরশের উপর মানুষের বসার মতো বসার কথা বলেছেন। কেউ বলেছে, তিনি আল্লাহর নিকটতম আসমানে অবতরণ করাকে মানুষের মতো করে অবতরণ করার কথা বলেছেন। বস্তুত এসবই তার ওপর মিথ্যাচার। তিনি কখনও এমন কথা বলেননি। শত্রুরা সব সময়েই মিথ্যাচার করে মজা পায়। আমরা শাইখুল ইসলামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে, তিনি এসব কিছু বলেননি। যেমন- তিনি বলেন,

১- আল্লাহ তা'আলা জগতের উপরে, জগত থেকে পৃথক, সৃষ্টিকুল তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না, তাকে জায়গা দিতে পারে না, তিনি 'আরশ বা অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নন, তদুপরি তিনি 'আরশের উপরে, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, তাদের অনুরূপ নয়, তাদের উপর যা ঘটা বৈধ তাঁর উপর তা বৈধ নয়।[৬]

২- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, তিনি 'আরশের ভেতরে নন অথবা 'আরশের প্রতি তাঁর মুখাপেক্ষিতাও নেই।[৭]

---

৬. মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/৩০৭)।

৭. দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (৬/৩১৫)।

৩- আল্লাহ তা'আলা তিনি স্রষ্টা, তিনি সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, তিনি তাঁর সত্তা, গুণ ও কর্মের জন্য তাঁর থেকে আলাদা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। বরং যা কিছুই তাঁর থেকে আলাদা তা-ই তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পৃথক জিনিস থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, সেই পৃথক সৃষ্টিই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনি নিত্য-নতুন যেসব কাজ নিজের সত্তা দ্বারা সম্পন্ন করেন সেসব কাজ করতে তাঁর থেকে পৃথক কোনো কিছুর প্রতি মোটেও মুখাপেক্ষী নন।[৮]

৪. আল্লাহ তা'আলাকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না, ফলে তুলনাকৃত সত্তা ও বস্তু দু'টি কিয়াস করার বিধানের ক্ষেত্রে সমান হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যেকটি প্রশংসার সবচেয়ে বেশি হকদার এবং মন্দ ও নিন্দনীয় বিষয় থেকে অনেক দূরে। সুতরাং এমন পরিপূর্ণ খাঁটি-নির্ভেজাল গুণাবলি থেকে যেকোনো ধরনের ত্রুটিমুক্ত গুণের প্রসঙ্গ আসলে তিনি এককভাবে তার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হকদার হবেন, অন্যদিকে ত্রুটিপূর্ণ অপরিপক্ক গুণাবলি থেকে যেকোনো ধরনের গুণের প্রসঙ্গ আসলে তার প্রত্যেকটি থেকে তাঁকে পবিত্র বা মুক্ত ঘোষণা করাটা অধিক বাঞ্ছনীয় হবে।[৯]

৫. রূহ তথা আত্মার ব্যাপারে বলা হয় যে, যখন মানুষ ঘুমায়, তখন রূহ ঊর্ধ্বে গমন করে; আর এটা সত্ত্বেও তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে থাকে, সম্পূর্ণভাবে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। রূহের ব্যাপারে কথিত এই ঊর্ধ্বে গমনকে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের ঊর্ধ্বে গমনের সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ, দৃশ্যমান বস্তু যখন এক জায়গা থেকে অন্য কোনো জায়গায় গমন করে, তখন তা প্রথম জায়গা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; আর তার ওপরের দিকে চলাচলটা হয় এক জায়গা থেকে অন্য কোনো জায়গায় প্রস্থানের চলাচল। আর রূহের ঊর্ধ্বে গমন ও নিচে অবতরণের বিষয়টি ঐ রকম নয়।

সুতরাং মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ব্যাপারে যখন তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন যে, তিনি (আল্লাহ) প্রত্যেক রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং 'আরাফার দিন হাজীগণের নিকটবর্তী হন, তখন এর থেকে এটা আবশ্যক হয় না যে, এ কাজগুলো আমাদের সামনে দৃশ্যমান বস্তুর অবতরণের মতো কোনো কর্মকাণ্ডের শ্রেণিভুক্ত হবে; যেগুলোতে সাধারণত এক জায়গা খালি করা এবং অপর জায়গাতে অবস্থান আবশ্যক করে। কারণ, রূহের অবতরণ ও ঊর্ধ্বে গমনও তো এটাকে আবশ্যক করে না; তাহলে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এমন কথা কীভাবে প্রযোজ্য হবে?! অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণ কর্তৃক এ জাতীয় ঊর্ধ্বে গমন ও নিচে অবতরণের বিষয় রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহর জন্য) যেসব নাম ও গুণাবলি (সিফাত) ঠিক করেছেন, তা অস্বীকার করা বৈধ হবে না; আরও বৈধ হবে না এগুলোকে সৃষ্টিসমূহের গুণাবলির সাথে তুলনা

---

৮. দার'উ তা'আরুদ্বিল আকল ওয়ান্ নাকল (২/২৩২)।

৯. দারউ তা'আরুদিল 'আকল ওয়ান্ নাকল (৭/১৫৪)।

করা; বিশেষ করে সৃষ্টিসমূহের মধ্য থেকে আমরা যাকে দেখতে পাই না, তার সাথে তুলনা করা। কারণ, আমরা সৃষ্টিসমূহের মধ্য থেকে যাকে দেখতে পাই না, তার জন্য যেসব নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত আছে, সৃষ্টিসমূহের মধ্য থেকে যাকে আমরা দেখতে পাই, তার সাথে যখন তা সাদৃশ্যপূর্ণ ও লাগসই নয়, তাহলে তা কীভাবে জগতসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে মানানসই হতে পারে, যিনি যাবতীয় সৃষ্টির পারস্পরিক সদৃশ্যতা বা সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার ধ্যান-ধারণা থেকে বহু দূরে?! প্রত্যেক সৃষ্টিই আরেক সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে; কিন্তু স্রষ্টার কোনো কিছুই তার সৃষ্টির সাথে তুলনা হতে পারে না; তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং যালিমরা যা বলে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।[১০]

৬. অকাট্যভাবে যা বলা অপরিহার্য তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব গুণাবলি দ্বারা তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, সেগুলোতে সৃষ্টির কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁকে সৃষ্টির কোনো কিছুর গুণাবলির সাথে তুলনা করবে, সে ব্যক্তি চরম ভুল করবে; ঐ ব্যক্তির মতো যে বলে, আল্লাহ অবতরণ করার অর্থ: আল্লাহ নড়াচড়া করেন ও প্রস্থান করেন যেমনিভাবে মানুষ বাড়ির ছাদের উপর থেকে নিচে অবতরণ করে। যেমন ঐ ব্যক্তির কথা, যে বলে: আল্লাহ অবতরণ করার অর্থ 'আরশ তাঁর থেকে খালি বা মুক্ত হয়ে যায়; ফলে তাঁর অবতরণ করার বিষয়টি হবে এক জায়গাকে খালি করে অন্য জায়গাকে ব্যস্ত রাখা। এটা তো বাতিল কথা, মহান রবকে এর থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা ওয়াজিব.........। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সর্বোচ্চ সুমহান, তিনি বলেন: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ "আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন" [সূরা আল-আ'লা: ০১]...। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল কিছুর চেয়ে সর্বোচ্চে, তেমনিভাবে তিনি সবকিছুর চেয়ে বড়; ফলে তিনি যদি বিশ্বজগতের কোনো কিছুর নিচে অবস্থান নেন, তাহলে তাঁর কিছু সৃষ্টির অবস্থান হবে তাঁর উপরে এবং তিনি তখন ٱلْأَعْلَى বা সর্বোচ্চ থাকবেন না; আর এটা তিনি নিজেকে যেভাবে গুণান্বিত করে বর্ণনা করেছেন তার বিপরীত।[১১]

৭. 'আরশ ও অন্যান্য সৃষ্টির ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান করা, সেগুলোর প্রতি তাঁর প্রয়োজন বা অভাব অনুভব করাকে আবশ্যক করে না; কারণ, আসমানের অবস্থান পৃথিবীর অনেক উপরে, অথচ সে তার প্রতি মুখাপেক্ষী নয়; আবার বায়ুর অবস্থানও যমীনের উপরে, অথচ বাতাসও যমীনের মুখাপেক্ষী নয়; অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণের অবস্থানও যমীনের উপরে, অথচ তারাও যমীনের নিকট কোনো কিছুতে মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী সৃষ্টি যখন নিচে অবস্থানকারীর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়াকে অপরিহার্য করে না, তখন সর্বোচ্চে অবস্থানকারী, সকল কিছুর স্রষ্টা, সকল বস্তুর থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন সত্তা আল্লাহ তা'আলা গোটা সৃষ্টিজগতের উপরে থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি তিনি কোনো প্রকারের মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজনের দ্বারস্থ নন

১০. মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (১৭/৩৪৯-৩৫০)।

১১. শারহু হাদীসিন-নুযূল, পৃ. ৪৫৯।

এটা আরও উত্তমভাবে বুঝা যায়।[১২]

৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর আকাশসমূহের উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক; কোনো বিদ্যমান বস্তুর দ্বারা তাঁর সীমাবদ্ধ বা পরিবেষ্টিত হওয়ার বিষয়টি অসম্ভব......। আরও অসম্ভব তাঁর সৃষ্টিসমূহের কোনো কিছুর প্রতি তাঁর মুখাপেক্ষিতা; 'আরশের প্রতিও নয় এবং তা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতিও নয়; বরং তিনি তাঁর কুদরত তথা শক্তিমত্তা দ্বারা 'আরশ ও তার বহনকারীগণের ধারক-বাহক। কারণ, সৃষ্টিজগৎ থেকে পৃথক সত্তা, সেগুলোর উপরে অবস্থানকারীর জন্য এটা অসম্ভব যে, তিনি সৃষ্টিসমূহের কোনো কিছুর অভ্যন্তরভাগে অবস্থান করবেন।[১৩]

৯. 'আরশকে যখন দিক, স্থান কিংবা জুড়ে থাকা জায়গা নামকরণ করা হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাই কিন্তু তার রব ও স্রষ্টা; আর 'আরশ আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী, যেমনিভাবে সৃষ্টি তার স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ সকল দিক থেকেই 'আরশ থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন।[১৪]

১০. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাব্যস্ত করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'আরশের উপরে আছেন; আর 'আরশের বাহকগণ তাদের অন্যদের চেয়ে আল্লাহর খুব নিকটবর্তী; আর উপরের আসমানে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ দ্বিতীয় আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণের চেয়ে আল্লাহর বেশি কাছাকাছি[১৫], আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আকাশের দিকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাঁর ঊর্ধ্বে গমনের মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁর প্রভুর খুব নিকটবর্তী হতে থাকেন; আর তাঁর ঊর্ধ্বে গমনের বিষয়টি ছিল আল্লাহর দিকে, নিছক তাঁর সৃষ্টিকুলের কোনো এক সৃষ্টির দিকে নয়। অনুরূপভাবে সালাত আদায়কারীর রূহ আল্লাহর নিকটবর্তী হয় সাজদার মধ্যে, যদিও তার শরীর নিচে পড়ে থাকে। কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য এর ওপরই প্রমাণবহ।[১৬]

১১. কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যগুলোর সব ক'টিই এটি প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপর, ঊর্ধ্বে এবং তিনি 'আরশের উপরে উঠেছেন।

---

১২. দারউ তা'আরুদিল 'আকল ওয়ান্ নাকল (৬/৩১৩)।

১৩. দারউ তা'আরুদিল 'আকল ওয়ান্ নাকল (৭/১৫-১৬)।

১৪. দারউ তা'আরুদিল 'আকল ওয়ান্ নাকল (৭/১৭)।

১৫. ইমাম আবু সা'ঈদ আদ-দারেমী রাহিমাহুল্লাহ 'আন-নাকদু' নামক গ্রন্থে (পৃ. ২৯০-২৯১) বলেন, "এমন প্রত্যেক কিছু যা আকাশের খুব কাছাকাছি, তা আল্লাহ তা'আলারও খুব কাছাকাছি; আর আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি তাঁর নৈকট্যের বিষয়টি একই রকম, চাই তাদের অবস্থান নিকটে হউক অথবা দূর সীমানায় হউক; তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুই তাঁর থেকে দূরে নয়; যদিও কিছু সৃষ্টি অপর কিছু সৃষ্টি থেকে তাঁর খুব কাছাকাছি ..... আর অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণ কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টিও; 'আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ বাকি সকল ফেরেশতার চেয়ে তাঁর খুব কাছাকাছি, যাদের অবস্থান আকাশসমূহের মধ্যে বিভিন্ন আকাশে। আর সাত আকাশের চেয়ে 'আরশ তাঁর খুব কাছাকাছি; আর এসবের প্রতি আল্লাহর নৈকট্যের বিষয়টি একই রকম। আর এটাই যৌক্তিক বক্তব্য বা ধারণা। তবে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে না যে, 'আরশের উপরে 'ইলাহ' রয়েছেন, সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন।

১৬. মাজমূ'উ আল-ফাতাওয়া (৬/৭)।

আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর উঠেছেন' এ গুণে গুণান্বিত করা হলে, কোনো ভ্রান্ত ধারণাকারী ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, তাঁর উপরে উঠার বিষয়টি মানুষ কর্তৃক নৌযানে ও গৃহপালিত জন্তুর পিঠে উঠার মতোই; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ ۝١٢ لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ﴾ "যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ করে থাক; যাতে তোমরা এর পিঠে চড়তে পার..." [সূরা আয-যুখরুফ: ১২–১৩]। তারপর সে (ভ্রান্ত চিন্তাবিদ) চিন্তা করে যে, তিনি (আল্লাহ) যখন 'আরশের উপর উঠেন, তখন তিনি তার মুখাপেক্ষী হয়ে যান, যেমনিভাবে নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু উপর আরোহণকারী ব্যক্তি এসব বাহনের মুখাপেক্ষী হয়; ফলে যদি নৌযান ছিদ্র হয় বা ফেটে যায়, তাহলে তাতে আরোহণকারী ব্যক্তি নিচে পড়ে যাবে; আবার বাহন হিসেবে গ্রহণ করা প্রাণিটি যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তাহলে তাতে আরোহণকারী ব্যক্তি ছিটকে পড়ে যাবে। সুতরাং এর ওপর কিয়াস করে বলা হয়: যদি 'আরশ না থাকে, তাহলে মহান রব আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিচে পড়ে যাবেন (না'উযু বিল্লাহ) ...

বস্তুত এ ভুল বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে 'আরশের উপর আল্লাহর আরোহণ করার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে তার ভুলের কারণে; কেননা সে ধারণা করেছে যে, এটা 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি মানুষ কর্তৃক নৌযানে ও গৃহপালিত জন্তুর পিঠে উঠার মতোই।

অথচ এই (إِسْتِوَاءٌ বা উপরে উঠা) শব্দটির মধ্যে এমন কিছু নেই, যা এই রকম অর্থ নির্দেশ করে; কারণ আল্লাহ তাঁর মহান সত্তার দিকে إِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) শব্দটিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যেমনিভাবে তিনি তাঁর সকল কর্মকাণ্ড ও গুণাবলিকে স্বীয় সত্তার প্রতি সম্পর্কযুক্ত করেছেন....। তিনি উন্মুক্তভাবে শুধু إِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) শব্দটিকে উল্লেখ করেননি, যা সৃষ্টির জন্য উপযোগী হতে পারে; আবার তিনি এটাকে এমন ব্যাপকভাবেও উল্লেখ করেননি যা সৃষ্টিকুলকে অন্তর্ভুক্ত করবে; (যেমনটি তিনি অন্যান্য সকল গুণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উন্মুক্ত কিংবা ব্যাপক নীতি অবলম্বন করেননি) বরং তিনি إِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) শব্দটিকে তাঁর মহান সত্তার দিকে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং (ধরে নেয়া অসম্ভব বস্তু হওয়ার পরও) যদি মেনে নেয়া হয় যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির মতো (আল্লাহ এর থেকে মহান ও পবিত্র), তাহলে তাঁর إِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) এর বিষয়টি সৃষ্টির إِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) এর মতো হতে পারত; কিন্তু বাস্তবে যেহেতু তিনি তাঁর সৃষ্টির সদৃশ নন; বরং দৃঢ়ভাবে জানা গেল যে, তিনি সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তিনি 'আরশ ও অন্য সবকিছুর স্রষ্টা; আর তিনি ভিন্ন বাকি সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী; আর তিনি যাবতীয় কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; তাই বুঝা গেল যে, তিনি বিশেষ إِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) এর কথা বলেছেন, যা একান্তভাবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত; তিনি তার এ إِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) গুণটিকে এমনভাবে বর্ণনা করেননি যা অন্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে, আর তা (অন্যের)

জন্য উপযোগীও নয়; যেমনিভাবে তিনি তাঁর জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, তাঁর দেখা, শ্রবণ করা এবং তাঁর সৃষ্টি করার ব্যাপারে শুধু তাই উল্লেখ করেছেন যা তাঁর সাথে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট; সুতরাং কীভাবে এ ধারণা করা জায়েয হবে যে, তিনি যখন 'আরশের উপর উঠেছেন তখন তিনি 'আরশের মুখাপেক্ষী হয়ে যান, (কীভাবে এ ধারণা করা জায়েয হবে যে,) যদি 'আরশ পড়ে যায়, তাহলে তিনি তার উপর থেকে পড়ে যাবেন (নাউযুবিল্লাহ)! তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং যালিম ও অবিশ্বাসীগণ যা বলে, তিনি তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

ঐ ব্যক্তি নিরেট মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়, যে ব্যক্তি এ জাতীয় বুঝ বুঝেছে ও ধারণা করেছে অথবা সে মনে করতে পারে যে, তার এ ধারণা করা বুঝটি শব্দের বাহ্যিকরূপ ও অর্থ অথবা জগতসমূহের প্রতিপালকের ব্যাপারে এ রকম ধারণা করাটাকে জায়েয মনে করে, যিনি সৃষ্টিকুল থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। বরং যদি ধরে নেয়া হয় যে, যদি কোনো জাহিল ব্যক্তি এরকম উপলব্ধি ও চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে তাকে স্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে যে, এরকম চিন্তা করাটা বৈধ নয়; তাকে আরও বলে দিতে হবে যে, আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত اِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) শব্দটি এরকম কিছু বুঝায় না; যেমনিভাবে মহান রব কর্তৃক তাঁর নিজকে যা দ্বারা বিশেষিত ও গুণান্বিত করেছেন সেসব গুণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কিছু বুঝায় না।(১৭)

১২. নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে, যার এক অংশ আরেক অংশের উপর কিন্তু তিনি তার উপরের সৃষ্টিকে নিচের সৃষ্টির মুখাপেক্ষী করেননি; যেমন, বায়ু যমীনের উপরে, অথচ সে যমীন কর্তৃক তাকে বহন করার মুখাপেক্ষী নয়; আবার মেঘমালাও যমীনের উপরে, অথচ সেও মুখাপেক্ষী নয় যমীন কর্তৃক তাকে বহন করার; আবার আকাশসমূহও যমীনের উপরে, অথচ আকাশগুলোও যমীন কর্তৃক তাদেরকে বহন করার মুখাপেক্ষী নয়।

অতএব, সকল কিছুর সুমহান প্রতিপালক ও মালিক যখন তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে, তখন কীভাবে আবশ্যক হবে তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি, অথবা তাঁর 'আরশের প্রতি তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়ার বিষয়টি?! অথবা কীভাবে সৃষ্টির উপরে তাঁর থাকা এ মুখাপেক্ষিতা আবশ্যক করবে? অথচ তা সৃষ্টিকুলের মধ্যে আবশ্যক নয়!

আর এটা জানা কথা যে, যখন কোনো সৃষ্টির জন্য অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষিহীনতা প্রমাণিত, তখন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হওয়ার বিষয়টি আরও বেশি সত্য ও উত্তমরূপে প্রমাণিত।(১৮)

১৩. আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন" [সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪], অর্থাৎ তিনি 'আরশের উপরে হওয়ার বিষয়টি এটা দাবি করে না যে, তাঁর اِسْتِوَاءٌ তথা উপরে উঠার বিষয়টি সৃষ্টির اِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) এর মতো হতে হবে।(১৯)

---

১৭. মাজমূ'উ আল-ফাতাওয়া (৩/৪৯-৫১)।

১৮. আর-রিসালাহ আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৮৪-৮৫।

১৯. মাজমূ'উ আল-ফাতাওয়া (৩/৪৬)।

১৪. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর إِسْتِوَاءُ (আরোহণ) এর বিষয়টি বাস্তব এবং বান্দা কর্তৃক নৌযানের উপর إِسْتِوَاءُ (আরোহণ) এর বিষয়টিও বাস্তব; কিন্তু সৃষ্টিকর্তার إِسْتِوَاءُ (আরোহণ)টি সৃষ্টিকুলের إِسْتِوَاءُ (আরোহণ) এর মতো নয়; কারণ, আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করেন না এবং তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন; বরং তিনি সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। বরং আল্লাহ তা'আলা 'আরশ ও তার বহনকারী ফেরেশতাগণকে তাঁর কুদরতের মাধ্যমে বহন বা ধারণ করেন এবং তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, ইমামগণের বক্তব্য, 'আল্লাহ তা'আলা বাস্তবেই তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন' এটা দাবি করে যে, তাঁর إِسْتِوَاءُ (উপরে উঠার বিষয়)টি হবে বান্দা কর্তৃক নৌযান ও গবাদি পশুর পিঠের উপর إِسْتِوَاءُ (উপরে উঠার) মতো, তাহলে সেই ব্যক্তির নিকট অবশ্যই তাদের অপর বক্তব্য: আল্লাহ তা'আলার রয়েছে বাস্তব জ্ঞান, বাস্তব শ্রবণ ও দৃষ্টি এবং বাস্তব কথাবার্তা; এগুলোরও অর্থ হওয়া দাবি করবে যে, তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ, দেখা ও কথাবার্তা হবে সৃষ্টিকুলের জ্ঞান, শ্রবণ, দেখা ও কথাবার্তার মতো। (নাউযুবিল্লাহ)[২০]

১৫. যে ব্যক্তি বলে: আল্লাহর 'ইলম (জ্ঞান) আমার 'ইলমের মতো অথবা তাঁর শক্তি আমার শক্তির মতো অথবা তাঁর কথাবার্তা আমার কথাবার্তার মতো অথবা তাঁর ইচ্ছা, ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি আমার ইচ্ছা, ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মতো অথবা 'আরশের উপর তাঁর আরোহণ করাটা আমার (কোনো কিছুতে) আরোহণ করার মতো অথবা তাঁর অবতরণ করাটা আমার অবতরণ করার মতো অথবা তাঁর আগমন করা আমার আগমনের মতো ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এভাবে সে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করল। (আল্লাহ তা'আলা তাদের এ জাতীয় কথাবার্তা থেকে পবিত্র ও মহান) যে ব্যক্তি এমন কথা বলল, সে পথভ্রষ্ট, খবীস, মিথ্যুক ও বাজে লোক, শুধু তাই নয়, বরং সে কাফির।

আবার যে ব্যক্তি বলে: আল্লাহর কোনো 'ইলম (জ্ঞান), শক্তি, কথাবার্তা, ইচ্ছা, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নেই; নেই তাঁর কোনো ভালোবাসা, সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, আরোহণ করা, আগমন ও অবতরণ করার মতো কোনো বিষয়, তাহলে সে আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ এবং মহান গুণাবলিকে অবজ্ঞা করল; আর আল্লাহর নাম ও নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করল। আর এ জাতীয় ব্যক্তিও পথভ্রষ্ট, খবীস, মিথ্যুক ও বাজে লোক এবং কাফির।[২১]

১৬. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর আসমানসমূহের উপরে অবস্থিত তাঁর 'আরশের উপরে আছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক; তাঁর সত্তা থেকে তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে কোনো কিছুই নেই এবং তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্য থেকে কোনো কিছুই তাঁর সত্তার মধ্যে নেই। আর তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র মহান; তিনি 'আরশ ও গোটা সৃষ্টিজগৎ থেকে

---

২০. মাজমূ'উ আল-ফাতাওয়া (৫/১৯৯)।

২১. মাজমূ'উ আল-ফাতাওয়া (১১/৪৮২)।

অমুখাপেক্ষী ও প্রয়োজন মুক্ত; তিনি তাঁর সৃষ্টিরাজির নিকট থেকে কোনো কিছুর প্রয়োজন অনুভব করেন না; বরং তিনি স্বীয় কুদরত বা ক্ষমতা বলে 'আরশ ও 'আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের ধারক ও বাহক।

আর আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতকে কতগুলো স্তরে সৃষ্টি করেছেন; তিনি তার উপরের স্তরকে নিচের স্তরের প্রতি মুখাপেক্ষী করেননি; সুতরাং আকাশ মুখাপেক্ষী নয় বাতাসের প্রতি এবং বাতাস মুখাপেক্ষী নয় যমীনের প্রতি। আর সর্বোচ্চ সুমহান হলেন আসমানসমূহ, যমীন ও উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছুর প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা; যিনি নিজেকে বর্ণনা করেছেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে, তিনি বলেন:

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]

"তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি, অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৭]

তিনি বহন করা অথবা বহন ছাড়া অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে অনেক মহান, বড় ও অমুখাপেক্ষী ও সর্বোচ্চ সুমহান সত্তা; বরং তিনি হলেন এক-অদ্বিতীয়, 'আস-সামাদ' (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী), যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি; আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই; যিনি ছাড়া বাকি যত কিছু আছে, সকলেই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী; আর তিনি ছাড়া বাকি যত কিছু আছে, সকলের কাছ থেকেই তিনি প্রয়োজন মুক্ত।[২২]

১৭. নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর এমনভাবে আছেন, যেভাবে থাকা তাঁর সম্মান ও মহত্ত্বের সাথে মানানসই। আর আমি বলি না যে, তাঁর (আল্লাহর) উপরের থাকার অবস্থা সেরকম, যেরূপ সৃষ্টির উপরে সৃষ্টির অবস্থান হয়ে থাকে, যেমনটি সাদৃশ্যবাদীরা বলে থাকে; আবার এ কথাও বলা যাবে না যে, আকাশসমূহের উপরে কোনো 'রব' নেই এবং 'আরশের উপরে কোনো 'রব' নেই, যেমনটি নাস্তিক জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে থাকে। বরং একথা বলা হবে যে, তিনি (আল্লাহ) তাঁর আকাশসমূহের উপরে অবস্থিত তাঁর 'আরশের উপরে আছেন, তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।[২৩]

১৮. আল্লাহ তা'আলা যা হারাম ঘোষণা করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলা, যা সে জানে না; যেমন, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে খুব জোরালোভাবে কোনো হাদীস বর্ণনা করে, অথচ সে তার (বক্তব্যের) বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানে না, অথবা সে আল্লাহ তা'আলাকে এমন কতগুলো গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত করে, যেগুলোর সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ

---

২২. মাজমূ' ফাতাওয়া (১/৩৬৭)।

২৩. মাজমূ'উ ফাতাওয়া (৩/২০৭-২০৮)।

থেকে কোনো কিতাব নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বর্ণিত কোনো হাদীসও নেই; চাই সে গুণাবলির বর্ণনাটি নেতিবাচক ও অর্থশূন্য জ্ঞাপকই হোক না কেন, যেমন জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বক্তব্য: আল্লাহ 'আরশের উপরেও নেই, আবার আকাশসমূহের উপরেও নেই; তাঁকে আখেরাতে দেখা যাবে না; তিনি কথা বলেন না, ভালোবাসেন না এবং এ জাতীয় আরও অনেক কথা, যার দ্বারা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করে অথবা সেই গুণাবলির বর্ণনাটি ইতিবাচক ও উপমা জাতীয় হোক, যেমন কেউ বলে: তিনি যমীনে হাঁটাহাঁটি করেন অথবা তিনি সৃষ্টির সাথে বসেন অথবা তারা নিজ চোখে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে অথবা আকাশসমূহ তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করে ও পরিবেষ্টন করে নেয় অথবা তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে আছেন, এগুলো ছাড়াও আল্লাহর ওপর অনুরূপ আরও বিভিন্ন প্রকার মিথ্যাচার।[২৪]

১৯. 'মাকান' (স্থান) বলতে বুঝানো হয় এমন কিছু, যাকে কোনো কিছু বেষ্টন করে রাখে; আল্লাহকে কোনো সৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না অথবা 'মাকান' বলতে এমন কিছু উদ্দেশ্য, যার প্রতি অবস্থান করা ব্যক্তি মুখাপেক্ষী হয়; আল্লাহ কোনো বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। আবার কখনও কখনো 'মাকান' (স্থান) বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার উপরে কিছু থাকে; আর আল্লাহ হলেন তাঁর 'আরশের উপরে, যা তাঁর আসমানসমূহের উপরে অবস্থিত।[২৫]

২০. যখন মুমিন ব্যক্তিকে বিকৃতি ও অর্থশূন্যতা, অথবা উপমা দেয়া থেকে দূরে রাখা হবে, তখন সে সঠিক পথে চলতে সমর্থ হয়। কারণ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা জানা গেছে, যা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাও জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা **"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়"** না তাঁর সত্তায়; না তাঁর গুণাবলিতে; না তাঁর কর্মকাণ্ডে। সুতরাং সৃষ্টিসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে কোনো কিছুর সাথে তাঁকে বিশেষিত করা জায়েয হবে না; কারণ তিনি পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত রূপ দ্বারা বিশেষিত, যাবতীয় ত্রুটি বা অপূর্ণতা থেকে তিনি পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল প্রকারের অভাব ও প্রয়োজন থেকে মুক্ত; তিনি ব্যতীত যাবতীয় কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি বলল: কুরআনে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুর তুলনা করার সমর্থন সম্পৃক্ত কথা রয়েছে, সে কুরআনের ওপর মিথ্যারোপ করল; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণীর মধ্যে এমন কিছু নেই যা এ জাতীয় কিছুর দ্বারা তাঁকে বিশেষিত করাকে সমর্থন করে; বরং কখনও কখনও মানুষ তার খারাপ বুঝের কারণে এ জাতীয় কথাবার্তা বলে; ফলে কখনও কখনও সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে এমনসব অর্থ বুঝে নিয়েছে, যা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে পবিত্র করা ফরয। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে মিথ্যারোপকারীর অবস্থা হলো এমন, যেমন বলা হয়ে থাকে:

---

২৪. মাজমূ'উ ফাতাওয়া (৩/৪২৫)।

২৫. আল-ইস্তিকামাহ (১/১২৭)।

কত ব্যক্তিকেই দেখা যায় যে সে বিশুদ্ধ কথার দোষ ধরছে,
অথচ তার বিপদটি এসেছে দুর্বল বা বিকৃত বুঝের কারণে।[২৬]

২১. মহান 'রব' সার্বিকভাবে তিনি ভিন্ন যাবতীয় সৃষ্টির নিকট কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী হওয়ার মতো দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যে ব্যক্তি মনে করে: তিনি 'আরশের প্রতি অথবা 'আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের প্রতি মুখাপেক্ষী, তাহলে সে হলো জাহিল পথভ্রষ্ট। বরং তিনি হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ; আর তিনি ছাড়া বাকি যত কিছু আছে, সকল কিছু সবদিক থেকে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর তিনি হলেন এমন সত্তা, যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; আর তিনি সকল কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে মুক্ত; আর তিনি ছাড়া বাকি সকল কিছু চরম অভাবী হিসেবে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে: ﴿يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ﴿٢٩﴾﴾ "আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে, সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।" [সূরা আর-রাহমান: ২৯][২৭]

২২. নিশ্চয় রূহ যদি তা এমন জিনিস হয় যা মানুষের মাঝে অবস্থিত থাকে, জীবিত থাকে, উপলব্ধি করে, ক্ষমতা রাখে, শ্রবণ করে, দেখতে পায়, ঊর্ধ্বে গমন করে, অবতরণ করে, যায়, আসে এবং এ জাতীয় আরও বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি নিয়ে অবস্থান করে, অথচ তখন তার ধরন-প্রকৃতি ও সীমা-পরিসীমা নির্ণয়ে বিবেক-বুদ্ধি সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে আটকে যায়; কারণ তারা কখনও তার কোনো নজীর বা নমুনা দেখতে পায়নি। কেননা বস্তুর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়- হয় তা সরাসরি দেখার মাধ্যমে অথবা তার নমুনা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে। সুতরাং যখন রূহটি সৃষ্টিকুলের মধ্যে তার কোনো দৃশ্যমান নমুনা ছাড়াই এসব গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত হতে পারে, তখন সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) তো আরও উত্তমভাবেই তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর মর্যাদার সাথে মানানসই উপযুক্ত নাম ও গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত হতে পারেন; আর বুদ্ধিজীবী সমাজ যেখানে রূহের ধরন-প্রকৃতি ও সীমা-পরিসীমা নির্ণয়ে ব্যর্থ, সেখানে তারা আরও চরমভাবে ব্যর্থ হবে তাঁর (সৃষ্টিকর্তার) ধরন-প্রকৃতি অথবা সীমা-পরিসীমা নির্ণয় করতে।

সুতরাং যে ব্যক্তি রূহের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যকে না বলবে, সে রূহ অস্বীকারকারী নাস্তিক বলে গণ্য হবে; আর যে ব্যক্তি রূহকে দৃশ্যমান কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা করবে সে অজ্ঞ ও উপমা পেশকারী হিসেবে বিবেচিত হবে, অথচ বাস্তবে রূহের অস্তিত্ব সত্যিকার অর্থেই সেটার যাবতীয় গুণাবলিসহ প্রমাণিত, তাহলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণাবলিকে না বলা ব্যক্তি তো আরও উত্তমভাবেই অস্বীকারকারী নাস্তিক বলে গণ্য হবে; আর যে ব্যক্তি অজ্ঞের মতো তাঁকে তাঁর সৃষ্টির সাথে কিয়াস করে তুলনা করবে, সেও নাস্তিক বলে গণ্য হবে; অথচ আল্লাহ তা'আলা তিনি পবিত্র, প্রকৃত অর্থে তাঁর অস্তিত্ব তাঁর সকল নাম ও গুণসহ সত্যিকার অর্থেই প্রমাণিত।[২৮]

---

২৬. মাজমূ'উ আল-ফাতাওয়া (৬/৩৯৯-৪০০)।

২৭. মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪২৮)।

২৮. আর-রিসালাহ আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৫৬-৫৭।

২৩. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ('আরশের উপর) আরোহণকে এমন বৈশিষ্ট্যে ও গুণাগুণে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা জায়েয হবে না, যেসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য সাব্যস্ত হয়, যা সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) জন্য নয়।[২৯]

২৪. নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টিকুল কর্তৃক তাঁকে পরিবেষ্টন করা থেকে অথবা সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে 'আরশ ও অন্য যেকোনো সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে পবিত্র। আর জাহিলদের মধ্য থেকে যে ধারণা করে যে, তিনি (আল্লাহ) যখন দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, তখন 'আরশ তাঁর উপরে থাকে এবং তিনি তখন বিশ্বজগতের দুই স্তরের মাঝখানে পরিবেষ্টিত হয়ে যান, তাহলে তার কথাটি সালাফে সালেহীনের 'ইজমা' এর খিলাফ হওয়ার সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী বলে গণ্য হবে।

২৫. যখন নূরের তৈরি ফেরেশতাগণ খান না ও পান করেন না, বরং তারা পানাহারের মুখাপেক্ষী নন, মানুষের মতো তাদের পেট নেই; তারা কথা বলেন, শ্রবণ করেন, দেখেন, ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং নিচে অবতরণ করেন, যেমনটি সাব্যস্ত আছে (কুরআন-সুন্নাহর) বিশুদ্ধ নস তথা বক্তব্যের দ্বারা; অথচ তাদের এ অবস্থা সত্ত্বেও তাদের এসব গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডকে মানুষের গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করা হয় না; সুতরাং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের সাথে তাঁর ভিন্নতা ও বৈপরীত্যের বিষয়টি ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যকার ভিন্নতা ও বৈপরীত্যের চেয়ে অনকে গুণ বেশি; অথচ তারা (ফেরেশতা ও মানুষ) উভয়ে মাখলুক (সৃষ্টি); আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে সৃষ্টির সদৃশের চেয়ে মাখলুকের সাথে মাখলুকের সাদৃশ্যতার বিষয়টি অনেক বেশি কাছাকাছি হওয়ার কথা। (তারপরও তাদের মধ্যে সেটার তুলনা চলে না, তাহলে সৃষ্টার সাথে সৃষ্টির কোনো সাদৃশ্যতা কীভাবে আসতে পারে?)

অনুরূপভাবে আদম সন্তানের রূহও শ্রবণ করে, দেখে, কথা বলে, নিচে অবতরণ করে এবং ঊর্ধ্বে গমন করে, যেমনিভাবে এ বিষয়টিও সাব্যস্ত আছে বিশুদ্ধ নস ও সুস্পষ্ট যুক্তির দ্বারা; আর এটা সত্ত্বেও তার (রূহের) গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডসমূহ শরীরের গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডসমূহের মতো নয়।

সুতরাং যখন এ কথা বলা জায়েয হবে না যে, রূহের গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডসমূহ দেহের গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডসমূহের মতোই, যে দেহ ও রূহের সমন্বয়ে মূলত মানুষের অস্তিত্ব; আবার মানুষের রূহ যখন তার নিজ দেহের সদৃশ নয়, তখন মহান 'রব' আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এবং তাঁর গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডসমূহকে দেহ এবং তার গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডসমূহের সাথে সদৃশ মনে করাটা কীভাবে জায়েয হবে?!![৩০]

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন" [সূরা আল-ফুরকান: ৫৯] থেকে এমন বুঝ গ্রহণ করল, যা সৃষ্টির

২৯. মাজমূ' ফাতাওয়া (৩৩/১৮৫)।

৩০. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৫৪)।

সাথে খাস (নির্দিষ্ট), যেমনটি সে অনুধাবন করে আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ﴾ "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে উঠবেন" [সূরা আল-মুমিনূন: ২৮] থেকে, তাহলে তো সে ব্যক্তি তার এ বুঝটি গ্রহণ করেছে তার মন্দ উপলব্ধি ও বুদ্ধির দৈন্যতা থেকে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বর্ণনার সীমাবদ্ধতা থেকে নয়; কারণ শব্দের বাহ্যিকতা প্রমাণ করে اِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) শব্দটি মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমনিভাবে দ্বিতীয় আয়াতে اِسْتِوَاءٌ (উপরে উঠা) শব্দটি বান্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর যখন ('আরশে) আরোহণকারী আল্লাহ (নৌযানে) আরোহণকারী বান্দার সদৃশ নন, তখন আল্লাহর اِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) বান্দার اِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) এর সাথে আদৌ সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।

যখন বান্দা যার উপর আরোহণ করবে, তার অভাববোধ করবে, সে তার উপর বহনকৃত হওয়ার মুখাপেক্ষী; আর মহান 'রব' আল্লাহ তা'আলা তিনি ব্যতীত বাকি সকল কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; আর 'আরশ ও অন্যান্য সকল কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী; আর তিনি ঐ মহান সত্তা, যিনি 'আরশ ও 'আরশের বাহকগণকে বহন করেন; মুখাপেক্ষী বান্দা যেটার উপর আরোহন করছে সেটার প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া আবশ্যক করে না যে, যিনি সবকিছু থেকে সম্পূর্ণভাবে অমুখাপেক্ষী, বরং সবকিছু তারই মুখাপেক্ষী, সে মহান রব্ব যার উপর আরোহন করবেন তার প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন।

আর মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর মধ্যে বাহ্যিকভাবে এমন কিছু নেই যা থেকে এটা বুঝা যাবে যে, যেভাবে সৃষ্ট জিনিসকে বহন করতে বহনকারী ইত্যাদি লাগে তেমনি আল্লাহর জন্যও তা লাগবে, বরং সে এ ধারণা তার কাছে এসেছে তার মন্দ বুঝ থেকে, শব্দের নির্দেশনা থেকে নয়।

কিন্তু যখন কোনো কল্পনাকারী তার নিজের মধ্যে কল্পনা করে বলে: আল্লাহ তার মতো, তখন সে কল্পনা করবে তাঁর (আল্লাহর) আরোহণ তার আরোহণের মতো। আর যখন সে বুঝতে পারবে যে, কোনো কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয়, না তাঁর আপন সত্তার মধ্যে, না তাঁর গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে, তখন সে জানতে পারবে যে, তাঁর (আল্লাহর) আরোহণ করাটা তার আরোহণের মতো নয়, আবার তাঁর (আল্লাহর) আসা-যাওয়াটা তার আসা-যাওয়ার মতো নয়; যেমনিভাবে সে জানতে পারবে যে, তাঁর (আল্লাহর) 'ইলম, শক্তিমত্তা, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি তার ইলম, শক্তি, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মতো নয়।

সুতরাং মহান 'রব' আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি তাঁর জন্যই সুনির্দিষ্ট; আর মাখলুক (সৃষ্টি) এর গুণাবলি মাখলুকের জন্যই সুনির্দিষ্ট; উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকারের অংশীদারিত্ব নেই এবং এক মাখলুকের গুণাবলির মধ্যেও আরেক মাখলুকের প্রকারের অংশীদারিত্ব নেই।[৩১]

---

৩১. আল-জাওয়াব আস-সহীহ লিমান বাদ্দালা দীন আল-মাসীহ (৪/৪২৬-৪২৮)।

২৭. আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ "দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা: ০৫] আল্লাহ কর্তৃক আরোহণ করাটা মাখলুক (সৃষ্টি) এর আরোহণ করার মতো বলা, অথবা এমন আরোহণের মতো করে ব্যাখ্যা করা, যা নতুন করে সংঘটিত হওয়া অথবা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া দাবি করে। এমনটি কেবল পথভ্রষ্ট মুশাব্বিহা (সাদৃশ্য স্থাপনকারী) ও মুজাসসিমা (দেহবাদী) সম্প্রদায় থেকে বর্ণনা করা হয়, আর এটা কুরআনিক দলীল ও যুক্তিনির্ভর প্রমাণ দ্বারা অকাট্যভাবে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য কথা।

অথবা এমন কথা বলা: আসলে বাস্তবে ('আরশে) আরোহণ করা বলতে এখানে কিছু নেই, 'আরশের উপরে কোনো ইলাহ নেই এবং আসমানসমূহের উপরে কোনো 'রব' নেই; তাহলে এটা হলো পথভ্রষ্ট নাস্তিক জাহমিয়্যাদের অভিমত। আর এ মতটিও দীন ইসলামের আবশ্যকীয়ভাবে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে বাতিল। যারা নবীর ইলমের ধারক ও যে স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্ব দিয়েছেন যে, তার স্রষ্টা তার উপর, যেমনটি তাদের স্বীকৃতি যে, তিনি তাদের রব, তাদের সকলের দৃষ্টিতে জাহমিয়্যাদের কথা বাতিল।

অথবা এমন কথা বলা: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'আরশের উপর এমনভাবে উঠেছেন, যা তাঁর মর্যাদার জন্য উপযুক্ত এবং তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের সাথে মানানসই; আর তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদাভাবে তাঁর আসমানসমূহের উপরে অবস্থিত 'আরশের উপরে আছেন এবং তিনি নিজেই 'আরশ ও 'আরশের বাহক ফেরেশতাগণের ধারক ও বাহক; আর إِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) এর বিষয়টি জ্ঞাত (মা'লুম) এবং তার ধরন-প্রকৃতির বিষয়টি অজ্ঞাত (মাজহুল), তার প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং তা নিয়ে প্রশ্ন করাটা বিদ'আত। বস্তুত এমনটি বলাই হচ্ছে মুসলিমগণের মাযহাব বা অভিমত; আর এটাই নির্ভেজাল স্বভাব-প্রকৃতিতে অবস্থানকারী সকল মুসলিমের নিকট إِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) শব্দের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, যা বিকৃত হয়ে নাস্তিকতার দিকে যায়নি এবং যা মোড় ঘুরিয়ে সাদৃশ্য স্থাপনের দিকেও যায়নি।(৩২)

২৮. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মধ্যে বেশি বেশি নজর দিবে, সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তিনি তার উম্মতের কাছে এটা ঢেলে দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের যে প্রতিপালকের ইবাদত কর, তিনি সকল কিছুর উপরে, 'আরশের উপরে এবং আকাশসমূহের উপরে রয়েছেন; আরও জানতে পারবে যে, সকল সালাফে সালেহীনের এই আকীদা-বিশ্বাসই ছিল, যেমনিভাবে তারা বিশ্বাস করতেন যে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে অবগত আছেন এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সালাফে সালেহীনের কারও নিকট থেকে এমন একটি শব্দও বর্ণিত হয়নি, যা এর বিপরীত কিছু প্রমাণ করে। আবার যুগ যুগ ধরে কোনো দিন তাদের মধ্য থেকে কেউ বলেননি যে, আমাদের 'রব' 'আরশের উপরে নেই, অথবা তিনি 'আরশের উপরে উঠেননি, অথবা তাঁর (আল্লাহর) 'আরশের উপর আরোহণ করার বিষয়টি সৃষ্টির কারো সমুদ্রের উপর আরোহণ করার মতো

৩২. মাজমূ' ফাতাওয়া (৩৩/১৭৭-১৭৯)।

ইত্যাদি জাহমিয়্যাদের যেসব বাজে কথা রয়েছে; অনুরূপ সালাফে সালেহীনের কেউ বলেননি যে, তাঁর (আল্লাহর 'আরশের উপর) আরোহণ করাটাকে মাখলুক (সৃষ্টি) এর আরোহণ করার সাথে তুলনীয়। অনুরূপ তাঁর জন্য এমন কোনো গুণ সাব্যস্ত করেননি, যা নতুন করে সংঘটিত হওয়া অথবা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া দাবি করে।[৩৩]

২৯. "আল্লাহ আসমানে" অথবা "আল্লাহ আসমানে নয়" –এ বিষয়ে অনেকেই বিতর্কে লিপ্ত হয়।

তন্মধ্যে যারা সাব্যস্ত করে তারা বলেন: আল্লাহ আসমানে, যেমনটি এর সমর্থনে (কুরআন-সুন্নাহর) কতগুলো 'নস' (বক্তব্য) এসেছে; আর এগুলো এ অর্থে প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, আসমানসমূহের উপরে অবস্থিত তাঁর 'আরশের উপর আছেন।

আর যারা 'আল্লাহ আসমানে হওয়া' অস্বীকার করে, তারা বলেন: আল্লাহ আসমানের মধ্যে নন, তাদের উদ্দেশ্য হলো: আকাশ তাঁকে ঘিরে রাখে না, সীমাবদ্ধ করে না এবং তাঁকে বহন করে না; তাঁকে উপরে তুলে ধরে না। সন্দেহ নেই, এই অর্থটিও সঠিক; কারণ তাঁকে তাঁর সৃষ্টিকুল সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে পারে না, বরং তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর 'আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থানটা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মতো। অনুরূপভাবে তিনি অন্য কারও প্রতি মুখাপেক্ষী নন; বরং তিনি তাঁর সৃষ্টির দ্বারস্থ হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক, তিনি 'আস-সামাদ' (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)।

সুতরাং উপরোক্ত দু'টি অর্থের মধ্যে কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই; কিন্তু তারা ভুল করেছেন এমন শব্দকে 'না' করার ক্ষেত্রে, যা কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে এসেছে এবং আরও ভুল করেছেন ধারণা ও কল্পনায় প্রবেশ করে যে, তার (শব্দের) উন্মুক্ত ব্যবহার ভ্রান্ত অর্থের দিক-নির্দেশ করে।

আবার কখনও কখনও তাদের কারও কারও এ ওযর রয়েছে যে, যখন তারা দেখেছে কেউ কেউ 'আসমানে আছে' বলে এ শব্দটিকে এমন নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করতে দেখেন যারা এর অর্থ করে থাকেন আসমান তাঁকে বহন করে অথবা তাঁকে ছায়া দেয়; এমতাবস্থায় যারা এ অর্থের ভুল ধরে, তাহলে সে অবশ্যই সঠিক কাজটিই করেছে। তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি (যিনি আসমানে আছেন বলেন) তিনি শব্দের ব্যবহারে সঠিক কাজটি করেছেন কারণ কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যে এভাবে নিঃশর্তভাবে এসেছে, আর সে পূর্বে গত হওয়া অর্থেও সঠিক ছিল; কারণ সেটিই তো কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যে প্রমাণকৃত সত্য অর্থ। তবে তাদের কেউ কেউ দ্বিতীয় শব্দ (আল্লাহ আসমানে নেই) এটা যারা গ্রহণ করে তাদেরকে কাফির পর্যন্ত বলে, এটাতে তারা ভুল করে; যখন সে লোকের উদ্দেশ্য হয় বিশুদ্ধ অর্থ; কারণ যে কেউ বিশুদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নেয় তাকে কোনো শব্দের কারণে কাফের বলা যায় না, যদিও সে অন্যায় করে কিংবা নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেলে।

৩৩. মাজমূ' ফাতাওয়া (৩৩/১৮৩)।

আর যে বা যারা তার কথা 'তিনি আকাশে নেই' এর ব্যাখ্যা করেন এই অর্থে: নিরেট শূন্যতা ছাড়া 'আরশের উপরে আসলে কিছুই নেই[৩৪]; আর আসমানসমূহের উপরেও কিছুই নেই; আর সেখানে উপাসনা করার মতো কোনো ইলাহও নেই; আর সেখানে নেই কোনো 'রব', যাকে ডাকা হবে এবং যার কাছে কিছু চাওয়া হবে; আর সেখানে নেই কোনো সৃষ্টিকর্তা, যিনি সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন; আবার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসলেই মিরাজের রাত্রিতে (ঊর্ধ্বে গমনে) তাঁর প্রতিপালকের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়নি[৩৫], ঐসব (অপব্যাখ্যাকারীরা) হলো পথভ্রষ্ট জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়, যারা নবীগণের ইজমা' এবং বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের স্বভাবজাত-প্রকৃতির বিরোধী।[৩৬]

৩০. যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের ভিতরে আছেন, সৃষ্টিসমূহ তাঁকে বেষ্টন করে আছে, আকাশসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, সৃষ্টিসমূহের কিছু অংশ তাঁর উপরে এবং কিছু অংশ তাঁর নিচে, সেই ব্যক্তি বিদ'আতকারী পথভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন কিছুর মুখাপেক্ষী, যা তাঁকে বহন করবে- 'আরশ বা অন্য কিছু, তাহলে সেই ব্যক্তিও বিদ'আতকারী পথভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হবে। আর অনুরূপভাবে যদি সে আল্লাহর গুণাবলিকে সৃষ্টিসমূহের গুণাবলির মতো মনে করে এবং বলে, আল্লাহ কর্তৃক ('আরশে) আরোহণ করার বিষয়টি সৃষ্টি কর্তৃক (কোনো কিছুতে) আরোহণ করার মতো অথবা তাঁর অবতরণের বিষয়টি সৃষ্টির অবতরণের মতো ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে সেও বিদ'আতকারী পথভ্রষ্ট। কারণ, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসহ কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, কোনো কিছুতেই সৃষ্টিকুল আল্লাহ তা'আলার সদৃশ হতে পারে না এবং আরও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; আবার এটাও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিসমূহের (সীমানা) থেকে আলাদা হয়ে ভিন্নভাবে তার উপরে অবস্থান করেন।

আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুল থেকে ভিন্ন আলাদা; তিনি তাঁর আকাশসমূহের উপরে অবস্থিত তাঁর 'আরশের উপরে অবস্থান করেন তাঁর সৃষ্টিজগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে; তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁর সত্তা থেকে কোনো কিছুই নেই; আবার তাঁর সত্তার মধ্যেও তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কোনো কিছুই নেই। আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশসহ বাকি যত কিছু আছে, সবকিছুর প্রয়োজন থেকে মুক্ত; তিনি সৃষ্টিকুলের কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন; বরং তিনি তাঁর 'আরশের উপর আরোহণ করার সাথে সাথে তাঁর কুদরতের মাধ্যমে 'আরশ ও 'আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণকে বহন বা ধারণ করেন; আর সৃষ্টির আরোহণের সাথে আল্লাহর আরোহণ করার বিষয়টিকে তুলনা করা যাবে না;

---

৩৪. মাজমূ' ফাতাওয়া (১৯/১৪০-১৪১)।

৩৫. মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৫৯)।

৩৬. মাজমূ' ফাতাওয়া (১৯/১৪০-১৪১)।

বরং আল্লাহ তা'আলার জন্য তাই সাব্যস্ত করা যাবে, নাম ও গুণাবলি থেকে যা তিনি তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর যদি সে সৃষ্টিসমূহের সাথে তাঁর তুলনা করা থেকে দূরে থাকে এবং এই জ্ঞান রাখে যে, কোনো কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয়, না তাঁর আপন সত্তার মধ্যে, না তাঁর গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে, তাহলে সে তার আকীদা-বিশ্বাসে সঠিক বলে বিবেচিত হবে এবং তার আকীদা উম্মতের সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের আকীদার মতো হবে।[৩৭]

৩১. মহান 'রব' আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন, এমনটা সম্ভব হতে পারে না, না 'আরশের প্রতি, না অন্য কিছুর প্রতি; এটাও সম্ভব নয় যে, বিদ্যমান কোনো বস্তু তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে; কারণ তিনি সর্বোপরে প্রকাশ্য। সুতরাং তাঁর উপরে কোনো কিছুই নেই ....।

তাছাড়া তিনি সকল কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে মুক্ত; আর তিনি ব্যতীত যাবতীয় কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা যা দ্বারা নিজেকে বিশেষিত করেছেন, তা কিছুতেই সৃষ্টিকুলের গুণাবলির সদৃশ হতে পারে না, যেমনিভাবে তাঁর সত্তা সৃষ্টিসমূহের সত্তার মতো হয় না। সুতরাং তিনি তাঁর 'আরশের উপর অবস্থান করছেন, যেমনটি তিনি তাঁর নিজ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, অথচ তিনি 'আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।

খাট, নৌযান বা প্রাণীর উপর আরোহণকারী মাখলুক (সৃষ্টি) এর নিচে যা আছে তা যদি চলে যায়, তাহলে তার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকার কারণে সে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তিনি ছাড়া বাকি সকল কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; তিনি তাঁর কুদরতের মাধ্যমে 'আরশ ও 'আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণকে বহন করেন।[৩৮]

৩২. আল্লাহ তা'আলা তিনি ভিন্ন যাবতীয় সকল কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর তিনি ছাড়া বাকি সকল কিছু সামগ্রিক দিক থেকে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী; কারণ তিনি হলেন 'আস-সামাদ' (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী), সকল কিছুর প্রয়োজন থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং বাকি সকল কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।

সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে: তিনি কোনো না কোনোভাবে সৃষ্টির মুখাপেক্ষী সে ব্যক্তি নিরেট মিথ্যাবাদী, মিথ্যারোপকারী, কাফির। সে কীভাবে বলতে পারে যে, তিনি সকল কিছুর মুখাপেক্ষী?! অথচ তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং যালিমরা যা বলে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।[৩৯]

৩৩. প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্য থেকে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা আল্লাহর বাণী,

---

৩৭. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৬২-২৬৩); আরও দেখুন: আর-রিসালাহ আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৬৬-৬৮; আল-জাওয়াব আস-সহীহ লিমান বাদ্দালা দীন আল-মাসীহ (৪/৩১৮-৩১৮); মিনহাজুস্ সুন্নাহ (২/৩২৩-৩২৪)।

৩৮. আল-জাওয়াব আস-সহীহ লিমান বাদ্দালা দীন আল-মাসীহ (৩/৪৯১-৪৯২)।

৩৯. আল-জাওয়াব আস-সহীহ লিমান বাদ্দালা দীন আল-মাসীহ (৪/৩৭৭-৩৭৮)।

তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এবং প্রথম সারির মুসলিম সাহাবী ও তাবে'য়ীগণের বাণী থেকে "আল্লাহর গুণাবলি বিষয়" এ শুধু এমন অর্থই অনুধাবন করে, যা সৃষ্টির সাথে মানায়, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে মানায় না। অতঃপর তারা এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পেলে সেসব বাণীকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে চায়; আর যখন তারা এ বিষয়টি তাবে'য়ীগণের বাণীর মধ্যে পায়, তখন তারা তাঁদের ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের ভ্রান্ত বুঝ ও উপলব্ধি অনুযায়ী তাদের (তাবে'য়ীদের) থেকে তা বর্ণনা করে, অথবা তাদের বক্তব্যের মধ্যে শব্দ বাড়িয়ে দেয় এবং পরিমাণ ও গুণগতভাবে তা পরিবর্তন করে ফেলে, যেমনটি আমরা তাদের মুখ থেকে শুনতে পাই এবং তাদের বই-পুস্তকে দেখতে পাই।[৪০] আর এটা সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করা হলো ঐসব ব্যক্তিবর্গের জন্য, যারা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে; আর প্রকৃত বিষয়টি আমি যা বর্ণনা ও উপস্থাপন করেছি, তার চেয়ে বেশি।[৪১]

৩৪. এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, কোনো কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয়, না তাঁর আপন সত্তার মধ্যে, না তাঁর গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে। আর সৃষ্টিকুলের সাথে তাঁর ভিন্নতা ও তাদের অংশীদারিত্ব থেকে তাঁর পবিত্রতার বিষয়টি অনেক বড় ও মহান বিষয়, ঐ বুঝ ও চিন্তাধারা থেকে, তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানীগণ যতটুকু বুঝতে পেরেছেন এবং বর্ণনাকারীগণ যতটুকু বর্ণনা করতে পেরেছেন। আর এমন প্রত্যেক গুণকে তাঁর থেকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে, যা নতুন করে সংঘটিত হওয়া অথবা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া দাবি করে।[৪২]

৩৫. যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে বা বলে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশ কর্তৃক তাঁকে বহন করার মুখাপেক্ষী, অথবা তিনি কোনো আসমান বেষ্টিত আছেন, যেখানে আসমান তাঁকে ছায়া দিচ্ছে, অথবা তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কোনো কিছুর মধ্যে পরিবেষ্টিত, অথবা তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের কোনো দিক বা পক্ষ দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছেন, তাহলে সেই ব্যক্তি ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

আর যে ব্যক্তি বলে: 'আরশের উপরে কোনো 'রব' নেই এবং আকাশসমূহের উপরে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, বরং সেখানে শুধুই শূন্যতা, তাহলে সেই ব্যক্তি নাস্তিক, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং ঐ ফিরআউনের মত বলে বিবেচিত হবে, যে বলেছিল:

﴿يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَٰبَ ۝٣٦ أَسۡبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبٗا﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧]

"হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই -আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; আর

---

৪০. মাজমূ' ফাতাওয়া (৩৩/১৭০)।

৪১. দারউ তা'আরুদিল 'আকল ওয়ান্ নাকল (৫/২৫৭)।

৪২. মাজমূ' ফাতাওয়া (৩৩/১৭৫)।

নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" [সূরা গাফির: ৩৬-৩৭]

বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও উম্মতের সালাফে সালেহীন এ বিষয়ে একমত যে, তিনি (আল্লাহ) তাঁর আকাশসমূহের উপরে অবস্থিত তাঁর 'আরশের উপরে তাঁর সৃষ্টিজগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; তাঁর সত্তার মধ্যে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কোনো কিছুই নেই, আবার তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যেও তাঁর সত্তা থেকে কোনো কিছুই নেই; আর এ কথার সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহর 'নস' রয়েছে এবং রয়েছে উম্মতের সালাফে সালেহীন ও সুন্নাহর ইমামগণের 'ইজমা'। এমনকি পূর্বের ও পরের সকল মুমিন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও উম্মতের সালাফে সালেহীন এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তি إِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) এর ব্যাখ্যা করবে "আধিকার বা দখল করা" অর্থে, অথবা এমন কোনো অর্থে ব্যাখ্যা করবে যা "আল্লাহ তাঁর আকাশসমূহের উপরে থাকাকে অস্বীকার করে, তাহলে সেই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোক বলে বিবেচিত হবে।(৪৩)

৩৬. মহান 'রব' আল্লাহ তা'আলা সকল দিক থেকে যাবতীয় কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর তিনি ব্যতীত সকল কিছু সর্বদিক থেকে তাঁর মুখাপেক্ষী; আর এটা হলো তাঁর নাম 'আস-সামাদ' এর অর্থ। কারণ, 'আস-সামাদ' হলো এমন এক সত্তা, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় দৈন্যতার কারণে যাঁর মুখাপেক্ষী হয় এবং অপর দিকে যিনি সবকিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী হন না। সুতরাং কীভাবে সৃষ্টিকুল থেকে কোনো কিছু তাঁর অবলম্বন বা নির্ভরতা হতে পারে?(৪৪)

৩৭. আল্লাহ তা'আলা নিজেকে বিশেষিত করে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন; আর তিনি তাঁর কিতাবের সাতটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। আবার তিনি তাঁর কোনো কোনো সৃষ্টিকে إِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন; যেমন তাঁর বাণী: ﴿لِتَسْتَوُۥا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ﴾ "যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার" [সূরা আয-যুখরুফ: ১৩], তাঁর বাণী ﴿فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ﴾ "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে উঠবেন [সূরা আল-মুমিনূন: ২৮] এবং তাঁর বাণী: ﴿وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ﴾ "আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর উঠলো" [সূরা হূদ: ৪৪]। আর আল্লাহর إِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) অন্যদের إِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) এর মতো নয়।(৪৫)

৩৮. আবশ্যকীয় ব্যাপারে হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আপন সত্তার জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে সদৃশ স্থাপন না করা। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে: আল্লাহর কোনো 'ইলম (জ্ঞান) নেই; নেই কোনো শক্তি, দয়া ও কথাবার্তা। তিনি ভালোবাসেন না, সন্তুষ্ট হন না; তিনি আহ্বান করেন না, গোপনে কথা বলেন না, আরোহণ করেন না, তাহলে সেই ব্যক্তি হবে নাস্তিক, অস্বীকারকারী,

---

৪৩. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৬/৪৬৮)।

৪৪. আল-জাওয়াব আস-সহীহ লিমান বাদ্দালা দীন আল-মাসীহ (৪/২৯৮-২৯৯)।

৪৫. আর-রিসালাহ আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ২৯।

আল্লাহকে অস্তিত্বহীন শূন্যতা ও জড়পদার্থের সাথে উপমা দানকারী।

আবার যে ব্যক্তি বলবে: তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞান আমার জ্ঞানের মতো, অথবা তাঁর শক্তি আমার শক্তির মতো, অথবা তাঁর ভালোবাসা আমার ভালোবাসার মতো, অথবা তাঁর সন্তুষ্টি আমার সন্তুষ্টির মতো, অথবা তাঁর দুই হাত আমার দুই হাতের মতো, অথবা তাঁর اِسْتِوَاءُ (আরোহণ) আমার اِسْتِوَاءُ (আরোহণ) এর মতো, তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহকে প্রাণির সাথে তুলনাকারী ও সাদৃশ্যদানকারী বলে গণ্য হবে। বরং জরুরীভাবে আবশ্যক হলো কোনো রকম উপমা ও সাদৃশ্য প্রদান ছাড়াই এ গুণগুলো সাব্যস্ত করা এবং কোনো প্রকারের অর্থহীন করা ছাড়াই তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা।[৪৬]

৩৯. এমন কাউকে আমরা জানি না, যে বলে: তিনি (আল্লাহ) তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী, অথবা তাঁর সৃষ্টিসমূহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী। আবার কেউ এ কথাও বলে না যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের মুখাপেক্ষী, অথচ তিনি হলেন 'আরশের স্রষ্টা; আর সৃষ্টি মুখাপেক্ষী হয় স্রষ্টার, স্রষ্টা মুখাপেক্ষী হয় না সৃষ্টির; আবার তাঁর কুদরতের মাধ্যমেই 'আরশ ও বাকি যাবতীয় সৃষ্টি স্থায়ী হয়েছে; আর তিনি 'আরশের প্রয়োজনীয়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; তিনি ভিন্ন সকল সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী।

আর যখন আল্লাহ 'আরশের উপরে, তখন তাঁর জন্য 'আরশের মুখাপেক্ষী হওয়া আবশ্যক নয়; কারণ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে, যার এক অংশ আরেক অংশের উপর এবং তিনি তার উপরের সৃষ্টিকে নিচের সৃষ্টির মুখাপেক্ষী করেননি। সুতরাং বায়ু যমীনের উপরে, অথচ সে তার মুখাপেক্ষী নয়। অনুরূপভাবে মেঘমালাও তার (যমীনের) উপরে, অথচ সেও তার মুখাপেক্ষী নয়। অনুরূপভাবে আকাশসমূহ মেঘমালা, বাতাস ও যমীনের উপর, অথচ আসমান এগুলোর মুখাপেক্ষী নয়; আর 'আরশ হলো আসমানসমূহ ও যমীনের উপর, অথচ সে এগুলোর মুখাপেক্ষী নয়। অতএব, কীভাবে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা সুমহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী হবেন, অথচ তাঁর অবস্থান হলো সকল সৃষ্টির উপরের উপরে?!

আর আমরা জানি যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা; আর তাঁর অনুগ্রহ বা সাহায্য ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কারও কোনো উপায় ও শক্তি সামর্থ্য নেই। আর যে শক্তি 'আরশ ও 'আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের মধ্যে আছে, তিনি তার স্রষ্টা; বরং আমরা বলব: তিনি 'আরশের বহনকারী ফেরেশতাগণের কর্মকাণ্ডসমূহের স্রষ্টা। সুতরাং তিনি যখন এই সকল কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর অনুগ্রহ বা সাহায্য ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কারও কোনো উপায় ও শক্তি-সামর্থ্য নেই, তখন তাঁর পক্ষে অন্যের দ্বারস্থ ও মুখাপেক্ষী হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

আমরা বলিনি যে, তিনি (আল্লাহ) অন্যের মুখাপেক্ষী; বরং তিনি নিরন্তর 'আরশ ও অন্য সবকিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; কিন্তু আমরা বলি: নিশ্চয় তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। সুতরাং যখন আমরা তাঁকে এর ওপর ক্ষমতাবান

৪৬. আর-রিসালাহ আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৩০।

বলে সাব্যস্ত করব, তখন এটা তাঁর জন্য শক্তি-সামর্থ্যের পরিপূর্ণতা সম্পন্ন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গুণ হয়ে যাবে, অন্যদের প্রতি মুখাপেক্ষিতাসহ নয়।[৪৭]

৪০. মহান রব আল্লাহ তা'আলা এমন পরিপূর্ণ গুণাবলির দ্বারা গুণান্বিত, যার উপরে আর কোনো গুণ হতে পারে না; সকল প্রকারের ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে এবং পরিপূর্ণ গুণাবলির কোনো কিছুর সাথে তাঁর সদৃশ হওয়া থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। তিনি পুরোপুরিই অপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ যাবতীয় গুণাবলি থেকে মুক্ত। আর তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলি, কোনো কিছুই সেগুলোতে তাঁর সদৃশ হয় না; এমনকি সে ক্ষেত্রে কোনো কিছু তাঁর কাছাকাছিও হয় না। আর আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণার বিষয়টি দু' প্রকারের বিষয়কে শামিল করে: অপূর্ণতা বা ত্রুটি না থাকা এবং পরিপূর্ণ গুণাবলির ক্ষেত্রে অন্যকে তাঁর সদৃশ মনে না করা।[৪৮]

৪১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মহাপরিপূর্ণতার অধিকারী। তাঁর পক্ষে যে কোনোভাবেই অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া অসম্ভব; কারণ যদি তিনি কোনো কিছুতে অন্যের দ্বারস্থ হন, তাহলে তো তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী হলেন। অথচ জরুরি বিষয় হলো: হয় তাঁর জন্য পরিপূর্ণতার বিষয়টি সাব্যস্ত করা অথবা যা কিছু তাঁর পরিপূর্ণতাকে খাট বা ত্রুটিযুক্ত করে, তা দূর করা।[৪৯]

৪২. মহান রব আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং তিনি এমন পরিপূর্ণতার গুণের দ্বারা গুণান্বিত, যার মধ্যে কোনো প্রকারের কমতি বা ত্রুটি নেই; আর পরিপূর্ণ গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর গুণাবলির মধ্য থেকে কোনো কিছুকে সৃষ্টিসমূহের কোনো গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং তাঁর গুণাবলির মধ্য থেকে কোনো কিছুতেই তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, না তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্যে, না তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে, না তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্খার মধ্যে, না তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মধ্যে, না তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের মধ্যে, না তাঁর إِسْتِوَاء (আরোহণ) এর মধ্যে, না তাঁর আসা-যাওয়ার মধ্যে, না তাঁর অবতরণের মধ্যে এবং না এগুলো ছাড়া অন্য কোনো গুণের মধ্যে, যার দ্বারা তিনি স্বয়ং নিজেকে বিশেষিত করেছেন অথবা যার দ্বারা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গুণান্বিত করেছেন; বরং সালাফে সালেহীন কোনো রকম বিকৃতি, অর্থশূন্যতা, ধরণ নির্ধারণ ও তুলনা করা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলাকে এমন গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত করেন, যার দ্বারা আল্লাহ স্বয়ং নিজেকে বিশেষিত করেছেন অথবা যার দ্বারা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গুণান্বিত করেছেন। সুতরাং তাঁর গুণাবলি থেকে এমন কোনো গুণকে তাঁর (আল্লাহর) থেকে প্রত্যাখ্যান বা না করেন না, যা তিনি তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁরা তাঁর গুণাবলিকে সৃষ্টিকুলের গুণাবলির সাথে সদৃশ স্থাপন করেন না। অতএব, (এসব গুণাবলি) অস্বীকারকারী মু'আত্তিল বা অর্থশূন্যকারী, নিষ্ক্রীয়কারী; আর যারা অর্থশূন্যকারী ও নিষ্ক্রীয়কারী তারা

৪৭. মিনাহজুস সুন্নাহ (২/৬৪৬-৬৪৭)।

৪৮. মিনহাজুস্ সুন্নাহ (২/১৫৬-১৫৭)।

৪৯. মিনহাজুস্ সুন্নাহ (২/১৬০)।

অস্তিত্বহীনের ইবাদত করে। অপরদিকে সদৃশ স্থাপনকারীরা তো উপমা প্রদানকারী; আর যারা উপমা প্রদানকারী তারা তো মূর্তির পূজা করে।

সালাফে সালেহীনের মতাদর্শ হলো: কোনো প্রকার সদৃশ স্থাপন করা ছাড়াই (গুণাবলি) সাব্যস্ত করা এবং কোনো রকম অর্থহীন করা ছাড়াই তাঁকে পবিত্র বলে জানা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ﴾ "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়" এটা উপমা প্রদানকারীদের দাবির খণ্ডন। তিনি আরও বলেন: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ "আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" এটা নাস্তিকদের জবাব।[৫০]

৪৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি থেকে এমন বুঝ অনুধাবন করে, যা নতুন কিছু সংঘটনকে আবশ্যকীয়ভাবে দাবি করে এবং সৃষ্টিকুলের গুণাবলির সাথে সদৃশ হয়, অতঃপর এটাকে আল্লাহ থেকে অস্বীকার করার চেষ্টা করল, তাহলে সে ব্যক্তি (আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে) তুলনা করল এবং (আল্লাহর গুণকে) অর্থহীন করল; বরং এ ব্যাপারে আবশ্যক হলো, আল্লাহ তা'আলাকে শুধু এমন গুণাবলি দ্বারাই বিশেষিত করা, যা দ্বারা তিনি (আল্লাহ) স্বয়ং নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অথবা যা দ্বারা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশেষিত করেছেন; আমরা কুরআন ও হাদীস অতিক্রম করব না। তাছাড়া আমরা জেনে নিব যে, কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়; না তাঁর আপন সত্তাতে, না তাঁর গুণাবলিতে, না তাঁর কর্মকাণ্ডসমূহে। সৃষ্টিকুলের জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁর (অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের) প্রকৃত ধরণ অনুধাবন করতে সক্ষম নয় এবং তাদের মুখের ভাষা তাঁর গুণাবলি নাগাল পাওয়ার ক্ষমতা রাখে না ﴿سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨١ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٨٢﴾ "তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি! আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।" [সূরা আস-সাফফাত: ১৮০-১৮২][৫১]

৪৪. আল্লাহ তা'আলাকে এমন গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত করা হবে, যা দ্বারা তিনি (আল্লাহ) স্বয়ং নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অথবা যা দ্বারা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশেষিত করেছেন, কুরআন ও হাদীসে আসার সীমা অতিক্রম করা যাবে না এবং এর মধ্যে অতীতের 'ইলম ও ঈমানওয়ালা সালাফে সালেহীনের পথ অনুসরণ করা হবে। আর কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনুধাবন করা অর্থসমূহ কোনো প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার অজুহাতে বাদ দেয়া যাবে না; কারণ এটা করা হলে তা হবে কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করার পর্যায়ভুক্ত। আবার সেসব গুণ বুঝা ও সাব্যস্ত করা থেকে মুখ ফিরিয়েও থাকা যাবে না, তাহলে তা হবে এমন পর্যায়ভুক্ত, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে তার ওপর অন্ধ এবং বধিরের মতো পড়ে থাকে; আর কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ছেড়ে দেয়া যাবে না, তাহলে তা হবে এমন পর্যায়ভুক্ত, যারা শুধু পড়া ব্যতীত আল্লাহর কুরআন

---

৫০. মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৪৩১-৪৩২)।

৫১. মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৩৭৫)।

সম্পর্কে কিছুই জানে না।[৫২]

৪৫. জাহিল-মূর্খ ব্যক্তি কালামশাস্ত্রবিদদের একথা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়: (কালামশাস্ত্রবিদের কথা হচ্ছে) 'আরবগণ اِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) শব্দটিকে গঠন করেছে মানুষ কর্তৃক ঘরের উপর, অথবা নৌযানের উপর উঠা, অথবা জুদী পর্বতের উপর নৌকা স্থির হওয়া এবং এ জাতীয় কোনো কোনো সৃষ্টির আরোহণ বা স্থির হওয়ার অর্থে। (অর্থাৎ স্রষ্টার জন্য নয়, কেবল সৃষ্টির জন্য এটা আরবদের ভাষায় এসেছে।)

বস্তুত তাদের এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়; যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, এই اِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) যখন বাস্তব বা প্রকৃত অর্থে হবে, তখন তা সৃষ্টিকুলের গুণাবলি থেকে কোনো কিছুকে শামিল করবে, অথচ 'নস' তাকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করেছে, তাহলে সেই ব্যক্তি ভাষার অর্থ অনুধাবনে এবং (ভাষার) হাকীকত (প্রকৃত অর্থ) ও মাজায (রূপক অর্থ) বুঝার ক্ষেত্রে গণ্ডমূর্খ বলে বিবেচিত হবে।

মূলত এসব গণ্ডমূর্খরা তাদের বুঝ বা উপলব্ধির সূচনাতেই তারা সৃষ্টিকর্তার গুণাবলিকে সৃষ্টিকুলের গুণাবলির সাথে তুলনা করে; অতঃপর তারা এটাকে অস্বীকার করে ও অর্থশূন্য করে। ফলে তারা এর থেকে শুধু এমন অর্থই অনুধাবন করে, যা সৃষ্টিকুলের জন্য খাস (নির্দিষ্ট) এবং এর প্রকৃত অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে; আর তখন মহান রবের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি থেকে তিনি (আল্লাহ) যার যোগ্য ও উপযুক্ত, তারা তা অস্বীকার করতে থাকে এবং আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করে। আবার তারা বের হয়ে যায় যুক্তিনির্ভর কিয়াস ও শরী'আতসম্মত বক্তব্যের গণ্ডী থেকেও; ফলে তাদের হাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, না কোনো সুস্পষ্ট যুক্তি এবং না কোনো বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণ।[৫৩]

৪৬. আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি একাই ছিলেন, যিনি মহাপবিত্র, যাঁর কোনো শরীক (অংশীদার) নেই; তারপর যখন তিনি সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি জগতকে তাঁর সত্তার মধ্যে সৃষ্টি করেননি যে, তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য স্থান হবেন; আবার তিনি আলাদা সৃষ্টি করে তাঁর সত্তাকে জগতের মধ্যে শামিলও করে দেননি যে, তিনি সৃষ্টিকুলের প্রতি মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল থাকবেন; বরং তাঁর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেই তিনি জগতকে বানিয়েছেন। ফলে তিনি তার উপরে থাকলেন এবং তা হলো উপরের দিক।[৫৪]

৪৭. মহান রব আল্লাহ তা'আলার সত্তা থেকে যা 'না' করা বা দূর করা আবশ্যক, তা হলো: সৃষ্টিকুলের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে কোনো কিছুর দ্বারা তাঁকে বিশেষিত করা, যেমনিভাবে আবশ্যক হলো সৃষ্টিকর্তার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে কোনো কিছুর দ্বারা মাখলুক (সৃষ্টি)কে বিশেষিত না করা অথবা বান্দার জন্য এমন কিছু সাব্যস্ত না করা, যাতে তার সাথে রবের সদৃশ হয়ে যায়।[৫৫]

---

৫২. মাজমূ'উ আল-ফাতাওয়া (১৩/৩০৫)।

৫৩. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২০৮-২০৯)।

৫৪. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৬/৩৫৭)।

৫৫. মিনহাজুস্ সুন্নাহ (২/৫৯৫)।

৪৮. বিদ্যমান অস্তিত্বসম্পন্ন কোনো বস্তু আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সদৃশ নয়; আর সৃষ্টিকুলের গুণাবলির ক্ষেত্রে তাদের সাথে তাঁর ভিন্নতা ও বৈপরীত্বের বিষয়টি অনেক বড় ব্যবধানের, সৃষ্টিকুলের একের সাথে আরেক সৃষ্টির ভিন্নতা ও বৈপরীত্বের চেয়ে। আর তিনি সৃষ্টিসমূহের কোনো কিছুর সদৃশ হওয়া থেকে অথবা তাঁর গুণাবলির ক্ষেত্রে তিনি তার (সৃষ্টির) কাছাকাছি হওয়ার চেয়ে অনেক বড় ও মহান।(৫৬)

৪৯. মানুষের আত্মা যখন তার নিকট সবচেয়ে নিকটতম বস্তু, এমনকি তা তার প্রবৃত্তি কামনা-বাসনার প্রতীক, অথচ সে তার ধরণ সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং তার বাস্তবরূপকে সে জ্ঞান-বুদ্ধির ছকে আয়ত্ত বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তখন সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার ধরণ সম্পর্কে বান্দা আরও উত্তমভাবেই না জানার কথা এবং তার জ্ঞান আল্লাহর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মোটেই উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।(৫৭)

৫০. নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, তারপর তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তাদের মধ্যে প্রবেশ করেননি এবং তাঁর নিজের মধ্যেও তিনি তাদেরকে শামিল করে নেননি। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁর সত্তা থেকে কোনো কিছুই নেই; আবার তাঁর সত্তার মধ্যেও তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কোনো কিছুই নেই।(৫৮)

৫১. যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে: তিনি কীভাবে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন?

তখন তাকে বলা হবে: তিনি কেমন?

তারপর সে যখন বলে: আমি তাঁর ধরণ সম্পর্কে জানি না।

তখন তাকে বলা হবে: তাহলে আমরাও অবতরণের ধরণ-প্রকৃতি সম্পর্কে জানি না; কারণ 'সিফাত' (গুণ) সম্পর্কে জানাটা আবশ্যক করে 'মাউসূফ' (বিশেষিত বস্তু) সম্পর্কে জানা; আর তা (গুণ সম্পর্কে জানা) তো তার (মাউসূফ বা গুণান্বিত সম্পর্কে জানা এর) শাখা ও অনুগামী। সুতরাং তুমি কীভাবে আমার নিকট দাবি কর বা জানতে চাও তাঁর শ্রবণ, দেখা, কথাবার্তা, আরোহণ ও অবতরণের ধরণ-প্রকৃতির জ্ঞান সম্পর্কে, অথচ তুমি তাঁর সত্তার ধরণ সম্পর্কেই কিছু জান না?!(৫৯)

৫২. আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَٱسۡتَوَتۡ عَلَى ٱلۡجُودِيِّ﴾ "আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হলো"]সূরা হূদ: ৪৪]; তিনি আরও বলেন: ﴿فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ﴾ "তারপর কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে" [সূরা আল-ফাতহ: ২৯]; তিনি আরও বলেন: ﴿فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلۡفُلۡكِ﴾ "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন" [সূরা আল-মুমিনূন: ২৮] এবং তিনি আরও বলেন: ﴿لِتَسۡتَوُۥاْ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ﴾ "যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হতে পার" [সূরা আয-যুখরুফ: ১৩] এই

---

৫৬. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৮১)।

৫৭. মাজমূ' ফাতাওয়া (৯/২৯৮)।

৫৮. মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৪৮৪)।

৫৯. মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২৫)।

জাতীয় সব ক'টি إِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) শামিল করে আরোহণকারী কর্তৃক আরোহণকৃত বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার বিষয়টিকে; কারণ, তার নিচে যদি তা (আরোহণকৃত বস্তু) না থাকে, তাহলে সে নিশ্চিত পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর বাণী: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪] এখানে আল্লাহ তা'আলা 'আরশ ও অন্য সকল কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; বরং তিনি তাঁর মহান কুদরতের মাধ্যমে 'আরশ ও 'আরশের বনহকারী ফেরেশতাগণকে ধারণ বা বহন করেন।

সুতরাং إِسْتِوَاءٌ শব্দটি সৃষ্টিকুলের জন্য হলে এমন কতগুলো অর্থকে আবশ্যক করে, যেগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। এমনভাবে তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, যা তাঁর পক্ষ থেকে আরশের প্রতি কোনো রকমের মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই সংঘটিত হয়েছে। বরং 'আরশসহ সকল কিছুই সর্বদিক থেকে তাঁর মুখাপেক্ষী।[৬০]

৫৩. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কর্মকাণ্ড ও বিষয়াদির মধ্য থেকে কোনো কিছুতেই তাঁর কোনো সমকক্ষ কেউ নেই; কারণ তিনি বিস্তারিতভাবেই পরিপূর্ণ গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর উপমা দান ও তুলনা করা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। আবার তিনি সাধারণভাবে যাবতীয় ত্রুটি, কমতি ও অপরিপূর্ণতা থেকে পবিত্র; কারণ তাঁকে অপরিপূর্ণতা দ্বারা বিশেষিত ও গুণান্বিত করাটা বড় বাতিল ও ভিত্তিহীন বিষয়, অপরদিকে তাঁর পরিপূর্ণতার বিষয়টি তাঁর পবিত্র সত্তার অপরিহার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।[৬১]

৫৪. মুসলিমগণ মধ্যমপন্থা অবলম্বনে কোনো রকম বিকৃতি, অর্থশূন্যতা, ধরণ নির্ধারণ ও উপমা প্রদান করা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলাকে এমন গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত করেন, যার দ্বারা তিনি তাঁর নিজকে গুণান্বিত করেছেন এবং যার দ্বারা তাঁর রাসূলগণ তাঁকে গুণান্বিত করেছেন। তারা তাঁকে পরিপূর্ণ গুণাবলির দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং তারা এমন যাবতীয় ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, যা সৃষ্টিকর্তার জন্য মানানসই নয় এবং যার দ্বারা সাধারণত শুধু সৃষ্টিকেই গুণান্বিত করা হয়। সুতরাং তারা তাঁকে জীবন, 'ইলম (জ্ঞান), শক্তি-সামর্থ্য, রহমত (দয়া), 'আদল (ন্যায়), ইহসান ইত্যাদির দ্বারা বিশেষিত করেন এবং তারা তাঁকে মৃত্যু, ঘুম-নিদ্রা, জাহল (অজ্ঞতা), অক্ষমতা, যুলুম, ধ্বংস বা বিনাশ ইত্যাদি থেকে পবিত্র ও মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। তাছাড়া তারা জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলির কোনো কিছুতে তাঁর কোনো সদৃশ নেই। সুতরাং তাঁর জানার মতো করে কেউ জানে না, তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের মতো করে কেউ শক্তি-সামর্থ্য রাখে না, তাঁর দয়ার মতো করে কেউ দয়া করতে পারে না, তাঁর শ্রবণের মতো করে কেউ শ্রবণ করে না, তাঁর দেখার মতো করে কেউ দেখতে পায় না, তাঁর সৃষ্টির মতো করে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না, তাঁর إِسْتِوَاءٌ (আরোহণ) করার মতো করে কেউ আরোহণ করতে পারে না, তাঁর আগমনের মতো করে কেউ আগমন করতে পারে না এবং তাঁর অবতরণের

---

৬০. মাজমূ' ফাতাওয়া (১৭/৩৭৯)।

৬১. মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৫৯২)।

মতো করে কেউ অবতরণ করতে পারে না।[৬২]

৫৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: [(আল্লাহ) আকাশে] অর্থাৎ উপরে; তাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরভাগের মধ্যে; বরং আকাশ মানে ঊর্ধ্বে। আর তিনি যখন 'আরশের উপরে, তখন তিনি সর্বোচ্চে, মহাঊর্ধ্বে এবং সেখানে কোনো সৃষ্টি নেই; এমনকি মহান 'রব' সেখানে সৃষ্টিকুলের কোনো কোনো কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ বা বেষ্টিত নন এবং তিনি কোনো বিদ্যমান দিকের মধ্যেও আবদ্ধ নন; বরং অস্তিত্ব তো রয়েছে কেবল স্রষ্টা ও সৃষ্টির। আর সৃষ্টিকর্তার অবস্থান তাঁর সৃষ্টিসমূহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সকলের উপরের উপরে। সুতরাং তিনি কোনো সৃষ্টির মধ্যেই নন, চাই ঐ সৃষ্টিকে কোনো 'দিক' বলে অভিহিত করা হোক, অথবা কোনো 'দিক' বলে অভিহিত করা না হোক।[৬৩]

৫৬. সুতরাং যে ব্যক্তি বলে: তিনি (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন সম্রাট কর্তৃক (সিংহাসনে) উঠার মতো এমনভাবে যে, তিনি 'আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী, তাহলে এটা হবে ঘৃণ্য উপমা; কারণ আল্লাহ তা'আলা তিনি ভিন্ন বাকি সকল কিছুর অভাব ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর 'আরশ ও বাকি সকল সৃষ্টি সামগ্রিক দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। আর তিনি তাঁর কুদরতের মাধ্যমে 'আরশ ও তার বনহকারী ফেরেশতাগণকে ধারণ বা বহন করেন।[৬৪]

এভাবে ইবন তাইমিয়্যাহ'র বক্তব্য থেকে আমরা আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে বাতিলপন্থী জাহমী, মু'তাযিলী, আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের আরোপিত সন্দেহসমূহের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি। তাঁর এসব বক্তব্য কত মহৎ ও শক্তিশালী কথা! কত ব্যাপক অর্থবহ কথা! কত উপকারী বক্তব্য! কত বিশুদ্ধ বাণী! কত বলিষ্ঠ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা! কত অগ্রাধিকার পাওয়ার মতো বক্তব্য! তার থেকে হক ও সত্যের আলোসমূহ জ্বলজ্বল করছে। আর ইনসাফের চাদরে তাকে বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের পোশাকে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কোনো দিক থেকে তাতে কোনো প্রকারের সন্দেহ ও সংশয় নেই।

আল্লাহ তা'আলা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র প্রতি রহম করুন! কারণ, তাঁর বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হক এবং বিশুদ্ধ সত্য, যা প্রকাশ পেয়েছে নিরেট স্বচ্ছ মেধা এবং বিশ্বস্ত গভীর জ্ঞান থেকে। তার বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ কত অলঙ্কারপূর্ণ! আর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংশোধন পরিমার্জন কত পরিপূর্ণ!

এ অধ্যায়ের উপসংহারে আমি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি:

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝٥٨﴾ [الاحزاب: ٥٨]

"আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় যা তারা করেনি তার জন্য; নিশ্চয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করলো।" [সূরা আল-আহযাব: ৫৮]

---

৬২. আল-জাওয়াব আস-সহীহ লিমান বাদ্দালা দীন আল-মাসীহ (২/১৪২-১৪৩)।

৬৩. আল-জাওয়াব আস-সহীহ লিমান বাদ্দালা দীন আল-মাসীহ (৪/৩১৭)।

৬৪. বায়ানু তালবীস আল-জাহমিয়্যাহ (৮/৫৪২)।

তাদেরকে আরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী:

«وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ»

"আর যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের আবর্জনার মধ্যে বসবাস করাবেন, যতক্ষণ না সে (তাওবা করে) তার কথা প্রত্যাহার করবে।"(৬৫)

আর رَدْغَةُ الْخَبَالِ এর অর্থ: জাহান্নামীদের নির্যাস বা আবর্জনা, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।(৬৬)

আর আমি তাদেরকে তাওবা করার জন্য আহ্বান করি ঐদিন আগমনের পূর্বে, যেদিন লজ্জা বা অনুশোচনা কোনো উপকারে আসবে না।

****

গ্রন্থটির মূল দাবি

কুরআন ও সুন্নাহকে সালাফে সালেহীনের মানহাজে বুঝতে হবে

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সকল গ্রন্থে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ও যার জন্য তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তা হচ্ছে সালাফী মানহাজ; কারণ আমরা জানি যে, বিশুদ্ধ থাকতে হলে সালাফী মানহাজ না গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই। তাই সালাফী মানহাজ নিয়ে নিম্নে কিছু আলোচনা পেশ করা হলো:

যেকোনো ধর্মাবলম্বীকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কার অনুসরণ কর? তবে সে অবশ্যই তাদের ধর্মের প্রধান ব্যক্তি ও তার সহচরদের দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করবে। জাগতিক ধর্মের মধ্যে হিন্দুদের জিজ্ঞেস করলে ঋষী-মহাঋষীদের কথাই বলবে। বৌদ্ধদের জিজ্ঞেস করলে বৌদ্ধ ও তার একান্ত সহচরদের জীবনকেই তাদের আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করবে। জৈনদের জিজ্ঞেস করলে মহাবীর ও তার মতদেরকেই তাদের অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে জানাবে। শিখদের জন্য গুরু নানক ও তার সহচররাই অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। এর বাইরে যারা আসমানী কিতাবের অনুসরণের দাবিদার তাদের মধ্যকার ইয়াহূদীদের কাছে আদর্শ হচ্ছে মূসা 'আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা সবচেয়ে সঠিক মানুষ, তাদের অনুসরণ ও অনুকরণকেই তারা ধর্মের সঠিক নীতি বলে আপনাকে জানাবে। যদি নাসারাদের জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা তোমাদের ধর্মের মাঝে কাদের অনুসরণ করাকে নিরাপদ মনে কর? তবে তারা অবশ্য বলবে, যিশু (ঈসা) ও তার সাথী হাওয়ারীদেরকেই মনে করি। ঠিক একই নিয়ম-নীতি অনুযায়ী আমরা ইসলামের ব্যাপারে কাদের নীতি অবলম্বন করতে হবে, কাদের অবস্থান আমাদের জন্য অবশ্য অনুকরণীয় তার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা আবশ্যক হবে যে, তারা হচ্ছেন রাসূল

৬৫. আহমাদ, আল-মুসনাদ (২/৭০); আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৫৯৭; হাকেম, আল-মুসতাদরাক (২/২৭) এবং তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৬৬. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২০০২।

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম। আর সেজন্যই যারা এ পন্থা ধারণ করে তাদেরকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণের বাইরে যায় না।

সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন এ উম্মতের জন্য সালাফ বা উত্তম পূর্বসূরী। কুরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে বুঝতে গিয়ে যারা এ সম্মানিত উত্তরসূরীদেরকে যথাযথভাবে অনুসরণ করবে তারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। কিয়ামত পর্যন্ত যারাই এ নীতি সুন্দরভাবে মেনে চলবে, সাহাবায়ে কিরামের সকলের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে সালাফী বলা হবে। যেমনিভাবে তাদেরকে নাজাতপ্রাপ্ত গোষ্ঠী, সাহায্যপ্রাপ্ত সম্প্রদায়, আছারের অনুসারী, হাদীসের অনুসারী ইত্যাদি নাম প্রদান করা হয়। এ সম্পর্ক কোনো ব্যক্তি বিশেষের দিকে নয়, কোনো নতুন মতাদর্শের দিকে নয়। এর সম্পৃক্ততা তো কেবল সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপক ও প্রাচীন মানহাজ বা বিশুদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণের দিকে। তাই তারাই সালাফী মানহাজের অনুসারী বলে বিবেচিত হবে যারা,

- সাহাবায়ে কিরামের আকীদায় থাকবে।
- সাহাবায়ে কিরামের আমল ও কর্মে থাকবে।
- সাহাবায়ে কিরামের আখলাক-চরিত্রে থাকবে।
- সাহাবায়ে কিরাম যা থেকে দলীল গ্রহণ করতেন তার ওপর থাকবে।
- সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে দলীল গ্রহণ করতেন সেভাবে দলীল গ্রহণ করবে।
- সাহাবায়ে কিরাম আত্মশুদ্ধির যে পদ্ধতি অবলম্বন করবে তারা সে পদ্ধতির অনুসরণ করবে।
- সাহাবায়ে কিরাম যে পদ্ধতিতে রাসূলকে ভালোবাসতেন তারাও সে পদ্ধতিতে রাসূলকে ভালোবাসবে।
- সাহাবায়ে কিরাম যে পদ্ধতিতে ও যেদিকে দাওয়াত দিতেন তারাও সে পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদান করবে।
- সাহাবায়ে কিরাম দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করেছেন তারাও সে নীতিতে অবস্থান করবে।
- সাহাবায়ে কিরাম ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে যে নীতি অবলম্বন করতেন তারারও একই ধরনের নীতিতে অবস্থান করবে।

সুতরাং যদি দীনে ইসলামের ওপর টিকে থাকতে হয়, যদি সঠিক পদ্ধতিটির অনুসরণ করতে হয় তবে কোনোক্রমেই সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারীদের মতাদর্শের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ইসলামের ইতিহাসে যারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে তারাই উপরোক্ত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার

কারণে হয়েছে। যেমন, নতুন মত ও পথে চলার কারণে খারেজী, রাফেযী, মু'তাযিলী, কাদারী, জাবরী, মুরজী ইত্যাদি ফির্কাসমূহের উদ্ভব ঘটেছে। অনুরূপভাবে একক ব্যক্তি বিশেষের মতবাদ অনুসরণের কারণে জাহমিয়া, আশ'আরিয়্যাহ, মাতুরিদিয়্যাহ ইত্যাদি ফির্কাসমূহের উৎপত্তি হয়েছিল।

তাই যদি ইসলামের সঠিক মতাদর্শে থাকতে হয় তবে আমাদেরকে সালাফে সালেহীনের মতাদর্শকে অনুসরণ করতেই হবে, তার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর এ বিষয়টিকে দু'ভাবে সাব্যস্ত করা যায়:

এক. কুরআন ও সুন্নায় আসা দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া

তন্মধ্যে কুরআনে কারীমে যেমন:

১- সাহাবায়ে কিরামের আকীদাহ ও আমলের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রকাশক ভাষ্যসমূহ:

﴿وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ [التوبة: ١٠٠]

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১০০]

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ﴿٢٩﴾﴾ [الفتح: ٢٩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সাজদায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার প্রভাবে পরিস্ফুট; এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের।" [সূরা আল-ফাতহ: ২৯]

﴿لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾﴾ [الفتح: ١٨]

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।" [সূরা আল-ফাতহ: ১৮]

২- সাহাবায়ে কিরামের ঈমানকে মানদণ্ড হিসেবে ঘোষণা করে আসা ভাষ্য:

﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٧﴾ [البقرة: ١٣٧]

"অতঃপর তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয় তারা হিদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা বিরোধিতায় লিপ্ত। সুতরাং তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৩৭]

৩- সাহাবায়ে কিরামের মত ও পথের বাইরে যাওয়া জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার কারণ:

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٥﴾ [النساء: ١١٥]

"আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দিব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!" [সূরা আন-নিসা: ১১৫]

৪- সাহাবায়ে কিরাম সর্বোত্তম জাতির সর্বোত্তম প্রজন্ম হওয়া:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ١١٠﴾ [آل عمران: ١١٠]

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভালো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসেক।" [সূরা আলে ইমরান: ১১০]

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٤٣﴾

[البقرة: ١٤٣]

"আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারেন। আর আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমরা এ উদ্দেশ্যে কিবলায় পরিণত করেছিলাম যাতে প্রকাশ করে দিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের ওপর এটা নিশ্চিত কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৩]

৫- সাহাবায়ে কিরাম দীনের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাদের পথ অনুসরণ করতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: ١٥]

"আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ কর। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।" [সূরা লোকমান: ১৫]

৬- আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্যবাদীদের সাথে থাকতে বলেছেন, আর সাহাবায়ে কিরাম প্রথম সত্যবাদী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যায়ণকৃত। আল্লাহ বলেন,

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝١٩﴾ [التوبة: ١٩]

"হাজীদের জন্য পানি পান করানো ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে তোমরা কি তার মতো বিবেচনা কর, যে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহর কাছে সমান নয়। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১৯]

৭- সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্য রয়েছে যে, তারা কখনও পরিবর্তন হয়নি। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ۝٢٣﴾ [الأحزاب: ٢٣]

"মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গীকার পূর্ণ করে) মারা গেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আল-আহযাব: ২৩]

৮- সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথের ওপর ছিলেন বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝١٠٧﴾ [يوسف: ١٠٧]

"তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে বা তাদের অজান্তে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ হয়ে গেছে?" [সূরা ইউসুফ: ১০৭]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও সাহাবায়ে কিরামের বুঝকে গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন,

৯- বিদ'আত ও শির্কের ছড়াছড়ি দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। রাসূল বলেন,

«أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।"(৬৭)

১০- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম প্রজন্মকে অনুসরণ করার নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন,

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»

"আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী এরপরে এমন সব ব্যক্তি আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম করে বসবে।"(৬৮)

১১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা ও সমস্যার সময় পুনরায় সাহাবায়ে কিরামের কর্মকাণ্ডের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

«إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقَالُوا: فَكَيْفَ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَرْجِعُونَ إِلَى أَمْرِكُمُ الأَوَّلِ»

"অবশ্যই ফিতনা সংঘটিত হবে। তখন সাহাবায় কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের তখন কী হবে? আমরা তখন কী করব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রথম অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে'।"(৬৯)

---

৬৭. তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ২৬৭৬।

৬৮. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ২৬৫২।

৬৯. তাবারানী, আল-কাবীর (৩/২৪৯)।

১২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের বিভক্তির ব্যাপারে পূর্বাহ্নে আমাদেরকে সাবধান করে তাঁর আদর্শ ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেন,

«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بني اسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

"বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন এক জোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[৭০]

১৩- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সুস্পষ্ট পথের ওপর রেখে গেছেন, যা দাবি করে যে তাদের পথেই পরবর্তীদেরকে চলতে হবে। তিনি বলেন,

«قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ»

"আমি তোমাদের আলোকিত দীনের ওপর রেখে যাচ্ছি, তার রাত তার দিনের মতই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব, তোমাদের ওপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরে থাকবে। তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে, যদি হাবশী গোলামও (তোমাদের নেতা নিযুক্ত) হয়। কেননা মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাসারন্ধ্রে লাগাম পরানো উটতুল্য। লাগাম ধরে যে দিকেই তাকে টানা হয়, সে দিকেই যেতে বাধ্য হয়।"[৭১]

দুই. বিবেক ও বাস্তবতার যুক্তিতে সাব্যস্ত হওয়া

আর তা কয়েকভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে,

১- সাহাবায়ে কিরাম কুরআন নাযিল হওয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা সেটার অর্থ বুঝে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা দেখেছেন ও তাঁর থেকে

---

৭০. তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ২৬৪১।

৭১. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৩।

সরাসরি শুনেছেন। সুতরাং তাদের বুঝই হবে সঠিক বুঝ।

২- সাহাবায়ে কিরাম জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ছিলেন, তারা ছোট বড় সবকিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জানার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। সুতরাং তাদের মতামত সর্বদা সঠিক হবে এটাই স্বাভাবিক।

৩- সাহাবায়ে কিরাম যা শুনতেন তার ওপরই আমল করতেন, তারা না জেনে আমল করেছেন এমনটি বলা যাবে না। অনুরূপভাবে না জেনে কোনো কিছু বিশ্বাস করতেন সেটা বলাও হবে তাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা।

৪- সাহাবায়ে কিরাম তাবে'য়ীদের কাছে তাদের ইলম পৌঁছানোর ব্যাপারে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতেন যা প্রমাণ করে যে, এ ইলম বিশুদ্ধ ইলম, আর তা অনুসরণ করে যেতে হবে।

৫- সাহাবায়ে কিরাম আরবী ভাষা সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। সুতরাং অন্যদের চেয়ে দীনও তারা ভালো বুঝবেন এটাই স্বাভাবিক।

৬- সাহাবায়ে কিরাম বিবেকের দিক থেকেও বিশাল বিবেকের অধিকারী ছিলেন। তাদের বিবেকের সাথে কারো বিবেকের তুলনাই চলে না।

৭- সাহাবায়ে কিরামের সকলেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, তাদের মতো ন্যায়পরায়ণ মানুষ আর কোনো দিন আসবে না। আর স্বাভাবিকভাবেই ন্যায়পরায়ণদের কথা, কাজ ও নীতি মানুষ গ্রহণ করে থাকে।

৮- সাহাবায়ে কিরাম ভনিতা বা কৃত্রিমতা পছন্দ করতেন না। তাদের দীনের ব্যাপারে কেবল হক কথাই বলবেন এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং তাদের মতামতই গ্রহণ করে নিতে হবে।

৯- সাহাবায়ে কিরামের মতামত গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণেই পরবর্তী ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ তাদের মতামতকে সংরক্ষণ করেছেন।

১০- সাহাবায়ে কিরাম যা বিশ্বাস করে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, যার ওপর থেকে ফিতনা থেকে বেঁচে গিয়েছেন, আমরা যদি সেটার বাইরে এক বিন্দুও না যাই তাতে আমাদের দীনের কোনো ক্ষতি হবে না। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামকে সুন্দরভাবে অনুসরণ করে যেতেই হবে। তাদেরকে যারা সুন্দরভাবে অনুসরণ করে তাঁরাই প্রকৃত সালাফী।

- **তাছাড়া সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও ইমামগণের বক্তব্য অনেক। যেমন,**

১- হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, হে কারীসাহেবরা, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথের অনুসরণ কর, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তোমরা সেটার ওপর দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে পার, তবে অনেক দূর অগ্রণী হয়ে যাবে, আর যদি তা ছেড়ে ডানে-বামে যাও তবে অবশ্যই পথভ্রষ্টতার বহুদূর চলে যাবে।[৭২]

৭২. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৭২৮২।

২- ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, ইলম উঠে যাওয়ার আগে তা শিখে নাও,... আর তোমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে আগের লোকদের মত গ্রহণ করা।[৭৩]

৩- ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা একজনকে ওসিয়ত করে বলেন, 'তোমার ওপর কর্তব্য হচ্ছে দীনের ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন, প্রথম যারা চলে গেছে তাদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ, কোনো বিদ'আত করো না।'[৭৪]

৪- 'উমার ইবন আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তোমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা,.. আর তোমরা সাহাবায়ে কিরাম যেখানে অবস্থান করেছেন সেখানে অবস্থান করবে'... যদি বল যে, পরে তো অনেক কিছু ঘটেছে, তবে মনে রেখ যে, তারা কেবল আদর্শচ্যুত হওয়ার কারণেই নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে।...[৭৫]

৫- ইমাম আওযা'ঈ বলেন, 'তুমি সুন্নাত এর নিজেকে ধৈর্য ধারণ করাও, আর সাহাবায়ে কিরাম যেখানে অবস্থান করেছেন সেখানে অবস্থান কর... তুমি সালাফে সালেহীনের পথ অবলম্বন কর'...।[৭৬]

ইমাম আওযা'ঈ আরও বলেন, 'তুমি সালাফগণের আসার অনুসরণ কর, যদিও মানুষ তোমাকে ত্যাগ করে বসে'।[৭৭]

৬- ইমাম মালেক বলেন, 'আমরা বিদ'আতীদের পিছনে সালাত পড়ি না'... 'আর সুন্নাতকে মেনে নেয়া, সালাফদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করাই আমাদের কাজ।' [ইজতিমা'উল জুয়ূশ: ১৫৫।

তিনি আরও বলেন, 'এ উম্মতের পরবর্তীদেরকে তাই সংশোধন করতে পারে যা পূর্ববর্তীদেরকে সংশোধন করেছে'।[৭৮]

- অনুরূপভাবে সালাফে সালেহীনের অনুসরণের ওপর ইজমাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে যারা ইজমা বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যতম।[৭৯]

সুতরাং সালাফে সালেহীনের মতাদর্শ মেনে চলা ফরয। তাদের মত ও পথের বাইরে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজেকে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত করা।

আল্লাহ আমাদেরকে সালাফে সালেহীনের মত ও পথ অনুসরণের মাধ্যমে যাবতীয় ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন।

---

৭৩. দারেমী, আস-সুনান (১/৬৬), (১/১৬৪)।

৭৪. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩১৯)।

৭৫. আবু দাউদ, আস-সুনান (১২/৩৬৫); আজুররী, আশ-শরী'আহ: ৫৩৯।

৭৬. আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া (৬/১৪৩)।

৭৭. আজুররী, আশ-শরী'আহ: ১২৭।

৭৮. কাযী ইয়াদ্ব, আশ-শিফা (২/৭১)।

৭৯. মাজমু' ফাতাওয়া (৪/১৫৮)।

بسم الله الرحمن الرحيم

এ ফাতওয়াটির বৃত্তান্ত

গ্রন্থকার শাইখুল ইসলাম, আল্লাহ স্বীয় রহমতে তাকে আবৃত করুন। তাকে হামা শহর থেকে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আল্লাহর কুরআনুল কারীমে এবং তাঁর রাসূলের সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলির প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের স্বরূপ কিরূপ? যেমন: 'আরশের উপর উঠা, সমুন্নত থাকা, দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করা ইত্যাদি।

এগুলো কি বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হবে নাকি এগুলোর তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক?

তখন তিনি এর উত্তরে তাই বলেছিলেন যা বলেছিলেন ইমাম মালিক ইবন আনাস এবং তার শাইখ রবী'আহ। আর তা হলো:

"ইস্তিওয়া শব্দটি(র অর্থ) জ্ঞাত, তার ধরন অজ্ঞাত এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।" আর নিশ্চয় এটা তাই যার ওপর ছিলেন অনুসৃত ইমামগণ এবং তাদের পূর্বের সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ।

এ ফাতওয়া শুনে তা'ওয়ীল প্রবক্তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

তখন শাইখুল ইসলাম এই ইসলামী আলোচনাকে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার কথা ভাবলেন। তিনি চার মাযহাবের অনুসারী এবং সূফীপন্থী বিশিষ্ট আলেমদের থেকে বর্ণিত মহৎ দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যসমূহ এই ফাতওয়ার সাথে সংযুক্ত করেন। যেমন, ইবন যামানীন আল-আন্দালুসী আল-মালেকী এর বক্তব্য, সূফী আমর ইবন উসমান আল-মাক্কী এর বক্তব্য ইত্যাদি। তখন এই সংযুক্তি সাধনের পর ফাতওয়াটি বিশালভাবে বিস্তৃতি লাভ করল। এটার নাম দেয়া হলো "আল-ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ আল-কুবরা" যাতে এটা পূর্বের ফাতওয়া থেকে স্বতন্ত্র হয় যা পরবর্তী "আল-ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ আস-সুগরা" নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

এ মহৎ ফাতওয়াটি উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয় এবং মূল ফাতওয়ার সাথে ভারতের লাবিম্নুর শহরে ১২৯১ হিজরীতে ভূপালের রাজা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের নির্দেশে মুদ্রিত হয়। এরপর কাতারের বাদশাহ কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন সানি এর অর্থায়নে ১৩২২ হিজরীতে ভারতের অমৃতসরে মুদ্রিত হয় আল-কুরআন ও সুন্নাহ মুদ্রণালয়ে অন্যান্য মুদ্রণের সঙ্গে। পরবর্তী বছর ১৩২৩ হিজরীতে মিশরে মুদ্রিত হয়। অতঃপর আমাদের বন্ধু আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রায্যাক হামযা এর তত্ত্বাবধানে ১৩৫১ হিজরীতে আমাদের সালাফিয়্যাহ মুদ্রণালয় মক্কা শাখা মুদ্রণ করে। অতঃপর ১৩৭৩ হিজরীতে শাইখ আহমাদ শাকির এর তত্ত্বাবধানে কায়রোর দারুল মা'আরিফ মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হয়। এখন পর্যন্ত এর মুদ্রণ চলমান রয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُئل شيخُ الإسلام، أبو العباس أحمد بن تيمية وذلك في سنة ثمان وتسعين وستمائة، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدًّا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس: ٣]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت:١١]، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن»

রহমান রহীম আল্লাহর নামে

বিশিষ্ট আলেমে রব্বানী শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন আবদুস সালাম রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যা ছিল ৬৯৮ হিজরীর ঘটনা। আর এ উত্তরে ঘটেছিল অনেক বিপর্যয় ও দূর্যোগ। আর এটা এমন উত্তর যার উপকারিতা অনেক বিশাল।

প্রশ্নকারী বলেন: কুরআনে বর্ণিত নিম্নোক্ত আল্লাহর সিফাতের আয়াত:

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝﴾ [طه: ٥]

“রহমান ‘আরশের উপর উঠেছেন।” [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ﴾ [الأعراف: ٥٤]

“অতঃপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ: ৫৪; সূরা ইউনুস: ০৩; সূরা আর-রা‘দ: ০২; সূরা আল-ফুরকান: ৫৯; সূরা আস-সাজাদাহ: ০৪; সূরা আল-হাদীদ: ০৪]

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١]

“তারপর তিনি আসমানের উপর উঠলেন, যা ছিল ধোঁয়া।” [সূরা ফুস্‌সিলাত: ১১] এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত সিফাত:

«إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»

“নিশ্চয় আদম-সন্তানদের অন্তরসমূহ রহমানের আঙ্গুলসমূহের দুটি আঙ্গুলের মাঝে।”(১)

---

০১. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৬৫৪।
উল্লেখ্য, হাদীসের অর্থে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ দু' আঙ্গুলের মাঝখানে থাকা লেগে থাকা বা ভেতরে থাকা আবশ্যক করে না বা দাবিও করে না। সুতরাং প্রকাশ্য অর্থের ওপরই আমরা সেটা গ্রহণ করতে পারি। যেমন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ বলেন, “আসমান ও যমীনের মাঝখানে অবস্থিত নিয়োজিত মেঘমালা” [সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৪] অনুরূপ আল্লাহর বাণী “তাঁর দু' হাতের মাঝখানে অবস্থিত তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে” [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৬], তদ্রূপ আল্লাহর বাণী, “আর জীনদের মধ্য হতে এমনও ছিল যারা তার দু' হাতের সামনে তাঁর রবের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করত।” [সূরা সাবা: ১২] এমন আরও বহু আয়াত রয়েছে, এসব স্থানের কোথাও মাঝখানে বলে লেগে থাকা, কিংবা ভিতরে থাকা বুঝানো হয়নি। [আত-তাদমুরিয়্যাহ পৃ. ৭৩; সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (১/২৩৬-২৩৮)]

وقوله: «يضع الجبار قدمه في النار» إلى غير ذلك من الأحاديث [وما قالت العلماء، وابسُطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى؟] فأجاب:

الحمد لله رب العالمين: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، وأمره أن يقول: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].

অনুরূপ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

«يَضَعَ الجَبَّارُ قَدَمَهُ فِي النَّارِ»

"প্রতাপশালী সত্তা (আল্লাহ) স্বীয় পা জাহান্নামে রাখবেন"[২] ইত্যাদি হাদীসসমূহের ব্যাপারে মহান ফকীহ দীনের ইমাম ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য কী? এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা উপস্থাপন করুন। আপনারা পুরস্কৃত হবেন ইনশা-আল্লাহ।

তখন তিনি উত্তরে বলেন: সকল হামদ সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহর জন্য।

এ ব্যাপারে আমাদের কথা তাই, যা বলেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে পূর্ববর্তীগণ এবং যারা তাদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করেছেন। আর যা বলেছেন তাদের পরবর্তী হিদায়াতের ইমামগণ[৩] যাদের সঠিক পথ ও জ্ঞানের ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত। আর এ অধ্যায়[৪] ও এ জাতীয় অন্যান্য অধ্যায়ের ব্যাপারে সকল মাখলুকের এটাই অপরিহার্য কর্তব্য।[৫] কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও সঠিক দীনসহ পাঠিয়েছেন মানুষদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মহাপরাক্রমশালী অতি প্রশংসিতের পথের দিকে বের করার জন্যে এবং তার জন্য তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি তাকে পাঠিয়েছেন তার অনুমতিতে তাঁর দিকে ডাকার জন্য এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছেন এ কথা বলতে যে,

﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى﴾ [يوسف: ١٠٨]

"বলুন, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

---

০২. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৪৮৪৮, ৪৮৪৯, ৪৮৫০; অনুরূপ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮৪৮।

০৩. যেমন চার ইমাম, দুই সুফইয়ান, যুহরী, ইবনুল মুবারক প্রমুখ।

০৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে যেসব গুণে গুণান্বিত করা হবে সে বিষয়ে।

০৫. অর্থাৎ সর্বদা সকল মাসআলার উত্তর নেয়ার জন্য আল্লাহর বাণী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের মত, তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীনে 'ইযাম এর বক্তব্য, হিদায়াতের ইমামগণের পথের অনুসারী হওয়া।

[إحكام الرسول صلى الله عليه وسلم باب الإيمان بالله اعتقادا وقولا]:

فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج [الله] به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردُّوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم، وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره. أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسًا مشتبهًا، فلم يميز [بين] ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.

[রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আল্লাহর ওপর ঈমানের অধ্যায়টিতে কী বিশ্বাস করতে হবে আর কী বলতে হবে সেটাকে সুদৃঢ়করণ]

সুতরাং বুদ্ধি-বিবেক ও দীনের দিক দিয়ে এটা অসম্ভব যে, ঐ উজ্জ্বল প্রদীপ[৬] যার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেছেন, তার সাথে সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছেন; যাতে তিনি লোকদের মাঝে তাদের কৃত মতভেদসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। আর মানুষদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাদের সকল দীনের বিষয়, যাতে তারা মতভেদ করেছে, সেটাকে তার প্রতি প্রেরিত কিতাব ও হিকমতের দিকে ফিরিয়ে দিতে।[৭] আর তিনি তো আল্লাহর পথের দিকে তাঁরই নির্দেশে বুঝেশুনে মানুষদেরকে দাওয়াত দেন। আর আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি তাঁর নি'আমত পরিপূর্ণ করেছেন। এহেন অবস্থায় এটা অসম্ভব যে, তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর সম্পর্কে জানার বিষয়টিকে সন্দেহপূর্ণ, সাদৃশ্যপূর্ণ ও ভেজাল অবস্থায় রেখে যাবেন, আর আল্লাহর সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে কোনটা ওয়াজিব[৮], কোনটা জায়েয[৯] এবং কোনটা নিষিদ্ধ তা পার্থক্য করে দিবেন না।[১০]

---

০৬. আল্লাহ বলেন, "হে নবী! অবশ্যই আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।" [সূরা আল-আহযাব: ৪৫-৪৬] আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূর্যের সাথে তুলনা করে উজ্জ্বল প্রদীপ বলা হয়েছে; কারণ সারা দুনিয়া তাঁর দ্বারা আলোকিত হয়েছে, তাঁর শরী'আতের মাধ্যমে প্রদীপ্ত হয়েছে। ইতোপূর্বে তা কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। [আশ-শিফা (১/৩১৯); ইবন কাসীর (৬/৪৩১)]

০৭. এটি ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য যে, তারা মতভেদ হলে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ'র দিকে ফিরে আসে।

০৮. উদাহরণত পূর্ণতাজ্ঞাপক যাবতীয় গুণাবলি, যেমন: জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা ইত্যাদি।

০৯. উদাহরণত কর্মবাচক গুণাবলি। অর্থাৎ এগুলো সাব্যস্ত করা; কারণ এগুলোর কথা কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে, যেমন: আগমন করা, অবতরণ করা, উপরে উঠা।

১০. উদাহরণত ত্রুটিপূর্ণ অর্থ প্রদান করে এমনসব গুণাবলি, যেমন: তন্দ্রা, ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, পান করা ইত্যাদি।

فإن معرفة هذا أصل الدين، وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب، وحصلته النفوس، وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب، وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادًا وقولاً؟! ومن المحال أيضًا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علَّم أُمَّتَه كل شيء حتى الخراءة، وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»، وقال فيما صح عنه أيضًا: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم».

কেননা, এটার জ্ঞান অর্জন দীনের বিষয়, হিদায়াতের আসল ভিত্তি। অন্তর যা অর্জন করে, মন যা হাসিল করে, বুদ্ধি যা উপলব্ধি করে তার অত্যাবশ্যক ও শ্রেষ্ঠতর বিষয়। সুতরাং কীভাবে এই কিতাব, এই রাসূল এবং নবী-রাসূলদের পরে উত্তম সৃষ্টিকুল (সাহাবায়ে কিরাম) তারা এসব ব্যাপারে এই কিতাবকে তাদের বিশ্বাস ও কথার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী না বানিয়ে থাকতে পারেন?

আর এটা অসম্ভব যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সকল কিছু শিক্ষা দিলেন, এমনকি পায়খানা-প্রস্রাবের নিয়মও[১১]। তিনি বলেছেন:

«تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ»

"আমি তোমাদেরকে উজ্জ্বল-শুভ্র পথের ওপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত-দিন একই রকম। আমার পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া কেউ এ পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।"[১২]

তিনি আরও বলেছেন, যা বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত:

«ما بعثَ اللهُ من نبيٍّ إلَّا كانَ حقًّا عليهِ أن يدلَّ أمَّتَهُ على خيرِ ما يعلمُهُ لَهم وينهاهُم عن شرِّ ما يعلمُهُ لَهم»

"আল্লাহ যে নবীই পাঠিয়েছেন তার ওপর এটা অবধারিত কর্তব্য যে, তিনি স্বীয় উম্মতকে যা তাদের জন্য ভালোবাসেন সেটার দিকে পথ দেখাবেন এবং তাদের জন্য যা অনিষ্ট জানেন তার থেকে তাদেরকে নিষেধ করবেন।"[১৩]

১১. গ্রন্থকার সে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করছেন, যা সহীহ মুসলিমে এসেছে, হাদীস নং ২৬২; সালমান আল-ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, তিনি বলেন, তাঁকে বলা হলো, তোমাদের নবী কি তোমাদেরকে সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন এমন কি পায়খানা-পেশাবের নিয়মও? তিনি বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন আমরা যেন পায়খানা-পেশাব কিবলামুখী হয়ে না করি অথবা আমরা যেন ডান হাতে পরিচ্ছন্ন না হই অথবা আমরা যেন তিন পাথরের কমে পরিষ্কার না হই অথবা আমরা যেন গোবর বা হাঁড় দিয়ে পরিচ্ছন্ন না হই।"

১২. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭১৪২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/১৭৫); ত্বাবারানী, আল-কাবীর (১৮/২৪৭, ২৫৮), নং ৬১৯, ৬৪২; আবু নু'আইম, আল-মুস্তাখরাজ (১/৩৬)। সনদ সহীহ।

১৩. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৪৪। তবে সহীহ মুসলিমের শব্দ হচ্ছে,

«إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ»

"আমার পূর্বে যে নবীই অতিবাহিত হয়েছেন তার ওপর কর্তব্য ছিল তার উম্মতকে তাদের জন্য ভালো যা জানবেন তার পথনির্দেশ করবেন, আর খারাপ যা জানবেন তা থেকে তাদেরকে সাবধান করবেন।"

وقال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا».

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم [مقامًا] فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه» رواه البخاري.

[منزلة العلم بالله تعالى] محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين. وإن دقت. أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم [ويعتقدونه] بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا

আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন এমন অবস্থায় যে, আকাশে একটা পাখি ডানা ঝাপটালেও তার জ্ঞান তিনি আমাদেরকে প্রদান করেছেন।"[১৪]

'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فذكر بدء الخَلْقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ» رواه البخاري.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির সূচনা থেকে শুরু করে জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়া পর্যন্ত আলোচনা করলেন। যে তা মুখস্ত করার সে মুখস্ত করেছে এবং যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেছে।" [বর্ণনায় বুখারী][১৫]

[মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা]

আর দীনের ক্ষেত্রে যা উম্মতের জন্য উপকারী, তা যত ক্ষুদ্রই হোক তার সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ার পর এটা অসম্ভব যে, তিনি তাদেরকে এটা শিক্ষা দেননি যা তারা তাদের প্রভু, মাবূদ, বিশ্বজাহানের প্রভু সম্পর্কে মুখে বলবে এবং অন্তরে বিশ্বাস করবে। যার জ্ঞান হচ্ছে সকল জ্ঞানের শীর্ষে, যার ইবাদত হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত উদ্দেশ্য, যার নিকট পৌঁছানোই হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য। বরং

---

১৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২১৩৬১; বাযযার, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৩৮৯৭; ত্বাবারানী, আল-কাবীর (২/১৫৫), নং ৩১৯২। তবে মুসনাদে আহমাদের শব্দ হচ্ছে,
«لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا».
"অবশ্যই আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে ছেড়ে গেছেন যে, আকাশে কোনো পাখি তার দু' ডানা মেলে উড়ছে সেটার ব্যাপারেও আমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করেছেন।"

১৫. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩১৯২। হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও এসেছে, হাদীস নং ২৮৯১। উভয়ের শব্দ কাছাকাছি।

خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسكة من إيمان وحكمة، أن لا يكون [بيان] هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن [يكون] خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصين عنه.

[استحالة تقصير السلف في أصول الدين وفروعه]

ثم من المحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة. القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كانوا غير عالمين و[غير] قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع.

এটা নবীর দাওয়াতের সার এবং আসমানী রিসালাতের মাখন। সুতরাং যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমান ও হিকমত আছে সে কীভাবে কল্পনা করতে পারে যে, রাসূল থেকে সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ বিবরণ সংঘটিত হয়নি? অতঃপর যখন তার থেকে সেটা যথাযথভাবেই সুসম্পন্ন হয়েছে বলে সাব্যস্ত হলো, তাহলে এটা অসম্ভব যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং উৎকৃষ্ট প্রজন্ম সাহাবায়ে কিরাম এ অধ্যায়ে[১৬] অতিরিক্তকরণের মাধ্যমে বা ঘাটতিকরণের মাধ্যমে ত্রুটি করেছেন।

[সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারীদের পক্ষ থেকে দীনের মৌলিক নীতিমালা ও শাখা-প্রশাখাসমূহের বর্ণনায় ত্রুটি করা অসম্ভব]

অতঃপর এটাও অসম্ভব যে, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মগুলো, যে প্রজন্মের প্রথমটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে (সাহাবায়ে কিরাম), তারপর যারা তাদের সাথে সম্পৃক্ত (তাবে'য়ীনে 'ইযাম), তারপর যারা তাদের সাথে সম্পৃক্ত (তাবে তাবে'য়ীন)[১৭], তারা এমন হবে যে, তারা এ ব্যাপারে স্পষ্ট সত্য কিছু জানবে না এবং বলবে না; কেননা এর বিপরীতে হয় তাদের না জানা ও না-বলা অথবা সত্যের বিপরীত বিশ্বাস করা ও বলা। আর উভয়টিই নিষিদ্ধ।

---

১৬. অর্থাৎ আকীদাহ'র বিষয়ে সাধারণভাবে, আর বিশেষ করে আল্লাহর নাম ও গুণের অধ্যায়ে।

১৭. একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত, যাতে ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের প্রশংসা করা হয়েছে। তাদেরকে উত্তম প্রজন্ম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৬৫০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৫৩৫।
তিন উত্তম প্রজন্ম বলতে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র মত হচ্ছে, সাহাবী, তাবে'য়ী, তাবে তাবে'য়ীন উদ্দেশ্য। এ মতটি পোষণ করেছেন, নাওয়াওয়ী, আবুত তাইয়্যেব, হাফেয ইবন হাজার, ইবন বায রাহিমাহুমুল্লাহ। তবে তাবে'য়ী ও তাবে তাবে'য়ীদের ব্যাপারে অধিকাংশদের কথাই ধর্তব্য। বিস্তারিত দেখুন, সাখাওয়ীর আল-মাজমূ'উল মুগীস (২/৬৯৯); ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ (৪/৫১); ইবন মানযূর, লিসানুল 'আরব (১৩/৩৩৩); নাওয়াওয়ী, শারহু মুসলিম (১৬/৮৫); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৭/৫); আযীমাবাদী, আউনুল মা'বূদ (১২/৪১০); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৩৫৭)।

أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم، أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني: بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر.

وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات. أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضًا عن الله، وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنيا، والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟!

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها،

প্রথমটি এ কারণে নিষিদ্ধ যে, যার অন্তরে ইলমের জন্য সামান্য তলব ও স্পৃহা আছে বা ইবাদতের আগ্রহ আছে- এ বিষয়ে[১৮] অনুসন্ধান করা, এটার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা এবং এ ব্যাপারে সত্যটা জানা তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ও সর্বোচ্চ কাঙ্খিত বিষয় হবে। অর্থাৎ মহান রব্ব আল্লাহর ব্যাপারে কী বিশ্বাস থাকা উচিত, তবে রবের ধরণ বা তার গুণের স্বরূপ সম্পর্কে নয়। বস্তুত আল্লাহর ব্যাপারে জানার আগ্রহের চাইতে কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ কোনো বিশুদ্ধ আত্মার চাহিদা হতে পারে না।

আসলে এটি স্বভাবজাত[১৯] জ্ঞাত বিষয়। শক্তিশালী চাহিদা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে কীভাবে কল্পনা করতে পারে যে, সেই চাহিদা হতে ঐসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ[২০] তাদের সমগ্র যুগব্যাপী পিছিয়ে ছিলেন। এটা সংগঠিত হতে পারে না তার মধ্যেও যে সৃষ্টির সেরা নির্বোধ, তাদের মধ্যে আল্লাহ থেকে অধিক বিমুখ, দুনিয়া অর্জনে বেশি বোকা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে সবচেয়ে উদাসীন। তাহলে সালাফে সালেহীনের মধ্যে কীভাবে তা হতে পারে?

আর [দ্বিতীয়টি অর্থাৎ] তারা[২১] এ ব্যাপারে সত্যবিহীন বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলেন বা তার প্রবক্তা ছিলেন, এটা কোনো মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে না, আর না পারে ঐ সম্প্রদায়ের সম্পর্কে অবগত কোনো বুদ্ধিমান সেটা মেনে নিতে।

বস্তুত এ ব্যাপারে[২২] তাদের থেকে বর্ণিত কথা এ ব্যাপারে এতো বেশি যে, তা এ ফাতওয়া বা তার কয়েকগুণ কলেবরে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সেটা যে অনুসন্ধান ও

---

১৮. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে, তাঁর নাম-গুণের ব্যাপারে, তাঁর কর্মের ব্যাপারে জানার বিষয়ে।

১৯. স্বভাবজাত বলে, আল্লাহ তা'আলা মানব মনে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন তা বুঝানো হয়েছে। আরবীতে তা ফিত্বরী জ্ঞান বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এক প্রকার ফিত্বরী জ্ঞান দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সে তার রব্বকে চিনতে পারে, যার মাধ্যমে ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বুঝতে পারে। যদি তা বিভিন্ন কারণে তা পরিবর্তিত না হয়ে যায় তবে সেটা মানুষকে অনেক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যায়।

২০. অর্থাৎ সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী উত্তম প্রজন্মসমূহের সৎ লোকগণ।

২১. অর্থাৎ সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী উত্তম প্রজন্মসমূহের সৎ লোকগণ।

২২. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে, তাঁর নাম-গুণের ব্যাপারে, তাঁর কর্মের ব্যাপারে জানার বিষয়ে।

يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.

[طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم] : ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن. «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم».

[منشأ الخطأ عند من فضل طريقة الخلف على طريقة السلف] :

فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضّلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا

খোঁজ করবে সেই জানতে পারবে।

[সালাফে সালেহীনের নীতিই হচ্ছে অধিক নিরাপদ, অধিক জ্ঞানসমৃদ্ধ ও অধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ]

আর এটা জায়েয হতে পারে না যে, খালাফ[২৩] বা পরবর্তীরা সালাফ[২৪] বা পূর্ববর্তীদের থেকে বেশি অবগত, যেমনটি বলে থাকে পূর্ববর্তীদের মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত কোনো কোনো নির্বোধ[২৫]। বরং সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তার প্রতি বিশ্বাসীদের সম্পর্কেও প্রকৃত অবগতি অর্জন করেনি; যখন সে বলে, পূর্ববর্তীদের পথ ও পদ্ধতি অধিক নিরাপদ, আর পরবর্তীদের পদ্ধতি অধিকতর বিজ্ঞ ও সুদৃঢ়।[২৬]

[যারা খালাফ বা পরবর্তীদের পদ্ধতিকে সালাফ তথা পূর্ববর্তীদের পদ্ধতির ওপর প্রাধান্য দেয় তাদের ভুলের মূল উৎস]:

কেননা এসব বিদ'আতী যারা খালাফ তথা পরবর্তী লোক (দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদ) ও তাদের পদাঙ্ক অনুসারীদের পদ্ধতিকে সালাফ তথা পূর্ববর্তীদের তরীকার ওপর প্রাধান্য

---

২৩. খালাফ বলে সাধারণত আপেক্ষিকভাবে পরে আসা লোকদেরকে বুঝানো হয়। বিশেষ অর্থে কারও কারও মতে, যারা ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের পরে এসেছে তাদেরকে বুঝানো হবে। আবার কখনও কখনও পরবর্তী যারাই প্রথম তিন প্রজন্মের মতামতের বিরোধিতা করবে তাদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে।

২৪. সালাফ বলে সাধারণত আপেক্ষিকভাবে পূর্বসূরীদের বুঝানো হয়ে থাকে। বিশেষ অর্থে, প্রথম তিন প্রজন্মের লোকদেরকে সাধারণত বুঝানো হবে। অর্থাৎ সাহাবীগণের যুগ, তাবে'য়ীদের যুগ ও তাবে তাবে'য়ীনদের যুগ। আবার কারও কারও মতে এ শব্দটি কেবল সাহাবীগণের জন্য প্রযোজ্য। আবার গাযালীর মতে, কেবল সাহাবী ও তাবে'য়ীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে প্রথম মতটি বেশি প্রচলিত। আবার কখনও কখনও যারাই সাহাবায়ে কিরামের মানহাজ বা পথ ও পন্থা অনুযায়ী চলবে তাদেরকে সালাফ বা সালাফী বলা হবে, যদিও তারা অনেক পরে আগমন করুন না কেন।

২৫. আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায় যখন দেখলো যে, আল্লাহ তা'আলার নাম, গুণ ও কর্ম সংক্রান্ত সালাফে সালেহীনের বক্তব্য তাদের নেতৃবর্গের বক্তব্যের বিপরীত, তখন তারা বলতে লাগলো, সালাফ বা পূর্ববর্তীদের বক্তব্য ছিল অধিক নিরাপত্তা বলয়ে, কিন্তু খালাফ বা পরবর্তীদের বক্তব্য হচ্ছে অধিক জ্ঞানমার্গের। এখানে শাইখুল ইসলাম বিভিন্নভাবে তাদের এ বক্তব্য খণ্ডন করছেন।

২৬. এ বক্তব্যটি সাধারণভাবে কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আশ'আরী, মাতুরিদীদের মধ্যে এটির প্রচলন বেশি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ যুগ যুগ ধরে এ মিথ্যা বক্তব্যের খণ্ডনে বক্তব্য দিয়েছেন এবং যারা এ সর্বনাশা মিথ্যা বক্তব্যটি বলেছে তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন। এ বক্তব্যটি আমরা দেখতে পাই ইবন হাজার এর নিকট, ফাতহুল বারী (১৩/৩৫২); অনুরূপ যাবীদীর নিকট, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন (২/১১২); বাইজূরীর নিকট, শারহু জাওহারাতিত তাওহীদ, পৃ. ৯১। বস্তুত আশ'আরী ও মাতুরিদীরা যখন দেখল যে, তাদের বক্তব্য সালাফে সালেহীনের নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখনই তারা এ মিথ্যা বক্তব্যটি আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজেদের বিনষ্ট পণ্য প্রচার-প্রসারে নেমে পড়ে।

أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨] ، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.

[جمع المتكلمين بين الجهل والكذب] :

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل

দেয়, এ ভুলটি তাদের ওপর এভাবে এসেছে যে, তারা ধারণা করে: পূর্ববর্তী সালাফগণের তরীকা হচ্ছে নিছক কুরআন ও হাদীসের শব্দাবলির প্রতি ঈমান। (তাদের ধারণা অনুযায়ী) পূর্ববর্তী সালাফগণ কুরআন ও সুন্নাহ'র শব্দ পড়তো কিন্তু এগুলোর কোনো বুঝ-জ্ঞান তাদের ছিল না। (এদের মতানুযায়ী) পূর্ববর্তী সালাফগণ ছিলেন ঐসব উম্মী বা নিরক্ষর লোকদের অবস্থানে[২৭] যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة: ٧٨]

"আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা শুধু উচ্চারণ করে পড়া ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৭৮][২৮] আর পরবর্তী খালাফদের পদ্ধতি হচ্ছে: কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের এমন কিছু অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা; যেগুলো স্বীয় হাকীকত বর্জিত হয়ে বিভিন্ন রূপকার্থে[২৯] ও দুষ্প্রাপ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

[কালামশাস্ত্রবিদরা অজ্ঞতা ও মিথ্যাকে একসাথ করেছে]

এই বিনষ্ট ধারণা তাদেরকে উক্ত বক্তব্য দানে বাধ্য করেছে যার সারকথা হচ্ছে, ইসলামকে পিছনে ছুড়ে ফেলা। তারা পূর্ববর্তী সালাফদের পদ্ধতির ওপর মিথ্যারোপ করেছে আর পরবর্তী খালাফদের পদ্ধতি সঠিক বলার মাধ্যমে পথভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এভাবে

২৭. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাদের এসব মিথ্যা দাবিকে ছয়টি প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করেছেন। দেখুন, [মাজমু' ফাতাওয়া (৫/১৫৬-১৬৩)]

২৮. নিঃসন্দেহে তাদের এ ধারণা উম্মতের সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কিরামের ওপর মিথ্যা ও অপবাদ। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই গ্রহণ করেছেন। বরং তারা শব্দের চেয়েও অর্থের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন। তারা আগে অর্থ গ্রহণ করতেন তারপর শব্দ...।" [মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/৩৩৯)]

২৯. কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা যাবে কি না তা নির্ভর করছে রূপকের আশ্রয় নেয়ার কারণ উদ্ঘাটনের মাঝেই। যারা আল্লাহর নাম ও গুণের অর্থ করতে গিয়ে সমস্যা অনুভব করেছে, যারা মনে করেছে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করলে তো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য হওয়া আবশ্যক করে তাই এ সাদৃশ্য থেকে বাঁচার জন্য রূপক অর্থের দিকে ধাবিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহর নাম ও গুণ সাব্যস্ত করতে গেলে তাতে সাদৃশ্য এসে যায় এ দাবিটি অসত্য। এটা তাদের স্বল্প বুঝ ও অপরিপক্ক যুক্তির কারণেই হচ্ছে। কারণ স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সৃষ্টির অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে যেমন উভয়ের সাদৃশ্য হওয়া জরুরী হয় না, তেমনি স্রষ্টার নাম ও গুণ সাব্যস্ত করতে গেলেও তাতে সৃষ্টির অনুরূপ হওয়া জরুরী হয় না। কারণ সত্তা অনুযায়ী তার নাম ও গুণ হয়ে থাকে। সুতরাং যদি বলা হয়, এসব নাম ও গুণ স্রষ্টার জন্য যেভাবে উপযোগী সেভাবে সাব্যস্ত করা হবে তাহলে আর সমস্যা থাকে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র "আর-রিসালাহ আত-তাদমুরিয়্যাহ" দেখা যেতে পারে।

بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر .وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنًى. بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف. وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال السابقين الأولين،

তারা সালাফদের পদ্ধতির ব্যাপারে তাদের ওপর মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেছে আর পরবর্তী খালাফদের পদ্ধতিকে সঠিক বলার মাধ্যমে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিকে একত্রিত করেছে।

এর কারণ, তারা বিশ্বাস করে যে, মূলত কুরআন ও সুন্নাহ'র এসব নস বা ভাষ্য কোনো সিফাতের ওপর প্রমাণবহ নয়; কেননা তারা এসব ক্ষেত্রে ঐ খারাপ সন্দেহের মধ্যে নিপতিত যাতে তারা স্বীয় কাফের ভ্রাতৃবর্গের সাথে একাত্ম হয়েছে।[৩০] যখন তারা মূলতই সিফাতগুলো নাকচ হওয়ায় বিশ্বাসী হলো, আবার এসব নস বা ভাষ্যের অবশ্যই কোনো একটি অর্থ করতে হয়, তখন তারা দুটো অবস্থার মধ্যে দ্বিধাযুক্ত রয়ে গেল। প্রথমত: শব্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং অর্থকে (আল্লাহর কাছে) সোপর্দ করা। যার নাম দিয়েছে তারা পূর্ববর্তীদের তরীকা। দ্বিতীয়ত: শব্দকে কৃত্রিমতা অবলম্বন করে বিভিন্ন অর্থের দিকে সরিয়ে দেয়া, যাকে তারা নাম দিয়েছে পরবর্তীদের তরীকা। ফলে এই বাতিল চিন্তাটি (উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতি) বিনষ্ট যুক্তি (আক্বল) এবং কুরআন-হাদীসের শব্দ (যাকে পরিভাষায় সাম' বলা হয়) এর সাথে কুফরীর সমন্বয়ে জন্মলাভ করলো। কেননা আল্লাহর সিফাত নাকচ করার ক্ষেত্রে তারা কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করেছে। যেগুলোকে তারা ধারণা করেছে স্পষ্ট প্রমাণ অথচ তা কতিপয় সংশয়-সন্দেহ ছাড়া কিছুই নয়। আর কুরআন-হাদীসের শব্দ তথা সাম'ঈ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তারা সেসব কথাকে তার স্থান থেকে সরিয়ে বিকৃত করে দিয়েছে।

সুতরাং তাদের বিষয়টি যখন এই দুটি কুফরী মুকাদ্দিমাহ[৩১] বা ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল,

৩০. অর্থাৎ যেভাবে কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায় মনে করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এসব বাণীতে আল্লাহর গুণাবলি ও কর্ম সংক্রান্ত কোনো কিছু নেই। পরবর্তী লোকগুলোও এসব আয়াতকে আল্লাহর নাম, গুণ ও কর্ম সাব্যস্ত করে বলে মনে করছে না। তবে যেহেতু এ আয়াত ও হাদীসসমূহকে কেউ ভুল বুঝে আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করতে পারে, তাই তারা সেগুলোর দূরবর্তী অর্থ করে সেগুলোকে তার আসল অর্থ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে এমন কাজ আরম্ভ করলো। এটাই তাদের তথাকথিত তা'ওয়ীল।

৩১. দু'টি মিথ্যা ও কুফরী মুকাদ্দিমা হচ্ছে,
এক. সালাফগণের নীতি ছিল, শুধু কুরআন ও সুন্নাহ'র শব্দের ওপর ঈমান আনা, তারা অর্থ বুঝতো না, তারা নিরক্ষর লোকদের মতো ছিল। আর তা নিরাপদ নীতি।
দুই. খালাফদের নীতি হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ'র এসব ভাষ্যের বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে বিভিন্ন

واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قومًا أميين، بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون . لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين . الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول:

[الحيرة والشك من صفات المتكلمين]:

তখন তার (দু'টি) মারাত্মক সর্বনাশা নতীজা(৩২) বা ফলাফল বের হলো:

এক. প্রথম যুগের অগ্রবর্তীদেরকে (সালাফদেরকে) মূর্খ মনে করা, তাদের বোকা মনে করা এবং এ বিশ্বাস করা যে, তারা ছিলেন সাধারণ (আম) নেককারদের মধ্যকার নিরক্ষর সম্প্রদায়। আল্লাহ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের সাগরে ডুবতে পারেনি এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে পারেনি। [নাউযুবিল্লাহ]

দুই. মর্যাদাবান পরবর্তীরা (খালাফরা) এ সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় কৃতিত্বের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করেছেন। [নাউযুবিল্লাহ]

বস্তুত এ কথাটি কোনো মানুষ চিন্তা করলে তা চূড়ান্ত মূর্খতাসম্পন্ন দেখতে পাবে বরং চূড়ান্ত ভ্রষ্টতা তাতে দৃশ্যমান পাবে।

[খালাফ মূলত কারা?]

বিশেষ করে খালাফ বলে নিছক এক শ্রেণির কালামশাস্ত্রবিদদের বুঝানো হয়ে থাকে।

[তারা কীভাবে পূর্ববর্তীদের থেকে বেশি জানবে?]

[কালামশাস্ত্রবিদদের অন্যতম গুণ হচ্ছে অস্থিরতা ও সন্দেহে নিপতিত থাকা]

দীনের ক্ষেত্রে যাদের অস্থিরতাই বেশি, আল্লাহ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান অনেক পুরু পর্দার আবরণে ঢাকা, আর যাদের পদচারণার শেষ জায়গা এবং তাদের সর্বশেষ পরিণতি সম্পর্কে অবগত জনৈক পণ্ডিত বলেন:

[মুহাম্মাদ ইবন আবিল কাসিম আব্দুল কারীম আশ-শাহরাস্তানী(৩৩)র স্বীকৃতি]

প্রকার রূপক ও বিরল অর্থ খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করা। আর তা হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নীতি।

৩২. মুকাদ্দিমা ও নতীজা এ দু'টি মানতিক শাস্ত্রের পরিভাষা। তবে সাধারণত তা বুঝার জন্য যে উদাহরণটি পেশ করা হয় তা হচ্ছে, কেউ বললো, পৃথিবী ধ্বংসশীল এটা প্রমাণ কর। তখন অপরজন দু'টি মুকাদ্দিমা এনে এর ফল হিসেবে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে থাকেন, যেমন: পৃথিবী পরিবর্তনশীল, আর যা পরিবর্তনশীল তা ধ্বংসশীল, সুতরাং পৃথিবী ধ্বংসশীল।
মনে রাখতে হবে, ফলাফল তখনই বিশুদ্ধ হবে যখন মুকাদ্দিমা বা ভূমিকার বক্তব্য পুরোপুরি সত্য হবে। উপরে [মতন] এ বর্ণিত কালামশাস্ত্রবিদদের নীতিতে দু'টি মুকাদ্দিমাই ভুল, অজ্ঞতাপূর্ণ ও মিথ্যা ছিল। শাইখুল ইসলাম পরবর্তীতে তা খণ্ডন করেন।

৩৩. তিনি হচ্ছেন আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবন আবুল কাসিম আব্দুল কারীম আশ-শাহরাস্তানী। জন্ম

لعمري لقد طفتُ المعاهدَ كلَّها وسَيَّرتُ طَرْفي بين تلك المعالِمِ

فلم أرَ إلا واضعًا كفَّ حائرٍ على ذقَنٍ أو قارعًا سِنَّ نادمِ

وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم:

[اعتراف الرازي]

"আমার জীবন, আমি সকল শিক্ষালয় প্রদক্ষিণ করেছি এবং আমার দৃষ্টি চালিয়েছি ঐসব জ্ঞানকেন্দ্রের মাঝে।

আমি তো দেখতে পেয়েছি কেবল তাদেরকে থুতনীর নিচে হাত রেখে পেরেশান হয়ে থাকতে অথবা অনুশোচনাকারীর ন্যায় দাঁত কাটতে(৩৪)।"(৩৫)

আর তারাই স্বীয় কিতাবসমূহে এসবের বর্ণনা দিয়েছে, নিজেদের ওপর স্বীকৃতি দিয়েছে অন্যের কবিতাকে উদাহরণরূপে পেশ করে অথবা নিজে সেগুলো রচনা করে, যেমন তাদের এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য:

[ইমাম রাযী(৩৬)র স্বীকৃতি]

৪৭৯ হিজরী, মৃত্যু ৫৪৮ হিজরী। দার্শনিক, কালামশাস্ত্রবিদদের ইমাম, তুলানমূলক ধর্মের পথিকৃত ও দার্শনিকদের পথের পথিক, তাকে আল-আফদ্বাল লকব দেয়া হয়। জন্ম হয়েছিল শাহরাস্তানে, যা নাইসাপূর ও খাওয়ারিযম এর মাঝখানের একটি জায়গার নাম। তারপর ৫১০ হিজরীতে বাগদাদ গমন করেন, সেখানে তিন বছর অবস্থান করে নিজ দেশে ফিরে যান এবং সেখানেই মারা যান। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, নিহায়াতুল ইক্বদাম ফী ইলমিল কালাম, আল-ইরশাদ ইলা আকায়িদিল ইবাদ প্রমুখ। [যিরিকলী, আল-আ'লাম (৬/২১৫)]

৩৪. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ কবিতাদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন, সকল দুনিয়া ঘুরে সে সবশেষে দু'দল লোককে দেখেছে, একদল শুধু সন্দেহে দোদুল্যমান, আরেকদল একটি বিশ্বাস করে আবার পরক্ষণেই সেটার ভুল দেখা দেয়ায় লজ্জিত হয়ে পড়ে। প্রথম দলটিকে জাহেলে বাসীত (সাধারণ মূর্খ), আর দ্বিতীয় দলটি জাহেল মুরাক্কাব (গণ্ড মূর্খ) বলা যায়। [মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/২৭০)]

৩৫. এটি শাহরাস্তানী নিয়ে এসেছেন। দেখুন তার গ্রন্থ, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/১৭৩)। তিনি একজন বড় মাপের কালামশাস্ত্রবিদ ছিলেন। নিজে সারা জীবন যার পিছনে ছুটেছেন শেষ জীবনে সেটার অসারতা তুলে ধরেছেন। তার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ'র গ্রন্থ মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/২৬৯); দারউত তা'আরুদ্ব (১/১৫৯), (২/৩১৫), (৫/১৭৯), (৭/৪০৩); মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৫৭২), (৩৩/১৭২)।

এ দু'টি কবিতা শাহরাস্তানী আনয়ন করলেও এর প্রবক্তা সম্পর্কে কয়েকটি মত দেখা যায়:

কারও কারও মতে, তা আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন বাজাহ এর বক্তব্য।

কারও কারও মতে, তা শাহরাস্তানীর বক্তব্যই। যেমনটি ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী তার শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ গ্রন্থে বলেছেন। [শারহুত ত্বহাওয়িয়্যাহ (১/২৪৪)]

কারও কারও মতে, তা আবু আলী ইবন সীনার বক্তব্য। [ত্বাশ কুবরী যাদাহ, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ (১/২৯৯)]

আরও দেখা যেতে পারে, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/২৭৪); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (১/১৫৯); মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/২৭১); মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৭৩)।

৩৬. তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ইবন হাসান ইবনুল হুসাইন, আত-তাইমী, আল-বিকরী। আবু আব্দুল্লাহ, ফখরুদ্দীন আর-রাযী। জন্ম ৫৪৪ হিজরী, মৃত্যু ৬০৬ হিজরী। তাকে বলা হয় ইমাম, মুফাসসির, আক্বলী ও নকলী বিষয়ে তার সময়কার একক ব্যক্তিত্ব। বংশের দিক থেকে কুরাশী, মূল

نهاية إقدام العقول عقالُ ... وأكثر سعي العالمين ضلالُ

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وغاية دنيانا أذى ووبالُ

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

[لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه:٥]، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر:١٠] ، وأقرأ في النفي ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

"সকল বুদ্ধির সর্বশেষ পদক্ষেপ শৃঙ্খল বেষ্টিত আর জগদ্বাসীর অধিকাংশ প্রচেষ্টা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত।

আমাদের আত্মাসমূহ আমাদের দেহের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, আমাদের দুনিয়ার শেষ পরিণতি কষ্ট ও বিপদে পরিবেষ্টিত।

আমাদের সারা জীবনের গবেষণা থেকে কেবল এ উপকার-ই পেয়েছি যে, এ ক্ষেত্রে শুধু বলা হয়েছে ও বলা হলো, এসবই আমরা একত্রিত করেছি।"

অবশ্যই আমি কালামপদ্ধতি এবং দার্শনিকপন্থা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছি; কিন্তু যা পেয়েছি তা হচ্ছে এটি কোনো অসুস্থকে সুস্থ করতে পারে না এবং কোনো পিপাসার্তের পিপাসাও নিবারণ করতে পারে না। আর আমি কুরআনের তরীকাকে সবচেয়ে নিকটবর্তী তরীকা হিসেবে দেখেছি। ইসবাতের (সাব্যস্তকরণের) ক্ষেত্রে আমি পড়ি:

﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥]

"রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]

"তার দিকে ভালো কথা উত্থিত হয়" [সূরা ফাতির: ১০]

নফীর (নাকচকরণ) ক্ষেত্রে আমি পড়ি:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١]

"তাঁর মতো কিছুই নেই।" [সূরা আশ-শূরা: ১১]

অবস্থান ত্বাবারিস্তানে, তার জন্ম হয়েছিল রাই শহরে, রাই শহরের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তাকে রাযী বলা হয়। তাকে 'ইবন খতীব আর-রাই'ও বলা হয়। হিরাতে তার মৃত্যু হয়। তার জীবদ্দশাতেই লোকেরা তার গ্রন্থ পড়ার জন্য আগ্রহী ছিল। অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, যেমন, তাফসীর মাফাতীহ আল-গাইব, মা'আলিম ফী উসূলিদ দীন, মুহাসসালু আফকারিল মুতাকাদ্দিমীন, ওয়াল মুতাআখখেরীন মিনাল উলামায়ি ওয়াল হুকামায়ি ওয়াল মুতাকাল্লিমীন, আসাসুত তাক্বদীস, আল-মাত্বালিব আল-আলীয়া, আল-মাহসূল ফী ইলমিল উসূল, আস-সিররুল মাকতূম ফী মুখাত্বাবাতিন নজূম প্রভৃতি।

ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, তার গ্রন্থসমূহে ব্যাপক বালা-মুসিবত রয়েছে, জাদুবিদ্যা, সুন্নাহ'র বিরোধিতা রয়েছে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন; কারণ তিনি ভালো হয়ে মারা গিয়েছিলেন। গোপন বিষয়টি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম। মাযহাবের দিক থেকে তিনি শাফে'য়ী মাযহাবের, আকীদাহ'র দিক থেকে তিনি আশ'আরী মতবাদের। বলা হয়ে থাকে, শেষ জীবনে তিনি সালাফী আকীদায় ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন। [ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২১/৫০০)]

الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي].

[اعترافات إمام الحرمين الجويني]:

ويقول الآخر [منهم]: «لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة [منه] فالويل لفلان، وها أنا ذا

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]

"তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।" [সূরা ত্বা-হা: ১১০] আমার মতো জ্ঞান অভিজ্ঞতা যারা অর্জন করে তারা আমার মতো জানতে পারবে।[৩৭]

[ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী[৩৮]র স্বীকৃতি]

তাদের (দার্শনিক) অন্য একজন বলেছেন: "আমি তো বিশাল সাগরে ডুব দিয়েছিলাম। আর আমি ইসলামপন্থী ও তাদের জ্ঞানকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর তারা যেটা আমাকে নিষেধ করেছিল তাতে লিপ্ত হয়েছিলাম। আর এখন আমাকে যদি আমার রব স্বীয় রহমত

---

৩৭. ফখরুদ্দীন রাযী (মৃ. ৬০৬ হিজরী) তাঁর জীবনের শেষাংশে ৬০৪ হিজরীতে লিখিত 'রিসালাতু যাম্মি লাযযাতিদ দুনিয়া' পুস্তিকার উপসংহারে উক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। পুস্তিকাটি ব্রিল, লেইডেন থেকে প্রকাশিত Ayman Shihadeh, The Teleological Ethics of Fakhr al-Din al-Razi (Leiden, The Netherlands: Brill, 2006) গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত।
সুতরাং শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তার বক্তব্যে সত্যবাদী ছিলেন তা প্রমাণিত হলো।
তাছাড়া এ বক্তব্য বিখ্যাত কালামশাস্ত্রবিদ সুবুকী তার তাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৫/৪০) এ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে লিসানুদ্দীন ইবনুল খত্বীব (মৃ. ৭৭৬ হিজরী), তার আল-ইহাত্বাহ ফী আখবারি গারনাত্বাহ গ্রন্থে (২/২২২) তা সনদসহ রাযী থেকে বর্ণনা করেছেন।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, রাযী তার আকসামুল লাযযাত গ্রন্থে তা বলেছেন (মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৭৩); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৮/৫২৯-৫৩০); দারউত তা'আরুদ্ব (১/১৬০); মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/২৭১); মাজমূ' রাসায়িলিল কুবরা (১/৯৭, ১৮৫)।
অনুরূপ ইবনুল কাইয়্যেম বর্ণনা করেছেন তার ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ৩০৪।
ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/২৪৪)।
তাছাড়া ইবন খাল্লিকান তার ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/২৫০) গ্রন্থেও তা রাযীর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।
শাইখ ড. মুহাম্মাদ রাশাদ সালেম তার দারউত তা'আরুদ্ব (১/৬০) এর টীকায় বলেন, 'আকসামুল লাযযাত' গ্রন্থটি ভারতীয় কোনো এক লাইব্রেরিতে পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।
রাযীর বিস্তারিত অবস্থা জানতে পড়ুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র বক্তব্য, (মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৮; বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১২৯); মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/২৭২); ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৬৬৬)।

৩৮. তিনি হচ্ছেন আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ ইবন মুহাম্মাদ, আল-জুওয়াইনী, যার উপাধী ছিল ইমামুল হারামাইন, রুকনুদ্দীন। কুনিয়াত আবুল মা'আলী। পরবর্তীদের মধ্য বড় জ্ঞানী। শাফে'য়ী মাযহাবের লোক। জন্ম ৪১৯ হিজরীতে জুওয়াইন অঞ্চলে, যা নাইসাপূরে অবস্থিত। তারপর তিনি বাগদাদ সফর করেন, তারপর মক্কায়, সেখানে চার বছর অবস্থান করেন, তারপর মদীনা, সেখানে ফতোয়া ও দারস প্রদান করেন। তারপর তিনি নাইসাপূরে ফিরে আসেন, ওযীর নিযামুল মুলক তার জন্য নাইসাপূরে মাদরাসাতুন নিযামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তার দরসে বড় বড় আলেমগণ হাযির হতেন। তার গ্রন্থসমূহের অন্যতম হচ্ছে, গিয়াসুল উমাম ফিততাইয়াসিয যুলাম। আল-বুরহান ফী উসুলিল ফিকহ, আশ-শামেল, আল-ইরশাদ, ওয়ারাকাত, মুগীসুল খালক। তিনি নাইসাপূরে ৪৭৮ হিজরীতে মারা যান। [দেখুন, আল-আ'লাম (৪/১৬০)]

أموت على عقيدة أمي».

[قول الغزالي] : ويقول الآخر منهم: «أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام».

[استحالة أن يكون الخلف أعلم من السلف] : ثم [هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف] إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا

দ্বারা প্রতিকার না করেন তাহলে দুর্ভোগ অমুকের জন্য[৩৯], আর আমিতো মারা যাব আমার মায়ের[৪০] বিশ্বাসের ওপর।"[৪১]

[ইমাম গাযালী[৪২]র বক্তব্য]

তাদের আরেকজন বলেছেন: "মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সন্দেহে থাকে কালামশাস্ত্রবিদগণ।"[৪৩]

[খালাফ তথা পরবর্তী লোকেরা সালাফ তথা সাহাবী ও তাদের সুন্দর অনুসারীদের থেকে বেশি জানা অসম্ভব]

অতঃপর সালাফদের বিরোধী এসব কালামশাস্ত্রবিদদের বিষয়টি যখন নিশ্চিতভাবে পরীক্ষা করা হবে, তখন দেখা যাবে যে, তাদের নিকট আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান এবং নির্ভেজাল মা'রেফাতের ভালো কিছু নেই। আর না তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান ও মা'রেফাতের ছিটে

---

৩৯. অর্থাৎ তার নিজের জন্য।

৪০. 'মায়ের বিশ্বাস' বলার কারণ হচ্ছে, সাধারণত যারা ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত দীনের ওপর বড় হয়, তারা আল্লাহর ব্যাপারে সহীহ্ আকীদাহ্-বিশ্বাসে থাকেন। সাহাবায়ে কিরামের মতো স্বাভাবিক আল্লাহ্ প্রদত্ত আকীদাহ্ ধারণ করেন। তারা কালামশাস্ত্রের মতো নাপাক জিনিস দিয়ে নিজেদের আকীদাহ্-বিশ্বাসকে বিনষ্ট করেননি। [দেখুন, আল-মু'আল্লেমী, আত-তানকীল (২/২৩৩)]

৪১. আবুল মা'আলী আল-জুয়াইনী তা বলেছেন, যা ইমাম যাহাবী তাঁর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৪৭১) এ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া সুবুকী তা ইমামুল হারামাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ইয়্যাহ আল-কুবরা (৩/২৬০); ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব (৩/৩৬১)। আরও দেখা যায়, ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতাওয়া (৪/৭৩); মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/২৬৯)।

৪২. তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-গাযালী আত-ত্বূসী। আবু হামেদ, যাকে কবরপূজারীরা হুজ্জাতুল ইসলাম উপাধী দিয়ে থাকে। দার্শনিক, সূফী, উসূলী, তর্কবিদ। জন্ম ৪৫০ হিজরী, আর মৃত্যু হিজরী ৫০৫ সালে। জন্ম ও মৃত্যু উভয়টিই ত্বাবেরানে, যা খুরাসানের একটি এলাকা। তারপর তিনি নাইসাপুর যান, তারপর বাগদাদে, তারপর হিজায অঞ্চলে, তারপর শাম তারপর মিশর দেশে। তারপর তার দেশে ফিরে আসেন। 'যা' এর উপর তাশদীদ দিয়ে উচ্চারণ করলে তার সম্পর্ক হয় কাপড় বুনন শিল্পের দিকে, আর 'যা' এর উপর ফাতহা দিয়ে হালকা করে পড়লে সেটা তূস এলাকার একটি জায়গার নাম। আর এটাই বিশুদ্ধ। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, তাহাফুত আল-ফালাসিফাহ, আল-ইক্বতিসাদ ফিল ই'তিক্বাদ ইত্যাদি। প্রথম জীবনে দার্শনিকদের পথে চলেছেন, পরে কালামশাস্ত্রবিদদের পথে, পরে সূফীদের পথে, আর মৃত্যুর পূর্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর আকীদাহ্ অনুসারে চলে মারা যান। [যিরিকলী, আল-আ'লাম (৭/২২-২৩)]

৪৩. এ বর্ণনাটি ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র সরাসরি গাযালী থেকে বর্ণনা করেছেন। মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/২৮); নাক্বদুল মানত্বিক, পৃ. ২৫; অনুরূপ ইবনুল কাইয়্যেমও তা গাযালী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। [মাদারিজুস সালেকীন (৩/৪৩৭)]
গাযালী রাহিমাহুল্লাহ জীবনের শেষাংশে সহীহ্ আকীদাহ্ ও মানহাজের ওপর ফিরে এসেছিলেন। সর্বশেষে তিনি কালামশাস্ত্রের ব্যাপারে মানুষদের সাবধান করতেন। বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, জামে'উর রাসায়িল (১/১৬৯); যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৯/৩২৫-৩২৬)।

من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون: أعلم بالله وأسمائه وصفاته،

وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، [فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم]، وأحاطوا من حقائق المعارف، وبواطن الحقائق، بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.

ثم كيف يكون خير قرون الأمة، أنقص في العلم والحكمة. لا سيما العلم بالله وأحكام آياته

ফোটার অধিকারী হতে পেরেছে। তাহলে কীভাবে এসব পর্দাগ্রস্ত নীচু পশ্চাদপদ হতাশাগ্রস্ত দুর্বলেরা আল্লাহ এবং তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানবান হতে পারে? কীভাবে তারা আল্লাহর সত্তা ও তাঁর আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে তাদের থেকে অধিক মজবুত হবে যারা প্রথম যুগের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার এবং যারা সুন্দরভাবে তাদেরকে অনুসরণ করেছেন? যারা[৪৪] ছিলেন নবীদের উত্তরাধিকারী, রাসূলগণের খলীফা, হিদায়াতের তারকা, অন্ধকারের প্রদীপ। যাদের দ্বারা আল্লাহর কিতাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কিতাবের মাধ্যমে তারাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৫] কিতাব তাদেরকে নিয়ে কথা বলেছে এবং তারা কিতাব দ্বারা কথা বলেছেন। যাদেরকে আল্লাহ এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন যার মাধ্যমে তারা সকল নবীদের অনুসারীদের ওপর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঐসকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় তো আরও সুস্পষ্ট, যাদের কোনো কিতাব-ই নেই। আর তারা জ্ঞানের হাকীকত ও হাকীকতের গোপন বিষয় এতটা আয়ত্ত্ব করেছিলেন যে, যদি তুমি তার সাথে অন্যদের প্রজ্ঞা একত্রিত কর, তাহলে যে মোকাবেলা করতে চায় সে লজ্জিত হবে।[৪৬]

অতঃপর জাতির সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রজন্ম (সালাফগণ) কীভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ঐসব তুচ্ছ (খালাফ)দের থেকে বেশি ঘাটতিযুক্ত হতে পারে? বিশেষ করে আল্লাহ, তাঁর নাম ও আয়াতের বিধানের ব্যাপারে ঐসব তুচ্ছদের ক্ষেত্রে সালাফগণের দিক থেকে? আর কীভাবেই বা সেসব দার্শনিকদের বাচ্চারা[৪৭],

---

৪৪. অর্থাৎ সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারীগণ।

৪৫. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের প্রচার-প্রসার তাদের মাধ্যমেই হয়েছে, আর কিতাবও তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ হয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের ইলমের সাথে পরবর্তীদের ইলমের তুলনামূলক আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। সাহাবায়ে কিরামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা জগতের সকলের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চেয়ে বেশি ছিল।

৪৭. সাধারণত কালামশাস্ত্রবিদ মুসলিমরা দর্শনশাস্ত্র বলতে বুঝে, যা এরিস্টটল দিয়েছে, তারা তাকে প্রথম শিক্ষক বলে। তারা ফারাবীকে দ্বিতীয় শিক্ষক বলে। পক্ষান্তরে ইবন সীনাকে তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের নিকট যদি কেউ এ তিনজনকে না মানে তবে সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতে ঢুকতে পারেনি। নাউযুবিল্লাহ। অথচ তাদের মধ্যে এরিস্টটল তো কাফের মুশরিক ও মুলহিদ, তার কাছে পৃথিবী অবিনশ্বর। ইবন সীনা মনে করত আল্লাহর অস্তিত্ব কেবল নামমাত্র। তারা ফিরিশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, মনে করে তা কেবল নবীর কাল্পনাশক্তির ব্যবহার, কিতাব বলতে বুঝায় নবম

وأسمائه. من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان، وورثة المجوس والمشركين، وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟!.

ভারত[৪৮] ও গ্রীক[৪৯] এর অনুসারীরা, অগ্নি উপাসক[৫০] ও মুশরিকদের উত্তরাধিকারীরা,

---

গোলক থেকে যা উৎসারিত হয় তা। নবী বলতে বুঝায় যারা প্রচুর ধারণা ও খেয়ালের বশবর্তী হতে পারে। আখেরাত বলতে তাদের কাছে কিছু নেই। বিস্তারিত দেখুন, ইবন হাযম, আল-ফাসলু (১/৯৪); আশ-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল (২/৩৬৯-৫৩৮); রাযী, ই'তিক্বাদু ফিরাক্বিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৯১; ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান (২/২৫৬-২৬৮); হিদায়াতুল হায়ারা, পৃ. ৯; ইবন তাইমিয়্যাহ দারউত তা'আরুদ্ব (১/১২২); ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ; আন-নাশশার, আল-ফিকরুল ফালসাফী ফিল ইসলাম, পৃ. ১১-।

৪৮. ভারত বলতে বর্তমানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও বর্তমান ভারত সবটাকেই বুঝানো হচ্ছে। এই অঞ্চলকে ভারত, ইন্ডিয়া ও হিন্দুস্তান বলা হয়। এর কারণ অনুসন্ধানে অনেক মত এসেছে।

১- মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের নাম হিন্দ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে, হিন্দ ও সিন্দ দু'ভাই ছিলেন, যাদের পিতা ছিলেন বুওকীর, তার পিতা ইয়াক্বতিন, তার পিতা হাম, যিনি নূহ 'আলাইহিস সালামের সন্তান।

২- অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। যেমন,

(ক) পৌরাণিক যুগের সাগর বংশের সন্তান রাজা ভরতের নাম থেকে আমাদের দেশের নামটি এসেছে ভারত বা ভারতবর্ষ। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে, মহাসাগরের উত্তরে এবং বরফে ঢাকা পাহাড়ের দক্ষিণে অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত দেশের নাম ভারতবর্ষ এবং এই দেশের মানুষকে অভিহিত করা হয়েছে 'ভারতসন্ততি' রূপে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রিক লেখক হেরেডটাস-এর মতে ভারতের জনসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই কারণে ভারত নামের সঙ্গে বর্ষ শব্দটি যোগ করে দেয়া হয়।

(খ) ঐতিহাসিক ড. রামশরণ শর্মার মতে ভরত নামে এক প্রাচীন উপজাতির নাম অনুসারে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে।

(গ) কলিঙ্গ সম্রাট খারবেল-এর হস্তিগুম্ফা শিলালিপিতে 'ভারধবস' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় এবং এই নাম গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হয়েছিল।

(ঘ) প্রাচীন পারসিক লিপিতে 'সপ্ত সিন্ধু'কে বলা হয়েছে হপ্ত হিন্দু। সিন্ধু তীরবর্তী বসবাসকারী মানুষকে বিদেশীরা হিন্দু বলত এবং তার থেকেই হিন্দুস্তান কথাটি এসেছে। গ্রিকরা সিন্ধুকে বলত ইন্দাস (Indus) আর এই Indus কথাটি থেকে ইন্ডিয়া (INDIA) কথাটি এসেছে।

সে যাই হোক, ভারতবর্ষীয়রা তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। তাই সেখানে মানুষের চিন্তাজগতে অনেক কথাই আসবে। এ ব্যাপারে আমার পিএইচ.ডি থিসিসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া লিখিত "আল-হিন্দুসিয়্যাহ ওয়া তাআসসুরু বা'দিল ফিরাক্বিল ইসলামিয়্যাতি বিহা" গ্রন্থটি দেখা যায়।

হিন্দুস্তানের দর্শন মৌলিকভাবে ছয়টি যা ষড়দর্শন নামে খ্যাত। এগুলোর মধ্যে বেদান্ত দর্শন সারা দুনিয়ায় প্রভাব ফেলেছে। এ দর্শনেরই প্রতিফলন হচ্ছে, অহংবাদ, সোহংবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ যা আরবীতে হুলুল, ইত্তেহাদ ও ওয়াহদাতুল ওজুদ নামে খ্যাত হয়েছে। এসব দর্শন আরবী অনুবাদ হওয়ার পর ব্যাপকভাবে মানুষ তা দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে।

৪৯. গ্রীক কারা? আরবী ভাষায় তার নাম ইউনান, যার পূর্ব নাম ছিল 'হিলাস' বা আলাস, যা বর্তমানে ইউরোপের একটি রাষ্ট্র, যা বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণপার্শ্ব, যার উত্তর দিকে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া, পূর্বদিকে তুরস্ক, দক্ষিণ দিকে ভূমধ্য সাগর, আর পশ্চিমে গ্রীক সাগর। প্রাচীন এক সভ্যতার নাম। তারা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক বিভিন্ন নিদর্শন যেমন: সমুদ্র, সূর্য, চাঁদ, আলো ইত্যাদির পূজা করত। পরবর্তীতে তারা দর্শনের দিকে বেশি ঝুঁকে যায়। তাদের দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, থলেস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল। পরবর্তীতে সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রবেশ করে। বর্তমানে তারা ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে।

৫০. অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়, আরবীতে তাদেরকে মাজূস বলা হয়। কুরআনে কারীমে যেসব ধর্মের নাম

ইয়াহূদী[৫১] খ্রিস্টান[৫২] সাবেয়ী[৫৩] সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তরা এবং তাদের সমজাতীয় ও সমগোত্রীয়রা আল্লাহ সম্পর্কে নবীদের ওয়ারিশ কুরআনের অনুসারী ও ঈমানদারদের থেকে বেশি জ্ঞানী হতে পারে?[৫৪]

এসেছে এটি তার একটি। বলা হয়ে থাকে, তাদের নবী ছিল এবং কিতাবও ছিল। তাদের নবীর নাম তারা যরাদশত বলে থাকে, আর তাদের কিতাবের নাম আবেস্তা। বর্তমানে তাদের অবস্থার প্রচুর বিকৃতি ঘটেছে। তাদের কয়েকটি ফির্কা রয়েছে। যরথুস্ত্র, মুযদাক, খুররাম, মিসখিয়্যাহ, মানিয়্যাহ। তবে তাদের সংখ্যা অনেক কম, প্রভাব অনেক বেশি। ইরান ও ভারতে তাদের অবস্থান লক্ষণীয়। তাদের অধিকাংশই দু' ইলাহে বিশ্বাস করে, আলো ও অন্ধকার। যদিও উভয় ইলাহকে প্রাচীন বলে না, নূর প্রাচীন, অন্ধকার নবীন।

৫১. মূসা 'আলাইহিস সালামের উম্মতকে বর্তমানে ইয়াহূদী বলা হয়। তাদের গ্রন্থ তাওরাত। তাছাড়া তারা তালমূদ নামক গোপন গ্রন্থেরও অনুসরণ করে থাকে। বর্তমানে তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলে বসবাস করে। এরা দুনিয়ার সকল অপকর্মের হোতা। তাদের মাধ্যমে দুনিয়ার অশান্তি বিরাজিত।

৫২. এরা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে নিজেদের দাবি করে থাকে। তারা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। তাদের বর্তমান ফির্কাসমূহ হচ্ছে, ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ও অর্থোডক্স। এদের প্রতিটি ফির্কাই পথভ্রষ্ট।

৫৩. সাবেয়ী শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে এক দীন থেকে বের হয়ে অপর দীন গ্রহণকারী। তাদের আদি বাসস্থান হচ্ছে ইরাকের হাররান এলাকা, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন। তারা আকাশের তারকারাজির পূজা করত। তারা দু'ভাবে বিভক্ত; এক. তাওহীদবাদী সাবেয়ী, তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। দুই. মুশরিক সাবেয়ী, তারাই সংখ্যায় বেশি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা সাবেয়ী ধর্মের নাম বর্ণনা করেছেন।

এসব ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য তুলনামূলক ধর্মের ওপর আমার রচিত দু'টি গ্রন্থ দেখা যেতে পারে: ১- তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত। ২- বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহ, যা বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট ফর ইসলামিক থট কর্তৃক প্রকাশিত।

৫৪. শাইখুল ইসলাম কর্তৃক কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্য 'সালাফদের পদ্ধতি নিরাপদ, খালাফদের পদ্ধতি জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ' এর খণ্ডন করে যা বর্ণনা করেছেন তা এখানে সমাপ্ত হয়েছে। যদি কারও এর চেয়ে বেশি খণ্ডন জানার ইচ্ছা করে তবে শাইখুল ইসলামের গ্রন্থ 'মাজমূ' ফাতাওয়া' এর (৪/১৫৭), (৫/১৫৬) ও তার পরবর্তী অংশ, দারউত তা'আরুদ্ব (৫/৩৭৮) ও তার পরবর্তী অংশ দেখা যেতে পারে। তাছাড়া ইমাম ইবন রাজাব আল-হাম্বলী এ ব্যাপারে একটি আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন, বায়ানু ফাদ্বলি ইলমিস সালাফি আলা ইলমিল খালাফি।

[سبب ضلال كثير من المتأخرين]:

وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. وعلم أن الضلال والتهوّك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإعراضهم عما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من البيّنات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدًا، وإنما أصف نوع هؤلاء، ونوع هؤلاء.

[أدلة علو الله على خلقه]:

[পরবর্তী তথা খালাফদের অনেকের পথভ্রষ্টতার কারণ]

আমি এই মুকাদ্দমা (পূর্বকথা) আগে এনেছি এই কারণে যে, যার কাছে এই মুকাদ্দামা স্বীকৃত হবে সে জানতে পারবে এ ক্ষেত্রে এবং অন্য ক্ষেত্রে হিদায়াতের পথ কোথায়? সে আরও জানতে পারবে যে, ভ্রষ্টতা-বিভ্রান্তি, অযথা ক্লান্তি পরবর্তী অনেকের ওপর চড়াও হয়েছে কেবল এই কারণে যে, তারা আল্লাহর কিতাব পশ্চাতে ফেলে রেখেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি যে সঠিক পথ ও দলীলাদি দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে।[৫৫] সালাফ[৫৬]দের ও তাদের অনুসারীদের তরীকা অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহকে জানার জ্ঞান তারা এমন লোকদের কাছে অনুসন্ধান করেছে যাদের কাছে আল্লাহ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই,[৫৭] (আল্লাহ সম্পর্কে তাদের কাছে) সে জ্ঞান না থাকার কথাটি তাদেরই স্বীকৃতি, উম্মতের সাক্ষীর মাধ্যমে এবং আরও অনেকে প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।[৫৮]

আমি নির্দিষ্ট একজনকে উদ্দেশ্য করিনি, আমিতো এদের প্রকার ও ওদের প্রকার বর্ণনা করছি।

[আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির উপরে থাকার প্রমাণসমূহ[৫৯]]

---

৫৫. আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রাখার কারণেই পূর্ববর্তী উম্মতরাও পথভ্রষ্ট হয়েছিল। এ উম্মতের অবস্থাও তাই। উদাহরণ দেখা যেতে পারে, সূরা আল-বাকারাহ: ৯১, ১০১; সূরা আলে ইমরান: ১৮৭।

৫৬. সালাফ বলতে সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী তাদের সুন্দর অনুসারী সকলকেই বুঝানো হয়েছে।

৫৭. কারণ আল্লাহর জ্ঞান কেবল ওহীর মাধ্যমেই লাভ করা যায়। ওহী নবী-রাসূলদের কাছেই আসত, আর যারা নবী রাসূলদের আসল অনুসারী তারাই সে ইলমের ধারক ও বাহক। তাই অন্যদের কাছে আল্লাহর জ্ঞান কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব না।

৫৮. ইতোপূর্বে তা গাযালী, রাযী, শাহরাস্তানীসহ অনেকের বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

৫৯. এ ব্যাপারে আমার রচিত "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।
তাছাড়া বিষয়টি এত বেশি প্রকাশ্য ও প্রামাণ্য যে, শাফে'য়ী মাযহাবের বড় এক আলেম বলেন, কুরআনে কারীমে এর ওপর এক হাজার বা তারও বেশি প্রমাণাদি রয়েছে, যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে এবং তিনি তাঁর বান্দাদের ঊর্ধ্বে।
অপর কারও মতে, কুরআনে কারীমে এর ওপর তিনশত প্রমাণ রয়েছে।

[دلالة القرآن على علو الله] :

وإذا كان كذلك: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء، وعليٌّ على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران:٥٥] ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ - أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾[الملك:١٦-١٧]، ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ

[কুরআনে কারীম থেকে প্রমাণাদি যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে]

আর যখন ব্যাপারটি তেমনি হলো, তাহলে [আমরা বলছি যে,] আল্লাহর কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং রাসূলের সুন্নাত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, অতঃপর সাহাবী-তাবে'য়ীদের সকল কথা এবং ইমামদের সকল বাণী, সবটাই পরিপূর্ণ এমন জিনিস দ্বারা যা হয় নস[৬০] অথবা যাহির[৬১] এ ক্ষেত্রে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সবকিছুর উপরে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি 'আরশের উপরে, আসমানের উপরে।[৬২] যেমন তাঁর বাণী:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠]

"তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায় এবং সৎকাজ, তিনি তা উপরে উঠিয়ে নেন।" [সূরা ফাতির: ১০] ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [ال عمران: ٥٥] "নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব, আমার দিকে আপনাকে উঠিয়ে নিব।" [সূরা আলে ইমরান: ৫৫]

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ [الملك: ١٦، ١٧]

"তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানের উপর রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থরথর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, আসমানের উপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন?" [সূরা আল-মুলক: ১৬-১৭]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির উপরে থাকা এবং উপরে উঠার বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সংখ্যা হাজারের মতো। যার ওপর সকল রাসূল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একমত হয়েছেন। [আস সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (১/৩৬৮)]

অনুরূপভাবে তিনি তার ইজতিমা'উল জুয়ূশ (পৃ. ৩৩১) গ্রন্থের শেষে বলেন, যদি আমি চাই তো এ মাসআলাতে এক হাজার দলীল নিয়ে আসতে পারব।

৬০. নস দ্বারা বুঝায় এমন বাক্য যা কেবল একটি অর্থই প্রদান করে, যাতে অন্য অর্থ করার সম্ভাবনা বা সুযোগ নেই।

৬১. যাহির দ্বারা বুঝায় এমন বাক্য যাতে দু'টি অর্থ হতে পারে, তবে তন্মধ্যে একটি অপরটি থেকে বেশি প্রকাশ্য; যেটি বেশি প্রকাশ্য তা-ই যাহির।

৬২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সবকিছুর উপরে থাকার বিষয়টি সাব্যস্ত করার জন্য কোনো তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া লাগে না। তা মুহকাম আয়াত-হাদীস, নস আয়াত-হাদীস ও যাহির আয়াত-হাদীস দ্বারাই সাব্যস্ত করা হবে।

إِلَيْهِ﴾[النساء:١٥٨] ، ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ [المعارج﴾:٤]، ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة:٥]، ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ [النحل:٥٠]، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس:٣] ، في ستة مواضع، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي

﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ﴾ [النساء: ١٥٨]

“বরং আল্লাহ তাকে তাঁর দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।” [সূরা আন-নিসা: ১৫৮]

﴿تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ﴾ [المعارج: ٤]

“ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।” [সূরা আল-মা'আরিজ: ০৪]

﴿يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ﴾ [السجدة: ٥]

“তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে।” [সূরা আস-সাজদাহ: ০৫] ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ﴾ [النحل: ٥٠]

“তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ তাদের রবকে।” [সূরা আন-নাহল: ৫০]

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ﴾ [يونس: ٣]

“তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন।” [সূরা ইউনুস: ০৩; সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪] (সূরা আর-রা'দ: ০২; সূরা আল-ফুরক্বান: ৫৯; সূরা আস-সাজদাহ: ০৪; সূরা আল-হাদীদ: ০৪) এই ছয় জায়গায়।

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥]

“রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন।” [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

﴿يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَٰبَ ۝٣٦ أَسۡبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبٗاۚ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧]

“হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই- আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।” [সূরা গাফির: ৩৬-৩৭][৬৩]

﴿تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ﴾ [فصلت: ٤٢]

৬৩. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, দুনিয়ার মানুষের সামনে যখন ফির'আউন কর্তৃক মূসার ওপর মিথ্যারোপ করার ঘটনা বর্ণনা করা হয় তখন তারা হয় মুহাম্মাদী-মূসাওয়ী হবে নতুবা তারা হবে ফির'আওনী। যখন মূসা বলেছিলেন, তার রব্ব আল্লাহ উপরে, যখন মূসা বলেছিলেন, তার রব্ব তার সাথে কথা বলেছেন, যখন মূসা বলেছিলেন, তার একজন সৃষ্টিকর্তা আছে, তখন দুনিয়ার মানুষ হয় তাকে অনুসরণ করে সত্যায়ন করবে অথবা ফির'আউনকে অনুসরণ করে মূসার ওপর মিথ্যারোপ করবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত তিনটি বিষয়েই মূসা 'আলাইহিস সালামকে সত্যায়ন করেছেন। [মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৩৫১)]

﴿لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر:٣٦-٣٧]، ﴿تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت:٤٢]، ﴿مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام:١١٤]. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.

[تواتر أدلة السنة على إثبات صفة العلو] :

وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون

"এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪২]

﴿أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الانعام: ١١٤]

"নিশ্চয় এটা আপনার রবের কাছ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত।" [সূরা আল-আন'আম: ১১৪] ইত্যাদি আরও অনেক যেগুলো কষ্ট ব্যতিরেকে গণনা করা যায় না।

[রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থেকে মুতাওয়াতির তথা নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে সন্দেহাতীত বর্ণনা দ্বারা "আল্লাহর সত্তাগতভাবে সর্বোচ্চে থাকা" গুণটি প্রমাণিত]

তেমনি রয়েছে অসংখ্য সহীহ(৬৪) ও হাসান(৬৫) হাদীস যা কষ্ট ছাড়া গণনা করা যায় না। যেমন, রাসূলের স্বীয় রবের দিকে উত্থিত হওয়ার মি'রাজের কাহিনী(৬৬), আল্লাহর নিকট থেকে ফিরিশতাদের অবতরণ করা, তাঁর দিকে তাদের আরোহন করা(৬৭), দিনে-রাতে ফিরিশতাদের পরপর তোমাদের মাঝ থেকে অবস্থানের পর উঠা-নামা করা, যারা তোমাদের সাথে ছিল তারা তোমাদের থেকে বের হয়ে উঠে যাওয়া এবং তাদেরকে আল্লাহর জিজ্ঞাসাবাদ, যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে ভালো জানেন(৬৮), অনুরূপ খারেজী(৬৯)দের

---

৬৪. সহীহ হাদীস বলতে বুঝায়, যে হাদীসের সনদ সংযুক্ত, বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন, সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকবে, আর তার সনদ ও মতন শায বা বিরল ও প্রচ্ছন্ন ত্রুটিপূর্ণতা থেকে মুক্ত থাকবে। [তাদরীবুর রাওয়ী (১/৬৩)]

৬৫. হাসান হাদীস বলতে বুঝায়, যে হাদীসের সনদ সংযুক্ত, বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ, স্বল্প ধীশক্তিসম্পন্ন, সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকবে, আর তার সনদ ও মতন শায বা বিরল ও প্রচ্ছন্ন ত্রুটিপূর্ণতা থেকে মুক্ত থাকবে। [তাদরীবুর রাওয়ী (১/১৫৯)]

৬৬. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৪৯; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৬৩; আবু যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত।

৬৭. অনুরূপ হাদীস আমরা দেখি, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৬৯০; অনুরূপ, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৬৪০৮।

৬৮. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৫৫৫, ৩২২৩, ৭৪২৯, ৭৪৮৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৬৩২; আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত।

৬৯. খারেজীদের সম্পর্কে জানার জন্য আমার 'ফিরাক বিশ্বকোষ' দেখা যেতে পারে। সাধারণত খারেজী বলতে বুঝায়, যাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সমাহার ঘটে:

১- সকল কবিরা গুনাহের কারণে কাফের বলা।

২- রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে কবীরা গোনাহের কারণে বিদ্রোহ করা বা বিদ্রোহের জন্য সর্বদা লেগে থাকা।

৩- বয়সে নবীন ও আক্বল-বুদ্ধিতে কম থাকা।

৪- মুসলিমদের মধ্যে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে হত্যার নীতি চালু করা।

৫- ফিকহের ক্ষেত্রে দুর্বল থাকা। অর্থাৎ গভীর জ্ঞান না থাকা, ভাসা ভাসা নলেজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া।

[فيكم] بالليل والنهار، فيخرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً». وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من

ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস:

«أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً».

"তোমরা কি আমাকে আমানতদার মানবে না, অথচ আসমানের উপর যিনি আছেন আমি তাঁর পক্ষ থেকে আমানতদার। আমার কাছে সকাল বিকাল আসমানের খবর আসে?"(৭০)

ঝাড়ফুঁকের হাদীস যেটি আবু দাউদ(৭১) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন:

«رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ»

"হে আমাদের রব্ব, যিনি আসমানের উপরে রয়েছেন, আল্লাহ! আপনার নাম অতীব পবিত্র, আপনার যাবতীয় নির্দেশ আসমান-যমীনে কার্যকর। আপনার রহমত যেমন আকাশে বিদ্যমান, তেমন যমীনেও রহমত বর্ষণ করুন! আমাদের পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্র বান্দাদের রব, আপনার দয়া থেকে দয়া বর্ষণ করুন এবং এ রোগের জন্য আপনার আরোগ্য ব্যবস্থা থেকে রোগমুক্তি দিন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

৬- অপরের ওপর ইসলাম কায়েমের জন্য ব্যস্ত থাকা।
৭- দীনী কর্মকাণ্ডের সময় প্রাধান্য দেয়ার নীতির ব্যাপারে অন্ধ থাকা।
৮- বড় বড় আলেমগণের মতের বিরোধিতা করা ও তাদেরকে খারাপ গুণ যথা মুরজিয়া, দরবারী ইত্যাদি বলা।
৯- নফল কাজের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করা।
১০- জিহাদের আয়াত ও হাদীসকে নিঃশর্তভাবে বাস্তবায়নের কথা বলা।

৭০. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৮৯২; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০৬৪; আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস।

৭১. তিনি হচ্ছেন, আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস ইবন শাদ্দাদ ইবন 'আমর ইবন আমের আল-আযদী আস-সিজিস্তানী। তার কিতাবুস সুনান দ্বারা তিনি সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত। জন্ম ২০২ হিজরী, মৃত্যু ২৭৫ হিজরী।
তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সালাফে সালেহীনের মতাদর্শে ছিলেন, সুন্নাহ'র অনুসরণ ও তার প্রতি আত্মসমর্পনে অসাধারণ। কালামশাস্ত্র নিয়ে কথা বলা ত্যাগ করতেন।
আবু হাতেম বলেন, 'আবু দাউদ হচ্ছে দুনিয়ার ইমামগণের একজন, যারা ফিকহ, ইলম, হিফয, ইবাদত, পরহেযগারী ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে তিনিই ইমাম। হাদীস একত্রিত করেছেন, গ্রন্থ লিখেছেন এবং সুনান ও হাদীস থেকে প্রতিরোধ করেছেন।
দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৪/১০১); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৯/৫৫); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (২/৪০৪); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৫৯১); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২০৩)।

شفائك على هذا الوجع». قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتكى أحد منكم، أو اشتكى أخ له، فليقل: ربنا الله الذي في السماء ... » وذكره. وقوله في حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه». رواه أبو داود. [وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود، وابن ماجه، والترمذي، وغيرهم،

«إذا اشتكى أحد منكم، أو اشتكى أخ له، فليقل: ربنا الله الذي في السماء ... »

"তোমাদের কেউ অসুস্থ হলে বা তার ভাই অসুস্থ হলে সে যেন বলে: হে আমাদের রব্ব আল্লাহ, যিনি আসমানের উপর রয়েছেন........।"[৭২] এরপর রাসূল তা উল্লেখ করেন।

অনুরূপ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও অন্যান্যদের বর্ণিত (আও'আল বা) শিং বিশিষ্ট পাহাড়ী ছাগল সংক্রান্ত হাদীসে এসেছে:

«والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه»

"আর তার উপরে 'আরশ। আর আল্লাহ 'আরশের উপরে। তিনি তোমাদের অবস্থা জানেন।"[৭৩]

আর এ হাদীসটি সুনান গ্রন্থকারগণ[৭৪] বর্ণনা করেছেন, যেমন আবু দাউদ, ইবন মাজাহ[৭৫], তিরমিযী[৭৬] ও অন্যান্যগণ।

---

৭২. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৮৯২; নাসা'য়ী, আল-কুবরা, হাদীস নং ১০৮৭৪; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং ১০৩৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৩৯৫৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/৪৯৪), (৪/২৪৩)।

৭৩. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৭২৩; তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৩২০; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৯৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭৭০; ইবন আবী আসেম (১/২৫৪), নং ৫৭৮; ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, পৃ. ৫৫; ইবন খুযাইমাহ আত-তাওহীদ (১/৩৩৪); আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যহ, পৃ. ২৪; আজুররী, আশ-শরী'আহ ২৯২; আল-লালেকা'ঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ (৩/৩৯০), নং ৬৫১; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/২৮৭, ৫০০); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৪২); আল-উক্বাইলী, আদ-দু'আফা (২/২৮৪); ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৪০); আবু নু'আইম, আখবারু আসবাহান (২/২); মিযযী, তাহযীবুল কামাল (২/৭১৯); আবুল আলা আল-হামাযানী, যিকরুল ই'তিক্বাদ ও যাম্মুল ইখতিলাফ, পৃ. ৬৭-৬৮, নং ১৯; ইবনুল জাওযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ (১/৮); মুনযিরী, মুখতাসারুস সুনান (৭/৯৩)।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ হাদীসটিকে বিস্তারিত গবেষণার পর হাসান বলেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৩৯, ১৯২)। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমও তার শাইখের অনুসরণ করেছেন।

৭৪. সুনান গ্রন্থকারগণ বলতে ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ এর সুন্নাহ গ্রন্থসমূহকে বুঝানো হয়।

৭৫. তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ, আবু আব্দুল্লাহ ইবন মাজাহ আল-ক্বাযওয়ীনী। আল-ইমাম, আল-হাফেয। সুনান গ্রন্থকারদের একজন। জন্ম হিজরী ২০৯ সালে এবং মৃত্যু ২৭৩ হিজরী সালে। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, ইবন মাজাহ ছিলেন হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধির সমালোচক, সত্যবাদী ও প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী।
দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/২৭৯); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২/৫১); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৯/৫৩০); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/১)।

৭৬. তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরাহ আত-তিরমিযী, ইমাম, হাফেয। তিনি তার আল-জামে'উস সহীহ এর জন্য সমধিক পরিচিত যা সুনান আত-তিরমিযী নামে খ্যাত।

فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

বস্তুত হাদীসটি দু'টি বিখ্যাত ত্বরীকায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কোনো এক ত্বরীকার বর্ণনায় দোষ হওয়ার দ্বারা অপর ত্বরীকায় দোষ আসবে না। কারণ হাদীসটি ইমামুল আয়িম্মাহ ইবন খুযাইমাহ(৭৭) তাঁর কিতাবুত তাওহীদে(৭৮) বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি শর্ত রেখেছিলেন যে, তাতে তিনি কেবল ন্যায়পরায়ণ কর্তৃক ন্যায়পরায়ণের মাধ্যম হয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকর্তিত সূত্রে এসেছে, তাই কেবল নিয়ে আসবেন।(৭৯)

ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, আবু 'ঈসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস জমা করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংরক্ষণ করেছেন, আলোচনা করেছেন।

দেখুন, ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৬৩৩); আল-ইবার (২/৬); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭০); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১১/৬৬); তাহযীবুত তাহযীব (৯/৩৮৭)।

৭৭. তিনি হচ্ছেন, আল-ইমাম, আল-হাফেয, আল-হুজ্জাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইসহাক আবু বকর আস-সুলামী আন-নাইসাপূরী আশ-শাফে'য়ী। আহলুস সুন্নাহ'র ইমাম। তার কিতাব আত-তাওহীদ সেটার ওপর প্রমাণবহ।

তিনি তার সময়কার মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেমন আলী ইবন হুজর, আহমাদ ইবন মানী', মুহাম্মাদ ইবন বাশশার প্রমুখ। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখ।

হাফেয আবু আলী আন-নাইসাপূরী বলেন, আমি ইবন খুযাইমার মতো বড় কাউকে দেখিনি। ইমাম যাহাবী তার ওপর টীকা দিয়ে বলেন, তিনি এমন কথা বললেন, অথচ তিনি তো নাসায়ীকেও দেখেছেন (অর্থাৎ তাহলে তিনি নাসায়ী থেকেও উত্তম)।

ইমাম দারা কুতনী বলেন, ইবন খুযাইমাহ ইমাম, প্রামাণ্য, তার দৃষ্টান্ত নেই। হাকেম বলেন, ইমামুল আয়িম্মাহ ইবন খুযাইমার ফযীলত আমার কাছে বেশ কিছু কাগজে লেখা আছে।

ইবন সুরাইজ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে খুটিয়ে খুটিয়ে নুকতা ও ফায়েদা বের করতেন। তার জন্ম হিজরী ২২৩ সালে। আর মৃত্যু হিজরী ৩১১ সালে।

তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ১৪০টির উপরে। তার উপরে রয়েছে মাসায়িল। সেটাও শত খণ্ডে। ইবন খুযাইমার প্রতি মানুষের বড় উঁচু ধারণা সর্বদা ছিল। লোকদের অন্তরে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ, ইলম ও দীনের কারণে সর্বদা সম্মান ও মর্যাদা বহমান।

দেখুন, ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৭২০); আল-ইবার (২/১৪৯); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/৩৬৫); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/২৬২)।

৭৮. এটি অনেক মর্যাদাবান একটি গ্রন্থ। ইমামগণ সবাই এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এ কিতাবের পূর্ণনাম 'কিতাবুত তাওহীদ ওয়া ইসবাতু সিফাতির রাব্বি আয্যা ওয়া জাল্লা।

৭৯. ইমাম ইবন খুযাইমাহ এ শর্তটি তাঁর কিতাবুত তাওহীদের শুরুতে (১/১১) উল্লেখ করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদীসটি হাদীসুল আও'আল নামে বিখ্যাত। হাদীসটির মূল ভাষ্য হচ্ছে,

عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِيهِمْ، إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوا إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذِهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، هَذَا السَّحَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْمُزْنُ؟» قَالُوا: وَالْمُزْنُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْعَنَانُ؟» قَالُوا: وَالْعَنَانُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟» قَالُوا: لَا، وَاللهِ مَا نَدْرِي، قَالَ: «فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ، وَإِمَّا اثْنَتَانِ، أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ، حَتَّى عَدَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ كَذَلِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «فَوْقَ السَّمَاءِ

وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها، فإنها مؤمنة.

وقوله في الحديث الصحيح: «إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي».

অন্য হাদীসে তিনি যে ক্রীতদাসীকে বললেন:

«أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

"আল্লাহ কোথায়? সে বলল: আসমানের উপরে। তিনি বললেন: আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: তাকে মুক্ত করে দাও; কেননা সে ঈমানদার।"(৮০)

অন্য হাদীসে তিনি বলেন: «إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي» "আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে 'আরশের উপরে তার নিকটে একটি কিতাবে লিখে দিলেন: নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধের অগ্রগামী হয়েছে।"(৮১)

তেমনি রূহ কবজের হাদীসে তিনি বলেন: «حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله» "অবশেষে তাকে নিয়ে আসমানের উপর উঠে যায়, যেখানে আল্লাহ আছেন।"(৮২)

السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوْقَ ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ»

"আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব বলেন, তিনি বাতহায় একদল লোকসহ বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে বসা ছিলেন, এমন সময় সেখানে তাদের উপর দিয়ে একখণ্ড মেঘমালা চলে যায়। তারা সবাই সেটার দিকে তাকায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান এটার নাম কী? তারা বললো, হ্যাঁ, এটা তো আস-সাহাব (মেঘমালা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল-মুযন? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল-মুযন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল-'আনান। তারাও বললেন, আল-'আনান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা কি জান, আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্ব কত? তারা বললো, না, আল্লাহর শপথ, আমরা জানি না। রাসূল বললেন, এ দু'য়ের দূরত্ব হয় এক, বা দুই, বা তিন ও সত্তর বছরের দূরত্ব। আসমান থেকে তার উপরের আসমানের দূরত্ব অনুরূপ, এভাবে তিনি সাত আসমান গণনা করলেন। তারপর বললেন, সাত আসমানের উপর একটি সমুদ্র আছে যার উপর ও নিচের দূরত্ব আসমান ও আসমানের দূরত্বের মতো। তার উপর রয়েছে আটটি পাহাড়ী ছাগল, যার ক্ষুর ও হাঁটুর মাঝের দূরত্ব হবে আসমান ও আসমানের মাঝখানের দূরত্ব। তারপর তাদের পিঠের উপর রয়েছে 'আরশ। তার নিচ ও উপরের মাঝখানে আসমান ও আসমানের দূরত্ব, আর আল্লাহ তার উপরে।" [তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৩২০]

ইবনুল আসীর আন নিহায়া গ্রন্থে বলেন, 'আও'আল' বলে ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আটজন ফিরিশতা যাদের চেহারা-সূরত পাহাড়ী ছাগলের মতো। মুবারকপুরী বলেন, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ 'আরশের উপর। এটিই হক ও সত্য। কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস এর ওপরই প্রমাণবহ। আর এটিই সালাফে সালেহীনের মাযহাব, সাহাবী, তাবে'য়ী ও অন্যান্য ইলমের অধিকারীগণের মত, আল্লাহ তাদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন। [তুহফাতুল আহওয়াযী (৯/১৬৫)]

৮০. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৫৩৭; মু'আওয়িয়াহ ইবনুল হিকাম আস-সুলামী বর্ণিত হাদীস।

৮১. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৪৭০৭; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৭৫১।

৮২. একটি বড় হাদীসের অংশ যা বর্ণনা করেছেন ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২৬৩; আহমাদ, হাদীস নং

وقوله في حديث قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله» إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأقره عليه:

شهدتُ بأن وعدَ الله حق ... وأنَّ النار مثوى الكافرينا

وأن العرش فوق الماء طافٍ ... وفوق العرش رب العالمينا

وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال: «آمن شعره وكفر قلبه» :

مجدوا الله فهو للمجد أهل ... ربنا في السماء أمسى كبيرا

بالبنا الأعلى الذي سبق الناس ... وسوى فوق السماء سريرا

شرجعًا ما يناله بصر العين ... يرى دونه الملائكة صورا

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর কবিতা যেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন:

"আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং জাহান্নাম কাফেরদের আবাসস্থল। নিশ্চয় 'আরশ পানির উপরে, আর 'আরশের উপরে রয়েছেন বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।"[৮৩]

উমাইয়্যাহ ইবন আবিস সালত সে অথবা অন্য কেউ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার কবিতা পাঠ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে উত্তম বলে বললেন: «آمن شعره وكفر قلبه» "তার কবিতা ঈমান এনেছে, আর তার অন্তর কুফুরী করেছে।"

"তারা আল্লাহকে মর্যাদা দিয়েছে, আর তিনি মর্যাদার যোগ্য। আমাদের রব্ব আসমানের উপর আছেন, তিনি হচ্ছেন মহান,

উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের মাধ্যমে, যিনি সকল মানুষের অগ্রবর্তী। তিনি আসমানের উপর বিন্যস্ত করেছেন খাট;

দীর্ঘ ও উঁচু, কোনো চোখ তাঁকে দেখতে পায় না। তার নিচে ফিরিশতাগণ মাথা নুইয়ে ঘাঁড় বাঁকা করে[৮৪] রয়েছেন।[৮৫]"

৮৭৬৯; ত্বাবারী, মুসনাদে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (২/৫০৩); সহীহুল জামে'উ, হাদীস নং ১৯৬৮; মুখতাসারুল উলু, পৃ. ৭৫; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ১৬২৭।

৮৩. উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৫৬, নং ৮২; ইবন আসাকির, তারিখু দামিশক (২৮/১১২, ১১৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১/২৩৮); তাজুদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (১/২৬৪); ইবন আব্দুল বার, আল-ইস্তী'আব (২/২৮৭); যাহাবী, আল-উলু (১/৪৩৮), নং ৭৪; নাওয়াওয়ী, আল-মাজমূ' (২/১৬৩); ইবন কুদামা, আল-উলু, পৃ. ১৪৫-১৫০; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ আল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১২১-১২২; ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৩৬৭-৩৬৮); দারা কুতনী, আস-সুনান (১/১২১)।

৮৪. কারণ যা খুব ভারী, তা বহন করতে মাথা বাঁকা করে রাখতে হয়।

৮৫. এগুলো উমাইয়্যাহ ইবন আবিস সালতের কবিতা। তার দিকে অনেকেই সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন, তার

[وقوله في الحديث الذي في السنن: «إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرًا»، وقوله: «يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب..» إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، التي تورث علمًا

অন্য হাদীসে:

«إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»

"নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, সম্মানিত, বান্দা যখন দুই হাত তাঁর দিকে উঠায় তখন তিনি তা শূন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।"(৮৬)

অন্য হাদীসে:

« يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ..»

"সে তার দুই হাত আসমানের দিকে প্রসারিত করে বলতে থাকে: হে আমার রব্ব, হে আমার রব্ব.....।"(৮৭) ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলোর সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া গণনা করা যায় না। মুতাওয়াতির(৮৮) পর্যায়ের হাদীস যা

দিওয়ানে রয়েছে, পৃ. ৩৩-৩৪; ইবন কাসীর, বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১/১২), (২/২২৯); ইবন মানযূর, তাহযীবে তারীখে দিমাশক (৩/১২৬)। অনুরূপ তা ফাকেহী তার আখবারু মক্কা গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন, বর্ণনা নং ১৯৭৩; ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৪/৭); যাহাবী, আল-উলু (১/৪৪৩), নং ৭৬।

৮৬. আবু দাঊদ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৪৮৮; তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৫৫৬; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৮৬৫; ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৮৭৬; হান্নাদ ইবনুস সারী, আয-যুহদ ১৩৬১; শিহাব আল-মুসনাদ ১১১১; বাইহাকী, আল-কুবরা (২/২১১); আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ৩২৫০, ১৯৬৪৮; ত্বাবারানী, আল-আওসাত্ব, হাদীস নং ৪৫৯১; ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (১০/৩৪০); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/৪৯৭); বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (৫/১৮৫), নং ১৩৮৫; ইবন আদী, আল-কামিল (২/৫৯৫); খত্বীব, তারিখু বাগদাদ (৩/২৩৫-২৩৬)। ইবন হাজার বলেন, এর সনদ জাইয়্যেদ। আলবানী বলেন, সহীহ। মুখতাসারুল 'উলু, পৃ. ৯৭০।

৮৭. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০১৫।
যদি বিদ'আতীরা বলে, উপরের দিকে হাত উঠানোর কারণ হচ্ছে তা দো'আর জন্য কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছে। উত্তর হবে,
১- এটাকে দো'আর জন্য কিবলা হওয়ার জন্য মানুষকে সেদিকে হাত তুলতে হয়, এর সপক্ষে দলীল লাগবে।
২- একথা ইতোপূর্বে কেউ বলেনি। সুতরাং তা বিদ'আতী চিন্তাধারা প্রসূত। যার সপক্ষে সালাফদের কোনো বক্তব্য নেই।
৩- দো'আ ও সালাতের কিবলা একই। আকাশকে দো'আর কিবলা নির্ধারণ করার কোনো দলীল নেই।
৪- কিবলা তো সেটাই যার দিকে কোনো মানুষ মুখ ফিরায়; সেট নয় যেটার দিকে হাত ফিরায়। যদি আসমানই কিবলা হতো তবে দো'আকারীকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দোআ করার বিষয়টি অনুমোদিত হয়ে আসত।
৫- হাদীসে হাত উঠানোর সাথে আল্লাহর ফেরৎ না দেয়ার সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে, যা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে থাকার কারণেই মানুষ সে দিকে দো'আ করে।

৮৮. মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলা হয়, যা এমন সংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন, যাদের সত্যতার ওপর অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জিত হয়, সেটা বর্ণনাকারীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই পর্যায়ে থাকতে হবে।
মুতাওয়াতির দু' প্রকার:

يقينيًا من أبلغ العلوم الضرورية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش، وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم، في الجاهلية الإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات، أو ألوفًا.

[قول نفاة العلو ليس له مستند من الكتاب والسنة ولا عن أحد من سلف الأمة] :

ثم ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين، ولا عن أئمة الدين. الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف.

দ্বরূরী[৮৯] বা নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ 'আরশের উপরে, আর সেটা আসমানের উপরে। আল্লাহ এ স্বভাবের উপরেই আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তবে শয়তান যদি কাউকে তার স্বভাব থেকে সরিয়ে দেয় সেটা ব্যতিক্রম।[৯০]

অতঃপর সালাফে সালেহীনের থেকে এ ব্যাপারে বর্ণিত কথা এতো বেশি যে, তা একত্রিত করলে শত শত, হাজার হাজার হবে।[৯১]

[যারা আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চে থাকার গুণটি অস্বীকার করে, তাদের সপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ কিংবা কোনো একজন সালাফে সালেহের কারো থেকে দলীল পাওয়া যাবে না]

এভাবে আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, যারা মতভেদ ও প্রবৃত্তি অনুসারীদের যুগ পেয়েছে তাদের কারো কাছ থেকে

এক. শব্দগত মুতাওয়াতির; যাতে শব্দ ও অর্থ উভয়টিই নিরবিচ্ছিন্ন সন্দেহহীন। যেমন হাদীস, যে কেউ আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

দুই. অর্থগত মুতাওয়াতির; যা এমন লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়া, যাদের সত্যতার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনে কোনো বাধা আসে না। যেমন দো'আর সময় হাত উঠানো, কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূলের সুপারিশ করার বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলো।

৮৯. কোনো বিষয়ের জ্ঞান কয়েক প্রকার অর্জিত হতে পারে,
এক. অত্যাবশ্যকভাবে অর্জিত জ্ঞান: এ রকম জ্ঞানকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন দুই চারের অর্ধেক।
দুই. চিন্তা-গবেষণা ভিত্তিক জ্ঞান: যেমন, বিদ্যুৎ ও রূহের অস্তিত্বের বিষয়টি।

৯০. এ জন্য ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, আশ'আরী মতবাদের প্রাথমিক অনুসারীরা আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর থাকার বিষয়টি স্বীকার করতেন, তারা সেটা অস্বীকার করতেন না। কারণ এ জ্ঞান ফিত্বরী জ্ঞান, অত্যাবশ্যক জ্ঞান, বলা মাত্রই বুঝার মত জ্ঞান। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৩০০)]

৯১. যারা এ বিষয়টিকে একত্র করেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আমাদের শাইখ, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তার এ গ্রন্থে, অনুরূপ ইবনুল কাইয়্যেম তার ইজতিমা'উল জুয়ূশ ও তাহযীবুস সুনান; যাহাবী তার আল-আরবা'ঈন, আল-উলু, আল-আরশ; ইমাম লালেকা'ঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ; ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, ইসবাতু সিফাতিল উলু; ইবন আব্দুল হাদী আল-মাকদেসী, ইসবাতু সিফাতিল ইস্তিওয়া প্রমুখ। বিস্তারিত জানার জন্য আমার "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

حرف واحد يخالف ذلك، لا نصًا ولا ظاهرًا.

ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه [بذاته] في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع، ونحوها؛

একটি হরফও বর্ণিত হয়নি যা (নস বা যাহের তথা) প্রকাশ্য-পরোক্ষ কোনোভাবেই তার ব্যতিক্রম।[৯২]

তাদের কেউ কোনো দিন বলেনি, আল্লাহ আসমানের উপর না, বা তিনি 'আরশের উপরে নন, বা তিনি সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান।[৯৩] এটাও বলেননি যে, সকল স্থান তার জন্য সমান; এটাও বলেননি যে, তিনি বিশ্বের ভেতরেও না বা বাইরেও না[৯৪], তার সাথে সংযুক্তও না আবার পৃথকও না।[৯৫] এও বলেনি যে, আঙ্গুল ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তার প্রতি

---

৯২. এটি এমন এক প্রমাণ যা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তাঁর 'আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ' এর মুনাযারায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি এখানে যা লিখেছি, তার বিরোধিতাকারীদের সকলকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তিন বছর পর্যন্ত; যদি আমি যা বর্ণনা করেছি তার বিপরীত একটি বক্তব্য কোনো সালাফে সালেহীনের কাছ থেকে আনতে পারে, তবে অবশ্যই আমি আমার বক্তব্য থেকে ফিরে আসব। আর আমার উপরও কর্তব্য থাকলো, আমি যা লিখেছি, তার সপক্ষে প্রথম তিন যুগের সকল গোষ্ঠী থেকে বর্ণনা উপস্থিত করবো যা আমার বর্ণিত বক্তব্যকে সমর্থন করবে, সেসব বর্ণনা আনব হানাফী, মালেকী, শাফে'য়ী, হাম্বলী, আশ'আরী ও আহলুল হাদীস প্রমুখের কাছ থেকে। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৯৭), (৩/১৬৯)]
বরং তিনি আরও বলেন, "যে কেউ সালাফে সালেহীনের কাছ থেকে আমার বর্ণিত আকীদাহ'র বিপরীতে একটি কথা নিয়ে আসবে পারবে, আমি সেটাতে তার অনুসরণ করবো।" [মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২০৬)]

৯৩. যেমনটি বলে থাকে হুলুলী গোষ্ঠী, যারা মনে করে স্রষ্টা সৃষ্টির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আছেন।

৯৪. যেমনটি বলে থাকে সীমালঙ্ঘনকারী মু'আত্তিলা সম্প্রদায়, যারা সৃষ্টিকে স্রষ্টাশূন্য করে থাকে।

৯৫. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, যারা বলে আল্লাহ তা'আলা জগতের ভিতরেও নন আবার বাইরেও নন, আর যারা বলে, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান, এ দু'টি বক্তব্যই একই তাক থেকে বের হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার জন্য উপরে থাকা ও 'আরশের উপরে উঠা অস্বীকার করে কুরআন ও হাদীসে আসা এতদসংক্রান্ত ভাষ্যসমূহকে তা'ত্বীল বা অর্থশূন্য করা। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৫১)]
তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান' এ কথাটি জাহমিয়্যাদের মধ্যে যারা ইবাদতগুজার ও সূফীদের বক্তব্য। আর 'আল্লাহ তা'আলা জগতের বাইরেও নয় ভিতরেও নয়' এ কথাটি জাহমিয়্যাদের মধ্যে যারা কালামশাস্ত্রে পারদর্শী ও যারা মুনাযারা করতে অভ্যস্ত তাদের বক্তব্য। আর সেজন্যই বলা হয়ে থাকে, 'কালামশাস্ত্রে পারদর্শী জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছুরই ইবাদত করে না, আর সূফীশাস্ত্রে বিশ্বাসী জাহমিয়্যারা সবকিছুর ইবাদত করে'। [মাজমূ' ফাতাওয়া (২/২৯৮)]
বরং তিনি আরও বলেছেন, তাদের অনেকের কাছ থেকেই উপরোক্ত দু'টি বক্তব্যই পাওয়া যায়। যখন কারও সাথে মুনাযারা করে তখন পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার অবস্থা থেকে আল্লাহকে মুক্ত করে বলে, তিনি জগতের ভিতরেও নন, জগতের বাইরেও নন। আর যখন ইবাদত করে ও দাসত্ব করতে চায় তখন বলে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর থেকে কোনো স্থান মুক্ত নয়, বরং স্পষ্টভাষায় হুলুল বা সর্বত্র সকল সৃষ্টিতে তার প্রবেশ করার কথা বলে থাকে, এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর অভ্যন্তরে বলেও মত প্রকাশ করে। বরং আরও অগ্রসর হয়ে ইত্তেহাদ বা সকল কিছুতেই তিনি একাকার হয়ে যাওয়ার কথাও বলে থাকেন, আবার আরও অগ্রসর হয়ে ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদের কথাও বলে থাকেন, ফলে তাদের মতে তাঁর অস্তিত্ব তো সকল সৃষ্টির অস্তিত্বই। আলাদা কিছু নয়।

بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

ইঙ্গিত করা জায়েয নেই।(৯৬)

বরং জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত আছে যে, তিনি 'আরাফাতের

(নাউযুবিল্লাহ) [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৭); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৭২)]
তারপর তিনি এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, 'কোনো কিছু জগতের বাইরেও নয়, আবার ভিতরেও নয়' এমন জিনিসের যে অস্তিত্ব নেই তা ফিত্বরী বা স্বভাবজাত ও অত্যাবশ্যক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩০৭, ৩১২)] দূর্ভাগ্যবশত: পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদ আশ'আরী ও মাতুরিদীদের গ্রন্থেও এ বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়।
তিনি আরও বলেন, যারা বলে 'তিনি জগতের ভিতরেও নন, বাইরেও নন' তারা কখনও তাদের মত খণ্ডন করতে পারবে না যারা বলে 'তিনি সর্বত্র বিরাজমান'। কারণ যদি সে এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা বৈধ মনে করে যা জগতের ভিতরেও নয়, বাইরেও নয়, যার প্রতি ইঙ্গিত করে দেখানো যায় না, সে এভাবে নেগেটিভ হওয়ার কারণে তাদের কথা অস্বীকার করতে পারবে না, যারা বলে 'তিনি সর্বত্র বিরাজমান'। [দারুউত তা'আরুদ্ব (৬/১৪৪-১৪৫)]

৯৬. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখানো দ্বারা চাক্ষুষ বা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে কোনো কিছু অনুভব করাকে বুঝায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন ঈসা তাদের থেকে কুফরী আঁচ করতে পারল' [সূরা আলে ইমরান: ৫২], অনুরূপ আল্লাহর বাণী, 'আর তাদের পূর্বে আমরা বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, তাদের কারও কোনো কিছুর অনুভব কি আপনি পাচ্ছেন? [সূরা মারইয়াম: ৯৮] আর জানা কথা যে, সকল মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা ফিত্বরাত তথা স্বভাবজাত জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত জ্ঞানে মানুষ এটা বুঝতে পারে যে, যা কোনোভাবেই অনুভূত হয় না, প্রকাশ্যও না, অপ্রকাশ্যভাবেও না, তার কোনো অস্তিত্ব নেই। [আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/২৫৮)]
তারপর শাইখুল ইসলাম এটা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উপরের দিকে আল্লাহর দিকে দো'আ ও অন্য সময় ইঙ্গিত করে দেখানো সেটা হাত দিয়ে হোক কিংবা ইঙ্গিত দিয়ে হোক, অথবা চোখ দিয়ে হোক বা অন্য কিছু দিয়ে হোক এমন সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইঙ্গিতের অন্তর্ভুক্ত যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে মুতাওয়াতির তথা নিরবিচ্ছিন্ন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সুন্নাহ'র মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। আর তার ওপর মুসলিম ও অমুসলিম সবার ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায়। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৪৯৭)] তিনি আরও বলেন, সকল সালাফে সালেহীন ও সিফাত সাব্যস্তকারীগণ এ মত পোষণ করেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব, তাঁর দর্শন হতে পারে, তাঁকে অনুভব করা যেতে পারে। সর্বপ্রথম তাঁকে অনুভব করা যাবে না এটা বলেছিল জাহম ইবন সাফওয়ান, যখন সে বৌদ্ধ মুশরিকদের সাথে মুনাযারা করছিল। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৩/৫৬৬)]
তিনি আরও বলেন, মহান আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করা তাকে আহ্বান করার পূর্ণতা প্রদান করে। কারণ তা তাঁর 'সামাদ' এর প্রতিফলন, সামাদ অর্থ হচ্ছে, যার কাছে বান্দারা ধাবিত হয়। আর জানা কথা যে, ভিতর, বাহির, অন্তর ও সারা শরীর মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য নিবেদিত হওয়া শুধু অন্তর তাঁর দিকে নিবেদিত হওয়া থেকে উত্তম। সুতরাং তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে দো'আ করা অবশ্যই তাঁর সামাদ গুণের পূর্ণতাজ্ঞাপক। তাই সামাদ নামটি তা দাবি করে থাকে। সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব থাকাই আবশ্যক করে যে, তিনি অবশ্যই পৃথক সত্তা, আর পৃথক সত্তার দিকে ইঙ্গিত হওয়াই স্বাভাবিক চাহিদা। আর তিনি যেহেতু 'সামাদ' উদ্দেশ্য সত্তা সেহেতে তার দাবি হচ্ছে এমন দো'আ করা যাতে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত থাকবে। আর তাই তিনি ব্যতীত অন্য কারও দিকে ইঙ্গিত করে দো'আ করা তাঁর সাথে শির্ক করা বলে গণ্য হবে, তাঁর তাওহীদ থেকে তাঁকে বের করে তার সাথে শরীক করা গণ্য হবে। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৪৫০)]
এভাবে যারা আল্লাহকে জগতের ভিতরেও নয়, বাইরেও নয়, ইঙ্গিতও করা যায় না, এরূপ কথা তাঁর জন্য বলে থাকে তাদের মধ্যকার অধিকাংশ কালামশাস্ত্রবিদদেরকেই দেখা যায় যে, তারা আল্লাহর জন্য ইবাদত করে না, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, তাঁর অভিমুখী হয় না। বরং তারা যদি সালাতও আদায় করে, সালাত পড়ে অমনোযোগী অন্তর নিয়ে, আর যদি আল্লাহকে ডাকে তো অনিবিষ্ট মনে ডাকে। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৫৫৮)]

وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات، في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: «ألا هل بلغت؟». فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها [إليهم] ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة، وأمثال ذلك كثير.

فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصًا وإما ظاهرًا، فكيف يجوز على الله، ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائمًا بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصًا ولا ظاهرًا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة، يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف، أو كل فاضل أن يعتقدها.

لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في

দিন বিশাল জনসমুদ্রের সামনে ভাষণদানকালে বলেছিলেন:

«ألا هل بلغت؟». فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها [إليهم] ويقول: «اللهم اشهد»

“সাবধান আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি? তারা বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি আকাশের দিকে আঙ্গুল উঁচু করে সেটাকে তাদের প্রতি ঝুঁকিয়ে বললেন: হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।[৯৭]” এটা তিনি কয়েকবার বললেন। অনুরূপ প্রমাণাদি আরও অনেক রয়েছে।

[সিফাত অস্বীকারকারীদের কথা সত্য হলে যেসব মারাত্মক প্রশ্ন আপতিত হয়]

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ’র এসব ও অনুরূপ ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত এসব সিফাতগুলোকে অস্বীকার ও নাকচকারীদের কথার মধ্যেই যদি হক বা সত্য থেকে থাকে, যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নস বা যাহির ভাষ্য থেকে যা বুঝা যায় তাতে হক্ব না থাকে, তাহলে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও উম্মতের উত্তম লোকদের জন্য এটা কীভাবে জায়েয হতে পারে যে, তারা সর্বদা সত্যের বিপরীত কথা বলে থাকেন[৯৮]? অতঃপর তারা যা সত্য সঠিক কথা, যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, তা তারা স্পষ্ট করে প্রকাশ করলেন না বা তার দিকে পথপ্রদর্শনও করলেন না, নস হিসেবেও নয়, যাহের হিসেবেও নয় (এটা কীভাবে সম্ভব?)।

অবশেষে রোম-পারস্যের জাত ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের বাচ্চা এবং দার্শনিকরা এসে জাতিকে সঠিক আকীদাহ বয়ান করল যে আকীদাহ বিশ্বাস গ্রহণ করা সকলের ওপর আবশ্যক। (এটা কীভাবে সম্ভব?)।

যদি এসব দার্শনিক যা বলে তাই আবশ্যকীয় বিশ্বাসের বিষয় হতো, অথচ তা জানতে তারা কেবল তাদের বুদ্ধি-বিবেকের ওপর নির্ভর করেছে, আর তাদের বিবেকের যুক্তির মাধ্যমে

৯৭. হাদীসটি জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত বিদায় হজের বর্ণনায় একটি বড় হাদীসের অংশ। দেখুন, সহীহ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১২১৮।

৯৮. কারণ কুরআন-সুন্নাহ’য় ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যে অনবরত এসব গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআনের ভাষ্য, হাদীসের বক্তব্য, সাহাবায়ে কিরাম কি তাহলে সত্যের বিপরীতে কথা বললেন?

معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصًا أو ظاهرًا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين.

তারা কুরআন-সুন্নাহ'য় নস বা যাহিরভাবে যা কিছু এসেছে তা খণ্ডন করতে সক্ষম হয়ে যায়, তাহলে এ বিচারে তো কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত থাকাই মানুষের জন্য বেশি হিদায়াতের কারণ হতে হয়, কুরআন-সুন্নাহ না থাকলেই তাদের জন্য তা বেশি উপকারী বিবেচিত হতে হয়। বরং কুরআন-সুন্নাহ থাকাটাই তো তখন দীনের মূল বিষয়ের জন্য নিছক ক্ষতিকর সাব্যস্ত হতে হয়ে।(৯৯)

---

৯৯. আর যেহেতু এটি একটি স্পষ্ট মিথ্যা ও অসত্য বিষয় তাই এসব কাফের, দার্শনিক, কালামশাস্ত্রবিদদের বাচ্চাদের দেয়া আকীদাহ-বিশ্বাস আবশ্যক বিষয় হতে পারে না। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের কথাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তাই হিদায়াত নিতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ'র নস বা যাহির ভাষ্য থেকেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন ও সুন্নাহকে দিয়েছেন আমাদের হিদায়াত ও উপকারের জন্য। এসব কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্য ইসলামে আগমনের পূর্বে কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামের অনুসারীদেরকে হিদায়াত প্রদান করেছে।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, যদি কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের বক্তব্যে সাব্যস্ত করা আল্লাহর নাম ও গুণকে সাব্যস্ত না করা এবং বিকৃত করার জন্য আসা কাফের পারস্য, রোমের অনুসারীদের বক্তব্য, ইয়াহূদী, নাসারাদের মতবাদ, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়, তাদের কথাকেই চূড়ান্ত সত্য বলতে হয়, তাহলে মানুষদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ব্যতীত ছাড়াই বেশি হিদায়াত ও তাদের উপকার প্রদানের জন্য অধিক উত্তম হতো। এর দ্বারা তো মনে হচ্ছে যে, রাসূলই তাদের জন্য পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কারণ প্রতিষ্ঠা করলেন! নাউযুবিল্যাহ।

তাদের অনেকেই মনে করে থাকে, আল্লাহর কালাম ও রাসূলের বাণী মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে অথবা তাদের বিবেক ও দীন নষ্ট করে দিয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমানের ব্যাপারে হক্কের বিপরীত বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে অথবা তাদেরকে হক্কের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত করেছে অথবা তাদেরকে ভীষণ সমস্যার বেড়াজালে নিক্ষেপ করছে; কারণ যখন তারা হক্ক জানতে বিবেক খরচ করেছে তখন এসব কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যকে ভিন্ন অর্থে প্রবাহিত করা, মানুষদেরকে এসব ভাষ্যের দাবি ও চাহিদা থেকে অন্য দিকে ফেরানো, যারা তাদের দেয়া মতবাদ মেনে নেয় না, নবী-রাসূলদের অনুসারী বিশাল জনগোষ্ঠী যখন তাদের সাথে শত্রুতা করে, তাদেরকে দমন করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। [নাউযুবিল্লাহ]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী অধিকাংশ জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোক বলে থাকে, কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা সিফাত সাব্যস্তকারী ভাষ্যসমূহ ও অনুরূপ আখেরাত কেন্দ্রিক ভাষ্যসমূহ, যেগুলোকে তারা মুশকিল ও মুতাশাবিহ নাম দিয়ে থাকে। সেগুলো অবতরণ করার উপকারিতা হচ্ছে, এগুলো নিয়ে আলেমগণ ইজতিহাদ করে সেগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থ ও স্পষ্ট চাহিদা থেকে অন্য খাতে প্রবাহিত করা। যার মাধ্যমে আত্মা ইজতিহাদের কষ্ট অনুভব করবে, চিন্তাজগত উন্মোচিত হবে, আর এর বিপরীতে যে হক্ক আছে তা লাভ করার জন্য যৌক্তিক দলীল-প্রমাণাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

তাই তাদের নিকট প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, রাসূলগণ সৃষ্টিকুলকে এমনসব জিনিস জানিয়েছেন যাতে হক্ক স্পষ্ট হবে না, ইলম অর্জিত হবে না, হিদায়াত বুঝা যাবে না। বরং এর দ্বারা কেবল বাতিলই প্রমাণিত হবে, এর দ্বারা শুধু পথভ্রষ্টতাই বুঝা যাবে; যাতে করে রাসূলের বক্তব্য দ্বারা সৃষ্টিকুলের উপকৃত হওয়া নিবদ্ধ থাকবে রাসূল যা প্রকাশ করেছেন, যা সৃষ্টিকুলকে বুঝিয়েছেন, তা খণ্ডন করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আর এ কারণে তারা এমন সব গবেষণায় আত্মনিয়োগ

فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثباتًا، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا من طريق سلف الأمة. ولكن انظروا أنتم، فما وجدتموه مستحقًا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواءٌ كان موجودًا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقًا له في عقولكم فلا تصفوه به!.

[منهج النفاة في نفي الصفات] :

ثم هم ههنا فريقان، أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه،

[সিফাত অস্বীকারকারীদের কথার দাবি]

কেননা এদের কথা অনুযায়ী (আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলির ব্যাপারে) প্রকৃত কথা হচ্ছে, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর পরিচয় ও তার গুণাবলির ক্ষেত্রে যা তাঁর জন্য উপযোগী, সাব্যস্ত করা কিংবা না-করা, এটার জ্ঞান কুরআন-সুন্নাহ'য় খোঁজ করো না এবং সালাফদের কথায়ও না বরং তোমরা গবেষণা করে দেখো। তারপর যেটা তাঁর জন্য তোমাদের যুক্তিতে উপযোগী পাও তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত কর। চাই সেটা'কুরআন ও সুন্নাহ'য় থাক বা না থাক। আর যে সিফাত তোমাদের যুক্তির মাধ্যমে তাঁর জন্য উপযোগী না পাও, সেটা তার জন্য সাব্যস্ত করো না।[১০০]

[সিফাত অস্বীকারকারীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও তাদের নীতি]

অতঃপর যেখানে যুক্তি কোনো কিছু সাব্যস্ত কিংবা অসাব্যস্ত কোনোটিই করে না, সেখানে তারা দু'টি দলে বিভক্ত:

(ক) [যা যুক্তিতে ধরে না, সেখানকার নীতি]

- অধিকাংশ বলে যে, যা তোমাদের আক্বল সাব্যস্ত করে না, তা তোমরা নাকচ করে দাও।[১০১]
- আর কেউ কেউ বলে যে, সেটার ব্যাপারে চুপ থাকো।[১০২]

করবে যার মাধ্যমে হক্ব চিনতে পারবে, কেননা রাসূল তাদের জন্য হক্ব জানার ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণই প্রতিষ্ঠা করেননি, অনুরূপ রাসূল তাঁর বাণীতে সে হক্ব চেনার জন্য সামান্যতম কিছুই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি। [দারউত তা'আরুদ্ব (৫/৩৬৫-৩৬৬)]

তাদের কথার আরো দাবি হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন তা দ্বারা কেবল তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকেই ঠেলে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। হিদায়াত তো তারা কেবল তাদের বিবেকের যুক্তির মাধ্যমেই অর্জন করবে। যার অনিবার্য ফল হচ্ছে, রাসূল তাদের জন্য পথভ্রষ্টতার পথ রচনা করেছেন, হিদায়াতের কিছুই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেননি। তাদের হিদায়াতের বিষয়টি তাদের নিজেদের দিকেই ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তাদের বক্তব্যের স্পষ্ট দাবি হচ্ছে, লোকদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ছেড়ে দেয়াই উত্তম ছিল এ রিসালাত থেকে; কারণ এ রিসালাত তাদের কোনো কাজে আসেনি, বরং তাদের ক্ষতি করেছে। [আল-কা'য়েদাতুল মারাকিশিয়্যাহ, পৃ. ৫১]

১০০. আর যেহেতু এটা বাতিল কথা, সুতরাং সিফাত অস্বীকারকারী কাফের পারস্য-রোমের অনুসারী, ইয়াহূদী-নাসারাদের মতবাদ, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের দেয়া মতামতের মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণ অস্বীকার করা কিংবা অর্থহীন করার নীতিকে কখনও গ্রহণ করা যেতে পারে না।

১০১. নাকচ করে দেয়ার পরে সিফাতের আয়াতসমূহকে মাজায বা রূপক অর্থে নিয়ে নাও। [ফাতহু রাব্বিল বারিয়্যাহ বিতালখীসিল হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৮৫]

১০২. আর তার জ্ঞান আল্লাহর কাছে সোপর্দ করো (বাতিল তাফওয়ীদ্ব), তবে অবশ্যই এটা বলবে যে

وما نفاه قياس عقولكم. الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافًا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورًا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا، أو يثبت ما لم تدركه عقولكم. على طريقة أكثرهم. فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة، ووحشي الألفاظ، وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرّح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزومًا لا محيد عنه،

(খ) [যা যুক্তিতে ধরে তাতে যুক্তিই হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড]

আর যা তোমাদের আক্বল বা যুক্তির মাপকাঠি নাকচ করে, (অথচ এ যুক্তির ব্যাপারে যমীনের বুকে যত মতভেদ ও অস্থিরতা রয়েছে তোমরা তার চেয়েও বেশি মতভেদ ও অস্থিরতায় লিপ্ত, তারপরও) সেটা তোমরা নাকচ করো; আর যখন তোমরা কোথাও বিবাদে জড়াবে তখন কেবল বিবেকের যুক্তির কাছেই প্রত্যাবর্তন করো। কেননা এটাই হচ্ছে এমন হক্ব যে হক্বের দাসত্ব করার নির্দেশনা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।[১০৩]

পক্ষান্তরে কুরআন-হাদীসে যেসব গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, যা তোমাদের বিবেকের যুক্তির বিপরীতে হয় বা যুক্তি তা সাব্যস্তও করে, কিন্তু সেটা তোমাদের যুক্তি যথার্থভাবে ধারণ করতে সক্ষম হয় না (যেমনটি তাদের অধিকাংশের পদ্ধতি), সে ব্যাপারে জেনে রাখ যে, আমি তা নাযিল করেছি কেবল তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, সেটা থেকে তোমরা কোনো হিদায়াত নিবে সে জন্য নয়। বরং তোমরা সেটাতে ইজতেহাদ বা প্রচেষ্টা চালিয়ে সেটাকে, (১) ভাষার দূরবর্তী বিরল অর্থে নেয়ার জন্য, শব্দের অপরিচিত বন্য অর্থে পরিচালিত করার জন্য ও (২) সেটার অর্থের জ্ঞানকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করার জন্য; তবে সাথে সাথে এটাও বলার জন্য যে, সেগুলো দ্বারা কোনো গুণ বুঝানো হয়নি। এসব কালামশাস্ত্রবিদদের নিকট এটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য।[১০৪]

এ (ধরনের) বক্তব্যের সমার্থ (যা উপরে তাদের কথার দাবি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে) তা তাদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর লোকদের থেকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে আমি দেখতে

এসব যা এসেছে তা দ্বারা আল্লাহর গুণ বুঝানো হয়নি। [ফাতহু রাব্বিল বারিয়্যাহ বিতালখীসিল হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৮৫]

১০৩. নিঃসন্দেহে তাদের এ নীতি মিথ্যা। কারণ নিরেট বিবেকের যুক্তি দিয়ে আল্লাহর জন্য কোনো কিছু সাব্যস্ত কিংবা নাকচ করার সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে ঝগড়া বিবাদ হলে বিবেকের যুক্তির কাছে প্রত্যাবর্তন করার কথা ইসলাম বলেনি, বলেছে কুরআন ও সুন্নাহ'র কাছে ফিরে আসতে। বিবেকের যুক্তির মতভেদের কারণেই তো ঝগড়া-বিবাদ হলো, তাহলে আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার অর্থ কোনো দিন সেটার সমাধান না হওয়া।

১০৪. নিঃসন্দেহে তাদের এ নীতি মিথ্যা। আল্লাহর কিতাবকে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন মানুষ যেন তা থেকে হিদায়াত নিতে পারে। সুতরাং তাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দূরবর্তী অপরিচিত অর্থে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের কাজ যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

ومضمونه أن كتاب الله لا يُهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله،

وأن الناس عند التنازع لا يردُّون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة. وهم المشركون. والمجوس، وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن

পেয়েছি।[১০৫] এ কথাটি তাদের দলের লোকদের নীতি অনুযায়ী এমন অত্যাবশ্যক বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যা থেকে বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। যার মূলকথা দাঁড়ায়, আল্লাহর মা'রিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব থেকে কোনো হিদায়াত লাভ করা যাবে না, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও, তাঁকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁর গুণাবলি শিক্ষা দেয়া ও সংবাদ দেয়া থেকে বিচ্যুত রাখতে হবে।

আর লোকদেরকেও তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো যাবে না। বরং সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে, যেদিকে তারা জাহেলী যুগে প্রত্যাবর্তন করত। অনুরূপ ঐদিকে ফয়সালার জন্য ফিরবে যেদিকে ফিরে সেসব সম্প্রদায় যারা নবী পাঠানোকে অস্বীকার করে, যেমন: ব্রাহ্মণ[১০৬] ও দার্শনিক[১০৭] মুশরিক সম্পদায়, অগ্নিপূজারী[১০৮] এবং সাবেয়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা[১০৯]।

যদিও এই ফিরানো[১১০] তার জটিলতা এবং বৈপরীত্য আরও বৃদ্ধি করবে। কারণ প্রত্যেক দলের/সম্প্রদায়ের রয়েছে অসংখ্য তাগূত[১১১], তারা তাদের কাছেই বিচার-ফয়সালার জন্য

---

১০৫. বস্তুত আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী অধিকাংশ জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের মত এটি। তাদের মধ্যে যারা তা স্পষ্ট করে বলেছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইবন আকীল, আবু হামেদ, তার জীবনের প্রথমাংশে, অনুরূপ ইবন রুশদ আল-হাফীদ।

১০৬. মুসলিম স্কলাররা বলে থাকেন যে, ভারতের ব্রাহ্মণেরা নবী পাঠানোর বিরোধী। বর্তমান হিন্দু সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈন সম্প্রদায়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে তা সত্যই মনে হয়। কারণ তারা স্রষ্টা নেমে আসার মতবাদে বিশ্বাসী, কিংবা স্রষ্টার অস্তিত্ব আলাদা সাব্যস্ত করতেই নারাজ। আমি আমার পিএইচ.ডি থিসিসে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১০৭. দার্শনিক সম্প্রদায় হচ্ছে নবী-রাসূলগণের সাক্ষাত শত্রু। দার্শনিকরা কখনো নবী-রাসূল সহ্য করতে পারে না। তারা মনে করে থাকে যে, তিনটি শক্তি থাকলে কেউ নবী হওয়ার দাবি করে থাকে: এক. প্রচণ্ড ধারণা প্রদানের শক্তি, দুই. প্রচণ্ড কথার জাদু, তিন. প্রচণ্ড ধারণ ক্ষমতা। দার্শনিকরা কোনোভাবেই নবুওয়াত মানতে রাজী নয়।

১০৮. অগ্নিপূজারীদের একটি গোষ্ঠী নবী প্রেরণকে অস্বীকার করে থাকে।

১০৯. সাবেয়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুশরিক তারা নবী প্রেরণকে অস্বীকার করে থাকে।

১১০. অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূল ব্যতীত অন্য কারও দিকে বিবাদ বিসম্বাদের সময় প্রত্যাবর্তন করা সমস্যা আরও বেশি ঘনীভূত করবে। কারণ, তাদের তো কমন কোনো প্রত্যাবর্তনের জায়গা নেই। তারাও তো শতধা বিভক্ত।

১১১. ত্বাগুত, শব্দের আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী। পারিভাষিকভাবে এমন প্রতিটি সত্তাই তাগূত, যাকে নিয়ে কেউ তার সীমালঙ্ঘন করেছে, উপাসনার মাধ্যমে অথবা অনুসরণের মাধ্যমে অথবা আনুগত্যের মাধ্যমে। [ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (১/৫০)]

يكفروا بهم، وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا - فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء:٦٠-٦٢] .

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول. والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته. أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علمًا وعملاً بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.

[مصادر شبهاتهم] : ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن

যাবে। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের কথা না মানতে। এসব কালামপন্থীদের অবস্থা আল্লাহর বাণীর সাথে কতইনা সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ۝٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۝٦١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ۝٦٢﴾ [النساء: ٦٠، ٦٢]

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন। অতঃপর কি অবস্থা হবে, যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন মুসীবত হবে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার কাছে এসে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছুই চাইনি'।" [সূরা আন-নিসা: ৬০-৬২] এসব লোকদেরকে যখন আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের দিকে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ'র দিকে ডাকা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, আমরা সে পথে চলছি, তাতে আমরা জানা ও মানার ক্ষেত্রে সুন্দর করতে চেয়েছি এবং আক্বল-নক্বলের সাথে সমন্বয় করতে চেয়েছি।[১১২]

[সন্দেহে নিপতিত হওয়ার মূল উৎস]

অতঃপর সিফাত অস্বীকারকারীদের দলীল নামের সংশয়সমূহের অধিকাংশই তারা পেয়েছে

---

১১২. বরং যারা যুক্তির দোহাই দিয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা এমন সব অকল্যাণের সম্মুখীন হবে যা তারা রাসূলের অনুসরণ করলে সম্মুখীন হবে বলে ধারণা করেছিল। যেমনটি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার আন-নাবুওয়াত (১/৪৩৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين، أو بعض ورثتهم الذين أُمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عن من قال كقولهم لتشابه قلوبهم ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء:٦٥]، ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ..﴾ [البقرة:٢١٣].

মুশরিক অথবা সাবেয়ী সম্প্রদায়ের তাগূতদের কারও মাধ্যমে অথবা তাদেরই কোনো উত্তরসূরির মাধ্যমে[১১৩] যাদের সাথে কুফরী করতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যেমন অমুক ও অমুক অথবা যে তাদের কথার মত কথা বলেছে, কারণ তাদের অন্তরসমূহে সাদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

"কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" [সূরা আন-নিসা: ৬৫]

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ﴾ [البقرة: ٢١٣]

"সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন যাতে মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত সেসবের মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরে শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করত।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৩]

---

১১৩. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ একাধিক জায়গায় এটি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জাহমিয়্যাদের আসল বক্তব্য তারা মুশরিকদের থেকে, সাবেয়ীদের থেকে গ্রহণ করেছে, ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণদের থেকে নিয়েছে, দার্শনিকদের থেকে চয়ন করেছে, আহলে কিতাবদের বিদ'আতীদের থেকে গ্রহণ করেছে, যারা মনে করে যে, রব্ব এর কোনো সাব্যস্ত করার মতো গুণ থাকতে নেই।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫১), (১০/৬৭)।

ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتاب هدًى للناس، ولا بيانًا ولا شفاء [لما في الصدور] ولا نورًا، ولا مردًّا عند التنازع، لأنا نعلم بالاضطرار [أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه [الكتاب والسنة] لا نصًا ولا ظاهرًا،

وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤]، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥]. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس

[সিফাত অস্বীকাকারীদের বক্তব্যের মারাত্মক পরিণতি]

আর তাদের এ বক্তব্যের[১১৪] আবশ্যক দাবি এই যে, কুরআন মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক নয়, বর্ণনাকারী নয়, অন্তরের আরোগ্য ও নিরাময়কারী নয়, আলোও নয়, বিবাদ বা দ্বন্দ্বের সময় ফিরার স্থানও নয়। কেননা আমরা জানতে বাধ্য হয়েছি, এসব কৃত্রিমতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিবর্গ যা যা বলে থাকে, সেটিই হচ্ছে এমন হক বা সত্যবাণী যা বিশ্বাস করা অপরিহার্য, যার সপক্ষে কুরআনে কারীম ও সুন্নাতে রাসূল প্রমাণবহ নয়, প্রকাশ্যেও নয়, গোপনেও সেটার দিকে কুরআন-সুন্নাহ'য় পথ দেখায় না। না নস বা চূড়ান্তভাবে, আর না যাহির বা দ্ব্যর্থবোধক হিসেবে।[১১৫]

এসব পণ্ডিতের বক্তব্যের পক্ষে সর্বোচ্চ যে দলীল-প্রমাণ তারা পেশ করার চেষ্টা করতে পারবে, তা হচ্ছে, তারা কোনো কোনো আয়াতের ফলাফল বের করে এ জাতীয় কথা বলে থাকে। যেমন, আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী থেকে নতীজা বা ফলাফল বের করা-

﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤﴾ [الاخلاص: ٤]

"তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" [সূরা আল-ইখলাস: ০৪]

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]

"তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান?" [সূরা মারইয়াম: ৬৫][১১৬]

---

১১৪. অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর সিফাত বিষয়ক ভাষ্যসমূহের (তাহরীফ বা) বিকৃতি, (ফাসেদ তা'ওয়ীল বা) বিনষ্ট অপব্যাখ্যা, (তাজহীল বা) মূর্খতার অপবাদ দানকারী বক্তব্য ও (তাফওয়ীদ্ব বা) অর্থ না জেনে আল্লাহর কাছে সেটা সোপর্দ করা, এগুলোর কারণে মারাত্মক যে অপবাদসমূহ আপতিত হয় তা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১৫. কুরআন ও সুন্নাহ'র শব্দসমূহ তিন প্রকার:

১- এমনকিছু ভাষ্য, যা কেবল একটি অর্থই প্রদান করে, যা ইলমুল ইয়াক্বীন বা দৃঢ় জ্ঞানের ফায়েদা প্রদান করে, সেগুলোর মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হবে তাও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হলো বলা হবে। যেমন "অতঃপর নূহ তাদের মাঝে হাজার বছর তবে পঞ্চাশ বছর কম অতিবাহিত করেছেন।" এখানে আসা, 'হাজার, পঞ্চাশ, নূহ, জাতি' এসব কিছুই 'নস' বা একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেছে।

২- এমনকিছু ভাষ্য যা প্রকাশ্যে একটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থ প্রদান করলেও তাতে দূরবর্তী একটি অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত বা সম্ভাবনাময় অর্থ করার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে। এটিও অকাট্য ও দৃঢ় জ্ঞানের ফায়েদা প্রদান করে।

৩- এমন কিছু ভাষ্য যার জন্য বর্ণনা আসা অপরিহার্য। কারণ তাতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে; এটিই মুজমাল, এগুলোর সাথে যদি কেউ উত্তম আচরণ করে তবে সেটিকে পূর্ববর্তী দু' প্রকারের আলোকে ব্যাখ্যা করে। আর তা তখন সম্ভব, যখন সেখানে বক্তার উদ্দেশ্য জানা যাবে। দেখুন, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৬৭০-৬৭২)।

১১৬. অর্থাৎ যারা আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে তারা এ দু'টি আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে থাকে

على العرش، ولا فوق السماوات، ونحو ذلك بقوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ لقد أبعد النجعة وهو إما مُلْغِز، أو مُدَلِس، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.

[عود على اللوازم الباطلة المترتبة على قول النفاة]:

ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل دينهم؛ لأن مَرَدَّهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالاً. يا سبحان

আর প্রত্যেক বুদ্ধিমানই এটা আবশ্যিকভাবে জানে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী- "তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান?" এ বাক্য থেকে এটা বুঝেছে যে, এর মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ 'আরশের উপরে না, আসমানের উপরেও না, তাহলে সে ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হলো।[১১৭] সে হয়তো বিভ্রান্তকারী অথবা ধোকা প্রদানকারী। তাদেরকে সে স্পষ্ট আরবী ভাষা দ্বারা সম্বোধন করেনি।[১১৮]

[সিফাত অস্বীকারকারীদের দ্বারা আল্লাহর সিফাত নাকচ করার আরও কিছু অনিবার্য বাতিল পরিণতি]

অনুরূপভাবে সিফাত অস্বীকার/বিকৃতি/অপব্যাখ্যা করার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, মানুষদেরকে তাদের মূল দীনের ব্যাপারে কল্যাণকর কোনো রিসালাত ব্যতীত ছেড়ে রাখা উত্তম হবে। কেননা রিসালাতের পূর্বে ও পরে তাদের পরিণাম একই দাঁড়াচ্ছে। আর রিসালাত যেন তাদের অন্ধত্ব ও ভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিল।[১১৯] [নাউযুবিল্লাহ]

যে, এ দু'টি আয়াতে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করাকে নাকচ করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ।
অথচ এ আয়াত দু'টি থেকেই তো আমরা আহলুস সুন্নাত সিফাত সাব্যস্ত করার কয়েকটি মূলনীতি গ্রহণ করে থাকি:

১- আল্লাহর কিছু নেতিবাচক গুণ রয়েছে।
২- সৃষ্টির কারও গুণাবলি আল্লাহর গুণাবলির সমপর্যায়ের হবে না।
৩- আল্লাহর নাম অন্য কারও জন্য প্রদান করা যাবে না, যেমনিভাবে আল্লাহকে অন্য কারও নাম দেয়া যাবে না।
৪- আল্লাহর নাম ও গুণ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকুলের কারও সাদৃশ্য দিয়ে সাব্যস্ত করা যাবে না।
৫- আল্লাহর নাম ও গুণ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকুলের কারও ধরণ অনুযায়ী সাব্যস্ত করা যাবে না।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সিফাত অস্বীকারকারী কিংবা অপব্যাখ্যাকারীদের কারও জন্য এ দু'টি আয়াতে কোনো দলীল নেই।

১১৭. কারণ এ বুঝ কোনোভাবেই এ আয়াতদ্বয় থেকে নেয়ার সুযোগ নেই। এখানে যা বলা হয়েছে তা কুরআনের অন্যান্য সরীহ বা স্পষ্ট আয়াতে 'আল্লাহর আরশের উপরে উঠা', 'আসমানের উপরে উঠা'র বিপরীতে নয় বরং পক্ষে। এ দু'টি আয়াত তো বরং বলছে যে, 'আল্লাহর আরশে উপরে উঠা'র গুণটিকে কোনোভাবেই সৃষ্টিকুলের মতো করে সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কোনো কুফু নেই। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কোনো সমতা নেই।

১১৮. কারণ যাদেরকে আরবী ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহে কোনো বিরোধ দেখতে পায় না। তারা সবগুলোর মধ্যে সমন্বয় দেখতে পায়। আর যারা আরবী বুঝে না, তারা শুধু বিরোধ দেখে, আর সিফাত অস্বীকার করার মাধ্যমে সেটার বৃথা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে।

১১৯. যেহেতু এটা বাতিল বলে সকল যুক্তিবাদী ব্যক্তিরাই বিশ্বাস করে থাকে, তাই আল্লাহর সিফাত বিষয়ক আয়াতসমূহ কখনও পথভ্রষ্টতার কারণ হতে পারে না।

الله! كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا من الدهر، ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.

[افتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية]:

ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاثًا وسبعين فرقة، فقد

হায়, সুবহানাল্লাহ! কীভাবে রাসূল জীবনের কোনো দিন বলেননি, অনুরূপ সালাফে সালেহীনের কেউ বলেননি যে, এসব আয়াত ও হাদীস যা বুঝায় তা তোমরা বিশ্বাস করো না বরং তোমরা তাই বিশ্বাস করো যা তোমাদেরকে ক্বিয়াস (যুক্তি) কামনা করে। অথবা তোমরা এটা এটা বিশ্বাস করো; কেননা এটাই সত্য। আর এ ক্ষেত্রে তোমাদের যুক্তি তার (কুরআন-সুন্নাহ'র) যাহির[১২০] বা প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত হলে ঐ যাহিরকে বিশ্বাস করো না। সে ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে যেটি ক্বিয়াস বা যুক্তি অনুযায়ী হয় সেটি বিশ্বাস কর। আর যেটি যুক্তি অনুযায়ী না হয় সে ব্যাপারে চুপ থাকো বা সেটি নাকচ করে দাও।[১২১]

[উম্মতের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্তি ও নাজাতপ্রাপ্ত দলের বর্ণনা]

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে, তাঁর উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।[১২২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই কী হবে তা জেনে

---

১২০. প্রকাশ্য অর্থ সেটিই যা সাধারণত মনে উদিত হয়, যার ওপর শব্দটি প্রমাণবহ আর যা শর'য়ী ভাষ্যসমূহের চাহিদা। দেখুন, আত-তিস'য়িনিয়্যাহ (২/৫৪৬)।
অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম অন্যত্র বলেন, যাহেরুল কালাম বা প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে, যারা ভাষা বুঝে তাদের সামনে সেটি পেশ করার পর সুস্থ বিবেকের যুক্তিতে যা সবার আগে বুঝে আসে। কিন্তু এটা অবশ্যই সত্য যে, সিফাত বিষয়ক ভাষ্যসমূহের যাহের অর্থ বা প্রকাশ্য অর্থ কখনও সাদৃশ্য স্থাপন নয়, যেমনটি কালামশাস্ত্রবিদ ও অন্যান্যরা মনে করে নিয়েছে। দেখুন, 'আর-রিসালাতুল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৩১; আর-রিসালাতুদ তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৬৯।

১২১. নাউযুবিল্যাহ। এটা কী কখনও হতে পারে? কুরআন ও হাদীসই তো বিশুদ্ধতার মানদণ্ড, কিয়াস ও যুক্তি কখনও তা হতে পারে না।

১২২. এটিই হচ্ছে বিখ্যাত হাদীসুল ইফতিরাক্ব। বা উম্মতের মাঝে মতভেদ হবে মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানানো সংক্রান্ত হাদীস। হাদীসটি বিভিন্ন বর্ণনায় কাছাকাছি শব্দে অনেক সাহাবীদের থেকেই বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা, 'আউফ ইবন মালেক, আনাস, মু'আওয়িয়াহ, ইবন 'উমার, জাবের, আবু উমামাহ, ইবন মাসউদ, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস প্রমুখ সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম তা বর্ণনা করেছেন।
আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইয়াহূদীরা এক বা দুই ও সত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাসারারা এক বা দুই ও সত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।" হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যথাক্রমে আবু দাঊদ, হাদীস নং ৪৫৯৬; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯১; আহমাদ (২/৩৩২); আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ ৫৯১০; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৬৬; ইবন নসর, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৫৮; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ, হাদীস নং ২৭৩; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬২৪৭; আজুররী, আশ-শরী'আহ, হাদীস নং ১৫; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং ১০, ৪৪১, ৪৪২; বাইহাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা (১০/২০৮), হাদীস নং ২০৯০১; আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৫৮।

علم ما سيكون، ثم قال: «إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله».
ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

বলেছেন।[১২৩]

অতঃপর তিনি বলেছেন:

«إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله».

"আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলে কখনো পথচ্যুত হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব।[১২৪]"

তেমনি নাজাতপ্রাপ্ত দলের[১২৫] বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে:

«هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

"তারা ঐসব লোক যারা ঐ পথে চলে যে পথে আজ আমি আছি ও আমার সাহাবীগণ আছেন।"[১২৬]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, হাদীসটি সহীহ ও বিখ্যাত যা সুনান ও মাসানীদে এসেছে। মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩৪৫); অনুরূপ ইমাম শাত্বেবীও সেটাকে সহীহ বলেছেন, আল-ই'তিসাম (২/১৮৯-১৯০); তাছাড়া শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যারা এতে দোষ দেখেছে তাদের সন্দেহসমূহ তিনি খণ্ডন করেছেন। দেখুন, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, নং ২০৩; তাখরীজ আহাদীস কিতাবিস সুন্নাহ (১/৩৩), নং ৬৬। অনুরূপ ইমাম ইবন আবী আসেম এ হাদীসের বহু সূত্র নিয়ে এসেছেন। দেখুন, আস-সুন্নাহ (১/৩২-৩৩)।

১২৩. অর্থাৎ উম্মতের বিভক্তির বিষয়টি আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন। জানার পরই তিনি তা বলেছেন। সবকিছু জেনে নিয়ে বলেছেন এটা শাইখের দাবি নয়; কারণ সবকিছুর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই; তা রুবুবিয়াতের অংশ।

১২৪. হাদীসটি জাবের ইবন আব্দুল্লাহ বর্ণিত বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ, যা বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৮৬; আহমাদ, ফাযায়েলুস সাহাবাহ, হাদীস নং ১৭০; আব্দ ইবন হুমাইদ, হাদীস নং ২৪০; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ১৫৫৬, ১৫৫৮; ত্বাবরানী, আল-মু'জামুল আল-আওসাত্ব, হাদীস নং ৪৭৫৭।
উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের কোনো কোনো শব্দে 'আর আমার পরিবার' কথাটি এসেছে। কিন্তু গবেষণা করে দেখা গেছে 'আর আমার পরিবার' এ কথাটুকু আলাদা। পরিবারকে ধারণ করতে বলা হয়নি। বলা হয়েছে, তাদের খোঁজ-খবর রাখতে এবং তাদের প্রতি দয়াদ্র থাকতে।

১২৫. নাজাতপ্রাপ্ত দল বলতে সে দলটিকে বুঝানো হয়েছে, উম্মতের মধ্যে যারা জাহান্নামে যাওয়া থেকে নাজাতপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই দলটি। বাকী ৭২ ফিরকা জাহান্নামে যাবে। ৭৩ ফিরকার মধ্য হতে একমাত্র যে ফিরকাটির ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। দুনিয়ার তাবৎ মানুষ দাবি করবে যে সে উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দাবি করলেই তো হবে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে নাজাতপ্রাপ্ত দলটির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

১২৬. এটি পূর্ববর্তী 'হাদীসুল ইফতিরাক' এর অংশ বিশেষ। এখানে নাজাতপ্রাপ্ত দলের একটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ হাদীসের শব্দ দিয়ে নাজাতপ্রাপ্ত দল কারা তা নির্ধারণ করছেন। আর তা হচ্ছে যারা 'সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আকীদাহ, মানহাজ ও শরী'আর ওপর ছিল তার ওপর অবশিষ্ট থাকবে, অনুরূপ তার সাহাবীগণ যা ধারণ করে চলে গেছেন, সে নীতির যথার্থ অনুসার ও অনুগামী।
হাদীসটির তাখরীজ হচ্ছে, এ অংশটুকু ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, যা নিম্নোক্ত

فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.

[أصل مقالة التعطيل] :

ثم أصل هذه المقالة. مقالة التعطيل للصفات. إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين، وضُلاَّل الصابئين، فإن أول من حُفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم،

তিনি কেন বললেন না, যে কেউ কুরআনকে বা কুরআনের দালালাত (নির্দেশনাকে) কুরআনের মাফহূমকে বা প্রকাশ্য কুরআনকে ই'তিকাদের ব্যাপারে আঁকড়ে ধরবে, সে পথভ্রষ্ট।[১২৭] বরং হিদায়াত হচ্ছে- তোমরা ফিরে যাবে তোমাদের আকলী কিয়াসের দিকে এবং (উত্তম) তিন প্রজন্মের পর কালামপন্থীরা যা নতুন উদ্ভাবন করেছে তার দিকে[১২৮]; যদিও এ কালামশাস্ত্র মূল শিকড় গজিয়েছিল তাবে'য়ীযুগের শেষ দিকে।

[সিফাত নিষ্ক্রিয়কারী বা নাকচকারীদের বক্তব্যের উৎসমূল[১২৯]]

বস্তুত সিফাতকে নিষ্ক্রিয়করণ করার এ মতবাদটি গ্রহণ করা হয়েছে মুশরিক ও ইয়াহূদীদের শিষ্যদের থেকে এবং পথভ্রষ্ট দীন বিরোধীদের থেকে; কেননা প্রথম যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে একথা বলেছে বলে প্রমাণিত আছে অর্থাৎ 'আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর হাকীকীভাবে (বাস্তবে) নেই বরং তিনি 'আরশের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন ইত্যাদি, প্রথমে একথা প্রকাশ পায় যার থেকে সে হচ্ছে জা'দ ইবন দিরহাম[১৩০]।

মুহাদ্দিসগণ তাদের গ্রন্থে আনয়ন করেছেন।
তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪১।
হাকেম ফিল মুস্তাদরাক (১/১২৮, ১২৯), হাদীস নং ৪৪৪।
লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১০০)।
আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ১৫-১৬।
আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ পৃ. ২৩।
ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩৬৮-৩৭০), হাদীস নং ২৬৪, ২৬৫।
উক্বাইলী, আদ-দু'আফাহ (২/২৬২)।
মুহাম্মাদ ইবন ওয়াদ্দাহ, আল-বিদা' ওয়ান নাহ্ই আনহা, পৃ. ৮৪।
বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (১/২১৩) এবং সহীহ বলেছেন।

১২৭. যেমনটি জাহমিয়্যা, মু'তাযিলা, বাতেনী সূফীরা বলে থাকে।

১২৮. যেমনটি তথাকথিত দার্শনিক, কালামশাস্ত্রবিদ, মু'তাযিলা, আশ'আরিয়া ও মাতুরিদিয়া ফিরকার লোকেরা বলে থাকে।

১২৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করা বা না করার ক্ষেত্রে যুক্তি কিয়াসের দিকে ঝুঁকেছে এবং কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ নেয়া যাবে না এ নীতিটি সর্বপ্রথম কারা মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে তার বর্ণনা।

১৩০. জা'দ ইবন দিরহাম, সে মূলত একজন দাস ছিল। তার মূল ছিল খুরাসান থেকে। সে মারওয়ান আল-হিমার বা সর্বশেষ উমাইয়্যা খলীফা মারওয়ানের শিক্ষক ছিল। পথভ্রষ্ট, বিদ'আতী। সর্বপ্রথম সে বলেছিল, আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননি, মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেননি। আর কথা বলা নাকি তাঁর জন্য জায়েযও নয়। নাউযুবিল্লাহ।

وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنُسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل: إن الجعد أخذ

তার থেকে জাহম ইবন সাফওয়ান(১৩১) এটি গ্রহণ করে প্রচার-প্রসার করে। ফলে জাহমিয়্যাহ(১৩২)

---

১২৪ হিজরীতে খালেদ আব্দুল্লাহ আল-কাসরী তাকে কূফাতে কুরবানীর ঈদের দিন হত্যা করেন। যখন তিনি মানুষদের ভাষণ দিচ্ছিলেন, তরপর বললেন, হে মানুষেরা, তোমরা কুরবানী কর, আল্লাহ তোমাদের কুরবানী কবুল করুন, তবে আমি জা'দ ইবন দিরহামকে দিয়ে কুরবানী করব, সে মনে করেছে আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননি, মূসার সাথে কথা বলেননি। জা'দ যা বলেছে তা থেকে আল্লাহ কতই না পবিত্র। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে জা'দকে যবাই করেন।

এ ঘটনা ইমাম বুখারী তার 'খালকু আফ'আলিল ইবাদ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পৃ. ২৯, ৩০; অনুরূপ বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা (১০/২০৫-২০৬); আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৯৭-৩২৮; দারেমী উসমান ইবন সা'ঈদ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ১৭, ৮২; লালেকাঈ, শারহু উসুলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/৩১৯); আন-নাজ্জাদ, আর-রাদ্দু আলা মান ইয়াকূলু আল-কুরআনু মাখলূকুন, পৃ. ৫৪, নং ৭২; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ; আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, আয-যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১০০। ইবন কাসীর বলেন, এ ঘটনাটি বড় বড় হাফেযরা বর্ণনা করেছেন, যেমন: বুখারী, ইবন আবী হাতেম, বাইহাক্বী, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ও ইবন আসাকির।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন,

ومن أجل ذا ضحى بجعد ... خالد القسري يوم ذبائح القربان

إذ قال إبراهيم ليس خليله ... كلا ولا موسى الكليم الداني

"আর সে জন্যই জা'দ ইবন দিরহামকে কুরবানী দিল খালেদ আল-কাসরী, আর সেটা ছিল মানুষের কুরবানীর দিন।

যখন সে বলল ইবরাহীম আল্লাহর বন্ধু নয়, অনুরূপ মূসাও আল্লাহর সাথে কথা বলেননি।" [নূনিয়াতু ইবনিল কাইয়্যেম পৃ. ৭; কাসীদার শুরুর অধ্যায়]

এ জা'দ ইবন দিরহামের ছাত্র ছিল জাহম ইবন সাফওয়ান। জাহম এ ভ্রান্ত মতবাদটি জা'দ থেকেই নিয়েছিল।

দেখুন, যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (১/১৮৫); ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (২/১০৫); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/৪৩৩); ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৯/৩৫০), (১০/১৯); ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়া (১২/৩৫০-৩৫১), (১০/৬৬); দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ১৭।

১৩১. জাহম ইবন সাফওয়ান, আবু মুহরিয আর-রাসেবী, তাদের দাস, মূলত সামারকান্দ থেকে। জাহমিয়্যাদের মূল। তার দিকেই জাহমিয়্যাহ ফির্কার লোকদের সম্পৃক্ত করা হয়। পথভ্রষ্ট, বিদ'আতী। উম্মতের মধ্যে বড় অকল্যাণ সৃষ্টিকারী। তা'ত্বীল তথা আল্লাহর গুণ অস্বীকারকারী, আল্লাহর নাম ও গুণ সবই অস্বীকার করত। সে মনে করত কুরআন সৃষ্ট। সে অপরদিক থেকে মানুষের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জাবর বা মানুষ তা করতে বাধ্য বলত। সে বলত যে জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। সে প্রতিটি বিদ'আতের কিছু অংশ গ্রহণ করেছে।

১২৮ হিজরীতে সিলম ইবন আহওয়ায আল-কিরমানী তাকে হত্যা করেন। তখন তিনি মার্ভ প্রদেশের গভর্নর ছিলেন।

দেখুন, যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (২/১৯৭); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৬/২৬-২৭); ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (২/১৪২); ইবন কাসীর, বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৯/৩৫০); যিরিকলী, আল-আ'লাম (২/১৪১)।

১৩২. জাহমিয়্যাহ, পথভ্রষ্ট একটি ফিরকা। তারা পূর্বোক্ত জাহম ইবন সাফওয়ানের অনুসারী। সে বলত, মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই, মানুষ বাধ্য। অনুরূপ কোনো প্রাণীরই কোনো ক্ষমতা নেই ও পছন্দ করে কাজ করার সুযোগ নেই। সে বিশ্বাস করতো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম লয়প্রাপ্ত হবে। আরও মনে করতো যে, ঈমান শুধু জানার নাম। আর সে কুরআনকে বানানো বলে বিশ্বাস করত। আর সে আল্লাহর সকল নাম ও গুণ অস্বীকার করত।

পরবর্তীতে জাহমিয়্যাহ নামটি কম-বেশ আল্লাহর নাম ও গুণ অস্বীকারকারীদের সবার জন্যই প্রযোজ্য হয়ে বলা হয়, অমুক জাহমিয়্যাদের আকীদাহ গ্রহণ করেছে। কারণ এরা সবাই নাম ও গুণ অস্বীকার

মতবাদ তার দিকে সম্পর্কিত করা হয়।(১৩৩) আর বলা হয়, জা'দ তার বক্তব্য গ্রহণ

করার ক্ষেত্রে তাদের ওয়ারিস।
দেখুন, আল-বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ১৯৯; আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২৭৯-২৮০; আল-ইসফারায়ীনী, আত-তাবসীর ফিদ দীন, পৃ. ৬৩-৬৪; আস-সাকসাকী, আল-বুরহান ফী মা'রিফাতি আকায়িদি আহলিল আদইয়ান, পৃ. ৩৪-৩৫।

১৩৩. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ মতবাদ যে, 'আরশের উপর আল্লাহ নেই, এটা ইসলামে সর্বপ্রথম জা'দ ইবন দিরহাম ও জাহম ইবন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরা আমদানী করে বিদ'আত হিসেবে চালু করে। উম্মতের লোকদের নিকট তারা সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুসারী। সালাফে সালেহীন তাদেরকে কাফের বলতেন, যদিও নির্দিষ্ট করে একজনকে কাফের বলতেন না। সালাফগণ বলতেন, আমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদের বক্তব্য বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু জাহমিয়্যাদের বক্তব্য বর্ণনা করতে পারি না। সালাফগণ আরও বলতেন, মুসলিম, ইয়াহূদী ও নাসারা সবাই একমত যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে, অথচ জাহমিয়্যারা বলে, তিনি 'আরশের উপর নন।" বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৪১৭)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও সাব্যস্ত করলেন যে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এটা বলেছে যে, আল্লাহ কারও সাথে কথা বলেননি, আল্লাহ তার বান্দাদের ভালোবাসেন না, সে হচ্ছে জা'দ ইবন দিরহাম। আর তাই সে অস্বীকার করত যে, আল্লাহ ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আর মূসার সাথে কথা বলেছেন। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৩৫৭), (১০/৬৬, ৬৯৭) (১২/২৬)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও উল্লেখ করেছেন যে, "প্রথম যার থেকে কুরআনকে সৃষ্ট বলা হয়েছে সে হচ্ছে জা'দ ইবন দিরহাম ও তার শিষ্য জাহম ইবন সাফওয়ান।" দেখুন, মাজমূ' ফাতওয়া (১২/৩০১)।

তিনি আরও বলেন, "বলা হয়ে থাকে, ইসলামে প্রথম যে ব্যক্তি তা'ত্বীল বা আল্লাহকে গুণশূণ্যকরণের কথা বলেছে, যা মূলত ফির'আউনের কথা ছিল, সে হচ্ছে জা'দ ইবন দিরহাম।" দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/১৭৭)।

অন্য জায়গায় বিদ'আতের সূচনা (যেমন মু'তাযিলাদের বিদ'আত) বর্ণনা করার সময় বলেন, "তখন পর্যন্ত আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করার মত বিদ'আত চালু হয়েছিল না, অবশেষে প্রকাশ হল জা'দ ইবন দিরহাম, সে সর্বপ্রথম তার প্রকাশ ঘটাল...।" দেখুন, ফাতাওয়া (১৪/৩৫০)।

অন্যত্র বলেন, "যে শির্কের বিরোধিতা করেছেন খলীল ইবরাহীম, যার ওপর সেখানকার লোকেরা তার শত্রুতা করেছিল, সেখানকার লোকেরাই আল্লাহর গুণ ও কর্ম অস্বীকারকারীদের ইমাম বিবেচিত হলো। ইসলামে প্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণ অস্বীকার করেছিল সে হচ্ছে জা'দ ইবন দিরহাম, সে ছিল (সর্বশেষ উমাইয়া খলীফা) মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের শিক্ষক।

ইমাম আহমাদ বলেন, বলা হয় এ জা'দ ইবন দিরহাম ছিল হাররান এলাকার। তার থেকেই জাহম ইবন সাফওয়ান আল্লাহর গুণ অস্বীকার করার মতবাদটি গ্রহণ করে। আর হাররানে ছিল বেশ কিছু সাবেয়ী বুদ্ধিজীবি ও দার্শনিক নেতৃবৃন্দ, সেসব বিকৃত দীনের অবশিষ্ট লোক, যারা শির্ক করতো, আল্লাহর গুণ ও কর্ম অস্বীকার করতো। [দারউত তা'আরুদ্ব (১/৩১৩)]

বরং ইমাম লালেকাঈ রাহিমাহুল্লাহ থেকেও তিনি বর্ণনা করেন যে, উম্মতের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, জা'দ সর্বপ্রথম আল্লাহর গুণ অস্বীকার করার মতবাদ দাঁড় করায়, তারপর জাহম তার অনুসরণ করে। [ফাতাওয়া (১২/৪২০)]

ইমাম লালেকাঈ তিনি নিজেও ইমাম ইবন আবী হাতেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণ অস্বীকার করেছে সে হচ্ছে জা'দ ইবন দিরহাম। [শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৩৮২)]

তাছাড়া ইতোপূর্বেকার যারা যারা জা'দ ইবন দিরহামকেই আল্লাহর গুণ অস্বীকার করার জনক বলেছে তারা হচ্ছেন, ইমাম উসমান ইবন সাঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যা, পৃ. ৭; আবু ইসমাঈল আল-হারওয়ী আল-আনসারী, যাম্মুল কালাম, পৃ. ৩০৪।

পরবর্তীদের মাঝে যারা তা উল্লেখ করেছেন, তারা হচ্ছেন ইমাম ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৯/৩৫০); যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (৩/২১৮)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, উমাইয়াদের ওপর জা'দ এর বিদ'আতের করুণ

مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم [اليهودي] الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.

করেছিল আবান ইবন সাম'আন[১৩৪] থেকে, আর আবান সেটি গ্রহণ করেছিল ত্বালূত থেকে, যে ছিল লাবিদ ইবন আ'ছম এর বোনের ছেলে।[১৩৫] আর তালূত গ্রহণ করেছিল লাবিদ ইবন আ'ছম[১৩৬] থেকে[১৩৭] এবং লাবিদ হচ্ছে ঐ ইয়াহূদী জাদুকর, যে আল্লাহর নবী

পরিণতি আপতিত হয়েছে। কারণ এটি ছিল সেসব কারণের একটি যার দরুন তাদের সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। [মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/১৮২)]

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, আর তার মাথার উপরই আল্লাহ তা'আলা বনী উমাইয়্যাদের রাজত্ব ও খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাদেরকে সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন, সম্পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করেছেন, তাদের শিক্ষক (জা'দ ইবন দিরহাম) এর কারণে, যে ছিল আল্লাহর গুণ অস্বীকারকারী ও আল্লাহর গুণকে নিষ্ক্রীয়কারী। [আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৩/১০৭১)]

১৩৪. আবান ইবন সাম'আন নামীয় বিখ্যাত কাউকে দেখা যায় না। তবে এ নামটি অনেকেই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইবন কাসীর তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে (৯/৩৫০) তার নাম বলেছেন, বায়ান ইবন সাম'আন আত-তামীমী। আরও বলেছেন, সে এ মতবাদ জা'দ থেকে নিয়েছে। সম্ভবত সেই উদ্দেশ্য।

যদি বায়ান ইবন সাম'আন হয়, তবে তার জীবনী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সে হচ্ছে, বায়ান ইবন সাম'আন আন-নাহদী, আত-তামীমী। একশত হিজরীর পরে নতুন মতবাদ নিয়ে তার উত্থান। সে আলী ইবন আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইলাহ হিসাবে মনে করত। সে বলত, আলীর মধ্যে ইলাহী শক্তি রয়েছে যা তার শরীরের সাথে মিশে গেছে। তারপর তার সে ইলাহী শক্তি তার সন্তান মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ'র মাঝে বিচরণ করেছে। বায়ানকে খালেদ আল-কাসরী ১১৯ হিজরীতে হত্যা করে। এ বায়ানের দিকেই সম্পৃক্ত করে বায়ানিয়া ফির্কার উৎপত্তি। এরা সম্পূর্ণ সীমালঙ্ঘনকারী ফির্কা, বরং বাগদাদী তাকে ইসলামী ফির্কার বাইরের ফির্কা গণ্য করেছেন। তার আকীদাহ'র মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সূরতে, আর আল্লাহর সব ধ্বংস হয়ে যাবে চেহারা ব্যতীত। তাদের দাবী হচ্ছে বায়ান ইবন সাম'আন নবী। তাদের কেউ কেউ বলত, বায়ান তো আল্লাহ। আরও বলত: কুরআনের বাণী 'হাযা বায়ানুন লিননাস' [সূরা আলে ইমরান: ১৩৯] এখানে 'বয়ান' বলে তাকেই বুঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। [দেখুন, ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (২/৬৯); আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৫; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২২৭; ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৫০২-৫০৩)]

১৩৫. ত্বালূত এর ব্যাপারে উপরে যা বর্ণিত হয়েছে তার থেকে বেশি বর্ণনা পাওয়া যায় না।

১৩৬. লাবীদ ইবন আ'ছম বনী রুযাইক এর লোক। বলা হয়ে থাকে, সে ছিল মুনাফিক, ইয়াহূদীদের হালীফ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ লোক। আবার কারও কারও মতে, তার মূলই ছিল ইয়াহূদী। সে ছিল মারাত্মক জাদুকর। সে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করেছিল।

১৩৭. জাহম ইবন সাফওয়ান, জা'দ ইবন দিরহাম, বায়ান ইবন সাম'আন, ত্বালূত্ব তারপর লবীদ ইবন আ'ছম, এ পথভ্রষ্টতার সনদ পরম্পরার ব্যাপারে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, [সুবুকী, আত-ত্বাবাক্বাত (৯/৩৫-৯১); আলী সামী আন-নাশশার, নাশআতুল ফিকরিল ফালসাফি ফিল ইসলাম (১/৩৩০); অনুরূপ শাইখ শু'আইব আল-আরনাউত্ব, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা এর টীকা (৫/৪৩৩)] কিন্তু আমরা বলি এ সনদে সন্দেহ না করাই উচিত। কারণ;

১- এ সনদ ইবন তাইমিয়া ব্যতীত অনেকেই বর্ণনা করেছেন, যেমন:

- ইবনুল আসীর, আল-কামিল (৬/১২১)।
- সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত (১১/৬৮)।
- ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১০/২১)।
- জামালুদ্দীন ইবন নুবাতাহ, সারাহিল 'উয়ূন ফী শারহি রিসালাতি ইবন যাইদূন, পৃ. ২৯৩।

[تأثر الجعد بالبيئة التي نشأ فيها]:

وكان الجعد هذا. فيما قيل. من أهل حرّان وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو:

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু[১৩৮] করেছিল।[১৩৯]

[জা'দ ইবন দিরহাম কর্তৃক তার বেড়ে উঠার স্থানের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া]

আর জা'দ ইবন দিরহাম -ইতোপূর্বে- হাররান ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিল।[১৪০] তাদের মধ্যে নমরুদ ও কিন'আনী ধর্মের অবশিষ্ট অনেক সাবেয়ী ও দার্শনিক ছিল, যাদের জাদুর ব্যাপারে পরবর্তী কেউ কেউ পুস্তক রচনা করেছেন।[১৪১] আর নমরুদ হচ্ছে- মুশরিক

২- এ সনদটি আলেমদের মাঝে কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই প্রসার লাভ করেছে। মুহাক্কিক আলেমগণ এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করেননি; কারণ তারা জানেন ঐতিহাসিক ও আকীদাগত প্রমাণাদি তার বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। বিশেষ করে জা'দ ইবন দিরহাম ও জা'হম ইবন সাফওয়ানের মধ্যকার শিক্ষকতা ও ছাত্রত্বের বিষয়টি ইবন কাসীর বর্ণনা করেছেন। [আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৯/৩৮২)]
তাছাড়া ইমাম বুখারীও তা কুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ থেকে শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। [খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৩০; আত-তারীখুল কাবীর (১/৬৪)] অনুরূপ ইবন মানযূর, মুখতাসারু তারীখি দিমাশক (৬/৫১); আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল-গাসীলীও তা বর্ণনা করেছেন।

৩- ইয়াহূদীরা প্রথমে মুশাব্বিহা অর্থাৎ আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদানকারী থাকলেও পরবর্তীতে তারা মু'আত্তিলা বা আল্লাহর গুণকে নিষ্ক্রীয়করণকারীতে পরিণত হয়ে যায়। যেমনটি ইমাম ইবন হাজার বর্ণনা করেছেন। [ইবন হাজার, আল-ফাতহ (৩/৩৫৯)]

তবে শাহরাস্তানী বলেন, ইয়াহূদীদের মধ্যে একমাত্র 'কুররায়ীন'রা প্রথম থেকেই মুশাব্বিহা ছিল, বাকীরা সকলে মু'আত্তিলাই ছিল। পরবর্তীতে তাদের সকলের মাঝে তা'ত্বীলই প্রাধান্য পায়। [আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/৯৩)]

১৩৮. লাবীদ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করার বিষয়টি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৫৭৬৩। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আর তা ছিল সপ্তম হিজরী সনের ঘটনা। আরও দেখুন, [ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (২/১৯৬-১৯৯); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১০/২২৬); সামহূদী, আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা (২/৩৪১-৩৪২)]

১৩৯. এটি হচ্ছে জা'দ ইবন দিরহামের পথভ্রষ্টতার প্রথম কারণ। যার সারমর্ম হচ্ছে সে তা ইয়াহূদীদের থেকে গ্রহণ করেছে।

১৪০. এখানে জা'দ ইবন দিরহামের পথভ্রষ্টতার দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সে তা সাবেয়ীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। কারণ সে হাররানে বড় হয়েছিল, আর সেখানে পথভ্রষ্ট সাবেয়ীদের বাকী অংশ বসবাস করত।

১৪১. এর দ্বারা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ সম্ভবত রাযীকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারণ রাযী জাদুর ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। যার শিরোনাম হচ্ছে, 'আস-সিররুল মাকতূম ফী মুখাত্বাবাতিন নুজূম'। অন্যত্র শাইখুল ইসলাম তার নামসহ এ কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন [আররাদ্দু আলাল মানত্বিকিয়ীন, পৃ. ২৮৬, ৫৪৪; আস-সাফাদিয়্যাহ (৯১/১৭২); আস-সাব'ঈনিয়্যাহ, (বুগইয়াতুল মুরতাদ) পৃ. ৩৭০; জামে'উর রাসায়িল (২/৫১-৫২); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৫৪৮), (৬/২৫৪), (১৩/১৮০); আল-ইস্তিগাসাহ ফির রাদ্দি আলাল বিকরী, পৃ. ৩১৬; দারউত তা'আরুদ্ব (১/৩১১)]
অবশ্য শাইখুল ইসলাম তার ব্যাপারে ভালো ধারণা করে বলেন, 'যদিও সে তা থেকে তাওবা করেছে ও ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে'। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৫৫)]

ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم.

كانت الصابئة إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركًا، بل مؤمنًا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة:٦٢]،

কালদানী সাবেয়ীদের রাজা, যেমন পারসীয় ও অগ্নি উপাসকদের বাদশাহ কিসরা, মিশরের বাদশাহ ফির'আউন, হাবশার খ্রিস্টান বাদশা নাজ্জাশী। এটা জাতিবাচক নাম, ব্যক্তিবাচক নাম নয়।

সাবেয়ীদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক, আর তাদের মধ্যকার জ্ঞানী বলতে দার্শনিকদেরই বুঝায়। যদিও তাদের কেউ কেউ আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝﴾ [البقرة: ٦٢]

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং নাসারা ও সাবেয়ীরা যারাই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে[১৪২], তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রব্ব এর কাছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৬২]

অনুরূপ অন্য আয়াতে বলেন,

বস্তুত ফখরুদ্দীন রাযী জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি তা সাবেয়ীদের থেকে শিখেছিলেন। এমনকি তিনি তার 'আল-মাত্বালিবুল আলীয়া' গ্রন্থেও 'জাদু ও তার প্রকারভেদ নিয়ে কথা' অধ্যায় বিন্যাস করেছিলেন। আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা চাই।

১৪২. আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে,

এক. যারাই ইতোপূর্বে আল্লাহ ও আখেরাতের ঈমান এনে মারা গিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রশান্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। এ হিসেবে এর মাধ্যমে আমাদের নবীর আগমনের আগে যারা ছিল তাদের কথা বলা হয়েছে।

দুই. যারাই বর্তমানকালে আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, আখেরাতের ওপর ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনবে তাদের কোনো ভয় ও পেরেশানী থাকবে না।

তিন. যারাই আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর সত্যিকারের ঈমান আনবে তাদের জন্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনা ব্যতীত দূরে থাকার সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহর ওপর ঈমান ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনার জন্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা ব্যতীত আর কোনো মাধ্যম বাকী নেই। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত পথেই উক্ত ঈমান আনতে হবে। তাই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনা ব্যতীত কারও ঈমান শুদ্ধ হবে না। সুতরাং কেউ যেন মনে না করে যে, ইয়াহূদী, নাসারা বা সাবেয়ী হলেও তার জন্য আখেরাতের মুক্তির ওয়াদা থাকবে।

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [المائدة:٦٩].
لكن كثيرًا منهم، أو أكثرهم كانوا كفارًا أو مشركين، كما أن كثيرًا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارًا أو مشركين، فأولئك الصابئون. الذين كانوا إذ ذاك. كانوا كفارًا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٦٩﴾ [المائدة: ٦٩]

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, আর সাবেয়ী ও নাসারাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৯]

তবে সাবেয়ীদের অনেকেই অথবা অধিকাংশই কাফের অথবা মুশরিক। যেমনিভাবে অনেক ইয়াহূদী ও নাসারা তাদের দীনে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে, কাফির[১৪৩] ও মুশরিকে পরিণত হয়েছে, অনুরূপভাবে সেসব সাবেয়ী যারা তখন বর্তমান ছিল, তারা তখন হয় কাফের ছিল অথবা মুশরিক। তারা তারকা পূজা করত এবং সেগুলোর আকৃতি বানাতো।[১৪৪]

---

১৪৩. ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে কাফের বলা হবে। [মারাতিবুল ইজমা', পৃ. ২০২]

১৪৪. উল্লেখ্য যে, বর্তমানেও ইরাকে এদের অস্তিত্ব দেখা যায়। তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্ম অন্যদের কাছে প্রকাশ করে না। ফলে অনেকেই তাদের ধর্মের সঠিক মতাদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে না। তাদের ওপর রচিত 'সাবেয়ী মানদেয়ী' গ্রন্থটি খুব পরিচিত। তবে তা তাদের ধর্মবিশ্বাসের কতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছে তা এখনও প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়।

[مذهب النفاة من الصابئين في صفات الله] :

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حرّان، وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضًا. فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين

[সাবেয়ীদের আল্লাহর গুণ অস্বীকারকারী মতবাদ]

মহান রব্ব সম্পর্কে এসব [আল্লাহর গুণ] নাকচকারীদের মত হচ্ছে- তাঁর কেবল নেতিবাচক গুণ[১৪৫] বা সম্বন্ধীবাচক[১৪৬] গুণ বা এ দুয়ের সমন্বয়ে ঘটিত গুণ[১৪৭] রয়েছে। এদের প্রতিই ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল।[১৪৮] সম্ভবত জা'দ ইবন দিরহাম এটিকে সাবেয়ী দার্শনিকদের থেকে গ্রহণ করেছিল। তেমনিভাবে আবু নসর আল-ফারাবি[১৪৯] তার যাবতীয় দর্শনবিদ্যা হাররান[১৫০] গিয়ে সেখানকার সাবেয়ী দার্শনিকদের থেকে গ্রহণ করেছিল।

আর জাহম[১৫১] সেটি গ্রহণ করেছিল (যেমনটি উল্লেখ করেছেন ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা),

---

১৪৫. অর্থাৎ নেগেটিভ হিসেবে তুলে ধরা, যেমন: না বা নন শব্দ প্রবেশ করে বলা যে, তিনি মূর্খ নন, তিনি দর্শক নন, তিনি শ্রোতা নন, তিনি 'আরশের উপরে উঠেননি, তিনি ক্রোধান্বিত হন না, তিনি অবতরণ করেন না, চেহারা নেই, ইচ্ছা নেই, উপরে নয়, নিচেও নয় ইত্যাদি।

১৪৬. অর্থাৎ সম্বন্ধীয় বাচক শব্দ হচ্ছে, বাক্যে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যা দু'টি জিনিসকে শামিল করে যার একটি অপরটিকে আবশ্যক করে, যেমন: পিতা ও পুত্র ইত্যাদি। সুতরাং পিতা বললে বুঝতে হবে কারও বাপ আর তার সন্তান থাকা আবশ্যক। ইল্লাত ও মা'লুলের মতো। সুতরাং তাদের নিকট স্রষ্টা মানেই সৃষ্টি থাকা। অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর নিকট, তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টি সাথে থাকুক বা না থাকুক।
অথবা এমনকিছু অন্যের ওপর অনুমান করে যার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। যেমন আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের বক্তব্য, তিনি রহীম ও রহমত করেন, আর রহমত তাঁর সাথে থাকতে পারে না। কেননা তা সৃষ্ট, তাই রহমত বলতে তার নি'আমত বুঝানো হবে।
অনুরূপ তাদের বক্তব্য, তিনি (সামী') শ্রোতা ও শোনেন, কিন্তু শোনার কাজ তার দ্বারা হতে পারে না, কারণ সেটা সৃষ্ট। সুতরাং শোনা বলে সাওয়াব বা শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য। এভাবে.... (নাউযুবিল্লাহ)

১৪৭. উপরোক্ত নেগেটিভ গুণ ও তার সাথে সম্বন্ধীয় গুণ এ দু'টি গুণের সমন্বিত গুণ সাব্যস্ত করার বিষয়টি বিরল অবস্থায় তারা সাব্যস্ত করে থাকে। বস্তুত তাও শেষ পর্যন্ত পজেটিভ অ্যাপ্রোচে নয়।

১৪৮. অর্থাৎ সাবেয়ী দার্শনিকদের প্রতিই আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন।

১৪৯. তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ত্বারখান ইবন আওযলগ আত-তুর্কী। আবু নাসর আল-ফারাবী। মানতিক শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, "তার বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ রয়েছে, যে কেউ এগুলোর মাধ্যমে হিদায়াত চাইবে সে পথভ্রষ্ট হইবে ও দিশেহারা হবে। তার হাতের উপরেই ইবন সীনার উত্থান। আল্লাহর কাছেই কেবল তাওফীক চাই"। ফারাবীকে বলা হতো, দ্বিতীয় মু'আল্লিম। যেমনটি এরিস্টটলকে বলা হয় প্রথম মু'আল্লিম। ফারাবীর জন্ম হয় হিজরী ২৫৭ সালে, তার মৃত্যু হয় ৩৩৯ হিজরীতে। তার অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তার দর্শন সম্পর্কে বলা হয় সে জগাখিচুড়ি দর্শনে বিশ্বাসী ছিল। সে প্লেটো ও এরিস্টটল উভয়ের দর্শনের মিল করার অযথা চেষ্টা করেছিল। [দেখুন, ওয়াফায়াতুল 'আইয়ান (৫/১৫৩-১৫৭); যাহাবী, আল-'ইবার (২/২৫১); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৫/৪১৬-৪১৮); ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব (২/৩৫০-৩৫৪)]

১৫০. বর্তমান ইরাকের একটি অংশ। অধিকাংশ সাবেয়ী সম্প্রদায় সেখানে বসবাস করে। [মু'জামুল বুলদান (২/২৩৫-২৩৬)]

১৫১. অর্থাৎ জাহম ইবন সাফওয়ান।

يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات.

فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالين؛ إما من الصابئين وإما من المشركين.

ثم لمّا عُرِّبت الكتب الرومية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء، من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم.

[ذم الأئمة لبشر المريسي وأتباعه]:

ولما كان في حدود المائة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية

ভারতীয় শ্রমণ (श्रमण) বৌদ্ধ[১৫২]দের থেকে, যখন সে কতিপয় শ্রমণ দার্শনিকের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল, সেসব শ্রমণ বৌদ্ধ মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ব্যতীত সকল জ্ঞানকেই অস্বীকার করত।[১৫৩]

এরা সবই হচ্ছে জাহমের (পথভ্রষ্টতার) সনদসূত্র[১৫৪]; যাদের মূল ইয়াহূদী, সাবেয়ী, মুশরিক ও পথভ্রষ্ট দার্শনিকেরা, যারা হয় সাবেয়ী নতুবা মুশরিক।

অতঃপর যখন হিজরী দ্বিতীয় শতকে রোমান ও গ্রীক পুস্তকাদি আরবীতে অনূদিত হলো তখন মুসীবত আরও বেড়ে গেল। তদুপরি শয়তানও এসব পথভ্রষ্টদের অন্তরে নতুন করে বেশ কিছু ভ্রষ্টতা ঢেলে দিল, যেমনটি সে ঢেলে দিয়েছিল তাদের মতো অন্যান্যদের অন্তরে[১৫৫]।

[ইমামগণ কর্তৃক বিশর আল-মিররীসী ও তার অনুসারীদের নিন্দা]

অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যে এসব উক্তি যা সালাফে সালেহীনের নিকট "জাহমিয়্যাহ মতবাদ" নামে পরিচিত, বিশর ইবন গিয়াস

---

১৫২. আল-বাইরুনী বলেন, সুমুনিয়া মূলত: শামানিয়্যা। তারা বৌদ্ধদের নীতির অনুসারী। [তাহকীক মা লিল হিন্দ মিন মাকূলাতিন মাকবূলাতিন ফিল আকলি আও মারযূলাহ, ১৯]

১৫৩. শ্রমণ মূলত বৈদিক নীতি-রীতি বিরুদ্ধ তিনটি গোষ্ঠীর নাম। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক গোষ্ঠী। যারা কোনো দেবতায় বিশ্বাসী ছিল না।

১৫৪. লক্ষ্য করুন, লেখক এখানে জাহম ইবন সাফওয়ানের পথভ্রষ্টতার উৎস হিসেবে কয়েকটিকে চিহ্নিত করেছেন:
এক. ইয়াহূদী উৎস।
দুই. হাররানী উৎস।
তিন. ভারতীয় নিরিশ্বরবাদী দর্শন কেন্দ্রিক উৎস।
বস্তুত এগুলোর সবগুলোতেই সৃষ্টিকর্তার কোনো গুণ সাব্যস্ত করা হয় না। ফলে জাহম ইবন সাফওয়ান সেসব দর্শনে প্রভাবিত হওয়ার কারণে আল্লাহর জন্য কোনো গুণ সাব্যস্ত করতো না।

১৫৫. বুঝা গেল যে, সিফাত অস্বীকারকারীদের পথভ্রষ্টতার সূত্রে আরও যোগ হলো,
চার. গ্রীক ও রোমান দর্শন।
পাঁচ. নতুন করে শয়তানের দেয়া সন্দেহ ও ভ্রষ্টতা।
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা আল্লাহ তা'আলার গুণ অস্বীকার করে তারা সব ধর্মের, সব রকমের দর্শনের সারবস্তুকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। তাদের সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে তারা ইয়াহূদীদের অনুসারী, তারা হাররানীদের অনুসারী, তারা ভারতীয় দর্শনের অনুসারী, গ্রীক ও রোমান দর্শনের অনুসারী এবং শয়তানের নির্দেশনার অনুসারী।

بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل: مالك، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، وأبي يوسف، والشافعي، وأحمد وإسحاق، والفضيل بن عياض، وبشر الحافي وغيرهم،

আল-মিররীসী(১৫৬) এবং তার সমপর্যায়ের অন্যান্যদের কারণে বিস্তৃতি লাভ করে। আর তখন তাদের নিন্দা ও ভ্রষ্টতা বর্ণনায় ইমামদের অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে। যেমন বলেছেন: মালেক(১৫৭), সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ(১৫৮), ইবনুল মুবারক(১৫৯), আবু ইউসুফ(১৬০),

১৫৬. তিনি হচ্ছেন বিশর ইবন গিয়াস ইবন আবী কারীমা আব্দুর রহমান আল-মিররীসী, আল-আদাওয়ী, তাদের মাওলা। তার কুনিয়াত আবু আব্দুর রহমান। মু'তাযিলী, ফকীহ, দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, যিন্দীক বলে তাকে দোষারোপ করা হয়। মু'তাযিলাদের মারিসিয়্যাহ গোষ্ঠীর প্রধান। সে ঈমানের ক্ষেত্রে ইরজা বা মুরজিয়া ছিল। কাযী আবু ইউসুফ থেকে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু সে পরবর্তীতে জাহমিয়্যাদের মতবাদ গ্রহণ করে নেয়। হারুন-অর-রশীদ এর সময়কালে কষ্ট পেয়েছিল। তার দাদা ছিল ছিল যাইদ ইবনুল খাত্তাবের দাস। কারও কারও মতে তার বাপ ইয়াহূদী ছিল। তবে সে বাগদাদের অধিবাসী ছিল, সেখানে মারীস নামক এলাকার বাসিন্দা ছিল। প্রায় ৭০ বছর বয়স পেয়েছিল। মৃত্যু ২১৮ হিজরী। বলা হয়ে থাকে, সে ছিল বেঁটে, কুৎসিত, ময়লা কাপড়ে অবস্থান করতো, লম্বা চুল রাখতো, বড় মাথা ও কান বিশিষ্ট। তার বেশ কিছু গ্রন্থ ছিল, তবে ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী তার মতবাদগুলো খণ্ডনে গ্রন্থ রচনা করেছেন। [যিরিকলী, আল-আ'লাম (২/৫৫-৫৬)]

১৫৭. তিনি হচ্ছেন মালেক ইবন আনাস ইবন মালেক আল-আসবাহী আল-হিমইয়ারী। আবু আব্দুল্লাহ, দারুল হিজরা মদীনার ইমাম, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের চার ইমামের এক ইমাম। তার দিকেই মালেকী মাযহাব সম্পৃক্ত করা হয়। জন্ম হিজরী ৯৩ সালে মদীনায়। আবার মৃত্যুও হয় হিজরী ১৭৯ সালে মদীনায়। দীনের ব্যাপারে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মজবুত ব্যক্তি ছিলেন। আমীর বাদশাদের ধার ধারতেন না। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল ফলে তাকে আঘাত করা হয়েছিল যার কারণে তার কাঁধ খুলে গিয়েছিল। খলীফা রশীদ তাকে বাড়িতে নিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে তিনি সাফ বলে দেন, ইলমের কাছেই আসতে হয়। তারপর খলীফা যখন ইমাম মালেকের মাদ্রাসায় গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন তখন ইমাম মালেক বললেন, আমীরুল মুমিনীন, ইলমের সম্মান করা মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা। আপনি এভাবে বসতে পারেন না। ফলে ইমাম মালেকের সামনে ছাত্রের মতো বসে গেলেন। ইমাম মালেকের গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে মুওয়াত্তা। [দেখুন, যিরিকলী, আল-আ'লাম (৫/২৫৬-২৫৮)]

১৫৮. তিনি হচ্ছেন ইমাম সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ ইবন মাইমূন আল-হিলালী আল-কূফী, আবু মুহাম্মাদ। মক্কার হারামের মুহাদ্দিস। তবে মাওলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১০৭ হিজরীতে কূফায় তার জন্ম। কিন্তু তিনি মক্কায় অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি হাফেয, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, প্রশস্ত ইলম, বিশাল সম্মানের অধিকারী ছিলেন। শাফে'য়ী বলেন, যদি মালেক আর সুফইয়ান না হতো তবে হিজাযের ইলম চলে যেতো। তার এক চক্ষু কানা ছিল। সত্তরবার হজ করেন। তার "আল-জামে'উ ফিল হাদীস" একটি গ্রন্থ রয়েছে। তাফসীরেও তার বিশাল অবদান আছে। তিনি হিজরী ১৯৮ সালে মারা যান। [যিরিকলী, আল-আ'লাম (৩/১০৫-১০৬)]

১৫৯. তিনি হচ্ছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবন ওয়াদ্বিহ আল-হাম্বালী, মাওলা হিসেবে। আত-তামীমী, আল-মারওয়াযী। কুনিয়াত আবু আব্দুর রহমান। অনেক গ্রন্থ ও সফরের অধিকারী। সারা জীবন সফরে কাটিয়ে দেন। কখনও হজ কখনও জিহাদ আর কখনও ব্যবসায়ী হিসেবে কাটিয়েছেন। তার মধ্যে হাদীস, ফিকহ, আরবী ভাষা, ইতিহাস, বীরত্ব, দানশীলতার সমাহার ঘটেছিল। তিনি খুরাসানের অধিবাসী ছিলেন। ফুরাত নদীর তীরে হীত এলাকায় রোম দেশের কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ফেরার পথে মারা যান। তার রয়েছে, কিতাবুল জিহাদ আর সম্ভবত এ বিষয়ে প্রথম তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেন। [যিরিকলী, আল-আ'লাম (৪/১১৫)]

১৬০. আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব আল-কূফী, আবু হানীফার কাছে ফিকহ শিখেছেন, লম্বা সময় তার সাথে ছিলেন। তিনি হিশাম ইবন উরওয়া, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী প্রমুখ থেকে হাদীস শুনেছেন। তার থেকে ইবন মা'ঈন, আহমাদ ইবন হাম্বল প্রমুখ হাদীস শুনেছেন। আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, প্রথম যখন হাদীস লেখা শুরু করি তখন ইমাম আবু ইউসুফের কাছে

যেতাম, তিনি আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের চেয়ে মুহাদ্দিসগণের প্রতি বেশি ঝুঁকতেন। ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তাইমী বলেন, আমি আবু ইউসুফকে তার মৃত্যুর সময় বলতে শুনেছি, যা কিছু আমি ফতোয়া দিয়েছি তার সবকিছু থেকে ফিরে আসলাম, তবে যা কুরআন ও সুন্নাহ'র অনুযায়ী হবে সেগুলো ব্যতীত। অন্য বর্ণনায়, যা কুরআন অনুযায়ী হবে এবং যার মুসলিমগণ একমত হয়েছেন। মৃত্যু হিজরী ১৮২। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৪৭০)।

১৬১. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস ইবনুল আব্বাস আল-কুরাশী আল-মুত্তালেবী আশ-শাফে'য়ী। ইসলামের বিখ্যাত চার ইমামের একজন। তিনি হাদীস শুনেছেন মালেক, ইবন উয়াইনাহ প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস শুনেছেন হুমাইদী, আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম, আহমাদ ইবন হাম্বল প্রমুখ। শাফে'য়ী বলেন, সাত বছর বয়সে আমি কুরআন হিফয করেছি, দশ বছর বয়সে আমি মুওয়াত্তা হিফয করেছি। আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য প্রতি শতকের শুরুতে এমন একজন লোক মনোনিত করেন যে মানুষদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনান শিক্ষা দিবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মিথ্যা প্রতিহত করবে। তিনি বলেন, আমরা দেখলাম, প্রথম শতকে 'উমার ইবন আব্দুল আযীয, আর দ্বিতীয় শতকে ইমাম শাফে'য়ী। তিনি হিজরী ২০৪ সালে মারা যান। [ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৫)]

১৬২. তিনি হচ্ছেন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল ইবল হিলাল ইবন আসাদ ইবন ইদরীস ইবন আব্দুল্লাহ আশ-শাইবানী, আল-মারওয়াযী, আল-বাগদাদী। তার কুনিয়ত হচ্ছে, আবু আব্দুল্লাহ। হাদীস ও ফিকহের ইমাম। হাম্বলী মাযহাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব। তার মা তাকে পেটে নিয়ে বাগদাদে আসেন, সেখানেই হিজরী ১৬৪ সালের রবিউল আউয়াল মাসে তার জন্ম হয়। সেখানেই বড় হন। ইলম অন্বেষণ করেন, সেখানকার মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস শুনেন। তারপর কূফা যান, বসরা, মক্কা, মাদীনা, ইয়ামেন, শাম, জাযীরাহ গমন করেন। বাগদাদের ২৪১ সালের রবিউল আউয়াল মাসে মারা যান। তার গ্রন্থসমূহের অন্যতম হচ্ছে আল-মুসনাদ, কিতাবুয যুহদ ইত্যাদি। [ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৪৫-৯৭)]

১৬৩. তিনি হচ্ছেন আবু ইয়া'কূব ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম ইবন মাখলাদ আল-হানযালী, যাকে সবাই ইবন রাহওয়িয়াহ নামে চেনে। ইসলামের প্রখ্যাত ইমামগণের একজন। তিনি হাদীস শুনেছেন ইবন উয়াইনাহ, ইবন মাহদী, প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস শুনেছেন, আয-যুহরী, আল-বুখারী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ প্রমুখ। যখন ইসহাক্ব ইবন রাহওয়িয়াহ মারা যান তখন মুহাম্মাদ ইবন আসলাম আত-তূসী বলেন, আমি ইসহাকের চেয়ে কাউকে বেশি আল্লাহর ভয়কারী দেখিনি। মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহকে তো কেবল তারাই ভয় করবে তারা হচ্ছেন আলেম সম্প্রদায়"। তিনি আরও বলেন, তিনি ছিলেন যুগের আলেমগণের বেশি জ্ঞানী, সুফইয়ান আস-সাওরী জীবিত থাকলে তার কাছে আসার প্রয়োজন পড়ত। হাম্বল বলেন, আবু আব্দুল্লাহকে ইসহাক্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ইসহাক্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়? ইসহাক্ব আমাদের নিকট ইমাম। অনুরূপ ইমাম আহমাদ বলেছেন, দুনিয়াতে ইসহাকের সমতুল্য কাউকে আমি দেখি না। তিনি হিজরী ২৩৮ সালে মারা যান। ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/৩৫৮)।

১৬৪. তিনি হচ্ছেন আবু আলী আল-ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব ইবন মাসঊদ ইবন বিশর। ইমাম, আলেম, যাহেদ, ওয়া'রিয়। তিনি হাদীস শুনেছেন মানসূর, আ'মাশ প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, ইবনুল মুবারক, কাত্তান, ইবন মাহদী প্রমুখ। ইবনুল মুবারক বলেন, আমি সবচেয়ে বড় ইবাদতগুজার মানুষ হিসেবে দেখেছি আব্দুল আযীয ইবন আবী রুওয়াদকে। আর সবচেয়ে পরহেযগার মানুষ দেখেছি ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্বকে। সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী পেয়েছি সুফইয়ান আস-সাওরীকে, সবচেয়ে বড় ফকীহ পেয়েছি আবু হানীফাকে, তার মতো ফিকহে কাউকে দেখিনি। নদ্বর ইবন শুমাইল বলেন, আমি রশীদকে বলতে শুনেছি, আমি আলেমদের মাঝে ভয়ানক হিসেবে মালেক ছাড়া কাউকে দেখিনি, পরহেযগারীতে ফুদ্বাইলের মতো কাউকে দেখিনি। হিজরী ১৮৭ সালে তিনি মারা যান। ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৩৭২)।

১৬৫. তিনি হচ্ছেন আবু নসর বিশর ইবনুল হারেস ইবন আব্দুর রহমান আল-মারওয়াযী, হাফী উপাধিতে বিখ্যাত। তৎকালীন বড় যাহেদ ও আবেদ। তিনি হাদীস শুনেছেন মালেক, হাম্মাদ ইবন যায়েদ প্রমুখ

في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم.
وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن
فورك في كتاب «التأويلات»

প্রমুখ।

বর্তমানে মানুষদের হাতে যেসব তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা)সমূহ বিদ্যমান রয়েছে, যেমন সেসব তা'ওয়ীল যার অধিকাংশই আবু বকর ইবন ফূওরাক[১৬৬] স্বীয় 'কিতাবুত তা'ওয়ীলাত' (كتاب التأويلات) গ্রন্থে[১৬৭] উল্লেখ করেছেন[১৬৮]।

থেকে, তার থেকে হাদীস শুনেছেন আহমাদ আদ-দাওরাকী, সিররী আস-সাকতী প্রমুখ। যাহাবী বলেন, খুব কমই মুসনাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিজেকে নিন্দা করতেন বেশি। পরহেযগারী ও ইখলাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন। তারপর তিনি তার কিতাবসমূহ দাফন করে ফেলেন। ইবরাহীম আল-হারবী বলেন, বাগদাদ নগরী বিশরের মতো পূর্ণ বিবেকসম্পন্ন, জিহ্বার হিফাযতকারী কাউকে বের করেনি। যেন তার প্রতিটি চুলের নিচে আক্বল ছিল। মানুষ তার পিছনে পঞ্চাশ বছর চলেছে। তবে তার কাছে কোনো মানুষের গীবত পায়নি। তার থেকে উৎকৃষ্ট কাউকে আমি দেখিনি। মৃত্যু হিজরী ২২৭ সালে। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৪৬৯)।

১৬৬. তিনি হচ্ছেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন ফূওরাক, আল-আনসারী, আল-আসবাহানী। আশ'আরী, কালামশাস্ত্রবিদ। আবুল হাসান আল-আশ'আরীর ছাত্র আবুল হাসান আল-বাহেলীর কাছে আশ'আরী মতবাদের দীক্ষা নেন। তিনি কাররামিয়াদের ওপর কঠোর ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি বিশ্বাস করতেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে। সেজন্য সুলতান মাহমূদ সবুক্তগীন তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তার মৃত্যু সন ছিল হিজরী ৪০৬। তার অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তবে তার গ্রন্থের বড় সমস্যা হচ্ছে তিনি শুধু সমস্যা দেখেন। হাদীসের একটিকে আরেকটির বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অনবরত তা'ওয়ীল করতেন। বিস্তারিত দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/২১৪)।

১৬৭. ড. ফুয়াদ সিযকীন বলেন, (তারীখুত তুরাস ৪/৫২-৫৩) আমি এ পর্যন্ত এ গ্রন্থের ১৪টি নাম পেয়েছি। তবে সেটি বর্তমানে মুশকিলুল হাদীস ওয়া বায়ানুহু নামে দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ থেকে ছাপা হয়েছে।

১৬৮. গ্রন্থটির লেখক আবু বকর ইবন ফূওরাক ইমাম বাকেল্লানীর সমসাময়িক ছিলেন। ইবন ফূওরাক ইমাম বাকেল্লানীর চেয়েও হাদীসশাস্ত্রে বেশি শ্রম ব্যয় করেন। ইমাম বাইহাকী তারই ছাত্র ছিলেন। ইবন ফূওরাক আল্লাহর জন্য সিফাতে খবরিয়্যাহ তথা যেসব গুণের কথা কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে সেগুলো সাব্যস্ত করতেন। তিনি আল্লাহর জন্য চেহারা, দু' হাত, চোখ সাব্যস্ত করতেন। এগুলোকে তা'ওয়ীল করতে নিষেধ করতেন। এগুলোকে 'জারেহা' বা অঙ্গ বলতেন না। এগুলোকে দেহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলা থেকেও মানা করতেন। তবে তিনি আল্লাহর জন্য সিফাতে ইখতিয়ারিয়্যাহ তথা তাঁর ইচ্ছাকৃত কর্মবাচক গুণগুলোকে অস্বীকার করতেন এ কারণে যে, তার মতে এগুলো 'হুলুলুল হাওয়াদিস' বা স্রষ্টার ওপর নতুন আপতিত বিষয়। তার পদ্ধতি ছিল হাদীস দিয়ে সিফাতের সূক্ষ্ম বিষয়ে দলীল গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি মনে করতেন খবরে ওয়াহিদ (যে হাদীসের সনদ মুতাওয়াতির নয়) তা দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞানের ফায়েদা দেয় না। বরং তার মতে তা দ্বারা কেবল ধারণা জন্মায়। দেখুন, মুশকিলুল হাদীস পৃ. ২২, ৬৮, ১০০, ১৭১, ২০৬, ১২৩, ২০৫।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইবন ফূওরাকের এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, এতদসত্ত্বেও এতে যেসব সহীহ হাদীসের তা'ওয়ীল দেখা যায় তা সরাসরি বিশর আল-মারিসী ও তার মত অপর জাহমিয়্যাদের তা'ওয়ীল এর হুবহু সংকলন। [দারউত তা'আরুদ্ব (৫/২৩৭)]
অন্যত্র তিনি বলেন, আর আবু বকর ইবন ফূওরাক তার কিতাবে বিশর আল-মারিসী ও তার পরবর্তী লোকদের সেসব তা'ওয়ীল একত্রিত করেছেন যা তার কিতাবের জন্য উপযোগী বিবেচনা করেছেন। তবে তিনি নিজে বিশরের মতো জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কারণ তিনি কিছু সিফাত সাব্যস্ত করেছেন যা বিশর সাব্যস্ত করেনি। তার আগে আবুল হাসান ইবন মাহদী আত-ত্বাবারীও তা'ওয়ীল করে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তার পদ্ধতি আবু বকর ইবন ফূওরাকের পদ্ধতির চেয়ে উত্তম। [বায়ানু

وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبّائي، وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني،

অনুরূপ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'উমার আর-রাযী[১৬৯] তার 'তা'সীসুত তাকদীস' (تاسيس التقديس) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন[১৭০] আর এগুলো হুবহু পাওয়া গেছে তারা ব্যতীত অন্যান্য লোকদের বক্তব্যে[১৭১]

তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৭/১৫৩-১৫৪)]

আল্লামা মু'আল্লেমী বলেন, বস্তুত ইবন ফূওরাক জাহমিদের পদ্ধতিতে চলেছিলেন, তিনি তার এ কিতাবে ইবনুস সালজীর নীতি অনুসরণ করেন। কারণ তিনি সিফাতের আয়াতসমূহের বিকৃতি সাধন করেন, হাদীসের মাঝে ত্রুটি প্রদানের চেষ্টা করেন। [আত-তানকীল (১/২৪২)]

ইবন ফূওরাকের কিতাবে যেসব মারাত্মক সমস্যা দেখা যায় তা হচ্ছে:

১) প্রতিটি হাদীসকে তা'ওয়ীল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। তিনি এ কাজকে আহলুল হাদীসদের একটি কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কারণ তার নিকট আহলুল হাদীসদের কাজ দু'টি:

ক) হাদীস বর্ণনা করবে, সনদ যাচাই করবে, সহীহ ও দুর্বল আলাদা করবে।

খ) হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন অবস্থা যাচাই করবে, মানদণ্ড দাঁড় করাবে, মূল থেকে শাখা বের করবে, সন্দেহকারীদের সন্দেহ দূর করবে। আর তিনি নিজে এ কাজটি করাকে আহলুল হাদীসদের কাজ বলে এসব তা'ওয়ীলের গ্রহণযোগ্যতা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুত এভাবে অপব্যাখ্যা দাঁড় করানো কোনো মুহাদ্দিস তো নয় কোনো মুসলিমের কাজই নয়। ইবন ফূওরাকের এসব তা'ওয়ীল এত বেশি পরিমাণ তাহরীফ তথা বিকৃতির পর্যায়ে গিয়েছিল যে, তার একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও যাহেদ কাউসারী এসব তা'ওয়ীলের অনেকগুলোর ব্যাপারে আপত্তি জানাতে বাধ্য হয়েছিল। দেখুন, বাইহাকীর আল-আসমা ওয়াস সিফাতের উপর যাহেদ কাউসারীর টীকা, পৃ. ৪৫২, ৫১৮।

২) সহীহ, দ্ব'য়ীফ, বানোয়াট সব রকমের হাদীসকে একসাথে মিশিয়ে ফেলেছিল। ফলে সে সবগুলোকেই তা'ওয়ীল করেছিল, যেন তা'ওয়ীল করা তার জন্য বাধ্যতামূলক কাজ ছিল। নাউযুবিল্লাহ। [তার কিছু নমুনা দেখুন, ড. আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ এর গ্রন্থ মাওকাফু ইবন তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়েরা (২/৫৬২); ড. আব্দুর রাযযাক মা'আশ, মাসালিকি আহলিস সুন্নাতি ফী মা আশকালা মিন নুসূসিল আকীদাহ (২/৩০)]

১৬৯. তিনিই ফখরুদ্দীন রাযী, যার জীবনী ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১৭০. রাযী এ গ্রন্থটি তৎকালীন বাদশাহ আস-সুলতানুল আদিল সাইফুদ্দীন আবু বকর ইবন আইয়্যুব ইবন শাযী এর জন্য লিখেছিলেন। এ বাদশাহ অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের লোক ছিলেন। [ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১৩/৯৪)]

রাযীর লেখা এ গ্রন্থ 'আসাসুত তাকদীস' এটাকে তিনি চারভাগে ভাগ করেছেন:

প্রথম ভাগ, আল্লাহ দেহবাদ থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয় ভাগ, হাদীস ও আয়াতসমূহের মধ্য হতে যা মুতাশাবিহাত তার তা'ওয়ীল।

তৃতীয় ভাগ, সালাফদের মাযহাব নির্ধারণ

চতুর্থ ভাগ, সালাফদের মাযহাবের শাখা নির্ধারণ।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ গ্রন্থটির খণ্ডনে "নাকদুত তা'সীস" নামে এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ গ্রন্থে রাযী জাহমিয়্যাদের দলীল-প্রমাণাদি এত বেশি পরিমাণ জমা করেছে যা জাহমিয়্যারাও তাদের কোনো গ্রন্থে জমা করেছে বলে দেখা যায়নি। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/২৮৯)।

এ গ্রন্থের খণ্ডন করে ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যান্য স্থানে আরও যা বলেছেন, তা দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/২১৬, ৩৫১, ৫৫৬); দারউত তা'আরুদ্ব (১/৪); আসসাব'ঈনিয়্যাহ (বুগইয়াতুল মুরতাদ), পৃ. ২০১; আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/২১৬); মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৭১-৭২)।

১৭১. অর্থাৎ পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট কিছু সম্প্রদায়ের কাছে। পূর্বে যেসব সন্দেহ জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলাদের কাছে ছিল, সেসব সন্দেহ হুবহু এসে পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে, যা দ্বারা বুঝা গেল যে, জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের বিরোধিতা করতে করতে কখন যে তারা জাহমিয়্যাহ

وأبي الحسين البصري، وأبي الوفاء بن عقيل، وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًا ولهم كلام حسن في أشياء.

فإنما بيَّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري،

যেমন, আবু আলী আল-জুব্বায়ী[১৭২], আব্দুল জব্বার ইবন আহমাদ আল-হামাদানী[১৭৩], আবুল হুসাইন আল-বসরী[১৭৪], আবুল ওফা ইবন 'আকীল[১৭৫], আবু হামিদ আল-গাযালী প্রমুখদের কথায় সেসবের অনেক পাওয়া যায়। এগুলো সবই হুবহু বিশর আল-মিররীসী স্বীয় কিতাবে যা উল্লেখ করেছিলেন তাই। যদিও এদের কারো কারো থেকে তা'ওয়ীলের রদ ও বাতিলকরণে অনেক বক্তব্য রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সুন্দর সুন্দর কথাও আছে।

[ইমাম দারেমীর কিতাবের প্রশংসা]

তবে আমি স্পষ্ট বর্ণনা করছি যে, তাদের তা'ওয়ীল হুবহু মিররীসীর তা'ওয়ীল। এটার প্রমাণ ইমাম বুখারীর সময়কালের প্রসিদ্ধ ইমাম দারেমী[১৭৬] স্বীয় «رد عثمان بن سعيد، على الكاذب العنيد، فيما افترى على الله في التوحيد» কিতাবে এসব তা'ওয়ীল হুবহু বিশর আল-মিররীসীর বলে

ও মু'তাযিলাদের বক্তব্য ও সন্দেহগুলো আত্মস্থ করে নিয়েছে তা তারা নিজেরাও বুঝতে পারেনি।

১৭২. তিনি হচ্ছেন আবু আলী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব ইবন সালাম আল-জুব্বাঈ, মু'তাযিলাদের একজন বড় আলেম। তার থেকেই সর্বপ্রথম আবুল আশ'আরী মু'তাযিলা মতবাদ গ্রহণ করে। জুব্বাঈ এসব গ্রহণ করেছে তার শিক্ষক আবু ইউসুফ ইয়া'কূব ইবন আব্দুল্লাহ আল-বসরী থেকে, তখন তিনি বসরায় মু'তাযিলাদের প্রধান ছিলেন। তার তিন ভাই বিষয়ক মুনাযারা সারা দুনিয়া খ্যাত। ৩০৩ হিজরীতে মারা যায়। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/১৮৩)।

১৭৩. তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আব্দুল জাব্বার ইবন আহমাদ ইবন আব্দুল জাব্বার আল-হামাযানী, প্রথমে সে ভিন্ন মতাদর্শের ছিল, কিছু দিন মু'তাযিলাদের মজলিসে হাজির হয়ে পুরো মু'তাযিলা হয়ে যায়। মৃত্যু ৪১৫ হিজরী। ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/২৪৪)।

১৭৪. তিনি হচ্ছেন আবুল হুসাইন আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুত তাইয়্যেব, আল-বসরী। বড় ধরনের বাগ্মী ছিলেন। মু'তাযিলাদের লেখক ও উকীল। মৃত্যু ৪৩৬ হিজরী বাগদাদে। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৫৮৭)।

১৭৫. তিনি হচ্ছেন, আবুল ওফা আলী ইবন আকীল ইবন মুহাম্মাদ ইবন আকীল আল-বাগদাদী। আবুল ওফা আল-হাম্বলী। তিনি তার অনেক গ্রন্থে তা'ওয়ীল করেছেন। হাম্বলী হওয়া সত্ত্বেও আকীদাহ'র ক্ষেত্রে অনেকটা মু'তাযিলী। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৯/৪৪৩)।

১৭৬. তিনি হচ্ছেন উসমান ইবন সা'ঈদ ইবন খালেদ ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী আস-সিজিস্তানী, আবু সা'ঈদ, আল-ইমাম, আল-আল্লামাহ। তিনি ছিলেন বিদ'আতীদের চক্ষুশূল ও গলার কাঁটা। সুন্দর মুনাযারার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, প্রমাণ উপস্থাপনে সিদ্ধহস্ত। হাদীস সংগ্রহে অধিক সফরকারী। তার মৃত্যু ছিল ২৮০ হিজরীতে। তিনি জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের আকীদাহ'র খণ্ডনে দু'টি গ্রন্থ লিখেছেন। আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, আর-রাদ্দু আলাল বিশর আল-মিররীসী।
আকীদাহ'র ছাত্রদের জন্য এ দু'টি গ্রন্থ না পড়ার কোনো বিকল্প নেই। শাইখুল ইসলাম ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যেম এ দু'টি গ্রন্থ পড়ার জন্য অসিয়ত করতেন। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/৬২১); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৩১; ইবন আব্দুল হাদী, রিসালাতুল লাতীফাতুন ফী আহাদীসি মুতাফাররাক্বাতিন দ্বা'য়িফাতিন, পৃ. ৭৪-৭৬।

صنف كتابًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم، وضعف حجة من خالفهم.

[إجماع الأئمة على ذم المريسية]:

ثم إذا رأى الأئمة ـ أئمة الهدى ـ قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم،

উল্লেখ করেছেন। যাতে তিনি মিররীসী থেকে এমনসব বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যা প্রমাণ করে যে, মিররীসী পরবর্তী যারাই এ বিষয়ে তার সাথে সংযুক্ত হয়েছে সে তাদের থেকে নিয়ম-নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশি পারঙ্গম, অনুরূপ মা'কূল[১৭৭] ও মানকূল[১৭৮] সম্বন্ধে অধিক অবগত। অতঃপর দারেমী স্বীয় বক্তব্য দ্বারা সেগুলো খণ্ডন করেছেন; যা কোনো বিবেকের যুক্তিতে পারঙ্গম মেধাবী ব্যক্তি অধ্যয়ন করলে সহজেই জানতে পারবে যে, সালাফে সালেহীন বস্তুত কোন নীতির ওপর ছিলেন। আর তার নিকট সালাফগণের তরীকার প্রামাণ্যতা শক্তিশালী হওয়া এবং তাদের বিরোধীদের তরীকার প্রমাণ দুর্বল হওয়া সহজেই ফুটে উঠবে।

[মিররীসীয়্যাহ[১৭৯]দের নিন্দায় উম্মতের ইমামদের ঐকমত্য]

অতঃপর যখন কেউ দেখবে যে, হিদায়াতের ইমামগণ মিররীসীর নিন্দায় একমত, এমনকি তাদের অধিকাংশই তাদেরকে কাফের ও গোমরাহ বলেছেন।[১৮০] আর যখন কেউ জানতে

১৭৭. অর্থাৎ বিবেকের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি।

১৭৮. অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র দলীল-প্রমাণাদি।

১৭৯. অর্থাৎ যারা বিশর আল-মিররীসী আল-জাহমীর অনুসারী। পরবর্তীকালে যারাই জাহমিয়্যাদের রদ্দ করেছেন তারা বিশর আল-মারিসী ও তার অনুসারীদের দল মিররীসীয়্যাহকে জাহমিয়্যাদের মুখপাত্র হিসেবে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। অবশ্য অধিকাংশ গ্রন্থকার মিররীসী ফির্কাকে মুরজিয়্যাদের একটি ফির্কা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (১/২৫১); আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ১৪০; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২৩২।

১৮০. এ বিষয়ে সালাফদের বক্তব্য অগণিত। যেমন,
ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেন, মিররীসী, তার রক্ত হালাল, তাকে হত্যা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমি বাগদাদবাসীকে বিশর আল-মিররীসী হত্যার যোগ্য তা একাধিকবার বলেছি। [দেখুন, তারীখে বাগদাদ (৭/৬৩)]
শাবাবাহ ইবন সুওয়ার বলেন, আমার, আবুন নদ্বর হাশেম ইবন কাসেম ও অন্যান্য ফকীহগণের ঐকমত্য হয়েছিল যে, মিররীসী কাফের, নাস্তিক। আমরা মত দিয়েছিলাম যে, তাকে তাওবার জন্য ডাকা হবে, যদি তাওবা করে তো ভালো, নতুবা তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। [আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১২৪)]
মাররূযী বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহকে (আহমাদ ইবন হাম্বলকে) বলতে শুনেছি, তার কাছে মিররীসীর আলোচনা করা হলো, তখন তিনি বললেন, তার বাপ ইয়াহূদী ছিল, তুমি মনে কর সে আর কী হবে?! [দেখুন, যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (১/৩২৩); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/২০১)]

وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبيّن الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر.

[بعض الكتب التي عنيت بنقل مذهب السلف]:

وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلاً منه، مثل:

পারবে যে, পরবর্তীদের মাঝে প্রচলিত এসব বক্তব্য মূলত মিররীসীর মতবাদই, তখন আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দিতে চান তার জন্য হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাবে। ওলা হাওলা ওলা কুউয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

এ ব্যাপারে ফাতওয়া বিস্তৃত করার সুযোগ নেই। আমি প্রাথমিক বিষয়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করলাম মাত্র। আর বুদ্ধিমান তো যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই পথ চলে।

[সালাফে সালেহীনের মত বর্ণনায় যেসব গ্রন্থ গুরুত্ব প্রদান করেছে তার কিছুর বর্ণনা]

আর এ বিষয়ে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য অসংখ্য কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো: লালেকাঈ[১৮১] এর আস-সুনান[১৮২],

---

আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, কোনো কোনো ইয়াহূদী মুসলিমদের কাউকে কাউকে মিররীসীর দ্বারা তাদের দীনের পথভ্রষ্টতা ও বিনষ্ট করার বিষয়টি বর্ণনা করে সাবধান করেছিল। আবু ইয়া'কূব ইসহাক ইবন ইবরাহীম লুলু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় দেখতে পেলাম বিশর আল-মিররীসীকে, লোকেরা তার ওপর জড়ো হয়ে আছে। এমন সময় এক ইয়াহূদী সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'সাবধান! সে যেন তোমাদের ওপর তোমাদের কিতাব নষ্ট না করে দেয়, যেমন তার পিতা আমাদের ওপর তাওরাতকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। অর্থাৎ তার বাপ ইয়াহূদী ছিল।' [দেখুন, তারীখে বাগদাদ (৭/৬১)]

তার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ১৪০; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্বি, পৃ. ২৩২।

১৮১. তিনি হচ্ছেন, হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবন মানসূর আর-রাযী আত-ত্বাবারী আল-লালেকাঈ। আবুল কাসেম, শাফে'য়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তার বিখ্যাত উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন, আল-ইসফারাঈনী, আবু মাসউদ আদ-দিমাশকী, আবু তাহের আল-মুখাল্লাস প্রমুখ। যিনি তার যুগে শাফে'য়ীদের মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন আল-খত্বীব আল-বাগদাদী, আবুল হাসান আলী ইবনুল হুসাইন আল-উকবারী প্রমুখ।

তিনি হিজরী ৪১৮ সালে মারা যান। তার রয়েছে অনেকগুলো গ্রন্থ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, আসমাউ রিজালিস সহীহাইন, কারামাতু আওলিয়ায়িল্লাহ, শারহু কিতাবি উমার ইবনিল খাত্তাব ইলা নাসারা আশ-শাম ইত্যাদি।

দেখুন, তারিখে বাগদাদ (১৪/৮০); যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/১০৮৩); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৪১৯); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১২/২৪); মুকাদ্দিমাতু কিতাব শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ।

১৮২ কিতাবটির নাম নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ হয়েছে:

১- কারো কারো মতে, কিতাবটির নাম 'কিতাবুস সুন্নাহ'। [ইবন কাসীর, বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১২/২৪); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১/৪৭)]

২- কারও কারও মতে, কিতাবুস সুনান, [ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতাওয়া আল-হামওয়িয়্যাহ আল-কুবরা]

৩- কারও কারও নিকট, শারহুস সুন্নাহ, [খত্বীব আল-বাগদাদী, তারিখু মাদীনাতিস সালাম

(১৪/৭০); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/২১১)]

৪- শারহু ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ, [যাহাবী, আল-উলু লিল 'আলিয়্যিল আযীম (২/১৩১০)]

৫- শারহু হুজাজি উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ [আবু শামাহ, আল-বা'য়িস আলা ইনকারিল হাওয়াদিস, পৃ. ১০-১১]

৬- শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ [আহমাদ সা'দ হামদান আল-গামেদী, বর্তমান তাহকীকের ভূমিকা]

সম্ভবত নামটি বড় হওয়ায় প্রত্যেকে একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে বর্তমান নামটিই বইয়ের উপর লেখা হয়; কারণ পাণ্ডুলিপির উপর এ নামটিই লেখা ছিল।

ইমাম লালেকাঈ তার এ গ্রন্থটি রচনার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন:

এক. অনেক আলেম তার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন তিনি এমন একটি কিতাব লেখেন যাতে আহলুল হাদীস তথা আহলুস সুন্নাহ'র আকীদাহ'র ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

দুই. যখন তিনি দেখলেন যে, মানুষরা তৎকালীন আধুনিক জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে প্রাচীন গ্রন্থগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে, যার উপর ইসলামী শরী'আত দাঁড়িয়ে আছে, যার দিকে সালাফে সালেহীনের আলেমগণ আহ্বান জানাতেন, যে পথে চলে তারা হিদায়াত পেতেন, যার ওপর তারা নির্ভর করতেন। [দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, পৃ. (১/২৮)]

১৮৩. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামদান ইবন বাত্তাহ আস-সুলামী, আল-উকবারী আল-হাম্বলী, যাকে 'ইবন বাত্তাহ' উপাধীতে ডাকা হয় তারই কোনো এক পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে। বাল্যকালেই ইলম অর্জনের জন্য সফর করেন। তিনি হাদীস শুনেছেন ইবন মানী' আল-বাগাওয়ী থেকে বাগদাদে, ইমাম আহমাদের মুসনাদের বর্ণনাকারী আবু বকর আল-কাত্বী'ঈর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, আরও শুনেছেন আবু আব্দুল্লাহ আল-মুহামেলী, আবু বকর আব্দুল আযীয গোলাম আল-খাল্লাল, ইবন সা'য়েদ প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন আবু নু'আইম আল-আসফাহানী, আবু ত্বালেব আল-'উশারী প্রমুখ। তার রয়েছে অনেক গ্রন্থ। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, রিসালাতুন ফী ইবত্বালিল হিয়াল, 'আশ-শারহু ওয়াল ইবানাহ আলা উসূলিস সুন্নাতি ওয়াদ দিয়ানাহ' যা আল-ইবানাতুস সুগরা নামে বিখ্যাত। দেখুন, তারীখে বাগদাদ (১০/৩৭১); যাইলু ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (৪/১৫৪); শাযরাতুয যাহাব (৩/১২২); অনুরূপ কিতাব আশ-শারহু ওয়াল ইবানাহ এর ভূমিকায় শাইখ রিদ্বা না'সান এর বক্তব্য। ইবন বাত্তাহ রাহিমাহুল্লাহর গ্রন্থ লেখার নিয়ম হচ্ছে মুহাদ্দেসীনের পদ্ধতি। যেমনটি করতেন আবু বকর আল-আজুররী তার আশ-শরী'আহ গ্রন্থে। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫২-৫৩)] তার জন্ম সন হিজরী ৩০৪, আর তিনি হিজরী ৩৭৮ সালে মারা যান।

১৮৪. এখানে ইবন বাত্তার অপর বড় গ্রন্থটির কথাই বলা হচ্ছে, যার নাম 'আল-ইবানাহ আন শরী'আতিল ফিরাক্বিন নাজিয়াহ ওয়া মুজানাবাতিল ফিরাক্বিল মাযমূমাহ' বা কখনো কখনো শুধু 'আল-ইবানাহ' বলা হলেও মূলত তা 'আল-ইবানাহ আল-কুবরা' নামে বেশি পরিচিত। এটির তাহক্বীক করেছেন শাইখ রিদ্বা না'সান, উসমান ইথিওবী ও ইউসুফ আল-ওয়াবেল।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ গ্রন্থ থেকে প্রচুর বর্ণনা করতেন। যেমন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৪২, ৩৭৬, ৩৯৬), (৬/৪০২, ৪০৪, ৪১২, ৪১৫, ৪১৯), (৭/১৮০, ৬৬০) আরও বহু জায়গায় তিনি অনেক উদ্ধৃতি এখান থেকে নিয়েছেন।

১৮৫. তিনি হচ্ছেন আবু যর আব্দুল্লাহ [মতান্তরে 'আব্দ যেমটি যাহাবী বলেছেন] ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-আনসারী আল-হারাওয়ী, আল-মালেকী। তবে তিনি মৌলিকভাবে আশ'আরী মতবাদের লোক ছিলেন। তিনি কাদ্বী আবু বকর ইবনুত ত্বাইয়্যেব থেকে ইলমুল কালাম এর সবক নিয়েছিলেন। তার অন্যান্য উস্তাদগণের অন্যতম হচ্ছেন দারাকুতনী, আবু ইসহাক আল-মুস্তামেল্লী, আবু ইসহাক আদ-দীনাওয়ারী প্রমুখ। তার থেকে বর্ণনা করেছেন আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী, মূসা ইবন আলী আস-সাক্বলী প্রমুখ। তার থেকে ইজাযতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন (প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের হাফেযদ্বয়) ইবন আব্দুল বার ও খত্বীব আল-বাগদাদী।

و «الأصول» لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، و «الأسماء والصفات» للبيهقي،

আবু 'উমার আত-ত্বলামানকী[১৮৬] এর 'আল-উসূল, ইবনু আবদিল বার[১৮৭] এর বক্তব্য, বাইহাকী[১৮৮] এর আল-আসমা ওয়াস সিফাত।

অনেক বড় পরহেযগার, দানশীল ও নেককার লোক ছিলেন। যাহাবী বলেন, তিনি বাগদাদের সুন্নাহ ও হাদীস নিয়ে মু'তাযিলা, রাফেযা ও কাদরিয়াদের সাথে বিতর্ক করতেন।...

তিনি সহীহ বুখারীর একজন বর্ণনাকারী ছিলেন। ইমাম বুখারী থেকে তিনজন তা বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন হাম্মুওইয়াহ ইবন ইউসুফ ইবন আ'ইয়ুন আল-মুসতামিল্লী, হামাওয়ী ও কুশমুইহানী। তিনি এ তিনজন থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। [ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৫৫৬)]

তার জন্ম ৩৫৫ হিজরী, মৃত্যু ৪৩৪ বা ৪৩৫ হিজরী। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল-জামে'উ, আদ-দু'আউ, ফাদ্বায়েলুল কুরআন, দালায়েলুন নবুওয়াহ, আর কিতাবুস সুন্নাহ, যা ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ উপরে বর্ণনা করেছেন। তবে কিতাবটি বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন, তারীখে বাগদাদ (১১/১৪১); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৫৫৪); তাযকিরাতুল হুফফায (৩/১১০৩); ইবনুল ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/২৫৪)।

১৮৬. তিনি হচ্ছেন আবু 'উমার আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-মু'আফেরী, আল-আন্দালুসী আত্ব-ত্বালামানকী। তাকে ত্বালামাঙ্ক শহরের দিকে সম্পৃক্ত করে ত্বালামাঙ্কী বলা হয়। মালেকী ইমামগণের অন্যতম। অত্যন্ত দৃঢ় ইমাম ছিলেন। স্পেনের মানুষ তার ইলম দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছেন। ইবন বাশকুওয়াল বলেন, 'তিনি ছিলেন বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারীর মতো, তাদের দমনকারী, শরী'আতের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন, আল্লাহর ব্যাপারে কঠোর...' ৪২৯ হিজরীতে মারা যান। তার গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল-উসূল [যেমনটি উপরে এসেছে] বা আল-ওসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল। [দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৫০); ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৮৪); যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১৭৮] তবে সম্ভবত গ্রন্থটি হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৫৬৬); আল-ইবার (৩/১৬৮); সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত (৮/৩২); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/২৪৩)।

১৮৭. তিনি হচ্ছেন আবু 'উমার ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল বার আন-নামেরী আল-আন্দালুসী, আল-কুরতুবী আল-মালেকী। প্রতীচ্য দেশের হাফেয। তিনি ছিলেন ইমাম, আলেম, সুন্নাহ ও ইত্তেবার ব্যক্তি। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, "তিনি আকীদাহ'র ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের মাযহাবে ছিলেন। কখনও ইলমুল কালামে প্রবেশ করেননি..."

ইমাম ইবন আব্দুল বার স্পেনে বসবাস করেন ও সেখানেই হিজরী ৪৬৩ হিজরীতে মারা যান। তার রচিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম হচ্ছে, আত-তামহীদ, আল-ইস্তেযকার, আল-ইস্তী'আব, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী, আল-ইন্তেকা ইত্যাদি। [দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৭/৬৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/১৫৩); ইবার (৩/২৫৫); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১২/১০৪)] ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, আবু হামেদ আল-গাযালী কালামশাস্ত্রের নিন্দায় যা বর্ণনা করেছেন তা ইমাম ইবন আব্দুল বার এর কিতাব 'জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী' থেকে নকল করেছেন। [দারউত তা'আরুদ্ব (৭/১৫৬-১৫৭)]

এখানে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইবন আব্দুল বার এর যে বক্তব্যের কথা বলেছেন তা তার তামহীদ কিতাবের সপ্তম খণ্ডে এসেছে।

১৮৮. তিনি হচ্ছেন হাফেয আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবন আলী আল-ফক্বীহ, আশ-শাফে'য়ী। ইমাম হাকেম এর বড় ছাত্রদের একজন। আর বাইহাক্ব হচ্ছে নাইসাপুর এর একটি গুচ্ছগ্রামের নাম। হিজরী ৩৮৪ তে জন্ম, আর হিজরী ৪৫৮ সালে মৃত্যু। অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন: আস-সুনানুল কুবরা দশ খণ্ডে, আস-সুনানুস সগীর অনেক খণ্ডে, শু'আবুল ঈমান, দালায়েলুন নবুওয়াহ, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, আল-ই'তিক্বাদ ইত্যাদি।

দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (১/৭৫); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/১৬৩); তাযকিরাতুল হুফফায (২/১১৩২); ইবনুল ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/৩০৪)।

আকীদায় তিনি অধিকাংশ জায়গায় আশ'আরী ছিলেন। কারণ তিনি তার উস্তাদ ইবন ফুওরাক দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলেন ও তার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وقبل ذلك «السنة» للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني،

তারও পূর্বে ইমাম তাবারানী[১৮৯] এর আস-সুন্নাহ, অনুরূপ ইমাম আবুশ শাইখ আল-আসফাহানী[১৯০],

"ইমাম বাইহাক্বী যখন আকীদাহ'র গ্রন্থ লেখতে চাইলেন তখন তিনি ইমাম আহমাদের আকীদাহ লিখতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা লিখার ক্ষেত্রে আবুল ফদ্বল আব্দুল ওয়াহিদ ইবন আবিল হাসান আত-তামীমীর বর্ণনায় নির্ভর করেন। বস্তুত এ তামীমীর বর্ণনা সরাসরি ইমাম আহমাদের শব্দ নয়। তামীমী ফিকহের বর্ণনার মত ইমাম আহমাদ থেকে নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করতেন। ফলে তামীমীর এসব বর্ণনায় অনেক মুনকার শব্দ প্রবেশ করে, যার কারণে বাইহাক্বী বেশ কিছু স্থানে সহীহ আকীদাহ'র বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। অথচ তিনি মনে করছিলেন যে, এটা ইমাম আহমাদের মত। বাস্তবে তা ইমাম আহমাদের মত নয়।" [দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১৭৬), (৬/৫৩), (১২/৩৬৭); আল-মুস্তাদরাক আলাল ফাতাওয়া (১/৮৫)]

বাইহাক্বী রাহিমাহুল্লাহর 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' যাহেদ কাউসারী কর্তৃক যে তাহকীক রয়েছে তা ভুল ও তাহরীফ বা বিকৃতিতে ভরপুর। পরবর্তীতে এটি বিশুদ্ধ তাহকীকে অন্যদের থেকে দু খণ্ডে বের হয় তা যথাযথ।

ইমাম বাইহাক্বীর আকীদাহ'র অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমি আমার "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" গ্রন্থে করেছি। সেখানে দেখার অনুরোধ থাকল।

১৮৯. তিনি হচ্ছেন আবুল কাসেম সুলাইমান ইবন আহমাদ আল-লাখমী আত-ত্বাবারানী। হাদীসের ইমামগণের মধ্যে বড় একজন ইমাম। তিনি আবু যুর'আহ আদ-দিমাশক্বী, ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম আদ-দাবারী, ইদ্রীস ইবন জা'ফার আল-'আত্তার প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইবন মান্দাহ, আবু বকর ইবন মারদুওইয়াহ, আবু নু'আইম আল-আসফাহানী প্রমুখ। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে, আল-মু'জামুল কাবীর, আল-মু'জামুল আওসাত্ব ও আল-মু'জামুস সগীর। আসফাহানে ৬০ বছর হাদীসের অধ্যাপনা করেন। তার জন্ম হিজরী ২৬০ সালে আর মৃত্যু হিজরী ৩৬০ সালে। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৬/১১৯)।

তার যে গ্রন্থের কথা এখানে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলছেন তা হারিয়ে যাওয়া কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার এ কিতাব থেকে অনেক বেশি চয়ন করেছেন। যেমন, দারউত তা'আরুদ্ব (৭/১০৮); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/৩৬৫), (২/৩৯০, ৬৯৬); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩৭৯), (৪/৫৩৯), (৩৩/১৭৩)।

অনুরূপ ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। [হাদীউল আরওয়াহ (২/৬৪৩); উদ্দাতুস সাবেরীন, পৃ. ৫৩৮]

ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী তার 'তাজরীদু আসানীদিল কুতুবিল মাশহূরাহ' গ্রন্থে এ কিতাবটির কথা তার সনদে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি তার ফাতহুল বারীতে সেখান থেকে বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। [ফাতহুল বারী (৫/১৮৩), (৮/১৯৯)]

দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (২/৪০৭); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৬/১১৯); তাযকিরাতুল হুফফায (৩/৯১২); ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (৩/৭৩); আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ, পৃ. ৩৮।

১৯০. তিনি হচ্ছেন আবুশ শাইখ, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর আল-আসফাহানী। সুন্নাহ ও ইবাদাতে প্রসিদ্ধ। হাদীস শোনার জন্য বিভিন্ন দেশে সফর করেন। তাফসীরশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি আমলকারী আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সুন্নাহ'র অনুসরণ করতেন। জন্ম হিজরী ২৭৪ সালে, আর মৃত্যু ৩৬৯ হিজরী সালে।

তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: সাওয়াবুল আ'মাল। অনুরূপ আস-সুন্নাহ, যেদিকে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন, তবে বর্তমানে তা হারিয়ে যাওয়া কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ গ্রন্থ থেকে তার একাধিক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। যেমন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১০৫), (৬/৩৭৬-৩৭৭); দারউত তা'আরুদ্ব (৭/১০৮); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/৩১৫), (২/৩৯৪, ৪২২); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩৭৯), (৬/৫৩২), (১৭/৭৫)। অনুরূপভাবে ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ সে গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, যাদুল মা'আদ

[ولأبي عبد الله بن منده، ولأبي أحمد العسّال الأصبهاني]، وقبل ذلك «السنة» للخلال،

আবু আব্দুল্লাহ ইবন মানদাহ [আল-আসাফাহানী][১৯১], আবু আহমাদ আল-আসসাল আল-আসফাহানী[১৯২] এর গ্রন্থসমূহ। তাছাড়া তারও আগেকার গ্রন্থ খাল্লাল[১৯৩]

(৩/৬৭৮)। এ গ্রন্থটিকে আবু সা'দ আস-সাম'আনী 'আস-সুন্নাতুল ওয়াদ্বিহাহ' নামকরণ করেছেন। দেখুন, আত-তাহবীর ফিল মু'জামিল কাবীর (১/১৯০)। তবে ইমাম আবুশ শাইখ এর 'আখলাকুন নবী ও আদাবুহু' গ্রন্থের মুহাক্কিক সালেহ আল-ওনাইয়ান বলেন, কিতাবটি হারিয়ে যাওয়া কিতাবের মধ্যে গণ্য। অনুরূপ তার গ্রন্থসমুহের অন্যতম হচ্ছে, 'কিতাবুল 'আযামাহ' যা কয়েক খণ্ডে তাহকীকসহ ছাপা হয়েছে।

১৯১. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন মানদাহ, আল-আবাদী, আল-আসফাহানী, আল-হাফেয, আল-মুহাদ্দিস। তার যমানার সবচেয়ে বড় পরিব্রাজক। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, আমি তার চেয়ে কাউকে বড় পরিব্রাজক দেখিনি। তার থেকে বড় হাদীস বিশারদও দেখিনি। সাথে সাথে তার ছিল প্রচণ্ড ধীশক্তি ও নির্ভরযোগ্যতা। আমার কাছে এ মর্মে খবর রয়েছে যে, তার শিক্ষক সংখ্যা এক হাজার সাতশত জন।
তিনি পুরো তেত্রিশ বছর হাদীস ও ইলমের জন্য সফর করেন। তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ৩১০ সালে, আর মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী সালে।
তিনি হাদীস শুনেছেন, আবু সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী, আবুল আব্বাস আল-আসাম্ম প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, হামযাহ ইবন ইউসুফ আস-সাহমী, আবু নু'আইম আল-আসফাহানী প্রমুখ। ইমাম আবু নু'আইম এর কাছে ইবন মানদাহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জবাব দেন, তিনি তো পাহাড়সমূহের একটি পাহাড় ছিলেন। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার একাধিক গ্রন্থে ইবন মানদাহ এর কিতাবুস সুন্নাহ এর উল্লেখ করেছেন। যেমন, শারহুস আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ২০৭; আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/১৬৬); মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৩৬৫); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩৭৯), (৫/৪১৩), (১৭/৭৫)।
তার গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কিতাবুল ঈমান, কিতাবুত তাওহীদ, কিতাবুস সিফাত, কিতাবুর রাদ্দি 'আলাল জাহমিয়্যাহ। আর কিতাবুস সুন্নাহ, যার দিকে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ উপরে ইঙ্গিত করেছেন।
দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/২৮); তাযকিরাতুল হুফফায (৩/১০৩১); মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৭৯; ইবন হাজার, লিসানুল মীযান ৫/৭০; কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুস্তাত্বরাফাহ পৃ. ৩৮।

১৯২. তিনি হচ্ছেন আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইবরাহীম ইবন সুলাইমান আল-'আসসাল আল-আসফাহানী, আল-ক্বাদ্বী, যিনি আসসাল নামে সমধিক পরিচিত। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবাহ, হাসান ইবন আলী আস-সাররী প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, ইবন আদী, ইবন মানদাহ, ইবন মারদুওইয়াহ প্রমুখ। ইবন মান্দাহ বলেন, আমি দু'বার সারা দুনিয়া সফর করেছি, তবে কোথাও আসসালের দৃষ্টান্ত পাইনি। তার রচিত অনেক গ্রন্থের অন্যতম হচ্ছে, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, কিতাব আত-তারীখ, কিতাব আল-আমসাল, কিতাবুল আযামাহ। আর তার রয়েছে কিতাবুস সুন্নাহ; যার কথা ইবন তাইমিয়্যাহ এখানে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া অন্যত্রও তিনি তা বর্ণনা করেছেন, যেমন, দারউত তা'আরুদ্ব (৭/১০৮); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/১৬৬)।
দেখুন, খত্বীব আল-বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১/২৭০); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৬/৬); আল-ইবার (২/২৮২); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৩৮০)।

১৯৩. তিনি হচ্ছেন ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হারূন ইবন ইয়াযীদ আল-খাল্লাল। হাম্বলীদের শাইখ, তাদের ইমাম ও আলেম। খাল্লাল শব্দের অর্থ ভিনেগার তৈরিকারী; কারণ তিনি তা করতেন। তিনি ইমাম আহমাদের অনেক ছাত্রের কাছ থেকে ইলম ও ফিকহ নিয়েছেন। আবু বকর আল-মাররূযীর হাত থেকে হাদীস নিয়েছেন, অনুরূপ তার উস্তাদদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন হারব আল-কিরমানী, ইমাম আহমাদের দু' সন্তান সালেহ ও আব্দুল্লাহ। তার থেকে বর্ণনা পাওয়া একটি বড় মূল্যবান সম্পদ; কারণ তার থেকে এসব বর্ণনা নিয়ে এসেছেন, তারই দাস আব্দুল আযীয ইবন জা'ফর, যিনি গোলাম আস-খাল্লাল নামে প্রসিদ্ধ। তিনি খাল্লাল এর আস-সুন্নাহ কিতাবটির

و «التوحيد» لابن خزيمة،

এর আস-সুন্নাহ[১৯৪], ইবন খুযাইমাহ এর আত-তাওহীদ[১৯৫],

বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদের মাসআলাসমূহ জমা করার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক দেশ সফর করেছেন। এমনকি ইমাম যাহাবী বলেন, তার আগে ইমাম আহমাদের আলাদা কোনো মাযহাব ছিল না। তিনিই ইমাম আহমাদ এর মাসআলাসমূহকে সাজিয়ে লিখেন। তার সম্পর্কে ইবন নাসেরউদ্দীন বলেন, তিনি একজন পরিব্রাজক, প্রশস্ত ইলমের অধিকারী, কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফদের বক্তব্য ও পদাঙ্ক জমা করার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তার জন্ম হিজরী ২৩৪ সালে আর মৃত্যু হিজর ৩১১ সালে। তার রয়েছে অনেক গ্রন্থ, তন্মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে, আল-জামে'উ লি উলুমি আহমাদ, এ গ্রন্থটি সম্পর্কে ইবন কাসীর বলেন, 'ইমাম আহমাদ এর মাযহাবে এ গ্রন্থের মত আর কোনো গ্রন্থ লেখা হয়নি।' এছাড়া তার অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে আল-'ইলাল, আত-ত্বাবাক্বাত ইত্যাদি।

দেখুন, আবু ইয়া'লা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (২/১২); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৫/১১২); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/৭৮৫); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/২৯৭)।

১৯৪. আস-সুন্নাহ নামক এ গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয় যে, তা তার অন্য গ্রন্থ আল-জামে'উ লি উলূমি আহমাদ এর অংশ। যেমনটি হাজী খলীফা তাঁর কাশফুয যুনূন গ্রন্থে বলেছেন (১/৫৭৬); ব্রকেলম্যান, তারীখু আল আদাবিল আরাবী (২/৩১৪); ফুয়াদ সিযকীন, তারীখ আত-তুরাস আল-আরাবী (৩/৩৩৩)।

তবে অন্যরা সেটাকে আলাদা গ্রন্থই বলেছেন। এ কিতাবটি সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন তা যথার্থ, তিনি এ কিতাব থেকে তার অনেক গ্রন্থে বর্ণনা এনেছেন। যেমন, আল-ইস্তিকামাহ (১/২০৫); আস-সাফাদিয়্যাহ (২/১৬৪); আসাব'ঈনিয়্যাহ (বুগইয়াতুল মুরতাদ) (পৃ. ৪৭০); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩৪৯, ৪২৮, ৪৩০), (২/১৬১, ১৬২, ১৬৩, ২১৩, ৩৪৯, ৪১৭); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩২২, ৩২৪), (৬/১৬১), (৭/৪৪৬, ৬৬০), (৮/১০৩, ৪০৭)। তাছাড়া তিনি এ কিতাবের ভূয়শী প্রশংসা করে বলেন, 'এটি হচ্ছে ইমাম আহমাদ থেকে দীনী উসূলী মাসআলার বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ গ্রন্থ; যদিও এখানে যা আছে তার চেয়েও বাড়তি কথা অন্যত্র আছে। যেমনিভাবে ইলমের ওপর তার লেখা গ্রন্থটি একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ; যাতে উসূলে ফিকহ সম্পর্কে ইমাম আহমাদের কথাকে একত্রিত করা হয়েছে।' [মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৩৯০)]

অন্যত্র তিনি বলেন, 'আবু বকর আহমদ ইবন হারূন আল-খাল্লাল, তিনিই সে ব্যক্তি যিনি উসূলুদ দীন তথা আকীদাহ, উসূলে ফিকহ, ফিকহ, অনুরূপ আদাব, আখলাক, যুহদ, রাক্বায়িক, ইলালিল হাদীস, তারীখ ইত্যাদি ইসলামী ইলম সংক্রান্ত ইমাম আহমাদের কথা একত্রিত করেছেন।' [মাজমু' ফাতাওয়া (১২/৩২৫)]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, 'এ গ্রন্থে তিনি ইমাম আহমাদের যাবতীয় ভাষ্য ও বক্তব্য জমা করেছেন। যেমনটি বাইহাক্বী জমা করেছিলেন তার "জামে'উন নুসূস মিন কালামিশ শাফে'য়ী" গ্রন্থে। এ দু'টি গ্রন্থ অত্যন্ত সম্মানিত, যা থেকে আলেম কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। [ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২০২]

বর্তমানে ইমাম খাল্লালের আস-সুন্নাহ নামীয় এ কিতাবটির একটি অংশ তাহকীক হয়ে বের হয়েছে। সে অংশ তাহকীক করেছেন শাইখ ড. আতিয়্যাহ আতীক আয-যাহরানী, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০৮। এতে আহলুল হাদীসদের মতো করে মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়। বাকী অংশ এখনো আলোর মুখ দেখেনি।

১৯৫. ইমামুল আয়িম্মাহ ইবন খুযাইমাহ রাহিমাহুল্লাহর এ গ্রন্থটির পূর্ণ নাম, কিতাবুত তাওহীদ ওয়া ইসবাতু সিফাতির রাব্ব। এ গ্রন্থটি আকীদাহ'র একটি আকর গ্রন্থ। পরবর্তী প্রত্যেক আলেম এ গ্রন্থ থেকে তথ্য চয়ন করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ গ্রন্থ থেকে তার অনেক গ্রন্থে তথ্য উপাত্ত এনেছেন। যেমন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৫৭০), (২/৪৩৬, ৪৩৯); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৯২), (৬/৪৬৭, ৪৯৭)।

যারা নব্য জাহমিয়্যাহ, যারা কট্টর আশ'আরী ও কট্টর মাতুরিদী এ কিতাবটি তাদের গলার কাঁটা হয়ে আছে। তারা এটা সহ্য করতে পারছে না; কারণ তিনি এ কিতাবে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার জন্য যাবতীয় হাদীসের সন্নিবেশ করেছেন। এজন্য দেখা যায় ইবন ফুওরাক, রাযী ও কাউসারীরা এ কিতাবকে কিতাবুশ শির্ক বলে, আর তারা এর গ্রন্থকারকে মুশাব্বিহ, মুমাসসিল, মুজাসসিম ইত্যাদি

وكلام أبي العباس بن سريج، و «الرد على الجهمية» لجماعة، وقبل ذلك «السنة» لعبد الله بن أحمد،

আবুল আব্বাস ইবন সুরাইজ[১৯৬] এর বক্তব্য, অনুরূপ একাধিক ইমামের[১৯৭] আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ।[১৯৮] তারও পূর্বে আব্দুল্লাহ[১৯৯] ইবন ইমাম আহমাদ এর আস-সুন্নাহ[২০০],

---

যা ইচ্ছা গালি-গালাজ করে। আলহামদুলিল্লাহ, তাদের সেসব সন্দেহ যথাযথ উত্তর দিয়েছেন ড. সাদেক সালিম সাদেক তার "নুবযাতুন লাতীফাতুন ফী রাদ্দি বা'দ্বি তাশগীবাতিল মু'আত্তিলাতি আলাল ইমাম ইবন খুযাইমাহ ওয়া কিতাবুত তাওহীদ"।

১৯৬. তিনি হচ্ছেন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন 'উমার ইবন সুরাইজ আল-বাগদাদী, আশ-শাফে'য়ী। সে সময়কার সবচেয়ে বড় আকীদাহ'র আলেম ও সুন্নাহ'র অনুসারী। তিনি হাদীস শুনেছেন হাসান ইবন মুহাম্মাদ আয-যা'ফরানী (শাফে'য়ীর ছাত্র), আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আদ-দূরী প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন আবুল কাসেম আত-ত্বাবারানী, আবু আহমাদ ইবন গিত্বরীফ আল-জুরজানী প্রমুখ। আবু ইসহাক্ব ইসফারায়ীনী বলতেন, আমরা আবুল আব্বাসের সাথে ফিকহের প্রকাশ্য দিক নিয়ে চলতাম, তার সূক্ষ্মতার বিষয়টিতে শরীক হতে পারতাম না। ইবন সুরাইজ বলতেন, ফিকহ শিখতে এসে কালাম শিক্ষায় রত হওয়া খুব কম সংখ্যককেই আমি সফল হতে দেখেছি। সে ফিকহের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কালামের অভিষ্ট লক্ষ্যে তো পৌঁছতে পারেই না। তার মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ৩০৬ সালে।
দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৪/২৭৮); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (১/৬৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/২০১); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/২৪৭)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার থেকে অনেক মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যেমন, বায়ানু তালবীসুল জাহমিয়্যাহ (২/৫৬২); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৭/১০৩, ১০৪, ৩০৫); দারউত তা'আরুদ্ব (৭/১৮৫); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (৩/৭৮৯)।

১৯৭. কোনো কোনো নুসখায় এসেছে, যেমন ইমাম বুখারী ও তার উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-জু'ফীর লেখা গ্রন্থ।

১৯৮. 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ' বা জাহমিয়্যাদের মতবাদ খণ্ডণ করে এ শিরোনামে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেমন,
১- ইমাম আহমাদ এর আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ
২- ইমাম ইবন আবী হাতেম এর আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ
৩- ইমাম বুখারী এর আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ
৪- ইমাম ইবন মানদাহ এর আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ
৫- ইমাম দারেমী এর আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ
৬- ইমাম ইবন কুতাইবাহ এর আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ইত্যাদি।

১৯৯. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল। তার পিতার হাতে বড় হন। তার কাছ থেকে সকল হাদীস শুনেন। সেজন্য তিনি তার পিতার হাদীসের অধিক বর্ণনাকারী। তার সম্পর্কে খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি ছিলেন প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য ও সমঝদার লোক। তার জন্ম হিজরী ২১৩ আর মৃত্যু হিজরী ২৯০ সালে। তার রচিত গ্রন্থাবলির অন্যতম হচ্ছে, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ বিরিওয়ায়াতে আব্দিল্লাহ, আল-ইলাল, ফাদ্বায়িলে উসমান ইবন আফফান ইত্যাদি।
দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৯/৩৭৫); আবু ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (১/১৮০); যাহাবী, আল-ইবার (২/৮৬); কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুস্তাত্বরাফাহ, পৃ. ৩৭।

২০০. আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ এর আস-সুন্নাহ গ্রন্থটি দু' খণ্ডে ছাপা হয়েছে, যা ড. মুহাম্মাদ সা'ঈদ আল-কাহত্বানীর তাহকীকে বের হয়েছে, যা ৬৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এ গ্রন্থটি সালাফী ও সহীহ আকীদাহ'র অন্যতম উৎসগ্রন্থ। এটি অনেকাংশেই ইমাম লালেকাঈ এর শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ' গ্রন্থ এবং ইমাম ইবন বাত্তাহ এর 'আল-ইবানাহ'র মতোই। যাতে সনদের মাধ্যমে আকীদাহ'র বর্ণনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তবে আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ এর এ গ্রন্থটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এতে জাহমিয়্যাদের ওপর রদ্দ করার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে এসেছে। উল্লেখ্য যে, শাইখ সালেহ ফাউযান, শাইখ সালেহ আলে আশ-শাইখ ও শাইখ ইবন জিবরীন

ইমাম আবু বকর ইবনুল আছরম[২০১] এর আস-সুন্নাহ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল[২০২] এর আস-সুন্নাহ,

রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো প্রথম সংস্করণে ছিল না; কারণ সেগুলো আলেমগণের কাছে প্রক্ষিপ্ত মনে হয়েছিল। পরবর্তীতে যারা এটিকে তাহকীক করে বের করেছেন তারা এ অংশ জুড়ে দিয়ে ভালো কাজ করেননি।
দেখুন, https://www.youtube.com/watch?v=CO4bMIHEt_k
https://www.youtube.com/watch?v=_WBOFCI3uhs
https://www.youtube.com/watch?v=ossD7gqIIJw
https://www.youtube.com/watch?v=xWJoolhFLfU

২০১. তিনি হচ্ছেন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হানে', আল-আসরম, আত-ত্বায়ী, ইমাম আহমাদের ছাত্র ও তার হাম্বলী মাযহাবের বর্ণনাকারী। তার মৃত্যু হিজরী ২৭৩ সালে।
তিনি হাদীস শুনেছেন আবু নু'আইম, 'আফফান, ক্বা'নাবী প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন নাসায়ী তার সুনানে, মূসা ইবন হারূন, ইয়াইয়া ইবন স্বা'য়েদ প্রমুখ।
আবু বকর আল-খাল্লাল বলেন, আসরম অত্যন্ত সম্মানিত ও হাফেয ছিলেন।
যাহাবী বলেন, তিনি অত্যন্ত জাগ্রত লোক ছিলেন; এমনকি তাকে ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব আল-মুকাবেরী বলেন, আসরমের বাপ-মায়ের একজন মনে হয় জিন্ন ছিলেন।
তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির অন্যতম হচ্ছে, কিতাবুস সুনান, মুসান্নাফ ফী 'ইলালিল হাদীস ও কিতাবুস সুন্নাহ। উপরে শাইখুল ইসলাম এর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তবে এ কিতাবটি বর্তমানে হারানো কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য হাম্বলীদের গ্রন্থে আসরমের এসব তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। দেখুন, আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল (১/১৪৪, ১৫২), (২/৩৫৯, ৪০২, ৪১৫, ৪৩৩, ৪৪৫); অনুরূপ ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/২৪০), (৩/৫৯, ১৫৬, ২০৫, ৩৩০)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অনেক স্থানে এ কিতাবটি থেকে বর্ণনা এনেছেন। যেমন, শারহ আল-আসফাহানিয়্যাহ পৃ. ২০৬; মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৪২, ৩৭৭), (৭/২৫৪, ৬৬৭); মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৩৬৫); দারউত তা'আরুদ্ব (২/২৩); আর তিনি এ কিতাবের (৭/১০৮) পৃষ্ঠায় তার নাম দিয়েছেন কিতাবুস সুন্নাহ ওয়ার রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ।
ইবনুল কাইয়্যেম এ কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৬৯; অনুরূপ নূনিয়াহতেও উল্লেখ করেছেন।
দেখুন, আবু ইয়া'লা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (১/৬৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৬২৩); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/১৪১); কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুস্তাত্বরাফাহ, পৃ. ৩৭।

২০২. তিনি হচ্ছেন আবু আলী হাম্বল ইবন ইসহাক ইবন হাম্বল আশ-শাইবানী। তিনি ইমাম আহমাদের চাচাতো ভাই ও তার ছাত্র। তিনি হাদীস শুনেছেন সুলাইমান ইবন হারব, আবু নু'আইম প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইবন স্বা'য়েদ, আবু বকর আল-খাল্লাল। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কিতাবুল ফিতান, কিতাবুল মিহনাহ ইত্যাদি। তার মৃত্যু হিজরী ২৭৩ সালে। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/৫১)।
ইবন তাইমিয়্যাহ হাম্বল এর এ গ্রন্থ আস-সুন্নাহ'র কথা কয়েকটি গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন, যেমন, শারহ আল-আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ২০৬; আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/১৬৩); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৭/৭৪); শারহু হাদীসিন নুযূল (১৬/৪০৪)।
খাল্লাল বলেন, হাম্বল ইমাম আহমদ থেকে বেশ কিছু বর্ণনা সুন্দরভাবে করেছেন, তবে কিছু বর্ণনায় আশ্চর্য অপরিচিত জিনিস নিয়ে এসেছেন। দেখুন, আবু ইয়া'লা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (১/৩৮৪)।
যাহাবী বলেন, ইমাম আহমাদ থেকে অনেক বর্ণনা করেছেন তবে তিনি একক কিছু বর্ণনা করেছে আর সেটাতে অগ্রহণযোগ্য অপরিচিত কিছু জিনিস নিয়ে এসেছেন। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/৫২)।
ইবন তাইমিয়্যাহ দৃঢ়ভাবে নির্দিষ্ট করে বলেন, খাল্লাল ও তার সাথী আবু বকর আব্দুল আযীয গোলাম খাল্লাল তারা দু'জনে হাম্বল যা এককভাবে বর্ণনা করেছেন তা অস্বীকার করে থাকেন। অন্যরা এসব

وللمروذي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، و «السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم،

ইমাম মাররূযী(২০৩) এর আস-সুন্নাহ(২০৪), ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী এর আস-সুন্নাহ(২০৫), ইমাম ইবন আবী শাইবাহ(২০৬) এর

বর্ণনার কোনো কোনোটি গ্রহণ করে থাকেন, যেমন আবু আব্দুল্লাহ ইবন হামেদ। দেখুন, আল-ইন্তেকামাহ (১/৭৫)।

ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, হাম্বল বেশ কিছু বর্ণনা এককভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে অন্যরা তাকে ভুল করেছে বলে থাকেন। যেমন খাল্লাল ও তার ছাত্র গোলাম খাল্লাল। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪০৫)।

ইবন রাজাব বলেন, আবু বকর আল-খাল্লাল ও তার গোলাম খাল্লাল তারা দু'জন সেসব বর্ণনা যা ইমাম আহমাদ থেকে হাম্বল এককভাবে বর্ণনা করেছেন তা গ্রহণ করতেন না। দেখুন, ফাতহুল বারী (৫/৯৭)।

তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, হাম্বল ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর বাণী 'وجاء ربك' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তার নির্দেশ এসেছে ও তার ক্ষমতা এসেছে। আলেমগণ বলেন, এটাতে হাম্বল ইমাম আহমাদ এর ওপর ভুল করে এ তথ্য পেশ করেছেন।

২০৩. তিনি হচ্ছেন আবু বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-মাররূযী (মারও রূয এর দিকে সম্পর্ক করে)। তিনি ইমাম আহমাদ এর বড় ও সম্মানিত ছাত্রদের একজন ছিলেন। ইমাম আহমদ থেকে অনেক ইলম বর্ণনা করেছেন। খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি আহমাদ ইবন হাম্বলের ছাত্রদের মধ্যে অগ্রণী, তার পরহেযগারী ও ফযীলতের কারণে। আহমাদ তাকে নিয়ে প্রশান্তি পেতেন ও খুশি হতেন। ইমাম আহমাদ এর মৃত্যু হলে তিনিই তার চক্ষু বন্ধ করে দেন ও গোসল প্রদান করেন।

যাহাবী বলেন, তিনি সুন্নাহ'র ইমাম ছিলেন, বিদ'আতীদের ওপর খড়গহস্ত ছিলেন, সুন্নাতের অনুসরণে প্রাণপন ছিলেন। বাগদাদের মানুষের মাঝে তার অনেক সম্মান ছিল। তার মৃত্যু হয়েছিল ২৭৫ হিজরীতে।

দেখুন, আবু ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (১/৫৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/১৭৩); তাযকিরাতুল হুফফায (২/৬৩১); সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত (৭/৩৯৩)।

২০৪. তার সুন্নাহ নামীয় কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত অন্যান্য কিতাবে তার থেকে বর্ণিত সুন্নাহ ও আকীদাহ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোই ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

২০৫. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু দাউদের যে কিতাব আস-সুন্নাহ'র কথা বলছেন তার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। সম্ভবত তার সুনান গ্রন্থে তিনি আকীদাহ'র ওপর ৩২টি অধ্যায় রচনা করেছেন ও হাদীস নিয়ে এসেছেন, তাই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকবেন। সেখানে তিনি আকীদাহ'র ওপর ১৭৬টি হাদীস নিয়ে এসেছেন।

তাছাড়া ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সে সুনান আবি দাউদ থেকেই তার বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীস ও আছার নিয়ে এসেছেন। যেমন, শারহ আল-আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ২০৬; মাজমূ' ফাতাওয়া (১৭/৭৪); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/১৩০)। তিনি কখনও কখনও ইমাম আবু দাউদের কিতাবুস সুনান এর চয়নকৃত অংশকে 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ' নামেও অভিহিত করেন।

২০৬. তিনি হচ্ছেন আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল-কাযী আবু শাইবাহ ইবরাহীম ইবন উসমান আল-আবাসী। ইমাম, পাহাড়, জগতবাসীর জন্য মাইলফলক। তিনি হাদীস শুনেছেন শারীক ইবন আব্দুল্লাহ আল-কাযী থেকে, যিনি তার বড় উস্তাদদের অন্যতম, অনুরূপ ইবনুল মুবারক, ইবন উয়াইনাহ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন বুখারী, মুসলিম প্রমুখ। ফাল্লাস বলেন, আমি আবু বকর ইবন আবী শাইবাহ এর মতো ধীশক্তি সম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তিনি আলী ইবনুল মাদীনীর সাথে আমাদের কাছে আগমন করেন, তখন তিনি শাইবানীর চারশত হাদীস নিজ মুখস্থ থেকে বর্ণনা করে উঠেন। ইমাম আবু উবাইদ বলেন, চারজনের কাছে সকল হাদীসের সনদ গিয়ে শেষ হয়েছে। তবে আবু বকর ইবন আবী শাইবাহ তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনবরত বর্ণনা করতে সমর্থ ছিলেন। আহমদ ইবন হাম্বল তাদের মাঝে বেশি ফকীহ ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ছিলেন তাদের মধ্যে হাদীসের বেশি একত্রিতকারী। আর আলী ইবনুল মাদীনী, তিনি তাদের মাঝে হাদীসের অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তিনি রচনা করেছেন আল-মুসান্নাফ, আল-মুসনাদ, আত-তাফসীর। তার মৃত্যু

وكتاب «الرد على الجهمية» لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب «خلق أفعال العباد» لأبي عبد الله البخاري، وكتاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي،

আস-সুন্নাহ(২০৭), ইমাম আবু বকর ইবন আবি আসিম(২০৮) এর আস-সুন্নাহ, ইমাম বুখারীর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-জু'ফীর(২০৯) কিতাব আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, ইমাম বুখারী(২১০) এর খালকু আফ'আলিল ইবাদ, ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী

হয়েছিল হিজরী ২৩৫ সালে। দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৫/১৬০); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৪৩২); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/১২২); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৮৫)।

২০৭. কিতাব আস-সুন্নাহ নামীয় তার কোনো গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তার অন্যান্য গ্রন্থে আকীদাহ বিষয়ক যা এসেছে সেটাই এখানে বলা উদ্দেশ্য।

২০৮. তিনি হচ্ছেন আবু বকর আহমাদ ইবন আমর আদ-দ্বাহহাক ইবন মাখলাদ আশ-শাইবানী আল-বসরী, বড় মাপের হাফেয, বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি হাদীস শুনেছেন আবুল ওয়ালীদ আত-ত্বায়ালিসী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমাইর প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুশ শাইখ আল-আসফাহানী, আবু বকর আল-কাব্বাব প্রমুখ। আবু সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী বলেন, আবু বকর ইবন আবী আসেম, তার ব্যাপারে তো আমি শুনেছি, তিনি শাকীক আল-বালাখী থেকে এক হাজার মাসআলা মুখস্থ করেছেন। তিনি হাদীস ও ফিকহের হাফেয বলে পরিচিত। তার মত ছিল প্রকাশ্য অর্থের ওপর চলা ও ক্বিয়াস বাদ দেয়া। হিজরী ২৮৭ সালে তিনি মারা যান। দেখুন, যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/৪৩০)। তার সুন্নাহ গ্রন্থ থেকে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অনেক তথ্য নিয়েছেন। যেমন, আস-সারেমুল মাসলূল (১/২৩৮); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৪৮); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১২১); (৬/৩৮০), (১০/২৬১), (১৪/৪২০)।
ইমাম ইবন কাসীর এ গ্রন্থের অনেক প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'কিতাবুস সুন্নাহ, ফী আহাদীসিস সিফাত আলা ত্বারীকাতিস সালাফ'। দেখুন, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (১১/৯৬)।
এ গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে। প্রথমে শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর তাহকীক ও তাখরীজসহ এক খণ্ডে। পরে ড. ফয়সাল আল-জাওয়াবিরাহ এর তাহকীকে দু' খণ্ডে বের হয়েছে। গ্রন্থকার এতে মুহাদ্দিসদের পদ্ধতিতে অধ্যায় বিন্যাস ও হাদীস নিয়ে এসেছেন।

২০৯. তিনি হচ্ছেন আবু জা'ফর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর ইবন ইয়ামান আল-জু'ফী, তাদের মাওলা, আল-বুখারী। তাকে মুসনিদি বলা হতো; কারণ তিনি মুসনাদ হাদীসের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। তিনি হাদীস শুনেছেন ইবন 'উয়াইনাহ, আব্দুর রাযযাক প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস শুনেছেন ইমাম বুখারী, ইমাম যুহলী, আবু যুর'আহ আর-রাযী প্রমুখ। হাকেম বলেন, তিনি তার সময়ে মা ওয়ারাআন নাহর এর ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারীর দাদা এ মুসনাদীর দাদা ইয়ামান এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ২২৯ সালে।
তার এ গ্রন্থ 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ' এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যদিও ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতাওয়া আল-কুবরাতে এর কথা উল্লেখ করেছেন। (৫/১৫)
দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ৫/১৬২; ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৬৫৮; ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৬/৯।

২১০. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম আল-জু'ফী আল-বুখারী। সহীহ বুখারীর গ্রন্থকার। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। তিনি তার যুগের বড় বড় হাফেযদের থেকে হাদীস শুনেছেন। যেমন, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবনুল মাদীনী, ইবন রাহওয়াই, যুহলী প্রমুখ। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অনেকেই যেমন, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, তিরমিযী, আবু হাতিম আর রাযী প্রমুখ। তার হিফয, ইলম, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে উম্মতের সকলের ঐকমত্য রয়েছে। তাঁর উস্তাদ মুহাম্মাদ আল-বীকান্দী ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি তুমি না থাকতে তাহলে আমি বুখারায় বসবাস করা উত্তম মনে করতাম না। নু'আইম ইবন হাম্মাদ বলেন, মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল এ উম্মতের ফকীহ। ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ বলেন, তোমরা এ যুবক থেকে হাদীস লেখ; যদি এ যুবক হাসান বসরীর সময়ে থাকতো তবে অবশ্যই মানুষ তার মুখাপেক্ষী হতো হাদীস ও হাদীসের ফিকহের ব্যুৎপত্তির কারণে।

وكلام عبد العزيز المكي صاحب «الحيدة» في الرد على الجهمية،

এর আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, বিখ্যাত মুনাযারা 'হাইদাহ'[২১১] গ্রন্থকার ইমাম আব্দুল

তিনি হিজরী ২৫৬ সালে মারা যান। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৩৯১)।
ইমাম বুখারীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায় রয়েছে, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ। তাছাড়া তার বড় আরেকটি গ্রন্থ আকীদাহ'র ওপর তার মজবুতির জানান দিচ্ছে। সেটি হচ্ছে, খালকু আফ'আলিল ইবাদ। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ ও আকীদাহ'র গ্রন্থ, যা ইমাম বুখারী থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-ফেরাবরী বর্ণনা করেছেন। যিনি সহীহ বুখারীরও বর্ণনাকারী। অনুরূপভাবে খালকু আফ'আলিল ইবাদ গ্রন্থটি ইমাম ইউসুফ ইবন রাইহান ইবন আব্দুস সামাদও বর্ণনা করেছেন। দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (২/১৭); মিযযী, তাহযীবুল কামাল (১৪/৪৫১)।
খালকু আফ'আলিল ইবাদ গ্রন্থটির মৌলিকভাবে তিনটি অংশ রয়েছে:
এক. আল্লাহর কথা বলা সাব্যস্তকরণ, আর কুরআন যে আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়, সেটা সাব্যস্তকরণ।
দুই. তাকদীর সাব্যস্তকরণ ও আল্লাহ তা'আলার ইলম সাব্যস্তকরণ।
তিন. বান্দার যাবতীয় কাজ আল্লাহর সৃষ্ট এটা স্যাস্তকরণ।
দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (১/২৬২)।
ইমাম বুখারীর সকল গ্রন্থের প্রতি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাপক আগ্রহ ও গুরুত্ব ছিল। বিশেষ করে খালকু আফ'আলিল ইবাদ গ্রন্থের বিষয়ে; কারণ এখানে অনেক বেশি পরিমাণ সালাফদের বক্তব্য ও তাদের আসার বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণত তিনি এ গ্রন্থ থেকে এনেছেন তার গ্রন্থসমূহে, দারউত তা'আরুদ্ব (২/২৪), (৭/১০৮-১০৯); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৩/৪১৭-৪২৩), (৫২৫-৫৩০), (৫/৩৬৬-৩৬৯, ৪০৫); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/২৪৩-২৪৯, ২৬০-২৬১); মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৬৪০); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৮/২২৭, ৪০৭), (৫/১৮৩), (১২/৩৩৩, ৫০৮-৫০৯)।
তাছাড়া এ গ্রন্থ থেকে ইমাম লালেকাঈও শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত গ্রন্থে অনেক আছার বর্ণনা করেছেন (৩/৫৪৯); তবে তিনি সেটার নাম রেখেছেন, আর-রাদ্দু আলাল কাদরিয়্যাহ।
এ গ্রন্থটি পড়ার কারণে ইমাম মিযযীকে জেলে যেতে হয়েছে। তিনি ইবন তাইমিয়্যাহ'র সমর্থনে এ গ্রন্থটি পড়ছিলেন, কিন্তু তখনকার আশায়েরা সম্প্রদায় তাকে রাষ্ট্র প্রধানের মাধ্যমে জেলে পুরানোর ব্যবস্থা করে। দেখুন, ইবন হাজার, আদ-দুরারুল কামিনাহ (৬/২৩০); শাওকানী, আল-বাদরুত ত্বালে' (২/৩৫৩)।
অনুরূপভাবে আল্লামা বা'লী রাহিমাহুল্লাহকেও এ কিতাব পড়ার কারণে জেলে যেতে হয়েছিল। দেখুন, আস-সাখাওয়ী, আদ-দ্বাওয়ুল লামে'উ (৫/৩)।

২১১. হাইদাহ কিতাবটি আব্দুল আযীয আল-কিনানীর দিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। তার অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি রয়েছে। [ফুয়াদ সিযকীন (৪/৬৬)] ইমাম যাহাবী এ কিতাবটিকে আব্দুল আযীয আল কিন্দীর হওয়া সম্পর্ক সন্দেহ পোষণ করেছেন। দেখুন, ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (২/৬৩৯)। তাজুদ্দীন সুবুকীও তা বলেছেন। [তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (১/২৬৬)]
কিন্তু ইমাম খতীব আল-বাগদাদী, ইবন আল-জাওযী ও ইবন হাজার দৃঢ়ভাবে তা আব্দুল আযীয কিনানীর বলে নির্ধারণ করেন। [খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১০/৪৪৯); ইবন আল-জাওযী, আল-মুনতাযাম (১১/৬৭); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৬/৩৬৪); আত-তাকরীব, পৃ. ৩৫৯] অনুরূপ ইবনুল 'ইমাদ ও ইমাম ইবন বাত্তাহ সেটিকে আব্দুল আযীয কিনানীর গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। [ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৯৫); ইবন বাত্তাহ (২/২২৫-২৪)] অনুরূপভাবে যাহাবী অন্য জায়গায় এ কিতাবটি আব্দুল আযীয আল-কিনানীর বলে উল্লেখ করেছেন। [আল-ইবার (১/৩৪১); তারীখুল ইসলাম (৫/৮৭৩)] তবে ইবনুস সুবুকীর বিরোধিতার কারণ আকীদাগতভাবে এতে আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে আশআরী মতবাদের বিরোধী কথা থাকা।
জামীল সালীবা এ গ্রন্থটির তাহকীকের সময় সেটিকে আব্দুল আযীয আল-কিনানীর বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং যারা এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছে তাদের সন্দেহের অপনোদন করেছেন। আমাদের শাইখ ড. আলী নাসের ফাকীহী গ্রন্থটির তাহকীকের সময়ও সেটিকে আব্দুল আযীয আল-কিনানীর

وكلام نعيم بن حماد الخزاعي.

আযীয আল-মাক্কী(২১২) কর্তৃক জাহমিয়্যাদের খণ্ডন করে প্রদত্ত তার বক্তব্য, ইমাম নু'আইম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ(২১৩) এর বক্তব্য,

সাব্যস্ত করেছেন।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ কিতাব থেকে প্রচুর বর্ণনা করেছেন এবং সেটি আব্দুল আযীয কিনানীর দিকেই সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন, দারউ তা'আরুদ (২/২৪৫-২৯৪), (৬/১১৫); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৩৪১); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩১৪), (৬/১৬৬, ৩২৪-৩২৫)। ইমাম মিযযী রাহিমাহুল্লাহও এ গ্রন্থ তার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। [মিযযী, তাহযীবুল কামাল (১৮/২২০)]

২১২. তিনি হচ্ছেন আব্দুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া ইবন আব্দুল আযীয আল-কিনানী আল-মাক্কী আশ-শাফে'য়ী। দাউদ আয-যাহেরী বলেন, আব্দুল আযীয ইমাম শাফে'য়ীর সাহচর্য নিয়েছিলেন কিছুদিন। খত্বীব বলেন, তিনি ইলম ও ফদ্বলে পূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তার বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তিনি শাফে'য়ীর কাছে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন ও তার সাহচর্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ইবন উয়াইনাহ ও অপর একদল থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে আবুল 'আইনা, হুসাইন ইবনুল ফাদ্বল আল-বাজালী, আবু বকর ইয়া'কূব ইবন ইবরাহীম আত-তামীমী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বাগদাদে হিজরী ২৩০ অথবা ২৪০ সালে মারা যান। তার শরীর অসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে গূল বলা হতো। তার মাঝে ও বিশর আল-মারিসীর মাঝে খলীফা মামুনের দরবারে কুরআনে কারীমের সৃষ্ট হওয়া না হওয়া বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান হয়েছিল। সে বিতর্কের আলোচনা একটি গ্রন্থ হিসেবে বের হয়েছে, যার নাম হচ্ছে 'আল-হাইদাতু ওয়াল ই'তিযার।

দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১০/৪৪৯); ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (২/৬৩৯); তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (২/১৪৪); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৬/৩৬৩); যিরিকলী, আল-আ'লাম (৪/২৯)।

২১৩. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ নু'আইম ইবন হাম্মাদ ইবন মু'আওয়িয়াহ, আবু আব্দুল্লাহ আল-খুযা'ঈ আল-মারওয়াযী। বড় আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন ইবনুল মুবারক, সুফইয়ান ইবন উয়াইনাহ প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, যুহলী প্রমুখ।

তিনি বিদ'আতীদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন বিশেষ করে জাহমিয়্যাদের ওপর। সালেহ ইবন মিসমার বলেন, নু'আইম বলেছেন, আমি জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যখন তাদের বক্তব্য জানলাম তখন হাদীস অন্বেষণ করতে শুরু করলাম। তখন বুঝতে পারলাম যে জাহমিয়্যাদের সর্বশেষ কথা হচ্ছে তা'ত্বীল বা স্রষ্টাকে নাম,গুণ ও কর্মশূন্য করা।

ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি জাহমিয়্যাদের ওপর খড়গহস্ত ছিলেন। তাকেও কুরআন সৃষ্ট কি সৃষ্ট নয় এ মাসআলায় পরীক্ষায় নিপতিত হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কুরআনকে সৃষ্ট বলতে রাযী হননি। ২২৮ অথবা ২২৯ হিজরীতে কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় মারা যান। তিনি তার জিঞ্জীরসহ দাফন করার অসিয়ত করেন এবং বলেন, আমি বাদী হয়ে থাকবো।

তার হাদীসের বর্ণনার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, নু'আইম বড় আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত। তবে আমার অন্তর তার বর্ণনার দিকে সায় দেয় না। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৫৯৫)।

আলেমগণের অনেকেই নু'আইম ইবন হাম্মাদ থেকে আল্লাহর সিফাত, বিদ'আতী ও তাদের নিন্দা সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১২৫); বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৮৫; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৪৬); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/৪৯২), (৫/১১০, ১৯৬, ২৬৩, ৫৩৫), (৮/২৩), (১০/৩০৩), (১১/৪৮২), (১২/৩৬৫)। অনুরূপ ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২১; শিফাউল আলীল, অধ্যায় ২১; যাহাবী, আল-উলু (২/১০৯২, ১০৯৩); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৩৬৮, ৩৭৮, ৩৮১, ৪৯৪, ৫৩২) প্রমুখ।

বর্ণিত আছে যে, তিনি জাহমিয়্যাহদের রদ্দ করার জন্য তেরোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৭/৫১৯); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১৩/৩০৬); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৪১৮); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (১০/৪৫৮)।

وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن سعيد [ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله] وأشياء كثيرة.

তদ্রূপ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, ইমাম ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ[২১৪], ইমাম ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আন-নাইসাপূরী[২১৫] ও তাদের অনুরূপ লোকদের বক্তব্য। তাদের পূর্বে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, তার মতো অনেকের গ্রন্থ, তাছাড়া আরও অনেক কিছু আছে।

তাছাড়া আমাদের নিকট নক্বলী[২১৬] এবং আক্বলী[২১৭] দলীলের যে বিরাট সমাহার রয়েছে তা এ স্থানে সংকুলন হবে না। আর আমি এটাও জানি যে, কালামপন্থীদের অনেক সংশয়-সন্দেহ আছে, কিন্তু ফাতওয়াতে সেগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়।[২১৮] সুতরাং যে এগুলো[২১৯] দেখবে এবং তাদের সংশয়গুলো স্পষ্ট করার ইচ্ছা করবে, তার জন্য সেটা অনেক সহজ হিসেবে দেখা দিবে।

---

২১৪. সম্ভবত এর দ্বারা ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ইবন ফাররূখ আল-কাত্তান আত-তামীমী। আবূ সা'ঈদ। হাফেযে হাদীসদের একজন। সিক্বাহ ও হুজ্জাহ। তিনি ইমাম মালেক ও শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ এর সমসাময়িক। তিনি বসরাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র মত অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। বালখী তার কিছু ভুল ধরেছে। তার কোনো গ্রন্থের হদিস পাওয়া যায়নি। তবে কাশফুয যুনূন এর লেখক তার একটি কিতাবের নাম 'আল-মাগাযী' উল্লেখ করেন। আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, আমার দু'চোখ ইয়াহইয়া আল-কাত্তানের মতো কাউকে দেখেনি। হাদীসের বিখ্যাত ছয় কিতাবের সকল গ্রন্থকারই তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার জন্ম হিজরী ১২০ সালে, আর মৃত্যু হিজরী ১৯৮ সালে।
দেখুন, যিরিকলী, আল-আ'লাম (৮/১৪৭)।

২১৫. তিনি হচ্ছেন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ইবন বকর ইবন আব্দুর রহমান আত-তামীমী আন-নাইসাপূরী। ইসলামের বড় ইমামদের একজন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন মালেক, লাইস প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বুখারী, মুসলিম, উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, যুহলী প্রমুখ। ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়ার মতো কাউকে দেখিনি। আর আমি মনে করি না তিনি নিজের মতো কাউকে দেখেছেন। তিনি আরও বলেন, যেদিন ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া মারা গেলেন সেদিন তিনি দুনিয়াবাসীদের ইমাম ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তার নিজের মতো কাউকে দেখেননি, আর লোকেরাও তার মতো কাউকে দেখেনি। তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ১৪২ সালে, আর মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ২২৬ সালে।
দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৯/১৯৭); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৪১৫); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৫১২); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৫৯)। তিনি তাদের ওপর এতই ক্রোধান্বিত ছিলেন যে, তিনি জাহমিয়্যাদের বক্তব্যকে মারাত্মক গণ্য করতেন, এমনকি তাদের বক্তব্য বর্ণনাকেও ঘৃণা করতেন।

২১৬. কুরআন ও হাদীসের দলীল।

২১৭. বিবেকের যুক্তিপ্রসূত প্রমাণাদি।

২১৮. বস্তুত এ সংক্ষিপ্ত ফাতাওয়া এতসব জায়গা হওয়ার কথা নয়। বিশেষ করে তিনি এ ফাতাওয়াটি লিখেছেন একটি প্রশ্নের উত্তরে। আর যোহর ও আসরের মাঝে এক বৈঠকে। যদি কালামশাস্ত্রবিদ তথা মু'তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিয়াদের বক্তব্য ও সন্দেহের উত্তরের বিষয়টি বলেন তবে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সেগুলোর উত্তর দিয়েছেন তার অনেক গ্রন্থে। যেমন, দারউত তা'আরুদ্ব, মিনহাজুস সুন্নাহ, আস-সাফাদিয়্যাহ, নাকদুত তা'সীস ইত্যাদিতে।

২১৯. অর্থাৎ উপরে বর্ণিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বক্তব্যসমূহ দেখবে।

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة. مقالة التعطيل والتأويل. مأخوذًا عن تلامذة المشركين، والصابئين، واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن، بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

***

আর যেহেতু (আল্লাহর গুণ অস্বীকার করার) এদের এ মতবাদ তথা তা'ত্বীল[২২০] (নিষ্ক্রিয়করণ) ও তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যাকরণ) মূলনীতিটি গৃহীত হয়েছে মুশরিক, ইয়াহূদী এবং সাবেয়ীদের শিষ্যদের থেকে, তাহলে একজন মুমিনের মন বা একজন বুদ্ধিমানের মন কীভাবে প্রশান্তি পেতে পারে তাদের পথ গ্রহণ করে যারা হয় অভিশপ্ত নতুবা পথভ্রষ্ট? আর কীভাবেই তারা ছেড়ে দিতে পারে তাদের পথ, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন? যারা হচ্ছেন- নবী, শহীদ এবং নেককার লোক।[২২১]

---

২২০. যারাই আল্লাহর গুণ অস্বীকার করতো বা অর্থহীন করতো অথবা অপব্যাখ্যা করতো সালাফে সালেহীন তাদের সকলকে মু'আত্তিলা বলতো। [ইবন তাইমিয়্যাহ (৫/৩২৯)]

২২১. অথচ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এদেরকে অনুসরণ করারই নির্দেশ আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তারাই তো ওরা যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন সুতরাং তোমরা তাদের হিদায়াতের অনুসরণ কর।" [সূরা আল-আন'আম: ৯০]

فصل

[مجمل مذهب أهل الحق في صفات الله تعالى]:

ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث».

ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه

পরিচ্ছেদ

[আল্লাহর সিফাত এর ব্যাপারে হকপন্থীদের সংক্ষিপ্ত নীতি]

অতঃপর এ ব্যাপারে সামগ্রিক ও সার্বজনীন কথা হচ্ছে: আল্লাহকে সে গুণে গুণান্বিত করা যে গুণে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর রাসূল যে গুণে গুণান্বিত করেছেন আর প্রথম যুগের অগ্রবর্তীগণ যে গুণে গুণান্বিত করেছেন[২২২], (এগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়ে) কুরআন-হাদীসকে অতিক্রম করা যাবে না।[২২৩]

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

«لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث».

"আল্লাহকে কেবল সেসব গুণে গুণান্বিত করা হবে, যাতে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গুণান্বিত করেছেন, এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস অতিক্রম করা যাবে না।"[২২৪]

সালাফে সালেহীনের নীতি[২২৫] হচ্ছে, তারা আল্লাহকে এমনসব গুণে গুণান্বিত করতেন যা দিয়ে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। অনুরূপ তাঁর রাসূল তাঁকে যা দিয়ে গুণান্বিত

---

২২২. অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম।

২২৩. কুরআন ও হাদীসে যা নেই তা সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ, আকীদাহ হচ্ছে তাওক্বীফী, তথা কুরআন ও সুন্নাহ'র দেয়া তথ্যনির্ভর। মুসলিম এ ব্যাপারে নস বা ভাষ্যের সাথেই চলবে, সেখানে বিবেকের যুক্তি বা ইজতিহাদ দিয়ে চলার সুযোগ নেই। যারাই যুক্তির পিছনে চলেছে তারাই এ ময়দানে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে।

২২৪. ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী তা বর্ণনা করেছেন, লুম'আতুল ই'তিকাদ, পৃ. ৯; অনুরূপ তাহরীমুন নাযর ফী কুতুবিল কালাম, পৃ. ৩৮-৩৯। অনুরূপ তা রয়েছে ইবন বাত্তাহ এর আল-ইবানাহ (৩/৩২৬); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪৭২) গ্রন্থদ্বয়েও।

২২৫. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার অধিকাংশ গ্রন্থে প্রায়শই এ বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ, পৃ. ৯১; আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৭; মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৫৭, ২৬৩), (৬/৩৮, ৫১৫, ৫১৮), (১১/২৫০, ৪৭৯), (১২/৭৩, ৫৭৫), (১৩/১৬০, ৩০৫)। অনুরূপ বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১০৫-১০৬); আস-সাফাদিয়্যাহ (১/১০৩), (২/৩১৪)।

وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يُعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، [لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد].

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة، وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصًا

করেছেন, কোনো প্রকার বিকৃতি কিংবা নিষ্ক্রিয়করণ ব্যতীতই, তদ্রূপ কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ কিংবা উদাহরণ সাব্যস্ত ব্যতীতই।[২২৬] আর আমরা জানি যে আল্লাহ যে গুণে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন তা সত্য, তাতে নেই কোনো কুজ্ঝটিকা বা প্রহেলিকা বা প্রহসন। বরং বক্তার কথা দ্বারা যেভাবে তার উদ্দেশ্য বুঝা যায় সেগুলোর অর্থও সেভাবে বুঝা যায়। বিশেষ করে বক্তা যখন স্বীয় বক্তব্যের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অবগত এবং স্বীয় জ্ঞানের বর্ণনাদানের ক্ষেত্রে বেশি বাগ্মী আর ব্যক্ত করা, পরিচয়দান ও পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি কল্যাণকামি।

তদুপরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নেই, না তাঁর নাম ও গুণসহ পবিত্রসত্তায়, না তার কার্যাবলিতে।[২২৭] কাজেই যেমন আমরা এই ইয়াকীন রাখি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত জাতিসত্তা রয়েছে, আবার তাঁর প্রকৃত কর্ম (ফে'ল) রয়েছে, তেমনি তাঁর প্রকৃত সিফাত (গুণাবলি)ও রয়েছে। আর তাঁর মতো কিছুই নেই, তাঁর সত্তায়ও না, গুণেও না, কর্মেও না।

সুতরাং প্রত্যেক ঐ জিনিস যা ত্রুটি (নুকছানী) বা নতুন (হুদুস[২২৮]) হওয়া আবশ্যক করে

২২৬. চারটি শব্দ আরবীতে এসেছে। চারটি অনুবাদ চারটি আলাদা শব্দে করা হয়েছে। শব্দ চারটি হচ্ছে,
১- তাহরীফ= বিকৃতি। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাহরীফ ব্যবহার করেছেন তা'ওয়ীল বলেননি। কারণ কালামশাস্ত্রবিদরা যা করেছে তা তা'ওয়ীল বা ব্যাখ্যা নয় বরং তা তাহরীফ বা বিকৃতি। আর তাহরীফ শব্দটি কুরআনে যত নিন্দিত হিসেবে এসেছে। তা'ওয়ীল শব্দটি তত নয়। আর যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহকে আমরা মানদণ্ড ধরবো, তাই তার বিপরীত বস্তুকে তাহরীফ বলা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৬৫, ১৯৫)]
২- তা'ত্বীল= নিষ্ক্রিয়করণ। খালি করা বা মুক্ত করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে তার সিফাত মুক্ত করা, আর সেগুলোকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে অস্বীকার করা। কুরআনে এটাকে ইলহাদ হিসেবে বলা হয়েছে।
৩- তাকয়ীফ= ধরণ নির্ধারণ করা। শব্দটি সালাফে সালেহীনের মুখ নিঃসৃত। ইমাম রাবী'আহ, মালেক সুফইয়ান ইবন উয়াইনাহ সবাই এ তাকয়ীফকে অস্বীকার করেছেন।
৪- তামসীল= সাদৃশ্য স্থাপন বা উদাহরণ প্রদান উভয়টিই নিষিদ্ধ, যা কুরআনের ভাষ্য থেকে সরাসরি নিষেধ এসেছে। আল্লাহ বলেন, "কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ১১]

২২৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে সদৃশ সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম, এ চারটির কোনোটিতেই তাঁর সাথে কাউকে সদৃশ বলার সুযোগ নেই।

২২৮. হুদুস বলতে দু'টি বিষয় বুঝায়:
১- যার অস্তিত্বের জন্য কার্যকারণ লাগে।

أو حدوثًا فإن الله منزه عنه حقيقة،

فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث، سابقه العدم، ولافتقار المحدَث إلى مُحدِث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.

[مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل] :

ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرّفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته.

তা থেকে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ মুক্ত ও পবিত্র; কেননা আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতার অধিকারী। আর তাঁর জন্য হুদূস তথা নতুন সৃষ্টি হওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, তাঁর জন্য 'আদাম বা না থাকা অসম্ভব। আর হুদূস (নতুন সৃষ্টি) তার পূর্বে 'আদাম (না থাকা) আবশ্যক করে। আবার মুহদাস (নতুন সৃষ্টি) মুহদিস (সৃষ্টিকারী) এর প্রতি মুখাপেক্ষী, তেমনি আল্লাহ তা'আলা তো নিজেই (ওয়াজিবুল ওজুদ[২২৯] তথা) আবশ্যিক অস্তিত্বের অধিকারী।[২৩০]

[সালাফগণের নীতি সাদৃশ্যস্থাপন ও নিষ্ক্রিয়করণের মাঝামাঝি অবস্থানে]

সালাফে সালেহীনের অনুসৃত পন্থা হচ্ছে তা'ত্বীল (নিষ্ক্রিয়করণ) ও তামসীল (সাদৃশ্যস্থাপন) এর মাঝামাঝি। সুতরাং তারা আল্লাহর কোনো গুণকে মাখলুকের গুণের মতো বলে না, যেমন আল্লাহর সত্তাকে কোনো মাখলুকের সত্তার মতো বলে না। তিনি নিজে তাঁর যে গুণ বর্ণনা করেছেন বা তাঁর রাসূল তাঁর যে গুণ বর্ণনা করেছেন সেগুলো তারা নাকচ করে না। তাই তারা তাঁর সুন্দর নামসমূহ এবং উন্নত গুণাবলিকে নিষ্ক্রিয় বলে না, কথাকে তার স্থান

২- যার অস্তিত্বের জন্য প্রথম এমন কিছুর প্রয়োজন হয়, যা ইতোপূর্বে নাই ছিল।
দেখুন, আল-মুবীন ফী শারহি মা'আনী আলফাযিল হুকামায়ি ওয়াল মুতাকাল্লিমীন, পৃ. ১১৯।
উভয় অর্থেই আল্লাহ তা'আলার জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। তবে এর দ্বারা আল্লাহর কর্মগত গুণ, অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক যখন ইচ্ছা তখন কিছু করাকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ এসব গুণের ক্ষমতা তার পূর্বাহ্নেই ছিল, তিনি যখন ইচ্ছা তা করবেন, তার প্রকাশ ঘটাবেন। সেখানে আল্লাহর কর্মগত গুণগুলোকে হুদুস নাম দিয়ে তা অস্বীকার করা যাবে না।

২২৯. ওয়াজিবুল ওজুদ হচ্ছে, তিনি স্বয়ং অপর সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, কাদীম, সর্বপ্রাচীন (আযালী), যার নতুন হওয়া কিংবা নাই হওয়া অসম্ভব। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ১৬-১৭; থানওয়ী, কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন (২/১৩৩১, ১৩৩৪)।

২৩০. অর্থাৎ তিনটি কারণে মহান আল্লাহ হুদুস বা কার্যকারণের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত;
এক. কারণ, 'হুদুস' হতে হলে তার আগে 'নাই' হওয়ার আবশ্যকতা থাকবে, আর আল্লাহর জন্য 'নাই' সময় বা অবস্থান কল্পনা করাও নিষিদ্ধ।
দুই. কারণ, 'হুদুস' বলে তার জন্য 'মুহদিস' অস্তিত্বে আনয়নকারীর প্রয়োজন হয়, যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।
তিনি. কারণ, তিনি স্বয়ং ওয়াজিবুল ওজুদ বা তাঁর জন্য আবশ্যিক অস্তিত্ব থাকা জরুরী বা যার অস্তিত্ব আবশ্যক। হুদুস তার সাথে সাংঘর্ষিক

থেকে সরিয়ে দেয় না, আল্লাহর নামসমূহ ও আয়াতসমূহে ইলহাদ(২৩১) (বিকৃতি) করে না।

২৩১. 'ইলহাদ' শব্দের মূল অর্থ, একদিকে ঝুঁকে যাওয়া, যুলুম করা ও বক্রপথ অবলম্বন করা। এজন্যই যেসব কবর সোজা খনন করার পর নিচে গিয়ে কিবলার দিকে ঝুঁকে দেয়া হয় সেগুলোকে লাহ্দ কবর বলা হয়। [দেখুন, ইবন মানযূর, লিসানুল আরব (৩/৩৮৯)]

এখানে আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহে ইলহাদ বলতে বুঝানো হয়েছে, সেগুলোর যেমন আছে তেমন না রেখে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়া ও মিথ্যারোপ করা। আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ, সুতরাং তোমরা সে নামসমূহ দিয়ে তাঁকে আহ্বান কর, আর যারা তাঁর নামসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করে, তারা যে কাজ করে তার শাস্তি তাদেরকে প্রদান করা হবে।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮০] [দেখুন, তাফসীর আত-ত্বাবারী (৯/১৩৩-১৩৪); তাফসীর ইবন কাসীর (৩/৫১৭)]

আর আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে ইলহাদ কয়েক প্রকার:

প্রথমত: আল্লাহর নামসমূহের কোনো কিছু অস্বীকার করা অথবা নামসমূহ যেসব সিফাত (গুণ) ও হুকুম-আহকাম শামিল করে আছে তার মধ্যে কোনো বিষয় অস্বীকার করা। যেমনটি করেছে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় ও অন্যান্য আহলে তা'ত্বীল তথা আল্লাহর গুণসমূহ অকার্যকর বলে ধারণাকারী সম্প্রদায়। এটা এ জন্য ইলহাদ (অস্বীকার) যে, আল্লাহর নামসমূহ ও তা যেসব হুকুম-আহকাম এবং আল্লাহর জন্য উপযুক্ত গুণসমূহকে শামিল করছে তার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। অতএব, এসবের মধ্যে কোনো কিছু অস্বীকার করার অর্থ, যা ওয়াজিব তা থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য দিকে ঝুঁকে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর নামসমূহ এমন গুণ-নির্দেশক করে দেয়া যা সৃষ্টিজীবের গুণ সদৃশ। যেমনটি করেছে আহলে তাশবীহ তথা আল্লাহর গুণসমূহকে সৃষ্টিজীবের গুণসদৃশকারী সম্প্রদায়। এটা এ কারণে যে, অর্থগতভাবে তাশবীহ (সাদৃশ্যকরণ) একটি বাতিল বিষয়। কুরআন-সুন্নাহ'র কোনো ভাষ্য এ বিষয়টিকে নির্দেশ করতে পারে না, বরং কুরআন-সুন্নাহ'র ভাষ্যসমূহ এ বিষয়টিকে বাতিল হওয়ার ওপর প্রমাণবহ অতএব আল্লাহর গুণসমূহকে সৃষ্টিকুলের গুণের সাথে তাশবীহ তথা সাদৃশ্যবোধক করে দেয়ার অর্থ আল্লাহর নামের ব্যাপারে যা ওয়াজিব ও যথার্থ তা থেকে বিচ্যুতি।

তৃতীয়ত: আল্লাহ তা'আলার ওপর এমন নাম প্রয়োগ করা যা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের ওপর প্রয়োগ করেননি। যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায় আল্লাহর ওপর (পিতা) নাম প্রয়োগ করেছে। আর দার্শনিকরা তাঁর ওপর প্রয়োগ করেছে (কার্যকরী কারণ) নাম। এটা এ জন্য বিচ্যুতি যে, আল্লাহর নামসমূহ ওহীনির্ভর। অতএব আল্লাহ তা'আলার ওপর এমন নাম প্রয়োগ করা যা তিনি নিজের ওপর প্রয়োগ করেননি, নামের ব্যাপারে যা ওয়াজিব ও যথার্থ তা থেকে বিচ্যুতি। তা ছাড়া এ প্রয়োগকৃত নামগুলো স্বয়ং বাতুলতাপূর্ণ, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

চতুর্থত: আল্লাহর নামসমূহ থেকে উৎকলিত করে কোনো উপাস্য বস্তুর নাম রাখা। যেমন -এক বর্ণনা মতে - মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার 'আল আযীয' নাম থেকে উৎকলিত করে তাদের মূর্তি আল উয্যার নাম রেখেছে। আল্লাহ তা'আলার 'ইলাহ' নাম থেকে উৎকলিত করে তাদের মূর্তি 'লাত' এর নাম রেখেছে। অতএব, তারা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ থেকে উৎকলিত করে তাদের উপাস্যসমূহের নাম রেখেছে। এটা এ কারণে ইলহাদ যে, আল্লাহর নামসমূহ কেবল তাঁর জন্যই সুনির্দিষ্ট।

অতএব, যেভাবে ইবাদত ও সত্য উলুহিয়াত আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট এবং আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা বর্ণিত, অনুরূপভাবে সুন্দরতম নামসমূহ তাঁর জন্যই সুনির্ধারিত। সুতরাং এ নামগুলো যেভাবে আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয় সেভাবে এগুলোর দ্বারা অন্য কারও নাম রাখা, নাম বিষয়ে যা ওয়াজিব ও উচিত তা থেকে বিচ্যুতি।

আল্লাহর নামসমূহের সব ধরনের বিকৃতিই হারাম; কেননা আল্লাহ তা'আলা বিকৃতিসাধনকারীদের হুঁশিয়ার করে বলেছেন: "আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা আল আ'রাফ: ১৮০]

এ বিকৃতিকরণের মধ্যে শরী'আতের দলিলের নিরিখে কোনোটি শির্কী আবার কোনোটি কুফরী।

[بيان أن التعطيل تمثيل والتمثيل تعطيل]:

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامعٌ بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون؛ فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولاً، وعطلوا آخرًا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى.

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش، أو أصغر أو مساويًا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم.

[أما] استواء يليق بجلال الله ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها.

[এটার বর্ণনা যে, তা'ত্বীল (নিষ্ক্রিয়করণ) তামসীল (তুলনা প্রদান)কে আবশ্যক করে, অনুরূপ তামসীল প্রদান করা তা'ত্বীল করাকে আবশ্যক করে]

তা'তীলকারী ও তামসীলকারী সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রত্যেকেই তা'ত্বীল ও তামসীল সাব্যস্তকারী। তা'ত্বীল বা (আল্লাহর নাম ও গুণকে) নিষ্ক্রিয়কারীগণ আল্লাহর নামের ও গুণের সেই অর্থই বুঝে যা মাখলুকের জন্য উপযোগী, এ কারণে তারা সে মাফহূম (বুঝ)কে নাকচ করে যেতে থাকে। ফলে তারা তা'ত্বীল ও তামসীল উভয়টিকেই একত্রিত করে। আগে তামসীল করে, পরে তা'ত্বীল করে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর সিফাত ও নাম দ্বারা যা বুঝা যায় তাকে তাঁর সৃষ্টির নাম ও সিফাতের বুঝের সাথে তুলনা করে ও সাদৃশ্য প্রদান করে। আবার এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর জন্য উপযোগী নাম ও গুণকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।[২৩২]

কেননা যখন কেউ বলে, "যদি আল্লাহ 'আরশের উপরে হন তাহলে তিনি হয়তো 'আরশের থেকে বড় হবেন অথবা ছোট অথবা সমান হবেন। আর এগুলো সবই অসম্ভব[২৩৩];" অনুরূপ কোনো বাক্য। (এটা কীভাবে তা'ত্বীল ও তামসীলকে একত্রিত করে? তার বর্ণনা হচ্ছে,) সে লোকটি মূলত মহান আল্লাহর 'আরশের উপরে উঠাকে তেমনি বুঝেছে যেমন কোনো জিসম (দেহ)-র উপরে অন্য কোনো জিসম উঠে থাকে। বস্তুত তার (দেহের উপর দেহ থাকার) এ বুঝটির আবশ্যকতা পূর্বের বুঝ (কোনো কিছু অপর কোনো কিছুর উপরে থাকলে সেটা বড় বা ছোট বা সমান হতে হবে) অনুসারেই হয়েছে (যা সৃষ্টির ওপর সৃষ্টির থাকার সাথে যথাযথ)। কিন্তু (স্রষ্টা কোনো কিছুর উপরে থাকার বিষয়টি এমন নয়, তাই) যদি বলা হতো, মহান আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন এমন প্রকার উপরে উঠা যা তাঁর মহত্বের সাথে উপযোগী এবং তাঁর জন্য বিশেষিত[২৩৪], তাহলে ('আরশে উঠার) সাথে এমন

২৩২. বিস্তারিত দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২০৯)।

২৩৩. এসব সন্দেহ আশ'আরী ও মাতুরিদী মতবাদের লোকেরা পেশ করে থাকে। যার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ সর্বোচ্চ সত্তা ও 'আরশের উপর উঠার গুণ অস্বীকার করা। দেখুন, তাদের গ্রন্থে এসব সন্দেহ, নাইসাপুরী, আল-গুনইয়া ফী উসূলিদ্দীন, পৃ. ৭৪; গাযালী, কাওয়া'য়িদুল ই'তিক্বাদ, পৃ. ১৬৮।

২৩৪. যেমনটি নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণ সাব্যস্ত করেছেন।

وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون جوهرًا، أو عرضًا، وكلاهما محال: إذ لا يعقل موجود إلا هذان،

কোনো বাতিল আবশ্যকতা ('আরশের চেয়ে বড় কিংবা ছোট কিংবা সমান হওয়ার) বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী করে না; যা নাকচ করা ওয়াজিব হবে (কেননা তা তো সৃষ্টির জন্য আবশ্যক, স্রষ্টার জন্য নয়)।[২৩৫]

এটা তখন সাদৃশ্য স্থাপনকারীর ঐ কথার মতো হয়ে যায়, যে বলে থাকে, যদি সৃষ্টিকুলের কোনো স্রষ্টা থাকবেন তবে সে হয়তো জাওহার[২৩৬] (মৌলবস্তু) হবে, নতুবা আরদ্ব[২৩৭] (গুণবাচক) হবে।[২৩৮] [অথচ জাওহার বা 'আরদ্ব' কোনোটি হওয়া আল্লাহর জন্য অসম্ভব।[২৩৯]] যেহেতু সকল অস্তিত্বই এ দুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ।[২৪০]

---

২৩৫. এ আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো মু'আত্তিল যে তা'ত্বীল ও তামসীল উভয়টিই করেছে তা প্রমাণিত হলো। কারণ সে তা'ত্বীল করার আগে তামসীল করে নেয়।

২৩৬. জাওহার হচ্ছে এমন মৌলবস্তু, যা জায়গা জুড়ে আছে। তবে তা দু'ভাগে বিভক্ত:
ক. বাসীত্ব বা সূক্ষ্ম যা তখনকার দার্শনিকদের পরিভাষায় 'আল-জাওহারুল ফারদ' বা অনু-পরমানু বুঝায়। তা এমন এক সত্তা যাতে আর ভাগ চলে না, বাস্তব কর্মের মাধ্যমেও নয়, ক্ষমতার দিক থেকেও নয়।
খ. মুরাক্কাব বা যৌগিক; আর তা হচ্ছে জিসিম বা দেহ। যা দুই বা ততোধিক 'আল-জাওহার আল ফারদ' তথা অণু-পরামাণু দ্বারা ঘটিত। তাতে বাড়তি কিছু নেই।

২৩৭. 'আরদ্ব হচ্ছে এমন বস্তু যা অবশিষ্ট থাকা সম্ভব নয়, অন্যের ওপর নির্ভর করে, অন্যের উপরে অবস্থান করে টিকে থাকে, যা জাওহার ও জিসিম এর মধ্যে কেবল প্রকাশ পায়। অপর কোনো জাওহার ও জিসিমে পরিণত হলে তা বাতিল হয়ে যায়।
আল্লাহর গুণাবলিকে কি 'আরদ্ব বলা যাবে? বস্তুত আল্লাহর গুণাবলিকে আরদ্ব বলা এটি কালামশাস্ত্রবিদদের আবিষ্কার। এটাকে সরাসরি হা বা না বলা যাবে না। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতে হবে, তারপর যদি তা ভুল অর্থে পরিচালিত হয়, যেমন আরদ্ব বলতে বুঝায় যা নিঃশেষ হয়ে যায় তবে সে অর্থে আল্লাহর সিফাতকে 'আরদ্ব বলা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই অস্বীকার করা হবে। আর যদি বিশুদ্ধ অর্থ করা হয় আর তা আল্লাহর গুণের সাথে উপযোগী বিবেচিত হয় তবে সেটার অর্থকে অস্বীকার করা হবে না। কিন্তু শব্দ স্বীকার করা হবে। [বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৯০-৯১, ১০৩-১০৪)]
ইমাম হাফেয ক্বিওয়ামুস সুন্নাহ আবুল কাসেম আল-আসবাহানী বলেন, 'সালাফগণ জাওহার ও আরদ্ব নিয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীনে 'ইযাম এর যুগে এসব ছিল না। তাই হতে পারে তারা এগুলো জানা সত্ত্বেও চুপ ছিলেন, তাহলে আমাদের জন্যও এ ব্যাপারে চুপ থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় যেমনটি তারা চুপ ছিলেন, নতুবা তারা এসব না জেনে চুপ ছিলেন, তাহলে তারা যা জানেননি, দীনের ব্যাপারে সেগুলো আমাদের না জানলেও চলবে। [আল-হুজ্জাতু ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/৯৯-১০০)]

২৩৮. মুমাসসিল বা সাদৃশ্য স্থাপনকারীর বক্তব্য এখানে শেষ।

২৩৯. অথচ... এ বক্তব্যটুকু ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে কথার মাঝখানে এসেছে। কারণ ইবন তাইমিয়্যাহ'র নিকট এটা অসম্ভব হলেও মুমাসসিল বা সাদৃশ্য স্থাপনকারীর নিকট জাওহার বা 'আরদ্ব হওয়া আল্লাহর জন্য অসম্ভব নয়।

২৪০. অর্থাৎ মুমাসসিল বা সাদৃশ্য স্থাপনকারী বলছে যে, সকল অস্তিত্বই এ দু'টির একটি হবেই, সুতরাং আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করা দোষণীয় নয়। সুতরাং আল্লাহর সিফাতগুলো মানুষের সিফাতের মতোই। [নাউযুবিল্লাহ]
এভাবে মুমাসসিল আল্লাহর সিফাতকে নিজের মত করে বুঝে নিয়ে দু'টি কাজ করেছে,
এক. সে আল্লাহকে তামসীল করেছে। জাওহার বা 'আরদ্ব যা সৃষ্টির গুণ, আল্লাহকে সেটার অধীন

أو قوله: إذا كان مستويًا على العرش، فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يُعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مَثَّل وكلاهما عَطَّل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز [الأول] بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.

[إثبات العلو والاستواء لله تعالى] :

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط، من أنَّ الله مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله

অনুরূপ মুমাসসিল বা সাদৃশ্যস্থাপনকারীর কথা[২৪১]: যখন তিনি [আল্লাহ] 'আরশের উপর উঠবেন তখন এটি মানুষের খাট বা নৌকার উপর উঠার মতোই ধরে নিতে হবে। যেহেতু 'ইসতিওয়া' (উপরে উঠা) এভাবে ছাড়া জানা যায় না।

এভাবে স্পষ্ট হলো যে, এ দুটি চিন্তাতেই রয়েছে তামসীল বা সাদৃশ্য স্থাপন, আর এ দু'টি চিন্তাতেই রয়েছে আল্লাহর সিফাতের স্বরূপকে নিষ্ক্রিয়করণ। প্রথমটির[২৪২] সমস্যা হচ্ছে সে প্রকৃত 'ইসতিওয়া'র সকল নামকে নিষ্ক্রিয় করেছে। আর দ্বিতীয়টির[২৪৩] সমস্যা হচ্ছে সে এমন এক 'ইস্তেওয়া' সাব্যস্ত করেছে যা কেবল মাখলূকের জন্য নির্দিষ্ট।[২৪৪]

[মহান আল্লাহর জন্য 'উর্ধ্বে থাকা' ও 'উপরে উঠা' এ গুণদ্বয় সাব্যস্তকরণ]

আর মীমাংসাপূর্ণ কথা হচ্ছে, যার ওপর মধ্যমপন্থী উম্মত রয়েছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ 'আরশের উপরে উঠেছেন[২৪৫], তাঁর শানের সাথে উপযোগী এবং তাঁর জন্যই খাসভাবে।

করে নিয়েছে।
দুই. সে তামসীল করার মাধ্যমে আল্লাহর গুণসমূহের প্রকৃত অর্থকে নিষ্ক্রিয় করে নিয়েছে।
এভাবেই একজন মুমাসসিল তামসীল ও তা'ত্বীল দু'টোই করে থাকে।

২৪১. এখানে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরেকটি উদাহরণ নিয়ে এসেছেন, যার মাধ্যমে সাদৃশ্য স্থাপনকারীর যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। মুমাসসিলের দেয়া যুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সে তামসীল করেছে, যার পরিণতি দাঁড়িয়েছে তা'ত্বীল, অর্থাৎ তামসীল করার মাধ্যমে এ গুণের আসল অর্থকে নিষ্ক্রিয়করণ করা হয়ে গেছে।

২৪২. অর্থাৎ মু'আত্তিল। যে ইস্তিওয়া এর প্রকৃত সকল অর্থকে নিষ্ক্রিয় করেছে। কারণ ইস্তিওয়া এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, উপরে উঠা ও উর্ধ্বে উঠা। যেমনটি কুরআনে এসেছে, 'আর জূদী পাহাড়ের উপর উঠল।' [সূরা হূদ: ৪৪] আরও এসেছে, 'যাতে তোমরা তার পিঠসমূহের উপর উঠতে পার।' [সূরা আয-যুখরুফ: ১৩]

২৪৩. অর্থাৎ মুমাসসিল। যে ইস্তেওয়া এর অর্থকে সৃষ্টির কারও মত করে সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তার মতে, উপরে উঠা বলতে সৃষ্টি কর্তৃক কোনো কিছুর উপরে উঠা। [নাউযুবিল্লাহ]

২৪৪. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'জেনে রাখ, যারাই 'ইস্তেওয়া' বা উপরে উঠার গুণ ও অনুরূপ [কর্মবাচক] গুণগুলোকে অস্বীকার করেছে, যদি তুমি সে কারণটি উদ্ঘাটন করতে গবেষণা কর তবে দেখতে পাবে, তারা আয়াত থেকে কোনো সৃষ্টি কর্তৃক কিছুর উপরে উঠাকেই অর্থ হিসেবে ধরে নিয়েছে, অথবা এমনভাবে উপরে উঠা ধরে নিয়েছে যাতে হুদুস (নতুনত্ব) বা নকস (ত্রুটি) মিশ্রিত হয়। তারপর তাদের বিপরীত মতের লোকদের থেকে তা বর্ণনা করে (অথচ তারা তা বলেনি) তারপর তারা সেটা বাতিল করার নিমিত্তে যাবতীয় দলীল প্রমাণাদির সমাহার ঘটায়। তারপর বলে, এর দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, 'ইস্তেওয়া' শব্দটিকে ইস্তীইলা' অর্থে নিতে হবে। অর্থাৎ ইস্তেওয়া অর্থ উপরে উঠা না নিয়ে 'ইস্তীইলা' বা করায়ত্ব করার অর্থে নিতে হবে। [আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৫৬৮)]

২৪৫. এখানে বিতর্ক পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের সাথে, যারা আল্লাহর 'আরশের উপর উঠাকে

ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.

[موافقة مذهب السلف للعقل والنقل]:

واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية [أصلاً] لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلّها فذلك سهل يسير.

কাজেই যেমন তিনি 'আলীম' সকল বিষয়ে অবগত, তিনি 'ক্বাদীর' সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, তিনি ('সামী')' সর্বদ্রষ্টা, ('বাসীর') সর্বশ্রোতা ইত্যাদি। আর আল্লাহর ইলম (জ্ঞান) ও কুদরত (ক্ষমতা)(২৪৬) এর ক্ষেত্রে এমন কোনো 'আরদ্ব'(২৪৭) এর বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা জায়েয নেই যা কোনো সৃষ্টির ইলম ও কুদরতের জন্য প্রযোজ্য; তেমনিভাবে মহান আল্লাহ 'আরশের উপরে(২৪৮), তাঁর জন্য মাখলূকের ফাউক্বিয়্যাত তথা মাখলূকের ওপর মাখলুক হওয়ার বৈশিষ্ট্য ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক বিষয়সমূহ সাব্যস্ত করা জায়েয নেই।

[সালাফে সালেহীনের মাযহাব বিবেকের যুক্তি ও কুরআন-সুন্নাহ'র ভাষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ]

আর জেনে রাখ যে, স্পষ্ট আক্বল (বিবেকের স্পষ্ট যুক্তি) এবং বিশুদ্ধ নকল (কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে) আসা দলীলে এমন কিছু নেই যা সালাফি তরীকার ভিন্ন হওয়া আবশ্যক করে। তবে হক্বের ওপর(২৪৯) আপতিত সংশয় নিরসন করার আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংকুলান হবে না। কাজেই যে অন্তরে সংশয় রয়েছে, আর সে তা নিরসনের ইচ্ছা করে তাহলে সেটা সহজ ও সরল।

অস্বীকার করে থাকে।

২৪৬. উল্লেখ্য যে, আশায়েরারা ইলম, কুদরত, শোনা, দেখা এগুলো সহ জীবন, ইচ্ছা, কালামে নফসী গুণসমূহ সাব্যস্ত করে থাকে, তারা বলে থাকে, এগুলো বিবেকের যুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয়, অন্যগুলো নয়।

২৪৭. ইতোপূর্বে আরদ্ব এর ব্যাখ্যা চলে গেছে যে সৃষ্টিতে 'আরদ্ব' বলতে বুঝায় যা অবশিষ্ট থাকে না বা ক্ষণস্থায়ী।

২৪৮. কারণ আল্লাহ তা'আলা যে ইস্তেওয়া বা উপরে উঠার কথা বলেছেন তা তো বিশেষ ধরনের উপরে উঠা, সেটার ধরণ আমাদের জানা নেই, যেমনটি আমরা আল্লাহর ইলম, কুদরত ও শোনার ক্ষেত্রে বলি যে, এটি আল্লাহর জন্য বিশেষ ধরনের ইলম, কুদরত ও শোনা, যার প্রকৃত ধরণ আমরা জানি না। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, শাইখুল ইসলামের আত-তাদমুরিয়্যাহ গ্রন্থের চতুর্থ নীতি]

২৪৯. অর্থাৎ সালাফদের আকীদাহ হচ্ছে হক্ব যার ওপর অনেকে বিবেকের যুক্তি দাঁড় করিয়ে সন্দেহে নিপতিত হতে পারে। সেসব অস্বচ্ছ যুক্তিকে দলীল মনে করে অনেক কালামশাস্ত্রবিদ সন্দেহে দোদুল্যমান হয়ে আছে। তাদের এসব সন্দেহ নিরসনের জন্য আরও বেশি লেখা দরকার যা এখানে তিনি নিয়ে আসেননি। তবে শাইখুল ইসলাম এ বিষয়ে ১১ খণ্ডের এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম 'দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি'। সে গ্রন্থে তিনি এসব লোকদের সন্দেহের জবাব দিয়েছেন, যারা কুরআন ও হাদীসে আসা আল্লাহর গুণ বিষয়ক ভাষ্যের সাথে তাদের বিবেকের যুক্তির মতবিরোধ দাবি করেছিল।

[اضطراب أهل التأويل]:

ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ـ من المتأولين لهذا الباب ـ في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية، يزعم أن العقل يحيلها، وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علمًا وقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك، فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويل.

[যারা তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে তাদের অস্থিরতা]

অতঃপর এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের সালাফে সালেহীনের বিরোধিতাকারী ও বিপরীতমুখী অবস্থানকারী যারা এ অধ্যায়ে তা'ওয়ীল তথা অপব্যাখ্যাকারী রয়েছে তারা জটিল সংশয়ের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে।(২৫০) কেননা;

- যে ব্যক্তি (জান্নাতে আল্লাহকে) দেখা যাবার বিষয়টি অস্বীকার করে(২৫১), সে মনে করে যে, আক্বল (বুদ্ধি-বিবেকের যুক্তি) সেটাকে অসম্ভব মনে করে, আর সে মনে করে যে এটাতে তা'ওয়ীল করা ছাড়া উপায় নেই।
- আর যে এটা অসম্ভব মনে করে যে, আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা আছে, অনুরূপ অসম্ভব মনে করে যে, আল্লাহর এমন কালাম বা বাণী রয়েছে যা সৃষ্টি নয় ইত্যাদি(২৫২), সে বলে, নিশ্চয় তার আক্বল বা বিবেকের যুক্তি এগুলো অসম্ভব মনে করে। তাই সে এগুলার তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করতে বাধ্য।
- বরং যে এটা অস্বীকার করে যে, বাস্তবে দেহের হাশর (পুনরুত্থান) আছে এবং জান্নাতে প্রকৃত অর্থে খাওয়া-দাওয়া আছে(২৫৩), সে মনে করে যে, আক্বল বা বিবেকের যুক্তি এটা অসম্ভব ভাবে, তাই সে তা'ওয়ীল করতে বাধ্য।
- তেমনি যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ 'আরশের উপরে নেই(২৫৪), সে মনে করে যে, আক্বল বা বিবেকের যুক্তি এটাকে অসম্ভব মনে করে এবং তাই সে [এটার] তা'ওয়ীল করতে বাধ্য।(২৫৫)

---

২৫০. কোনো নিয়মনীতিতে তারা নিজেদেরকে সুস্থির রাখতে পারছে না। তাদের একেকজনের তা'ওয়ীলের কারণ একেক রকম। একজনের কাছে যা বিবেকের যুক্তিতে ধরে, অপরজনের কাছে তা বিবেকের যুক্তিতে ধরে না, যা প্রমাণ করে যে মানুষের বিবেকের যুক্তি কখনও সমান হয় না, সেখানে কমন কোনো বিষয়ও নেই।

২৫১. যেমনটি জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলারা মনে করে থাকে, অনুরূপ তাদের অনুসারী খারেজী ও রাফেদ্বী মতবাদের লোকেরা।

২৫২. যেমনটি জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলারা মনে করে থাকে।

২৫৩. যেমনটি তথাকথিত দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসীরা ও তাদের অনুসারী কট্টর বাতেনী ফির্কার লোকেরা মনে করে থাকে।

২৫৪. যেমনটি মনে করে থাকে, জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, আশায়েরা, মাতুরিদিয়্যাহ প্রভৃতি ভ্রান্ত ও বিদ'আতী দলসমূহ।

২৫৫. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোন জিনিস বিবেকের যুক্তি ধরে না সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে

[الدليل على فساد منهج أهل التأويل]:

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله.

فيا ليت شعري بأي عقل يُوزَن الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث

[যারা তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয় তাদের মানহাজ নষ্ট হওয়ার প্রমাণ]

এদের কথা ভ্রান্ত হওয়ার দলীল হিসেবে তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আক্বল যেটাকে অসম্ভব সাব্যস্ত করে সে ব্যাপারে তাদের কোনো চলমান মূলনীতি নেই। বরং তাদের মধ্য থেকে একজনের আক্বল যা অসম্ভব সাব্যস্ত করে, অন্যজনের আক্বল সেটাকে জায়েয বা আবশ্যক সাব্যস্ত করে।[২৫৬]

হায়! যদি জানতাম, কোন আক্বল দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে ওজন করা হবে?[২৫৭]

বিস্তর মতভেদ রয়েছে। অথচ তারা সবাই বিবেকের যুক্তি নিয়েই চলার দাবি করে। তথাকথিত দার্শনিকরা শারীরিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এ দাবিতে যে, তা যুক্তিতে ধরে না, অথচ মু'তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিদীরা সেটাকে যুক্তিতে ধরে বলে থাকেন। অনুরূপভাবে মু'তাযিলারা, যারা আল্লাহর ইলম, কুদরত, সৃষ্ট নয় এমন বাণী অস্বীকার করে, তাদের যুক্তি হলো যে, তা যুক্তিতে ধরে না, অথচ আশায়েরা ও মাতুরিদীদের নিকট তা যুক্তিতে ধরে। আবার মু'তাযিলারা, যারা আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে না বলে তাদের যুক্তি হলো, যুক্তিতে তা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, অথচ আশায়েরা ও মাতুরিদীরা সেটাকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করে থাকেন। অপরদিকে আহলুল হক্বরা, সালাফীরা, চার ইমাম ও তাদের অনুসারী সহীহ আকীদাহ'র অনুসারীরা বিশ্বাস করে থাকেন আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন, অথচ অন্যান্য সকল ফির্কা বলে থাকেন যে, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা যুক্তিতে ধরে না, তাই তা'ওয়ীল করতে হবে।

তাই কোনটি বিবেকের যুক্তি সমর্থন করে আর কোনটি সমর্থন করে না তাতে এত মতভেদ থাকার অর্থই হচ্ছে, বিবেকের যুক্তি কোনটি ধরবে আর কোনটি ধরবে না তা একজন থেকে অন্যজনের ব্যাপারে আলাদা থাকতে বাধ্য। আনাসের যা বিবেকে ধরে, আনাসের বাপের তা বিবেকে নাও ধরতে পারে, তাই বলে যা আনাসের বাপের বিবেকে ধরে না, তা নিষিদ্ধ বলার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। সুতরাং যুক্তির প্রতি না ঝুঁকে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে যা এসেছে তা মেনে নেয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথা সর্বদা পথভ্রষ্টতা তাকে ঘিরে থাকবে।

২৫৬. ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী এটা সাব্যস্ত করছেন যে, মা'কূল বা 'যে জিনিস আক্বলে ধরে' তা সকল মানুষের নিকট এমন নির্দিষ্ট একটি জিনিস নয়; বরং প্রত্যেকের নিকটই তা ভিন্ন। [দেখুন, আরাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ১২৭]

২৫৭. ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ এ কথাটির ব্যাখ্যা করে বলেন, তোমাদের কাদের আক্বলকে এ ব্যাপারে মাপকাঠি ধরব যে, তার সাথে মিলে গেলে নিব ও তার প্রকাশ্য অর্থের ওপর রাখব, আর যা তার বিরোধী হবে তা পরিত্যাগ করব অথবা তা'ওয়ীল করব বা তাফওয়ীদ্ব করব? এরিস্টটল ও তার অনুসারীদের আক্বলের কাছে? নাকি প্লেটো ও তার অনুসারীদের আক্বলের কাছে? নাকি পিথাগোরাসের আক্বলের কাছে? নাকি এম্পেদোক্লিসের আক্বলের কাছে, নাকি সক্রেটিস এর আক্বলের কাছে? নাকি থেমিস্টিউসের আক্বলের কাছে, নাকি ফিলিপপুত্র আলেক্সান্দারের আক্বলের কাছে? নাকি ফারাবীর আক্বলের কাছে? নাকি জাহম ইবন সাফওয়ানের আক্বলের কাছে? নাকি নাযযাম এর আক্বলের কাছে, নাকি 'আল্লাফ এর আক্বলের কাছে? নাকি জুব্বাঈর আক্বলের কাছে, নাকি বিশর আল-মিররীসীর আক্বলের কাছে? নাকি ইসকাফীর আক্বলের কাছে? নাকি হুসাইন আন-নাজ্জার এর আক্বলের কাছে? নাকি আবু ইয়া'কুব আশ-শাহহাম এর আক্বলের কাছে? নাকি আবুল হুসাইন আল-খাইয়াত্ব এর আক্বলের কাছে? নাকি আবুল কাসেম আল-বালাখীর আক্বলের কাছে? নাকি সুমামাহ ইবন আশরাস এর আক্বলের কাছে? নাকি জা'ফর ইবন মুবাশ্বির এর আক্বলের কাছে?

قال: «أَوَكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟».

তাইতো ইমাম মালেক ইবন আনাসের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, যেখানে তিনি বলেছেন: «أَوَكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟».
"যখনই আমাদের নিকট এমন কোনো তর্কবাদী লোক আগমন করবে যে অন্যের চেয়ে তর্কে বেশি পটু, তখনই কি আমরা ওদের তর্কের কারণে মুহাম্মাদের নিকট জিবরীলের আনিত বিধান ছেড়ে দিব?"(২৫৮)

নাকি জা'ফর ইবন হারব এর আকলের কাছে? নাকি আবুল হুসাইন আস-সালেহীর আকলের কাছে? নাকি আবুল হুসাইন আল-বাসরীর আকলের কাছে? নাকি আবু মু'আয আত-তুমনীর আকলের কাছে? নাকি মা'মার ইবন 'আব্বাদ এর আকলের কাছে? নাকি হিশাম আল-ফূত্বী এর আকলের কাছে? নাকি 'আব্বাদ ইবন সুলাইমান এর আকলের কাছে? নাকি পরবর্তীতে যারা এসেছে তাদের আকলের ব্যাপারে তোমাদের সন্তুষ্টি রয়েছে? যারা কয়েক আকলকে পরিমার্জন করে সেগুলোর খিচুড়ি তৈরি করেছে, যারা নিজেদের জন্য আলাদা মতবাদ দাঁড় করিয়েছে, পূর্ববর্তীদের মতবাদে সন্তুষ্ট হতে পারেনি? এই যে, তোমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, মুহাম্মাদ ইবন 'উমার আর-রাযী, তার কোন আকল দিয়ে তুমি ওহীর ভাষ্যের বিশুদ্ধতা পরিমাপ করবে? তোমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছ যে, তার গ্রন্থসমূহে সে সর্বদা অস্থির থাকে, এতই অস্থির যে, সে কোনো মতের ওপরই সুস্থির থাকে না। সুতরাং তোমরা তার বিবিধ আকলের মধ্য হতে একটি আকল তোমরা আমাকে নির্ধারণ করে দাও যার ওপর সে স্থির ছিল, তারপর সেটাকে আমার জন্য মানদণ্ড করে দাও। নাকি তোমরা শির্ক, কুফর ও ইলহাদ এর সহযোগী নাসিরুদ্দীন আত-তূসীর আকলের কাছে আমাকে যেতে বল? কারণ তার আলাদা আকল রয়েছে যে আকলের মাধ্যমে সে তার পূর্ববর্তী মুলহিদদের আকলের বিরোধিতা করেছে তবে সে আকলের মাধ্যমে সে রাসূলের অনুসারীদের আকলের কাছে পৌঁছতে পারেনি। নাকি তোমরা সন্তুষ্ট হও আমি যেন কারামেত্বা, বাতেনিয়া ও ইসমাঈলিয়্যাদের আকলের কাছে যাব? নাকি যাব সর্বেশ্বরবাদের প্রবক্তা ইত্তেহাদিয়্যাদের আকলের কাছে? এসব এবং তাদের মত অসংখ্য দাবিদার যারা বলে চলেছে; তাদের আকলই সবচেয়ে স্পষ্ট, তাদের বিরোধীরা স্পষ্ট আকলের বিরোধিতা করছে (তাদের কাছে যাব?) এ হচ্ছে তাদের আকল, এ আকল সমষ্টি তাদের কিতাবে লিখিত, তাদের লোকদের থেকে বর্ণিত। যদি এ তালিকা লম্বা হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তবে আমরা একটি একটি করে তাদের আকলের প্রকৃত অবস্থা তোমাদের কানে ঢেলে দিতাম, অবশ্য যারা বিভিন্ন ফির্কার ইতিহাস লিখেছে, তারা তা পেশ করেছে। যদি তোমরা চাও তবে সেগুলো জমা করতে পার অথবা সেখান থেকে একটি আকল এনে তাকে ওহী ও যা রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন সেগুলোর জন্য মানদণ্ড করে নাও।
যদি এটি করতে অসমর্থ হও তবে তাদের ওযর গ্রহণ কর, যারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত, তারা যার নাম দিয়ে থাকে 'আল-আদিল্লাহ আল-লাফযিয়্যাহ' বা 'আক্ষরিক দলীল', এগুলোকে যারা সেসব অস্থির আকলগুলোর ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এগুলো যে অস্থির তা তাদেরই কিছু লোকের সাক্ষ্য দ্বারা স্বীকৃত আর তা যে অস্থির ও পরস্পর বিরোধী তার ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী ঈমানদারদের সাক্ষ্যও প্রদত্ত। তাই তাদের কথা গ্রহণ করো, যারা বলে থাকে যে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত সঠিক জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত করে। যারা বলে, এসব অস্থির ও পরস্পর বিরোধী আকলসমূহ কেবল সন্দেহ, পেরেশানী, সংশয় ও বহুমুখী মূর্খতারই জন্ম দেয়। তাই যখন তারা দেখে যে, কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যের সাথে এদের কারও আকলের বিরোধিতা দেখা দিয়েছে তখন তারা কেবল স্পষ্ট কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করে আর এসব আকলকে পদতলে ফেলে পিষ্ট করে, সেখানেই রাখে যেখানে আল্লাহ এদেরকে ও এদের প্রবক্তাদের রেখেছেন। [আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৭৮৩-৭৮৪)]

২৫৮. এটি ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন, যথাক্রমে, আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া (৬/৩২৪); আল-হারাওয়ী, যাম্মুল কারাম, নং ৮৫৫-৮৫৭; যাহাবী, আস-সিয়ার (৮/৮৮); লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১৪৪); যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১০৩; আলবানী বলেন,

[الرد على أهل التأويل]:

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى

[তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যাকারী[২৫৯]দের মতামত খণ্ডন]

আর তাদের প্রত্যেকে অন্যজনকে যা দ্বারা বিতর্ক করেছে নিজেও তার দ্বারা বিতর্কিত হয়েছে। আর তা বিভিন্নভাবে লক্ষণীয়:

প্রথমত: এই বর্ণনা দিয়ে যে, আক্বল (বিবেকের যুক্তি) এসব গুণাবলি সাব্যস্ত করাকে অসম্ভব বলে না।

দ্বিতীয়ত: এ ব্যাপারে বর্ণিত নস তথা কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যগুলো তা'ওয়ীল[২৬০] (স্বাভাবিক অর্থ বাদ দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দূরবর্তী অর্থে নিয়ে যাওয়া) এর সম্ভাবনা রাখে না।

তৃতীয়ত: এটি অকাট্যভাবে জানা গেছে যে, এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন, যেমন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের সাওম নিয়ে এসেছিলেন।

এর সনদ বিশুদ্ধ। মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৪০; আর সুয়ূত্বী তা তার মিফতাহুল জান্নাত গ্রন্থে তা আনয়ন করেছেন।

২৫৯. তা'ওয়ীল এর অনুবাদ এখানে অপব্যাখ্যা করার কারণ হচ্ছে, বস্তুত তা'ওয়ীল নামে কালামশাস্ত্রবিদরা যা করে তা ব্যাখ্যা নয়, অপব্যাখ্যা। কেননা তা'ওয়ীল নাম দিয়ে দূরবর্তী অর্থ খুঁজে বের করা আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর সিফাতের অপব্যাখ্যা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

২৬০. তা'ওয়ীল শব্দের দু'টি অর্থ,

এক. তাফসীর বা ব্যাখ্যা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'এ হচ্ছে সে কর্মের ব্যাখ্যা যে ব্যাপারে আপনি সবর করতে সমর্থ হচ্ছিলেন না' [সূরা আল-কাহফ: ৮২]

দুই. তাফসীর অর্থ প্রকৃত অবস্থা, যেদিকে তা প্রত্যাবর্তন করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম বলেন, 'হে আমার প্রিয় পিতা, এ হচ্ছে আমার স্বপ্নের প্রকৃত অবস্থা, যে স্বপ্ন আমি আগে দেখেছিলাম।' [সূরা ইউসুফ: ৯৯]

আর আল্লাহর বাণী: "তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহকাম', এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ্', সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফেতনা এবং তা'ওয়ীল তথা ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, 'আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" [সূরা আলে ইমরান: ০৭]

এ আয়াতে মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের তা'ওয়ীল এর উপরোক্ত দু'টি অর্থও হতে পারে।

১- তা'ওয়ীল শব্দের অর্থ তাফসীর হবে, "যদি জ্ঞানে সুগভীর লোকেরা এটার অর্থ জানে" ধরা হয়।

২- তা'ওয়ীল শব্দের অর্থ প্রকৃত অবস্থা হবে, যদি এর অর্থ "কেবল আল্লাহ জানে" এ কথার মধ্যেই থেমে যাওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুতাকাল্লিম তথা মু'তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায় তা'ওয়ীল এর আরেকটি অর্থ করে থাকে যা কখনো এটার অর্থ ছিল না। বরং তারা নিজেরা তা আবিষ্কার করেছে। সেটি হচ্ছে,

তিন. শব্দকে তার নিকটবর্তী অর্থ থেকে দূরবর্তী অর্থে নিয়ে যাওয়া, কোনো কারণ সেখানে বিদ্যমান থাকায়, যা তাকে আসল অর্থে নিতে বাঁধা দিচ্ছে।

বস্তুত তা'ওয়ীল এর এ অর্থটি তাদের বানানো অর্থ। কুরআন, সুন্নাহ, সালাফদের বক্তব্য ও ভাষ্য থেকে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালামশাস্ত্রবিদরা এ তা'ওয়ীলের ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহর নাম ও সিফাতের অপব্যাখ্যায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। এটাকে তা'ওয়ীল না বলে তাহরীফ বা বিকৃতি বা ইলহাদ বলাই শ্রেয়।

الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان،
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة

সুতরাং এগুলো যারা আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে তা'ওয়ীল করে সেগুলোকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়, তাদের দ্বারা এগুলোকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়া কারামিতা(২৬১) ও বাতেনীয়া(২৬২)

২৬১. কারামিতা শব্দটি হামদান কুরমুত্ব এর নাম অনুযায়ী বলা হয়। যে এ ফির্কার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। কুরমুত্ব অর্থ বক্রতা বা সংকীর্ণতা থাকা। তার পায়ে বা চলনে সমস্যা থাকায় তাকে কুরমুত্ব বলা হতো। প্রথম জীবনে সে কূফার একজন কৃষক ছিল। [বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ৩১৪] সে তার দাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বিশাল একদল লোকের জমায়েত সে তৈরি করেছিল। তারা ২১৮ হিজরী সনে মু'তাদ্বাদ এর খিলাফতকালে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, বাহরাইন (বর্তমান সৌদী আরবের পূর্বাঞ্চল) শাসন করে, যমীনের বুকে ফিতনা -ফাসাদে ভরপুর করে দেয়, হাজীদের লুট করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, রক্ত প্রবাহিত করে, বাইতুল্লাহকে হালাল করে দেয়, হাজারে আসওয়াদ তুলে নিয়ে বাহরাইন তথা আল-আহসা ও দাম্মাম এলাকায় নিয়ে যায়।

এ ফির্কা বস্তুত বাতেনী ফির্কা। তারা শরী'আত মানে না, মাহরাম নারীকেও হালাল মনে করে, দীনের অত্যাবশ্যক জিনিসকেও অস্বীকার করে, শরী'আতের বিধি-বিধানের এমনসব তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে যা কখনও দীন মেনে নেয় না। বিবেক সায় দেয় না। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এখানে সেসব তা'ওয়ীলের দিকে ইঙ্গিত করছেন।

বিস্তারিত দেখুন, বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২৬৬; আল-আসফারায়ীনী, আত-তাবসীর ফিদ-দীন, পৃ. ৮৩; মালাত্বী, আত-তাম্বীহ ওয়ার রাদ্দ, পৃ. ২১-২২; আস-সাকসাকী, আল-বুরহান ফী আকায়িদি আহলিল আদইয়ান, পৃ. ৮০-৮১; রাযী, ই'তিক্বাদাতু ফিরাকিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৭৯; ইবনুল জাওযী, রিসালাতুন ফিল কারামাত্বাহ; বালাযুরী, মু'জামুল বুলদান (১/৩৪৬)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, কারামাত্বিয়া বাতেনী ফিরকার লোকেরা শিয়াবাদ অবলম্বন করত। [আস-সাফাদিয়্যাহ (১/২৮৫); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৮১)]

তারা তাদের নিজেদের মাঝে নতুন নতুন পরিভাষার উদ্ভব ঘটায়, যা পরবর্তীতে মুসলিমদের মাঝে প্রচার-প্রসার ঘটে। এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সাবেয়ী মুশরিক, দ্বিত্ববাদী মাজুস ও দার্শনিকদের মতের প্রচার-প্রসার করা। [আস-সাব'ঈনিয়্যাহ, (বুগইয়াতুল মুরতাদ) পৃ. ১৯৩, ৩১৫]

ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, তাদের আসল গ্রন্থ হচ্ছে 'রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা'। তাদের নেতারা মূলত মুনাফিক। [আস-সাব'ঈনিয়্যাহ, পৃ. ৩২৯, ৩৪১; বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩৭৪)] বস্তুত এরা বাহাত্তর ফিরকার বাইরের লোক। তারা কোনোভাবেই ঈমানদার নয়।

২৬২. বাতেনীয়া: এরা একটি ফির্কা বা উপদল, যারা বাহাত্তর ফির্কার বাইরের লোক। বাতেনী শব্দের অর্থ গোপন। এদেরকে বাতেনী বলা হয়, কারণ তারা দাবি করে যে শরী'আতের প্রত্যেকটি ভাষ্যের প্রকাশ্য অর্থ ও অপ্রকাশ্য অর্থ রয়েছে। তারা আরও মনে করে সাধারণ মানুষের জন্যই কেবল বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য। কিন্তু যে কেউ বাতেনী ইলমে অগ্রসর হয়েছে তার জন্য বাহ্যিক যাবতীয় তাকলীফ রহিত হয়ে গেছে। শরী'আতের বিধি-নিষেধ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তারা শরী'আতের বাহ্যিক নির্দেশনার নাম দিয়েছে 'আল-আগলাল' বা জিঞ্জীর। তারা বলে আল্লাহর বাণী, 'আর তিনি তাদের উপর থেকে বোঝা লাঘব করবেন এবং সেসব জিঞ্জীরও যা তাদের উপর রয়েছে।' [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭] এর দ্বারা তাদের তথাকথিত মতবাদ বুঝানো হয়েছে।

তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শরী'আত বাতিল করা। তারা জান্নাত ও জাহান্নাম অস্বীকার করে থাকে, বরং তাদের অধিকাংশ লোক স্রষ্টার অস্তিত্বই অস্বীকার করে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তাদের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, 'বাতেনী ফির্কার লোকেরা দু' শ্রেণিতে বিভক্ত;

১- যারা বলে থাকে, কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রকাশ্য অর্থের পাশাপাশি বাতেনী বা গোপন অর্থও রয়েছে, যে গোপন অর্থ প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত। সাধারণত তাদেরকেই বাতেনী বলা হয়।

وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملاً إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل

ফের্কার লোকদের দ্বারা হজ, সাওম, সালাত ও নবুওয়াতে আসা অন্যান্য বিধানকে অপব্যাখ্যা করার মতোই।

চতুর্থত: এই বর্ণনা দেয়া যে, স্পষ্ট আক্বল (বুদ্ধি-বিবেকের যুক্তি) নস তথা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও নস তথা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে এমন বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে বিস্তারিত রূপ আক্বল বুঝতে অক্ষম(২৬৩), বরং আক্বল সেটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে বুঝতে সক্ষম। এছাড়াও আরও বিভিন্নভাবে তা'ওয়ীলের অসারতা বুঝা যায়।

তাছাড়া এ পথের বড় বড় রথি মহারথি তথা বিচরণকারী বিশিষ্টজনেরা স্বীকৃতি দিয়েছে যে, ঐশী বিষয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্বল ইয়াক্বীন তথা নিশ্চিত জানার পথ দেখায় না।(২৬৪)

তারা আবার দু' শ্রেণিতে বিভক্ত:

ক. তারা ইসলামের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড যেমন সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদিতেও বাতেনী অর্থ আবিষ্কার করে থাকে, তারা বলে থাকে: হারাম হওয়ার যেসব ভাষ্য রয়েছে তা তার প্রকাশ্য অর্থে নয়, সেগুলো দিয়ে সাধারণ মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করা উদ্দেশ্য।
শাইখুল ইসলাম বলেন, বস্তুত এরাই যিন্দীক শ্রেণি, এরাই মুনাফিক, এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। সূফী যিন্দীক হুলূলী ও ওয়াহদাতুল ওজূদীরা এই শ্রেণিভুক্ত। শাইখুল ইসলাম উপরে এ শ্রেণিকেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

খ. যারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে (আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে) প্রকাশ্য বক্তব্যের বিপরীত গোপন বক্তব্য ও ভাষ্য নির্ধারণ করেন। যদিও আমলি বিষয়সমূহে তারা প্রকাশ্য রূপকে মেনে নেন। এ হচ্ছে মূলত বাতেনী ফির্কার মধ্যে যারা দর্শন চর্চা করে তাদের মত। আলেমগণ বলেন, মুসলিমদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া দল হচ্ছে এরা। বরং তারা দাজ্জালের চেয়েও জঘন্য। সর্বপ্রথম এ মতের দিকে আহ্বান জানিয়েছিল উবাইদুল্লাহ ইবন মাইমূন আল-ক্বাদ্দাহ। সে ইমাম জা'ফর সাদেক এর ক্রীতদাস ছিল। খলীফা মামুনের সময় তার উদ্ভব হয়েছিল।
দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, নাক্বদুত তা'সীস (১/২৫৯-২৬০); ইসফারায়ীনী, আত-তাবসীর ফিদ দীন, পৃ. ৮৩; ইবনুল জাওযী, রিসালাতুন ফিল ক্বারামাত্বাহ, পৃ. ৩৬; রাসায়িলি ইখওয়ানুস সাফা, পৃ. ১৩৮-১৪৪; ইবন আরাবী হাতেমী, আল-ফতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ (৪/২৬৩-২৬৬, ২৭১, ২৭৫)।

২- যারা গোপন আমল ও ইলমের কথা বলে থাকে। তবে তারা বলে এগুলোর সাথে প্রকাশ্য অর্থের মিল রয়েছে। তারা আবার অন্যান্য আলেমগণের সাথে একমত যে, যারাই বলবে এসব শরী'আতের বিধি-নিষেধের প্রকাশ্য রূপের সাথে গোপন রূপের বৈপরিত্য রয়েছে তারা মুনাফিক। এরাই তাসাওউফের অনুসারী বলে বিখ্যাত। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/১৬৭)।

২৬৩. যেমন আখেরাতের ওপর ঈমানের বিষয়টি। আখেরাতের দিন আসবে ও অবশ্যম্ভাবী হওয়ার বিষয়টি বিবেক বুঝতে সক্ষম। কারণ দুনিয়াতে ভালো কিংবা মন্দ করেছে সেটার জবাবদিহীতা না থাকার বিষয়টিতে সুস্থ বিবেক শায় দেয় না। বরং বিবেকের যুক্তি তা সাব্যস্ত করে, কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনা সে কখনো দাঁড় করাতে পারে না, তা ওহীর মাধ্যমেই কেবল বর্ণিত হতে পারে।

২৬৪. যেমনটি ইবন রুশদ আল-হাফীদ এ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। [ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত

له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا، فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.

[الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة وأنصحهم لها] :

ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:٨]، وقال تعالى: ﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان:٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم:٢٧].

সুতরাং বিষয়টি যখন এরূপ তখন এসবের জ্ঞান নবুওয়াতের মাধ্যমে লাভ করা অপরিহার্য।

[রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ও উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী]

মুমিনদের নিকট জ্ঞাত যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি সকল দীনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি মানুষদেরকে আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমানের জন্য যেসব বিষয় সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই তাদেরকে স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তির ওপর ঈমান। আর সেটা হচ্ছে সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের ওপর ঈমান, যেমনটি উভয়কে একত্রিত করেছেন আল্লাহ তাঁর এই বাণীতে:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ۝٨﴾ [البقرة: ٨]

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি', অথচ তারা মুমিন নয়।" [সূরা আল-বাকারাহ: ০৮] এবং

﴿مَّا خَلۡقُكُمۡ وَلَا بَعۡثُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسٖ وَٰحِدَةٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ۝٢٨﴾ [لقمان: ٢٨]

"তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা লোকমান: ২৮]

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾ [الروم: ٢٧]

"আর তিনি-ই, যিনি সৃষ্টিকে শুরুতে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি সেটা পুনরাবৃত্তি করবেন।" [সূরা আর-রূম: ২৭]

তা'আরুদ্ব (১/১৬২)]

وقد بَيَّنَ الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أَمْرِ الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده، وكشف به مراده.

ومعلومٌ للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانًا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة، وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة.

ومعلومٌ أن المتكلم [والفاعل] إذا كمل علمه وقدرته وإرادته: كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان.

والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة، والإرادة الجازمة: يجب وجود المراد،

আর আল্লাহ স্বীয় রাসূলের জবানে আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমানের বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যা দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং তার মাধ্যমে তাঁর কী উদ্দেশ্য সেটা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আর মুমিনদের জানা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যাপারে সকলের চেয়ে অধিক অবগত, সকলের চেয়ে অধিক উম্মতের কল্যাণকামী, বক্তব্য প্রদান ও বর্ণনা করে দেয়ার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বিশুদ্ধভাষী বরং সকল সৃষ্টির মধ্যে অধিকতর জ্ঞানী, কল্যাণকামী ও স্পষ্টভাষী, তাঁর ক্ষেত্রে জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছার পরিপূর্ণতা একত্রিত হয়েছিল।

আর এটা জ্ঞাত যে, বক্তা বা কর্তার জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছা যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন তার বক্তব্য ও কর্ম তেমনি পূর্ণতা লাভ করে, আর অপূর্ণতা তখন আসে যখন তার জ্ঞান অপূর্ণ থাকে কিংবা জ্ঞান প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, নতুবা সেটা প্রকাশের ইচ্ছা তার না থাকে।(২৬৫)

আর রাসূল তো জ্ঞানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সবার শীর্ষে, স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়ার পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকার ক্ষেত্রেও শীর্ষে। আর স্পষ্টভাবে পৌঁছানোর ক্ষমতা থাকার ক্ষেত্রেও শীর্ষে। আর পূর্ণ ক্ষমতা ও সামর্থ্য এবং দৃঢ় ইচ্ছা থাকা ইচ্ছাকৃত বিষয়ের অস্তিত্ব লাভ হওয়া আবশ্যক করে।(২৬৬)

---

২৬৫. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, ইলম বা জ্ঞান তো সেটাই, যার সঠিক হওয়ার ওপর দলীল রয়েছে। আর উপকারী ইলম তখনই হবে যখন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নিয়ে আসা জ্ঞান হবে। তিনি আরও বলেন, কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ ছাড়াও ইলম পাওয়া যেতে পারে তবে তা অবশ্যই দুনিয়াবী ইলম হবে, যেমন ডাক্তারী বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, কৃষিকাজ, ব্যবসা।

কিন্তু ইলাহী বিদ্যা, দীনী জ্ঞান, এসব জ্ঞানের কেবল একমাত্র উৎস হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকল সৃষ্টির মাঝে রাসূলই এ বিষয় সবচেয়ে বেশি জানেন। সৃষ্টিকে তা শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ প্রচণ্ড, সৃষ্টির সবার চেয়ে তা বর্ণনা করতে ও পরিচিতি তুলে ধরতেও তিনি বেশি সক্ষম। সুতরাং তিনি জ্ঞান, কুদরত, ইরাদা এ তিনটিতে সকলের উপরে। আর এ তিনটির মাধ্যমেই উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। রাসূল ব্যতীত অন্যরা হয় তার জ্ঞানে সমস্যা বা বিকৃতি থাকবে, অথবা সে তা শিক্ষা দিতে আগ্রহের ঘাটতি থাকবে, ফলে সে শিক্ষা দিবে না, কোনো অনুরাগ কিংবা বিরাগের কারণে, ভয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে, অথবা সে তার বর্ণনার ক্ষমতায় ত্রুটি থাকবে। তার বর্ণনা অন্তরে যা উপলব্ধি করেছে তা বলতে অক্ষম। [দেখুন, মাজমু' ফাতাওয়া (১৩/১৩৬)]

২৬৬. এ কায়েদা বা নীতিটি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখ করে থাকেন। প্রচুর

فعلم قطعًا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانًا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون [لهم بإحسان] ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على [سبيل] الاستقامة.

সুতরাং অকাট্যভাবে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমানের ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা দিয়েছেন তা দিয়ে তিনি যা কিছু বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছেন সে উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধিত হয়েছে। আর তিনি যা বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছেন সেটা তার জ্ঞান অনুযায়ীই সম্পন্ন হয়েছে। আর এ ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান তো সকল জ্ঞানের চেয়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, এ ব্যাপারে অন্য কেউ রাসূলের থেকে বেশি অবগত, রাসূলের থেকে পূর্ণ বয়ানকারী[২৬৭] অথবা সৃষ্টির হিদায়াতের ব্যাপারে রাসূলের থেকে বেশি আগ্রহী, সে নাস্তিক; সে মুমিন নয়। অপরদিকে সাহাবী, তাবে'য়ী এবং তাদেরকে যারা সুন্দরভাবে অনুসরণ করেছেন আর যারা সালাফদের পথে ছিলেন তারা এ অধ্যায়ে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথেই অবস্থান করেছেন।[২৬৮]

পরিমাণে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে থাকেন। কারণ, দৃঢ় ইচ্ছার সাথে পূর্ণ ক্ষমতা উদ্দেশ্য বিষয়টির অস্তিত্ব বাস্তবে রূপ নেয়। যেমন, ভালোবাসা যখন প্রবল হবে তখন যদি কোনো বাঁধা ও ক্ষমতার ঘাটতি না থাকবে তখন সেটার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পড়বেই। তদ্রূপ অন্তরে ঈমান থাকলে তার প্রভাব মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাবেই।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ নীতিটি সাব্যস্ত করেছেন যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থার মাঝে সমন্বয় হলে অনেক সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যায়। [ফাতাওয়া (৭/৩৭০)]

তিনি এ নীতিটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বলেন, কোনো কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা আর তার সাথে যদি পূর্ণ ক্ষমতার সংমিশ্রণ ঘটে তবে তাতে নির্ধারিত বিষয়টি ঘটা আবশ্যক হয়ে পড়ে। [ফাতাওয়া (৭/৬৪৫)]

২৬৭. অন্যত্র শাইখুল ইসলাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক যে বর্ণনা এসেছে তা দু'ভাবে পেশ করা হয়েছে:

এক. তিনি এ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিবেকের যুক্তি সম্পন্ন আকলী দলীল উল্লেখ করেছেন। আর কুরআনে কারীম সেসব আকলী দলীল ও দৃঢ় বিশ্বাস আনয়নকারী প্রমাণাদিতে পরিপূর্ণ, যার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়, দীনের উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট হয়।

দুই. তিনি শুধু বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন; কারণ তিনি স্পষ্ট নিদর্শন ও দৃঢ় প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচারক। তিনি সত্য ব্যতীত আর কিছু বলেন না। আল্লাহ তা'আলাও তাঁর সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়েছেন, তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূল আল্লাহর কাছ থেকে যা বর্ণনা করেন ও প্রচার করেন তাতে সত্য ও সত্যায়নকৃত। [ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতাওয়া (১৩/১৩৬-১৩৭)]

২৬৮. কারণ তারা কখনো মনে করেনি যে, রাসূলের চেয়ে অন্য কেউ বেশি জ্ঞানী, বেশি বর্ণনার অধিকারী, উম্মতের প্রতি বেশি যত্নবান হতে পারবেন। সুতরাং তাদের পথই সঠিক পথ ও হক পথ। যারা এ মত থেকে আলাদা হয়ে গেছে তারা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত। আগত অংশে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ পথভ্রষ্টদের শ্রেণিবিভাগ করছেন। তাদের কমন ভুল হচ্ছে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর উপরোক্ত কোনো এক বিষয়ে অপর কাউকে অধিক অগ্রগণ্য মনে করেছে।

[الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف]:

وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل.

[الطائفة الأولى: أهل التخييل]:

فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح الحقائق.

ثم هم على قسمين:

[সালাফে সালেহীনের পথ থেকে বক্রপথে অবস্থানকারীদের শ্রেণিবিভাগ]

আর যারা সালাফদের পথ থেকে বিচ্যুত(২৬৯) তারা তিন(২৭০) গ্রুপ:

(১) নবী-রাসূলদের আনীত বিষয়গুলোতে বিস্তর কল্পনার অপবাদ প্রদানকারী,

(২) নবী-রাসূলদের আনীত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তা'ওয়ীল তথা অপব্যাখ্যার নীতি অনুসারী, এবং

(৩) নবী-রাসূলদের আনীত বিষয়গুলোর ব্যাপারে অজ্ঞতার নীতি অনুসারী।

[প্রথম গোষ্ঠী: নবী-রাসূলদের আনীত বিষয়গুলোতে বিস্তর কল্পনার অপবাদ প্রদানকারী]

নবী রাসূলগণ কর্তৃক আনীত বিষয়গুলোর ব্যাপারে নবী রাসূলগণের ওপর বিস্তর কল্পনার অপবাদ প্রদানকারীরা হচ্ছে- দার্শনিক সম্প্রদায় এবং তাদের পথে কালামপন্থী ও তথাকথিত ফকীহরা যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমানের বিষয়ে রাসূল যা উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল প্রকৃত অবস্থার একটি কাল্পনিক রূপ প্রদান করা; যাতে তা দ্বারা সাধারণ জনগণ উপকার লাভ করেন। এটা নয় যে, তা দ্বারা তিনি সত্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বা সৃষ্টিকে পথ দেখিয়েছেন বা হাকীকতকে ফুটিয়ে তুলেছেন।(২৭১) এরা আবার দুই

---

২৬৯. যদি এসব গ্রুপের লোকেরা সাক্ষ্য দিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের চেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী, সবচেয়ে বড় স্পষ্টভাষী বর্ণনাকারী, তাহলে তারা এসব ধ্যাণ-ধারণা কিংবা বিকৃতি কিংবা মূর্খতার দলে যোগ দিত না।

২৭০. ইবনুল কাইয়্যেম আল্লাহর সিফাত বিষয়ে মানুষদেরকে বিস্তারিত পাঁচভাবে বিভক্ত করেছেন:
১- তা'ওয়ীল পদ্ধতির অনুসারী।
২- কল্পনাকারী অপবাদ প্রদানকারীদের অনুসারী।
৩- মূর্খতার অপবাদ প্রদানকারী সম্প্রদায়।
৪- তাশবীহ ও তামসীল বা সাদৃশ্য ও উদহারণ প্রদানকারী সম্প্রদায়
৫- সঠিক পথের অনুসারী সম্প্রদায়। বিস্তারিত দেখুন আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৪১৮)।

২৭১. ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, তারা হচ্ছে ঐ সম্প্রদায়, যারা বিশ্বাস করে যে, রাসূলগণ সৃষ্টির মাঝে কখনও হক্ব কথা প্রকাশ করেননি। কারণ সেটা প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের কাছে এ ব্যাপারে এক প্রকার কল্পনা ভর করছিল, তারা সে কল্পনাকে বাহিক্য জিনিসে ব্যক্ত করেছিলেন মাত্র। [আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৪১৮-৪১৯)]
ইবনুল তাইমিয়্যাহ বলেন, ইবন সীনা ও তার মত কিছু দার্শনিক এ ধরনের কথা দিয়ে তাদের

منهم من يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة، وباطنية الصوفية. ومن منهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يُبَيِّنها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فَهْمَ ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.

ভাগে বিভক্ত:

- কেউ কেউ বলে, রাসূল হাকীকতকে তার আসলরূপে জানতেন না(২৭২), বরং কিছু ইলাহী দার্শনিক আছে যারা সেটা জানে। তেমনি জানে এমন কিছু লোকও যাদেরকে তারা আউলিয়া নামে আখ্যায়িত করেছে। তারা মনে করে, দার্শনিক ও আউলিয়াদের কেউ কেউ আল্লাহ ও শেষ দিন সম্বন্ধে রাসূলদের থেকে বেশি অবগত। এটি হচ্ছে ঘোর নাস্তিক টাইপের দার্শনিক ও বাতেনী(২৭৩) ফির্কার মতবাদ। যে বাতেনীগুলোর কেউ শীয়া বাতেনীয়া সম্প্রদায়ের আর কেউ সূফী(২৭৪) বাতেনীয়া সম্প্রদায়ের।
- আবার তাদের কেউ কেউ বলেন, বরং রাসূল সেটা জানতেন কিন্তু বর্ণনা করেননি। বরং বলেছেন তার বিপরীত কথা। আর তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন হক্ব (সত্যের) বিপরীতটিই বুঝে; কারণ হকের বিপরীতে থাকার মধ্যে সৃষ্টিকুলের জন্য কল্যাণ ও স্বার্থ রয়েছে।(২৭৫)

মূলনীতি দাঁড় করিয়েছে, যেমন ইবন সীনা তার আর-রিসালাতুল উদ্বহ্ওয়িয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। [দারউত তা'আরুদ্ব (১/৯)]

২৭২. ক্বারামিত্বা ও দার্শনিকদের মত হচ্ছে, রাসূলগণ এসব বিষয় জানতেন না। তারা বলে নবীর চেয়ে দার্শনিক ভালো জানে। নবীর কাজই হচ্ছে মানুষদেরকে নিজের কল্পনার জগতে নিয়ে যাওয়া। তাদের নিকট নবুওয়াত সাধারণ মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ হতে পারে, তবে সেটা জ্ঞানী-গুণী ও মারেফাতের দাবীদারদের নিকট নয়। ফারাবী ও তার মত যারা আছে যেমন, মুবাশ্বির ইবন ফাতিক ও তার মত ইসমা'ঈলী সম্পদ্রয়ায়ের লোকেরা বলে থাকে। [ফাতাওয়া (৪/৯৮-৯৯), (১৯/১৫৬)]

২৭৩. বাতেনী ফির্কা বলা হয় এজন্য যে, তারা মনে করে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যের একটি গোপন অর্থ রয়েছে যা প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত। বাতেনীদের মধ্যে যারা অত্যন্ত ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত তারা হচ্ছে, কারামিত্বা, যাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী শিয়াদের মধ্যে গণ্য করা হয়। শাহরাস্তানী বলেন, তাদের যেসব উপাধী রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বাতেনিয়্যা, ক্বারামিত্বা, মুযদাকিয়্যাহ। তাদের নেতারা তাদের কিছু বক্তব্যকে দার্শনিকদের বক্তব্যের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। [আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/২২৮)]

২৭৪. সূফী বলা হয়, কারণ তারা সূফ পরিধান করত। সূফ মানে পশমের মোটা কাপড়। প্রাথমিক দিকে যারা দুনিয়াবিমুখ হতো, বেশি ইবাদত করতো তাদেরকে সূফী বলা হতো। তবে সেটা প্রথম তিন উত্তম যুগে প্রসিদ্ধ ছিল না। বিষয়টি প্রথমে পরহেযগারী ও তাকওয়ার চর্চাতে থাকলেও কালক্রমে সেটি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনে রূপ নেয়। এমনকি তাদের অনেকেই দীনের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারাই নতুন করে কুরআন ও হাদীসের গোপন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল। তাদের বিখ্যাত বাড়াবাড়িকারী লোকদের মধ্যে রয়েছে, ইবন আরাবী, হাল্লাজ, ইবন সাব'ঈন ও অন্যান্যরা। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৫)।

২৭৫. ইবন তাইমিয়্যাহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন যে, এ মতটি মৌলিকভাবে কিছু দার্শনিক ও বাতেনী

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، مع أن ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.

وأما الأعمال: فمنهم من يقرها، ومنهم من يجريها هذا المجرى،

ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.

এরা আরও বলে, রাসূলের ওপর আবশ্যক হচ্ছে মানুষকে তাজসীম (দেহ সাব্যস্ত করা)-র বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করা, যদিও সেটা বাতিল। তেমনি এটা বিশ্বাস করতে মানুষদেরকে জানাবেন যে, শরীরসহ পুনরুত্থান হবে, যদিও তা বাতিল। অনুরূপ এটা বিশ্বাস করতে যে, জান্নাতীরা খাওয়া-দাওয়া করবে যদিও তা বাতিল। তারা বলে: কেননা এই পদ্ধতিতে ছাড়া অন্য কোনোভাবে সৃষ্টিকে দাওয়াত দেয়া সম্ভব নয়, এটা মিথ্যা তবে বান্দাদের স্বার্থে। এ হচ্ছে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমানের বিষয়ে আগত নসসমূহের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য।(২৭৬)

আর আমল বা কর্মের ক্ষেত্রে(২৭৭): তাদের কেউ কেউ সেটা বাস্তব অর্থে স্বীকার করে, আবার কেউ কেউ উপরের মতো এক্ষেত্রেও বলে যে, আমলের জন্য সাধারণ শ্রেণি আদিষ্ট, বিশেষ শ্রেণি নয়। এটাই হচ্ছে দীনদ্রোহী বাতেনি ফিরকাহ, ইসমাঈলিয়্যাহ ও তাদের মতো লোকদের মতাদর্শ।

ফির্কার লোকদের। যেমন, ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়ের নাস্তিকদের, ইখওয়ানুস সাফার রাসায়িল লিখকদের, ফারাবীর, ইবন সীনার, হত্যাকৃত সোহরাওয়ার্দীর, ইবন রুশদ আল-হাফীদের। অনুরূপভাবে তা সেসব সুফী মুলহিদদের মতও, যারা তাদের তাসাউফের পূর্বসূরী কুরআন ও সুন্নাহ'র অনুসারী শাইখদের মত থেকে বের হয়ে গেছে। যেমন ইবন আরাবী, ইবন সাব'ঈন, ইবনুত তুফাইল; যে ব্যক্তি হাই ইবন ইয়াকযান এর রিসালা লিখেছিল। [দারউত তা'আরুদ্ব (১/১০-১১)]

এরা মনে করে কল্পনার বিষয়টি রাসূলের বক্তব্যে, তবে ইলমে নয়। [ফাতাওয়া (১৯/১৫৬)]

ইবন তাইমিয়াহ আরও বলেন, এরা চেয়েছিল রাসূল মিথ্যা বলবেন স্বার্থের জন্য এমনটি বলতে, বিনা স্বার্থে বলবেন না এমনটি বলতে, কিন্তু তারা এর মাধ্যমে মারাত্মক খারাপ কর্মে লিপ্ত হয়েছে; কারণ তাদের কথার অর্থ হচ্ছে রাসূল মানুষদেরকে সংশয়ে নিক্ষেপ করেছেন, অন্ধকারে রেখেছেন, সৃষ্টিকে ভ্রষ্ট করেছেন, বরং বাতিল প্রকাশ করেছেন আর হক্ব গোপন করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) দেখুন, মাজমু' ফাতাওয়া (৪/৯৮), (১৯/১৫৭); দারউত তা'আরুদ্ব (৫/৬০-৭৩)।

২৭৬. এ নীতিটি অবলম্বন করেছে ইবন সীনা, ইবন রুশদ আল-হাফীদ। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবন রুশদ বাতেনী ফির্কার লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মনে করে প্রকাশ্য শরী'আতের বাতেনী একটি ব্যাখ্যা রয়েছে যা যাহেরী শরী'আতের বিরোধী। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/১৬৬)।

২৭৭. অর্থাৎ প্রকাশ্য আমল যেমন সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, সৎকাজ, সালাম, দো'আ, যিকির ইত্যাদি।

[الطائفة الثانية: أهل التأويل]:

وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، ولا دلَّهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة، والمعتزلة ومن دخل

[দ্বিতীয় গোষ্ঠী: নবী-রাসূলদের আনীত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তা'ওয়ীল তথা অপব্যাখ্যার নীতি অবলম্বনকারী]

এবার তা'ওয়ীল বা ব্যাখ্যাপন্থীদের বক্তব্য হচ্ছে- আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে বর্ণিত নসসমূহের দ্বারা রাসূল মানুষদেরকে বাতিল ই'তিকাদের উদ্দেশ্যে করেননি বরং তিনি এগুলোর দ্বারা বিভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন। তবে উদ্দেশ্যসমূহ তাদেরকে বর্ণনা করেননি। এ ব্যাপারে তাদের কোনো নির্দেশনাও দেননি, বরং তিনি চেয়েছেন তারা গবেষণা করে স্বীয় আক্বল দ্বারা সেগুলো জেনে নিবে, অতঃপর সেগুলোকে তার মূল অর্থ হতে সরিয়ে নেয়ার জন্য যাবতীয় চেষ্টা নিবদ্ধ করবে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদেরকে পরীক্ষা করা বা এটা দিয়ে মেধা ও বুদ্ধিকে ক্লান্ত বানানো, যাতে এসব ভাষ্যে আগত বাক্যকে তার অর্থ ও চাহিদা থেকে দূরে সরানো যায়। তারা সত্যকে (এর মাধ্যমে সরাসরি জানতে পারবে না, কেবল) জানবে অন্যদিক দিয়ে। এ গোষ্ঠী হচ্ছে মুতাকাল্লিমীন (কালামশাস্ত্রবিদ), জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা[২৭৮] ও তাদের কোনো কিছুতে যারা প্রবেশ করেছে এমনসব

---

২৭৮. মুতাযিলা হচ্ছে এমন একটি ফির্কা যারা তাদের মতবাদ নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে বিরোধিতা করেছে। এ গোষ্ঠীর প্রধান ও প্রথম যে তাদের নীতি বিন্যাস করেছে সে হচ্ছে ওয়াসিল ইবন আত্বা। তাদেরকে মু'তাযিলা বলার কারণ হচ্ছে ওয়াসিল ইবন আত্বা ও হাসান বসরীর মাঝে কবীরা গুনাহকারীর হুকুম নিয়ে মতভেদ হয়। ওয়াসিল বললো, কবীরা গুনাহকারী ঈমান ও কুফরীর মাঝখানে অবস্থান করবে, তারপর সে হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করে অন্যত্র বসে পড়ে। তখন হাসান বসরী তাদেরকে বলেন, ই'তাযালা 'আন্না' বা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। মু'তাযিলাদের অনেক ফের্কা রয়েছে, তবে সবাই যেসব বিষয়ে একমত তা হচ্ছে,

১- আল্লাহর কোনো গুণ নেই।
২- কুরআন সৃষ্ট জিনিস।
৩- বান্দা তার নিজের কর্ম নিজে সৃষ্টি করে।
৪- তাকদীরের কিছু অংশ অস্বীকার।
৫- কবিরাহ গুণাহকারী ঈমানদারও নয়, কাফেরও নয়, এ দুয়ের মাঝখানে, তবে আখেরাতে জাহান্নামের অধিবাসী।
৬- তাদের রয়েছে পাঁচটি নীতি; সেগুলোর দ্বারা তারা অনেক বিশুদ্ধ আকীদাহ নষ্ট করে দিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে,

- আত-তাওহীদ, যার মূল অর্থ তাদের কাছে আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করা।
- আল-আদল, যার অর্থ তাকদীরের মাঝে আল্লাহর ইচ্ছা ও সৃষ্টিতে বান্দার কর্ম হয় তা অস্বীকার করা।
- আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইন, যার অর্থ কবীরা গুণাহকারী ঈমান থেকে বেরিয়ে গেছে।
- আল-ওয়া'দু ওয়াল ও'য়ীদু, যার অর্থ কবীরা গুণাহকারী যদি তাওবা না করে মারা যায় তবে তার ওপর আল্লাহর ওয়াদা জাহান্নাম প্রদান করা আল্লাহর ওপর ওয়াজিব।
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, যার অর্থ যালিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে

معهم في شيء من ذلك.

[هذه الفتوى رد على أهل التأويل]:

والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأوَّلين مشهورًا، بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة

গোষ্ঠীসমূহ[২৭৯]।

[এই ফতোয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আল্লাহর সিফাত তা'ওয়ীল করে তাদের মত খণ্ডন করা]

এই ফতোয়ায় যাদের মতকে আমরা খণ্ডন করার ইচ্ছা করেছি তারা এসব শেষে বর্ণিত সম্প্রদায়[২৮০]। যেহেতু প্রথম গোষ্ঠীর লোকদের থেকে মানুষের ভেগে যাওয়া প্রকাশ্য।[২৮১] কিন্তু এরা[২৮২] তাদের থেকে ভিন্ন। কেননা বিভিন্ন জায়গায় তারা সুন্নাহ'র সহযোগী হিসেবে নিজেদেরকে প্রচার-প্রসার করে বেড়ায়।[২৮৩] অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা না ইসলামের

হবে, যারা তাদের মতের বিরুদ্ধে (আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) তাদেরকে দমন করতে হবে। দেখুন, শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/৫৬); বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ৯৩; ইসফারায়ীনী, আত-তাবসীর ফিদ-দীন, পৃ. ৩৭; রাযী, ই'তিক্বাদাতু ফিরাক্বিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৩৮; সাকসাকী, আল-বুরহান ফী মা'রিফাতি আক্বায়িদি আহলিল আদইয়ান, পৃ. ৪৯; মালাত্বী, আত-তাম্বীহ ওয়ার রাদ্দ, পৃ. ৩৫।

২৭৯. যেমন, কুল্লাবিয়া, সালেমিয়্যাহ, কাররামিয়্যাহ, শিয়া, পরবর্তী আশ'আরী সম্প্রদায় ও মাতুরিদী সম্প্রদায়। [দারউ তা'আরুদ্ব আল-আক্বল ওয়ান নাক্বল (১/১৩)]

২৮০. অর্থাৎ আহলুত তা'ওয়ীল। যারা আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ব্যাপারে অপব্যাখ্যার নীতি অবলম্বন করেছে। স্বাভাবিক অর্থ থেকে সেগুলোকে দূরবর্তী বিরল অর্থে নিয়ে গেছে, অথবা নতুন অর্থ তৈরি করে নিয়েছে।

২৮১. অর্থাৎ আহলুত তাখয়ীল। কারণ ঈমানদার সাধারণত কখনও ঈমানিয়্যাতের ব্যাপারে তাদের মতবাদকে মেনে নিবে না। কেউ রাসূল সম্পর্কে তাদের এ জঘন্য কথা সহজে মানুষের মাঝে বলতে সাহস করবে না। মানুষকে যদি বলা হয় রাসূলগণ কল্পনা করে কথা বলেছেন বা রাসূলগণ বাস্তব অবস্থার বিপরীতে জনগণকে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মিথ্যা বলেছেন, তাহলে ন্যূনতম ঈমানের অধিকারী তার বিরুদ্ধে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। তাই তারা তাদের কথা গোপন করে রাখে, কেবল তাদের নিজস্ব বলয়ে সেটা বলে থাকে। ফলে তাদের দ্বারা সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠী, অর্থাৎ তা'ওয়ীলকারীদের দ্বারা দুনিয়ায় যত সর্বনাশ ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং তাদেরকে এখানে রদ্দ করা হবে।

২৮২. অর্থাৎ আহলুত তা'ওয়ীল বা আল্লাহর সিফাতের অপব্যাখ্যাকারীদের অবস্থা মারাত্মক। এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সুস্পষ্ট। এরাই হচ্ছে মু'তাযিলা, আশ'আরী, মাতুরিদী সম্প্রদায়।

২৮৩. যেসব স্থানে আশায়েরা, মাতুরিদী সম্প্রদায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সহযোগী হয়েছে, তা হচ্ছে:

১- কবীরা গুনাহগার এর মাসআলা।
২- কবর ও হাশরের বিভিন্ন অবস্থা ও কর্মের বর্ণনা।
৩- খিলাফত ও ইমামতের মাসআলা।
৪- সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার মাসআলা।
৫- দার্শনিক, কারামিত্বা, বাতেনিয়াদের বিরুদ্ধে তারা তাদের ক্ষমতা নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে দাঁড়িয়েছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা না দার্শনিকদের অস্ত্র ভাঙ্গতে পেরেছে

সহযোগিতা করেছে, আর না দার্শনিকদের নীতিকে ভাঙ্গতে পেরেছে।(২৮৪) বরঞ্চ দার্শনিকরা

আর না তারা ইসলামকে সাহায্য করতে পেরেছে। বস্তুত তারা ইসলামের শত্রু ইয়াহূদী-নাসারা ও দার্শনিকদের সামনে দাঁড়ানোর মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

২৮৪. আহলুত তা'ওয়ীল বলতে আমরা কাদেরকে বুঝিয়েছি তা ইতোপূর্বে ব্যক্ত করেছি, তাদের মধ্যে প্রথমেই মু'তাযিলা, তারপর আশায়েরা, তারপর মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়, তাছাড়া আরও কিছু অখ্যাত সম্প্রদায়ও রয়েছে। এরা সাধারণত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে অবস্থান করে। নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বলার জন্য সচেষ্ট থাকে। ক্ষণে ক্ষণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সহযোগিতার দাবি করে। কিন্তু তারা তিনটি মৌলিক কারণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বাইরে চলে গেছে:

১- তারা বিবেকের যুক্তিকে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যের ওপর প্রাধান্য দেয়।

২- তারা আকীদার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ খবরে ওয়াহিদকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে না।

৩- তারা তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যার নীতি। অর্থাৎ যাবতীয় মুতাওয়াতির (কুরআন ও সুন্নাহ মুতাওয়াতিরাহ)কে আকলের বিপরীত হলে অবশ্যই তা'ওয়ীল করে নিতে হবে।

এছাড়াও আকীদাহ'র প্রতিটি অধ্যায়েই আরও কিছু বিষয়ে আশায়েরাহ ও মাতুরিদিয়্যাহদের মতবাদ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধী, যেমন:

- **আকীদাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতাদর্শ হচ্ছে,**

    ১- বিবেকের যুক্তিকে কুরআন-সুন্নাহ'র ভাষ্যের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

    ২- যেসব ভাষ্য মুতাওয়াতির সেগুলো যদি বিবেকের যুক্তির বিপরীত হয় তবে সেগুলোকে তা'ওয়ীল করতে হবে।

    ৩- আকীদাহকে দু'ভাগে ভাগ করা, আকলিয়াত (আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি) ও সাম'ইয়াত (মৃত্যু পরবর্তী বিষয়াদি)।

    ৪- খবরে ওয়াহিদ আকীদাতে দলীল না হওয়া, তবে সাম'ইয়াতে তা দ্বারা দলীল নেয়া যাবে।

    ৫- তাদের এক গোষ্ঠী, যেমন গাযালীর মতে সূফী কাশফ ও যাওক কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যের ওপর প্রাধান্য পাবে। এর জন্য কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যকে তা'ওয়ীল করা যাবে, যাতে তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। [রিসালাতুল ইলম আল-লাদুন্নী, কুবরা আল-ইয়াক্বীনীয়াত]

    ৬- কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যের দাবি ধারণার জন্ম দেয়, দৃঢ় ইলমের ফায়েদা দেয় না। যতক্ষণ না তা দশটি দোষ থেকে মুক্ত হচ্ছে...

    ৭- অপর দিকে বিবেকের যুক্তি অনুযায়ী হলে দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

- **একজন মানুষের প্রথম কর্তব্য অধ্যায়ে**

    ১- প্রথম কর্তব্য, চিন্তা-গবেষণা বা চিন্তা-গবেষণার প্রতি ইচ্ছা, অথবা সন্দেহ করা, অথবা সন্দেহের ইচ্ছা করা।

    ২- মুকাল্লিদের ঈমান শুদ্ধ না হওয়া।

    ৩- স্রষ্টা ও সৃষ্টির আলাদা অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হওয়া, তথা আল্লাহকে সৃষ্টি থেকে আলাদা করে 'আরশের উপর না মানা।

- **ঈমান অধ্যায়ে**

    ১- ঈমানের অভিধানিক অর্থ শুধু বিশ্বাস বলা।

    ২- ঈমানের শর'য়ী অর্থ নির্ধারণে ভুল করা তথা আমলকে ঈমানের রুকনের অন্তর্ভুক্ত না করণে।

    ৩- ঈমান বাড়া ও কমার নীতিতে।

- **কুফর অধ্যায়ে**

১- কুফরী হওয়ার সকল শর্তপূরণ ও বাঁধা অপসারণের পরও কুফরীর বিধান বলতে দ্বিধা করা।

২- কুফরী হওয়ার জন্য বিশ্বাস থাকা বাধ্য করা অর্থাৎ কর্মগত কুফরীকে কুফরী মনে না করা।

৩- কুফরী হওয়ার জন্য মুখে কুফরী করার স্বীকৃতি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কুফরী না বলা।

- তাওহীদ অধ্যায়ে

১- তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতে স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার নীতিতে ভুল পন্থা অবলম্বন। স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠা, অথচ তা ফিত্বরী ব্যাপারে। স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য দলীল 'হুদুস ওয়াল কিদাম' ব্যবহার করা, যা বিতর্কিত।

২- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতে আল্লাহর গুণাবলি সবগুলো কিংবা আংশিককে অস্বীকার কিংবা অপব্যাখ্যা।

৩- তাওহীদুল উলুহিয়্যাহকে তাওহীদের সংজ্ঞায় না নেয়া। ফলে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ'র ব্যাপারে এসেছে চরম ঔদাসিন্য।

৪- ইলাহ ও রব একই অর্থে নেয়া।

- শির্ক অধ্যায়ে

১- আল্লাহর অস্তিত্ব মেনে নেয়ার পরে অন্য কাউকে পরিচালক বা কর্তৃত্বকারী মেনে নিলেও শির্ক না বলা। যেমন, গাউস, কুতুব, নুকাবা, নুজাবা ইত্যাদি বিশ্বাস করা।

২- আল্লাহর গুণাবলি অন্যদের মাঝে দাবি করার পরও শির্ক না বলা।

৩- আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করলেও মুশরিক না বলা; যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে রুবুবিয়্যাতের গুণ না দেয়।

- নবুওয়াত অধ্যায়ে

১- নবুওয়াত একান্ত আল্লাহর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। সেখানে নবীর মাঝে কোনো গুণ থাকা আবশ্যক নয়।

২- নবী-রাসূলদের নবুওয়াতের প্রমাণ শুধু মু'জিযায় সীমাবদ্ধ মনে করা।

৩- মু'জিযা, কারামাত ও জাদু, গণকবাজির মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড সঠিক না হওয়া।

৪- ওহীর ব্যাপারে ফয়েয হওয়া নীতিতে বিশ্বাসী হওয়া।

৫- কুরআন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর এমন কালাম নয় যা দিয়ে তিনি কথা বলেছেন, এমনটি বলা।

৬- আল্লাহর কালামের স্বর ও বর্ণ নেই বলা।

- আখেরাত অধ্যায়ে

১- হাশরের মাঠে আল্লাহর আগমন অস্বীকার করা।

২- আল্লাহকে দেখার অর্থ অনুভব করা বলে বিশ্বাস করা।

- ক্বাদা ও কাদর অধ্যায়ে

১- আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রবল করে বান্দার ইচ্ছাকে প্রভাবহীন করা, যা জাবরে মা'নাউওয়ী বলে খ্যাত।

২- বান্দার কর্মকাণ্ডকে 'কাসব' নাম দেয়া, যার ব্যাখ্যা পৃথিবীর অসার বস্তুর একটি।

৩- তাকদীরকে মুবরাম ও মু'আল্লাক দু'ভাগে ভাগ করা।

৪- তাওফীক অর্থ আনুগত্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি করা, আর বঞ্চিত করার অর্থ হচ্ছে গুনাহ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করা। সরাসরি কাউকে ভালো কিংবা মন্দ করার সুযোগ দেয়া সাব্যস্ত না করা।

৫- বান্দার কর্মের সাথে কার্যকারণের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা। যেমনে এটা বলা যে, আগুনের কাছে পুড়ে গেছে, আগুনের কারণে পুড়েনি।

৬- আল্লাহ তা'আলার কর্মকাণ্ডের হিকমত অস্বীকার করা।

الزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشُّبَه المانعة منه.
وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب.
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر

এসব মুতাকাল্লিমদের (আশায়েরা ও মাতুরিদীদের)কে সিফাতের বক্তব্যে তারা যা বলেছে (আল্লাহর ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে আসার পরও তা'ওয়ীল করা) অনুরূপ বক্তব্য (শারীরিক) পুনরুত্থানের ব্যাপারে মেনে নিতে বাধ্য করেছে। তারা বলে: আমরা অবশ্যম্ভাবীভাবে জানি যে, রাসূলগণ শারীরিক পুনরুত্থান নিয়ে এসেছিলেন।[২৮৫] আর আমরা তাতে (তার ওপর শারীরিক পুনরুত্থান এর ওপর ঈমান আনতে) বাধা প্রদানকারী সংশয়সমূহে (এর অসারতা) জেনেছি[২৮৬]।

আর আহলুস সুন্নাতগণ এদেরকে[২৮৭] বলেন: আমরা আবশ্যিকভাবে জেনেছি যে, রাসূল সিফাত সাব্যস্তকরণ নিয়ে এসেছিলেন। আর (জানা কথা যে) পুনরুত্থান সংক্রান্ত নস বা ভাষ্যসমূহের চেয়ে আল্লাহর কিতাবে সিফাত সংক্রান্ত নস বা ভাষ্যসমূহ অনেক বেশি ও বড়। আহলে সুন্নাত তাদেরকে আরও বলে, এটা জ্ঞাত কথা যে, আরবের মুশরিকগণ পুনরুত্থান অস্বীকার করলেও সিফাতকে অস্বীকার করত না। তারা পুনরুত্থানের বিষয়টি নিয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে নেমেছিল, তাঁর সাথে মুনাযারা ও বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সিফাত নিয়ে আরবের কেউ কোনো দিন বিরোধিতা করেনি।

তাই জানা গেল যে, আকল (বুদ্ধি-বিবেকের যুক্তি) পুনরুত্থানের স্বীকৃতি দেয়ার চেয়ে সিফাতের স্বীকৃতি দেয় অনেক শক্তভাবে। এতদসত্ত্বেও এটা কীভাবে সম্ভব যে, তিনি সিফাত সম্বন্ধে যা জানিয়েছেন তা যেমনটি জানিয়েছেন তেমনটি নয়, আর মা'আদ তথা

□ তা ছাড়া বিবেকের মাধ্যমে ভালো কিংবা মন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আশায়েরা সম্প্রদায় বিবেকের যুক্তির মাধ্যমে শরী'আতের কোনো কিছুর সুন্দর কিংবা কুৎসিত হওয়ার জ্ঞান লাভ করা অস্বীকার করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আশায়েরা সম্প্রদায় না দার্শনিকদের অস্ত্র ভাঙ্গতে পেরেছে আর না তারা শত্রুদের মুকাবিলায় ইসলামকে সাহায্য করতে পেরেছে।

২৮৫. সুতরাং যে কারণে তোমরা আল্লাহর নাম ও গুণে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করতে চাচ্ছ সেই একই কারণে আমরা শারীরিক পুনরুত্থান সাব্যস্তকারী ভাষ্যসমূহেরও তা'ওয়ীল করতে বাধ্য।

২৮৬. অর্থাৎ শারীরিক পুনরুত্থান সম্পর্কিত দার্শনিকদের সন্দেহের অসারতা আমরা জেনেছি। তারপরও হে মুতাকাল্লিমরা, তোমরা আল্লাহর গুণের ব্যাপারে যা বল, আমরাও অনুরূপ কথা বলতে পারি পুনরায় উত্থান সংক্রান্ত বিষয়ে।

২৮৭. অর্থাৎ আশায়েরা ও মাতুরিদীদেরকে।

به من المعاد هو على ما أخبر به.

وأيضًا: فقد عُلم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذمَّ أهل الكتاب على ما حرَّفوه وبدَّلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبًا منهم وتصديقًا؟، ولم يَعِبْهُم قط بما تعيب النفاةُ لأهل الإثبات، مثل: لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل

পুনরুত্থান সম্বন্ধে যা জানিয়েছেন তা যেমনটি জানিয়েছেন তেমনই?

তদুপরি জানা গেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে কিতাবদেরকে কিতাব পরিবর্তন ও বিকৃত করার জন্য নিন্দা করেছেন।(২৮৮) আর এটা জ্ঞাত যে, তাওরাত আল্লাহর সিফাতের আলোচনায় ভরপুর।(২৮৯) সুতরাং এগুলো যদি বিকৃতি ও পরিবর্তন হতো, তাহলে তাদের এ কাজটির নিন্দা করা আরও অধিক উপযুক্ত হতো।(২৯০) বরং তারা যখন রাসূলের সামনে আল্লাহর সিফাতের উল্লেখ করত, বিমুগ্ধ হয়ে ও সত্যায়ন করে তিনি হাসতেন(২৯১), সেটা কীভাবে হলো? রাসূল তাদের ওপর কখনো এমন কোনো দোষারোপ

---

২৮৮. সহীহ বুখারীতে এসেছে [(৫/২৯১), হাদীস নং ২৬৮৫], ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "তোমরা কীভাবে আহলে কিতাবদের জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের কিতাব যা তার নবীর ওপর নাযিল করা হয়েছে তা আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে নবীন খবরটি প্রদান করে, যা পুরাতন হয়ে যায়নি। আর আল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর কিতাবে যা এসেছে তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে, তাদের হাতের কিতাবকে বিনষ্ট করেছে..."।
তাছাড়া মহান আল্লাহ বলেন, "অতঃপর তাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি; তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে গেছে। আর আপনি সবসময় তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবেন, কাজেই তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১৩]
আরও বলেন, "অতঃপর তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। কাজেই আমরা আসমান থেকে তাদের প্রতি শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা যুলুম করত।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৬২]

২৮৯. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, প্রাচীন আহলে কিতাবরা কখনও তাওরাতে আসা আল্লাহর সিফাতগুলোকে অস্বীকার করতো না। তবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবরা আল্লাহর গুণাবলিতেও বিকৃতি সাধন করেছে যখন তাদের মাঝে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো, যেমন দার্শনিক মূসা ইবন মাইমূন ও তার মত লোকদের আগমন ঘটে অথবা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতো লোকদের উদ্ভব হলো যেমন আবু ইয়া'কূব আল-বাসরী ও তার মতো লোকদের উত্থান হয়। [দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (৭/৯৪)]
ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেছেন, ইয়াহূদীদের সাথে মু'তাযিলাদের অনেক যোগাযোগ ছিল, তাদের মাঝে কর্মগত মিলও প্রচুর। ইয়াহূদীরা মু'তাযিলাদের পাঁচ মূলনীতি পাঠ করে থাকে।

২৯০. কিন্তু কুরআনে কারীমে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে আহলে কিতাবদের কিতাবে আল্লাহর নাম ও গুণ সংক্রান্ত ভাষ্যগুলোর কোনো নিন্দা আসেনি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে সেগুলোর সত্যায়ন এসেছে।

২৯১. এর দ্বারা সে হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ইয়াহূদী পণ্ডিত এসে বললো, হে মুহাম্মাদ, অথবা বললো, হে আবুল কাসেম, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে এক আঙুলের উপর রাখবেন, যমীনসমূহকে অপর আঙুলের উপর রাখবেন, পাহাড় ও গাছ অন্য আঙুলের উপর রাখবেন, পানি ও মাটি অপর আঙুলের উপর রাখবেন, আর সকল সৃষ্টিকে এক

عابهم بقولهم: ﴿يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة:٦٤]، وقولهم: ﴿إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران:١٨١]، وقولهم: استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [ق:٣٨]، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى،

করেননি যে দোষারোপ করে থাকে সিফাত নাকচকারীরা সিফাত সাব্যস্তকারীগণের ওপর। যেমন, সিফাত নাকচকারীরা সিফাত সাব্যস্তকারীদের ওপর তাজসীম (দেহবাদী) ও তাশবীহ (সাদৃশ্যপ্রদানকারী) ইত্যাদি শব্দের তকমা লাগায়। বরং তিনি[২৯২] তাদেরকে দোষারোপ করেছেন তাদের এ কথার কারণে যে, ﴿يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ "আল্লাহর হাত রুদ্ধ।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৪] এবং ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ ফকীর[২৯৩], আর আমরা ধনী।" [সূরা আলে ইমরান: ১৮১] এবং তাদের কথা: আল্লাহর আসমান-যমীন সৃষ্টি করে বিশ্রাম নিয়েছেন।[294] তখন আল্লাহ বললেন:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ۝﴾ [ق: ٣٨]

"আর অবশ্যই আমরা আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আর আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" [সূরা ক্বাফ: ৩৮]

আর কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত সিফাতের মতো সিফাতে তাওরাতও ভরপুর। অথচ তাওরাতে সরাসরি আখেরাতের আলোচনা কুরআনের মতো এত স্পষ্ট করে নেই। সুতরাং দুই কিতাবে[২৯৫] উল্লিখিত সিফাত তা'ওয়ীল করা জায়েয হলে এক কিতাবে উল্লিখিত মা'আদ[২৯৬] (পুনরুত্থান)-এর তা'ওয়ীল করা আরও বেশি উপযুক্ত।

আঙুলের উপর রাখবেন, তারপর সেগুলো নাড়বেন এবং বলবেন, আমি রাজা, আমি রাজা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ইয়াহূদী পণ্ডিত যা বলেছে তা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাকে সত্যায়ন করে হাসলেন। তারপর পড়লেন, "আর তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৭]

২৯২. আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীসে ইয়াহূদীদের ওপর তখনি দোষারোপ করেছে যখন তারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করেছে। যখন কোনো সিফাতের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছে। যেমন, আল্লাহর হাত রুদ্ধ বলার কারণে আল্লাহ তাদেরকে ধমক দিয়েছেন।

২৯৩. আল্লাহর প্রতি অসম্মানজনক গুণ প্রয়োগ করার কারণে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। কোনো সম্মানসূচক গুণ প্রদানের কারণে তাদের নিন্দা আসেনি।

২৯৪. এখানেও যেহেতু আল্লাহর প্রতি অসম্মানজনক গুণ প্রদান করা হয়েছে, তাই আল্লাহ তা'আলা সেটা নাকচ করে আয়াত নাযিল করেছেন।

২৯৫. অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআনে।

২৯৬. কারণ কুরআনেই বিশদভাবে মা'আদ বা পুনরুত্থানের কথা এসেছে। তাওরাতে তার কেবল সাধারণ বর্ণনাই স্থান পেয়েছে।

والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل فالأول أولى بالبطلان.

[الطائفة الثالثة: أهل التجهيل] :

وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني [تلك] الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.

আর দ্বিতীয়টি(২৯৭) তথা মা'আদ-পুনরুত্থান এর তা'ওয়ীল করা বাতিল হওয়া রাসূলের দীন থেকে জানা আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে প্রথমটি (সিফাতের ভাষ্যসমূহে) তা'ওয়ীল করার বিষয়টি বাতিল হওয়া অধিক উপযুক্ত।(২৯৮)

[তৃতীয় গোষ্ঠী: আহলুত তাজহীল তথা নবী-রাসূলদের আনীত সিফাত বিষয়ক আয়াতসমূহের ব্যাপারে অজ্ঞতার নীতির অনুসারী]

আর তৃতীয় গোষ্ঠী তারা হচ্ছে, আহলুত তাজহীল তথা [নবী-রাসূলদের আনীত সিফাত বিষয়গুলোতে] অজ্ঞতার নীতির অনুসরণকারী।(২৯৯) সুন্নাহ'র সাথে সম্পৃক্ত ও সালাফদের অনুসরনের দাবীদার অনেকেই এ নীতি অবলম্বন করে থাকে। তারা বলে: সিফাতের আয়াত যেগুলো আল্লাহ নাযিল করেছিলেন সেগুলোর অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না, জিবরীলও এসব আয়াতের অর্থ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না, উম্মতের প্রথম সারীর অগ্রবর্তীগণও এগুলোর অর্থ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করেননি।(৩০০)

---

২৯৭. অর্থাৎ মা'আদ বা পুনরুত্থান সংক্রান্ত ভাষ্য ও তথ্যসমূহ কোনোভাবে তা'ওয়ীল করা বাতিল হওয়ার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে জানা বিষয়।

২৯৮. অর্থাৎ যদি রাসূলের দীনের মাঝে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, পুনরুত্থান সংক্রান্ত নস বা ভাষ্যগুলোতে কোনো প্রকার তা'ওয়ীল চলবে না, তাহলে সিফাতের আয়াতসমূহে তা'ওয়ীল বাতিল হওয়ার বিষয়টি আরও বেশি উত্তমরূপে জানা যায়।

২৯৯. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র এদেরকে 'আহলুত তাম্বলীল ওয়াততাজহীল' এ নামে নামকরণ করেন। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (১/১৫)। আবার কখনও কখনও তাদেরকে যাহেরিয়্যাহও বলতেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪১৪); তাদেরকে কেউ কেউ আহলে তাফওয়ীদ্ব ও উম্মিয়্যাহ নামেও অভিহিত করে। দেখুন, জাওয়াবুল ই'তিরাদ্বাতিল মিসরিয়্যাহ, পৃ. ২৩।

৩০০. ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, তাদের কথার প্রকৃত অর্থ এটা দাঁড়ায় যে, নবী-রাসূলগণ জাহেল, পথভ্রষ্ট। তারা জানতো না সেসব আয়াতের অর্থ যাতে আল্লাহ তার নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং নবীদের কথাও তার অনুসারীরা বুঝতো না।
তারপর তিনি বলেন, এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, এসব ভাষ্য দ্বারা যা উদ্দেশ্য তা তার প্রকাশ্য দাবি ও বুঝের বিপরীত। কোনো নবী, ফিরিশতা, সাহাবী কিংবা আলেম এগুলোর উদ্দেশ্য জানে না, যেমনিভাবে তারা জানে না কিয়ামত কবে হবে। আবার তাদের মধ্যে আরেক দল বলে, বরং প্রকাশ্য অর্থের ওপর চালিয়ে নেয়া হবে, প্রকাশ্য অর্থের ওপর বহন করা হবে, তা সত্ত্বেও এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। এভাবে তারা স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে, একদিকে বলছে তার একটি ব্যাখ্যা আছে প্রকাশ্য অর্থের বিপরীতে, আবার বলছে প্রকাশ্য অর্থের ওপর চালিয়ে নেয়া হবে। এ বিষয়টি ইবন আক্বীল যাম্মুত তা'ওয়ীল গ্রন্থে তার উস্তাদ আবু ইয়া'লার দোষ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (১/১৫-১৬), (৫/৩৮১), (৭/৩৪-৩৫); মাজমূ' ফাতাওয়া

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداءً، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧]، فإنه وقف كثير من السلف على قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ وهو وقف صحيح [لكن] لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي

অনুরূপভাবে হাদীসে উল্লিখিত আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারেও তাদের এই বক্তব্য যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ সেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য জানেন না। অথচ রাসূলই প্রথম তা দিয়ে কথা বলেছেন। সুতরাং তাদের কথা অনুযায়ী রাসূল এমন বাক্য নিয়ে কথা বলেছেন যার অর্থ তিনি নিজেই জানতেন না।(৩০১)

এদের ধারণা, তারা আল্লাহর বাণী: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] "অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।" [সূরা আলে ইমরান: ০৭] এর অনুসারী। কেননা সালাফদের অনেকেই আল্লাহ (الله) শব্দের উপর ওয়াকুফ করেছেন।

বস্তুত এটি বিশুদ্ধ ওয়াকুফ।(৩০২) কিন্তু তারা (আহলুত তাজহীল) কালামের অর্থ ও ব্যাখ্যার মাঝে পার্থক্য করেনি, অনুরূপভাবে যে তা'ওয়ীল একমাত্র আল্লাহ জানেন সেটা বুঝতে

(১৩/২৮৫), (১৭/৩৬১)।
ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, আহলুত তাজহীল বা এগুলোর অর্থ জানা যায় না দাবি করা গোষ্ঠী তাদের এ নীতিকে দু'টি কায়েদার ওপর সাজিয়েছে,

১. এ ভাষ্যগুলো মুতাশাবিহ।
২. মুতাশাবিহ এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

এ দুটি কায়েদার ওপর ভর করে তারা সাহাবী-মুহাজির ও আনসারসহ সকল তাবে'য়ী ও ইমামদেরকে এসব বিষয়ে অজ্ঞ হিসেবে তুলে ধরেছে।
ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, তারা তিনটি ভুল করেছে, প্রথমত: তারা মুতাশাবিহ নির্ধারণে ভুল করেছে। দ্বিতীয়ত: তারা আয়াতগুলোকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তৃতীয়ত: তারা মুতাশাবিহাতের অর্থ কেবল আল্লাহই জানে বলছে। এভাবে তিনটি ভূমিকাতেই ভুল করেছে। এ নীতিতে আসার কারণে তারা কুরআন থেকে শিক্ষা নিতে পারেনি, কুরআন নিয়ে গবেষণা থেকে মাহরূম হয়েছে, অথচ এর মাধ্যমেই ঈমান প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তরসমূহ আল্লাহর পরিচয়ে সিক্ত হবে। ফলে তারা আল্লাহর নাযিল করা কিছু শব্দের উচ্চারণ করে থাকে যার অর্থ তারা বুঝে না, তারা মনে করে থাকে যে, এগুলো নাযিল হয়েছে কেবল তিলাওয়াত ও ইবাদত করার জন্য, এগুলোর অর্থ বুঝা, শিক্ষা নেয়া, চিন্তা ও গবেষণা করার প্রয়োজন নেই। [আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৪২৩-৪২৪)]

৩০১. ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, তারা (আহলুত তাজহীল) বলে, সিফাত বিষয়ক আয়াতসমূহ এমন কিছু ভাষ্য যা কিছু শব্দের সমষ্টি, যার অর্থ জানা যায় না। আমরা জানি না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে আমরা এগুলোকে শব্দ আকারে পড়বো, যার কোনো অর্থ নেই। আমরা এটা জানবো যে, এর একটা ব্যাখ্যা আছে যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। যদি আমাদের কাছে এমন কোনো কিছু আসে আমরা সেটাকে কোনো প্রকার সাদৃশ্য কিংবা তুলনা হিসেবে বিশ্বাস করবো না। আমরা সেগুলোর অর্থ জানি না, কেউ যদি সেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করে তবে সেটার বিরোধিতা করবো, সেগুলোর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই সোপর্দ করবো। [আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৪২২)]

৩০২. যারা এখানে ওয়াকফ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইবন 'উমার, এক বর্ণনায় ইবন আব্বাস, আয়েশা, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর, 'উমার ইবন আব্দুল আযীয, আবুশ শা'ছা, আবু নাহীক। আর এ মতই গ্রহণ করেছেন কিসাঈ, ফাররা, আখফাশ, আবু উবাইদ, আবু হাতেম, আসমা'ঈ ও সা'লাব। আর তা পছন্দ করেছেন ইবন জারীর, ইবন কুদামাহ, বাগাওয়ী, আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী, শাওকানী ও শানকীত্বী।

انفرد الله تعالى بعمله، وظنوا أن التأويل [المذكور] في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.

[معنى التأويل]:

فإن التأويل يراد به ثلاث معان:

পারেননি।(৩০৩) তাই তারা ধারণা করেছে যে, কিতাবুল্লাহ থেকে উল্লিখিত তা'ওয়ীলই পরবর্তীদের কথায় ব্যবহৃত তা'ওয়ীল।(৩০৪) ফলে তারা ভুলে পতিত হয়েছে;

[তা'ওয়ীল এর বিবিধ অর্থ](৩০৫)

কেননা তা'ওয়ীল শব্দটি(৩০৬) তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়:

---

৩০৩. অর্থাৎ তারা দু'টি ভুল করেছে:
এক. বাক্যের অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। বাক্যের অর্থ জানা গেলেও বিস্তারিত ধরণ অনেক সময় জানা যায় না। এখানেও তারা ভুল করেছে। এসব সিফাতের আয়াতসমূহের অর্থ আরবী ভাষাতে একেবারেই সরল। এগুলোর অর্থ বুঝতে কোনো কষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই। আরবরা অহরহ এগুলো তাদের ভাষায় ব্যবহার করেছে। তাহলে অর্থ না জানার কিছু নেই। হ্যাঁ, অবশ্যই তাফসীর বা ধরণ বুঝা কঠিন। কারণ যার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে তো কেউ দেখেনি, তাই তার গুণের ধরণ বুঝা সহজ নয়। সেটাই হলো তাফসীর। এ তাফসীর, যা তা'ওয়ীল এর একটি অর্থ, সেটা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে অর্থ করতে পারতো, কিন্তু তারা সেটা না করে ভুল করেছে।
দুই. কুরআনের আয়াতে এখানে যে তা'ওয়ীল একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা দ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রকৃত অবস্থা বা আসল স্বরূপ। নিঃসন্দেহে সেটা একমাত্র আল্লাহ জানেন। এ তা'ওয়ীল এর অর্থ সেটা নয় যা পরবর্তী কালের লোকেরা তা'ওয়ীল শব্দের জন্য নির্ধারণ করেছে। তারা তা'ওয়ীল বলতে দূরবর্তী কোনো অর্থ বুঝে গিয়েছে যা কোনো কারণে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ অর্থটির অস্তিত্ব কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যে নেই। তাই তাদের এ ভুলটি হয়েছিল আয়াতে আসা তা'ওয়ীল শব্দটির অর্থ নির্ধারণে।

৩০৪. বস্তুত আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যে তা'ওয়ীল বলে দু'টি জিনিসকে বুঝানো হয়: এক. সাধারণভাবে কোনো কিছুর অর্থ বুঝা। দুই. প্রকৃত গুঢ় রহস্য বা তত্ত্ব লাভ করা। অপরাপর অর্থটি পরবর্তীদের পরিভাষা।

৩০৫. তা'ওয়ীল শব্দটির আভিধানিক অর্থ, ১) পরিণাম ও সর্বশেষ অবস্থা, ২) পরিবর্তন ও পরিবর্তিত রূপ। ৩) ব্যাখ্যা। ৪) স্পষ্ট বর্ণনা। [দেখুন, তাহযীবুল লুগাহ, মু'জামু মাকায়ীসুল লুগাহ (১/১৫৯-১৬০), তাজুল 'আরূস (৭/২১৬), ইবন মানযূর (লিসানুল আরব ১১/৩৩)।
আর পরিভাষায় তা'ওয়ীল শব্দটি সম্পর্কে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এটি বর্তমানে মুশতারাক শব্দে পরিণত হয়েছে। মুশতারাক শব্দ হচ্ছে এমন সব শব্দ যেগুলো একাধিক অর্থে সমভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অর্থ নির্ধারিত হয়। এখানে তা'ওয়ীল শব্দটির কুরআনিক একটি অর্থ রয়েছে, সালাফে সালেহীন একটি অর্থে ব্যবহার করেছেন, আবার পরবর্তীরা আরেকটি অর্থে সেটাকে নিয়ে গেছে। যে কারণে এসব আয়াত যার কাছে যেভাবে পৌঁছেছে আর তার মাথায় তা'ওয়ীল শব্দের যে অর্থ ঘুরপাক খাচ্ছে সে সেটাকে উক্ত অর্থে ব্যবহার করে কুরআনে আসা তা'ওয়ীল শব্দের ব্যাখ্যা করেছে। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/২৮৪-২৮৬)] সংক্ষেপিত। আরও দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব [(৯/২৪); সাফাদিয়্যাহ (১/২৮৮)]।

৩০৬. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, তা'ওয়ীল শব্দটি সম্পর্কে মানুষ দু' প্রান্তিক সীমানায় রয়েছে। এক. কেউ কেউ তার নিন্দায় গ্রন্থ রচনা করেছে। (যেমন কাযী আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত ফী আখবারিস সিফাত, অনুরূপ ইবন কুদামাহ, যাম্মুত তা'ওয়ীল) দুই. অপর পক্ষ তা'ওয়ীল করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, (যেমন, আবু বকর ইবনু ফুওরাক তার মুশকিলুল হাদীস ওয়া বায়ানিহী গ্রন্থে)। বরং তাদের মধ্যকার কেউ কেউ তা'ওয়ীল করা ওয়াজিবও বলেছে। তারপর ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এসে সেটার আসল অর্থ ও কখন তা গ্রহণযোগ্য হবে আর কখন হবে না, তা স্পষ্ট করে দেন। [দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/২৮৮), (৫/৩৪৯-৩৫০); দারউত তা'আরুদ্ব

[التأويل في اصطلاح المتأخرين]:

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً

[তা'ওয়ীল শব্দটি পরবর্তী লোকদের পরিভাষায়]

পরবর্তীদের অধিকাংশের পরিভাষায় তা'ওয়ীল হচ্ছে- কোনো শব্দের অর্থকে তার অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত সম্ভাবনার দিকে সরিয়ে নেয়া, এমন দলীলের কারণে যা তার সাথে যুক্ত থাকে।(৩০৭)

সুতরাং তাদের নিকট, যাহির(৩০৮) শব্দের চাহিদা অনুযায়ী অর্থে ব্যবহৃত শব্দ তা'ওয়ীল নয়।(৩০৯) তাদের ধারণা- তা'ওয়ীল শব্দ দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এটাই(৩১০)। আর নস(৩১১)

(৫/২৩৭); আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৮৯-]

৩০৭. (এমন দলীলের কারণে বা তার সাথে যুক্ত থাকে), এ অংশটুকু থাকলে সেটা তা'ওয়ীলের গ্রহণযোগ্য পারিভাষিক অর্থ হতে পারে, যা উসূলবিদগণ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যারা আল্লাহর সিফাতের তা'ওয়ীল করে তারা এ অংশটুকু বা এ শর্তটুকু বেমালুম ভুলে যায়। তারা কেবল আক্বলী তথা বিবেকের যুক্তির শরণাপন্ন হয়ে সিফাতের আয়াতসমূহকে তার আসল প্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থ থেকে অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থের দিকে নিয়ে যায়, যা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, পরবর্তী এ পরিভাষা কুরআন ও হাদীসে আসেনি। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের শব্দে আসা তা'ওয়ীল হিসেবে এ অর্থ সর্বোতভাবে অগ্রহণযোগ্য।

৩০৮. এমন দলীল যাতে দু'টি অর্থ করার সুযোগ থাকে, একটি প্রকাশ্য অর্থ, আরেকটি দূরবর্তী অর্থ। প্রকাশ্য অর্থকে যাহের বলা হয়। আর অপ্রকাশ্য বা দূরবর্তী অর্থকে মুআওয়াল বলা হয়। এটি পরবর্তী লোকদের পরিভাষা।

৩০৯. যেমন ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ 'আলা ও ইরতাফা'আ বা স্বা'আদা, (উপরে উঠা, উর্ধ্বে উঠা, আরোহন করা) এদের নিকট তা'ওয়ীল নয়। অথচ এটা তা'ওয়ীল। এটার সারকথা হচ্ছে, শব্দ থেকে যা বুঝা যায় তা, সালাফে সালেহীনের নিকট তা'ওয়ীল বা সরল অর্থ (যা তাফসীর হিসেবে খ্যাত)। কিন্তু যারা পরবর্তীদের বুঝ অনুযায়ী তা'ওয়ীল করে আর যারা তাফওয়ীদ্ব করে তারা এটাকে তা'ওয়ীল মনে করে না।

৩১০. অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত তাদের বক্তব্য, যাতে বলা হয়েছে, তা'ওয়ীল হচ্ছে কোনো শব্দের অর্থকে তার অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত সম্ভাবনার দিকে সরিয়ে নেয়া, এমন দলীলের কারণে যা তার সাথে যুক্ত থাকে। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তা'ওয়ীল বলতে 'কোনো শব্দের অর্থকে তার অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত সম্ভাবনার দিকে সরিয়ে নেয়া, এমন দলীলের কারণে যা তার সাথে যুক্ত থাকে অথবা পরবর্তী দলীলের ওপর ভিত্তি করে অথবা শুধু কোনো এক প্রকার দলীলের ওপর নির্ভর করে' এ অর্থে ব্যবহার করা পরবর্তী লোকদের পরিভাষা। সালাফে সালেহীনের কারও শব্দে তা'ওয়ীল দ্বারা এ পারিভাষিক অর্থটি উদ্দেশ্য ছিল না। পরবর্তীতে এ অর্থটি এত বেশি প্রচার ও প্রসার পায় যে, তারা মনে করতে থাকে যে, কুরআনে কারীমে আসা তা'ওয়ীলকে এ অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। তারা বলতে থাকে, "আর তার তা'ওয়ীল কেবল আল্লাহই জানেন" [সূরা আলে ইমরান: ০৭] এর অর্থ সেটাই যা তারা পরবর্তীতে পরিভাষা হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তারপর তাদের একদল বলে উক্ত অর্থটি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, আরেক দল বলে উক্ত অর্থটি ইলমে দৃঢ় লোকেরা জানে। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, নিঃসন্দেহে উভয় দলই ভুলের ওপর আছে। কারণ এটার কোনো বাস্তবতা নেই। বরং তা বাতিল। আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, এটা তাঁর উদ্দেশ্য না, আর তিনি তা উদ্দেশ্য নেননি। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৪৯-৩৫০), শারহু হাদীসিন নুযূল]

৩১১. কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা সিফাত সংক্রান্ত নস বা ভাষ্যসমূহের এমন তা'ওয়ীল করতে হবে যাতে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ না থাকে। এটাকে তারা তা'ওয়ীল নাম দিয়েছে। এ কারণে তারা প্রতিটি সিফাত বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের জন্য দূরবর্তী একটি অর্থ নির্ধারণ করে

على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلاً مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون.

ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد. مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.

এর এমন তা'ওয়ীল রয়েছে যা তার মাদলূল (শব্দ দ্বারা বুঝা যায়) এর বিপরীত[৩১২], যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।[৩১৩] তা'ওয়ীলকারীরাও জানে না অথবা তা'ওয়ীলকারীরা জানে[৩১৪]।

আবার এদের অনেকের বক্তব্য, শব্দ তার যাহির বা প্রকাশ্য অর্থের ওপর প্রযোজ্য হবে। কাজেই তার যাহির উদ্দেশ্য হবে। অথচ তারা বলে: নিশ্চয় এর একটি তা'ওয়ীল আছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। নিঃসন্দেহে এটি পরস্পর বিরোধী কথা, যাতে সুন্নাহ'র সাথে সম্পৃক্ত চার ইমামের অনুসারী ও অন্যান্য অনেকেই পতিত হয়েছেন।[৩১৫]

সেটা জানাকেই ইলম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান সাব্যস্ত করে। আর যারা প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে তাদের প্রতি কুফর এর সম্পৃক্ততা প্রদান করে।

৩১২. এতটুকুতে আহলুত তা'ওয়ীল ও আহলুত তাজহীল একমত। শেষ পর্যন্ত তারা এমন সব তা'ওয়ীল নামীয় অপব্যাখ্যার শরণাপন্ন হয় যা তাদেরকে ক্বারামিত্বা, বাতেনী, জাহমীদের অপব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যায়। [মাজমূ' ফাতাওয়া]

৩১৩. এতটুকু কেবল আহলুত তাজহীলের মত। যদিও প্রকৃত অর্থে এটা আহলুত তা'ওয়ীলদেরও মত। কারণ তারাও প্রকাশ্য অর্থকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে থাকে। তারা আরও মনে করে থাকে যে এগুলো মুতাশাবিহ। এগুলোর অর্থ কেবল আল্লাহ জানেন। আমরা যা করছি তা কেবল সাওয়াবের আশায় করছি।

৩১৪. আহলুত তাজহীল তথা তাফওয়ীদ্ব নীতির অনুসরণকারীদের দু'টি মত রয়েছে। তাদের একদল বলে তা'ওয়ীলকারীরা সে অর্থটি জানতে পারবে, অপর দলটি বলে তা'ওয়ীলকারীরাও তা জানতে পারে না।

৩১৫. তাদের এ স্ববিরোধিতার বিষয়টি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার অনেক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,
'তারপর তাদের কেউ কেউ বলে, এর দ্বারা যা উদ্দেশ্য তা তার প্রকাশ্য অর্থ ও বুঝের বিপরীত। এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা কোনো নবী, ফিরিশতা কিংবা সাহাবী কিংবা কোনো আলেম জানতে পারেন না। যেমন তারা জানে না, কিয়ামত কবে হবে।
তাদের আরেক দল বলে, বরং এগুলোকে তার প্রকাশ্য অবস্থার ওপর নেয়া হবে, প্রকাশ্য রূপে বহন করা হবে, তবে আল্লাহ ব্যতীত কেউ তার তা'ওয়ীল জানে না।
এভাবে তারা স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়, কারণ তারা এগুলোর এমন একটি তা'ওয়ীল সাব্যস্ত করছে যা তার প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী, তারপরও বলছে যে, এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে নেয়া হবে। [দারউত তা'আরুদ্ব (১/১৬), (৫/৩৮১)]
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, "... অতঃপর এরা মারাত্মক নিকৃষ্ট ধরনের স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হলো, যখন তারা বললো, এগুলোকে তার প্রকাশ্য অর্থে নেয়া হবে, তারপর বললো, এর তা'ওয়ীল যা প্রকাশ্য রূপের বিপরীত হবে তা বাতিল, তা সত্ত্বেও এর তা'ওয়ীল আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।
কীভাবে তারা এর তা'ওয়ীল সাব্যস্ত করছে আর বলছে সেটাকে প্রকাশ্য অর্থেই নিতে হবে, আরও বলছে, সেটার প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়, কেবল রব্ব সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সেটার তা'ওয়ীল জানেন। স্ববিরোধিতার নযীর হিসেবে এটা কি নিকৃষ্ট নয়? বস্তুত তারা তিন জায়গায় ভুল করেছে, মুতাশাবিহ নির্ধারণে, এ সিফাতের আয়াতগুলোকে মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে আর মুতাশাবিহ এর অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন বলার মধ্যে।" [দেখুন, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৪২৩-৪২৪)]

[التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين]:

والمعنى الثاني: [أن] التأويل هو تفسير الكلام، سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ كما نقل ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن إسحاق،

[তা'ওয়ীল শব্দটি অধিকাংশ মুফাসসিরগণের নিকট]

তা'ওয়ীল এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কালামের তাফসীর, কোনো বাক্যের ব্যাখ্যা, চাই সেটা যাহিরের সাথে সামঞ্জস্যশীল হোক বা না হোক। অধিকাংশ মুফাসসির ও অন্যান্যদের পরিভাষায় এটাই তা'ওয়ীল এর অর্থ।

এই তা'ওয়ীল মজবুত ইলমধারীরা জানেন। আর এটা ঐ ওয়াকফ অনুযায়ী, সালাফদের মাঝে যারা ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ এর ওপর ওয়াকফ করেছেন। যেমনটি ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ[৩১৬], মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবনুয যুবাইর[৩১৭], মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক[৩১৮],

---

৩১৬. তিনি হচ্ছেন মুজাহিদ ইবন জাবার, আবুল হাজ্জাজ আল-মাক্কী, সায়েব ইবন আবিস সায়েব এর ক্রীতদাস। মাখযুমী বংশের সাথে সম্পৃক্ত। একদিকে তিনি কিরাআতের শাইখ, তাফসীরের শাইখ, ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার বড় ছাত্রদের একজন। তিনি তার থেকেই তাফসীর ও কুরআন গ্রহণ করেছেন। তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি পুরো কুরআনকে ইবন আব্বাসের কাছে ত্রিশবার পেশ করেছি। অপর বর্ণনায় এসেছে, আমি ইবন আব্বাসের কাছে কুরআনকে এমনভাবে পেশ করেছি যে, প্রতিটি আয়াতের পরেই থেমে থেমে জেনেছি এ আয়াত কিসের ব্যাপারে এবং কী হয়েছিল। তিনি হিজরী ১০৩ বা ১০৪ সালে মারা যান।
দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (৫/৪৬৬); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/৮৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/৪৪৯); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (১০/৪২)।

৩১৭. তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবনুয যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম আল-আসাদী আল-মাদানী। মদীনার ফকীহগণের একজন ও তাদের কারীদের অন্যতম। ইবন সা'দ বলেন, তিনি আলেম ছিলেন আর তার কাছে কিছু হাদীস ছিল। দারাকুত্বনী তাকে সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হিজরী ১১০ সালের তার মৃত্যু হয়।
দেখুন, ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৯/৯৩); ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (পরবর্তী আলাদা অংশ, পৃ. ১১২।

৩১৮. তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার, আল-হাফেয, ইতিহাস সংবাদ ও সীরাতের বর্ণনাকারী। মদীনার অধিবাসী। হাদীসের হাফেযদের অন্যতম। তার দাদা ইয়াসার ছিল 'আইনুত তামার' এর যুদ্ধের কয়েদি। হিজরী ১৫০ সালে তার জন্ম। কারও কারও মতে ১৫১ সালে, অপর কারও মতে ১৫২ সালে।
ইমাম শাফে'য়ী তার প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, কেউ যদি মাগাযী বা রাসূলের যুদ্ধ বিদ্যা সম্পর্কে সমুদ্রের মতো জ্ঞানী হতে চায় তবে সে যেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক এর পরিবারভুক্ত হয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাগাযীর জ্ঞানে আল্লামা। তার হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে অনেক বক্তব্য এসছে। একদল তাকে গ্রহণযোগ্য অপরদল তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, একাধিক কারণে ইবন ইসহাকের হাদীসভিত্তিক বর্ণনা গ্রহণের ব্যাপারে আলেমগণকে হাত গুটিয়ে নিতে দেখেছি। সেসব কারণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তার শিয়াপ্রীতি, কাদরপ্রীতি, হাদীসে তাদলীস। তবে সাদূক ছিলেন সেটা অস্বীকার করার জো নেই। হাফেয ইবন হাজার বলেন, তিনি সাদূক বা হাসান হাদীসের বর্ণনাকারী, তাদলীস বা দোষ-ত্রুটি গোপন করে বর্ণনা করতেন। শিয়াপ্রীতির দোষ প্রদান করা আছে এবং কাদর বা তাকদীর অস্বীকারকারীদের মতের প্রতি অনুরক্ত পাওয়া গেছে।

وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في مواضع أُخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.

ইবন কুতাইবাহ[৩১৯] প্রমুখ[৩২০] থেকে। বস্তুত উভয় বক্তব্যই এক বিবেচনায় সঠিক। যেমনটি আমরা সেটাকে অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।[৩২১] আর এজন্যই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এটাও এসেছে, ওটাও এসেছে। আর উভয়টিই হক্ক ও যথাযথ।[৩২২]

দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১/২১৪); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/১৭২); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/৩৩); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৯/৩৮); তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ৪৬৭; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (৩/৪৬৮)।

৩১৯. তিনি হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবাহ, আদ-দীনাওয়ারী। অনেক গ্রন্থ প্রণেতা। অনেক বিষয়ের পণ্ডিত। আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, গরীবুল কুরআন, আল-ক্বিরাআত, ই'রাবুল কুরআন, 'উয়ুনুল আখবার, মুশকিলুল কুরআন। হিজরী ২৭৬ সালে হঠাৎ করে মারা যান। তার সম্পর্কে খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও দীনদার উৎকৃষ্ট মানুষ।
দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১০/১৭০); ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (২/৫০৩); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৯৬); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৩/৪২)।

৩২০. আরও যারা এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন তারা হচ্ছেন, আবু নাজীহ, রবী', কাসেম ইবন মুহাম্মাদ, দাহহাক। আর তা পছন্দ করেছে, আবু জা'ফর আন-নাহহাস, আবু সুলাইমান আদ-দিমাশকী, আবুল হাসান আল-আশ'আরী, আন-নাওয়াওয়ী, ইবনুল হাজেব, খত্বীব আল-বাগদাদী।
দেখুন, তাফসীর তাবারী (৩/১৮৩); তাফসীর ইবন কাসীর (২/৭-৮); সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানছূর (২/১৫১-১৫২); ইবনুন নাহহাস, ই'রাবুল কুরআন (১/৩৫৬); মা'আনিল কুরআন (১/৩৫৩); ইবন কুতাইবাহ, তা'ওয়ীলু মুশকিলুল কুরআন, পৃ. ৭২; আহকামুল কুরআন (২/২৮৩); খত্বীব আল-বাগদাদী, আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (১/৬৩); নাওয়াওয়ী, শারহু মুসলিম (১৬/২১৮); সুয়ূত্বী, আল-ইতক্বান (২/৪); আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ২২৩।

৩২১. যেমন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/২৭৫, ২৮৪-২৮৫), (৫/২৩৪-৩৪৭-৩৪৯), (১৬/৪০৭-৪২২); মাজমূ'আতুর রাসায়িলুল কুবরা (২/১৭-২১); আত-তাদমুরিয়্যাহ, ৯০-৯১।

৩২২. বস্তুত আয়াতের এখানে ওয়াকফের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের দু'টি মত রয়েছে:
এক. শুধু 'ইল্লাল্লাহ' এর উপর ওয়াক্ফ করতে হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, এর তা'ওয়ীল একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তখন 'যারা ইলমে মজবুত' তা থেকে মুবতাদা বা নতুন বাক্য শুরু হবে, আর 'তারা বলে আমরা এসবের উপরই ঈমান আনলাম' [সূরা আলে ইমরান: ০৭]
দুই. একসাথে মিলিয়ে পড়া, "এর তা'ওয়ীল জানে না কেউ আল্লাহ ছাড়া আর যারা ইলমে মজবুত তারা ব্যতীত। তারা বলে, আমরা এর ওপর ঈমান আনলাম"। [সূরা আলে ইমরান: ০৭] সেটার খবর হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, এর তা'ওয়ীল কেউ জানে না, আল্লাহ ব্যতীত ও যারা ইলমে মজবুত তারা ব্যতীত, তারা জানা সত্ত্বেও বলে, আমরা এসবের ওপর ঈমান আনলাম, এসবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে....
[দেখুন, তাফসীর তাবারী (৬/২০১); তাফসীরে বাগাওয়ী (২/১০); তাফসীর আল-কুরতুবী (৪/১৬); তাফসীর ইবন কাসীর (২/১০); সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানছূর (২/১৫১); আশ-শানকীত্বী, আদ্বওয়াউল বায়ান (১/১৯১); ইবন তাইমিয়্যাহ, আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৯০]
ইবন তাইমিয়্যা বেশ কিছু জায়গায় বলেছেন, উভয় অর্থটি সঠিক। তাই,
যখন আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ এর তা'ওয়ীল জানে না এখানে (ওয়াক্ফ করা বা) থামা হবে, তখন অর্থ হবে মুতাশাবিহ এর প্রকৃত অর্থ, যার দিকে এর সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন, সর্বশেষ পরিণতি তা কেবল আল্লাহই জানেন।
আর যখন 'রাসেখুনা ফিল ইলম' বা 'ইলমে মজবুত লোকেরাও সেটার তাওয়ীল জানে' সেটা সহ মিলিয়ে পড়া হবে তখন অর্থ হবে, এর সাধারণ অর্থ আলেমরাও জানে।
দেখুন, [ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (১/২০৭-২০৮); ফাতাওয়া (৫/২৩৪); আস-

[التأويل الوارد في القرآن والسنة] :

والمعنى الثالث: أن التأويل: هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان، ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: ﴿يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف:١٠٠] . وقال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف:٥٣] ، وقال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

[তা'ওয়ীল শব্দটি যে অর্থে কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে]

আর (তা'ওয়ীল) এর তৃতীয় অর্থ: তা'ওয়ীল হচ্ছে ঐ হাকীকত তথা প্রকৃত সত্য, যে দিকে কথা ফিরে যায়, যদিও তা যাহির (প্রকাশ্য) অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।(৩২৩) সুতরাং জান্নাতে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি যেগুলোর সংবাদ আল্লাহ দিয়েছেন সেগুলো প্রকৃত সত্য এবং স্বয়ং যা বিদ্যমান তা-ই। এমনটি নয়, মস্তিষ্ক দ্বারা যার বিভিন্ন অর্থ কল্পনা করা হয় ও জিহ্বা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

বস্তুত কুরআনের ভাষায় বর্ণিত তা'ওয়ীল এটাই। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণীতে ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম বলেছিলেন: ﴿يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا﴾ [يوسف: ١٠٠] "হে আমার প্রিয় পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন।"(৩২৪) [সূরা ইউসুফ: ১০০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ﴾ [الاعراف: ٥٣] "তারা কি শুধু সে প্রকৃত পরিণামের অপেক্ষা করে? যেদিন সে প্রকৃত পরিণাম প্রকাশ পাবে, সেদিন যারা আগে সেটার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদের রবের রাসূলগণ তো সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৫৩]

অন্য আয়াতে: ﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] "অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" [সূরা আন-

---

সাফাদিয়্যাহ (১/২৯১)] আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেমের বক্তব্য। [আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৩/৯২১)]

৩২৩. অর্থাৎ এ অর্থের দিক থেকে তা'ওয়ীল এর জন্য যাহের বা প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী হওয়া জরুরী নয়।

৩২৪. অর্থাৎ স্বপ্নের সর্বশেষ পরিণতি। যেখানে এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যার প্রকৃত সত্য রূপ প্রকাশ পেলো।

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾ [النساء:٥٩].
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله.

[ما المراد بتأويل الصفات]:

فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول» فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء، فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه

নিসা: ৫৯]

এ হচ্ছে সে তা'ওয়ীল বা প্রকৃত অবস্থা যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

[সিফাতের তা'ওয়ীল করা দ্বারা উদ্দেশ্য]

আর সিফাতের তা'ওয়ীল হলো, ঐ প্রকৃত অবস্থা যা একমাত্র আল্লাহই জানেন তা হচ্ছে সিফাতের ধরণ, যা অজ্ঞাত। ইমাম মালেক ও অন্যান্য সালাফে সালেহীন এটাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন যখন তারা বলেছেন,

«الاستواء معلوم، والكيف مجهول»

"ইস্তেওয়া এর অর্থ জানা রয়েছে (অর্থাৎ উপরে উঠা) কিন্তু ধরণ অজানা।"

সুতরাং 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ জানা ও জ্ঞাত। এটাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা যাবে। এটা এমন তা'ওয়ীল যা ইলমে সুদৃঢ়পদগণ জানেন। কিন্তু সে 'ইস্তেওয়া' বা উপরে উঠার ধরণ সেটাই ঐ তা'ওয়ীল যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, যা আব্দুর রায্যাক[৩২৫] ও অন্যান্যগণ[৩২৬] তাদের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, "কুরআনের তাফসীর চার ধরনের:

(১) ঐ তাফসীর যা আরবগণ তাদের কথায় জানে ও বুঝে।

(২) ঐ তাফসীর যা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

---

৩২৫. তিনি হচ্ছেন আব্দুর রায্যাক ইবন হাম্মাম ইবন নাফে' আল-হিমইয়ারী আস-সান'আনী। তার যমানার সবচেয়ে বড় হাফেযদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হাদীস শুনেছেন হিশাম ইবন হাসসান, উবাইদুল্লাহ ইবন 'উমার, তার ভাই আব্দুল্লাহ, ইবন জুরাইজ, মা'মার প্রমুখ থেকে, তবে তিনি মা'মার থেকে বেশি নিয়েছেন। আর তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেন তার শিক্ষক সুফইয়ান ইবন উয়াইনাহ, মু'তামির ইবন সুলাইমান, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবন রাহওয়াইহি, ইবন মা'ঈন, ইবনুল মাদীনী প্রমুখ। আব্দুর রায্যাক বলেন, আমি আট বছর মা'মারের সঙ্গী ছিলাম। হিশাম ইবন ইউসুফ বলেন, আব্দুর রায্যাক আমাদের মধ্যে বড় আলেম ও বড় হাফেয। তিনি হিজরী ২১১ সালে মারা যান। তার গ্রন্থসমূহের অন্যতম হচ্ছে, মুসান্নাফ, তাফসীর। বলা হয়ে থাকে, আব্দুর রাযযাক সতেরো হাজার হাদীস মুখস্থ জানতেন।
দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৫/৫৪৮); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৩/২১৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/৫৬৩); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৬/৩১০)।

৩২৬. অন্যান্যগণের মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন ইবন জারীর আত-তাবারী।

قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب.

وهذا كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة:١٧]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عَيْن رأتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَر على قَلْب بَشَر».

وكذلك عِلْم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

(৩) ঐ তাফসীর যা আলেমগণ জানেন।

(৪) ঐ তাফসীর যা কেবল আল্লাহ জানেন, যে ওটা জানার দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী।"(৩২৭)

এটা ঐরকম যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧﴾ [السجدة: ١٧]

"অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ!" [সূরা আস-সাজদাহ: ১৭]

অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তর কল্পনা করেনি।"(৩২৮)

তেমনি কিয়ামতের জ্ঞান ইত্যাদি।

এটা ঐ তা'ওয়ীল যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, যদিও আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে যা কিছু বলা হয়েছে তার অর্থ আমরা বুঝি, অনুরূপ আমাদেরকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তাও আমরা বুঝি।(৩২৯) কেননা আল্লাহ বলেছেন:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ ٢٤﴾ [محمد: ٢٤]

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?" [সূরা মুহাম্মদ: ২৪]

তিনি আরও বলেন, ﴿أَفَلَمۡ يَدَّبَّرُواْ ٱلۡقَوۡلَ﴾ [المؤمنون: ٦٨] "তবে কি তারা এ বাণীতে চিন্তা-

৩২৭. দেখুন, তাবারী, তাফসীর (১/৩৪); ইবন কাসীর, তাফসীর (১/১৮), (২/৭); আরও দেখুন, সুয়ূত্বীর আদ-দুররুল মানসূর (২/১৫১-১৫২)।

৩২৮. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩২৪৪, ৪৭৭৬, ৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৭৪৯৮; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮২৪।

৩২৯. অর্থাৎ কুরআনে কারীমে এমন কোনো কোনো ভাষ্য এসেছে যার আসল তাফসীর একমাত্র আল্লাহ জানেন, কিন্তু সেগুলোর শব্দার্থ ও সেগুলোর দ্বারা আল্লাহ কী বুঝাতে চাচ্ছেন তা মোটামোটি বুঝি। অথচ এগুলো নিয় চিন্তা-গবেষণা করারও উদ্দেশ্য।

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾ [المؤمنون:٦٨]، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا».

গবেষণা করেনি?" [সূরা আল-মুমিনুন: ৬৮] এখানে তিনি পূর্ণ কুরআন গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আংশিক নয়।

আবু আব্দুর রহমান সুলামী[৩৩০] রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا».

"আমাদেরকে যারা কুরআন পড়াতেন; যেমন উসমান, ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা তারা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশটি আয়াত শিখলে তার মধ্যকার ইলম শেখা ও আমল শেখা ব্যতিরেকে সেগুলো অতিক্রম করত না। তাদের উক্তি আমরা কুরআন, ইলম, আমল সবটাই শিখেছি।"[৩৩১]

---

৩৩০. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবন হাবীব ইবন রাবী'আহ আল-কূফী, আল-ইমাম, কূফার কারী আস-সুলামী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তার জন্ম হয়েছিল। তিনি উসমান, আলী, ইবন মাসঊদ এর কাছে কুরআন পড়েছেন, তাজওয়ীদ শিখেছেন, তাফসীর নিয়েছেন। তার থেকে আসেম ইবন আবিন নাজূদ কুরআন নিয়েছেন। আর তার থেকে হাফস নিয়েছেন, যা আমাদের পূর্বদেশীয়দের কিরাআত। তিনি চল্লিশ বছর ধরে মানুষদের কুরআনের জ্ঞান বিতরণ করেন।

আবু 'আউন আস-সাক্বাফী বলেন, আমি আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামীর কাছে কুরআন পড়তাম। হাসান ইবন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাও তাঁর কাছে কুরআন পড়তেন। [আল্লাহু আকবার; ইলম মানুষকে কত উপরে উঠায়, নবী পরিবারের লোক সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও একজন তাবে'য়ীর কাছে কুরআন পাঠ করতে হাসান ইবন আলীর কোনো সমস্যা হয়নি। অথচ তিনি জান্নাতের যুবকদের দুজন সর্দারের একজন]

বলা হয়ে থাকে, তিনি হিজরী ৭৪ সালে অথবা ৭৩ সালে মারা যান।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৬/১৭২); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/৫৫); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/২৬৭); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৫/১৮৩)।

৩৩১. মুসনাদে আহমাদ (৫/৪১০), হাদীস নং ২৩৪৮২; ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ৩০৫৪৯; তাবারী, আত-তাফসীর (১/৩৫-৩৬); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/৫৫৭); ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাত (৬/১৭২); মুহাম্মাদ ইবন ওয়াদ্দাহ আল-কুরতুবী, আল-বিদা'উ ওয়ান নাহইয়ু 'আনহা, পৃ. ৮৬; বাইহাক্বী, আস-সুনান আল-কুবরা (৩/১১৯-১২০); ত্বাহাউই, মুশকিলুল আসার (১৪৫১); তাহাউই, মুশকিলুল আসার, হাদীস নং ১৪৫০।

وقال مجاهد: «عرضتُ المصحف على ابن عباس. رضي الله عنهما. من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها».

وقال الشعبي: «ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها». وقال مسروق: «ما قال

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«عرضتُ المصحف على ابن عباس - رضي الله عنهما - من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها».

আমি ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার নিকট মুসহাফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পেশ করেছি। প্রত্যেক আয়াতের শেষে থেমে সে সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি।"[৩৩২]

শা'বী[৩৩৩] রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها».

"যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করলেই আল্লাহর কিতাবে তার বর্ণনা রয়েছে।"[৩৩৪]

মাসরূক[৩৩৫] রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

---

৩৩২. ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ৩০৯১৮; দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং ১১২০; তাবারী, আত-তাফসীর (১/৯০), নং ১০৮; আত-ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (১১/৭৭), হাদীস নং ১১০৯৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৩০৭); আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৩/২৭৯-২৮০); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/৪৬৫-৪৫৭); ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (১/১৫)।

৩৩৩. তিনি হচ্ছেন আবু আমর আমের ইবন শুরাহীল আল-হামাদানী আশ-শা'বী। ইসলামের বড় ইমামদের একজন। তিনি অনেক প্রবীন সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন, যেমন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, সা'ঈদ ইবন যায়েদ প্রমুখ। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন হিকাম, হাম্মাদ, দাউদ ইবন আবী হিন্দ প্রমুখ। তিনি হাফেযে কুরআন ও হাদীস ছিলেন। কিছুই লিখেননি। তিনি সাহাবীদের জীবদ্দশায় ফতোয়া দিতেন। তবে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা হাজ্জাজের বিরুদ্ধে ইবনুল আস'আস এর সাথে বের হয়েছিলেন।
মাকহূল বলেন, আমি শা'বী থেকে বড় জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।
আবু মিজলায বলেন, আমি শা'বী থেকে বড় ফকীহ কাউকে দেখিনি। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেবও নয়, ত্বাউসও নয়, আত্বাও নয়, হাসান বসরীও নয়, ইবন সীরীনও নয়। আমি তাদের সকলকেই দেখেছি।
ইবন উয়াইনাহ বলেন, মানুষের মাঝে আলেম তিনজন। ইবন আব্বাস তার সময়ের আলেম। শা'বী তার সময়ের আলেম। আর সাওরী তার সময়ের আলেম।
শা'বী রাহিমাহুল্লাহ হিজরী ১০০ সালে মারা যান।
দেখুন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৪/৩১০); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৩/১২); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/৭৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/২৯৪); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (১/১২৬)।

৩৩৪. আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ (১/৫৪৭); অনুরূপ ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৩/৯২৫)।

৩৩৫. তিনি হচ্ছেন আবু আয়েশা মাসরূক ইবনুল আজদা' ইবন মালেক ইবন উমাইয়্যাহ আল-ওয়াদে'ঈ আল-হামাদানী। তাবে'য়ীদের মধ্যকার বড় মাপের আলেম। তিনি 'মুখাদ্রাম' ছিলেন। অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আয়েশা, ইবন মাসঊদ প্রমুখ। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, শা'বী, ইবরাহীম আন-নাখা'য়ী প্রমুখ। শা'বী বলতেন, আমি পৃথিবীর প্রান্তদেশের কোথাও মাসরূকের মত ইলম অন্বেষণকারী কাউকে

أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعِلْمُه في القرآن، ولكن عِلْمُنا قَصُرَ عنه».
وهذا بابٌ واسعٌ قد بُسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على [أصول] المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أُنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا للناس.

«ما قال أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعِلْمُه في القرآن، ولكن عِلْمُنا قَصُرَ عنه».

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীগণ যা কিছুই বলেছেন, তার জ্ঞান কুরআনে বিদ্যমান। তবে আমাদের জ্ঞান সে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতায় রয়েছে।"(৩৩৬)

এর বিস্তারিত বিবরণ স্বীয় স্থানে বর্ণিত হয়েছে(৩৩৭)।

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐসব ভ্রান্ত মতবাদসমূহের 'মুলনীতি'র ব্যাপারে সতর্ক করা' যেগুলো রাসূলের আনীত ইলম ও ঈমান অধ্যায়ে বিভ্রান্তিকর ও ভ্রষ্টতা আবশ্যক করেছে। আর (এ বিষয়েও সাবধান করা যে) রাসূলকে কেউ যদি এমন বানায় যে, তার প্রতি যে কুরআন নাযিল হয়েছে তার অর্থ সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখেন না, তদ্রূপ জিবরীলকেও এমন বানায় যে, তিনি শ্রুত তথা আকীদা বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না, তাহলে তো সে কুরআনকে হিদায়াতকারী হিসেবে নেয়নি, মানুষের জন্য সেটাকে বর্ণনা হিসাবেও গ্রহণ করেনি।

দেখিনি। তিনি আরও বলেন, যখন উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ কূফায় আগমন করলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, উৎকৃষ্ট আলেম কে? তারা বললো, মাসরূক।

মাসরূক বলতেন, একজন মানুষের ইলমের জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে আল্লাহর ভয় করার বিষয়টি জানবে। আর একজন মানুষের মূর্খতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে নিজের আমল নিয়ে আত্মভরিতা করবে। বর্ণিত আছে, তিনি (মৃত্যুর সময়) বলেছিলেন, আমি কোনো জিনিসের জন্য আফসোস করি না, কেবল আল্লাহর জন্য সাজদাহ না করতে পারার বিষয়টিই আমার আফসোসের বিষয় থেকে যাবে। ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, মাসরূক গ্রহণযোগ্য। তার মতো ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করা সাজে না। তিনি হিজরী ৬২ অথবা ৬৩ সালে মারা যান।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৬/৭৬); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/৪৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/৬৩)।

৩৩৬. আবু খাইসামাহ যুহাইর ইবন হারব, আল-ইলম, পৃ. ৫০; খত্বীব আল-বাগদাদী, আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (১/১৯৭), নং ১৯৫। ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (১/২০৮), (৫/৫৭); ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িক (৩/৯২৫)।

অপর বর্ণনায় এসেছে, মাসরূক বলেন, প্রবৃত্তির অনুসারীরা (বিদ'আতীরা) যেই হোক না কেন, আল্লাহর কুরআনে সেটার খণ্ডন রয়েছে। তবে হয়ত কখনও কখনও আমরা সেটার হদিস পাই না। [হারওয়ী, যাম্মুল কালাম, নং ২০৪]

অনুরূপ ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মানুষ যদি পুরো কুরআন নিয়ে গবেষণা করতো, তাহলে তাতে প্রতিটি বিদ'আতী ও তার বিদ'আতের জবাব খুঁজে পেত।" [হারওয়ী, যাম্মুল কালাম, পৃ. ৬৯]

৩৩৭. যেমন, দারউত তা'আরুদ্ব (৫/৫৬-৫৭); তাছাড়া কুরআন ধারণ করার জন্য আরও কিছু আছার দেখা যেতে পারে, যেমন

ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমরা যদি ইলম বা জ্ঞান চাও তাহলে কুরআনে খুঁজে বেড়াও; কারণ তাতে পূর্বের ও পরের ইলম রয়েছে।" [আত-ত্বাবারানী, আল-কাবীর (৯/১৩৫); বাইহাক্বী, আশ-শু'আব (৩/৩৪৭)] এ বিষয়ে আরও দেখা যেতে পারে, ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, নং ৮১৪; মারওয়াযী, মুখতাসারু কিয়ামিল্লাইল, নং ২১৩; যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/১৬)।

[اللوازم الفاسدة المترتبة على مذهب أهل التجهيل]:

ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علومًا عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا [في هذا] الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطؤون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة، وسائر أصناف الملاحدة.

[أقوال الأئمة في صفات الله تعالى] :

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.

[আহলুত তাজহীল বা তাফওয়ীদকারীদের মতাদর্শ অনেকগুলো বিনষ্ট বিষয় মেনে নিতে বাধ্য করে]

অতঃপর এরা(৩৩৮) এসব বিষয়ে আক্বলী (বুদ্ধি-বিবেকসম্মত) যুক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।(৩৩৯) তারা রাসূল এবং তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহর মা'রেফত তথা তাঁর সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়ে কোনো আকলী (বিবেকগ্রাহ্য যুক্তি) বা সাম'ঈ (কুরআন-হাদীসের) জ্ঞান আছে বলে স্বীকৃতি দেয় না। এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের সাথে তাদের অপরাধের অংশীদার।(৩৪০) তারা রাসূল এবং সালাফে সালেহীনদের দিকে অজ্ঞতার নিসবত করে ভুল করেছে, যেমন ভুল করেছে তাতে বিকৃতিকারী ও অপব্যাখ্যাকারীরা এবং যাবতীয় নাস্তিক সম্প্রদায়।

[আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে প্রথিতযশা ইমামদের বক্তব্য]

আমরা এখানে পূর্বসূরী ইমামদের হুবহু বক্তব্য তুলে ধরব, তাদের বক্তব্যও যারা তাদের মত বর্ণনা করেছে; যতটুকু সম্ভব এ স্বল্প পরিসরে, যাতে এ অধ্যায়ে তাদের মাযহাব স্পষ্টভাবে জানা যায়।

---

৩৩৮. তাফওয়ীদ তথা 'অর্থ জানা যায় না' আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে এ নীতির প্রবক্তারা।

৩৩৯. কারণ তারা মনে এগুলোর অর্থ করা যাবে না, আর যারা বলে এগুলোর অর্থ করা যাবে না, তারা তো আকল বা বিবেকের যুক্তি ও তার দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে পুরোপুরি অচল করে দিয়েছে।

৩৪০. অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে যারা বলে থাকে যে এগুলোর অর্থ জানা যায় না, সেসব 'আহলুত তাজহীল' অনেকটাই তখন প্রথম গোষ্ঠী আহলুত তাখয়ীল (নবী-রাসূলদের আনীত বক্তব্যকে কল্পনার ফসল অপবাদ প্রদানকারী) লোকদের সাথে একাত্মতা পোষণ করেছে। কারণ তারা ওদের মতই মনে করেছে যে, রাসূলের কাছে আল্লাহর যেসব গুণাবলির কথা এসেছে তা কল্পনা ও উদাহরণ পর্যায়ের, ফলে নবী যা বিবেকে কল্পনা করা যায় সেটাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে উপস্থিত করেছে। (নাউযুবিল্লাহ! নবীদের ওপর এতবড় অপবাদ)। তাদের মতই ইতোপূর্বে যাদের আলোচনা গত হয়েছে সেসব দার্শনিকও মনে করে থাকে যে, রাসূলগণ আখেরাতের পুনরুত্থানের ব্যাপারে যা যা বলেছেন সবই পুনরুত্থানকে বুঝানোর জন্য বিবেকের কাছে উদাহরণ পেশ করার মতো। অনুরূপ সেখানে যা যা হবে বা পাবে বলা হয়েছে সবই বিবেকের স্বাদ ও বিবেকের কষ্টকে বুঝানো উদ্দেশ্য। (নাউযুবিল্লাহ) দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩২৮)।

[قول الأوزاعي]:

روى أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته».

فقد حكى الأوزاعي. وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين، الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق

[ইমাম আওযা'ঈ(৩৪১) রাহিমাহুল্লাহর মত]

ইমাম বাইহাকী স্বীয় الأسماء والصفات গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে(৩৪২) ইমাম আওযা'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, "আমরা আর তাবে'য়ীগণ তখনও অনেক ছিলেন, আমরা সকলেই বলতাম: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে এবং হাদীসে আল্লাহর যেসব সিফাত বর্ণিত হয়েছে, আমরা তার প্রতি ঈমান রাখি।"(৩৪৩)

ইমাম আওযা'ঈ যিনি তাঁর যুগের তাবে'য়ীদের চার ইমামের একজন (অর্থাৎ হিজাযের ইমাম মালেক, সিরিয়াবাসীদের ইমাম আওযা'ঈ, মিশরবাসীদের ইমাম লাইস(৩৪৪) এবং

---

৩৪১. তিনি হচ্ছেন আবু 'আমর আব্দুর রহমান ইবন 'আমর ইবন ইয়াহমুদ আল-আওযা'ঈ। ইসলামের বড় ইমামগণের একজন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন আত্বা ইবন আবী রাবাহ, যুহরী, ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর ও অনেক তাবে'য়ী থেকে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন শা'বী, সাওরী, ইবনুল মুবারক প্রমুখ। বারবার তাকে বিচারক পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল আর তিনি বারবার তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শাম দেশে তিনিই প্রথম ইলম লিপিবদ্ধ করেন। তার কাছে প্রচুর হাদীস, ফিকহ ও ইলম ছিল। বরং তিনি তার যমানার সকলের জন্য প্রামাণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

ইমাম মালেক বলেন, আওযা'ঈ এমন ইমাম যার অনুসরণ করা যায়। তিনি শাসকদের নসীহত করতেন। কারও পরোয়া করতেন না। হিজরী ১৫৭ সালে তার মৃত্যু হয়।

ইসমা'ঈল ইবন 'আইয়াশ বলেন, আমি মানুষদেরকে হিজরী ১৪০ সালে বলতে শুনেছি, বর্তমান সময়ে আওযা'ঈ হচ্ছেন উম্মতের আলেম।

মুহাম্মাদ ইবন শু'আইব বলেন, আমি উমাইয়্যাহ ইবন ইয়াযীদকে বললাম, আওযা'ঈ কি মাকহূলের মতো হতে পারে? তখন তিনি বললেন, আওযা'ঈ তো আমাদের নিকট মাকহূল থেকেও উপরে।

ইমাম যাহাবী বলেন, নিঃসন্দেহে তিনি ইলমের প্রশস্ততার দিক থেকে মাকহূলের উপরে। তার একটি মাযহাব প্রসিদ্ধ ছিল, শাম দেশের ও স্পেনের ফকীহগণ এক সময় তার মতের ওপর আমল করতেন।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (৭/৪৮৮); আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৬/১৩৫); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৩/১২৭); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/১০৭); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (১/২৪১)।

৩৪২. এ আসার এর সনদকে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বিশুদ্ধ বললেন। আরও দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬২); অনুরূপ এটাকে ইমাম ইবন হাজারও সহীহ বলেছেন। ফাতহুল বারী (১৩/৪০৬)। ইমাম যাহাবী বলেন, তার বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য, আল-আরশ, পৃ. ৩৮। আর তিনি তাযকিরাতুল হুফফাযে এর সনদকে বিশুদ্ধ বললেন (১/১৮২); ইবনুল কাইয়্যেমও এর সনদকে বিশুদ্ধ বললেন, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৯৭); ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৩১।

৩৪৩. বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩০৪), নং ৮৬৫; আরও দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/১২০-১২১); আল-উলু, পৃ. ১০২; আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৮১; আল-'আরশ, পৃ. ৩৮; তাযকিরাতুল হুফফায (১/১৮২); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৩১; আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৯৭); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪০৬)।

৩৪৪. তিনি হচ্ছেন লাইস ইবন সা'দ ইবন আব্দুর রহমান, আবুল হারেস আল-ফাহমী, আল-ইমাম, মিসর

حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش، وبصفاته السمعية.

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه، والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك.

ইরাকবাসীদের ইমাম সুফিয়ান সাওরী(৩৪৫) তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাবে'য়ীদের যুগে আল্লাহ 'আরশের উপর এবং তাঁর সিফাতসমূহের যা কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে(৩৪৬) তার ওপর ঈমান রাখার ব্যাপারে বক্তব্য সকলের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল।

আর একথা আওযা'ঈ তখন বলেছিলেন যখন আল্লাহর 'আরশের উপর হওয়া ও আল্লাহর অন্যান্য সিফাত অস্বীকারকারী জাহম এর মতাদর্শ প্রকাশ লাভ করে। যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, সালাফদের মতাদর্শ জাহমের মতবাদের বিপরীত।

দেশের আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি হাদীস শুনেছেন আত্বা ইবন আবী রাবাহ, সা'ঈদ আল-মাকবুরী, যুহরী প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন হুশাইম, ইবন ওয়াহাব, ইবনুল মুবারক প্রমুখ। সা'ঈদ ইবন আবী মারইয়াম বলেন, আমি আশি বছরে উপনীত হয়েছি এখনো আমি কোনো বিদ'আতী প্রবৃত্তির অনুসারীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হইনি। ইমাম যাহাবী বলেন, বিদ'আতী ও প্রবৃত্তি পূজারীরা ইমাম লাইস, মালেক, আওযা'ঈর সময় নিবৃত্তে চলে গিয়েছিল। আর তখন সুন্নাতের মর্যাদা সমুন্নত ছিল (যার ফলে তাদেরকে বিতর্ক করতে হয়নি। বর্তমানে বিতর্কের মাধ্যমে তাদেরকে হারানো দীনী ইলম শেখার একটি মূল কারণ; কারণ সংখ্যায় এখন তারাই বেশি)।

খলীফা মানসূর তাকে সেখানকার তার প্রতিনিধি করতে চাইলেন, কিন্তু তা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ও হাত দরাজ ব্যক্তি ছিলেন। তাকে নিয়ে এ ব্যাপারে উদাহরণ পেশ করা হতো।

ইমাম আহমাদ বলেন, মিসরীদের মাঝে লাইসের চেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস আর কারও কাছে নেই। আমর ইবনুল হারেস তার কাছাকাছি পৌঁছে থাকবে।

ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর বলেন, লাইস মালেক থেকে বড় ফকীহ ছিলেন, কিন্তু মালেক এর কিসমত ভালো (অর্থাৎ ছাত্র থাকা)। হারমালাহ বলেন, শাফে'য়ীকে বলতে শুনেছি, মালেক রাহিমাহুল্লাহ থেকে লাইস রাহিমাহুল্লাহ আছার (কুরআন-হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্য) এর অনুসরণ বেশি করতেন। তিনি হিজরী ১৭৫ সালে মারা যান।

দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১৩/৩); ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া (৪/২৮১); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/২২৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/১৩৬); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৮/৪৫৯)।

৩৪৫. তিনি হচ্ছেন সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ ইবন মাসরূক আস-সাওরী। আবু আব্দুল্লাহ আল-কূফী। তার সময়কার পৃথিবীর মানুষের ইমাম। যিনি ইলম, আমল ও পরহেযগারীকে একত্রিত করেছিলেন। ছোটকাল থেকেই ইলম অর্জনে ব্রতী হন। বলা হয়ে থাকে, তার শিক্ষক সংখ্যা ছয়শতেরও উপরে। আর তার থেকে যারা বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা হাজারের উপরে। তার প্রশংসা করেছেন বড় বড় সকল আলেম। যেমন ইমাম আহমাদ, ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ইবন মাহদী প্রমুখ। এমনকি তারা তাকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে, আল-জামে'উ। তার জন্ম ৯৭ হিজরীতে, আর মৃত্যু ১৬১ হিজরীতে।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (৬/৩৭১); আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৬/৩৫৬); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৯/১৫১); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (২/৩৬৮); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/২২৯); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৪/১১১)।

৩৪৬. যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, ইত্যাদি।

[قول مكحول والزهري]:

وروى أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» عن الأوزاعي قال: «سُئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، فقالا: أَمِرُّوها كما جاءت».

[قول الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد]:

ورُوِي أيضًا عن الوليد بن مسلم قال: «سألتُ مالكَ بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن

[মাকহূল(৩৪৭) ও যুহরী(৩৪৮)র বক্তব্য]

ইমাম আবু বকর আল-খাল্লাল 'কিতাবুস সুন্নাহ'তে ইমাম আওযা'ঈ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "মাকহূল ও যুহরিকে সিফাতের হাদীসগুলোর তাফসীর বা ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলেন: যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও।"(৩৪৯)

[ইমাম মালেক, সুফইয়ান আস-সাওরী, আওযা'ঈ ও লাইস ইবন সা'দ এর বক্তব্য]

ওয়ালীদ ইবন মুসলিম(৩৫০) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ইমাম মালেক ইবন আনাস,

---

৩৪৭. তিনি হচ্ছেন আবু 'আব্দুল্লাহ অথবা আবু আইয়্যুব অথবা আবু মুসলিম, মাকহূল আশ-শামী আদ-দামেশকী, আল-ফক্বীহ। জন্ম কাবুল নগরীতে। তিনি আনাস ইবন মালেক, সাওবান, জুবাইর ইবন নুফাইর, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, সুলাইমান ইবন ইয়াসার, শুরাহবিল ইবনুস সামত্ব, মাহমূদ ইবনুর রবী', তাউস প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যুহরী, রাবী'আহ আর-রাই, ইসমা'ঈল ইবন উমাইয়্যাহ, ইসমা'ঈল ইবন আবী বকর, আইয়্যুব ইবন মূসা, হাজ্জাজ ইবন আরতাআ প্রমুখ। ছোট তাবে'য়ীদের অন্তর্ভুক্ত। আবু হাতেম বলেন, শাম দেশে মাকহূল এর থেকে বড় ফকীহ কেউ নেই। যুহরী বলেন, আলেম হচ্ছেন চার জন: সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব মদীনায়, শা'বী কুফাতে, হাসান বসরায় আর মাকহূল শাম দেশে।
মৃত্যু হিজরী ১১০ এর পরে। বুখারী তার জুয আল-কিরাআতে, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবন মাজাহ তার হাদীস তাদের গ্রন্থে আনয়ন করেন। ইবন হাজার বলেন, নির্ভরযোগ্য, ফকীহ, অধিক পরিমাণে ইরসাল করতেন। যাহাবী বলেন, শামবাসীদের ফকীহ তিনি।
দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/১৫৫)।

৩৪৮. তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন শিহাব আয-যুহরী, আবু বকর আল-কুরাশী আল-মাদানী। বড় বড় সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। বিখ্যাত সাত ফকীহগণের একজন। তার থেকে প্রায় দু' হাজার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যুহরী সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, ইমাম যুহরী সত্তর বছর হাদীসের পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। হিজরী ১২৪ সালে মারা যান। তার জন্ম ছিল ৫০ হিজরী সালে।
দেখুন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৩/৩৬০); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/১০৮); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/৩২৬); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৯/৪৪৫); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (১/১৬২)।

৩৪৯. ইমাম লালেকাঈ, শারহু উসূলে ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, ৭৩৫; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৭৭), নং ৯৫৪; তবে তাদের শব্দ হচ্ছে, امضوا الأحاديث على ما جاءت "হাদীসকে যেভাবে এসেছে যেভাবে পরিচালিত করো" উভয় বাক্যের অর্থ একই। আরও দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/১৬২, ৩৩৭, ৩৪৬); আল-উলু, পৃ. ১০২।

৩৫০. তিনি হচ্ছেন আবুল আব্বাস ওয়ালিদ ইবন মুসলিম আদ-দামেশকী। শাম দেশের তৎকালীন সময়ের বড় আলেমগণের একজন। তিনি হাদীস শুনেছেন মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান, ইবন জুরাইজ, আওযা'ঈ প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন লাইস ইবন সা'দ, বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ (তারা উভয়েই তার উস্তাদ), আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াহাব, আবু মিসহার, আহমাদ ইবন হাম্বল প্রমুখ। আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, আমি শাম দেশীয় কাউকে ওয়ালিদ ইবন মুসলিমের চেয়ে বড় বিবেকবান

سعد، والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات؟ فقالوا: أمِرُّوها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمِرُّها كما جاءت بلا كيف».

فقولهم-رضي الله عنهم-: «أمِرُّوها كما جاءت» ردٌّ على المعطلة، وقولهم: «بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين [في زمانهم]، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. ومن طبقتهم حماد بن زيد، [وحماد بن سلمة وأمثالهما].

সুফইয়ান আস-সাওরী, লাইস ইবন সা'দ ও আওযা'ঈকে সিফাতের হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন: যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও।" অন্য বর্ণনায় আছে, তারা বলেন: "এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই কোনো ধরণ নির্ধারণ ছাড়া চালিয়ে দাও।"(৩৫১)

তাদের কথা "যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও" মুআত্তিলাদের (অর্থ নিষ্ক্রিয়কারীদের) মত খণ্ডন করে, আর "কোনো ধরণ বর্ণনা ছাড়া" একথা মুমাসসিলাদের (তুলনাকারীদের) মত খণ্ডন করে। যুহরী ও মাকহূল তাবে'য়ীযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বাকী চারজন তাবে-তাবে'য়ীযুগের দুনিয়ার ইমাম। তাদের স্তরের মধ্যে আছেন, হাম্মাদ ইবন যায়েদ(৩৫২),

---

দেখিনি। হিজরী ১৯৪ বা ১৯৫ সালে তার মৃত্যু হয়।
দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/২১১)।

৩৫১. আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ পৃ. ১৫৯; ইবন মানদাহ, আত-তাওহীদ (৩/১১৫), নং ৫২০; (৩/৩০৭) নং ৮৯৫; সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৫৬; দারাকুত্বনী, আস-সিফাত, পৃ. ৭৫; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ (৩/৫২৭), নং ৯৩; আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৩১৫; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৯৮); ই'তিকাদ, পৃ. ৫৭; ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৫৮); আল-ইন্তিকা, পৃ. ৩৬; ইবন কুদামা, যাম্মুত তা'ওয়ীল, পৃ. ২০; যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১০৫; আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৮২, আল-আসবাহানী, আল-হুজ্জাহ (১/৪৩৮); আবু ইয়া'লা, ইবতালুত তা'ওয়ীলাত (১/৪৭)।

৩৫২. তিনি হচ্ছেন আবু ইসমা'ইল হাম্মাদ ইবন যায়েদ ইবন দিরহাম আল-আযদী। হাদীসের ইমামগণের একজন বড় ইমাম। তিনি হাদীস শুনেছেন আমর ইবন দীনার, সাবেত আল-বুনানী, আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন সুফইয়ান, শু'বাহ (উভয়ে তার শিক্ষক), ইবন মাহদী প্রমুখ। ইবন মা'ঈন বলেন, হাম্মাদ ইবন যাইদের মতো প্রামাণ্য আর কেউ নেই। আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, হাম্মাদ ইবন যায়েদ দীনের মধ্যে মুসলিমদের ইমামগণের একজন। তিনি আমার নিকট হাম্মাদ ইবন সালামাহ থেকে অধিক প্রিয়। আব্দুর রহমান ইবন মাহদী বলেন, আমি সুন্নাত (আদর্শ, আকীদাহ ও মানহাজে) ও হাদীসে অধিক জ্ঞানী যাকেই দেখেছি তাকে পেয়েছি যে সে সুন্নাতে হাম্মাদের ইবন যায়েদ এর মাধ্যমে প্রবেশ করেছে।
হিজরী ১৭৯ সালে তার মৃত্যু হয়। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/৪৫৬)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি দীনের বড় ইমামদের একজন। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৩/৫২৩)]
অন্যত্র তিনি বলেন, হাম্মাদ ইবন যায়েদ বিখ্যাত সুন্নাহ'র ইমামগণের একজন। যার স্তর হচ্ছে, মালেক, সাওরী, আওযা'ঈ, হাম্মাদ ইবন সালামাহ, লাইস ইবন সা'দের সময়কার ও তাদের মত ইমাম হওয়ার দিক থেকে। বরং তিনি সুন্নাহ'র আলেমগণের নিকট সাওরী থেকে সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ। যদিও সাওরী তার থেকে ইলম ও যুহদে বেশি এগিয়ে। আর তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট হাম্মাদ ইবন সালামাহ থেকেও অধিক পরিমাণে হাদীসের হাফেয। যদিও হাম্মাদ (ইবন সালামাহ) তার থেকে পরহেযগারীতে বেশি বিখ্যাত ও সুন্নাহ'র দিকে আহ্বানে বেশি অগ্রণী। তিনি সে সময়কার বসরার ইমাম যখন বসরা ছিল ইসলামের আলেমদের মিলনমেলা। [মাজমূ' ফাতাওয়া

روى أبوالقاسم الأزجي بإسناده عن مطرِّف بن عبد الله، قال: سمعت مالك بن أنس

হাম্মাদ ইবন সালামাহ(৩৫৩) প্রমুখ।

আবুল কাসেম আল-আযজী(৩৫৪) স্বীয় সনদে মুতাররিফ ইবন আব্দুল্লাহ(৩৫৫) থেকে বর্ণনা

(১২/৩২৬)]

৩৫৩. তিনি হচ্ছেন আবু সালামাহ হাম্মাদ ইবন সালামাহ ইবন দীনার আল-বসরী আন-নাহওয়ী, আল-বায্যায, আল-খিরাকী, আল-বাত্বায়িনী, রবী'আহ ইবন মালেক এর পরিবারের মাওলা। ইসলামের বড় ইমামগণের অন্যতম। তিনি হাদীস শুনেছেন ইবন আবী মুলাইকাহ (তিনি তার বড় শাইখ), সাবেত আল বুনানী, কাতাদাহ ইবন দি'আমাহ প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন ইবন জুরাইজ, ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইবন মাহদী প্রমুখ। ওহাইব ইবন খালেদ বলেন, হাম্মাদ ইবন সালামাহ আমাদের নেতা ও আমাদের মধ্যকার বেশি জ্ঞানী। আব্দুর রহমান ইবন মাহদী বলেন, যদি হাম্মাদ ইবন সালামাহকে বলা হয়, তুমি তো আগামী দিন মারা যাবে তাতে তার আমলে আর বাড়ানোর কোনো ক্ষমতা তার নেই (এত বেশি আমল করতেন যে, আর বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই)। যাহাবী বলেন, তিনি ইলমের সমুদ্রের মধ্য হতে একটি সমুদ্র ছিলেন। তবে তার কিছু ওয়াহম বা ধারণা বশবর্তী হওয়া বর্ণনা রয়েছে, যদিও প্রশস্ত বর্ণনার তুলনায় সেটা কিছুই না। তিনি ইনশা-আল্লাহ সাদূক বর্ণনাকারী। তিনি হাম্মাদ ইবন যায়েদের মত এত দৃঢ় ছিলেন না।
হিজরী ১৬৭ সালে তার মৃত্যু হয়। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/৪৪৭)।
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, আমি বিদ'আতী ও মতভেদকারীদের বিপক্ষে হাম্মাদ ইবন সালামাহর মত এত কঠোর কাউকে দেখিনি। অনুরূপ আল্লাহকে আখেরাতে দেখতে পাওয়া ও কাদরিয়া-মু'তাযিলাদের বক্তব্য খণ্ডন করার ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি বর্ণনাকারী কাউকে পাইনি। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৩/৭১৪)।
ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, মু'তাযিলা ফির্কার জাহেয ইমাম হাম্মাদ ইবন সালামাহ ও বসরার কাযী মু'আয ইবন মু'আয এর বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য করতো। অথচ এতে তাদের কোনো দোষ ছিল না। মূল কারণ হচ্ছে, হাম্মাদ ইবন সালামাহ সিফাত সংক্রান্ত হাদীসগুলো জমা করতেন এবং সেগুলোর প্রচার-প্রসার করতেন, আর মু'আয যখন বিচারক হলেন তখন তিনি জাহমিয়্যাহ ও কাদরিয়াদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর বিষয়টি খলীফা হারুন-অর-রশীদের দরবারে উঠল। যখন তিনি হাম্মাদ ইবন সালামার সাথে একত্রিত হলেন আর বিস্তারিত জানলেন তখন খলীফা হারুন তাকে সম্মান করলেন এবং সুন্নাহ'র প্রচার-প্রসারের জন্য তার প্রশংসা করলেন। দেখুন, আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৩৭৫)।
ইবন আবী ইয়া'লা ও ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুমাল্লাহ দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হাম্মাদ ইবন সালামাহ রাহিমাহুল্লাহ সিফাত সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। দেখুন, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৫০); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/১৫৯)।

৩৫৪. তিনি হচ্ছেন আবুল কাসেম আব্দুল আযীয ইবন আলী ইবন আহমাদ ইবনুল ফাদ্বাল ইবন শাকার আল-বাগদাদী আল-আযজী। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন খত্বীব আল-বাগদাদী, কাযী আবু ইয়া'লা প্রমুখ। সিফাত এর তার একটি অগোছালো গ্রন্থ রয়েছে। খত্বীব বলেন, আমরা তার থেকে হাদীস লিখেছি। তিনি সাদূক ছিলেন, অনেক কিতাবের অধিকার ছিলেন। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/১৮)।

৩৫৫. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুত্বাররিফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর আল-হারশী আল-আমেরী আল-বসরী। বড় আলেমগণের একজন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার পিতা, আলী, আম্মার, আবু যর, উসমান প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাসান বসরী, সাবেত আল-বুনানী, ক্বাতাদাহ প্রমুখ। 'ইজলী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। বসরাতে ইবনুল আস'আসের ফিতনা থেকে তিনি এবং ইবন সীরীন ব্যতীত কেউ নাজাত পায়নি। আর কূফাতে খাইসামাহ ইবন আব্দুর রহমান ও ইবরাহীম আন-নাখ'য়ী ব্যতীত কেউ নাজাত পায়নি। (বাকী সবাই আব্দুর রহমান ইবন আস'আস এর ফিতনায় পড়ে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জীবন বিসর্জন দেয়। আলেমগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষমতা না থাকলে বের হওয়াকে ফেতনা বলে অভিহিত করেন। যাহাবী বলেন, তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, তার ছিল পরহেযগারী, বিবেক ও আদব। হিজরী ৯৫ সালে

[إذا ذكر عنده] من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: «سَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب

করেন, তিনি বলেন, "ইমাম মালিকের নিকট যখন এমন কারো বিষয় আলোচনা করা হলো যে সিফাতের হাদীসগুলোকে(৩৫৬) প্রতিহত করে থাকে, তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, "উমার ইবন আবদুল আযীয(৩৫৭) রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী শাসকগণ(৩৫৮) বিভিন্ন

তিনি মারা যান। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/১৮৭)।

৩৫৬. ইমাম আজুররীর আশ-শরী'আহতে এসেছে, 'দীনের মধ্যে পথভ্রষ্টতা অবলম্বনকারীদের কথা আলোচনা করা হলো'। [আশ-শরী'আহ, বর্ণনা নং ৯২, ১৩৯]

৩৫৭. তিনি হচ্ছেন আবু হাফস 'উমার ইবন আব্দুল আযীয ইবন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবন আবিল আস ইবন উমাইয়্যাহ ইবন আব্দশামস ইবন আব্দ মান্নাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব আল-কুরাশী আল-উমাওয়ী আল-মাদানী ও আল-মিসরী। দীনদার, সঠিক পথের পথিক, পরহেযগার খলীফা। তিনি একবার আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ইমামতি করলেন তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি এ যুবকের মতো কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো সালাত আদায়কারী দেখিনি। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও আমানতদার। তার ছিল পরহেযগারী, ফিকহ। অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইনসাফকারী ইমাম ছিলেন, আল্লাহ তার ওপর রহমত করুন ও তার ওপর সন্তুষ্ট হোন।

যাহাবী বলেন, এ লোকটি উত্তম চরিত্রে নমুনা ছিলেন, পূর্ণ বিবেকের অধিকারী ছিলেন, উত্তম চলন, বলন, ভালো প্রশাসক ছিলেন। তার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যতটুকু সম্ভব ইনসাফ কায়েম করবেন। ইলমে ছিলেন পরিপূর্ণ, ফিকহের জ্ঞানে ভরপুর সত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বুঝের দিক সর্বদা ছিল প্রকাশিত। সর্বাদা আল্লাহর কাছে কান্নাকারী ও তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহর জন্য সর্বদা দণ্ডায়মান, একনিষ্ঠ ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি, যদিও তিনি খিলাফতের দায়িত্ব নিযুক্ত। সর্বদা হকের সাথে কথা বলতেন অথচ তার সাহায্যকারী খুবই কম ছিল।

তার মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ১০১ সালে। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/১১৪)।

ইমাম শাত্বেবী বলেন, 'উমার ইবন আব্দুল আযীযের উপরোক্ত বক্তব্য যুগ যুগ ধরে আলেমগণের যত্নধন্য ছিল। তারা তা মুখস্থ করে রাখতেন, মালেক এ বাণীটি খুবই পছন্দ করতেন। দেখুন, আল-ই'তিসাম (১/১৪৫); আল-মুওয়াফাকাত (৪/৪৬১)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, মালেক বহুবার এ বাণীটি 'উমার ইবন আব্দুল আযীয থেকে উদ্ধৃত করেছন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৯/১৭৮)।

কাযী ইয়াদ্ব বলেন, মালেক যখন 'উমার ইবন আব্দুল আযীয থেকে এ বাণীটি উদ্ধৃত করতেন তখন খুশিতে বাগবাগ হয়ে যেতেন। দেখুন, তারতীবুল মাদারিক (১/১৭২)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, মালেক ইবন আনাস সহ ইমামগণ সর্বদা এ বাণীটি অত্যন্ত পছন্দ করে এসেছেন। তারা সেটাকে সর্বদা বর্ণনা করতেন। দেখুন, ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (৬/২৮)।

তাছাড়া ইমাম শাত্বেবী আরও বলেন, এ বাণী সুন্নাত এর অনেকগুলো মূলনীতিকে ধারণ করে আছে। যেমন: বিদ'আতের মুলোৎপাটন, সুন্নাহ'র অনুসারীর প্রশংসা, সুন্নাহ'র বিরোধিতাকারীর নিন্দা ইত্যাদি। দেখুন, আল-ই'তিসাম (১/১৪৫-১৪৬)।

৩৫৮. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফায়ে রাশেদগণ। কারণ অন্যদের সেটার অধিকার নেই। কিন্তু খলীফায়ে রাশেদগণকে অনুসরণ করার জন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে আমার আদর্শ আঁকড়ে ধরা, আমার পরে যেসব খলীফায়ে রাশেদ আসবে, যারা হিদায়াতের ওপর থাকবে ও হিদায়াত করবে, তাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা, সেগুলোকে গোড়ালীর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে।" [আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৬০৭; ইবন মাজাহ, আস-সুনান,হাদীস নং ৪২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭১৪৪; দারেমী, আস-সুনান,

الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين، ولاه الله ما تولّى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا».

সুন্নাত প্রণয়ন করেছেন, সেগুলো ধারণ করা হচ্ছে আল্লাহর কিতাবকে সত্যায়ন করা, তার অনুগত্য পরিপূর্ণ করা, আল্লাহর দীন শক্তিশালী হওয়া। কোনো মাখলুকের সেটা পরিবর্তন করা এবং তার বিপরীত কোনো কিছুর দিকে তাকানো বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এর মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করবে সেই হিদায়াতপ্রাপ্ত। যে তার দ্বারা সহযোগিতা নেয় সেই সাহায্যপ্রাপ্ত। আর যে এর বিরোধিতা করবে এবং মুমিনদের ভিন্নপথ অবলম্বন করবে(৩৫৯) আল্লাহ তাকে সেই দিকে ঘুরিয়ে দিবেন যেদিকে সে ঘুরবে এবং নিক্ষেপ করবে জাহান্নামে। আর তা অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান।"(৩৬০)

হাদীস নং ৯৬; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, আস-সুনান, ৫৪]

ইমাম শাত্বেবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তার উত্তম উত্তরসূরী উম্মতের অভিভাবকগণ (খলীফায়ে রাশেদগণ) যা করবে তা সবই উম্মতের জন্য সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তা কখনও বিদ'আত বলা হবে না, যদিও আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসে সেসব ব্যাপারে বিশেষ কোনো ভাষ্য জানা না যায়। দেখুন, আল-ই'তিসাম (১/১৪৬)।

যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তার ছেলে আব্দুল্লাহকে বলেন, যখন তার কাছে অভিযোগ আসলো যে, ইরাকবাসীদের কিছু লোক তার কাছে কুরআনের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যায় বিবাদ করেছে, তখন তিনি বললেন, "কুরআন অনেক জাতি গোষ্ঠীই পড়েছে, প্রত্যেকেই তাদের প্রবৃত্তি অনুসারে সেটার ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে ভুল করে চলেছে। সুতরাং তারা যখন তোমার কাছে আসবে তখন তুমি তাদেরকে আবু বকর ও 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার রীতি-নীতি দিয়ে বিতর্ক করবে; কারণ তারা এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে আবু বকর ও 'উমার তাদের চেয়ে বেশি কুরআন জানতেন। আব্দুল্লাহ বলেন, এরপর যখন এরা আবার আমার সাথে আবার তর্ক করতে আসলো তখন আমি আবু বকর ও 'উমারের কর্মকাণ্ড দিয়ে দলীল দিতে লাগলাম, তখন আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা আমার সাথে দাঁড়াতেই পারলো না, বসতেই সক্ষম হলো না।" [ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৬২০)]

ইমাম শাত্বেবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরের খলীফাদের কর্মকাণ্ডের দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো, যাতে করে এটা বুঝা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায় যে, এটিই ছিল সর্বশেষ আমল যায় ওপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গিয়েছিলেন, তার ওপর কোনো রহিতকারী বিধান আপতিত হয়নি; কারণ সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন থেকে নতুনতর কর্মকাণ্ডই সর্বদা গ্রহণ করতেন। দেখুন, আল-ই'তিসাম (১/১৪৭)।

৩৫৯. মুমিন বলতে এখানে সাহাবায়ে কিরাম যা গ্রহণ করেছেন সে ইজমা'র কথা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা' গ্রহণ না করে তবে সে নিজেকে ধ্বংসের মুখোমুখি করলো। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা তাই বলেছেন, "আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৫]

৩৬০. আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৭৬৬; ফাসাওয়ী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ, (৩/৪৮৮); ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩৫২-৩৫৩), নং ২৩০, ২৩১; লালেকাঈ, শারহে উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ নং ১৩৪; খত্বীব আল-বাগদাদী, আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (১/৪৩৫-৪৩৬), নং ৪৫৫; ইবন আব্দুল বার, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী (২/৩৫৭), নং ১২১৮।

[قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الاستواء]:

وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة [ثقات] عن سفيان بن عيينة، قال: سُئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه.

[قول الإمام مالك في الاستواء]:

منها: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني، وأبو بكر البيهقي، عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك

[আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার ব্যাপারে রবী'আহ ইবন আবী আব্দির রহমানের বক্তব্য]

ইমাম খাল্লাল বিশ্বস্ত সনদে সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "রবী'আহ ইবন আবী আব্দির রহমান(৩৬১)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আল্লাহর বাণী 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' সম্পর্কে। কীভাবে তিনি উঠেছেন? তিনি বললেন, ইস্তিওয়া শব্দটির অর্থ অজানা নয় (অর্থাৎ উপরে উঠা), কিন্তু 'কাইফ' বা ধরণ বিবেকের আওতা বহির্ভূত।(৩৬২) আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাতের বার্তা এসেছে, রাসূলের ওপর দায়িত্ব স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া, আর আমাদের দায়িত্ব একে সত্য বলে মেনে নেয়া।"(৩৬৩) আর এই একই বক্তব্য রবী'আহ এর ছাত্র মালিক ইবন আনাস থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

[ইস্তেওয়া বা 'আরশের উপর উঠার বিষয়ে ইমাম মালেক এর বক্তব্য]

তন্মধ্যে, যা বর্ণনা করেছেন আবুশ শাইখ আল-আসফাহানী ও আবু বকর আল-বাইহাক্বী রাহিমাহুমাল্লাহ ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া থেকে। তিনি বলেন, আমরা ইমাম মালিক ইবন

---

৩৬১. তিনি হচ্ছেন আবু উসমান রবী'আহ ইবন আবী আব্দির রহমান ফাররূখ, মদীনার মুফতী, তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম। বলা হয়, আবু আব্দির রহমান আল-কুরাশী আত-তাইমী, তাদের মাওলা। যিনি রবী'আ আর-রাই নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আলে মুনকাদির পরিবারের দাস। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, 'আত্বা ইবন ইয়াসার প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, সুলাইমান আত-তাইমী, মালেক ইবন আনাস প্রমুখ।
ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন, রবী'আহ ইবন আবি আব্দির রহমান থেকে সাবধানী কাউকে আমি দেখিনি। উবাইদুল্লাহ ইবন 'উমার বলেন, তিনি আমাদের কঠিন জায়গার লোক, আমাদের আলেম ও আমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ মানুষ। হিজরী ১৩৬ সালে তিনি মারা যান। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৬/৮৯)।

৩৬২. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৩৯৮); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৫১); ঈজলী, তারিখুস সিক্বাত, পৃ. ১৫৮, নং ৪৩১; যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ৯৮, তবে সুফইয়ান সাওরী থেকে। ইবন কুদামা আল-মাক্বদেসী, আল-উলু, পৃ. ১৬৪।

৩৬৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাতের বার্তা এসেছে... এ কথাটি ইমাম রবী'আহ ছাড়াও একাধিক মনিষী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম যুহরী ও আওযা'ঈ। দেখুন, আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া (৩/৩৬৯); সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২৪৯; বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, তা'লীক হিসেবে যুহরী থেকে, কিতাবুত তাওহীদ, অধ্যায় নং ৪৬।

بن أنس، فجاء رجل، فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استوى؟، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرُّحَضاء ثم قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعًا، ثم أمر به أن يُخرج» اهـ.

আনাসের নিকট ছিলাম। তখন এক লোক এসে বলল:

يا أبا عبد الله الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كيف استوى؟، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرُّحَضَاء ثم قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعًا، ثم أمر به أن يُخرج»

"হে আবু আব্দুল্লাহ! "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" কীভাবে তিনি উঠেছেন? ইমাম মালেক তখন মাথা নিচু করে রাখলেন, এমনকি তাঁর উপর ঘামের ফোটা দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন: 'ইস্তেওয়া' অজ্ঞাত নয়, এর 'ধরণ' জানা বিবেক-বুদ্ধির আওতার মধ্যে নয়, এর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব, এর ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।"[৩৬৪]

৩৬৪. কোনো অর্বাচিন মনে করতে পারে যে, মালেক রাহিমাহুল্লাহ সিফাতের আয়াত সম্পর্কে সর্বসাধারণ উম্মতের সাথে কথা বলাকেই অপছন্দ করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে মালেক রাহিমাহুল্লাহ'র ওপর অপবাদ। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সিফাতের আয়াত অনেক বেশি পরিমাণ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে ব্যাপকভাবে আল্লাহর সিফাতের বিস্তৃত বর্ণনা কোনো প্রকার রাখঢাক ছাড়াই করেছেন। সাহাবায়ে কিরামও সিফাতের আয়াত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন। এগুলো দিয়ে ওয়ায করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছেন ও পরিচয় প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীগণও এসব আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের কারও কাছ থেকেই এসব আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে পলায়ণপর মানসিকতার কিছু বর্ণিত হয়নি। তাবে তাবে'য়ীগণ ব্যাপকভাবে তাদের কর্মকাণ্ডে আল্লাহর সিফাতের আলোচনা করতেন। তাদের কারও কাছ থেকেই এভাবে আসেনি যে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে না, তাহলে মালেক রাহিমাহুল্লাহ কেন সিফাতের আয়াত ও হাদীসের আলোচনা অপছন্দ করবেন?

কিছু মানুষ রয়েছে যারা সর্বদা ভুল বুঝ দাঁড় করাতে অভ্যস্ত। তারা একটি স্বাভাবিক স্পষ্ট কথাকেও অস্পষ্ট বানাতে বদ্ধপরিকর। তাদের অন্তরে বক্রতা থাকায় তারা সবকিছুতে বক্রতা পছন্দ করে। তারা আল্লাহর পরিচয় লাভের একমাত্র মাধ্যমকে বিতর্কিত করে মানুষদের কাছে আল্লাহর পরিচয়ের ক্ষেত্রে চোরাগলি নীতি অবলম্বন করতে চায়। ইসলাম কখনও এমন নয় যে তাতে আল্লাহর পরিচয়ের বিষয়টিকে সর্বসাধারণের কাছ থেকে গোপন করতে হবে। এটা তো খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের পরিচয়ের বিষয় নয় যে, সর্বসাধারণের কাছ থেকে গোপন করতে হবে। ইসলামের সবার জন্য সকল আকীদাহ ও শরী'আহ উন্মুক্ত। আর আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়গুলোও এমন নয় যে, তা সাধারণ মানুষের বুঝে আসবে না বা তাদের জন্য ঈমানী ক্ষতির কারণ হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বান্দার হিদায়াত চান, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর উম্মতের জন্য কল্যাণকামী ও স্পষ্টভাষী। যদি আল্লাহর গুণাবলিতে আল্লাহর দীনের জন্য হিদায়াতের বিষয় না হতো তাহলে এগুলো এত ব্যাপক আকারে কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসতো না।

বস্তুত আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের আলোচনা জনসম্মুখে করা যাবে না এমন কথা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমানদার সাধারণ কেউ কোনো দিন বলেনি। ইমামরা তো তা মোটেও বলেননি। এটি মূলত তাদের মত হতে পারে যারা ইসলামী শরী'আতের মৌলিক নীতি ও আকীদাহ থেকে বের হয়ে গেছে যেমন, রাফেযী সম্প্রদায়, জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়, খারেজী হারূরী সম্প্রদায় ও তাদের মত যারা পরবর্তীতে এসেছে সেসব সম্প্রদায়।

কোনো কোনো সালাফ থেকে যদি এসব আয়াত ও হাদীসের আলোচনা সীমিত করার কথা বলা হয়ে থাকে তবে তা ছিল বিশেষ বিশেষ সময়ে, যেমনিভাবে তাদের কেউ কেউ ফিকহ ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসও কখনও কখনও বর্ণনা করা বিরত থাকত। অনুরূপ বিশেষ কোনো সময় তাকদীর এর মাসআলা, ঈমান, বিধি-বিধান ও ধমকিসংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের আলোচনা না করতে দেখা যেত। তাহলে বুঝা গেল, বিশেষ কারণে কেউ কথা না বলার বিষয়টি কেবল আল্লাহর

আমি তোমাকে বিদ'আতী দেখতে পাচ্ছি।(৩৬৫) তখন তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।(৩৬৬)

নাম ও গুণের সাথে সম্পর্কিত নয়, সেটি অন্যান্য অধ্যায়েও বিশেষ কারণে কেউ কেউ কথা বলেনি। তাই আল্লাহর নাম ও গুণের আয়াত ও হাদীসের আলোচনাকে আলাদাভাবে নিষেধ করার কোনো অর্থ হয় না।

তাছাড়া কোনো সঙ্গত কারণে যখন কেউ কেউ কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনা করত না, উক্ত সময়েও সেসব আয়াত ও হাদীসের আলোচনা অন্যরা ঠিকই করেছে। সকলেই যে তা বর্ণনা করা থেকে বিরত ছিল তা নয়। কারণ কারও কারও কাছে হয়ত মনে হতে পারে যে, এসব আয়াত ও হাদীসের আলোচনা করলে ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু অপর আলেমগণের মতে সেগুলোর আলোচনা ক্ষতির কারণ নয় বরং উপকারী বিষয়। সুতরাং কখনও কখনও হয়ত উভয় শ্রেণির লোক এ বিষয়ে বিতর্কও করতে পারে। [দেখুন, আত-তাস'ঈনিয়্যাহ (১/১৪৯-১৫১)]

এ তো গেল সাধারণ কথা। বিশেষ করে ইমাম মালেকের এ বাণীর মাঝে কোনোক্রমেই আল্লাহর গুণাবলি আলোচনা না করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়নি বা আলোচনা করা তিনি অপছন্দ করেননি। বরং ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ তো তা বর্ণনাই করেছেন। তিনি তো বলেই দিলেন যে, এগুলোর অর্থ জানা আছে, ধরণ জানা নেই। যারা ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে কেবল তাদেরকেই বিদ'আতী ও মজলিসে উপস্থিত থাকার অনুপযুক্ত ঘোষণা করেছেন।

হ্যাঁ, এ ব্যাপারে মালেক রাহিমাহুল্লাহ'র জন্য এ ওযর পেশ করা যেতে পারে যে, মালেক রাহিমাহুল্লাহ মনে করেছিলেন, ধরনের কথা উপস্থিত কারও কারও অন্তরে সন্দেহে উদ্রেক করতে পারে, তার বিবেক সমস্যাগ্রস্ত হতে পারে। কারণ সাধারণত মানুষকে যে জিনিস থেকে নিষেধ করা হয় সেটার প্রতি আগ্রহ একটু বেশি হয়ে যায়, কিন্তু সবার তা হয় না। কিন্তু তাই বলে ইমাম মালেক এর কথাকে অপব্যাখ্যা করে এটা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা যে, তিনি আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের আলোচনা করাই পছন্দ করেননি, এমন কথা বলা ইমাম মালেকের ওপর মিথ্যাচার ও তাকে তার পূর্ববর্তী আলেমদের মত ও আদর্শ থেকে ভিন্ন হিসেবে প্রচার করা, যা কখনও ভালো কাজ নয়। কারণ এসব আয়াত ও হাদীসের আলোচনা ইমাম মালেকের চেয়ে যারা মুসলিমগণের নিকট অনেক বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন তারা করেছেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার, আবু হুরায়রা, ইবন আব্বাস, 'আত্বা ইবন আবী রাবাহ। অনুরূপ ইমাম মালেকের সমকক্ষরাও সেসব আয়াত ও হাদীসের আলোচনা করেছে যেমন সুফইয়ান আস-সাওরী, লাইস ইবন সা'দ, সুফইয়ান ইবন উয়াইনাহ। আর নিঃসন্দেহে ইমাম সাওরী হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালেক থেকে বেশি জানেন ও বেশি সংরক্ষণকারী। তিনি এতে মালেকের চেয়েও কম ভুল করেন। যদিও মালেক রাহিমাহুল্লাহ কার থেকে হাদীস নিবেন তা চয়ন করে নিতে সিদ্ধহস্ত। আর লাইস, তিনি তো যেমনটি ইমাম শাফে'য়ী বলেছেন, তিনি মালেকের চেয়েও বড় ফকীহ, তবে তার ছাত্ররা তাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে।

মোটকথা: ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ'র কথাকে অপব্যাখা করে সিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের আলোচনা না করার ব্যাপক নীতি বের করা সর্বৈব মিথ্যা ও নিকৃষ্ট অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। [দেখুন, আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (৩/৯৩৬); আরও দেখা যেতে পারে, ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৫১)...; ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/১০৪)]

৩৬৫. ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বিদ'আতীদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। তিনি তার মজলিসে বিদ'আতীদের বসার অনুমতি দিতেন না। বিদ'আতীদেরকে তার সাথে বিতর্ক করার সুযোগ দিতেন না। তাদেরকে মজলিস থেকে অপমান করে বের করে দিতেন। বস্তুত মদীনা সমাজের লোকেরা কখনও বিদ'আতকে প্রশ্রয় দেয়নি। আর তিনি তাদের মাঝেই বড় হয়েছেন।

৩৬৬. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৩৯৮); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৫০-১৫১); ই'তিক্বাদ পৃ. ৫৬; দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৩৩; আবু ইসমা'ঈল আস-সাবুনী, আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস, পৃ. ১৭-১৯; ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৫১); আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া (৬/৩২৫-৩২৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৮৯-৯০, ৯৫); আল-উলু, পৃ. ১০৩-১০৪। ইবন কুদামাহ, লুম'আতুল ই'তিক্বাদ, পৃ. ৪; ইসবাতি সিফাতিল উলু, পৃ. ১৭২-১৭৩; সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (৩/৪৭৩); বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (১/১৭১০)। ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী এর সনদকে উত্তম বলেছেন, ফাতহুল বারী (১৩/৪০৭)।

[معنى قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول]:

فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول» موافقٌ لقول الباقين: «أمِرُّوها كما جاءت بلا كيف»، فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول»، ولما قالوا: «أمِرُّوها كما جاءت بلا كيف»،

[রবী'আহ্ ও মালেক এর বক্তব্য, 'ইস্তেওয়া অজানা নয়' এ কথার উদ্দেশ্য]

কাজেই রবী'আহ ও মালিকের বক্তব্য: "ইসতিওয়া অজ্ঞাত নয়, এর ধরণ জানা বিবেকের আওতাভুক্ত বিষয় নয়, এর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব।" এটি অন্য ইমামদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল যে, "এগুলোকে তোমরা কোনো ধরণ নির্ধারণ ব্যতিরেকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও।" তারা তো কেবল নাকচ করেছেন সিফাতের কাইফিয়্যাত তথা ধরণ ও পদ্ধতির জ্ঞানকে, মূল সিফাতের বাস্তব অর্থকে নাকচ করেননি।[৩৬৭]

যদি সালাফগণ আল্লাহর শানের সাথে উপযুক্ত যে অর্থ সেটা না বুঝে শুধু কেবল শব্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করতো[৩৬৮] তাহলে[৩৬৯] তারা বলতেন না "ইসতিওয়া অজানা নয়, এর ধরণ বিবেক দিয়ে প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় নয়" এবং বলতেন না "যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও ধরণ (কাইফিয়্যাত) নির্ধারণ ছাড়া।" কেননা "ইসতিওয়া" শব্দটি তখন তো

---

৩৬৭. অর্থাৎ সালাফগণ 'ধরণ' এর জ্ঞান অস্বীকার করেছেন, তারা এর অর্থকে অস্বীকার করেননি। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সালাফে সালেহীন থেকে এ কথা বিখ্যাত যে, মহান আল্লাহর সিফাত এর ব্যাপারে 'কী ধরনের' বা ধরণ কী? তা প্রশ্ন করা যাবে না। অনুরূপ মহান আল্লাহর কর্মের ব্যাপারেও 'কেন'? এ প্রশ্ন করা যাবে না। তিনি আরও বলেছেন, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণ যেমন মালিক রাহিমাহুল্লাহ, তারা বর্তমান সময়ে আমাদের নিকট মহান আল্লাহর সিফাত এর 'ধরণ' জানা না থাকার কথা বলেছেন। তবে 'ধরণ' এর একটি বাস্তব অবস্থা রয়েছে তা কেউ অস্বীকার করেনি। অথচ অনেক জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলা এসব সিফাতের ব্যাপারে তারা যা জেনেছে বা বলেছে তার বাইরে সেগুলোর বাস্তব ও হাকীকতই অস্বীকার করে থাকে। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১৯৭)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সিফাতের হাকীকত ও বাস্তব 'ধরণ' থাকাকে অস্বীকার করেননি। বরং বাস্তব ধরণ জানা থাকাকে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং এসব সিফাতকে তার হাকীকী তথা বাস্তব অর্থেই নিতে হবে, কোনোরূপ রূপক অর্থের পিছনে ছুটা যাবে না। ধরণকে রূপক বানানো যাবে না। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এটাই ইমাম ইবন আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, জামে'উর রাসায়িল (৮/১৮৬)।

৩৬৮. কারণ দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো কুটতর্কের লোক, আরবী ভাষা জ্ঞানে স্বল্পতার অধিকারী ব্যক্তিকে দেখা যায় তারা ইমাম মালিক এ বক্তব্য 'ইস্তেওয়া অজানা নয়' এর অর্থ করছে, ইস্তেওয়া শব্দটি আরবী ভাষার শব্দ, এ শব্দটি অজানা নয়। এর মাধ্যমে তারা বুঝাতে চাচ্ছে এখানে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ অজানা নয়' এটা বুঝাননি। নাউযুবিল্লাহ, শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক করে তারা ইমামদের বক্তব্যের স্পষ্ট ভাষ্যকেও অপব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। এখানে বিরুদ্ধবাদীদের একটি সন্দেহ তুলে ধরা হয়েছে, যায় চারটি জবাব শাইখুল ইসলাম প্রদান করবেন।

৩৬৯. বিদ'আতীদের মধ্যে আহলুত তাজহীল (যারা মনে করে সিফাতের আয়াত ও হাদীসগুলোর অর্থ জানা যায় না') তারা যেহেতু ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ'র বাণীটি থেকে 'অর্থ না জানার' দলীল হিসেবে পেশ করে তাই ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইমাম মালেকের সে বাণীর আলোচনা করেই তাদের কুপোকাত করছেন। এটাকে বলা হয় কালবুদ দলীল।

فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلومًا، بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم.

وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فمن قال: إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش، لا يحتاج أن

জ্ঞাতই হতো না[৩৭০], বরং আরবী বর্ণমালার অর্থের মতো অজ্ঞাতই হতো।[৩৭১]

তেমনি (যদি ইমাম মালেক ও অন্যান্যদের ভাষ্য 'ইস্তেওয়া অজানা নয়' কথা দ্বারা কেবল শব্দটি জানা উদ্দেশ্য হতো) তাহলে (পরবর্তী বাক্যে আসা) কাইফিয়্যত বা 'ধরণ' এর জ্ঞান নাকচ করার প্রয়োজন হতো না, যখন শব্দের অর্থই বুঝা না যায় বা বুঝা যাচ্ছে না। (তখন কাইফিয়্যত বা ধরনের কথা কেন আসবে?) কাইফিয়্যত বা ধরণ এর জ্ঞান নাকচ করার প্রয়োজন তো তখনই হয় যখন সিফাত মেনে নেয়া হয়।[৩৭২]

তেমনি (যদি ইমাম মালেক ও অন্যান্যদের ভাষ্য 'ইস্তেওয়া অজানা নয়' কথা দ্বারা কেবল শব্দটি জানা উদ্দেশ্য হতো) তাহলে যে ব্যক্তি 'সিফাতে খবরিয়্যাহ'[৩৭৩] (তথা আল্লাহ কর্তৃক কুরআনে বা নবীর মাধ্যমে জানানো) এর কোনো সিফাতকে বা সকল সিফাতকে নাকচ করে, তার তো এটা বলার প্রয়োজনই নেই যে, "بلا كيف (কোনো ধরণ নির্ধারণ ছাড়া)।[৩৭৪] যে কেউ বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ 'আরশের উপরে নেই" তার আবার بلا

৩৭০. ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'মালেক রাহিমাহুল্লাহ এটা বর্ণনা করলেন যে, 'ইস্তিওয়া' এর অর্থ জানা আছে। (তা হচ্ছে উপরে উঠা), তার ধরণ অজানা। সুতরাং অজানা ধরণ হচ্ছে সে "তা'ওয়ীল" বা "পূর্ণ বিবরণ" বা "মূলরূপ" যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আর 'ইস্তেওয়া' ও অন্যান্য শব্দ থেকে যা বুঝা যায় তা তো সে 'তাফসীর' যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বর্ণনা করেছেন। [দারউত তা'আরুদ্ব (১/২৮৭)]

অন্য জায়গায় বলেন, 'তিনি বর্ণনা করে দিলেন যে, তাঁর ইস্তেওয়া (তথা উপরে উঠা) এর ধরণ বান্দাদের অজানা। তবে ধরণ নেই এমন কথা বলা হয়নি। বরং বান্দাদের কাছে সেটার জ্ঞান নেই এটাই ঘোষণা করেছেন।' [দারউত তা'আরুদ্ব (২/৩৫)]

৩৭১. এ হচ্ছে প্রথম জাওয়াব। যার মূলকথা হচ্ছে, আরবী বর্ণমালার কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ হয় না। এগুলোর ব্যপারে কারো পক্ষ থেকে বলা হয় না যে, এগুলো অজানা নয়। বরং তারা কেউ এগুলোর অর্থ জানে না। কিন্তু 'ইস্তেওয়া' শব্দটির অর্থ হয় এটা আরবী ভাষা যারা জানে তারা সবাই বলতে বাধ্য। সুতরাং যখন 'ইস্তেওয়া' সম্পর্কে বলা হলো যে, এটি অজানা নয়, তখন সহজেই এটা বুঝা যায় যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য অজানা নয়। বরং এ শব্দগুলোর অর্থই উদ্দেশ্য।

৩৭২. এ হচ্ছে দ্বিতীয় জবাব, যার মূলকথা হচ্ছে, যদি শুধু 'ইস্তেওয়া' শব্দটি জানা রয়েছে' এটা বুঝানো হতো, তাহলে তারপরে 'ধরণ বিবেকের যুক্তির প্রাপ্তির বাইরের বিষয়' এটা বলতেন না। তাই সালাফরা যখন বললো, 'ইস্তেওয়া' অজানা নয়, এর অর্থ দাঁড়ায়, তারা 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝেছে। ধরণ বুঝেননি, যা তাদের পরবর্তী বাক্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

৩৭৩. সিফাতে 'খবরিয়্যাহ' বলতে বুঝায়, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এমন সকল সিফাত বা গুণাবলি। যেমন, 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ, হাশরের মাঠে আগমন, চেহারা, দু' হাত... ইত্যাদি।

৩৭৪. এ হচ্ছে তৃতীয় জবাব, যার মূল কথা হচ্ছে, যদি 'ইস্তেওয়া' শব্দটি জানা রয়েছে' এটা বুঝানো হতো তাহলে অনেকের বক্তব্য, 'তোমরা এগুলোকে চালিয়ে নাও, ধরণ নির্ধারণ ছাড়া', এ মধ্যকার 'ধরণ নির্ধারণ ছাড়া' কথাটি বলা বাহুল্য হতো। কারণ যে জিনিসের অর্থ জানা যায় না তার আবার ধরনের প্রশ্ন কেন আসবে?

يقول: بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف.

[معنى قول الأئمة: أمروها كما جاءت]:

وأيضًا: فقولهم: أَمِرُّوها كما جاءت. يقتضي إبقاء دلالتها على [ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معاني، فلو كانت] دلالتها منتفية لكان الواجب [أن يقال: أَمِرُّوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أَمِرُّوا ألفاظها مع] اعتقاد أن الله لا يُوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا [تكون قد أُمِرّت] كما جاءت، ولا يقال حينئذ: بلا كيف، إذ نفي الكيفية

كيف (কোনো ধরণ নির্ধারণ ছাড়া) বলার প্রয়োজন কি? কাজেই সালাফে সালেহীনের মাযহাব যদি মূলত সিফাতকেই নাকচ করা হতো তাহলে তারা بلا كيف (বা ধরণ নির্ধারণ ব্যতিরেকে কথাটি) বলতেন না।

[ইমামদের বক্তব্য, 'তোমরা সিফাতের আয়াতসমূহকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নাও' এর অর্থ][৩৭৫]

তেমনি[৩৭৬] তাদের বক্তব্য: "সেগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে দাও" এর চাহিদা হচ্ছে, সেগুলো যা বুঝাচ্ছে তার ওপরেই সেগুলোকে রেখে দেয়া। কারণ, সেগুলো এমন শব্দাবলি, যেগুলোর অর্থ আছে। যদি সেগুলোর অর্থ বুঝানো নাকচ করা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে অবশ্যই একথা বলা আবশ্যক হতো যে, এর শব্দগুলোকে এই বিশ্বাস রেখে চালিয়ে দাও যে, এগুলোর অর্থ উদ্দেশ্য নয় অথবা এর শব্দগুলোকে এই বিশ্বাস রেখে চালিয়ে দাও যে, এগুলো যা অর্থ বুঝাচ্ছে আল্লাহ্ সে গুণে গুণান্বিত নন। (যদি এমন কিছু বলা হতো) তবে সেগুলোকে তখন যেমন এসেছে তেমন চালিয়ে দেয়া হতো না। আর তখন এটাও

---

৩৭৫. এখানেও অনেক বিদ'আতী অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। তারা বলে, 'যেভাবে আছে সেভাবে চালিয়ে নাও' এর অর্থ হচ্ছে এসব সিফাতের আয়াত ও হাদীসকে না বুঝে পড়ে চলে যাও। নিঃসন্দেহে তাদের এ বক্তব্য অর্থহীন। কারণ এসব বক্তব্যের ব্যাখ্যা অপর বর্ণনায় এসেছে যে, "তোমরা এগুলোকে ধরণ নির্ধারণ ব্যতীত যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নাও"। আর জানা কথা যে, সালাফদের বক্তব্য পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরস্পর বিরোধী নয়। সালাফদের বক্তব্যকে পরস্পর বিরোধী না বানিয়ে পরস্পর মিল দেখানোই আলেমগণের কাজ। আর যারা পথভ্রষ্ট তারাই সালাফদের বক্তব্যে বিরোধিতা খোঁজা পছন্দ করে। আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে হিদায়াত দেয়ার পর বক্র করে দিবেন না, এ দো'আই করছি।

৩৭৬. এখানে চতুর্থ জবাবটি রয়েছে। আর তার সারমর্ম হচ্ছে, যদি শুধু 'ইস্তেওয়া' শব্দটি জানা রয়েছে' এটা বুঝানো হতো, তাহলে কোনো কোনো ইমামের বক্তব্য 'এগুলোকে সেভাবে চালিয়ে নাও যেভাবে এসেছে' এর সাথে তা যথাযথ হয় না। কারণ চালিয়ে নেয়ার মানেই হচ্ছে অর্থকে চালিয়ে নেয়া। তাদের বক্তব্যের অর্থই হচ্ছে, সিফাত সংক্রান্ত আসা এ ভাষ্যগুলো কিছু জিনিসের ওপর প্রমাণবহ। তাই যখন বলা হলো, এগুলোকে চালিয়ে নাও, তখন তার অর্থ দাঁড়ালো: এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্যকে চালিয়ে নাও। কেননা যদি শব্দ চালিয়ে নেয়া উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এভাবে বলা হতো: 'তোমরা এগুলোর শব্দকে চালিয়ে নাও তবে বিশ্বাস করবে যে এগুলোর দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে তা উদ্দেশ্য নয় অথবা বলা হতো, 'তোমরা এগুলোর শব্দকে চালিয়ে নিবে, তবে বিশ্বাস করবে যে, এগুলো বাস্তবে যেসব গুণের কথা বলছে তা দিয়ে আল্লাহকে গুণান্বিত বলা যাবে না।' আর যদি এরকম কিছু বলা হতো তবে তখন সত্যি সত্যিই এগুলো যেভাবে অর্থবহ বাক্য হিসেবে এসেছে সেভাবে তা চালিয়ে দেয়া হতো না। আর তখন এর পরে আসা 'বিলা কাইফ' বা ধরণ নির্ধারণ ব্যতিরেকে কথাটি বলা যেতো না। কারণ যার কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে 'ধরণ নির্ধারণ করা ছাড়া' কথাটি অর্থহীন বক্তব্যে পরিণত হতো।

عما ليس بثابت لغوٌ من القول.

[قول عبد العزيز بن الماجشون]:

وروى [الأثرم في السنة] وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، [وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم] بإسناد صحيح، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس، وابن الماجشون، وابن أبي ذئب. وقد سئل فيما جحدت به الجهمية:

বলা হতো না যে, بلا كيف (বা ধরণ ব্যতিরেকে) যেহেতু যা প্রমাণিত নয় তা থেকে তার ধরন পদ্ধতি নাকচ করা অনর্থক ও অযথা।[৩৭৭]

[ইমাম আব্দুল আযীয ইবনুল মাজেশূন এর বক্তব্য]

ইমাম আল-আসরাম তাঁর 'আস-সুন্নাহ' কিতাবে, ইবন বাত্তাহ তাঁর 'আল-ইবানাহ' কিতাবে[৩৭৮], আবু আমর ত্বালামানকী এবং অন্যান্যরা বিশুদ্ধ সনদে আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবী সালামাহ আল-মাজেশূন[৩৭৯] থেকে বর্ণনা করেন, আর ইবন মাজেশূন হচ্ছেন মদিনার তিন ইমামের একজন, বাকি দু'জন ইমাম মালেক ও ইবন আবী যি'ব[৩৮০]।

---

৩৭৭. বস্তুত ইমাম মালেক ও তার উস্তাদ রবী'আহ এর বক্তব্য 'ইস্তেওয়া' অজানা নয়, ইস্তেওয়ার 'ধরণ' বিবেক জানতে পারছে না, ইস্তেওয়ার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, ইস্তেওয়ার ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত, এ মহান নীতিটি আল্লাহর সকল গুণাবলির ব্যাপারে সমভাবে প্রযোজ্য একটি কালজয়ী বক্তব্য। আল্লাহর সকল সিফাতের ব্যাপারে এ বক্তব্যটি যথাযথ। এ বক্তব্যটি বিদ'আতীদের গলার কাঁটা। তারা কোনোভাবেই এটাকে সহ্য করতে পারে না। তারা বিভিন্নভাবে এটাকে বিকৃত করে। কিন্তু যেভাবেই বিকৃত করুক না কেন হক প্রকাশিত হবেই।
ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, তাদের কেউ কেউ বলে, এখানে 'ইস্তেওয়া' জানা এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ জানেন। এটা যে কতবড় জাহেল এর বক্তব্য তা পরের 'ধরণ অজানা' কথা থেকেই বুঝা যায়। যদি আল্লাহ জানে এটাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে 'ধরণ অজানা' এর ব্যাপারটি কীভাবে আসল? [দেখুন, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৩/৯৪৫-৯৪৬)]

৩৭৮. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/৬৩), নং ৫৯; ইমাম যাহাবী তা 'আল-উলু' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, পৃ. ১০৫-১০৬; ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/৩১১-৩১২) এবং সহীহ বলেছেন। তাছাড়া তা লালেকাঈ তার শারহু উসূলি মু'তাক্বাদি আহলিস সুন্নাহ (২/৫০২-৫০৩), নং ৮৭৩।

৩৭৯. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবী সালামাহ মাইমূন আত-তাইমী, তাদের মাদানী মুক্ত দাস। সে যুগের ইলম ও ফিকহের বড় ইমাম। যিনি ইমাম ইবনুল মুনকাদির, ওয়াহাব ইবন কাইসান, হিলাল ইবন আবী মাইমূনাহ প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবন ত্বাহমান, যুহাইর ইবন মু'আওয়িয়াহ, লাইস ইবস সা'দ প্রমুখ। খুব বেশি হাদীস বর্ণনা করেননি, তবে ফকীহ ও বাগ্মী ছিলেন। অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ১৬৪ সালে। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/৩০৯)। যাহাবী বলেন, আব্দুল আযীয ছিলেন হিজায অঞ্চলের ইলমের সমুদ্র। খলীফা মানসূরের পক্ষ থেকে মদীনায় একবার ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মানুষদের কাছে মালেক ও আব্দুল আযীয ইবন মাজেশূন ব্যতীত আর কেউ ফতোয়া দিবে না। তার সন্তান আব্দুল মালেক ছিলেন ইমাম মালেক এর বড় ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন, যাহাবী, আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম (২/৯৬৭)।

৩৮০. তিনি হচ্ছেন, আবুল হারেস মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান ইবনুল মুগীরাহ ইবনুল হারেস ইবন আবী যি'ব আল-কুরাশী আল-আমেরী আল-মাদানী। তার সময়কার বড় আলেমগণের অন্যতম। তিনি হাদীস শুনেছেন ইকরিমা, যুহরী, সা'ঈদ আল-মাকবুরী প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস শুনেছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, কাত্তান, ওকী' প্রমুখ। আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেবের মতো। অতঃপর আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইবন আবী যি'ব কি তার মত কাউকে রেখে গেছেন? আহমাদ জবাব দিলেন, না। তারপর আহমাদ বলেন, তিনি মালেক থেকেও উত্তম;

«أما بعد: فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب [العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكَلَّت الألسن عن] تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم تجد مساغًا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أُمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال «كيف» ؟ لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول، ولم يَزَلْ، وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت، ولا يبلى، وكيف [يكون] لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه، ولا

তাকে (ইবনুল মাজেশূনকে) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল জাহমিয়্যাহরা যে সবকিছু অস্বীকার করেছে সেটা সম্পর্কে। জবাবে তিনি বলেন, "অতঃপর অবশ্যই আমি বুঝতে পেরেছি যা তুমি জিজ্ঞেস করেছ, জাহমিয়্যাহ ও তাদের উত্তরসূরীরা মহান রবের সিফাত সম্পর্কে, যেসব বাজে বক্তব্য নিয়ে চড়াও হয়েছে[৩৮১] সে সম্পর্কে যে রবের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও চিন্তার ঊর্ধ্বে, যার গুণের বর্ণনা কোনো জবান সম্পন্ন করতে পারে না, যার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগতির ক্ষেত্রে বুদ্ধি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়[৩৮২], যার মহত্ব বুদ্ধিকে ফিরিয়ে দেয়, ফলে তা কোনো উপায় না পেয়ে ব্যর্থ ও অনুতপ্ত হয়ে ফিরে যায়। তাদেরকে তো কেবল নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে চিন্তা ও গবেষণা করার যেখানে তিনি পরিমিত সৃষ্টি করেছেন[৩৮৩], তার ব্যাপারেই কেবল 'কীভাবে' প্রশ্নটি করা যায় যে একসময় ছিল না, পরে হয়েছে। কিন্তু যিনি কখনো পরিবর্তন ও দূরীভূত হন না, সর্বদাই রয়েছেন, যার মতো কিছুই নেই (তার ব্যাপারে এ প্রশ্ন করা যায় না)। তিনি কেমন তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তাঁর মর্যাদা কীভাবে অবগত হওয়া যাবে, যার শুরু বা সূচনা নেই?[৩৮৪] যিনি মারাও যান না, আবার পুরাতনও হন না। তাঁর গুণের জন্য কীভাবে এমন কিছু সীমা ও সমাপ্তি থাকবে, যা জ্ঞানীরা জানতে পারে বা তার পরিমাণ কোনো বর্ণনাকারী নির্ধারণ করতে পারে?[৩৮৫] বস্তুত তিনিই হচ্ছেন স্পষ্ট হক্ব ও সত্য, তাঁর সত্যতার উপরে কোনো সত্যতা নেই, তার চেয়ে

তবে মালেক তার থেকে হাদীসের লোকদের বাছাই ভালো জানতেন। বস্তুত ইবন আবী যি'ব ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলতে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করতেন না। হিজরী ১৫৮ সালে তার মৃত্যু হয়। কারও কারও মতে হিজরী ১৫৯ সালে।
দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/১৮৩); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/১৩৯); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৯/২০৩)।

৩৮১. আরবী শব্দটি تتايعت হবে, যার উদ্দেশ্য বিবেচনায় উপরোক্ত অর্থ করা হয়েছে।

৩৮২. দেখুন, সূরা আল-মুলক: ০৪।

৩৮৩. মনে হয় এখানে সে হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন যাতে এসেছে, 'تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله' "তোমরা আল্লাহর নি'আমত নিয়ে গবেষণা করবে, আল্লাহকে নিয়ে নয়।" এ হাদীসটি ত্বাবারানী তার আওসাত্বে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৬৩১৯; অনুরূপ বাইহাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে, হাদীস নং ১২০। হাদীসটি সনদ সন্দেহপূর্ণ। শাইখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে তার অন্যান্য বর্ণনা বিবেচনায় হাসান বলেছেন, সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৯৭৫। কিন্তু অনেক মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। আর বাস্তবেও তা দুর্বল।
[দেখা যেতে পারে, http://altameme1.blogspot.com/2013/09/blog-post_9749.html]

৩৮৪. দেখুন, সূরা আল-হাদীদ: ০৩।

৩৮৫. দেখুন, সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৫; সূরা ত্বা-হা: ১১০।

شيء، أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرًا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم وسيد السادات، وربهم ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

اعرف. رحمك الله. غناك عن تكلّف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته، أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلفًا، فقد ﴿اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ﴾ [الأنعام:٧١] فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب

স্পষ্ট কিছুই নেই। তার সিফাত[৩৮৬] বিশ্লেষণে তার সৃষ্টিকুলের কারো বিবেক অক্ষম হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে, বিবেকসমূহ তাঁর ছোট একটি সৃষ্টি[৩৮৭], যা ক্ষুদ্রতায় প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু সেটি চলাফেরা করে, অথচ তার কোনো কান দেখা যায় না, চোখ দেখা যায় না। তদুপরি তার বিবেক কীভাবে কাজ করে ও চিন্তা করে সেটা তোমার কাছে ধরা পড়া তার চোখ ও কানের চেয়ে আরও বেশি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য। সুতরাং সে আল্লাহ কতই না বরকতময় উত্তম স্রষ্টা। আর তিনি তাদের স্রষ্টা, সকল নেতাদের নেতা ও রব, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৩৮৮]

জেনে রাখ, (আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন) আল্লাহ যে সিফাত বর্ণনা করেছেন সেগুলোর পরিমাণ অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি যে অক্ষম, তা-ই তোমাকে যে সিফাত তিনি নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেননি[৩৮৯] সেই সিফাতের ধরণ পাওয়ার বেহুদা চেষ্টা করা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। যখন তার বর্ণিত সিফাতের পরিমাণ অবগত হতে পারোনি তখন তিনি যার বর্ণনা দেননি তা জানার কষ্ট করার দরকার কী তোমার? এর দ্বারা কি তুমি কোনো তার অনুগত্যের পথের সন্ধান চাচ্ছ? না কোনো নাফরমানীর থেকে সাবধান করছো?

অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে যে সিফাত বর্ণনা করেছেন, গভীরতা পাওয়ার দোহাই দিয়ে ও অযথা চিন্তা-গবেষণা করে, তা অস্বীকার করবে তাকে তো, ﴿ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ﴾ [الانعام: ٧١] "শয়তান যমীনে এমন শক্তভাবে পেয়ে বসেছে যে সে দিশেহারা।" [সূরা আল-আন'আম: ৭১] ফলে সে এমন হয়ে গেল যে,

---

৩৮৬. ইবন তাইমিয়্যাহ এর দ্বারা দলীল নিয়েছেন যে, সালাফগণ এগুলোকে সিফাত বলতেন। দেখুন, [আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৪০৪)] আর সিফাতকে তার মাওসূফের সাথেই বলতেন আলাদা বলতেন না। [আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৪১৮)]

৩৮৭. যেমন: মশা, মাছি ও পিঁপড়া।

৩৮৮. সূরা আশ-শূরা: ১১।

৩৮৯. ইবন তাইমিয়্যাহ এর টীকা দিয়ে বলেন, এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাঁর অনেক সিফাত রয়েছে যা তিনি বর্ণনা করেননি। আর তার সিফাত নিজে বানিয়ে বলা যাবে না।

وسمى من نفسه بأن [قال] : لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البَيِّن بالخفي، وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي

আল্লাহ যে সিফাত বর্ণনা করেছেন তা অস্বীকার করার জন্য তার ধারণা অনুযায়ী দলীল পেশ করতে শুরু করছে এবং নিজের পক্ষ থেকে এই বলে নাম দিচ্ছে যে, তার জন্য যদি এইটা থাকে তাহলে তার জন্য এইটা থাকা আবশ্যক।(৩৯০) ফলে সে প্রকাশ্য জিনিস থেকে অন্ধ হয়ে অপ্রকাশ্য জিনিসের সাথে যুক্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ নিজের থেকে যে গুণগুলোর নাম নিয়েছেন তা সে অস্বীকার করে, সেগুলোর দোহাই দিয়ে যেগুলোর নাম নেয়া থেকে তিনি চুপ(৩৯১)

৩৯০. যেমনটি জাহমিয়্যারা বলে থাকে যে, যদি তাঁর গুণাবলি সাব্যস্ত করা হয় তবে তো তাকে দেহ হতে হয় অথবা তার ওপর 'আরদ্ব' আপতিত হয়, তাহলে তো তিনি মুহদাস বা নতুনত্ব গ্রহণকারী হয়ে যাবেন, এসব কথার দাবি ও ধরে নেয়া চিন্তা-চেতনা দিয়ে তারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে থাকে।

৩৯১. আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু না বলাকে 'সামত' বা চুপ থাকা এ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা দোষণীয় নয়। কারণ তা 'ইখবার' বা সংবাদ প্রদান, তা কোনো 'সিফাত' নয়। সিফাত হিসেবে 'সুকূত' বা চুপ থাকা এটা হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন,

১- আবু সা'লাবাহ আল-খুশানী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কিছু ফরয চূড়ান্ত করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলোকে বিনষ্ট করো না... কিছু বিষয় থেকে চুপ থেকেছেন তোমাদের জন্য ছাড় হিসেবে, ভুলে নয়, তোমরা সেগুলোকে খুঁজে বেড়াবে না।"
[হাকেম, আল-মুস্তাদরাক (৪/১২৯); দারা কুতনী (৪/১৮৩); ত্বাবারানী, আল-কাবীর (২২/২২২), নং ৫৮৯; বাইহাক্বী, আল-কুবরা (১০/১২-১৩); বাগদাদী, ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, পৃ. ৯; ইবন হাজার, আল-মাত্বালিব আল-'আলীয়া (৩/৭২), নং ২৯০৯]

২- সালমান আল-ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘি, মাখন খাওয়া ও ফিরা পরিধান করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হালাল তো তা যা আল্লাহ তার কিতাবে হালাল করেছেন, আর হারাম তো তা যা আল্লাহ তার কিতাবে হারাম করেছেন, আর যে ব্যাপারে সুকূত বা চুপ থেকেছেন তিনি তা অবশ্যই ক্ষমার্হ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত।
[তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ১৭২৬; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৩৬৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৪/১২৯); ত্বাবারানী, আল-কাবীর (৬/২৫০, ২৬১), নং ৬১২৪, ৬১৫৯; মুসনাদুশ শামিয়্যীন, হাদীস নং ২০৮৬; বাইহাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা (৯/৩২০), (১০/১২)। হাদীসটি ইমাম তিরমিযীর নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে তা মাওকূফ। আর তিনি মাওকূফ হওয়ার বিষয়টি ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেন]

৩- অনুরূপ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের মানুষ কিছু জিনিস খেতো, আর কিছু জিনিস খেতো না ঘৃণিত মনে করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে পাঠালেন, কিতাব নাযিল করলেন, হারামকে হারাম করলেন আর হালালকে হালাল করলেন, তখন যে সব বিষয়ে তিনি সুকূত বা চুপ করলেন, তাতে সমস্যা নেই, ক্ষমার ওপর থাকলো। আর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "বলুন, 'আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ছাড়া। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উৎসর্গের কারণে'। তবে যে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালঙ্ঘন না করে নিরুপায় হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয় আপনার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-আন'আম: ১৪৫]
[আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৮০০; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৩৪৭); ত্বাহাউই, শারহু মুশকিলিল আসার (২/২২৮), (৮/৪৫০)]

৪- আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, "যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন তা হালাল, আর যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যাতে তিনি সুকূত করেছেন

বা চুপ থেকেছেন তা নিরাপদ; সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদান করা নিরাপত্তা তোমরা গ্রহণ করো; কারণ আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তা নন যিনি বিস্মৃত।" তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "আর আমরা আপনার রবের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে ও পিছনে আছে ও যা এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই। আর আপনার রব্ব বিস্মৃত হন না।" [সূরা মারইয়াম: ৬৪]

[দারাকুতনী (২/১৩৭); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৪০৬); বাইহাক্বী, আস সুনানুল কুবরা (১০/১); আত-ত্বাবারানী, মাসনাদুশ শামিয়্যীন ২১০২]

৫- পূর্বসূরী যে আলেম থেকে সরাসরি আল্লাহর জন্য সুকৃত বা চুপ থাকা গুণটি সাব্যস্ত হয়েছে তিনি হচ্ছেন বিলাল ইবন সা'দ ইবন তামীম আল-আশ'আরী আদ-দিমাশকী। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, ইবাদতগুজার ও উৎকৃষ্ট মানুষ। খলীফা হিশাম ইবন আব্দুল মালেক এ যমানায় মারা যান। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা এখন কথা বলছ, আল্লাহ এখন চুপ আছেন। অচিরেই আল্লাহ কথা বলবেন আর তোমরা চুপ করে থাকবে। তারপর তোমাদের আমল থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকবে যাতে তোমাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। "আর তোমরা সেই দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের যুলুম করা হবে না।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮১] আদ-দুওলাবী, আল-কুনা (২/৪); আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া (৫/২৩১)]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে সুকৃত বা চুপ থাকার গুণে গুণান্বিত করার বিষয়টি সহীহ সুন্নাত ও ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৭৮-১৭৯)] তারপর তিনি বর্ণনা করেন যে, সুকৃত বা চুপ থাকা দ্বারা কখনও কখনও 'কথা বলা থেকে চুপ করা'কে বুঝায়, কখনও কখনও 'কথা প্রকাশ করা ও জানিয়ে দেয়া থেকে চুপ থাকা'কে বুঝায়। যদি আল্লাহ তা'আলাকে এ দু'টি অর্থে সুকৃত বা চুপ থাকার গুণে গুণান্বিত করা হয়, তবে সেটি তাদের বক্তব্যের বিরোধী হয় যারা বলে, 'তিনি মুতাকাল্লিম বা বক্তব্য প্রদানকারী এ অর্থে যে তিনি আলীম বা সব জানেন, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যখন সম্বোধন করেন তখন তিনি বক্তব্য প্রদান করেন না, বরং তিনি তাদের জন্য এমন ধারণ ক্ষমতা সৃষ্টি করেন যাতে তাঁর ক্বাদীম বা পুরাতন কথা শুনতে পান, চাই সেটাকে (ধারণকৃত জিনিসটিকে) শুধু অর্থ বলা হোক, অথবা অর্থ ও বর্ণের সমষ্টি বলা হোক। এটিই মূলত ইবন কুল্লাব ও আশ'আরীর মতবাদ, আর তাদের সাথে একই স্বরে রয়েছে হাম্বলী ও অন্যান্য মাযহাবের অনেক ফকীহ ও আহলে হাদীসের কোনো কোনো ব্যক্তি ও সূফীদের কোনো কোনো গোষ্ঠী। তারা হয় সরাসরি চুপ থাকাকে অস্বীকার করে, আর এটিই তাদের বিখ্যাত মত, অথবা সুকৃত শব্দটি ব্যবহার করে নন, কিন্তু চুপ থাকার অর্থে ব্যবহার না করে সৃষ্টির মাঝে (কাদীম বা পুরাতন) কথা শুনার ক্ষমতা সৃষ্টি না করার অর্থে তা'ওয়ীল করে থাকে। অথচ দলীল প্রমাণাদি সবই তাদেরকে একেবারেই দমিয়ে দেয়.... তারপর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বেশ কিছু দলীল-প্রমাণাদি উল্লেখ করেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৭৯-১৮০)। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর 'চুপ থাকা' গুণটি অস্বীকার করে থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৬৩)।

ইবন কুল্লাবের সাথে একমত হয়ে যারা আল্লাহকে 'চুপ থাকা গুণ' থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ঘোষণা করে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কাযী আবু ইয়া'লা, ইবন 'আক্বীল, ইবনুয যাগূনী প্রমুখ। তাদের মতে আল্লাহর জন্য কোনো কিছু থেকেই চুপ থাকা জায়েয নয়; কারণ কথা বলা ক্বাদীম (পুরাতন) গুণ, যা তার সত্তার সাথে থাকা অবশ্যম্ভাবী, তাদের নিকট তা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তারা আল্লাহর কথা বলার গুণকে আল্লাহর 'হায়াত' বা জীবন গুণের সাথে একই রকম মনে করে থাকে। তাই তাদের নিকট জীবনের মতোই বলা যাবে না, তিনি চাইলে কথা বলবেন, চাইলে চুপ থাকবেন। আর তাদের নিকট এটা বলা জায়েয নেই যে, 'আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয় থেকে চুপ থেকেছেন' যেমনটি হাদীস ও আছারে স্পষ্টভাবে এসেছে। তাই তারা 'চুপ থাকা সাব্যস্তকারী' সেসব হাদীস ও আছারকে 'ধারণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি না করা'র অর্থে নিয়ে গিয়ে অপব্যাখ্যা করে।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, কাযী আবু ইয়া'লা ও তার সমমনা লোকেরা ইবন কুল্লাবের নীতির ওপরে অবস্থান করে ইমাম আহমাদ, হাদীস ও আছারে এসব ব্যাপারে যেসব বাণী ও বক্তব্য এসেছে সেগুলোকে 'না শোনানোর মাধ্যমে চুপ থাকা' এ অর্থে তা'ওয়ীল নামের অপব্যাখ্যা

له الشيطان حتى جحد قول الرب . عز وجل . ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة:٢٢-٢٣] فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه، ونضرته إياهم ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر:٥٥] ، وقد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون.

থেকেছেন।(৩৯২) এভাবে শয়তান তাকে প্ররোচনা দিতেই থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর বাণীকেই ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] "সেদিন কতক চেহারা সতেজ হবে, স্বীয় রবকে দেখবে।" [সূরা আল-হাদীদ: ২২-২৩] অস্বীকার করে বলে: কিয়ামতের দিন কেউ তাকে দেখতে পাবে না।(৩৯৩) ফলে সে অস্বীকার করে আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহ, যা দ্বারা কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর বন্ধুদের সম্মানিত করবেন, তাঁর চেহারা দর্শন করা, তাদের প্রতি তাকানো, ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝﴾ [القمر: ٥٥] "মহান ক্ষমতাধর বাদশাহ'র নিকট যথার্থ আসনে আসীন হওয়ার মাধ্যমে" [সূরা আল-কামার: ৫৫], আর তখন তিনি ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তারা আর মরবে না, তারা

করে। তারা 'কথা বলা থেকে চুপ থাকা' এ অর্থে গ্রহণ করে না (অথচ এটাই হক্ক অর্থ, যা আমরা আগে বর্ণনা করেছি)। দেখুন, শারহুল আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ২৩৮, ২৩৯; মিনহাজুস সুন্নাহ (৩/৩৭০)।

৩৯২. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় টীকা দিয়ে বলেন, 'জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় যা আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন সেগুলোকে অস্বীকার করে, এ অজুহাতে যে এগুলো সাব্যস্ত করলে তো অমুক অমুক হওয়া আবশ্য করে। অনুরূপভাবে তারা আল্লাহ যেসব বিষয়ে চুপ থেকেছেন, কোনো কিছু সাব্যস্ত কিংবা অসাব্যস্ত কোনোটিই করেননি, সেটা সাব্যস্ত করার দাবি হচ্ছে এই বা এই ইত্যাদি তুলে এনে চুপথাকা গুণটি অস্বীকার করে। অথচ তাদের এ দু'টি কাজই পথভ্রষ্টতা।

ইমাম ইবনুল মাজেশূন যেন বিশর আল মিররীসী ও তার মত জাহমিয়্যাহদের একটি প্রাচীন অজুহাত তুলে ধরছেন যাতে তারা বলতো, যদি আল্লাহ 'আরশের উপর হন তবে তো তা দ্বারা তার 'আরশের চেয়ে বড় হওয়া আবশ্যক করে, অথবা ছোট হওয়া আবশ্যক করে.... ইত্যাদি।

৩৯৩. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহকে দেখা, তাঁর চেহারার দিকে তাকানো, সে আনন্দ অনুভব করা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য বড় নি'আমত। কুরআন ও হাদীসে তার অনেক দলীল রয়েছে,

১- আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"যারা ইহসানের সাথে আমল করে (উত্তমরূপে কাজ করে) তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরও বাড়তি। কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা ইউনুস: ২৬] এখানে ('যিয়াদাহ' বা) বাড়তি বলে বিশুদ্ধ তাফসীর মোতাবেক আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানোর কথা বুঝানো হয়েছে। এটিই আবু বকর, হুযাইফাহ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আব্দুর রহমান ইবন আবী লাইলা, মুজাহিদ, ইকরিমাহ প্রমুখদের বক্তব্য। দেখুন, তাবারী (১১/১০৪-১০৭); ইবন কাসীর (৪/১৯৮-১৯৯); মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/১৭৯)।

২- মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে বলেন, 'যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন মহান আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি চাও আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়িয়ে দিই? ... তখন তিনি তাঁর হিজাব বা পর্দা উন্মুক্ত করবেন, আর দেখা যাবে জান্নাতীদেরকে মহান রবের চেহারার দিকে তাকানোর চেয়ে প্রিয় কোনো নি'আমত প্রদান করা হয়নি। তারপর রাসূল তিলাওয়াত করলেন, "যারা উত্তম আমল করবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, আর তার চেয়ে বাড়তি কিছু"। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮১]

তাছাড়া আরও বহু দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে। এ ব্যাপারে 'সহীহ হাদীস বিশ্বকোষ' প্রথম খণ্ডের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدًا.

وقال المسلمون: يارسول الله، هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تُضَارُّون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية

তার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখবে।"

... অবশেষে তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর দেখাকে সে অস্বীকার করছে বিভ্রান্তিকর ভ্রষ্ট দলীল-প্রমাণ দাঁড় করার মাধ্যমে।[৩৯৪] কেননা সে জেনেছে যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন যখন তাদের সামনে প্রকাশ পাবেন তারা তখন তাঁর তাই দেখবে[৩৯৫] যার প্রতি তারা ইতোপূর্বে ঈমানদার ছিল, আর সে ছিল অস্বীকারকারী।

মুসলিমগণ বলেছিল: হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে কি আমরা দেখতে পাবো? রাসূল উত্তরে বলেন:

«هل تُضَارُّون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» .

"মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে দেখতে কি তোমাদের কষ্টবোধ হয়। তারা বলল: না। তিনি

---

৩৯৪. সম্ভবত সে বিভ্রান্তিকর দলীল-প্রমাণ বলতে তাদের অজুহাত বা কথার দাবিসমূহ বুঝানো হয়েছে। যেমন, যারা আল্লাহর দেখাকে অস্বীকার করে তারা বলে থাকে যে, যদি দেখা সাব্যস্ত হয় তাহলে তো আল্লাহ তা'আলা কোনো 'দিকে' হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। অনুরূপ তাহলে তো ... এমন এমন হওয়া আবশ্যক করে...

৩৯৫. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ বাক্যাংশের ওপর টীকা দিয়ে বলেন, 'জাহমি আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে; কারণ সে জানে যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের জন্য নিজেকে প্রকাশ করবেন তখন তারা আগে যে বিষয়ের ওপর ঈমান আনত সেটা তারা দেখতে পাবে। আর সে তো ছিল অস্বীকারকারী। তাই জানিয়ে দেয়া হলো যে মুমিনগণ কিয়ামতের দিন তা দেখবে যা তারা দুনিয়ার বুকে ঈমান আনতো আর জাহমিয়্যারা অস্বীকার করতো। আর জাহমিয়্যাহ বুঝতে পারছে যে কিয়ামতের দিন তাঁকে দেখতে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে সে যা অস্বীকার করেছিল তা সাব্যস্ত হওয়া। তাই সে যে কোনো মূল্যে তা অস্বীকার করে চলেছে। কারণ আল্লাহকে দেখা অবশ্যম্ভাবীভাবে তার কথার দাবির অসারতা প্রমাণ করবে। সে জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহকে দেখার কথা স্বীকৃতি দেয়ার পর জাহমিয়্যাদের কথার দাবি অস্বীকার করার ব্যাপারে জাহমিয়্যাদের সাথে একমত হয়, সে সকল দেখা স্বীকারকারী ও দেখা অস্বীকারকারী সবার নিকটেই স্বাভাবিক বিবেকের যুক্তিকে অস্বীকার করেছে। [আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৪১৯-৪২০)]

এর দ্বারা সম্ভবত ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের মতকে খণ্ডন করছেন। কারণ তাদের নিকট আল্লাহকে আখেরাতে দেখা যাবে তবে সেটা কোনো দিকে নয়। সেটা কেবল অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। নাউযুবিল্লাহ। তাদের মতটি যে বিবেকের দাবি বিরোধী এটা বুঝতে কষ্ট পেতে হয় না। কারণ জাহমিয়্যাদের দ্বারা আল্লাহকে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করার কারণটি হচ্ছে তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহকে দেখতে হলে তাঁর জন্য 'উলূ' বা ঊর্ধ্বে অবস্থান সাব্যস্ত করতে হয়। তাই তারা দেখা ও ঊর্ধ্ব এ দু'টিকেই অস্বীকার করেছে। কিন্তু যে কেউ দেখা স্বীকার করবে কিন্তু দেখার দাবি (উপরে ও ঊর্ধ্বে থাকাকে) অস্বীকার করবে, যেমনটি আশায়েরা ও মাতুরিদিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে থাকে, সে তো প্রকাশ্য স্ববিরোধিতায় লিপ্ত। কীভাবে দিক ব্যতীত দেখার বিষয়টি বিবেকগ্রাহ্য হয়?!

বিস্তারিত দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৩৪৯); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৪৩০); ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ২০০।

القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك».
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول: قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض». وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: «لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة». وقال فيما بلغنا: «إن الله ليضحك من

বললেন: তবে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? তারা বললেন: না। তিনি বললেন: তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের রব্বকে সেদিন এরকম দেখতে পাবে।"(৩৯৬)

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول: قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض».

"জাহান্নাম পূর্ণ হবে তখনই যখন মহা প্রতাপশালী আল-জাব্বার সেখানে স্বীয় পা রাখবেন। তখন সে বলবে: যথেষ্ট যথেষ্ট(৩৯৭) এবং এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে।"(৩৯৮)

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবন কায়েস(৩৯৯)কে বলেছিলেন:

«لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة».

"তুমি গত রাতে তোমার মেহমানের সাথে যা করেছে তাতে আল্লাহ হেসেছেন।"(৪০০)

তিনি আরও বলেন:

«إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم» ، فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ [قال: «نعم» قال: لا نعدم من رب يضحك خيرًا»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবন-জীবিকার সংকীর্ণতা ও নৈরাশ্য এবং তোমাদের

---

৩৯৬. হাদীসটি দেখুন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৬৫৭৩; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮২।

৩৯৭. এখানে আরবী শব্দটি হচ্ছে 'ক্বাত্ব' 'ক্বাত্ব' যা 'কেত্ব' কেত্ব' দুভাবেই পড়া যায়। এর এক অর্থ হচ্ছে যথেষ্ট হয়ে গেছি, যা উপরে অনুবাদ করা হয়েছে অথবা সেটা জাহান্নামের শব্দ। প্রথম অর্থটিই অধিকাংশ আলেমের মত। দেখুন, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৮/৫৯৫)।
কোনো কোনো জাহমী এর ভুল অনুবাদ করতে পারে যে, 'ক্বাত্ব' এর অর্থ কিতাব। ক্বাত্ব শব্দের এ অনুবাদটি আরবী ভাষায় কোনোভাবেই নেই। আর তা কোনো মুহাদ্দিসও বলেননি।

৩৯৮. হাদীসটি পূর্বে তাখরীজ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এটা বলা যায়, হাদীসটি এসেছে, সহীহ বুখারীতে, হাদীস নং ৪৮৪৮, ৪৮৪৯, ৪৮৫০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮৪৮।

৩৯৯. বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তোমার কাজে হেঁসেছেন, তিনি আবু ত্বালহা, যেমনটি মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে। ইবন হাজার এটাকেই সহীহ বলেছেন। [ফাতহুল বারী (৭/১১৯-১২০), (৮/৬৩২)] খত্বীব বাগদাদী বলেছেন সম্ভবত এটি অন্য আবু ত্বালহা, বিখ্যাত যায়েদ ইবন সাহল নয়। কিন্তু ইবন হাজার তা সমর্থন করেননি।

৪০০. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৭৯৮, ৪৮৮৯; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২০৫৪।

أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم»، فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ [قال: «نعم» قال: لا نعدم من رب يضحك خيرًا» في أشباه هذا مما لم نحصه. وقال الله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١]، ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور:٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه:٣٩]، وقال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر:٦٧] . فوالله ما دلَّهم على عِظَم ما وصفه من نفسه، وما تحيط به قبضته [إلا صغر [نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي] ألقى في

দ্রুত সাড়ার কারণে হাসেন। তখন এক বেদুঈন লোক বলল: আমাদের রব কি হাসেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। সে বলল: যে রব হাসেন আমরা তাঁর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবো না।"(৪০১)

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ "আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ১১]

তিনি আরও বলেন: ﴿وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ "তোমরা রবের ফয়সালায় ধৈর্য ধরো; কেননা তুমি আমাদের চোখের সামনে রয়েছে।" [সূরা আত-তূর: ৪৮]

তিনি আরও বলেন: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ﴾ "যাতে সে আমার চোখের সামেনে প্রতিপালিত হয়।" [সূরা ত্বা-হা: ৩৯]

তিনি আরও বলেন: [ص: ٧٥] ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ﴾ "আমি যাকে আমার দু' হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সাজদাহ করতে কিসে তোমাকে বাধা দিল?" [সূরা সাদ: ৭৫]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]

"কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের উর্ধ্বে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৭]

সুতরাং আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি নিজের ব্যাপারে যে ব্যাপক বিবরণ দিয়েছেন আর তার কবজা যা কিছুকে ব্যাপ্ত করে আছে, তার সামান্য নজিরই তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন যেটুকু তাদের কাছে আছে।(৪০২) তিনি তাদের হৃদয়ে সেটা ঢেলে দিয়েছেন, তাদের মনে

---

৪০১. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৮১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৬১১৮৭, ১৬২০১; ত্বায়ালাসী, হাদীস নং ১০৯২; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৫৫৪; ত্বাবারানী, আল-কাবীর (১৯/২০৭), হাদীস নং ৪৬৯; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৪১১), হাদীস নং ৯৮৭। আমার অপর গ্রন্থ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" সেখানে হাদীসটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

৪০২. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন, 'সুতরাং আয়াত যা প্রমাণ করছে তা হচ্ছে সেটাই, যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। এখানে আল্লাহ যে গুণ বর্ণনা

روعهم، وخلق على معرفة [قلوبهم] ، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ماسواه. لا هذا ولا هذا. لا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.

اعلم. رحمك الله. أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافنّ في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبًا، ولا تتكلفنّ لما وصف لك من ذلك قدرًا.

وما أنكرته نفسك، ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك. من ذكر ربك. فلا تتكلفن علمه بعقلك، ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه،

সেটার পরিচয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহ নিজের ব্যাপারে যে বিবরণ দিয়েছেন এবং তার রাসূলের জিহ্বায় (গুণের) যে নাম দিয়েছেন, আমরাও তার মতো করেই (গুণগুলোর সে) নাম দিবো। এটা ছাড়া অন্য কোনো গুণ আমরা কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত করব না। এটাও করব না, ওটাও করব না। অর্থাৎ তিনি যে গুণে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, তা অস্বীকার করব না আর তিনি যে গুণের মাধ্যমে নিজেকে গুণান্বিত করেননি, আমরাও কৃত্রিমভাবে সেটাকে সংযুক্ত করব না।

জেনে রাখ! (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) দীন সংরক্ষিত রাখার উপায় হচ্ছে, তোমাকে দীন যেখানে থামতে বলেছে সেখানে থেমে যাওয়া এবং তোমাকে যে সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে তা অতিক্রম না করা; কেননা দীনের খুঁটি হচ্ছে ভালোকে জানা এবং মন্দকে পরিহার করা। সুতরাং যে ব্যাপারে জানা প্রশস্ত হয়, যাতে অন্তর প্রশান্ত হয়, যার মূল কুরআন-সুন্নাহয় উল্লিখিত, যার জ্ঞান উম্মত পরস্পর ওয়ারিশভাবে লাভ করেছে, সেটা বর্ণনা করতে ও তোমার রবের গুণ উল্লেখ করতে ভয় পেও না ও দোষ মনে করো না। আর যা তিনি স্বল্প পরিমাণ বর্ণনা করেছেন তাতে (বাড়িয়ে বলার মতো) কৃত্রিমতার আশ্রয় নিও না।

আর তোমার মন যা অস্বীকার করে, তোমার রবের কিতাবে যার উল্লেখ পাওনি, অনুরূপ তাঁর নবীর হাদীসেও তার উল্লেখ আসেনি, তোমার রবের সেসব গুণের ব্যাপারে তোমার বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা জানার ভনিতা করো না[৪০৩], তোমার জবানেও তা বর্ণনা করো না। যে

করলেন (যেমন কবজা বা মুষ্ঠি) তার অনুরূপ তাদের কাছে অনেক ক্ষুদ্র। যদি তা তাদের কাছে ছোট হওয়া সত্ত্বেও অনেক বড় হিসেবে প্রকাশ পায় তাহলে আল্লাহ যা বর্ণনা করেননি তার অবস্থা কেমন হতে পারে? তাহলে তার সত্তা কত বড় হতে পারে যা তিনি বর্ণনা করেননি?' [দেখুন, আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৪২০)]

আর যা এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তা হচ্ছে সেই ইয়াহূদী আলেম যখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন... হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সত্যায়ন করে হেসেছিলেন। এখানে ইয়াহূদী আলেমের কথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ বড়ত্ব ও মহত্ব তা থেকে অনেক বড় ও বিশাল। [ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ফুরকান বাইনাল হাক্কি ওয়াল বুত্বলান, পৃ. ৫০৩]

৪০৩. কারণ গায়েবী বিষয়ে বিবেকের যুক্তির কোনো মূল্য নেই।

فإن تكلفك [معرفة] ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم [تكلف] ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد - والله - عزّ المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يُعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم يُنكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما بلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلبُ مسلم، ولا تكلّف صفة قدره ولا تسميه غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم - الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها - لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدًا، ولا يتكلّفون وصفه بما لم يُسم تعمُّقًا، لأن الحقَّ

ব্যাপারে তোমার রব নীরব রয়েছেন সে ব্যাপারে তুমিও তেমনি নীরব থাকো; কেননা তিনি নিজে যার বর্ণনা দেননি তা জানার ভান করা, তিনি যার বর্ণনা দিয়েছেন সেটা অস্বীকার করার শামিল। কাজেই আল্লাহর বর্ণনা দেয়া বিষয় থেকে অস্বীকারকারীরা যা অস্বীকার করে সেটাকে তুমি যেমন বড় করে দেখো, তেমনি যার বর্ণনা তিনি দেননি সেগুলো যারা বর্ণনা করে সেটা জানার কৃত্রিমতাকেও তুমি বড় করে দেখো।

সুতরাং আল্লাহর কসম, খুব কম মুসলিমই পাওয়া যাচ্ছে যারা ভালোকে জেনে গ্রহণ করছে ও তাদের দ্বারাই ভালোকে জানা যাচ্ছে, আর খারাপের নিন্দা করছে ও তাদের অস্বীকারের দ্বারাই খারাপকে চেনা যাচ্ছে।[৪০৪] আল্লাহ নিজে তাঁর কিতাবে তাঁর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নবীর হাদীস থেকে অনুরূপ যা তাদের কাছে পৌঁছেছে, কোনো মুসলিমের অন্তর এটা উল্লেখ করতে ও সে নামে নামকরণ (গুণে গুণান্বিত করতে) রোগগ্রস্ত হয়নি।[৪০৫] অনুরূপ কোনো মুমিনের অন্তর অন্যের বর্ণিত সিফাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করার জন্য কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয় না।[৪০৬]

আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আল্লাহর সিফাত বলে উল্লেখ করেছেন তা আল্লাহর নিজে উল্লেখ করার মতোই। আর সুদৃঢ়পদ আলেমগণ যারা তাদের জ্ঞানের সীমায় থেমে যায়, যারা আল্লাহ নিজের জন্য যে গুণ বর্ণনা করেছেন তাই বর্ণনা করে, আর যা তিনি বর্ণনা করেননি সেটা যারা পরিত্যাগ করে, তারা তাঁর বর্ণিত নাম নেয়া গুণগুলো অস্বীকার করে না। আবার যে গুণ তিনি বর্ণনা করেননি সেটা বর্ণনার ভান করে না; কেননা সত্য হচ্ছে, তিনি যা উল্লেখ করেননি সেটা ত্যাগ করা এবং যে নাম তিনি দিয়েছেন সেই

---

৪০৪. এই যদি হয় ১৬৪ হিজরী সনের কথা, তাহলে বর্তমানে তার অবস্থা কেমন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

৪০৫. অর্থাৎ তারা সেটা উল্লেখ করতে কখনও দ্বিধা করেনি। বরং সেটা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর মারেফত লাভের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

৪০৬. ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن এ লাইনের অর্থ আমি এভাবে উদ্ধার করেছি, এর চেয়ে ভালো কোনো অর্থ কারো জানা গেলে তা প্রতিস্থাপন করার অনুরোধ করা হলো।

ترکُ ما ترك وتسميةُ ما سمَّى ومن يتبع ﴿غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء:١١٥]، وَهَبَ اللهُ لنا ولكم حُكْمًا، وألحقنا بالصالحين اهـ.
وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره، وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية: أنه يلزم أن يكون جسمًا أو [عَرَضًا فيكون] .

নাম দেয়া। আর যে কেউ অনুসরণ করবে,

﴿غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]

"মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!" [সূরা আন-নিসা: ১১৫] আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাদেরকে সৎলোকদের সাথে যুক্ত করুন।[৪০৭]

এসবই ইমাম ইবনুল মাজেশূনের কথা। কাজেই সেটা চিন্তা-গবেষণা করে দেখো: তিনি কীভাবে অন্যান্য ইমামদের সাথে একাত্ম হয়ে কাইফিয়্যাত তথা ধরণ জানা নাকচ করে সিফাতগুলোকে সাব্যস্ত করেছেন?[৪০৮]

আর (দেখুন) তাদের কাজকে তিনি কীভাবে অস্বীকার করলেন যারা সিফাতক এ অজুহাতে নাকচ করার চেষ্টা করে যে, এটা সাব্যস্ত করলে এই এই সমস্যা আবশ্যক হয়, যেমনটি বলে থাকে জাহমিয়্যারা[৪০৯] যে, এতে তাঁর জিসম' (দেহ) হওয়া বা 'আরদ্ব (যৌগিক) হওয়া আবশ্যক হয়। ফলে তিনি মুহদাস (নতুন সৃষ্ট) হয়ে যান।[৪১০]

৪০৭. এ মহৎ বর্ণনাটি নিয়ে এসেছেন:
১- ইমাম ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/৬৩); নং ৫৯; (জাহমিয়্যাহদের খণ্ডন..)
২- ইমাম লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৮৭৩।
৩- ইমাম যাহাবী, আল-উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/৯৬৫-৯৬৭), নং ৩৫১।
৪- ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/৩১১-৩১২)।
৫- ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (২/৩৫-৩৭)।
৬- ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/১৬৬)।
৭- ইবন তাইমিয়্যাহ, আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৪১০)।
তাছাড়া এটি আবু 'উমার আত-ত্বালামাঙ্কীর উসূল আর ইমাম আসরাম এর আস-সুন্নাহতেও এসেছে। কিন্তু উক্ত কিতাবদ্বয় বর্তমানে হারানো কিতাবের অন্তর্ভুক্ত।

৪০৮. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ বড় বক্তব্য পুরোটাই নিয়ে এসেছেন, যার প্রতিটি অংশ প্রমাণ করছে যে, সালাফে সালেহীন আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কখনো কারো প্রশ্নের তোয়াক্কা করেননি। সিফাতের অর্থ সাব্যস্ত করার বিরোধিতা তখন থেকেই জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় শুরু করেছিল। তারা কুরআন ও হাদীসে আসা সিফাতের বর্ণনা দিলে যারা বিবেকের যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন তুলে বা কথার দাবি বর্ণনা করে সেসব সিফাত নাকচ করার অপচেষ্টা করতো, তখন তিনি এ কঠোর বক্তব্য প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা শাইখুল ইসলাম ও ইমাম ইবনুল মাজেশূন উভয়কে জান্নাতের উঁচু মকাম দান করুন। আমীন।

৪০৯. এখানে জাহমিয়্যাহ বলে আল্লাহর সিফাতের অর্থ নিষ্ক্রিয়কারী সকল ফের্কার লোকদের বুঝানো হয়েছে। কারণ জাহমি হওয়া তাদের কমন নাম। সেখানে কারও কাছে এটার পরিমাণ বেশি হতে পারে, আবার কারও কাছে কম হতে পারে।

৪১০. ইবনুল মাজেশূন রাহিমাহুল্লাহ তাদের এসব বক্তব্যকে খণ্ডন করেন, সিফাত সাব্যস্ত করলে এই হওয়া

[আল-ফিকহুল আকবার[৪১১] গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা[৪১২] রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য]

দাবি করে বা এই হওয়া আবশ্যক করে এমন কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

ইবনুল মাজেশূন রাহিমাহুল্লাহ মৌলিকভাবে কয়েকটি জিনিসের ওপর জোর দিয়েছেন:

১- সিফাত সাব্যস্তকরণ: আর তা হচ্ছে, আল্লাহ যা দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অনুরূপ যা দিয়ে তাঁকে তাঁর রাসূল গুণান্বিত করেছেন সেগুলো দিয়ে আল্লাহকে গুণান্বিত করা। এর মাধ্যমেই নিরাপত্তা, প্রশান্তি, অন্তরের বিশুদ্ধতা অর্জিত হবে। আল্লাহর জন্য সম্মান ও মর্যাদা সাব্যস্ত হবে।

২- সিফাত সাব্যস্ত করণের জন্য ভান না ধরা, কৃত্রিমতা অবলম্বন না করা, অযথা ধরণ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো গভীরতায় প্রবেশ না করা। সুতরাং যা সাব্যস্ত হয়নি, কুরআন ও হাদীসে তা সম্পর্কে চুপ থেকেছে তা দ্বারা তাঁকে গুণান্বিত করা থেকে চুপ থাকা। অযাচিতভাবে তাতে প্রবেশ না করা।

৩- কারও কথার দাবি কিংবা প্রশ্নের আশংকায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা থেকে পিছপা না হওয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

৪- বিবেক দিয়ে কিছু সাব্যস্ত করা থেকে দূরে থাকা। কারণ এ সব জায়গায় বিবেকের কোনো কর্তৃত্ব নেই।

৪১১. 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি ইমাম আবু হানীফার দিকে অনেকেই সম্পৃক্ত করে থাকেন। গোঁড়া হানাফীদের অনেকেই সেটা অস্বীকার করে থাকেন। তবে কয়েকটি কারণে তার রচনা ইমাম আবু হানীফা বা তার একান্ত ছাত্রদের হাতে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়:

১- এটির বর্ণনাকারী দু'জন বিখ্যাত হানাফী ইমাম। একজন হচ্ছেন ইমাম আবু হানীফার পুত্র হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন আবু মুতী' আল-বালাখী।

২- হানাফী আলেমগণের অনেকেই তার ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন, ইমাম আবুল লাইস আস-সামারকান্দী, আল-হানাফী। ইমাম মুল্লা আলী আল-ক্বারী। ইমাম আবুল মুনতাহা আহমাদ আল-মিগনিসাওয়ী প্রমুখ।

৩- যুগ যুগ ধরে আলেমগণ এ গ্রন্থকে আবু হানীফার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন অথবা তার একান্ত ছাত্রদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন, আন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (মৃত: ৩৮৪ হিজরী), আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী, (মৃত: ৪২৯ হিজরী) আবুল মুযাফফার আল ইসফারাঈনী (মৃত: ৪৭১ হিজরী), শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারওয়ী, (মৃত: ৪৮১ হিজরী), ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাওয়ী (মৃত: ৪৮২ হিজরী), ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, ইবন তাইমিয়্যাহ, যাহাবী, ইবনুল কাইয়েম, ইবন আব্দুল হাদী, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, মুল্লা আলী আল-ক্বারী, আব্দুল হাই লাখনৌওয়ী, হাজী খলীফা, ইসমাঈল পাশা আল-বাগদাদী; মাহমুদ শুকরী আলূসী।

দেখুন, আন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৫৬; বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ৩০৮; ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (৬/২৬৩); যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১০১; শারহুত তাহাউই (১/৫); লাখনাওয়ী, আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃ. ৬৮; হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন (২/১২৮৭); ইসমাঈল পাশা আল-বাগদাদী, হাদিয়্যাতুল আরেফীন (২/৪৯৫); ব্রকেলম্যান, তারীখিল আদাবিল আরাবী (৩/১৩৭); ফুয়াদ সিযকীন, তারীখুত তুরাস (৩/৩৭); মাহমূদ শুকরী আলূসী, গায়াতুল আমানী (১/৪৪৮); ড. মুহাম্মাদ আল-খুমাইস, উসূলুদ্দীন ইন্দাল ইমাম আবী হানীফা (১/১১৭-১২৩)। যদিও তার অভ্যন্তরে তার অনুসারী মু'তাযিলাদের অপবিত্র হাতের ছোঁয়া না লাগার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। যারা পুরাতন গ্রন্থ পড়তে অভ্যস্ত তারা সহজেই তা বুঝতে পারবেন।

৪১২. তিনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত ইবন যুওত্বা আত-তাইমী আল-কূফী। তাইমুল্লাহ ইবন সা'লাবার মাওলা বা মুক্তদাস। তবে বলা হয়, তিনি পারস্যের স্বাধীন লোকদের সন্তান। ইসলামের বড় ফকীহগণের অন্যতম। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান, জাবালাহ ইবন সুহাইম, 'আদী ইবন সাবিত প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার ছেলে হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা, যুফার ইবনু হুযাইল আত-তামীমী আল-ফকীহ, যায়েদ ইবনুল হুবাব প্রমুখ। আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বসরায় গেলাম, সেখানে তারা এমনসব প্রশ্ন করতে লাগলো যার উত্তর আমার কাছেও নেই। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমৃত্যু হাম্মাদ এর

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة،

الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: «سألت أبا حنيفة عن الفقة الأكبر؟ فقال: لا تكفرن أحدًا بذنب، ولا تنفِ أحدًا به من الإيمان،

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্রদের নিকট প্রসিদ্ধ "আল ফিকহুল আকবর" কিতাবে আছে, যা তারা বিশুদ্ধ সনদে আবু মুতি' আল-হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ আল-বালখী[৪১৩] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

"আমি আবু হানীফাকে আল ফিকহুল আকবর দীনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন:

(১) কোনো পাপের কারণে কাউকে কাফের জানিও না[৪১৪], এর কারণে কারও থেকে ঈমানকে নাকচ করো না।[৪১৫]

মজলিস ছাড়বো না। এভাবে আমি ১৮ বছর তার সাথে সর্বদা ছিলাম।
তিনি হিজরী ১৫০ সালে মারা যান। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৬/৩৯০)।

৪১৩. তিনি হচ্ছেন আবু মুতী' আল-হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-বালখী, ফকীহ। তিনি বলখের বিচারক ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষ বিদ্বান ছিলেন। ইবনুল মুবারক তার খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। ইবন 'আউন, হিশাম ইবন হাসসান প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে আহমাদ ইবন মানী', খাল্লাদ ইবন আসলাম আস-সাফফার ও একদল লোক হাদীস বর্ণনা করেন। মৃত্যু হিজরী ১৯৭, বা ১৯৯ সালে। তিনি ইমাম আবু হানীফা থেকে আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি বর্ণনা করেন। দেখুন, কুরাশী, আল-জাওয়াহিরুল মুদ্বীয়্যাহ ফী ত্বাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ (২/২৬৫)।

৪১৪. অর্থাৎ এমনসব গুনাহ যা সাধারণ কবীরা গুনাহ। কিন্তু বড় শির্ক, বড় নিফাক ও বড় কুফর যখন হবে তখন তা সাধারণ গুনাহ বা ছোট অপরাধ থাকবে না। তখন তাকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুরতাদ ঘোষণা করা হবে। যেমনটি হানাফী মাযহাবের কিতাবেই বর্ণিত আছে।

৪১৫. এর মাধ্যমে তিনি খারেজীদের অবস্থানকে নাকচ করেছেন। কারণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত হচ্ছে, কোনো গুনাহের কারণে আহলে কিবলার কাউকে কাফের না বলা, কোনো আমলের কারণে কাউকে তারা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, যদি সেটি নিষিদ্ধ কাজ হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মদ পান ইত্যাদি। তবে শর্ত হচ্ছে তাতে ঈমান হানির কিছু ঘটবে না। যদি ঈমান ছুটে যাওয়ার অবস্থা হয়ে যায়, যেমন আল্লাহ তা'আলা যার ওপর ঈমান আনতে বলেছে তা ত্যাগ করে বসে, উদাহরণত আল্লাহর ওপর ঈমান, ফিরিশতাদের ওপর ঈমান, কিতাবের ওপর ঈমান, রাসূলগণের ওপর ঈমান, আখেরাতের ওপর ঈমান, তাকদীরের ভালো কিংবা মন্দ লেখা থাকার ওপর ঈমান এগুলোর কোনোটি ছেড়ে দেয় তবে সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি এমন কোনো কিছু বিশ্বাস করে কিংবা মুখে বলে বা এমন কোনো আমল করে তা উপরোক্ত কোনো কিছুর ওপর ঈমানের বিরোধী প্রমাণিত হবে তবে সেও কাফের হবে। তদ্রূপ যদি ইসলামের বিধানসমূহে যা হালাল বলে স্বীকৃত তা হারাম করলে, যা হারাম বলে স্বীকৃত তা হালাল করলে সেও কাফের হবে। তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামের প্রকাশ্য ফরযগুলোর কোনোটি অস্বীকার করে তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৫৪৯), (১২/৪৭৪), (১৬/৪৭৪), (২০/৯০); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৪২৩), (২/১৭, ১৮)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাফে সালেহীন আকীদার পটভূমিতে সর্বদা বলে থাকেন যে, আমরা আহলে কিবলার কাউকে কোনো গুনাহের কারণে কাফের বলি না, কোনো আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে বের করি না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কোনো কোনো মানুষ থেকেও ব্যভিচার, চুরি, মদপান ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে যারা কাফের হয়ে যায় তাদের বিধান প্রবর্তন করেননি। তাদের মাঝে ও মুসলিমদের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও কর্তন করেননি। বরং তিনি তাদের কাউকে বেত্রাঘাত করেছেন, কাউকে রজম করেছেন, কারো হাত কেটেছেন এসব কিছুর পরও তিনি তাদের

وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا [تتبرأ من] أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

(২) সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।

(৩) আর জেনে রাখবে! যা তোমার কাছে এসেছে তা তোমার কাছে না আসার ছিল না, আর যা না এসেছে তা আসার ছিল না।[৪১৬]

(৪) রাসূলের সাহাবীগণের কোনো একজন থেকেও তুমি বিমুক্ত বা সম্পর্কচ্যুত হয়ো না।[৪১৭]

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।" ইসলামের প্রতিটি বিধানই এ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৬৭১)]

৪১৬. এর মাধ্যমে মু'তাযিলা ও কাদরিয়া ফির্কার লোকদের বক্তব্য নাকচ করা উদ্দেশ্য, যারা তাকদীর অস্বীকার করে থাকে।

৪১৭. একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট ও অপমানিত বিষয় হলো, সাহাবায়ে কিরামের কারও ব্যাপারে অপমানজনক কথা বলা বা তাদের কারও সমালোচনা করা, তাদের মর্যাদাহানিকর কোনো কথা বলা। কেননা,

১- আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। [সূরা আত-তাওবাহ: ১০০; সূরা আল-মুজাদালাহ: ২২]

২- সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যেকে আমাদের জন্য ঈমানের মানদণ্ড। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঈমান ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের সাথে নিজেদের ঈমানকে তুলনা করে দেখতে বলেছেন। [সূরা আল-বাকারাহ: ১৩, ১৩৭]

৪- আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম বলে এমনসব লোককে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল, সেটা যত সামান্য সময়ের জন্যই হোক না কেন। [দেখুন, সূরা মুহাম্মাদ: ২৯; সূরা আল-হাদীদ: ১০; সূরা আল-আনফাল: ৬৪, ৭৫; সূরা আত-তাওবাহ: ৮৮; সূরা আত-তাহরীম: ০৮]

৫- সাহাবায়ে কিরামের কারও ব্যাপারে অপমানজনক কথা বলার অর্থ হচ্ছে নিজেকে মুনাফিক হিসেবে দাঁড় করানো। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৫৭২, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৭৫]

৬- সাহাবায়ে কিরামের একজন জীবিত থাকলে তিনি যদি কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, তবে আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দিতেন। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৫৩২]

৭- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের মর্যাদা তাঁকে যারা দেখেনি এমন ভাইদের চেয়ে বেশি নির্ধারণ করেছেন। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৪৯]

৮- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যারা দেখেছে, ঈমান এনেছে, সত্যায়ন করেছে, অনুসরণ করেছে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। [মুসনাদে আহমাদ (৪/১৫২)]

৯- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগের লোকদেরকে উত্তম প্রজন্ম ঘোষণা করেছেন। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৬৫০, ৩৬৫১]

১০- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে উম্মতের জন্য আমানতদার ঘোষণা করেছেন। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৫৩১]

১১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের মাঠে সকলকে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ১৭৩৯, ১৭৪৪১; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৯] এতে যারা কেবল ক্ষণিকের জন্য সে সভায় উপস্থিত ছিলেন তারাও অন্তর্ভুক্ত।

১২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ জানিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম থেকে সকলে রাসূলের হাদীস শুনবে। [আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৬৫৯]

১৩- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সকলের চেহারাকে শুভ্রোজ্জ্বল করার দো'আ করেছেন যারাই তাঁর হাদীস বর্ণনা করবে। [আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৬৬০] সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা এদের সর্বাগ্রে।

১৪- সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার ব্যাপারে কেউ

ولا توالي أحدًا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان [وعليّ إلى الله عز وجل] .

قال «أبو حنيفة» : الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. اهـ.

---

(৫) তাদের একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে বন্ধু বানিও না।[৪১৮]

(৬) আর উসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করবে।"[৪১৯]

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ (অন্যত্র) বলেন:

ইলমের ক্ষেত্রে ফিকহ্ অর্জনের চেয়ে দীনের ক্ষেত্রে ফিকহ্ আকবর উত্তম।[৪২০] আর কোনো ব্যক্তি কীভাবে তার রবের ইবাদত করবে এটা জানা তার জন্য অনেক ইলম অর্জন করা অপেক্ষা উত্তম।"[৪২১]

ঈর্ষা করলে সাহাবায়ে কিরাম তাদের সাবধান করতেন যে, তোমরা তো জান না, হতে পারে তোমরা রাসূলের সাথে বেআদবীর কারণে জাহান্নামে যেতে। তাই তোমাদেরকে সে মর্যাদা দেয়া হয়নি। [বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ: ৮৭] সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহ তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন নবীর সাহচর্যের জন্য।

১৫- সাহাবায়ে কিরামের সাহচর্যের কারণে 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু অনেককে শাস্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতেন। [ইবন হাজার, আল-ইসাবাহ (১/২০-২১)]

অনুরূপভাবে কুরআনে কারীমে সাহাবায়ে কিরামকে উত্তম জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এসব কিছু প্রমাণ করে যে, সাহাবী হওয়ার জন্য ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখাই যথেষ্ট। তাঁর সাথে অনেক দিন থাকার শর্ত কেউ করেনি।

ইমাম লালেকাঈ বলেন, যে কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য নিয়েছে, একবছর, একমাস, এক ঘণ্টা, অথবা তাঁকে একনজর দেখেছেন, অথবা তাঁর কাছে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন, তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে বিবেচিত হবেন। যতটুকু সাহচর্য তিনি নিয়েছেন ততটুকুর জন্যই তিনি সাহাবী। তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে কম সাহচর্য পেয়েছেন তিনি যারা তাঁকে দেখেনি এমন সকলের চেয়ে উত্তম। যদিও পরবর্তীরা তাদের সকল আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তারপরও যিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁকে দেখে দু' চোখ ধন্য করেছেন, যদিও তা ক্ষণিকের জন্য হয়, তিনি সকল তাবে'য়ী থেকে উত্তম, যদিও তাবে'য়ী সব ধরনের কল্যাণমূলক আমল নিয়ে আসুক।

৪১৮. যা শিয়া-রাফেযী ও খারেজীরা করে থাকে।

৪১৯. অবশ্যই উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর থেকে শ্রেষ্ঠ। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এ মাসআলায় তাওয়াক্কুফ বা কোনো সিদ্ধান্ত না দেয়াকে পছন্দ করতেন। এটা তার পক্ষ থেকে ইজতিহাদ ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

৪২০. সম্ভবত ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এখানে আকীদাহ'র গুরুত্ব বেশি দিতে বলছেন। কারণ ইমাম আবু হানীফার সময় পর্যন্ত আকীদাহ ও শরী'আহ আলাদা শাস্ত্র হিসেবে জন্ম নেয়নি। তাই তিনি দু'টোকেই উল্লেখ করলেন, তারপর দীনের 'ফিকহে আকবার' বলতে 'আকীদাহ' অংশ বুঝিয়ে বাকী শর'য়ী মাসায়েলকে 'আল-ফিকহু ফিল ইলম' নামকরণ করেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আকীদাহ'র গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি প্রদান করেছেন। কারণ আকীদাহ বিশুদ্ধ না হলে কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইমামকে আকীদাহ বিশুদ্ধ করার প্রতি তাঁর এ প্রচেষ্টার জন্য জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন।

৪২১. এখানে তিনি দীনী ইলম, বিশেষ করে 'ফিকহ ফিল ইলম' বা শর'য়ী জ্ঞানের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে শর'য়ী জ্ঞান। সম্ভবত তিনি এটা বলে কালামশাস্ত্র বা এ জাতীয় জাগতিক জ্ঞানের অসারতা ও অপ্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করছেন।

قال «أبو مطيع» : قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن، والحدود، واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه.

ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس، فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك؟ . قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف

আবু মুতি' বলেন: আমি বললাম, আমাকে শ্রেষ্ঠ ফিকহ সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি বললেন: মানুষ জানবে ঈমান, শর'য়ী বিধি-বিধান, সুন্নাহ, বিভিন্ন হদ, ইমামদের মতপার্থক্য।

এরপর তিনি উত্তম বক্তব্যের মাধ্যমে উল্লেখ করলেন, ঈমানের বিভিন্ন বিষয়, তাকদীরের বিষয়, কাদরিয়াদের মতবাদ খণ্ডন করার বিষয়। এখানে তা বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ নেই।

অতঃপর বললেন: আমি বললাম, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়, ফলে কতিপয় লোক তাকে অনুসরণ করে, অতঃপর সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বের হয়, তার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? তিনি বললেন, আমি এটা বৈধ মনে করি না।(৪২২) আমি বললাম, কেন? অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে

---

৪২২. ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে প্রসিদ্ধ আছে যে, যালেম ও নিষ্ঠুর শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষে তিনি মত পেশ করতেন। এজন্যই ইমাম আওযা'ঈ বলেছেন, আবু হানীফার সবকিছুই আমরা সহ্য করে যাচ্ছিলাম, অবশেষে তিনি আমাদের জন্য তরবারী উন্মুক্ত করার বিধান প্রদান করলেন। অর্থাৎ যালেম শাসকের বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্ত করা, আমরা সেটা সহ্য করতে পারলাম না।

কারণ আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র মত হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা ফরয, আর তা হতে হবে মুখে। যদি তার কথা মান্য না করা হয় তবে তরবারীর মাধ্যমে ফয়সালা করা হবে। [দেখুন, আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন (১/৮৬-৮৭)]

আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ তার আস-সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, (নং ২৩৩), ইবরাহীম ইবনুশ শামমাস আস-সামারকান্দী বলেন, ইবনুল মুবারককে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, তখন আমরা তার কাছে ছিলাম, আবু হানীফা তো মুরজিয়া ছিলেন, আবার তরবারী উন্মুক্ত করার পক্ষেও মত প্রদান করতেন, তখন ইবনুল মুবারক সে লোকের কথার কোনো জবাব দেননি, বা অস্বীকার করেননি।

এর বিপরীতে অধিকাংশ মুহাদ্দিস আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের মত হচ্ছে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করা। তাদের যুক্তি হলো, এভাবে অস্ত্রধারণের মধ্যে অপকারিতা ও ফাসাদ অনেক বেশি। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কোনো ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে যখনই কেউ বের হয়েছে, তখনই তার দ্বারা কৃত ফিতনা ও ফাসাদ তার দ্বারা অর্জিত কল্যাণের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। [দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ (৪/৫২৭)]

আল্লামা আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লেমী বলেন, "মুসলিমরা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে এতে কেবল অকল্যাণই রয়েছে..." [আত-তানকীল (১/৯৪)] তারপর মু'আল্লেমী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ'র যেসব ভাষ্য থেকে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করা হয়েছে আর যেসব ভাষ্যে বিদ্রোহ করা জায়েয করা হয়েছে তা সর্বজন বিদিত। মুহাক্কিক তথা সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ দু' ধরনের ভাষ্যের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেন যে, যদি দৃঢ় ধারণা হয় যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার যে ক্ষতি তা সে তুলনায় খুবই সামান্য যা দিয়ে অন্যায়কে প্রতিরোধ করা যাবে, তখন বিদ্রোহ করা যাবে নতুবা নয়। আর এ ধারণার ব্যাপারেও দু'জন মুজতাহিদের মাঝে মতভেদ থাকতে পারে। তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মত বেশি গ্রহণযোগ্য যে এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, মানুষের সাথে মিশে বাস্তব অবস্থা জানতে পারবে, যুদ্ধের অবস্থা ও পরিণতির ব্যাপারে যার রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাছাড়া তার রয়েছে মুসলিম দেশের সীমান্তের অমুসলিমদের পাঁয়তারা ও তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ জ্ঞান। [আত-তানকীল (১/৯৪)]

والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟.

قال: كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.

قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة، إلى أن قال: قال «أبو حنيفة»

নিষেধ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এটা অবশ্যম্ভাবী ফরয কাজ। তিনি বললেন, সেটা তুমি যা বলেছ তা[৪২৩], কিন্তু তারা রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে, হারামকে হালাল করার মাধ্যমে যমীনের বুকে যতটুকু সংশোধন করবে তার চেয়ে বেশি বিনষ্ট করবে।[৪২৪]

আরও বলেন...আর তিনি খারেজী ও বিদ্রোহীদের[৪২৫] হত্যার বিষয়ে আলোচনা

---

৪২৩. বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মত থেকে আলাদা দল বের করেছে তাদের কাজের বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হানীফার এ মতটি খুবই জোরালো। মুসলিম উম্মাহকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দলে দলে বিভক্ত না করে তাদের মাঝে সহীহ আকীদাহ ও ইলমের প্রচার-প্রসার করা হলে তার মাধ্যমেই দীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল ছাড়া আর কোনো পথকে দেখে না তারা প্রকৃতই অন্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।" [সূরা আন-নূর: ৫৫]

৪২৪. এর মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ পরবর্তীতে অন্য ইমামদের মতে ফিরে এসেছেন যে, যালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার মধ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। বর্তমানে এটা অনেকাংশেই বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এমন দাঁড়িয়েছে, আপনি জোর করে সেই যালিমকে সরিয়ে দিলেও পরবর্তীতে যে ক্ষমতায় যাবে সে আরও খারাপ ধরনের লোক। যদি কোনো কারণে ভালো কেউ ক্ষমতায় এসে যায় তখন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত তাকে ক্ষমতায় অবস্থান করতে দেয় না। তারা তাদের মত করে কাউকে বসায়, আর তখন যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের জন্য চরম পরিণতি অপেক্ষা করতে থাকে যা মিশর, আলজেরিয়ার অবস্থা থেকে সহজেই যেকোনো বিবেকবান বুঝে নিতে পারে। তাই আমাদের উচিত শাসকের পরিবর্তনের চেয়ে শাসিতদের আকীদাহ-বিশ্বাস, আচার-আচরণ পরিবর্তন করা। এর মাধ্যমে শাসকরাও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে।

৪২৫. খারেজী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য জানা অতীব জরুরী জিনিস। ইবন তাইমিয়্যাহ অনেক কিতাবে এ পার্থক্য তুলে ধরেছেন। শাইখুল ইসলাম বলেন, অনেকের নিকট খারেজী আর বিদ্রোহী একই রকম। তার ওপর ভিত্তি করে তারা বিভিন্ন মাসআলা বের করে নিয়েছে। কিন্তু বস্তুত তা ভুল। কারণ বিশুদ্ধ কথা যার ওপর হাদীসের ইমাম, সুন্নার বিশেষজ্ঞ ও মদীনাবাসী রয়েছেন, যেমন, আওযা'ঈ, সাওরী, মালেক ও আহমাদ ইবন হাম্বল, তা হচ্ছে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। দেখুন, ফাতাওয়া (৮/৫৪৮-৫৪৯)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শরী'আর অনেক গ্রন্থকার ইমাম তাদের গ্রন্থে, যারা আকীদাহ ও আমল বিষয়ক মূলনীতির বাইরে যাওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, যেমন যাকাত অস্বীকারকারী ও খারেজী সম্প্রদায়, এদের সাথে যুদ্ধের বিষয়টিকে, যারা ইমাম বা শাসকের বিরুদ্ধে বের হয়ে যুদ্ধে নেমেছে, যেমন, উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফীনের যুদ্ধ, তাদের সাথে একাকার করে আলোচনা করে থাকেন। এটা নিঃসন্দেহে ভুল। বরং কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা' বলে এ দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। যেমনটি অধিকাংশ ফিকহের ইমাম, সুন্নাহ'র ইমাম, হাদীসের ইমাম, তাসাউফের নেতৃবর্গ, কালামশাস্ত্রের অভিজ্ঞ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বলে থাকে। [মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৪৮৬-৪৮৭)]

অন্যত্র তিনি বলেন, যারা বিধি-বিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তারা বিদ্রোহী ও খারেজীদের একসাথে উল্লেখ করে থাকেন, অথচ বিদ্রোহীদের হত্যা করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস নেই, কেবল কাউসার ইবন হাকীম কর্তৃক নাফে' থেকে বর্ণিত

عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض: فقد كفر؛ لأن الله تعالى

করেন।(৪২৬) অবশেষে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে বলবে আমি জানি

হাদীস ছাড়া, যা বানোয়াট। অপরদিকে হাদীসের ওপর রচিত গ্রন্থাবলি যেমন: সহীহ বুখারী, সুনান গ্রন্থসমূহ সেখানে শুধু মুরতাদ ও খারেজীদের হত্যার কথা বলা হয়েছে; কারণ তারা প্রবৃত্তির অনুসারী। অনুরূপভাবে সুন্নাহ বা আকীদাহ'র কিতাবসমূহে ইমাম আহমাদ ও অনুরূপ ইমামদের থেকে, অনুরূপভাবে আমার ধারণা মতে ইমাম মালেক ও তার সাথীদের গ্রন্থসমূহের কোথাও বিদ্রোহীদের হত্যা করার ব্যাপারে কোনো অধ্যায় বিন্যাস করা হয়নি। তারা তো শুধু মুরতাদ ও প্রবৃত্তির অনুসারী (খারেজী)দের বিষয়ে হাদীস আনার জন্য অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। বস্তুত এটিই হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত মূলনীতি। তা হচ্ছে, যারা শরী'আত ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ইমামের আনুগত্য না করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কুরআন ও সুন্নাহ'র কোনো ভাষ্যে তা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। সুতরাং এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা জরুরী। [ফাতাওয়া (৪/৪৫১)] অনুরূপ আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২০/৩৯৫), (২৮/৫০৩-৫০৪, ৫৪১)।

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে খারেজী ও বাগী বা বিদ্রোহীদের মধ্যে পার্থক্য কী সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি অত্যন্ত প্রশস্ত উত্তর প্রদান করেন, যাতে অনেক উপকারী তথ্য রয়েছে। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৩৫/৫৩) ও তার পরের পৃষ্ঠাসমূহ]

৪২৬. রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বের হওয়া বলতে সাধারণত বুঝায়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা ও অস্ত্র নিয়ে বের হওয়া। এটির হুকুম বিভিন্ন প্রকার: কখনও কখনও হারাম হবে, আবার কখনো সেটা ওয়াজিব হবে, আবার কখনো কখনো সেটা মাকরূহ হবে, কখনও মুস্তাহাব হবে, কখনো সেটা জায়েয হবে। সর্বদা একই বিধান হবে না। সেটা অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন হতে বাধ্য।

বিষয়টির আলোচনা কয়েক পর্যায়ে হতে পারে:

এক. রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বের হওয়া গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ:

রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বের হওয়ার সাধারণ সূরত ৪টি:

১- খারেজী সম্প্রদায়: তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ ও মৌলিক আমল বিরোধী হওয়ায় প্রবৃত্তি অনুসরণ করে রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বের হয়। তারা সাধারণত কবীরা গুনাহকারীকে কাফের বলে, যালিম শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়া সর্বাবস্থায় ফরয মনে করে। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা রয়েছে।

২- বাগী বা বিদ্রোহী সম্প্রদায়: যারা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য কোনো গ্রহণযোগ্য তা'ওয়ীল বা ব্যাখ্যা কিংবা অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সহকারে বের হয়েছে। অনুরূপ যারা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক, দলীয় গোঁড়ামী কিংবা দুনিয়া লাভ করার জন্য বের হবে। তাদের সাথে প্রথমেই যুদ্ধ করা হবে না, বরং ইমাম ও তাদের মাঝে মীমাংসার চেষ্টা করা হবে, যদি তাদের ওপর কোনো যুলুম হয় সেটা তুলে নিতে হবে, যদি তাদের হক হয় তাদের দিতে হবে, যদি তাদের কোনো সন্দেহ থাকে তবে তাদের থেকে তা নিরসন করতে হবে। অবশেষে যুদ্ধ হবে, যা সূরা আল-হুজুরাতের ৯নং আয়াতে এসেছে।

৩- ডাকাতী, হানাহানি রাহাজানিকারী সন্ত্রাসী সম্প্রদায়: যারা যমীনের বুকে ফিতনা করার জন্যই বের হয়, যদি তাদের ক্ষমতা বেশি হয়ে যায়, তবে রাষ্ট্রপ্রধানের উচিত তাদের পাকড়াও করে তাদের ওপর হিরাবাহ এর বিধান প্রয়োগ করা যা সূরা আল-মায়িদাহ এর ৩৩নং আয়াতে এসেছে। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরানীদের সাথে আচরণ করেছেন। আর যদি রাষ্ট্রপ্রধান তা করতে সমর্থ না হন তবে জনগণ তাদেরকে নিজেদের ক্ষমতাবলে পাকড়াও করতে পারবেন।

৪- হকপন্থী লোকেরা যখন হক প্রতিষ্ঠার জন্য যালিম, ফাসেক ও কাফের শাসকের বিরুদ্ধে বের হয়, তখন সে বের হওয়াকে বিদ্রোহ বলা যাবে না। যেমনটি মদীনাবাসীরা করেছিল ইয়াযীদের প্রশাসনের বিরুদ্ধে, আলেম ও ক্বারীরা বের হয়েছিল হাজ্জাজের বিরুদ্ধে। বিশুদ্ধ মতে, তখন যারা তেমন শাসকের বিরুদ্ধে বের হবে, সে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। [ইবন হাজার: ফাতহুল বারী (১২/২৮৬); ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা (১০/৫০৮)]

এ অবস্থায় সংক্ষেপে যে বিধান হবে তা হচ্ছে,

- যদি ইমাম যালিম বা ফাসেক হয়, আর তার বিরুদ্ধে যে বা যারা বিদ্রোহ করে তারা যদি ইনসাফকারী হয়, তাহলে ইনসাফকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কারও জন্য জায়েয হবে না।
- আর যদি ইমাম ইনসাফকারী হয়, আর তার বিরুদ্ধে ইনসাফকারী লোকই বিদ্রোহ করে বসে, তবে এ অবস্থার যুদ্ধকে বলা হবে ফিতনার যুদ্ধ। এ অবস্থায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করা উত্তম হবে। কারণ এ অবস্থায় যুদ্ধ না করার ব্যাপারে প্রচুর শর'য়ী ভাষ্য রয়েছে। আর তখন রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করে, (যদিও তিনি ইনসাফকারী হন), ন্যায়পরায়ণ বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কারও জন্য জায়েয হবে না। কারণ তা ফিতনার যুদ্ধ। তবে কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে মিলে যুদ্ধ করা সবার ওপর অবশ্য কর্তব্য রাষ্ট্রপ্রধান নেককার হোক বা বদকার।

দুই. শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়ার ক্ষেত্রে শাসকদের অবস্থা:

১. যদি শাসক কাফের হয়, যার কুফরীর ব্যাপারে প্রমাণ স্পষ্ট হয়, তখন তার বিরুদ্ধে বের হওয়া মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়, তবে শর্ত হচ্ছে,
   ক- সমস্যা দূর করা কিংবা কমিয়ে ফেলার ক্ষমতা থাকতে হবে।
   খ- সমস্যা যা আছে তার চেয়ে বড় ফিতনা কিংবা তার সম পর্যায়ের ফিতনাতে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা মুক্ত থাকতে হবে।
   গ. যদি শর্ত পূরণ করা সম্ভব না হয়, তবে সেখানে ধৈর্যের সাথে অনুকুল অবস্থার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

২. যদি শাসক যালিম হয় বা ফাসেক হয়, তখন তার বিরুদ্ধে বের হওয়া যাবে কি না এ ব্যাপারে সালাফদের মাঝে দু'টি মত রয়েছে:
   ক. বের হওয়া যাবে। এটি হানাফী, মালেকী ও শাফে'য়ী মাযহাবের ইমামগণের মত। এর পক্ষে যেমন কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য অনেক তেমনি যুক্তি ও ঐতিহাসিক ঘটনাও কম নয়।
   খ. বের হওয়া যাবে না। ইমাম আহমাদ ও পরবর্তী আলেমগণের ঐকমত্য। এ ব্যাপারেও কুরআন, হাদীস ও ইতিহাসের শিক্ষা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে।

দলীল প্রমাণাদি বিশ্লেষণপূর্বক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, যালিম শাসকের বিরুদ্ধে বের হতে হলে কতগুলো শর্ত পাওয়া যেতে হবে:

- সম্পূর্ণভাবে দূর করা ও সেখানে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ থাকতে হবে।
- যুলুম ও ফাসাদ কম করা সম্ভব হতে হবে যদিও তা পুরোপুরি দূর না হয়।

আর যদি তাকে রাখা ও তার বদলে যাকে আনা হবে সেখানে কোনো দৃশ্যমান পার্থক্য সূচিত না হয় তাহলে বিদ্রোহ না করাই উত্তম কাজ হবে। তখন ধৈর্য্য ধারণ করে অনুকুল সময়ের অপেক্ষায় দীন ও ঈমানের চর্চা করতে হবে।

কিন্তু যদি দেখা যায়, তাকে তাড়াতে গিয়ে আরও বড় ধরনের সমস্যা আসবে, তখন তা করা একবাক্যে হারাম হবে।

সুতরাং যদি সেসব শর্ত পূরণ করা সম্ভব না হয়, তবে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে বের না হওয়াই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুসলিমরা শাসকের বিরুদ্ধে বের হয়ে আরও বড় বিপদ ডেকে এনেছে, যেমন:

১- উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বিরুদ্ধে বের হয়ে সমস্যা বেশি তৈরি করেছে।
২- উষ্ট্রীর যুদ্ধের পরিণতি হচ্ছে খিলাফত ধ্বংস হওয়া ও বনি উমাইয়ার রাজত্ব কায়েম হওয়া।
৩- হুসাইন ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বিয়োগান্ত ঘটনার উদ্ভব হওয়া।
৪- মদীনাবাসীরা হাররার যুদ্ধে বের হয়ে শুধু মৃত্যু আর অপমানই ডেকে এনেছে।
৫- ইবনুল আস'আছ এর সাথে ক্বারী ও আলেমরা হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বের হয়ে বিশাল বিপর্যয় ডেকে এনেছে।
৬- যাইদ ইবন আলীর ঘটনা আজও সকলকে অসম অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। [মু'আল্লেমী, আত-তানকীল, (১/৯৪)]
৭- রাসূলের পরিবার থেকে ২৫ জন বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু তাদের কোনো উপকার হয়নি, জাতিরও হয়নি। [আবুল হাসান আল-আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন (১/১৫১-১৬১)]

يقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] وعرشه فوق سبع سماوات.

قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟

قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وانه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ. سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض.

قال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] وعرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول: ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.

না আমার রব আসমানে নাকি যমীনে? সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বলেন: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝﴾ [طه: ٥] "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫] আর তাঁর 'আরশ সাত আসমানের উপরে।

আমি [আবু মুতি'] বললাম, যদি সে বলে, নিশ্চয় তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন কিন্তু আমি জানি না 'আরশ কি আসমানে নাকি যমীনে? তিনি বললেন: সে কাফের হবে; কেননা সে আল্লাহর আসমানে থাকাকে অস্বীকার করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যত উপর আছে তত উপরের উপরে। আর তাকে উপরের দিকে ডাকা হয়, নিচের দিকে নয়।

অন্য শব্দে এসেছে, আমি আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যে বলে: আমি জানি না আমার রব আসমানে না যমীনে। তিনি বললেন: সে অবশ্যই কাফের হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ বলেন: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝﴾ [طه: ٥] "রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫] আর তার 'আরশ সাত আসমানের উপরে।

তিনি আরও বলেন, সে বলে তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, কিন্তু সে জানে না, 'আরশ যমীনের উপর নাকি আসমানের উপর, তার উত্তরে আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, যদি সে আল্লাহ তা'আলাকে আসমানের উপর হওয়া অস্বীকার করে, তবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে।[৪২৭]

---

৪২৭. আল-ফিকহুল আকবার, বর্ণনায় আবু মুতী' আল-বালখী, পৃ. ৪০, ৪৪, ৪৯-৫০; তাহকীক: যাহেদ আল-কাউসারী, (একটি গ্রন্থসমগ্রের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থ, যাতে আলেম ওয়াল মুতা'আল্লিম রয়েছে, যা আবু মুক্বাতিল আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ তাতে রয়েছে উসমান আল-বাত্তির কাছে লেখা আবু হানীফার চিঠি) মুদ্রণ ১৩৬৮, মাতবা'আতুল আনওয়ার, কায়রো। মাকতাবাতুল খানজী কর্তৃক প্রচারিত।

আরও দেখুন, শারহুল ফিকহুল আকবার, আল-মাতুরিদী, পৃ. ২, ৬, ১৪, ১৭। (একটি গ্রন্থসমগ্রের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থ, যাতে আকীদাহ'র সাতটি বিখ্যাত রিসালাহ রয়েছে। মুদ্রণ দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, হায়দরাবাদ, আদ-দাকেন, হিন্দ।

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ ভাষ্যটি আরও যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন, শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল হারাওয়ী (মৃত: ৪৮১ হিজরী) তার আল-ফারুক গ্রন্থে, অনুরূপ ইবনুল কাইয়্যেম তার ইজতিমা'উল জুয়ূশ, তদ্রূপ যাহাবী তার আল-'উলু ও আল-'আরশ গ্রন্থদ্বয়ে।

[تكفير أبي حنيفة لمن توقف ولم يجزم هل الله في السماء أم في الأرض]:

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كَفَّر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء [أو ليس في الأرض ولا في السماء؟] واحتج على كفره بقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبَيَّنَ بهذا أن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ يبين أن الله فوق السماوات، فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى عليين، وأنه يُدعَى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على [الإقرار] بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا

[ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক ঐ ব্যক্তিকে কাফের ঘোষণা; যে আল্লাহ কি আসমানে নাকি যমীনে, এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া থেকে বিরত থাকবে]

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তার ছাত্রদের নিকট এ প্রসিদ্ধ কথায় তিনি তাকে কাফের বললেন, যে বলে আল্লাহ আসমানে নাকি যমীনে তা আমি জানি না। সুতরাং সে ব্যক্তি কেমন হবে যে ব্যক্তি (আরশের উপরে থাকা) অস্বীকারকারী, নাকচকারী? যে বলে যে, তিনি আসমানের উপর না অথবা বলেন তিনি আসমানেও না যমীনেও না।

আর ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত ব্যক্তির কাফের হওয়ার ওপর দলীল হিসেবে আল্লাহর বাণী: "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা: ০৫] দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন: 'আর তার 'আরশ সপ্ত আকাশের উপরে।' এর দ্বারা তিনি বর্ণনা করে দিলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ সপ্ত আকাশের উপরে, 'আরশের উপরে। আর 'আরশের উপরে উঠা' প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ স্বয়ং 'আরশের উপরে।

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ তারপরেই ঐ ব্যক্তিকে কাফের বললেন, যে তাঁর 'আরশের উপর উঠাকে মানে তবে 'আরশ আসমানে নাকি যমীনে এ বিষয়ে সে নীরব থাকে। কেননা সে আল্লাহর আসমানের উপর থাকাকে অস্বীকার করলো। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, কেননা সে আল্লাহর উপরে থাকাকে অস্বীকার করছে, অথচ আল্লাহ সকল উপরস্থ জিনিসের উপরে রয়েছেন। আর তাকে ডাকা হয় উপরের দিকে, নিচের দিকে নয়। এটা ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে কাফের বললেন যে আল্লাহর উপরে হওয়াকে অস্বীকার করে। তিনি এর যুক্তি হিসেবে পেশ করলেন যে, আল্লাহ উপরস্থ সবকিছুর উপরে, আর তাকে উপরের দিকে ডাকা হয়,

من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحًا عنه بذلك، فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخُ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب «الفاروق».

নিচের দিকে নয়। আর এই দুটি দলীলই স্বভাবজাত ও বুদ্ধি-বিবেক সম্মত; কেননা অন্তর স্বভাবতই এ স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ উপরে। এটাও স্বীকৃতি দেয় যে, তাকে ঊর্ধ্ব দিকে ডাকা হয়, নিম্ন দিকে নয়।

এখানে অপর বর্ণনাটি এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে, যেখানে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, "যদি সে আল্লাহর উপরে থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে"।[৪২৮]

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী হারাওয়ী[৪২৯] স্বীয় 'আল-ফারূক'[৪৩০] গ্রন্থে সনদসহ এ বক্তব্যটি স্পষ্ট শব্দে বর্ণনা করেছেন।[৪৩১]

---

৪২৮. এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম যাহাবী তার আল-উলু গ্রন্থে, পৃ. ১০১-১০২; মুখতাসারুল উলু পৃ. ১৩৭। আর এটি ইমাম ইবন কুদামা আল-মাকদেসীও ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তার 'ইসবাতু সিফাতিল উলু' গ্রন্থে, পৃ. ১৭০।

৪২৯. তিনি হচ্ছেন আবু ইসমা'ঈল আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-আনসারী আল-হারাওয়ী। জন্ম ৩৯৬ হিজরীতে। তিনি ছিলেন ক্ষমতাসম্পন্ন আলেমগণের একজন। কোনো তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারের তোয়াক্কা করতেন না। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, 'তিনি একেবারে পুরো আছার এর অনুসারী ব্যক্তি ছিলেন। কালামশাস্ত্রবিদদের ওপর উন্মুক্ত তরবারী ছিলেন। আসমা ওয়াস সিফাতে সহীহ আকীদাহ'র ওপর ছিলেন। যদিও সুলুক এর ক্ষেত্রে সূফীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। তাদের পদ্ধতিতেই তার বিখ্যাত 'মানাযিলুস সায়েরীন' গ্রন্থটি রচনা করেন। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, 'তবে তার 'মানাযিলুস সায়েরীন' গ্রন্থে সালাফে সালেহীনের নীতির বাইরে ভিন্ন নিঃশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে কোথাও কোথাও তিনি অনেক বিতর্কিত ও সমস্যাপূর্ণ বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন।'
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম তার এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা করে রচনা করেছেন তার 'মাদারিজুস সালেকীন' গ্রন্থটি। যাতে তিনি সেটাকে সালাফী আকীদায় ফেরৎ দিয়েছিলেন। হিজরী ৪৮১ সালে তার মৃত্যু হয়। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যাম্মুল কালাম, আল-আরবা'ঈন, মানাযিলুস সায়েরীন, আল-ফারূক, যা এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন। আর তা থেকে শাইখুল ইসলাম অনেক বর্ণনা করে থাকেন।
তার জীবনী জানার জন্য দেখুন, আবু ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (২/২৪৭); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৫০৩); আল-ইবার (২/৩৪৩); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/৩৬৫)।

৪৩০. গ্রন্থটি বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরা হয়।

৪৩১. এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে কোনো কোনো গোঁড়া হানাফী, জাহমী ও অন্ধ বলে থাকে এটা ইমাম আবু হানীফা থেকে সাব্যস্ত নয়। অথচ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ বক্তব্য তার আল-ফিকহুল আবসাত্ব গ্রন্থে, যা আবু মুতী' আল-বালাখীর মাধ্যমে এসেছে তাতে স্পষ্টভাবে এসেছে। নিম্নে আমি হানাফী মাযহাবের আলেম ও অন্য মাযহাবের আলেমগণ থেকে যারা আল-ফিকহুল আবসাত্ব বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করবো, এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বাস্তবে শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারাওয়ী, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফীসহ যারাই উপরোক্ত ভাষ্য বর্ণনা করেছেন তারা কেউ ভুল করেননি। বরং অন্যদের বর্ণনাও এর কাছাকাছি বা পুরোপুরি সমর্থন করছে। যেমন,
১) ইমাম আবুল লাইস আস-সামারকান্দী, ইমাম আবু জা'ফর আল-হিন্দওয়ানী থেকে বর্ণনা করেন,

তিনি আবুল কাসেম আস-সাফফার থেকে, তিনি নাসির ইবন ইয়াহইয়া আল-বালখী থেকে বর্ণনা করেন,

قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفر قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى فإن قال أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر أيضا ونذكره من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من الربوبية والألوهية في شيء وروي في الحديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال وجب علي عتق رقبة مؤمنة أفيجزئ أن أعتق هذه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمؤمنة أنت؟ فقالت نعم فقال أين الله فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة.

"আবু হানীফা বলেন, যে কেউ বলবে, আমি জানি না আল্লাহ কী আসমানে নাকি যমীনে, সে কাফের হবে, মহান আল্লাহ বলেন, 'রহমান আরশের উপর উঠেছেন।' অতঃপর যদি বলে, আমি এ আয়াত অনুসারে বলি, কিন্তু আমি জানি না, কোথায় 'আরশ রয়েছে? আসমানে নাকি যমীনে, তবে সেও কাফের হবে। আমরা তো তাকে উপরের দিকে উল্লেখ করি, নিচের দিকে নয়; কারণ নিচে হওয়া রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতের কোনো কিছুর সাথেই নেই। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কালো এক দাসী নিয়ে এসে বললো, আমার ওপর একটি মুমিনা দাসী আযাদ করা আবশ্যক হয়েছে, আমি যদি একে আযাদ করে দিই, তবে কি যথেষ্ট হবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঈমানদার? সে বললো, হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ কোথায়? সে তখন আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে আযাদ করে দাও, সে তো মুমিনাহ নারী।" [আল-ফিকহুল আবসাত্ব, যাহেদ কাউসারীর টীকাসহ]

২) বায়াদ্বী তার ইশারাতুল মারাম গ্রন্থে আল-ফিকহুল আবসাত্ব থেকে বর্ণনা করেন,

قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. وكذا من قال أنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض. والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء وعليه ما روي في الحديث أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال وجب علي عتق رقبة مؤمنة أفتجزيء هذه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمؤمنة أنت؟ فقالت نعم فقال أين الله فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة.

"আবু হানীফা বলেন, যে কেউ বলবে, আমি জানি না আল্লাহ কী আসমানে নাকি যমীনে, সে কাফের হবে। অনুরূপ কেউ যদি বলে, তিনি 'আরশের উপরে, তবে আমি জানি না, কোথায় 'আরশ রয়েছে? আসমানে নাকি যমীনে (তবে সেও কাফের হবে)। আল্লাহকে তো উপরের দিকে ডাকা হয়, নিচের দিকে নয়; কারণ নিচে হওয়া রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতের কোনো কিছুর সাথেই নেই। আর এর উপরই গ্রহণ করা হবে সে হাদীসটিকে, যাতে এসেছে, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কালো এক দাসী নিয়ে এসে বললো, আমার ওপর একটি মুমিনা দাসী আযাদ করা আবশ্যক হয়েছে, আমি যদি একে আযাদ করে দিই, তবে কি যথেষ্ট হবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঈমানদার? সে বললো, হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ কোথায়?' সে তখন আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে আযাদ করে দাও, সে তো মুমিনাহ নারী।" [আল-ফিকহুল আবসাত্ব, যাহেদ কাউসারীর টীকাসহ]

৩) আল-ফিকহুল আবসাত্ব এর ইবরাহীম কুওরানী এর নুসখায় এসেছে,

قال أبو حنيفة من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى فإن قال إنه تعالى على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر كون العرش في السماء لأن العرش في أعلى عليين.

"আবু হানীফা বলেন, যে কেউ বলবে, আমি জানি না আমার রব্ব আসমানের উপর নাকি যমীনে, সে তা কাফের হয়ে যাবে; কারণ মহান আল্লাহ বলেন, 'রহমান আরশের উপর উঠেছেন'। তারপর

যদি বলে, তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, তবে সে বলে, আমি জানি না, 'আরশ কি আসমানের উপর নাকি যমীনের উপর। তিনি বলেন, সেও কাফের; কারণ সে 'আরশকে আসমানের উপরে থাকা অস্বীকার করেছে, অথচ 'আরশ যাবতীয় উপরস্থ জিনিসের উপরে।" [ইবরাহীম কুওরানী আশ-শাফে'য়ী এর পাণ্ডুলিপি]

৪) ইমাম যাহাবী কর্তৃক আল-ফিকহুল আবসাত্ব থেকে উদ্ধৃত ভাষ্য হচ্ছে,

وبلغنا عَن أبي مُطِيع الحكم بن عبد الله الْبَلْخِي صَاحب الْفِقْه الأَكْبَر قَالَ سَأَلت أَبَا حنيفَة عَمَّن يَقُول لَا أعرف رَبِّي فِي السَّمَاء أَو فِي الأَرْض فَقَالَ قد كفر لِأَن الله تَعَالَى يَقُول {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} وعرشه فَوق سمواته فَقلت إِنَّه يَقُول أَقُول على الْعَرْش اسْتَوَى وَلَكِن قَالَ لَا يدْرِي الْعَرْش فِي السَّمَاء أَو فِي الأَرْض قَالَ إِذا أنكر أَنه فِي السَّمَاء فقد كفر. رَوَاهَا صَاحب الْفَارُوق بِإِسْنَاد عَن أبي بكر بن نصير بن يحيى عَن الحكم

"আমাদের কাছে আবু মুতী' আল-হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ আল-বলখী থেকে এসেছে, যিনি ফিকহুল আকবর গ্রন্থের প্রধান লোক, তিনি বলেন, আমি আবু হানীফাকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে বলে, আমি জানি না আমার রব আসমানের উপরে নাকি যমীনের উপর, তখন তিনি বলেন, সে তো কাফের হয়ে গেল; কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন', আর তার 'আরশ সকল আসমানের উপরে। তখন আমি বললাম, সে বলে, তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, তবে বলে, সে জানে না 'আরশ, তা আসমানে নাকি যমীনে। তখন আবু হানীফা বললেন, যদি সে আসমানের উপরে থাকা অস্বীকার করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।" এ বর্ণনাটি 'আল-ফারূক' গ্রন্থকার তার সনদে আবু বকর ইবন নাসির ইবন ইয়াহইয়া থেকে, তিনি হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন। [ইমাম যাহাবী, আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম]

৫) ইমাম যাহাবী কর্তৃক আল-ফিকহুল আবসাত্ব থেকে অন্য গ্রন্থে উদ্ধৃতি:

وروى أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي في الفقه الأكبر فقال: "[سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض] فقال: [من لم يقر أن الله على العرش] قد كفر لأن الله تعالى يقول {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} وعرشه فوق سبع سموات، فقلت: إنه يقول {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} ، ولكن لا يدري العرش في السماء أم في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر".

"আবু মুতী' আল-হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ আল-বলখী আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু হানীফাকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে বলে, আমি জানি না আমার রব আসমানের উপরে নাকি যমীনের উপর, তখন তিনি বলেন, যে কেউ এটা স্বীকার করবে না যে আল্লাহ্ 'আরশের উপর, সে তো কাফের হয়ে গেল; কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'রহমান আরশের উপর উঠেছেন', আর তার 'আরশ সাত আসমানের উপরে। তখন আমি বললাম, সে বলে, তিনি আরশের উপর উঠেছেন, তবে বলে, সে জানে না 'আরশ, তা আসমানে নাকি যমীনে। তখন আবু হানীফা বললেন, যদি সে আসমানের উপরে থাকা অস্বীকার করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।" [ইমাম যাহাবী, আল-'আরশ]

৬) আবু শাকূর আস-সালেমী কর্তৃক উদ্ধৃতি:

قال أبو مطيع البلخي رحمه الله: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه فيمن قال لا أدري أين الله فقال أبو حنيفة رضي الله عنه أنه يكفر لأنه وصف الله بكل مكان فقال أبو مطيع ولم يكفر قال لأنه خالف النص والله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى قال أبو مطيع كيف استوى قال أمروها كما جاء.

"আবু মুতী' আল-বালখী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে প্রশ্ন করেছি সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে বলে, আমি জানি না আল্লাহ্ কোথায়? তখন আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, সে তো কাফের হয়ে যাবে; কারণ সে আল্লাহকে সর্বত্র বলেছে। তখন আবু মুতী' বললেন, কেন সে কাফের হবে? তিনি উত্তরে বলেন, কারণ সে সরাসরি কুরআনের ভাষ্যের বিরোধিতা করেছে। আর আল্লাহ্ বলেন, 'রহমান আরশের উপর উঠেছেন', তখন আবু মুতী' বললেন, কীভাবে উপরে উঠলেন, তখন ইমাম বললেন, এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নাও"। [আবু শাকূর আস-সালেমী কর্তৃক আত-তামহীদ গ্রন্থে উদ্ধৃতি]

[قول هشام بن عبيد الله الرازي] :

وروى هو أيضًا وابنُ أبي حاتم أنّ هشام بن عبيد الله الرازي . صاحب محمد بن الحسن،

[হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ আর-রাযীর বক্তব্য]

তিনি (ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারাওয়ী) এবং ইবন আবি হাতিম[৪৩২] (উভয়েই) বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান[৪৩৩] এর ছাত্র হিশাম ইবন উবায়দুল্লাহ আল-

---

এসব উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে,

১- আল-ফিকহুল আবসাত্ব ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র পক্ষ থেকে 'ইমলা' বা মুখস্থ থেকে বলা জিনিস ছিল, যা তার ছাত্ররা লিখে নিয়েছিলেন।

২- আল-ফিকহুল আবসাত্ব এর বিভিন্ন নুসখা বা পাণ্ডুলিপি ছিল, যা থেকে আলেমগণ উপকৃত হয়েছেন।

৩- ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে উপরোক্ত বক্তব্য সত্য ও সঠিক। তিনি অন্যান্য সত্যনিষ্ঠ আলেমগণের মতোই সহীহ ও বিশুদ্ধ আকীদাহ'র দিকপাল ছিলেন, তিনি বিদ'আতী ও জাহমীদের গলার কাঁটা ছিলেন। পরবর্তীতে আবার জাহমী মাতুরিদীরা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যকে কাট-ছাট ও অপব্যাখ্যা করে তাদের মত করে সাজানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কুরআনের আয়াত ও হাদীস উল্লেখ থাকায় সেটা তাদের সেসব জালিয়াতিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে।

৪- শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারওয়ী, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবনুল কাইয়েম, ইমাম যাহাবী কেউই আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে যে বর্ণনা এনেছেন তাতে আমানতের খেয়ানত করেননি। যারা এমন কিছু বলবে তারাই মিথ্যুক প্রমাণিত হবে।

৫- পূর্ববর্তী সকল হানাফী ইমাম আল্লাহকে 'আরশের উপরেই বিশ্বাস করতেন। তারা এ কেন্দ্রিক তাদের ঈমানকে সংরক্ষণ করতে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের আশ্রয় নিয়েছেন।

৪৩২. তিনি হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইদ্রীস, ইবন আবী হাতেম আর রাযী। হিজরী ২৪০ সালে তার জন্ম। তিনি তার পিতা আবু যুর'আহ প্রমুখ থেকে হাদীস শুনেছেন। তার থেকে হাদীস শুনেছেন ইবন আদী, আবুশ শাইখ ইবন হাইয়ান, আবু আহমাদ আল-হাকেম প্রমুখ। আবু ইয়া'লা আল-খলীলী বলেন, আবু মুহাম্মাদ তার পিতা ও আবু যুর'আর ইলম ধারণ করেছেন, তিনি ছিলেন ইলম ও রিজালশাস্ত্র জানার ক্ষেত্রে সমুদ্রের ন্যায়। তিনি ফিকহ, সাহাবা ও তাবে'য়ীন এবং বিখ্যাত আলেমদের মতভেদ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, জারহ ও তা'দীলে তার একটি মূল্যবান কিতাব আছে। অনুরূপ 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ' নামেও তার একটি কিতাব আছে, যা থেকে আমি বেশ কিছু তথ্য নিয়েছি। তাছাড়া তার একটি তাফসীরের কিতাব রয়েছে কয়েক খণ্ডে, যার অধিকাংশই সালাফদের আছার দিয়ে পূর্ণ। তাফসীরটি অত্যন্ত সুন্দর।

তিনি আরও বলেন, তিনি ছিলেন এমন সমুদ্র, যাতে বালতি ফেললে ময়লা হয় না। তিনি যুহদ ও অধিক পরিমাণ ইবাদতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমন আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত যারা আমল করতেন। হিজরী ৩২৭ সালে তার মৃত্যু হয়। তার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মাঝে আরও রয়েছে, আল-মুসনাদ, আয-যুহদ, আল-কুনা ইত্যাদি।

দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৬৩); মীযানুল ই'তিদাল (২/৫৮৭); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৩০৮)।

৪৩৩. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন ফারক্বাদ, আশ-শাইবানী, আল-কূফী। ইরাকের ফকীহ। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের ছাত্র। প্রথমে আবু হানীফা থেকে ফিকহ শিখেছেন তারপর আবু ইউসুফের কাছে। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হানীফা, মিসআর ও মালেক ইবন আনাস প্রমুখ থেকে। তার থেকে প্রচুর নিয়েছেন ইমাম শাফে'য়ী, আরও নিয়েছেন ইমাম আবু উবাইদ প্রমুখ। শাফে'য়ী বলেন, মোটা মানুষদের মাঝে ইমাম মুহাম্মাদের চেয়ে বুদ্ধিমান কারও সাথে আমার মুনাযারা হয়নি। যদি আমি চাই বলতে পারি যে, কুরআন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তার বিশুদ্ধ ভাবাশৈলী ও বাগ্মীতার কারণে। ইমাম আবু ইউসুফ

قاضي الرَّي - حبس رجلاً في التجهم، فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام، فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه، ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: «ردوه إلى الحبس، فإنه لم يتب».

রাযী(৪৩৪), জাহমি মতবাদের অনুসারী হওয়ার কারণে(৪৩৫) এক ব্যক্তিকে আটক করেছিলেন। অতঃপর লোকটি তাওবা করলো। তারপর তাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য হিশামের নিকট আনা হলে তিনি বললেন: তাওবা করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা। তখন হিশাম তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন: তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ 'আরশের উপরে, মাখলূক থেকে আলাদা(৪৩৬)? সে বলল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ 'আরশের উপরে, তবে আমি জানি না যে, সৃষ্টির থেকে আলাদা কী? হিশাম বললেন: তাকে আবার বন্দি করো; কেননা সে তাওবা করেনি।(৪৩৭)

এর মৃত্যুর পরে খলীফা হারূন-অর-রশীদের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তাকে দিয়ে উদাহরণ পেশ করা হয়।
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা কোথায় পেলেন? তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এর কিতাব থেকে। হিজরী ১৮৯ সালে রাই শহরে তার মৃত্যু হয়।
দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (২/১৭২); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/১৮৭); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/১৩৪)।

৪৩৪. তিনি হচ্ছেন হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ আর-রাযী, আন-বুসতী, আল-ফকীহ। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবন আবী যি'ব, মালেক ইবন আনাস ও সে স্তরের আলেমগণ থেকে, আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালিদ, যদিও তিনি তার উস্তাদদের একজন, আবু হাতেম আর-রাযী প্রমুখ। আবু হাতেম বলুন, সাদূক অর্থাৎ তার বর্ণনা হাসান।
ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, তিনি ইলমের সমুদ্রসমূহের একটি। সুন্নাহ'র ইমামগণের একজন। আবু হাতেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি রাইতে হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ থেকে উঁচু মর্যাদা ও সম্মানিত কাউকে দেখিনি।' হিজরী ২২১ সালে তার মৃত্যু হয়।
দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৯/৬৭); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৪৪৬); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (১১/৪৭)।

৪৩৫. অর্থাৎ জাহমিয়্যাদের আকীদাহ-বিশ্বাস ধারণ করার কারণে তাকে আটক করা হয়। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান। স্রষ্টা ও সৃষ্টি একসাথে রয়েছে। এ আকীদাহ-বিশ্বাস কুফরী হওয়ার কারণে তাকে আটক করা হয়, যাতে তাওবা করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদায় বিশ্বাসী হয়।

৪৩৬. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির সাথে লেগে নেই। 'তার সৃষ্টি থেকে আলাদা' এ পরিভাষাটি সালাফে সালেহীনের বক্তব্যে প্রচুর এসেছে। বরং অনেকেই এ শব্দটির ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের শব্দ ও অর্থগতভাবে ইজমা' বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আবু হাতেম আর-রাযী, আবু যুর'আহ আর-রাযী, [লালেকাঈ, উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ (১/১৯৮); যাহাবী, আল-উলু (২/১১৫৫); উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৬৪; মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবাহ, কিতাবুল 'আরশ, পৃ. ৫০-৫১; ইবন বাত্তাহ আল-উকবারী, আল-ইবানাহ (৩/১৩৬); আবু আব্দুল্লাহ ইবন আবী যামানীন, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১০৬]।
ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'এ ব্যাপারে যারা সালাফে সালেহীনের ইজমা' বর্ণনা করেছেন, অথবা আহলুস সুন্নাত এর ইজমা' বর্ণনা করেছেন, অথবা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীনদের ইজমা' বর্ণনা করেছেন এদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ গণনা করতে পারবে না। সালাফে সালেহীন সর্বদা 'সৃষ্টি থেকে পৃথক' এ কথাটি বলেই আসছেন, তারা এর মাধ্যমে জাহমিয়্যাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন।' দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫৩১)।

৪৩৭. এ বর্ণনাটি আরও যারা বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল

[قول يحيى بن معاذ الرازي] :

وروى أيضًا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: «إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد [أحاط] بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضِلّيل، وهالك مرتاب، [يمزج] الله بخلقه، ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان».

[ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযীর[৪৩৮] বক্তব্য]

অনুরূপ ইয়াহইয়া ইবন মু'আয রাযী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

"নিশ্চয় আল্লাহ 'আরশের উপর, মাখলুক থেকে পৃথক। তিনি সবকিছুকে ইলমের (জানার) মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন। সবকিছুর সংখ্যা গণনা করে রেখেছেন। পথভ্রষ্ট, নিকৃষ্ট কোনো জাহমী ছাড়া কেউ এ কথায় সন্দেহ রাখতে পারে না। সে তো ধ্বংসশীল, সংশয়বাদী। সে আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে মিশিয়ে দেয়[৪৩৯], সে আল্লাহর সত্তাকে নোংরা পঁচার সাথে মিশায়।"[৪৪০]

জুয়ূশ, পৃ. ১৪০-১৪১; ইবন তাইমিয়্যাহ, নাকদ্বুত তা'সীস (১/৪৪০); দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (৬/২৬৫)।

আর ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার নাকদ্বুত তা'সীস গ্রন্থে আবু হাতিম এর বর্ণনায় তা উল্লেখ করেন, আবু হাতিম বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী ইবনুল হাসান আস-সুলামী, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি... হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ এক লোককে আটক করলেন জাহমিয়্যাহ মতবাদের কারণে... তারপর তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন।

৪৩৮. তিনি হচ্ছেন আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী, যাহেদ ও দুনিয়াবিমুখ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওয়াজ ও যুহদে তার অনেক আলোচনা রয়েছে। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন আলী ইবন মুহাম্মাদ আত-তুনাফেসী প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন হাসান ইবন আলওয়িয়্যাহ, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাযাশী, আবুল আব্বাস ইবন হামকওয়াইহ। তাকে আবু নু'আইম তার হিলইয়াতে, খত্বীব তার তারীখে বাগদাদে নিয়ে এসেছেন। তিনি হিজরী ২৫৮ সালে মারা যান। দেখুন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (১০/৫১-৭০); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১৪/২০৮-২১২); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৬/১৬৫); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/১৫)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তিনি কল্যাণের সাথে প্রসিদ্ধ তাসাওফের আলেম ছিলেন। তিনি বেলায়েত ও নবুওয়তের ব্যাপারে সূফীদের ভ্রষ্ট নীতি থেকে বিমুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৫/৪)।

৪৩৯. এখানে ইয়াহইয়া ইবন মু'আয রাহিমাহুল্লাহ জাহমিয়্যাদের একটি গোষ্ঠীর দিকে ইঙ্গিত করছেন, আর তারা হচ্ছে জাহমিয়্যাদের ইবাদতকারী শ্রেণি, যারা বলে আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ একাধিক স্থানে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, জাহমিয়্যাদের দু'টি গোষ্ঠী রয়েছে:

১- তাদের কালামশাস্ত্রবিদ গোষ্ঠী, যারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা জগতের ভিতরেও নেই বাইরেও নেই।

২- তাদের ইবাদতকারী গোষ্ঠী, যারা বলে থাকে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।

দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৭), (২/৫১২); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৭২)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ দু'টি কথাই মূলত একই জায়গা থেকে বের হয়েছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর থাকা থেকে মুক্ত করা। কারণ যখনি তারা এ সত্য অস্বীকার করলো, যে সত্যের ওপর আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন, রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, কিতাব নাযিল করেছেন, যার ওপর ঈমানদারগণ যুগে যুগে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তখনি তারা বিচ্ছিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেছেন, তাদের একটি মতবাদের অসারতা অপর মতবাদের মূলের অসারতাকে আবশ্যক করে। বরং দু'টি বক্তব্যের একটি অপরটির বিরোধী। তাদের কেউই তাদের কথার উপর স্থির থেকে অপর কথাকে খণ্ডন করতে সক্ষম হবে না। [দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫২৫)]

৪৪০. এটি ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেছেন তার উলু গ্রন্থে পৃ. ১৩৯-১৪০; তিনি সেখানেও তা আবু ইসমা'ঈল

[قول ابن المديني]:

وروى أيضا عن ابن المديني [لما سُئل: ما قول] أهل الجماعة؟ قال: «يؤمنون بالرؤية والكلام،

[আলী ইবনুল মাদীনীর বক্তব্য]

অনুরূপ(৪৪১) আরও বর্ণিত হয়েছে ইবনুল মাদীনী(৪৪২) থেকে, "যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: জামা'আতপন্থীদের(৪৪৩) বক্তব্য কী? তিনি বললেন: তারা ইমান রাখে আল্লাহকে দেখার ওপর(৪৪৪) ও আল্লাহর কালামের

আল-হারাওয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ২০৭-২০৮।

৪৪১. এমন বর্ণনা নু'আইম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ থেকেও এসেছে। যেমনটি আমরা দেখি ইমাম যাহাবীর নিকট। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৬১১)।

৪৪২. তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আলী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর ইবন নাজীহ ইবন বকর ইবন সা'দ আস-সা'দী। তাদের বসরী মাওলা বা ক্রীতদাস, যাকে মানুষ ইবনুল মাদীনী বলেই জানে। ইসলামের ইমামগণের একজন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবন যায়েদ, ইয়াযীদ ইবন যুরাই', আব্দুল ওয়ারিস, হুশাইম প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আহমাদ ইবন হাম্বল, বুখারী, আবু হাতেম প্রমুখ।

তার গুণাবলি বর্ণনায় যাহাবী বলেন, আল-ইমাম, আল-হুজ্জাহ, আশ-শাইখ, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেন, 'আমি কারও কাছে নিজেকে ছোট মনে করিনি, কেবল আলী ইবনুল মাদীনীর কাছে'। আহমাদ ইবন হাম্বল তার নাম ধরতেন না, সম্মান দেয়ার জন্য কুনিয়াত ব্যবহার করতেন। আবু হাতিম আর রাযী বলেন, ইবনুল মাদীনী মানুষের মাঝে হাদীস ও তার ইলাল বুঝার ক্ষেত্রে এক ঝাণ্ডা ছিলেন। তিনি হিজরী ২৩৪ সালে মারা যান। বলা হয়, তার দুইশত এর মত গ্রন্থ ছিল। তার অধিকাংশ গ্রন্থ হাদীস ও তার ইলম সম্পর্কে ছিল। যেমন, আল-আসমা ওয়াল কুনা, আদ-দু'আফা, আত-ত্বাবাকাত, আল-মুদাল্লেসূন, আস-সিকাত, আত-তারীখ। তবে তার অধিকাংশ প্রণীত গ্রন্থই হারিয়ে গেছে। কেবল চার বা পাঁচটিই অবশিষ্ট আছে বলে খত্বীব আল-বাগদাদী উল্লেখ করেছেন।

দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১১/৪৫৮); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/৪১); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৮১)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাকে আহলে হাদীসদের মধ্যকার ফকীহ বলতেন। দেখুন, [আল-ফাতাওয়াল কুবরা (৪/১২১); আল-কাওয়া'য়িদুন নূরানিয়্যাহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ; মাজমূ' ফাতাওয়া (২৫/২৬০)]

৪৪৩. অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের বক্তব্য কী? এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহকে আল-জামা'আহ নামে যুগ যুগ ধরে বলা হতো। সুতরাং সেটা কোনো নতুন নাম নয়।

৪৪৪. অর্থাৎ তারা ঈমান রাখে যে, আল্লাহকে আখেরাতে সচক্ষে চাক্ষুষভাবে দেখা যাবে। আরও ঈমান রাখে যে আল্লাহ তা'আলাকে আখেরাতে দেখা যাবে। জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের অধিকাংশই তা বিশ্বাস করে না। আর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায়দ্বয়ের লোকেরাও এ দু'টিতে যথাযথ বিশ্বাস করে না। ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'রুওইয়া' বা আখেরাতে আল্লাহকে দেখা ও 'কালাম' বা আল্লাহর বাণী অস্বীকারকারীদেরকে কাফের বলতেন। তিনি বলতেন, 'যে কেউ মনে করবে আল্লাহকে দেখা যাবে না সে কাফের। আর যে কেউ মনে করবে আল্লাহর মূসার সাথে প্রকৃত অর্থে কথা বলেননি তবে সেও কাফের।' দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১১/৪৭২); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/৫৮)।

বস্তুত আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে মৌলিক তিনটি মত দৃষ্টিগোচর হয়:

এক. আল্লাহ তা'আলাকে আখেরাতে সচক্ষে চাক্ষুষভাবে দেখা যাবে। তবে দুনিয়াতে কেউ তাকে জীবিত জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে না। বস্তুত এটিই হচ্ছে এ উম্মতের সালাফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবে'য়ীন ও মুসলিম ইমামগণের মতাদর্শ। আর এটার উপর কুরআন ও

ওপর[৪৪৫]। আরও ঈমান রাখে যে, আল্লাহ আসমানের উপরে 'আরশের উপরে

সুন্নাহ'র যাবতীয় প্রমাণাদি রয়েছে।

দুই. আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে না, দুনিয়াতেও না আখেরাতেও নয়। এ মতটি হচ্ছে অস্বীকারকারী জাহমিয়্যাহ ও তাদের অনুসারীদের মত।

তিন. আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়া ও আখেরাতে দেখা যাবে। এটি হচ্ছে হুলুলী সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারী সীমালঙ্ঘনকারী সূফীদের মত।

দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/৩৩৬-৩৩৭); বুগইয়াতুল মুরতাদ, পৃ. ৪৭০-৪৭২।

৪৪৫. অর্থাৎ তারা ঈমান রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলার গুণে গুণান্বিত। যখন যখন ইচ্ছা তখন কথা বলেন।

বস্তুত আল্লাহর কথা বলার গুণটি নিয়ে মানুষের মাঝে অনেকগুলো মতাদর্শ রয়েছে:

এক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আর মত: তাদের মতের সারাংশ হচ্ছে,

১- আল্লাহ তা'আলার রয়েছে কথা বলার গুণ।

২- এ গুণটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অবস্থান করছে; তার থেকে পৃথক নয়।

৩- এ গুণটির সাথে আল্লাহর গুণান্বিত হওয়ার কোনো শুরু বা শেষ নেই।

৪- এ গুণটি তাঁর প্রাচীন গুণ। আবার তিনি যখন ইচ্ছা ও পছন্দ তখন তিনি কথা বলেন।

৫- তাঁর কথা হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বসুন্দর কথা।

৬- তাঁর কথা কোনো সৃষ্টিকুলের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; স্রষ্টাকে সৃষ্টির ওপর কিয়াস করা যাবে না।

৭- যখন ইচ্ছা তখন তিনি তার সৃষ্টির যার সাথে ইচ্ছা তিনি কথা বলেন; চাই রাসূল হোন, কিংবা ফিরিশতা অথবা তার অন্যান্য বান্দাগণের সাথে। যেকোনো কিছুর মাধ্যমে অথবা মাধ্যম ব্যতীতই।

৮- তাঁর কথা তিনি সত্যিকার অর্থেই যাকে ইচ্ছা তাকে শোনান। হতে পারে সে তাঁর ফিরিশতা বা তাঁর রাসূল। আর আখেরাতে তিনি সেটা বান্দাদের সকলকে নিজ স্বরে শোনাবেন। যেমনিভাবে দুনিয়াতে তিনি তাঁর স্বর শুনিয়েছেন মূসা 'আলাইহিস সালামকে যখন তিনি গাছের নিকট গিয়েছিলেন। আর মূসাও তা শুনেছিলেন।

৯- যেভাবে তাঁর কথা কারও কথার মতো নয়, তেমনিভাবে তাঁর স্বরও কারও স্বরের মতো নয়।

১০- আল্লাহর বাণীর কোনো শেষ নেই।

১১- তাঁর বাণীর মধ্যে রয়েছে, কুরআন, তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জীল।

১২- পুরো কুরআনই তাঁর বাণী, সূরা, আয়াত ও শব্দ। তিনি কুরআন নিয়ে কথা বলেছেন, তা বর্ণ ও অর্থের সমষ্টি। এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে কারও ওপর নাযিল হয়নি। তিনি আল্লাহ জিবরীলকে কুরআন শুনিয়েছেন, জিবরীল সেটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছেন, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা তাঁর উম্মতকে শুনিয়েছেন। এখানে জিবরীল ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে প্রচার ও বর্ণনা করা ব্যতীত কোনো কিছু নেই। এ কুরআন লাওহে মাহফূযে লিখিত, আর তাই আমাদের মুসহাফে স্থাপনকৃত, তিলাওয়াতকারীরা তা তাদের যবানী দ্বারা তিলাওয়াত করে, পাঠকারীরা তাদের স্বর দ্বারা তা পাঠ করে, শ্রোতারা তা তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবন করে, কপিকাররা তাদের হাতে তা কপি করে, মুদ্রকাররা তাদের যন্ত্র দিয়ে তা মুদ্রণ করে, আর সেটাই হাফেযগণ তাদের বুকে ধারণ করে, এসবই শব্দ-বর্ণ ও অর্থ সহকারে। এ কুরআন নিয়ে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ কথা বলেছেন, আর সেটা প্রকৃত অর্থেই তাঁর কথা, অন্যের কথা নয়। তাঁর থেকেই এসেছে আর তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। যে যেভাবে ইচ্ছা তাতে তার কাজ করে, যেমন পাঠকের পড়া, উচ্চারণকারীর উচ্চারণ, মুখস্থকারীর ধীশক্তি, লিখকের লেখা, সব কিছুর জন্য কুরআন একটিই, সৃষ্ট নয়। যেখানেই সেটা তিলাওয়াত করা হোক, যেখানেই তা লেখা হোক, যেখানেই তা পড়া হোক। সুতরাং যে কেউ এ কুরআন শুনে মনে করবে যে তা সৃষ্ট সে কাফের হয়ে যাবে।

১৩- আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন মূসা 'আলাইহিস সালামের জন্য, আর তা ছিল

আদম সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে, যেমনটি সহীহ হাদীসে এসেছে।

১৪- আর আল্লাহর বাণী ভাগ করা যায়, সেটার কিছু অংশ হতে পারে, সেটাকে খণ্ড খণ্ড করা যায়। তাই কুরআনও তাঁর বাণী, তাওরাতও তাঁর বাণী, ইঞ্জীলও তাঁর বাণী।

১৫- কুরআন তাওরাত নয়, তাওরাত ইঞ্জীল নয়।

১৬- সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের কিছু অংশ, আয়াতুল কুরসী সূরা আল-বাকারার কিছু অংশ, সূরা আল-বাকারাহ সূরা আলে ইমরান নয়, এভাবে তার সকল বাণী সম্পর্কে বলা হবে।

১৭- আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছেন, তাওরাত ইবরানী ভাষায়, কুরআন আরবী ভাষায় আর ইঞ্জীল সুরিয়ানী ভাষায়।

১৮- কুরআনে কারীমে যে অর্থসম্ভার এসেছে তা তাওরাতে নেই, আর তাওরাতে যে অর্থসম্ভার এসেছে তা কুরআনে নেই। তবে কোনো বিশেষ শিক্ষার ভাবার্থ সকল গ্রন্থে থাকা অসম্ভব নয়। যেমন তাওহীদের বিষয়। অনুরূপ তার সকল বাণীই আলাদা আলাদা।

১৯- আল্লাহর বাণীর পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তার কিছু অংশ অপর কিছু অংশের চেয়ে উৎকৃষ্ট। যেমন আয়াতুল কুরসী অন্য সকল আয়াত থেকে উৎকৃষ্ট। সূরা আল-ফাতিহার মতো কোনো কিছু তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনের অন্যত্র নাযিল হয়নি। আর 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের তিনভাগের একভাগ সমতুল্য।

২০- আল্লাহর কালামের আগ-পিছ রয়েছে। একাংশের পরে আরেক অংশ রয়েছে। যেমন বিসমিল্লাহ এর মাঝে আল্লাহ শব্দটি বিসমি এর পরে আছে। অনুরূপভাবে 'বিসমি' শব্দের মাঝে (বি) আগে তারপর (সীন) তারপর (মীম)। এসবই আল্লাহর বাণী, যা কখনো সৃষ্ট নয়। শব্দ, বর্ণ সব মিলিয়েই আল্লাহর বাণী। সৃষ্টির কারও বাণীর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

২১- কুরআন নিয়ে বান্দার স্বর, তাদের নড়াচড়া, মুসহাফের কাগজ, চামড়া, বাঁধাইয়ের উপকরণ, লেখার কালি এসবই সৃষ্ট ও তৈরি করা। তবে বর্ণসমূহের দ্বারা ঘটিত যা বলা হচ্ছে, যা শোনা হচ্ছে, যা লিখা হচ্ছে, যা সংরক্ষিত হচ্ছে তা সবই মহান আল্লাহর কালাম বা বাণী; যার বর্ণ ও অর্থ কোনোটিই সৃষ্ট নয়।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহর বাণীর ব্যাপারে এ আকীদাই পোষণ করে থাকেন।

দুই. দার্শনিক ও গোঁড়া সূফীদের মতবাদ:

তাদের মতবাদের সারাংশ হচ্ছে, আল্লাহর কালাম নামে যা বলা হচ্ছে তার অস্তিত্ব রাসূলের সত্তার বাইরে নেই। সেটা তো কেবল কারও অন্তরে যেসব অর্থের ফয়েজ বা উদ্গীরণ বা বিস্ফোরণ বা উৎসারণ বা উচ্ছাস বা উপচে পড়ে থাকে সেটাই অথবা যা কর্মক্ষম আক্বল (নবম গোলার্ধ) থেকে যা কারও অন্তরে ফয়েজ আকারে পড়ে সেটাই।

এসব দার্শনিকদের মধ্যে যারা মুসলিম বলে পরিচয় দিত, তারা বলে এখানে কর্মক্ষম আক্বল বলে জিবরীলকে বুঝানো হতে পারে। অথচ এরিস্টটল জিবরীল নামের কাউকে স্বীকারই করে না। তাদের মতে, কুরআন নবীর অন্তরে সৃষ্ট, মূসা নিজের অন্তরে থাকা কথাই শুনেছেন। মূসা নিজের অন্তরের বাইর থেকে কোনো কথা শুনেনি।

তিন. জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারীদের মতবাদ

তাদের মতবাদের সারাংশ হচ্ছে,

আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো গুণ সম্পৃক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং জীবন, জ্ঞান, কুদরত, কথা বলা ইত্যাদি কোনো কিছুই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কোনো গুণ নয়। সুতরাং তার কালাম বা বাণী সৃষ্ট; যা তিনি কোনো দেহ বা জিসমে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহর বাণী নামে যা বলা হচ্ছে তা অন্য কোনো জিসিম, শরীর বা দেহ থেকে শুরু হয়েছে। আল্লাহর কাছে থেকে তার শুরু হয়নি। তাই আল্লাহর সাথে কোনো বাণীর সম্পৃক্ততা নেই, না কোনো অর্থ, আর না কোনো বর্ণ-শব্দ। তাদের নিকট আল্লাহ কর্তৃক কথা বলার অর্থ হচ্ছে, যে কোনো কথা সম্পাদন করেছে যদিও সেটা আলাদা কোনো স্থান থেকে হয়।

চার. কুল্লাবিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মতবাদ

কুল্লাবিয়্যাহ সম্প্রদায় আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্লাবের মতের অনুসরণ করে থাকে। তাদের মতে, আল্লাহর সর্বদা কথা বলার গুণে গুণান্বিত। কথা বলা তাঁর নিজের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত একটি গুণ। সে গুণটির বাস্তব অবস্থা হচ্ছে তা মূলত কালামে নাফসী বা আত্মিক কথা, যা

আল্লাহর প্রাচীনত্বের সাথে প্রাচীনভাবেই তাঁর মাঝে রয়েছে। এটি তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাঁর কথা বলা এ গুণটি তাঁর জীবন, জ্ঞান ইত্যাদি গুণের মতই প্রাচীন (নতুন করে কিছু করেন না)। আল্লাহর কালাম এর কোনো বর্ণ নেই। কোনো শব্দ নেই। আর তা অংশ বা ভাগ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন হয় না, শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যায় না।

সেটা একই অর্থে, আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হলেই কেবল তা আদেশ ও নিষেধে পরিণত হয়। সে হিসেবে নির্দেশ, নিষেধ ও সংবাদ তাদের নিকট নবসৃষ্ট অর্থ।

তারা আরও বলে, কুরআন পড়তে যে বর্ণ দ্বারা গ্রথিত হয়ে পড়া হয় তা আল্লাহর কালামের ইবারত বা প্রকাশরূপ, সুতরাং তা সৃষ্ট।

আর তাই আল্লাহর কালামের ইবারত বা বাহ্যিকরূপ পরিবর্তন ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আরবীতে বললে কুরআন হয়, ইবরী ভাষায় বললে তাওরাত হয়, সুরইয়ানী ভাষায় বললে ইঞ্জীল হয়। এসবই আল্লাহর অপরিবর্তনীয় এক কালাম (কালামে নাফসী), যার ইবারত বা বাহ্যিকরূপ কেবল পরিবর্তন হয়েছে।

আর তাই তারা আল্লাহর বাণী 'যতক্ষণ না সে আল্লাহর কালাম শুনে' [সূরা আত-তাওবাহ: ৬] এ আয়াতে আসা 'শোনা' এর অর্থ করে 'বুঝা'।

সে হিসেবে তাদের নিকট:

- কুরআন যা আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, যাতে বর্ণ রয়েছে, তা আল্লাহর বাণী নয়। বরং তা তার বাণীর ইবারত বাহ্যিক রূপায়ণ, সুতরাং তা সৃষ্ট।
- আল্লাহ্ সর্বদা আদেশ নিষেধ করার বিষয়টি অস্বীকার করেন। বরং এগুলো নতুন অর্থে পুরাতন অর্থের রূপান্তর।
- তাদের মতে আল্লাহর কালাম বলতে বুঝাবে আত্মিক কালাম যা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত; তবে তা তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর তার রয়েছে কেবল একই অর্থ। [নাউযুবিল্লাহ]

পাঁচ. আশ'আরিয়া মতবাদ:

তাদের মতবাদ উপরে বর্ণিত কুল্লাবিয়্যাহ মতবাদের মতই। তবে ভিন্নতার দিক হচ্ছে, তাদের মতে,

১- আল্লাহর বাণী পূর্ব থেকেই চারটি জিনিসের অর্থের সমষ্টি। আদেশ, নিষেধ, সংবাদ ও সংবাদের চাওয়া।

২- আল্লাহ সর্বদা (প্রাচীন কালামে নাফসীর মাধ্যমে) আদেশ, নিষেধকারী ও সংবাদ প্রদানকারী। তবে এগুলো কালামের বিবিধ গুণ, প্রকার নয়।

৩- আর আল্লাহর বাণী (কালামে নাফসী) যা তাঁর সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত, তা হচ্ছে যাবতীয় নির্দেশকৃত বস্তুর জন্য নির্দেশ, যাবতীয় নিষেধকৃত বস্তুর জন্য নিষেধ, যাবতীয় সংবাদের জন্য সংবাদ।

ছয়. মাতুরিদিয়া মতবাদ:

তাদের মতবাদ অনেকাংশেই আশ'আরিয়া মতবাদের মতই, তবে পার্থক্য হচ্ছে, আবু মানসূর আল-মাতুরিদীর মতে আল্লাহর বাণী যেহেতু কালামে নাফসী, তাই 'কালামুন নাফসী' শোনা যায় না, কারণ যা শোনা যায় তা তো আওয়াজ। সুতরাং মূসা এমন কিছু শব্দ শুনেছেন যা আল্লাহর কালামের ওপর প্রমাণবহ। হতে পারে তিনি সে শব্দ গাছে সৃষ্টি করেছেন। [মুসামারাহ ফী শারহিল মুসায়ারাহ, পৃ. ৮০-৮১; অনুরূপ তাফতাযানী, শারহুল আকায়িদ আন-নাসাফিয়্যাহ, পৃ. ১৪]

সাত. সালেমিয়া মতবাদ

তাদের মতবাদের সারাংশ হচ্ছে,

ক) আল্লাহ তা'আলার কথা বলার গুণ রয়েছে। আর কালামের বর্ণ ও আওয়াজও আছে। আল্লাহর কালাম ক্বাদীম বা প্রাচীন, সৃষ্ট নয়। আল্লাহর কালামের কিছু অর্থ রয়েছে যা কালামের সাথে সম্পৃক্ত।

খ) তবে আল্লাহর কালাম আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরতের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

এরা প্রথম অংশে সালাফদের সাথে একমত হলেও দ্বিতীয় অংশে কুল্যাবিয়্যাহ, আশ'আরিয়া ও

ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة:7]، فقال: اقرأ ما قبلها: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

উঠেছেন।(৪৪৬) তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহর বাণী:

﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]

"তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] এর ব্যাপারে। উত্তরে তিনি বললেন: তুমি এর পূর্বে পড়(৪৪৭)-

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [المجادلة: ٧]

"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা আছে তা জানেন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭]"(৪৪৮)

মাতুরিদিয়্যাদের সাথে একমত হয়েছে। এভাবে তারা দু' মতের সমন্বয় করতে গিয়ে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে।

আট. কাররামিয়্যাহ মতবাদ

তাদের মতবাদের সারকথা হচ্ছে,

ক) আল্লাহর কালাম সৃষ্ট নয়। তা সত্ত্বেও তা হাদেস বা নতুন।

খ) আল্লাহর কালামের বর্ণ ও আওয়াজ রয়েছে।

গ) আল্লাহর কালাম আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত।

ঘ) আল্লাহর কালাম আল্লাহর ইচ্ছার ও কুদরতের সাথে সম্পৃক্ত; তবে আগে তাঁর ওপর কথা বলা নিষেধ ছিল।

ঙ) আর 'আল্লাহর সর্বদা কথা বলতেন' এর অর্থ হচ্ছে, কথা বলতে সমর্থ ছিলেন।

চ) আল্লাহর আযালী কোনো কথা ছিল না। অর্থাৎ তখন তিনি এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন না; কারণ তখন তো হাদেস ছিল না।

এরা খ ও গ এ দু'টিতে সালাফে সালেহীনের মতের সাথে। কিন্তু ক এর প্রথম অংশে একমত হলেও দ্বিতীয় অংশে বিরোধ। আর ঘ এর প্রথম অংশে সালাফদের সাথে একমত হলেও দ্বিতীয় অংশে বিরোধ। ঙ ও চ একেবারেই সালাফদের আকীদাহ বিরোধী।

৪৪৬. এটিই হচ্ছে আল্লাহর কর্মগত একটি গুণের বর্ণনা। তা হচ্ছে তিনি সর্বোর্ধ্বে 'আরশের উপরে উঠেছেন। আরবীতে যা আল-ইসতেওয়া নামে বিখ্যাত। এ গুণটিতেই কালামশাস্ত্রবিদদের বড় বিরোধ। অথচ তা সবচেয়ে বেশি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। আরও বেশি জানার জন্য "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এ গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

৪৪৭. বিদ'আতীদের একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফের সালেহীনের বক্তব্যের অংশবিশেষ কর্তন করে তুলে ধরা। যাতে করে আগ পিছ থেকে আলাদা করে নেয়ার মাধ্যমে ভাষ্যে বিকৃত ঘটানো সম্ভব হয়। এজন্যই মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, 'আমার ইচ্ছা হয় এ বৃদ্ধ অবস্থাতেও আমার হাত যেন কাটা হতো, তারপরও যদি আল্লাহর কিতাব থেকে তারা একটি ভাষ্যের পূর্ণরূপ উপস্থাপন করত। তারা তো কেবল প্রথম অংশ নেয় পরের অংশ ছেড়ে দেয় অথবা পরের অংশ নেয় প্রথম অংশ ছেড়ে দেয়।' [ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/২১১); আজুররী, আশ-শরী'আহ, নং ৪৮৭]

৪৪৮. অর্থাৎ এখানে সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে, জানা থাকা, জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রাখা ও দেখা। এর ওপর আরেকটি দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আয়াতটিকে 'ইলম' দিয়ে শুরু করেছেন, বলেছেন 'আলাম তারা আন্নাল্লাহ ইয়া'লামু... আবার তিনি আয়াতও শেষ করেছেন 'ইন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইয়িন আলীম' বলে।

[قول الإمام الترمذي] :

وروى أيضًا عن أبي عيسى الترمذي قال: «هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان» .

[قول أبي زرعة] :

وروى عن أبي زُرْعَة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]

[ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য]

অনুরূপ আবু 'ঈসা আত-তিরমিযী[৪৪৯] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "তিনি (আল্লাহ) 'আরশের উপরে যেমনটি তিনি স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার জ্ঞান, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি সকল জায়গায়[৪৫০] ।[৪৫১]

[আবু যুর'আহ আর-রাযীর বক্তব্য]

আর তিনি[৪৫২] আবু যুর'আ আর-রাযী[৪৫৩] থেকে বর্ণনা করেন, তাকে যখন "রহমান

ইমাম ইবন কাসীর বর্ণনা করেন, একাধিক ব্যক্তি এর ওপর ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের আওতাভুক্ত হওয়া। দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর (৮/৬৭)।

আর আলী ইবনুল মাদীনীর উপরোক্ত আসারটি বর্ণনা করেছেন ইমাম যাহাবী আল-উলু গ্রন্থে পৃ. ১২৯; ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারাওয়ীর মাধ্যমে। তার সনদ হচ্ছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন নাফে'কে বলতে শুনেছি, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হারেস, আলী ইবনুল মাদীনীকে প্রশ্ন করা হলো, তখন আমি তার কাছ থেকে শুনছিলাম, [আহলুস সুন্নাহ ওয়া] আল-জামা'আহ এর মত কী? .... তখন তিনি তা বর্ণনা করেন। আরও দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

৪৪৯. তিনি হচ্ছেন আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরাহ ইবন মূসা ইবনুদ দাহহাক আস-সুলামী আত-তিরমিযী। দীনের বড় ইমামদের একজন, দীনের হাফেযে হাদীসের অন্যতম ব্যক্তি। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন কুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, বুখারী প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মাহবূব, যিনি তার আল-জামে'উ গ্রন্থের বর্ণনাকারী, হাম্মাদ ইবন শাকের আল-ওয়াররাক প্রমুখ। ইবন হিব্বান বলেন, আবু 'ঈসা হচ্ছেন তাদের একজন যারা জমা করেছেন, গ্রন্থনা করেছেন, হিফয করেছেন এবং আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।

আবু সা'দ আল-ইদরীসী বলেন, ধীশক্তির দিক থেকে আবু 'ঈসাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হতো। হাকেম বলেন, আমি 'উমার ইবন আল্লাককে বলতে শুনেছি, আবু 'ঈসা যখন খুরাসানে মারা যান তখন ইলম, হিফয, পরহেযগারী ও যুহদ এর দিক থেকে তার মতো কাউকে রেখে যাননি। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭০)।

৪৫০. এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি যেন নিকটে থেকেও উপরে, আবার উপরে থেকেও নিকটে।

৪৫১. তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩২৯৮।

৪৫২. অর্থাৎ ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারওয়ী, যার আলোচনা ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৪৫৩. তিনি হচ্ছেন আবু যুর'আহ উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল কারীম ইবন ইয়াযীদ আর-রাযী। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, 'বাগদাদের সাঁকো অতিক্রমকারী কেউ ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহর চেয়ে ফকীহ ছিল না, আর না কেউ ছিল আবু যুর'আহ এর মতো হাফেয। তিনি হিফয ও মজবুতির দিক

فقال: «تفسيره كما تقرأ، هو على العرش، وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله».

'আরশের উপরে উঠেছেন" এর তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি বললেন: "এর তাফসীর তাই যেমন তুমি পড়ছো[৪৫৪], তিনি 'আরশের উপর। আর তাঁর জ্ঞান সকল স্থানে।

থেকে ইমাম ছিলেন। নিজের দেশ থেকে বের হয়ে ১৪ বছর ইলম অর্জনে কাটান। তিনি হাদীসের দারস প্রদানের জন্য ৩২ বছর বয়সে বসে পড়েন। হিজরী ২৬৪ সালে তিনি মারা যান।
দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (১/৩২৮); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১০/৩২৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/৬৫)।

৪৫৪. সালাফে সালেহীন থেকে বেশ কিছু ভাষ্য এসেছে যাতে সিফাত সংক্রান্ত বাণীসমূহের তাফসীর না করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এগুলো পড়াই এগুলোর তাফসীর। যেমন,

১- মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শাইবানী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য: "এ হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য লোকেরা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমরা সেগুলোর বর্ণনা করব, ঈমান আনব কিন্তু তাফসীর বা ব্যাখ্যা করবো না।" [লালেকাঈ, আস-সুন্নাহ, ৭৪১]

২- আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য: "এ হাদীসগুলো আমাদের নিকট হক্ব ও যথাযথ। নির্ভরযোগ্যরা একে অপর থেকে তা বর্ণনা করেন। তবে আমাদেরকে যখন এর ব্যাখ্যা দিতে চাওয়া হয় তখন আমরা বলি: আমরা কাউকে এগুলো কিছুর তাফসীর করতে দেখতে পাইনি।" [লালেকাঈ, আস-সুন্নাহ, ৯২৮]

এ রকম আরও কিছু ভাষ্যের ওপর নির্ভর করে কোনো কোনো লোক (বিশেষ করে আহলুত তাজহীল) এগুলো দ্বারা তাদের তাফওয়ীদ্ব নীতি তথা 'এগুলার অর্থ বুঝা যায় না' এর নীতির প্রমাণ পেশ করে থাকে। এ ভাষ্যগুলোকে তারা তাদের তাফওয়ীদ্ব নীতির দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। তারা মনে করে থাকে যে সালাফরা বুঝি এ নীতিই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। বস্তুত এটা 'আহলুত তাজহীল' তথা অর্থ না জানার দাবিদার লোকদের ভ্রান্তি, মূর্খতা। কারণ:

১- তাদের কারো কারো কাছ থেকে সেটার উদ্দেশ্যের বর্ণনা স্পষ্টভাবে এসেছে, যেমন,
আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম বলেন, 'এসব হাদীস বিশুদ্ধ; এগুলোকে হাদীসবিশারদ ও ফকীহগণ একে অপর থেকে বহন করেছেন। এগুলো আমাদের নিকট হক্ব ও সত্য, এগুলোতে আমরা কোনো সন্দেহ করি না। তবে যখন বলা হবে, কীভাবে তিনি তাঁর পা রাখলেন? কীভাবে তিনি হাঁসলেন? তখন আমরা বলি, এটাকে তাফসীর করা যাবে না, আর আমরা কাউকে সে তাফসীর করতে শুনতেও পাইনি।' [দারাকুতনী, আস-সিফাত, নং ৫৭]
অনুরূপভাবে ইয়াযীদ ইবন হারূন রাহিমাহুল্লাহ জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত আল্লাহকে দেখা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেন, "তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে"। তখন এক লোক বলে বসলো, এ হাদীসের অর্থ কী? তখন ইয়াযীদ রাগ করলেন এবং বললেন, কে জানে সেটা কী রকম? [দেখুন, আস-সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২৩৬]
অনুরূপভাবে সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ বলেন, 'কুরআনে যা দিয়ে আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন তার পাঠই হচ্ছে তার তাফসীর। কোনো ধরণ নেই আর না আছে কোনো উদাহরণ।' [দারাকুতনী, আস-সিফাত, নং ৬১; আস-সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২৪৭-২৪৮]
ইমামদের পক্ষ থেকে এসব ভাষ্য আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে, তারা যে তাফসীর করতে নিষেধ করেছেন তা হচ্ছে এগুলোর 'ধরণ' বর্ণনা করা।

২- তাছাড়া এগুলোর তাফসীর বলতে তারা সাধারণ অর্থ বলতে নিষেধ করেননি, তার প্রমাণ এটাও যে, তারা স্পষ্ট করেই বলতেন যে, তারা জাহমিয়্যাদের তাফসীর চান না। যেমনটি ইমাম আহমাদ বলেছেন, যা ইমাম আবু ইয়া'লা তার ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত গ্রন্থের নিয়ে এসেছেন, (পৃ. ৭৫)।
অনুরূপ ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইতোপূর্বে 'আমিররূহা কামা জাআত' এর আলোচনায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।
এর আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, যা ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী তার বিপক্ষের লোককে বলেন, তাতে এসেছে, "অনুরূপ আমরা এ সিফাতগুলোর ধরণ নির্ধারণ করি না, এগুলোর

[قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة] :

وروى أبو القاسم اللالكائي. صاحب أبي حامد الإسفراييني. في «أصول السنة» بإسناده عن

যে ব্যক্তি এটা ছাড়া অন্য কিছু বলবে, তার ওপর আল্লাহর লা'নত।"(৪৫৫)

[ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এর বক্তব্য]

আবু হামেদ আল-ইসফারায়েনীর(৪৫৬) ছাত্র আবুল কাসেম লালেকাঈ স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব

মিথ্যারোপ করি না তোমাদের মিথ্যারোপের মতো। এগুলোকে তাফসীর করি না তোমাদের বাতিল তাফসীরের মতো।" [দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল মিররীসী (১/২২২)]

৩- অনুরূপভাবে 'তাফসীর না করা'র বিষয়টিকে সুন্নাহ'র ইমামগণ শুধু সিফাতের আয়াতেও বলেননি, বরং তারা তা জাহান্নামের ধমকির হাদীসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'তোমরা আমার পরে কাফের হওয়ার দিকে ফিরে যেও না...' ও 'যখন দু'জন মুসলিম তাদের দু'টি তরবারী নিয়ে মুখোমুখি হয়... ইত্যাদি ভাষ্যে [এ রকম আরও কিছু ভাষ্য দেখা যেতে পারে ইমাম লালেকাঈ এর আস-সুন্নাহ গ্রন্থে (১/১৬৩-১৭০)]। তারা এসব ভাষ্য সম্পর্কেও বলেছেন যে, এগুলোকে তাফসীর করা হবে না। এটা এজন্য যে, বিদ'আতীরা এগুলোর ব্যাপারে বাতিল ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, সিফাতের আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে 'তাফসীর নিষিদ্ধ' বলে বাতিল মতাদর্শের লোকদের অপব্যাখ্যাকেই নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা হক তাফসীর বা অর্থ বুঝার ব্যাপারটি কখনও নিষেধ করেননি। কারণ ঐসব হাদীসের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারে, সেগুলো বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বরং তাদের উদ্দেশ্য কৃত্রিম অপব্যাখ্যা দাঁড় করানো থেকে নিষেধ করা। সুতরাং অন্য জায়গায় সালাফগণ যে তাফসীর করতে নিষেধ করেছেন সিফাতের আয়াতের ক্ষেত্রেও সে একই কথা প্রযোজ্য হবে।

বস্তুত সালাফদের দ্বারা সিফাত ও অন্যান্য বিষয়ে 'তাফসীর না করা' বলতে বাতিলপন্থীদের অপব্যাখ্যা নিষেধ করার বিষয়টিই যে উদ্দেশ্য তার প্রমাণ এত বেশি, যা গননা করে শেষ করা কঠিন। তার কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে, দারেমীর, আর-রাদ্দু আলাল মাররীসী (১/২৮৭, ২৮৯, ৩৫২, ২৬০); অনুরূপ আবুল কাসেম আসফাহানীর আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/১২২-১২৩)। আরও বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, ড. আহমাদ আল-কাযী, মাযহাবু আহলিত তাফওয়ীদ্ব ফী নুসূসিস সিফাত।

৪৫৫. ইমাম যাহাবী তা তার আল-উলু গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন, পৃ. ১৩৭; ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারাহওয়ীর মাধ্যমে। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আবু ইয়া'কূব আল-কুরাব, তিনি বলেন, আমাকে জানিয়েছেন আমার দাদা, তিনি বলেন, আমি আবুল ফাদ্বল ইসহাক্ব থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-আসফাহানী জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি আবু যুর'আর কাছ থেকে শুনেছি, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল... তারপর তিনি তা উল্লেখ করেন। আরও দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ২০৩; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ুশ, পৃ. ২৩৪।

৪৫৬. তিনি হচ্ছেন আবু হামেদ আহমাদ ইবন ত্বাহের ইবন মুহাম্মাদ আহমাদ আল-ইসফারায়িনী। আশ'আরী মতবাদের লোক। তৎকালীন বাগদাদের শাফে'য়ী আলেমগণের উস্তাদ। বলা হয়ে থাকে, তার মজলিসে তিনশত এর বেশি ফকীহ হাজির হতেন। তৎকালীন সময়ের রাষ্ট্র ও সরকারের লোকদের কাছে তার মর্যাদা ছিল প্রতিষ্ঠিত। দারাকুতনী থেকে তার সুনান গ্রন্থ শুনেন। খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, তারা আমাকে আবু হামিদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, ইবনুল মুবারক মসজিদে তার দারসে আমি হাজির হয়েছিলাম; তাদের কারও কাছে শুনেছি যে, তার মজলিসে ৭০০ ফকীহ হাজির হতেন। তারা আরও বলতেন, যদি তাকে শাফে'য়ী দেখতেন তবে অবশ্যই খুশি হতেন।

তার জন্ম হিজরী ৩৪৪ সালে। আর মৃত্যু ৪০৬ সালে। আর 'ইসফারায়ীন' খুরাসানের একটি শহর, যা নাইসাপূর এর নিকটে অবস্থিত।

দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৪/২৩৭); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (১/৭২); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/১৯৩)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তাকে শাফে'য়ীর পরে মাযহাবের বড় ইমাম বলতেন। দেখুন,

محمد بن الحسن ـ صاحب أبي حنيفة ـ قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل: من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئًا من ذلك، فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جَهْم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء» اهـ.

'উসূলুস সুন্নাহ'[৪৫৭] গ্রন্থে আবু হানীফার ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "(মুসলিম বিশ্বের) মাশরিক থেকে মাগরিব তথা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের সকল ফুক্বাহায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঈমানের ক্ষেত্রে একমত যে, কুরআন-হাদীসে আল্লাহর যেসকল সিফাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে সেগুলো কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গুণের (ধরণ) বর্ণনা ও সাদৃশ্য প্রদান[৪৫৮] ছাড়া মেনে নেয়া। কাজেই যে ব্যক্তি আজ সেগুলোর কোনো কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে সে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও (সাহাবায়ে কিরাম ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল) জামা'আত থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা তারা সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি, বরং কুরআন-সুন্নাহ'য় যা আছে সেটা অনুযায়ী তারা ফাতওয়া দিয়েছেন, অতঃপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন[৪৫৯]। সুতরাং যে কেউ জাহাম এর মতো কথা বলবে সে জামা'আত থেকে খারিজ হয়ে যাবে; কেননা সে (জাহাম) আল্লাহকে এমন গুণে বর্ণনা করেছে যা আবশ্যক করে যে, তিনি কিছুই না।"[৪৬০]

মাজমূ' ফাতাওয়া (৩৫/১০১); আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৩/৪৭৫)।
ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, তিনি সে সময়ের শাফে'য়ীদের ইমাম, বরং তিনি দ্বিতীয় শাফে'য়ী। দেখুন, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৯২।
ইবন তাইমিয়্যাহ তার অনেকগুলো আকীদাহ বিষয়ক মতাদর্শ বর্ণনা করেছেন, যেমন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/১৬০-১৬১, ৩০৬, ৫৫৭), (১৮/৩৩৩), (১৯/২০৫), (৩৩/১৭৩); আস-সাফাদিয়্যাহ (২/১৬২); আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৬/৬০০-৬০১)।

৪৫৭. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এখানে এ নাম দিলেও অন্যত্র অন্য নাম বলেছেন। বস্তুত এ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ। এ নামের ব্যাপারে আলোচনা ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৪৫৮. এখানেও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সাদৃশ্য প্রদান করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য, ধরণ নির্ধারণ ও উদাহরণ পেশ করতে নিষেধ করা। যদি শুধু অর্থই উদ্দেশ্য হতো তাহলে বলার দরকার হতো না যে, এগুলোর ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে সবাই একমত। কারণ ঈমান আনতে হলে অর্থের ওপরই ঈমান আনার কথা বলা হবে, শুধু শব্দের ওপর ঈমান আনার কথা বলা উদ্দেশ্য হলে বলতো যে, 'এগুলোর শব্দের ওপর ঈমান আনা', বা 'এগুলোর অর্থ করা যাবে না সেটার ওপর ঈমান আনা' এভাবে বলা হতো।

৪৫৯. যেমন: ফতোয়া দিয়েছেন যে, আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন কিন্তু ধরনের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

৪৬০. আবুল কাসেম আল-লালেকাঈ, আত-ত্বাবারী, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৭৪০। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে এ আছারটি সাব্যস্ত রয়েছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৪-৫)।

محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبًا، أو دائمًا. و [قوله: «من غير تفسير» أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات] .

[قول أبي عبيد القاسم بن سلام] :

وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: «هذه الأحاديث

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তিনি আবু হানীফা, মালেক এবং তাদের স্তরের আলেমদের কাছ থেকে হাদীস ও ইলম গ্রহণ করেছেন। তিনি আল্লাহর সিফাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন না করার ব্যাপারে ইজমা' বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, জাহমিয়্যাহগণ অধিকাংশ সময় অথবা সর্বদা আল্লাহকে 'অসাব্যস্তকরণ নীতি' অনুযায়ী না বাচক গুণেই গুণান্বিত করে।

আর এখানে ইমাম মুহাম্মাদ এর কথা: (তাফসীর বা 'ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান ছাড়া') এর অর্থ হচ্ছে সিফাতের ব্যাপারে অর্থ নিষ্ক্রীয়কারী জাহমিয়্যাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ; (না করা) যারা সিফাতের বিদ'আতী তাফসীর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) নীতি উদ্ভাবন করেছে, যা সাহাবী ও তাবে'য়ীদের 'সাব্যস্তকরণ' নীতির বিপরীত।

[আবু উবাইদ আল-ক্বাসেম ইবন সাল্লাম এর বক্তব্য]

ইমাম বাইহাক্বী ও অন্যান্যরা আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম(৪৬১) থেকে বিশুদ্ধ

জাহমিয়্যারা বলতো, 'আল্লাহ কিছু একটা, তবে কোনো কিছুর মতো নয়। ইমাম আহমাদ তার জবাবে বলেন, যে জিনিস কোনো জিনিসের মত নয় বিবেকবান সকলেই বলে সেটা আসলে কিছু নয়। তখন মানুষ বুঝতে পারলো যে, আসলে তারা কিছুই সাব্যস্ত করে না। বরং তারা নিজেদের থেকে প্রকাশ্যে এ ধরনের হেয়ালীপূর্ণ কথা বলে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে চায়।' [ইমাম আহমাদ, আর-রাদ্দু আলায যানাদিকাতে ওয়াল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২০৯]
জাহম ইবন সাফওয়ান মূলত সম্পূর্ণরূপে মু'আত্তিল ছিল। সে আল্লাহর জন্য নাম ও গুণ কোনোটিই সাব্যস্ত করতো না। সেজন্যই যখন বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুরা তার সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্কে জড়ালো তখন সে বললো, 'তিনি হচ্ছেন এই বাতাস, যা সবকিছুর সাথে, সবকিছুর মধ্যে, কোনো কিছুই তা থেকে মুক্ত নয়।' জাহম আরও বললো, 'আল্লাহ মা'দুম বা অস্তিত্বহীন [নাউযুবিল্লাহ], যখন সে মনে করলো যে আল্লাহকে কোনো ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করা যায় না।' দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৬৩৪, ৬৩৫; বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৩২০)। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যেহেতু কুরআনে কারীমে তাঁর নিজেকে 'শাইঅ' বা কিছু হওয়া সাব্যস্ত করেছেন। তাই তাঁর সম্পর্কে বলতে হবে যে, তিনি অবশ্যই 'কিছু' তবে সৃষ্ট কোনো কিছুর মতো নন। এটা বলা হবে না যে, তিনি কোনো কিছুর মতো নন। তবে এটাও জানা দরকার যে, 'শাইঅ' বা 'কিছু' আল্লাহর সিফাত নয় বরং খবর বা তাঁর সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা।

৪৬১. তিনি হচ্ছেন আবু 'উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম ইবন আব্দুল্লাহ। খোরাসানের অধিবাসী। তিনি ছিলেন শিক্ষক, পড়াতেন নাহু ও আরবী ভাষা। তার থেকে হাকেম হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "সুন্নাহ'র অনুসারী হওয়া জ্বলন্ত কয়লা হাত দিয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ করে রাখার মতো, সেটা আজকে আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তরবারীর আঘাত করার চেয়েও উত্তম।"

التي يقول فيها: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غِيَرِه»، «وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها»، «والكرسي موضع القدمين»،

সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: ঐসব হাদীস যাতে বর্ণিত আছে; "আমাদের রব হাসলেন তাঁর বান্দাদের নৈরাশ্য ও পরিবর্তন অত্যাসন্ন দেখে", "জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তোমার রব স্বীয় পা তাতে রাখবেন", "কুরসী হচ্ছে তার দু' পায়ের স্থান"(৪৬২),

---

আবু বকর আল-আম্বারী বলেন, 'আবু উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ রাতকে তিনভাগ করতেন। প্রথম এক-তৃতীয়াংশ সালাত আদায় করতেন, পরবর্তী তৃতীয়াংশ ঘুমাতেন আর শেষ এক-তৃতীয়াংশ গ্রন্থ লিখতেন। হিজরী ১৫৭ সালে তার জন্ম হয়, মৃত্যু হয় হিজরী ২২৪ সালে। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে গরীবুল হাদীস, আল-আমওয়াল, আন-নাসেখ ওয়াল মানসূখ ইত্যাদি।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৭/৩৫৫); আবু ইয়া'লা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (১/২৫৯); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/৬০); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৪৯০); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৫৪)।

৪৬২. এ 'আছার'টি ইবন আব্বাস ও আবু মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার আসারটি বর্ণনা করেছেন,

১- ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ, পৃ. ৭৯।
২- ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীর (৩/১৪০৬)।
৩- ইবন জারীর আত-তাবারী, আত-তাফসীর (৫/৩৯৮)।
৪- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/৩০১), নং ৫৮৬।
৫- ইবন মান্দাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৪৫।
৬- আব্দুর রাযযাক, আত-তাফসীর (২/২৫১)।
৭- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪৯)।
৮- আত-ত্বাবারানী, আল-কাবীর (১২/৩৯)।
৯- আদ-দারাকুত্বনী, আস-সিফাত, পৃ. ৪৯-৫০।
১০- আল-হারাওয়ী, আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৫৬-৫৭।
১১- দ্বিয়া, আল-মুখতারাহ (১০/৩১০)।
১২- দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল মিররীসী, পৃ. ৬৭-৭১। এর তাহকীকে হামেদ আল-ফিকী বলেন, এটি আমরা ইবন আব্বাস থেকে জানি, তা সহীহ ও বিখ্যাত।
১৩- আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৫৮২)।
১৪- হাকেম, আল-মুস্তাদরাক (২/২৮২)। তারপর বলেন, এ হাদীসটি সহীহ, শাইখাইন তথা বুখারী ও মুসলিমের শর্তে, তবে তারা সেটা আনেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন।
১৫- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৪৮)।
১৬- খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১২/২৫২)।
১৭- যাহাবী, আল-উলু, ৬১; মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১০২, তাহকীকারী শাইখ আলবানী বলেন, এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।
১৮- ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (১/৪৫৭)। তারপর তিনি বলেন, এটাকে ওকী' তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন..... তারপর সনদ দিয়ে তা নিয়ে এসেছেন।
১৯- ইবনুল জাওযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়া (১/৬-৭)।
২০- সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (২/১৭)। তারপর তিনি এটাকে আরও যারা বর্ণনা করেছেন সেসবের নাম বর্ণনা করেছেন। তারা হচ্ছেন ফিরইয়াবী, আব্দ ইবন হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবন আবী হাতিম, ত্বাবারানী, আবুশ শাইখ, হাকেম, খত্বীব, বাইহাক্বী।
ইমাম আবু যুর'আকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তা সহীহ, তবে আমরা এর কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাবো না। যেভাবে আমাদের কাছে এসেছে সেভাবে আমরা বলবো, সেটা যেভাবে হাদীসে এসেছে তেমনই।

وهذه الأحاديث في «الرؤية» هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أنا إذا سُئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدًا يفسرها» اهـ.

«أبو عبيد» أحد الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت

আল্লাহকে দেখা সংক্রান্ত এসব হাদীস, আমাদের নিকট এগুলো সবাই সত্য, যা নির্ভরযোগ্য আলেমগণ একজন থেকে আরেকজন পেয়েছেন। তবে আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে ব্যাখ্যা করি না।[৪৬৩] আমরা কাউকে পাইনি যে তার ব্যাখ্যা করেছেন।[৪৬৪]

আবু উবাইদ হচ্ছেন প্রসিদ্ধ সমসাময়িক চার ইমামের একজন। অন্য তিনজন: শাফে'য়ী, আহমদ, ইসহাক। ইলমুল ফিকহ, ইলমুল লুগাহ ও তা'ওয়ীল বিষয়ে তার জ্ঞান বর্ণনা

২১- ইবন মান্দাহ, আত-তাওহীদ (৩/৩০৯)।
২২- হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৬/৩২৩)। আর তিনি বলেন, এর রিজালগুলো সহীহ হাদীসের রিজাল।
ইবন মানযূর তার লিসানুল আরব (৬/১৯৪) গ্রন্থে তাহযীবুল্লুগাহ এর গ্রন্থকার আবু মানসূর আল-আযহারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'এ বর্ণনাটির ব্যাপারে আলেমগণ বিশুদ্ধ বলার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন।
শাইখ আবু আব্দির রহমান নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী এটার সনদকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন এর সনদের সকল লোক নির্ভরযোগ্য। দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১০২; সিলসিলা দ্ব'য়ীফাহ (২/৩০২-৩০৩), নং ৫৮৮।
আর আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর আছার, তা বর্ণনা করেছেন,
১- ইবন জারীর আত-ত্বাবারী, আত-তাফসীর ৩, ১০।
২- আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/৩০২), নং ৫৮৮।
৩- ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ, পৃ. ৭৮।
৪- বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৪৮)।
৫- আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৬২৭-৬২৮)।
৬- ইবন মান্দাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৪৬।
৭- সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (২/১৭)। তারপর তিনি সেটাকে ইবনুল মুনযিরের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।
৮- যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ৮৪; মুখতাসার আল-উলু, পৃ. ১২৩-১৩৪। আলবানী এর সনদকে সহীহ বলেছেন এবং বলেছেন, এর সকল রিজাল নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ। দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১২৪।

৪৬৩. অর্থাৎ সে ব্যাখ্যা করি না, যা জাহমিয়্যারা করে, যার ফলে সেগুলোকে অর্থশূন্য করা হয়। অনুরূপ তেমন ব্যাখ্যাও করি না, যার ফলে সেটার ধরণ নির্ধারণ কিংবা উদাহরণ-উপমা পেশ করা হয়। তদ্রূপ তেমন ব্যাখ্যাও করি না, যার ফলে সেটার শব্দের অর্থে বিকৃতি ও ইলহাদ আসে। এখানেও কোনোভাবেই 'তাফসীর বা ব্যাখ্যা' বলে অর্থ না করা বুঝানো হয়নি।

৪৬৪. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৯০)। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনুল হারেস আল-ফকীহ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু মুহাম্মাদ ইবন হাইয়ান আল-আসফাহানী, যাতে তাকে তার দাদা ইজাযত দিয়েছিল, তিনি আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি বলেন, আমি আবু উবাইদকে বলতে শুনেছি.... আর তিনি তা উল্লেখ করেন।
তাছাড়া এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, আস-সিফাত পৃ. ৬৮-৬৯ এর কাছাকাছি শব্দে।
অনুরূপ আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ২৫৫।
লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৫২৬)।
ইবন মান্দাহ, আত-তাওহীদ (১/২৩২)।
ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৪৯)।
যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১২৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৫০৫)। আর আলবানী এর সনদ মুখতাসারুল উলুতে বিশুদ্ধ বলেছেন।

فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسرها. [أي تفسير الجهمية].

[قول عبد الله بن المبارك]:

وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلاً قال له: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة. عنى صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: «أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه» ونحو هذا.

أراد ابن المبارك: أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟

করার চেয়েও বেশি বিখ্যাত। তিনি সেই যুগের লোক ছিলেন যে যুগে ফিতনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রকাশ পেয়েছিল।(৪৬৫) তা সত্ত্বেও তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি এমন কোনো আলেমকে পাননি যে এগুলোকে জাহমিয়্যাদের ন্যায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে।

[ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এর বক্তব্য]

ইমাম লালেকাঈ এবং বাইহাক্বী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি(৪৬৬) তাকে বলল: হে আবু আব্দির রহমান! আমি সিফাত অপছন্দ করি। অর্থাৎ রবের সিফাত। তখন ইবনুল মুবারক তাকে বললেন: আমি তা সকলের চেয়ে বেশি অপছন্দ করি, তবে কুরআন যখন কোনো কথা বলে আমরাও সেটা বলি। কোনো ব্যাপারে হাদীস-আছার আসলে আমরা সেটা বলতে সাহস করি।(৪৬৭) অনুরূপ কথা।

ইবনুল মুবারকের উদ্দেশ্য হলো, আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহকে কোনো সিফাত দ্বারা গুণান্বিত করতে শুরু করা অপছন্দ করি; যদি না তা কুরআন-হাদীসে আসে।

তেমনি আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ও অন্যান্যরা বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনুল মুবারক(৪৬৮) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে বলা হলো: আমরা কীভাবে আমাদের রবকে জানবো? তিনি বললেন:

---

৪৬৫. তিনি ১৫৭ হিজরী থেকে ২০৪ হিজরী সাল সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে অবস্থান করেছেন।

৪৬৬. অপরাপর বর্ণনায় এ লোকের নাম এসেছে। তিনি হচ্ছেন আফলাহ ইবন মুহাম্মাদ। যেমনটি এসেছে নামসহ লালেকাঈ, বাইহাক্বী, যাহাবীর আল-উলু গ্রন্থে।

৪৬৭. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৪৩১); নং ৭৩৭; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৫৮-১৫৯), নং ৭২৬; যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১১০-১১১; দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৫২।

৪৬৮. ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন খুরাসানের ইমাম। ইবন তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেছেন যে, জাহমিয়্যাদের নীতি ও সিফাত অস্বীকার করার প্রবণতা যখন খুরাসানেই সূত্রপাত হয়েছিল তখন খুরাসানের আলেমগণের পক্ষ থেকে সে সময়ে জাহমিয়্যাদের ওপর এমন নিন্দার ঝড় উঠেছিল তা অন্য কোনো শহর ও গঞ্জে দেখা যায়নি, যেখানে এ বিদ'আতের উৎপত্তি ঘটেনি বা তারা শুনতে পাননি। যেমনিভাবে কূফাতে যখন 'ইরজা' (আমল ঈমানের অঙ্গ নয়) এ নীতি প্রচার-প্রসার লাভ করলো তখন কূফার আলেমগণের পক্ষ থেকে সেটার নিন্দা ও বিরোধিতা খুব ব্যাপক আকারে ছিল। সুতরাং তারা অন্য এলাকার আলেমগণের তুলনায় এ বিদ'আতের বিরুদ্ধে বেশি সোচ্চার হয়েছিল। [দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৩১১)]

قال: «بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية: أنه ههنا في الأرض» وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.

[قول حماد بن زيد] :

وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب ـ الإمام ـ: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية، فقال: «إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء».

এভাবে যে, তিনি সাত আসমানের উপরে, 'আরশের উপরে। সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক। আমরা জাহমিয়্যাদের ন্যায়[৪৬৯] বলি না যে, তিনি এখানে যমীনে।[৪৭০] ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন।[৪৭১]

[হাম্মাদ ইবন যায়েদ এর বক্তব্য]

অনুরূপভাবে ইমাম লালেকাঈ, ইমাম সুলায়মান ইবন হারব[৪৭২] থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন যে, আমি হাম্মাদ ইবন যায়েদকে[৪৭৩] বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: জাহমিয়ারা প্রচেষ্টা চালায় এটা বলতে যে, আসমানের উপরে[৪৭৪] কিছুই

৪৬৯. এটি জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের সূফীবাদ দ্বারা প্রভাবিত অংশের মত; যেমনটি ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৪৭০. দেখুন, আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১১১, ১৭৪, ৩০৭); দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল মিররীসী, পৃ. ২৩-২৪; আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৩৯-৪০, তাহকীক বদর আলে-বদর; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৬৯); বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৩১, তাহকীক, আব্দুর রহমান উমাইরাহ; যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১১০; মুখতাসার, পৃ. ১৫১-১৫২; আল-আরবাঈন, পৃ. ৮১; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৩৪, তিনি বলেন, এ আছারটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদে আলী ইবনুল হাসান ইবন শাকীকের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, তারপর তিনি তা বলেন। ইবনুল কাইয়্যেম উক্ত কিতাবের অন্যত্র ২১৩-২১৪ পৃষ্ঠায় বলেন, বরং এটি ইবনুল মুবারক থেকে প্রায় মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তাকে বলা হলো..... তারপর বাকী কথা বর্ণনা করলেন। অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করে বলেন, 'বিআসানিদা সীহাহ'। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৮৪)।

৪৭১. ইউসুফ ইবন মূসা আল-ক্বাত্তান বলেন, আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমাদকে) বলা হলো, আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আসমানের উপরে তাঁর 'আরশের উপরে, সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান সর্বত্র? তিনি বললেন, "হ্যাঁ। তিনি তাঁর 'আরশের উপর, কোনো কিছু তার জ্ঞানের বাইরে নয়।" দেখুন, ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৫৯), নং ১১৫; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৬৭৪; ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল উলু, পৃ. ১১৬; যাহাবী, আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম (২/১১১৩), নং ৪৩৮।

৪৭২. তিনি হচ্ছেন সুলাইমান ইবন হারব ইবন বুজাইল, আবু আইয়্যুব আল-আযদী। মক্কার বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন। তার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন, সুলাইমান ইবন হারব ইমামগণের একজন। তার জন্ম হিজরী ১৪০ সালে, আর মৃত্যু হিজরী ২২৪ সালে বসরায়। দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৭/৩০০); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৯/৩৩); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৩৩০); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৪/১৭৮)।

৪৭৩. যাহাবী বলেন, হাম্মাদ ইবন যায়েদ ইলম ও সম্মানে ইরাকীদের মাঝে তেমনি মর্যাদাপূর্ণ যেমনি মালেক ইবন আনাস হিজাযীদের মাঝে মর্যাদাপূর্ণ। দেখুন, আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম (২/৯৭০)।

৪৭৪. আসমানের উপরে বলে সবকিছুর উপরে উদ্দেশ্য। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলেন, 'সামা' শব্দের অর্থ উপরে। তাই যেখানেই 'সামা' এসেছে সেখানেই অর্থ হবে সর্বোচ্চে, সবকিছুর উপরে। কোথাও এর অর্থ আকাশের অভ্যন্তরে নয়। আর 'ফী' শব্দটি আরবী ভাষায় প্রচুর পরিমাণে 'আলা'

এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'ফিস সামায়ে' এর অর্থ আসমানের মধ্যে না হয়ে 'আলাস সামায়ি' হবে, যার অর্থ, আসমানের উপরে। আর যা আসমানের উপরে তা সর্বোপরে, সেটা 'আরশের উপরে হওয়ার বিরোধী নয়। এটা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়। আর 'ফী' এর অর্থ উপরে হওয়ার বহু প্রমাণ কুরআনে কারীমে রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, 'ফামশূ ফী মানাকিবিহা' অর্থাৎ 'সুতরাং তোমরা যমীনের ঘাঁড়ে চলাফেরা কর।' এখানে 'ফী' বলে 'আলা' বুঝানো হয়েছে। কারণ মানুষ যমীনের ভিতরে চলাফেরা করে না, যমীনের ঘাঁড়ের উপর চলাফেরা করে থাকে।

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বোচ্চ পবিত্র সত্তা, এ বিষয়টি ফিত্বরাত বা মানুষের স্বভাবজাত জ্ঞানেই মানুষ বুঝতে পারে। এর অস্বীকারকারী বিদ'আতীরা তাদের ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত জ্ঞানেই বুঝতে পারে যে, 'জগতের ভিতরে নয়, বাইরেও নয়, এমন কথা বলার অর্থ হচ্ছে তাঁকে অস্তিত্বহীন বলা। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৩০০)।

ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে এটার জ্ঞানের তুলনায়, তিনি যেসকল সৃষ্টির উপরে, সেটার জ্ঞান ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত বিদ্যায় মানুষের কাছে বেশি পরিচিত, শরী'আতে তা খুবই প্রসিদ্ধ আর উম্মতের সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের নিকট বিশালভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর তাই জাহমিয়্যারা আল্লাহর সর্বোচ্চ সত্তা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার কথা গোপন করে শুধু আল্লাহকে হাশরের দিন দেখা না যাওয়া ইত্যাদি বিষয় বেশি প্রকাশ করে। যাতে করে তারা যেসব জিনিস প্রকাশ করে যেমন তাঁকে হাশরের দিন দেখা না যাওয়া, কুরআন সৃষ্ট, এসব তথ্যের আড়ালে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপরে থাকার বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে। সালাফে সালেহীন ইমামগণ তাদের এসব চক্রান্ত ও চালাকি ঠিকই বুঝতেন, তারা জাহমিয়াদের কথার স্বরে সেটা জেনে ফেলতেন। তারা বুঝতেন যে, জাহমিয়ারা কোন জিনিস প্রকাশ করছে আর কোন জিনিস অস্বীকার করছে; কারণ সালাফগণ জাহমিয়াদের মূলনীতি জানতেন। জাহমিয়ারা তো কেবল এজন্যই তাঁকে দেখা যাওয়ার বিষয়, অনুরূপ তাঁর যথাযথভাবে কথা বলার বিষয়টি অস্বীকার করতো, কারণ তারা জানতো যে, তাঁকে দেখা ও তাঁর কথা বলা দাবি করে যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপরে রয়েছেন। জাহমিয়ারা যদি আল্লাহর কথা বলা ও দেখার বিষয়টি মেনে নিত তবে আবশ্যিকভাবে তারা মহান আল্লাহকে 'আরশের উপর মানতে বাধ্য হতো।" [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৩১২-৩১৩)]

আর যখন ইবনুল হাইসাম ও ইবন ফূওরাক সুলতান মাহমূদ সবুক্তগীনের দরবারে মুনাযারা করলো, তখন ইবন ফূওরাক দাবি করলো যে, আল্লাহ তা'আলা জগতের ভিতরেও নয়, বাইরেও নয়, পৃথকও নয়, সাথেও নয়। তখন সুলতান মাহমূদ সবুক্তগীন তাকে বললেন, তুমি যদি অস্তিত্বহীন কোনো কিছুর গুণ বর্ণনা করতে তাহলে কি সেটা সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক কিছু বলতে পারতে? অথবা তিনি বলেছেন, তুমি এ রবের যে গুণ বর্ণনা করেছ তার মাঝে ও অস্তিত্বহীন কিছুর মাঝে পার্থক্য করে দেখাও। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৫৩); মিনহাজুস সুন্নাহ (৩/৪২৯); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/২৬৮); আর-রিসালাতুত তাদমীরিয়্যাহ, পৃ. ৬০।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, যে জিনিস জগতের ভিতরেও নয়, বাইরেও নয়, সে জিনিসের ব্যাপারে মানুষের মন বলে যে, সেটা কেবল অস্তিত্বহীন জিনিসই হতে পারে। মানুষের অন্তরে এ স্বীকৃতি, সেটার স্বীকৃতির চেয়ে বড় যে, যাকে দেখা যাবে না তা কেবল অস্তিত্বহীন জিনিসই হতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমটির অস্তিত্বহীন হওয়ার বিষয় অন্তরে প্রাথমিকভাবে ও আবশ্যিকভাবে যত বড় আকারে ধরা পড়ে তা দ্বিতীয়টির বিষয়ে তত প্রাথমিকভাবে ও আবশ্যিকভাবে নয়।' [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৩১৩)]

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, প্রাথমিক জাহমিয়্যারা যা বলতে চেষ্টা করতো, কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে বলতো না, বরং অন্যান্য জিনিসের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করতো, পরবর্তী জাহমিয়্যারা সেটা স্পষ্ট করে বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তখনকার যুগে সুন্নাহ'র প্রচার-প্রসার, ইমামদের আধিক্য তাদেরকে তা স্পষ্ট করে বলা থেকে বাঁধা দিত; কিন্তু পরবর্তীতে যখন উত্তম যুগ থেকে মানুষ দূরে চলে গেল, সুন্নাহ গোপন হতে লাগলো, ইমামগণ চলে গেলেন তখনই আল্লাহর গুণ অস্বীকারকারী জাহমিয়্যারা তাদের আসল চেহারা দেখাতে আরম্ভ করলো, অর্থাৎ আল্লাহর সর্বোচ্চ সত্তা হওয়ার বিষয়টি যা তাদের পূর্ববর্তীরা গোপন করে রাখতো, প্রকাশ করতে সমর্থ হতো না। দেখুন, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৩৬।

[قول سعيد بن عامر الضبعي]:

وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر الضبعي. إمام أهل

নেই।[৪৭৫],[৪৭৬]

[সাঈদ ইবন 'আমের আদ-দুবা'ঈ এর বক্তব্য]

ইবন আবী হাতীম স্বীয় 'আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ'[৪৭৭] গ্রন্থে সা'ঈদ ইবন আমের

---

৪৭৫. বর্ণনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে। যেমন,

১- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ তাঁর আস-সুন্নাহ (১/১১৭-১১৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী, আলী ইবন মুসলিম আত-তূসী, তারা দুজনে বলেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবন হারব, তিনি বলেন, আমি হাম্মাদ ইবন যায়েদকে বলতে শুনেছি... তারপর তা বর্ণনা করেন।

২- অনুরূপ ইমাম খাল্লালও তা আস-সুন্নায় বর্ণনা করেন।

৩- আরও বর্ণনা করেন, বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৩১;

৪- ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল উলু, পৃ. ১৭১-১৭২ আর তিনি সেটাকে আসরম এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

৫- অনুরূপ তা বর্ণনা করেন যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১০৬-১০৭ আর তিনি সেটাকে ইবন আবী হাতেম এর 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ' গ্রন্থের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেন, তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবন হারব, তিনি বলেন আমি হাম্মাদ ইবন যায়েদকে বলতে শুনেছি... তারপর তিনি তা বর্ণনা করেন। আরও দেখুন, মুখতাসারুল 'উলু, পৃ. ১৪৬।

৬- ইবনুল কাইয়্যেম ইজতিমা'উল জুয়ূশ আল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৬-২১৪।

এ বর্ণনাটিকে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বিশুদ্ধ বলেছেন যেমনটি উপরের ভাষ্যে এসেছে। আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৮৩-১৮৪); তাছাড়া শাইখ আলবানী বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৪৭।

৪৭৬. ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ হাম্মাদ ইবন যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ'র এ বক্তব্যের ওপর টীকা দিয়ে বলেন, সালাফে সালেহীনের বক্তব্য, সুন্নাহ'র ইমামগণের বক্তব্য, বরং সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণের সকলের বক্তব্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমানসমূহের উপরে। আর তিনি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, এর ওপর তাদের প্রমাণ হচ্ছে, কুরআন, হাদীসের ভাষ্য ও সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তীদের আছার।

এর বিপরীতে পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদদের মত হচ্ছে, আল্লাহ আসমানের উপরেও নয়, 'আরশের উপরেও নয়, আসমানসমূহের উপরেও নয়, যমীনেও নয়। জগতের ভেতরেও নয়, বাইরেও নয়, সৃষ্টি থেকে তিনি আলাদাও নন, তাদের সাথেও নন। আরও বলে, যত কিছু আছে সবই জিসিম বা দেহ এর গুণ। আর আল্লাহ তো জিসিম বা দেহ থেকে মুক্ত।...

দেখুন, আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম (২/৯৭০)।

৪৭৭. এ গ্রন্থটি ইমাম ইবন আবী হাতেম রচিত গ্রন্থের তালিকায় অনেকেই উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৫৯)। সেখান থেকে তিনি এ স্থানে কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। অন্যত্র বলেন (১৩/২৬৪), ইবন আবী হাতেম এর কিতাব আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ একটি বড় কিতাব, আমি সে কিতাব থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছি।

২- ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/৮৩০), সেখানে তিনি বলেন, জাহমিয়্যাদের মতামত খণ্ডন করে রচিত তাঁর (ইবন আবি হাতেম এর) একটি বড় গ্রন্থ রয়েছে, যা তার ইমাম ও নেতা হওয়া প্রমাণ করে।

৩- সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৩/৩২৫)।

৪- সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত (১৮/১৩৬)।

৫- ইবন হাজার, তা'জীলুল মানফা'আহ (১/৮২৮)।

البصرة علمًا ودينًا، من شيوخ أحمد. أنه ذكر عنده الجهمية، فقال: «هم شرٌّ قولًا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. وقالوا هم: ليس عليه شيء».

[قول الإمام ابن خزيمة]:

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ـ إمام الأئمة: «من لم يقل: إن الله فوق سماواته على

আদ-দ্বুবা'ঈ[৪৭৮] থেকে যিনি জ্ঞানে ও দীনদারিতে বসরার ইমাম, ইমাম আহমদের শাইখ, তার কাছে জাহমিয়্যাদের বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন: এরা কথায় ইয়াহূদী-নাসারা থেকেও নিকৃষ্ট; কারণ ইয়াহূদী-নাসারা সহ সব ধর্মালম্বী মুসলিমদের সাথে একমত যে, আল্লাহর 'আরশের উপরে। আর তাদের বক্তব্য: 'আরশের উপরে কিছু নেই।[৪৭৯]

[ইমাম ইবন খুযাইমাহ এর বক্তব্য]

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমাহ বলেন: "যে ব্যক্তি বলবে না যে, আল্লাহ আসমানের উপরে, 'আরশের উপরে, সৃষ্টির থেকে ভিন্ন ও পৃথক, তার তাওবা করা

৬- বুরহানুদ্দীন ইবন মুফলিহ, আল-মাকসাদুল আরশাদ (১/২৮২), (২/১০৬)।
৭- সুয়ূত্বী, ত্বাবাক্বাতুল মুফাসসিরীন পৃ. ৫২।
৮- কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ, পৃ, ৩৯।
৯- যিরিকলী, আল-আ'লাম (৩/৩২৪) ইত্যাদি।
১০- ফুয়াদ সিযকীন, তারীখুত তুরাস (১/৩৫৫)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ কিতাবের কথা তার একাধিক গ্রন্থে বলেছেন, সেখান থেকে অনেক উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৪৪০), (২/৪২, ৫২৫); মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৫০৬, ৫৭১), (১৭/৭৪); দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬১); মিনহাজুস সুন্নাহ (২/২৫২, ৩৬৫)।

৪৭৮. তিনি হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ সা'ঈদ ইবন 'আমের আদ-দ্বুবা'য়ী আল-বসরী। বড় হাফেযদের একজন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন হাবীব আশ-শহীদ, ইউনুস ইবন 'উবাইদ প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবন হাম্বল প্রমুখ। কাত্তান বলেন, সা'ঈদ ইবন 'আমের গত চল্লিশ বছর ধরে এ শহরের শিক্ষক।
যিয়াদ ইবন আইয়্যুব বলেন, আমি বসরায় সা'ঈদ ইবন 'আমের আদ-দ্বুবা'ঈ মতো কাউকে দেখিনি।
ইমাম আহমাদ বলেন, আমি তার থেকে ও হুসাইন আল-জু'ফী থেকে উৎকৃষ্ট কাউকে দেখিনি।
হিজরী ২০৮ সালে তার মৃত্যু হয়।
দেখুন, ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/৩৫১); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/৩৮৫); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/২০)।

৪৭৯. এ আছারটি যারা বর্ণনা করেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন,
১- বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ পৃ. ৩১।
২- যাহাবী, আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম (২/১০৩৩), নং ৩৯১; সেখানকার সনদ হচ্ছে, ইবন আবী হাতেম থেকে, তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে সা'ঈদ ইবন আমের আদ-দ্বুবা'ঈ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে... তারপর তিনি তা বর্ণনা করেন। দেখুন, মুখতাসারুল 'উলু, পৃ. ১৬৮।
৩- যাহাবী, আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৮২।
৪- ইবনুল কাইয়্যম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২১৫।
আরও দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬১); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৮৪)।

عرشه بائن من خلقه، وجب أن يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه ثم أُلقي على مزبلة، لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة، ولا أهل الذمة» ، [ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح] .

আবশ্যক। তা না হলে তাকে হত্যা করা হবে।(৪৮০) তারপর আস্তাকুড়ে ফেলা হবে, যাতে তার দূর্গন্ধে কিবলা অনুসারী (মুসলিম) ও যিম্মীগণ কষ্ট না পায়।”(৪৮১) এটা তার থেকে আল-হাকিম(৪৮২) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন(৪৮৩)।(৪৮৪)

---

৪৮০. এর আছারটির বাকী অংশ হচ্ছে, ‘আর তার সম্পদ ফাই হিসেবে গণ্য হবে, কোনো মুসলিম তার ওয়ারিশ হবে না; কারণ মুসলিম কাফেরের ওয়ারিশ হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিম কাফের এর ওয়ারিশ হয় না, আর কাফের মুসলিমের ওয়ারিশ হয় না।”

৪৮১. আছারটি যারা বর্ণনা করেছেন তারা হচ্ছেন:

১- হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৭৪।
২- আবু ইসমা'ঈল আস-সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২০-২১।
৩- ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল উলু, পৃ. ১৮৫।
৪- যাহাবী, আল-উলূ, পৃ. ১৫২; মুখতাসার, পৃ. ২২৫-২২৬।
৫- যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৭২৮)।
৬- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬৪)।
৭- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৯৪।

৪৮২. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হামদুওইয়াহ, যিনি ইবনুল বাইয়ে' নামে প্রসিদ্ধ, আদ-দ্বিব্বী, আত-ত্বাহমানী আন-নাইসাপুরী। ইসলামের বড় হাফেযদের একজন। আল-মুস্তাদরাক কিতাবের গ্রন্থাকার। ছোট বয়স থেকেই তার পিতা ও মামার তত্ত্বাবধানে হাদীস সংগ্রহে মনোযোগ দেন। তিনি হাদীস শুনেছেন মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব আল-আসাম্ম, ইবনুল আখরাম প্রমুখ থেকে। বলা হয়, তার উস্তাদের সংখ্যা দু' হাজারের উপরে। আর তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেন আবু যর আল-হারাওয়ী, আবু ইয়া'লা আল-খালীলী, আল-বাইহাক্বী প্রমুখ।
তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, ‘তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন, হাদীস তাখরীজ করেছেন, জারহ ও তা'দীল করেছেন, তাসহীহ ও তা'লীল করেছেন। তিনি ছিলেন ইলমের সমুদ্র; তবে তার মাঝে কিছুটা শিয়া প্রভাব ছিল।’
তার জন্ম সাল ছিল ৩২১ হিজরী, আর মৃত্যু সাল ছিল ৪০৩ হিজরী। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে, আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, তারীখে নাইসাপুর, আল-ইকলীল প্রভৃতি।
দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৫/৪৭৩); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/২৮০); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/১৬২); তাযকিরাতুল হুফফায (২/৭২০); ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (৫/২৩২); কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুস্তাত্বরাফাহ, পৃ. ২১।

৪৮৩. দেখুন, মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস, পৃ. ২৮৫; নং ১৮৭।

৪৮৪. সিফাত অস্বীকারকারী কাফের হওয়ার কারণ হচ্ছে,

১- এর নামই হচ্ছে তা'ত্বীল। আর শির্কের আসল হচ্ছে তা'ত্বীল করা বা সৃষ্টিকে স্রষ্টাশূন্য করা বা স্রষ্টাকে তার গুণ থেকে শূন্য করা বা স্রষ্টাকে সৃষ্টি থেকে আলাদা করে সাব্যস্ত না করা। যেমনটি ইবনুল কাইয়্যেম তার আল-জাওয়াবুল কাফী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে আমার গ্রন্থ ‘আশ-শির্কু ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস’ দেখা যেতে পারে।
২- অপর যে কারণে কাফের হবে তা হচ্ছে, জানানোর পরে যা সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত তা অস্বীকার করা।
৩- অথবা গ্রহণযোগ্য ওযরের অনুবর্তী না হয়ে সন্দেহ ব্যতীতই উদ্দেশ্যমূলকভাবে আল্লাহর সত্তা ও সিফাতে বিকৃতি সাধণের মাধ্যমে ইলহাদ করা।

দেখুন, ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ দায়েমাহ বিস সাউদিয়্যাহ (৩/১২৮)।

[قول عباد بن العوام الواسطي] :

وقد روى عبد الله بن أحمد، عن عباد بن العوام الواسطي - إمام أهل واسط، من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد. قال: كلمت بشرًا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء.

['আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম আল-ওয়াসেত্বী এর বক্তব্য]

ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ স্বীয় সনদে ওয়াসিতবাসীদের ইমাম শাফে'য়ী ও আহমাদের শাইখদের স্তরের 'আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম আল-ওয়াসেত্বী[৪৮৫] থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি বিশর আল-মিররীসী এবং তার ছাত্রদের সাথে কথা বলেছি, দেখেছি যে তাদের শেষ কথা যেখানে শেষ হয় তা হচ্ছে এটা বলার মাধ্যমে যে, উপরে কিছুই

উপরোক্ত যেকোনো একটি কারণই কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাহলে যদি কারও মাঝে সব কয়টির সমাবেশ ঘটে তবে তার কুফরীর ব্যাপারে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে?

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ সিফাত অস্বীকার করার বিষয়টিকে দু' প্রকারে ভাগ করেছেন:

এক. মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে অস্বীকার; তখন সেটা যে কুফরী এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

দুই. অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অস্বীকার; আর তখন তা দু' প্রকার:

১- যদি এ অপব্যাখ্যার ব্যাপারে আরবী ভাষায় কোনো সুযোগ রয়েছে, তখন তা কুফরীতে নিমজ্জিত করে না। সেটা ভুল হিসেবে ধর্তব্য হবে।

২- যদি এ অপব্যাখ্যার ব্যাপারে আরবী ভাষায় কোনো সুযোগ নেই, তখন তা কাফির হওয়া আবশ্যক করে; কারণ সে তো আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করলো, আর তখন সে যেন প্রকৃত অর্থেই তাতে মিথ্যারোপ করলো।

দেখুন, উসাইমীন, আল-মাজমূ'উস সামীন (২/৬২-৬৩)।

ইমাম ইবন কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, যে কেউ ইস্তেওয়া বা 'আরশের উপর উঠা অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে; কারণ এতে আল্লাহর সংবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, আল্লাহর কালামের সাথে কুফরী করা হয়, আর যে কেউ কুরআনের কোনো সর্বসম্মত একটি বর্ণ অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তাহলে যে কুরআনের সাতটি আয়াতকে অস্বীকার করবে, আল্লাহর সংবাদকে সাতটি জায়গায় অস্বীকার করবে, সে কাফের না হয়ে কী হবে? দেখুন, ইবন কুদামাহ, যাম্মুত তা'ওয়ীল, পৃ. ২৬।

এজন্যই ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যে কেউ প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও বিরোধিতা করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তাঁর থেকে তা ইবন কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ তার ইসবাতু সিফাতিল উলু গ্রন্থে পৃ. ১২৪ তার উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছেন। অনুরূপ ইমাম ইবন জারীর আত-ত্বাবারীও তাঁর আত-তাবসীর ফী মাআলিমিদ দীন গ্রন্থে, পৃ. ১৩৯ তার উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছেন।

৪৮৫. তিনি হচ্ছেন, আবু সাহল 'আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম ইবন 'উমার ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুনযির আল-কিলাবী, আল-ওয়াসেত্বী। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন আবু মালেক আল-আশজা'ঈ, ইবন আবী নাজীহ আল-মাক্কী প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন আহমাদ ইবন হাম্বল, 'আমর আন-নাক্বিদ প্রমুখ। তার সম্পর্কে ইবন সা'দ বলেছেন, তিনি ছিলেন তার সকল কাজে অত্যন্ত ভদ্র ও শরীফ মানুষ। হাসান ইবন 'আরাফাহ বলেন, আমাকে ওকী' রাহিমাহুল্লাহ 'আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার মতো নেই।' হিজরী ১৮৫ সালে তার মৃত্যু হয়।

দেখুন, খলীফা, তারীখে খলীফা ইবন খাইয়াত্ব, পৃ. ৪৫৭; খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১১/১০৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৪৪৯)।

[قول عبد الرحمن بن مهدي]:

وعن عبدالرحمن بن مهدي، الإمام المشهور، أنه قال: «ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى، والله، أن لا يناكحوا، ولا يورثوا».

নেই।"(৪৮৬)

[ইমাম আব্দুর রহমান ইবন মাহদীর বক্তব্য]

অনুরূপভাবে তিনি (আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ) প্রসিদ্ধ ইমাম আব্দুর রহমান ইবন মাহদী(৪৮৭) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্য হতে জাহমীদের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ নেই। তারা ঘুরেফিরে এটাই বলে যে, উপরে কিছুই নেই। আল্লাহর কসম, আমি মনে করি যে, তাদের পরস্পর বিবাহ ও উত্তরাধিকারিত্ব নেই।(৪৮৮)"

---

৪৮৬. এ আছারটি বর্ণনা করেছেন,

১- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১২৬-১২৭), আছার নং ৬৫, ১৯৫, ৫১৬। তিনি তা যিয়াদ ইবন আইয়্যুব থেকে, তিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবন ইসমা'ঈল আল-ওয়াসেত্বীকে বলতে শুনেছি, আমি 'আব্বাদ ইবনুল 'আওয়ামকে বলতে শুনেছি,.. অতঃপর তিনি তা বর্ণনা করেন।

২- যাহাবী তা আল-উলুতে বর্ণনা করেন, পৃ. ২/৯৯৭, নং ৩৬৭; তার শেষে আছে, আমার মত হচ্ছে, তাদের সাথে বিয়ে-শাদী চলবে না, তাদের কেউ পরস্পর ওয়ারিশ হবে না। দেখুন মুখতাসার, পৃ. ১৫৪।

৩- দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬১)।

৪- মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৮৫) (ফাতাওয়া আল-মারাকেশিয়্যাহ)।

৫- ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২১৫-২১৬।

৪৮৭. তিনি হচ্ছেন আবু সা'ঈদ আব্দুর রহমান ইবন মাহদী ইবন হাসসান ইবন আব্দুর রহমান আল-আম্বরী, আল-বসরী। দীনের বড় ইমাম, হাদীসের সনদ ও মতনের সমালোচনাকারী বড় আলেম। তিনি হাদীস শুনেছেন সুফইয়ান, শু'বা প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন ইবনুল মাদীনী, ইবন মা'ঈন, আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখ। ছোটকাল থেকেই ইলম অন্বেষণ করেন, আলেমগণ তাঁর উপর প্রশংসার বাণী দিয়েছেন প্রচুর পরিমাণে। তার সম্পর্কে শাফে'য়ী বলেন, 'এ বিষয়ে তার সমপর্যায়ের কাউকে আমি জানি না'। আলী ইবনুল মাদীনী তার সম্পর্কে বলেন, যদি আমি কাবার রুকনে ইবরাহীমী ও মাকামে ইবরাহীমীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে চাই যে, আমি আব্দুর রহমান ইবন মাহদীর চেয়ে হাদীসে অভিজ্ঞ কাউকে জানি না তাহলে অবশ্যই বলতে পারি। আইয়্যুব ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বলেন, আমরা যখন দীন ও দুনিয়া একত্রে দেখতে চাইতাম তখন আমরা আব্দুর রহমান ইবন মাহদীর ঘরে যেতাম। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ইমাম, হুজ্জত, ইলম ও আমলে আদর্শ।

তার জন্ম হিজরী ১৩৫ সালে, আর মৃত্যু হিজরী ১৯৮ সালে।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (৭/২৯৭); আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৯/৩); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১০/২৪০); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/১৯২); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (১/৩৫৫)।

৪৮৮. এ আছারটি দেখুন,

১- খাল্লাল, আস-সুন্নাহ।

২- আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১২০-১২১), নং ১৪৭।

৩- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ১/৩২০।

৪- বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৩৪-৩৫।

৫- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬১)।

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلِّم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يُستتابوا، فإن تابوا وإلا قُتلوا».

[قول الأصمعي]:

وعن الأصمعي قال: «قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على

অনুরূপভাবে আবদুর রহমান ইবন আবি হাতীম স্বীয় 'আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ' গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবন মাহদী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "জাহম ও তার অনুসারীরা বলতে চায় যে, আল্লাহ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেননি। তারা বলতে চায় যে, আসমানের উপর কিছুই নেই।[৪৮৯] আর আল্লাহ 'আরশের উপর নন। আমি মনে করি, তাদের তাওবা করানো। তা না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।"[৪৯০]

[ইমাম আসমা'ঈ এর বক্তব্য]

ইমাম আসমা'ঈ[৪৯১] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জাহামের স্ত্রী আগমন করে

৪৮৯. অর্থাৎ তাদের শেষ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, তারা কিছুর ইবাদত করবে না। জাহমিয়্যাদের মুনাযির ও তাদের কালামশাস্ত্রবিদরা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি জগতের ভেতরেও নন, জগতের বাইরেও নন। বস্তুত এটি হচ্ছে অস্তিত্বহীনের গুণ, যাকে জিনিস বা বস্তু বা ব্যক্তি কিছুই বলা যায় না।

৪৯০. আছারটি যারা নিয়ে এসেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন,

১- বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (১/৩৮৬), সেখানে এসেছে, আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফেয ও আবু সা'ঈদ ইবন আবী 'আমর থেকে বর্ণিত, তারা দু'জনে বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা শুনিয়েছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা শুনিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-ওয়াররাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন 'আমর ইবনুল আব্বাস, তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবন মাহদীকে বলতে শুনেছি... তারপর তা বর্ণনা করেন।

২- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১১৯-১২০), নং ৪৪, ৪৮।

৩- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/৩১৬-৩১৭)।

৪- বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৮৩।

৫- ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৮৪)।

৬- ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬১)। শাইখুল ইসলাম বলেন, প্রামাণ্য সনদ দিয়ে বর্ণিত।

৭- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২১৪।

৮- আবু দাউদ, মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ, পৃ. ২৬২।

৯- আর তা ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেছেন, আল-উলু, পৃ. ১১৮ এবং বলেছেন, একাধিক ব্যক্তি তা আব্দুর রহমান ইবন মাহদী থেকে সহীহ সনদে নিয়ে এসেছেন।

১০- তাছাড়া যাহাবী আরও বর্ণনা করেছেন তাঁর আরবা'ঈন গ্রন্থে, পৃ. ৮১।

১১- অনুরূপ আরও বর্ণনা করেছেন ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে (৯/১৯৯-২০০)।

৪৯১. তিনি হচ্ছেন আবু সা'ঈদ আব্দুল মালেক ইবন কারীব ইবন আব্দুল মালেক ইবন আলী ইবন আসমা', আল-আসমা'ঈ, আল-বসরী। ভাষা ও সাহিত্যে যার কথা প্রমাণ। তিনি হাদীস শুনেছেন ইবন 'আওন, সুলাইমান আত-তাইমী, আবু 'আমর ইবনুল 'আলা প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস শুনেছেন আবু উবাইদ, ইবন মা'ঈন, ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-মাওসেলী, আবু হাতেম আর-রাযী প্রমুখ। শাফে'য়ী বলেন, আরবদের কেউ আসমা'ঈর মতো সুন্দর ইবারতে কথা ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। ইমাম আহমাদ তার সুন্নাতের ওপর থাকার ভূয়শী প্রশংসা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন,

عرشه. فقالت: محدود على محدود؟ . وقال الأصمعي:

দাবাগীনে[৪৯২] অবতরণ করল। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি বলল: আল্লাহ 'আরশের উপরে। সে (স্ত্রী) বলল: সীমাবদ্ধের[৪৯৩] ওপর সীমাবদ্ধ।[৪৯৪] আসমা'ঈ বললেন:

আসমা'ঈ তার সাহিত্যের বিষয়টি ভালোই জানতেন। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, আল-ইমাম, আল-আল্লামা, আল-হাফেয, হুজ্জাতুল আদব, লিসানুল আরব।'
তিনি হিজরী ২১৬ সালে মারা যান।
দেখুন, বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (৫/৪২৮); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১০/৪১০); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৩/১৭০); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/১৭৫); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৬/৪১৫)।

৪৯২. সম্ভবত এটি একটি জায়গার নাম। যেখানে চামড়া শিল্প প্রক্রিয়াজাত করা হতো। একবচন দাব্বাগ।

৪৯৩. এটি প্রাক্তন জাহমিয়্যাদের পথভ্রষ্টকারী একটি যুক্তি, যার কারণে তারা আল্লাহকে 'আরশের উপর থাকা অস্বীকার করে। তারা বলে, আল্লাহ যদি 'আরশের উপর থাকেন তো সীমাবদ্ধ হয়ে যাবেন। তখন 'আরশও সীমাবদ্ধ আর তার উপর আল্লাহও সীমাবদ্ধ। বর্তমানেও অধিকাংশ আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যকে এমন যুক্তি তুলে ধরে অস্বীকার করে।
ইতোপূর্বে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তাদের এ সন্দেহের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "তাদের বক্তা যখন বলে, যদি আল্লাহ 'আরশের উপর হোন তখন আবশ্যিকভাবে তাঁকে 'আরশের চেয়ে বড় হতে হবে, অথবা.... "। সেখানে এ সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছিল যে, এটা তো সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমনটি কিয়াস করে বলা যায়, স্রষ্টার ক্ষেত্রে এ ধরনের কিয়াস নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্টতা।

৪৯৪. সম্ভবত আসমা'ঈ এ মহিলার বিরুদ্ধে এজন্য গিয়েছিলেন যে, সে আল্লাহ তা'আলার জন্য ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ বা 'আরশের উপরে উঠা গুণটি অস্বীকার করেছে। যেন সে বলছে, যে কেউ বলবে যে আল্লাহ 'আরশের উপর, সে তো এর মাধ্যমে আল্লাহকে সীমাবদ্ধতার গুণে গুণান্বিত করলো।
হদ (সীমা) বিষয়ে প্রথমেই আমাদেরকে কিছু বিষয় একমত হতে হবে, তা হচ্ছে,
১- হদ্দ আল্লাহর কোনো সিফাত বা গুণ নয়।
২- হদ্দ শব্দটি সালাফগণের কেউই আল্লাহর জন্য ব্যবহার করেননি।
৩- হদ্দ শব্দটি কুরআন ও সুন্নাহ'র কোথাও সাব্যস্ত করা হয়নি, আবার অসাব্যস্তও করা হয়নি।
৪- মতভেদটি হচ্ছে, আল্লাহর জন্য 'হদ্দ' বা সীমা শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি না? এটা দিয়ে আল্লাহর সম্পর্কে কোনো সংবাদ দেয়া যাবে কি না?
তাই সঠিক কথা হচ্ছে, 'হদ' বা 'সীমাবদ্ধ' এ শব্দটি একটি 'মুজমাল' বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ সংক্ষিপ্ত শব্দ। কখনও কখনও তা দ্বারা বিশুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা যায়, আবার তা দ্বারা বাতিল অর্থও গ্রহন করা যায়। এজন্য ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে এটা বলা সাব্যস্ত হওয়াও প্রমাণিত, আবার অসাব্যস্ত হওয়াও প্রমাণিত। আর জাহমিয়্যারা সর্বদা বলে 'তাঁর কোনো সীমা' নেই। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা অস্বীকার করা যে, 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক', আল্লাহ তা'আলা জগতের উপরে। কারণ তাদের মতে এটা বললে তাঁর জন্য হদ্দ বা সীমা নির্ধারণ হয়ে যায়।
যারা আল্লাহর জন্য 'হদ্দ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাদের দ্বারা হদ্দ শব্দটি ব্যবহারের কারণ হচ্ছে, জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় যখন আল্লাহর জন্য সর্বোর্ধ্বে থাকার গুণটি অস্বীকার করলো, তখন কোনো কোনো আহলুস সুন্নাত সে ঊর্ধ্ব ও উপরকে বুঝানোর জন্য 'দিক' শব্দটি ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে যখন জাহমিয়্যারা আল্লাহ ও তার সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য করা অস্বীকার করলো, তখন কোনো কোনো আহলুস সুন্নাত সে পার্থক্য করার জন্য 'হদ্দ' শব্দটি ব্যবহার করে।
এজন্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "এ শব্দটি দিয়ে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ'য় না আসা অতিরিক্ত কোনো গুণ সাব্যস্ত করছি না, বরং এর দ্বারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে সৃষ্টির সাথে মিশিয়ে দেয়ার যে অপচেষ্টা বাতিলপন্থী, আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর লোকেরা করেছে আমরা সেটাকে খণ্ডন করে মহান আল্লাহর আলাদা অস্তিত্ব সাব্যস্ত করাকে বুঝিয়েছি। [ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৩/৪৮)]
সালাফদের মধ্যে যারা হদ্দ বা সীমা সাব্যস্ত করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,
১- ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী।

২- ইমাম ইবনুল মুবারক। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৪৪৩)]
৩- ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল।
৪- ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহি
৫- ইমাম আবুল হাসান আদ-দিশতী।
৬- ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী প্রমুখ।

তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার এমন সীমা আছে যার দ্বারা সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা। তাঁর মাঝে ও সৃষ্টিকুলের মাঝে ভিন্নতা ও পৃথকতা রয়েছে। তিনি সৃষ্টিকুলের সাথে মিলে মিশে নেই। বরং তাঁর কাছে নির্দেশ উঠে ও তাঁর থেকে নাযিল হয়। আর তাঁর জন্য আগমন করা ও আসা বিশুদ্ধ ইত্যাদি গুণাবলি, যা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে পৃথকতা সাব্যস্ত করছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ হিসেবে হদ্দ বা সীমা হচ্ছে, এমন কিছু গুণাবলি ও পরিমাণ সাব্যস্ত করা, যা দিয়ে অন্য বস্তু থেকে আলাদা হওয়া প্রমাণিত হবে। বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহ এটার ওপর প্রমাণবহ যে, আল্লাহ তা'আলার এমন হদ্দ বা সীমা রয়েছে যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিকুল থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তিনি সকল মুহদাস বা নতুন কিছু থেকে পৃথক গুণে গুণান্বিত। তাহলে এ অর্থে আল্লাহর জন্য হদ্দ সাব্যস্ত করা অবশ্যই বিশুদ্ধ।

তাছাড়া আরেকটি অর্থেও হদ্দ সাব্যস্ত করা বিশুদ্ধ আর তা হচ্ছে, আল্লাহর নিজের যাত ও সিফাত এর অবশ্যই সীমা রয়েছে, কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। এ হিসেবেও হদ্দ সাব্যস্ত করা না জায়েয হবে। যেমনটি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার দারউত তা'আরুদ্ব ও বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থদ্বয়ে সাব্যস্ত করেছেন।

অনুরূপভাবে স্থান হিসেবেও হদ্দ সাব্যস্ত করা যাবে। কারণ আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তিনি 'আরশের উপর রয়েছেন। আর 'আরশ অবশ্যই একটি স্থান। সুতরাং জাহমিয়্যারা সেটা অস্বীকার করার জন্য হদ্দ বা মাকান ব্যবহারের দোষ তুলে ধরলেও আমরা তা ব্যবহার থেকে বিরত হবো না। যেমনটি ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী বলেছেন। দেখুন, নাক্বদুদ দারেমী আলা বিশর আল-মিররীসী, পৃ. ২২৩-২২৪। অনুরূপ মাজমূ' ফাতাওয়া ও রাসায়িলি ইবন উসাইমীন (৭/১৯৩)।

আর এ মতের বিপরীতে সালাফগণের মধ্য হতে যারা হদ্দ বা সীমা সাব্যস্ত করেননি, তাদের মধ্যে রয়েছেন,

১- ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল। হাম্বল ও ইসহাকের বর্ণনায়।
২- ইমাম ত্বাহাউই।
৩- ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী।
৪- ইমাম আবু নসর আস-সাজযী।

তবে এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান আল্লাহকে জ্ঞান ও আয়ত্ত্ব করতে অসমর্থ হওয়া। তাঁকে কারও জ্ঞান ও চোখ কোনোভাবেই আয়ত্ত্ব করতে পারবে না।

তাছাড়া তাঁর গুণের প্রকৃত স্বরূপও কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। এটা সৃষ্টির পক্ষে অসম্ভব বিষয়। অনুরূপভাবে কেউ যেন রাব্বুল আলামীনের আকার-আকৃতি নির্ধারণ না করে বসে।

উপরোক্ত তিনটি কারণে তারা হদ্দ সাব্যস্ত করতে নিষেধ করে থাকেন।

কিন্তু জাহমিয়্যাহ ও তাদের অনুসারীরা হদ্দ শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করার মাধ্যমে কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে যা পুরোপুরিই বাতিল:

এক. স্রষ্টাকে সৃষ্টি থেকে আলাদা না করা।
দুই. স্রষ্টাকে জগতের ভেতরেও নয় বাইরেও নয় এটা সাব্যস্ত করা।
তিন. স্রষ্টার 'আরশের উপর উঠাকে অস্বীকার করা।
চার. স্রষ্টা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসাকে অস্বীকার করা।
পাঁচ. স্রষ্টা কর্তৃক হাশরের মাঠে আগমনকে অস্বীকার করা।
ছয়. স্রষ্টাকে আখেরাতে দেখতে পাওয়া অস্বীকার করা ইত্যাদি।

এসবই বাতিলপন্থীদের শব্দের অসৎ ব্যবহার। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

সুতরাং কেউ যদি হদ্দ শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে কি না তা জিজ্ঞেস করে তাকে প্রশ্ন করা হবে, তার কাছে হদ্দ শব্দটির অর্থ কী? তার ব্যক্ত করা অর্থ অনুযায়ী তাকে জবাব দেয়া হবে। অর্থাৎ এক কথায় উত্তর দেয়া চলবে না।

বিস্তারিত দেখা যেতে পারে,

كافرة بهذه المقالة».

[قول عاصم بن علي بن عاصم]:

وعن عاصم بن علي بن عاصم-شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما-قال: «ناظرت جهميًّا، فتبيَّنَ من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربًّا».

এ কথায় সে কাফের হয়ে গেছে।"[৪৯৫]

[আসেম ইবন আলী ইবন আসেম এর বক্তব্য]

ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী ও তাদের স্তরের লোকদের শিক্ষক, ইমাম আসেম ইবন আলী[৪৯৬] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি এক জাহমীর সাথে মুনাযারা করেছি। তার কথা থেকে ফুটে উঠল যে, উপরে কোনো রব আছে এটার ওপর সে ঈমান রাখে না।"[৪৯৭]

১- রাদ্দু ইমাম আদ-দারেমী আলা বিশর আল-মিররীসী, পৃ. ২৩।
২- ইবন তাইমিয়্যাহ, নাক্বদুত তা'সীস (১/৪২৬-৪৪৬), (২/১৭০-১৭২)।
৩- ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (১/১৭৩)।
৪- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাহ আত-ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/২৬৩)।

৪৯৫. আছারটি নিয়ে এসেছেন,
১- যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ২/১০৪১, নং ৩৯৭; সেখানে বলা হয়েছে, আমাদের নিকট আসমা'ঈর কাছ থেকে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, তারপর তিনি তা বর্ণনা করলেন। আরও দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৭০-১৭১।
২- যাহাবী, আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৮১।
৩- ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২৫। ইবনুল কাইয়্যেম এটা নিয়ে আসার পরে টীকা দিয়ে বলেন, তাহলে জানা গেল যে, এ মতাদর্শ মূল সূত্রপাত এ লোক (জাহম) ও তার স্ত্রী। তার জন্য কতই না উপযোগী আল্লাহর বাণী: "অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে, আর তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে।" [সূরা আল-মাসাদ: ৩-৪]

৪৯৬. তিনি হচ্ছেন আবুল হুসাইন 'আসেম ইবন আলী ইবন আসেম ইবন সুহাইব, আল-ওয়াসেত্বী, আল-কুরাশী, আত-তাইমী, তাদের মাওলা। বড় হাদীসের ইমামদের একজন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন ইকরিমাহ ইবন 'আম্মার, ইবন আবী যি'ব, শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবন হাম্বল, বুখারী, আবু দাউদ প্রমুখ।
তাঁর সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, আসেম ইবন আলী ইবন আসেম মুসলিমদের সর্দার। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, আসেম ইবন আলী ইবন আসেম ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি খালকুল কুরআনের বিপর্যয়ের সময় দীনের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেছিলেন। এমনকি ইমাম আহমাদ বলেন, ইসলামের তিনি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, দাঁড়ানোর বিনিময়ে আশা করি আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে প্রতিদান দিবেন।
আবুল হুসাইন ইবনুল মুনাদী বলেন, তিনি বাগদাদের মাসজিদ আর-রুসাফাতে হাদীসে দারস প্রদান করতেন। তার মজলিসে এক লক্ষের মতো মানুষ হাজির হতো। হিজরী ২২১ সালে তিনি মারা যান। দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১২/২৪৭); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/৩৯৭); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/২৬২); যিরিকলী, আল-আ'লাম (৩/২৪৮)।

৪৯৭. এ আছারটি আরও যারা নিয়ে এসেছেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন,
১- আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ নং ১৯১।
২- ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬১); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৪৩, ৮৩)।
৩- ইমাম যাহাবী, আল-উলু (২/১০৬৯)।
৪- ইবনুল কাইয়্যাম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২১৭; আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৯৬)।

[قول الإمام مالك]:

وروى الإمام أحمد: ثنا سُرَيْج بن النعمان، قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان».

[ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলেন, আমাদেরকে সুরাইজ ইবনুন নু'মান(৪৯৮) জানিয়েছেন, তিনি বলেন, "আমি আব্দুল্লাহ ইবন নাফে' আস-সায়েগকে(৪৯৯) বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: আমি মালেক ইবন আনাসকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ আসমানের উপরে, আর তাঁর জ্ঞান সর্বত্র। কোনো স্থানই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।"(৫০০)

---

৪৯৮. তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান সুরাইজ ইবন মারওয়ান আল-জাওহারী, আল-লু'লু'য়ী, আল-বাগদাদী, তার আসল হচ্ছে খোরাসান থেকে। তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে সামান্য ধারণার অনুবর্তী হতেন। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত। তার মৃত্যু হিজরী ২১৭ সালে।
দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৯/২১৭); ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৪/৩০৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/২১৯); খাযরাজী, খুলাসাতু তাযহীবি তাহযীবিল কামাল (১/৩৬৫); ইবন হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ২২৯।

৪৯৯. তিনি হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন নাফে' আস-সায়েগ আল-মাখযূমী, মাওলাহুম, আল-মাদানী। মদীনার বড় ফকীহগণের একজন। অনুরূপ ইমাম মালেকের ছাত্রদের একজন। তিনি ইমাম মালেকের সাথে সর্বদা থাকতেন। এমনকি তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি চল্লিশ বছর ইমাম মালেকের সাথী হয়েছিলাম, তবে তার থেকে কিছু লিখিনি, শুধু হিফয করতাম।
তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি মালেক এর মতামতের হিফযকারী। আর তিনিই মদীনা বাসীদেরকে ইমাম মালেকের ফিক্বহ শিখিয়েছেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তার কিতাব বিশুদ্ধ। তার ধীশক্তিতে সামান্য কমতি আছে। তিনি হিজরী ২০৬ সালে মারা যান।
দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৫/৪৩৮); কাযী ইয়াদ্ব, তারতীবুল মাদারিক (১/৩৫৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৩৭১); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/১৫); ইবন হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩২৬।

৫০০. এ আছারটি যারা নিয়ে এসেছেন তারা হচ্ছেন,
১- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১০৬-১০৭); তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সুরাইজ ইবনুন নু'মান, তিনি বলেন, আমাকে জানিয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবন নাফে'... তিনি বলেন, মালেক বলেন,... তারপর তিনি তা বর্ণনা করেন, সেখানে বাড়তি আছে, তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭]
২- আবু দাউদ, মাসায়িলি ইমাম আহমাদ, পৃ. ৬৩।
৩- ইবন মানদাহ, কিতাবুত তাওহীদ (৩/৩০৭)।
৪- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ২৮৯। তিনি দু' পদ্ধতিতে ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন।
৫- ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৮)।
৬- ইবন আব্দুল বার, আল-ইন্তেকা, পৃ. ৩৫।
৭- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৪০১)।

[قول الإمام الشافعي] :

وقال الشافعي: «خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه، وجمع عليه قلوب عباده».

وفي الصحيح عن أنس بن مالك، قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: «زوجكنَّ أهاليكُن وزوجني الله من فوق سبع سماوات».

[ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য]

ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফত সত্য। তার ফায়সালা তিনি আসমানে করেছেন। তাঁর বান্দাদের অন্তর এর ওপর একত্রিত করেছেন।(৫০১)

অনুরূপ সহীহ গ্রন্থে(৫০২) আনাস ইবনে মালেক বলেন, যয়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের ওপরে গর্ব করতেন এই বলে যে, তোমাদের বিয়ে দিয়েছে তোমাদের পরিবার, আর আমার বিবাহ দিয়েছেন আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে(৫০৩)

৮- ইবন কুদামা, ইসবাতু সিফাতিল উলু, পৃ. ১৬৬।
৯- ইমাম যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ৯৩; দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৪০। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন।
১০- দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬১-২৬২)। সেখানে শাইখুল ইসলাম তার সনদকে সহীহ বলেছেন।
১১- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৪১, ইবন আব্দুল বার এর বর্ণনায়।

৫০১. আছারটি যারা বর্ণনা করেছেন:
১- ইবন কুদামা, ইসবাতু সিফাতিল উলু, পৃ. ১৮১। হাক্কারীর বর্ণনায়।
২- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৬৫। তিনি এটাকে সহীহ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

৫০২. হাদীসটি নিয়ে এসেছেন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭৪২০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৪২৮।

৫০৩. হাদীসটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তিনি নিজেই যয়নাবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিয়ে দিয়েছেন। কারণ কুরআনে কারীমে এসেছে, "আর স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।' আর আপনি আপনার অন্তরে গোপন করছিলেন এমন কিছু যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন এবং আপনি লোকদেরকে ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। তারপর যখন যায়দ তার (স্ত্রীর) সাথে প্রয়োজন শেষ করল, তখন আমরা তাকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্রদের স্ত্রীদেরকে (স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে) কোনো সমস্যা না হয় যখন তারা (পোষ্য পুত্ররা) নিজ স্ত্রীর সাথে প্রয়োজন শেষ করবে (এবং তালাক দিবে)। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" [সূরা আল-আহযাব: ৩৭] এ ঘটনাটি সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় বিস্তারিত এসেছে। আনাস ইবন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যখন যয়নাব এর ইদ্দত সমাপ্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবন হারেসাকে বললেন, যাও, তাকে আমার কথা স্মরণ করাও। তখন যায়েদ গেলেন, অবশেষে তাঁর কাছে আসলেন, তিনি তখন রুটির খামীর করছিলেন... বাকী হাদীস বর্ণনা করলেন, অবশেষে যায়েদ বললেন, আমি বললাম, হে যয়নাব, সুসংবাদ গ্রহণ করো, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছেন তোমাকে স্মরণ করছেন। তখন যয়নাব বললেন, আমি কোনো কিছুই করবো না, যতক্ষণ না আমার রবের সাথে পরামর্শ করছি। অতঃপর যয়নাব তার সালাতের স্থানে গেলেন, আর তখনই কুরআন নাযিল হলো, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি ব্যতীতই তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন।'

وهذا مثل قول الشافعي.

[استتابة أبي يوسف بشرا] :

وقصة أبي يوسف . صاحب أبي حنيفة . مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم. قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.

[قول الإمام ابن أبي زمنين] :

[وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين . الإمام المشهور من أئمة المالكية . في كتابه

আল্লাহ তা'আলা।(৫০৪) এটা শাফে'য়ী এর কথার মতো।(৫০৫)

[ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক বিশরকে তাওবা করানো]

আর ইমাম আবু হানীফার ছাত্র আবু ইউসুফ কর্তৃক বিশর আল-মিররীসীকে তাওবা করানোর ঘটনা প্রসিদ্ধ। অবশেষে সে পালিয়ে গেল, যেহেতু সে সিফাতকে অস্বীকার করে জাহামের কথা প্রচার করেছিল(৫০৬)। ইবন আবি হাতিম এবং অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।(৫০৭)

[ইমাম ইবন আবী যামানীন এর বক্তব্য]

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবি

হাদীসটি ইমাম আহমাদও নিয়ে এসেছেন (৩/১৯৫)। হাদীস থেকেই বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ স্বয়ং রাসূলকে যয়নাবের সাথে বিয়ে দিয়েছেন তাই আর অনুমতি ও কারও মাধ্যমের প্রয়োজন হয়নি।

৫০৪. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এখানে হাদীসটি এনে ইমাম শাফে'য়ীর দাবি করা ইজমা'র সপক্ষে দলীল পেশ করেছেন। কারণ শাফে'য়ী বললেন যে, আল্লাহ আসমানের উপর সেটা অনুমোদন করেছেন আর মানুষের অন্তরকে সেটার ওপর এক করে দিলেন। তাই আসমানে যে সেটা অনুমোদিত হলো তার অনুরূপ ঘটনা উল্লেখ করলেন।

৫০৫. ইবন তাইমিয়্যাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যদি এ অধ্যায়ে ইমাম শাফে'য়ীর কথাই কেবল একত্রিত করা হয় তবে তা যথেষ্ট হয়ে যেতো। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৩৯)।

৫০৬. বস্তুত জাহাম ইবন সাফওয়ানের সাথে বিশর এর সাক্ষাত ঘটেনি। সে এসব তথ্য বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করেছিল। কারণ জাহম ১২৮ হিজরীতে মারা যায়। অপর দিকে বিশর এর জন্ম হয় ১৩৮ হিজরীতে।

৫০৭. এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন:

১- যাহাবী, আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম (২/৯৯৯), নং ৩৬৯। তিনি ইমাম ইবন আবী হাতেম এর বর্ণনায় তা সনদসহ নিয়ে আসেন। আরও দেখা যেতে পারে, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৫৪-১৫৫। সেখানে এসেছে যে, বিশর ইবনুল ওয়ালীদ আল-কিন্দী ইমাম আবু ইউসুফ আল-কাযীর কাছে এসে বললেন, আপনি আমাকে কালামশাস্ত্র থেকে নিষেধ করেন অথচ বিশর আল-মিররীসী, আলী আল-আহওয়াল ও অমুক কালামশাস্ত্রের সাথে আছে। তিনি বললেন, তারা কী বলে? তখন সে বললো, তারা বলে, আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান। তখন আবু ইউসুফ বলেন, তাদেরকে আমার সামনে হাজির করো। লোকেরা তাদের খোঁজে গেল। ইত্যবসরে বিশর উঠে চলে গেল, লোকেরা গিয়ে আলী আল-আহওয়াল ও অন্য একজন বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে আসলো। তখন আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ উক্ত বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে যদি মারার জায়গা থাকতো তবে মেরে তক্তা বানাতাম। অতঃপর তাকে জেলে পুরানোর নির্দেশ দিলেন। আর আহওয়ালকে পিটানো হলো, তাকে দেশে দেশে ঘুরানো হলো।

২- ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫২৫, ৫২৬)।

৩- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২২২।

الذي صنفه في «أصول السنة» قال فيه: باب الإيمان بالعرش.

[قول الإمام ابن أبي زمنين في العرش والعلو]:

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:5] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحديد:4] ؛ فسبحان من بَعُدَ وقَرُبَ بعلمه، فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رَزِين

যামানীন[৫০৮] স্বীয় কিতাব 'উসূল আস-সুন্নাহ'তে বলেন: অধ্যায়: 'আরশের প্রতি ঈমান[৫০৯]

['আরশ ও উপরে থাকা সম্পর্কে ইমাম ইবন আবী যামানীন এর বক্তব্য]

তিনি বলেন: আহলে সুন্নাতের কথা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ 'আরশ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে খাস করেছেন সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে ও উঁচুতে হওয়া দ্বারা। অতঃপর তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে তার উপর উঠেছেন। যেমন তিনি নিজের ব্যাপারে জানিয়েছেন:

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥]

"রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

তিনি আরও বলেন:

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الحديد: ٤]

"তারপর তিনি 'আরশে উঠেছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে।" [সূরা আল-হাদীদ: ০৪]

সুতরাং অতি পবিত্র তিনি, যিনি দূরবর্তী [হয়েছেন[৫১০] ফলে তাকে দেখা

---

৫০৮. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 'ঈসা ইবন মুহাম্মাদ আল-মুররী, আল-আন্দালুসী। কর্ডোবার শাইখ। যিনি ইবন আবী যামানীন নামে খ্যাত হয়েছেন। বহু বিদ্যার ধারক, ইলমের সমুদ্র। যুহদ ও রিক্বাকে গ্রন্থ রচনা করেছেন। উত্তম কবিতা রচনা করেছেন।
ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, তিনি ইবাদত, তাকওয়া ইখলাসের অধিকারী ছিলেন। রাষ্ট্র ও সরকারের লোকদের থেকে দূরে থাকতেন। সালাফে সালেহীনের আছার ও নিদর্শন অনুসরণ করে চলতেন। ইলমে অত্যন্ত প্রখর ছিলেন। জন্ম হিজরী ৩২৪ সালে, আর মৃত্যু হিজরী ৩৯৯ সালে। তার লিখিত গ্রন্থাবলির মাঝে অন্যতম হচ্ছে, 'মুখতাসারুল মুদাওয়ানাহ', মুনতাখাবুল আহকাম, হায়াতুল কুলূব, উসূলুস সুন্নাহ ইত্যাদি।
দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/১৮৮); ইবার, (২/১৯৬); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/১৫৬)।

৫০৯. ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ (১/২২০)।

৫১০. আল্লাহ তা'আলাকে কি দূরবর্তী বলা যাবে?
ইবন তাইমিয়্যাহ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে 'দূরবর্তী' গুণে গুণান্বিত করা যাবে না। [দেখুন, আল-ইস্তেকামাহ (১/১৩৭)] অন্যত্র বলেছেন, আর 'বা'য়ীদ' আল্লাহর নামও নয়। তাকে উম্মতের সালাফদের কেউ ও তাদের ইমামগণ কখনও 'বা'য়ীদ' বা দূরবর্তী গুণে গুণান্বিত করেননি। [দেখুন, আল-ইস্তেকামাহ (১/১৩৯)] এর কারণ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসে তা না আসা।
তবে 'ইখবার' বা এটা বলা যাবে কিনা যে, আল্লাহ কাফেরদের থেকে দূরে বা বদকারদের থেকে দূরে? যদি উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেয়া ও তাদের প্রতিদান দেয়া থেকে দূরে

العقيلي؛ قلت يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: «في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء».

যায় না][৫১১] ও নিকটবর্তী হন জ্ঞানের [ও ক্ষমতার][৫১২] মাধ্যমে[৫১৩] ফলে তিনি গোপন শলা-পরামর্শ শুনতে পান।

অতঃপর তিনি আবু রাযীন আল-উকাইলী বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন, [যাতে এসেছে,] আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে আমাদের রব কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, 'আমা'তে, যার[৫১৪] উপরেও বায়ু, নিচেও বায়ু। অতঃপর তিনি পানির উপরে 'আরশ সৃষ্টি করলেন।"[৫১৫]

তাহলে সেটাতে আশা করি সমস্যা হবে না।

৫১১. বন্ধনীর বাড়তি অংশ মূল কিতাব উসুলুস সুন্নাহ (১/২২০) থেকে।

৫১২. বন্ধনীর বাড়তি অংশ মূল কিতাব উসুলুস সুন্নাহ (১/২২০) থেকে।

৫১৩. আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ কী? শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন যে নৈকট্য কেবল বিশেষভাবেই হয়। নৈকট্য কখনও সর্বসাধারণের জন্য হয় না। দেখুন, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (৩/১২৫১)।
অর্থাৎ 'কুরব' বা 'নৈকট্য' বিষয়টি মা'য়িয়্যাহ বা 'সাথে থাকা' এর মত নয়। বরং বিষয়টি 'মা'য়িয়্যাহ আল-খাসসা'র মতো।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অনেকগুলো কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য এনে প্রমাণ করেছেন যে, রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী হন। তারপর তিনি বলেন, তবে এসব নৈকট্য সবই হচ্ছে বিশেষ নৈকট্য যা কোনো কোনো অবস্থায় হয়ে থাকে, অপর অবস্থায় থাকে না। কুরআন ও সুন্নাহ'র কোথাও সকল সৃষ্টির জন্য সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত নৈকট্য সাব্যস্ত করা হয়নি। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৩০, ২৪০)]
অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু যত জায়গায় নিজেকে নিকটে থাকার কথা বলেছেন সেগুলোতে কোথাও সকল সৃষ্টির নিকটে রয়েছে এমনটি বলেননি, যেমনটি বলেছেন 'সাথে' থাকার ব্যাপারে। কারণ 'মা'য়িয়্যাত' বা সাথে থাকার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সাধারণ ও বিশেষ দু'ভাবে বলেছেন, কিন্তু নৈকট্য, তিনি কার নিকটে আসবেন এটা একান্তই তার জন্য নির্দিষ্ট যার তিনি নিকটে থাকবে বলেছেন। যেমন আহ্বানকারী, [সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৬] ইবাদতকারী [বান্দা আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হয় যখন সে সাজদা করে...] অনুরূপ হাজীদের জন্য 'আরাফার মাঠে নিকটে হওয়া ও প্রথম আসমানের নিকটে থাকা...' [মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৪৭৮), (১৫/১৭)]
ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, 'কুরআন ও সুন্নাহ'র কোথাও বলা হয়নি যে, আল্লাহ সবার নিকটে। এটাও বলা হয়নি যে, তিনি কাফের ও ফাজেরদের নিকটে। বরং সর্বদা বিশেষভাবেই নির্দিষ্ট লোকদের জন্যই তা এসেছে...' [মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (৩/১২৫১)] ইবনুল কাইয়্যেম সেখানে আরও বলেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকটে থাকা দু' প্রকার:
১- তাঁকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়ার মাধ্যমে তার নিকটে থাকা।
২- তাঁর আনুগত্যকারীর সাওয়াব দানের জন্য তাঁর নিকটে থাকা।
উল্লেখ্য, পরবর্তী আলেমগণের কারও কারও গ্রন্থে আল্লাহর 'কুরব' বা নৈকট্যকে দু'ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে, সাধারণ নৈকট্য, বিশেষ নৈকট্য। [তাফসীর সা'দী] সম্ভবত তারা সেটাকে মা'য়িয়্যাত বা 'সাথে থাকা' এর ওপর কিয়াস করেছেন। কিন্তু সেটা যথাযথ মনে হয় না। বস্তুত 'সাধারণ নৈকট্য' বলার কোনো ভাষ্য সালাফে সালেহীনের থেকে বর্ণিত হয়নি। তাই আল্লাহর 'কুরব' বা নৈকট্য কেবল বিশেষই হয়ে থাকে এটাই বলতে হবে।

৫১৪. ইমাম ইবন আব্দুল বার কোনো কোনো আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এখানে "যার উপর" ও "যার নিচ" বলে 'আমা'কে বুঝানো হয়েছে। দেখুন, তামহীদ (৭/১৩৮)।

৫১৫. হাদীসটি যারা উদ্ধৃত করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,
১- তিরমিযী (৫/২৮৮), হাদীস নং ৩১০৯।

মুহাম্মাদ (ইবন আবী যামানীন) বলেন: 'আমা হচ্ছে, ঘন পুঞ্জীভূত মেঘমালা[৫১৬]; যেমনটি

২- ইবন মাজাহ, হাদীস নং (১/৬৪), ১৮২।
৩- আবু দাউদ আত-ত্বায়ালাসী, আল-মুসনাদ, পৃ. ১৪৭, নং ১১৮৯।
৪- ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৬১৪১।
৫- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৬১৮৮।
৬- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/২৫-২৬), নং ৪৫০।
৭- ত্বাবারানী, আল-কাবীর (১৯/২০৭), নং ৪৬৮।
৮- হাকীম আত-তিরমিযী, আর-রাদ্দু 'আলাল মু'আত্তিলাহ, পৃ. ১৮৮।
৯- তাফসীর আত-তাবারী (১২/৪)।
১০- ত্বাবারী, আত-তারীখ (১/৩৭-৩৮)।
১১- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৭১-২৭২)।
১২- ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৭)।
১৩- ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ, পৃ. ৫৪।
১৪- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৫০)।

হাদীসটির ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কারও কারও নিকট হাদীসটি সহীহ, অপর কারও নিকট তা দুর্বল। মূল সমস্যা হচ্ছে, ওকী' ইবন হুদুস বা 'উদুস নামীয় একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন তার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকা। অথচ ইবন হিব্বান তাকে 'সিক্বাত' বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। ইবন হাজার তাকে মাকবূল বলেছেন। তাকে জানার জন্য বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, ইবন কুতাইবাহ, তা'ওয়ীল মুখতালাফুল হাদীস, পৃ. ১৫০; ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৯/২৩৬); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (১১/১৩১); তাক্বরীব, পৃ. ৫৮১; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (৪/৩৩৫)।

৫১৬. 'আমা' শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়,

এক. মাদ্দ সহকারে, ('মা' বর্ণকে টেনে লম্বা করে পড়া) 'আমা', তখন তার অর্থ হবে মেঘমালা, অথবা উঁচু মেঘ, অথবা ঘন মেঘ তা থেকে বৃষ্টি হয়। অথবা সূক্ষ্ম মেঘ। অথবা কালো মেঘ। এটিই খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী বর্ণনা করেছেন। আর তা আবু উবাইদ থেকেও বর্ণিত আছে।

দুই. মদ্দ ব্যতীত, ('মা' বর্ণকে না টেনে পড়া) 'আমা', তখন অর্থ হবে তার সাথে কিছু নেই। এটিই ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেন, আহমদ ইবন মানী' থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবন হারূন থেকে। দেখুন, [তিরমিযী, আস-সুনান (৫/২৮৮), ইবন কুতাইবাহ, তা'ওয়ীলু মুখতালাফুল হাদীস, পৃ. ১৫০; আবু উবাইদ, গরীবুল হাদীস (২/৮-৯); ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস (৩/৩০৪); খাত্তাবী, গারীবিল হাদীস (৩/৩৪২); ইবন মানযূর, লিসানুল আরব (১৫/৯৯-১০০)]।

প্রথম অর্থ অনুসারে মেঘমালা সাব্যস্ত করতে হবে। মহান আল্লাহ কর্তৃক উক্ত মেঘের উপর থাকার ধরণ নির্ধারণ না করে সাব্যস্ত করতে হবে। তবে এ মেঘ সাব্যস্ত করা আল্লাহ তা'আলার প্রথম সত্তা হওয়া ও তাঁর পূর্বে কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকার বিরোধী নয়। আবু উবাইদ বলেন, আমরা হাদীসটিকে আরবী ভাষায় বুঝা যায় সে অর্থে ব্যাখ্যা করেছি, তবে আমরা জানি না সে 'আমা' এর ধরণ সম্পর্কে বা তার পরিমাণ কেমন সেসব সম্পর্কে। আল্লাহই ভালো জানেন। দেখুন, আবু উবাইদ, গরীবুল হাদীস (২/৯)। আযহারী তার তাহযীবুল লুগাহ গ্রন্থে ইমাম আবু উবায়েদ এর মতটি প্রাধান্য দেয়ার পর বলেন, 'আর এ কথাটি যা শক্তিশালী করে তা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।" [সূরা আল-বাক্বারাহ: ২১] তিনি বলেন, 'গামাম' শব্দটি আরবী ভাষায় সুবিদিত। তবে আমরা জানি না সে মেঘমালার ধরণ যে মেঘমালায় ছায়ায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আগমন করবেন। সুতরাং সেটার ওপর ঈমান আনবো কিন্তু আমরা তাঁর গুণের ধরণ বর্ণনা করবো না। অনুরূপভাবে আল্লাহর অন্য গুণের বেলাতেও আমরা একই নীতি অবলম্বন করি। দেখুন, আল-আযহারী, তাহযীবুল লুগাহ (৩/২৪৬); ইবন মানযূর, লিসানুল আরব

الإيمان بالكرسي.

[قوله في الكرسي]

: قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة: أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه «فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها».

উল্লেখ করেছেন খলীল।[৫১৭]

অতঃপর তিনি অন্যান্য আছার উল্লেখ করেন। তারপর বলেন: অধ্যায়: কুরসীর প্রতি ঈমান[৫১৮]

[কুরসীর ব্যাপারে ইবন আবী যামানীন এর বক্তব্য]

মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (ইবন আবী যামানীন) বলেন, আর আহলুস সুন্নাতের কথা হচ্ছে: কুরসী হচ্ছে 'আরশের সম্মুখে এবং সেটি দু' পায়ের স্থান। অতঃপর তিনি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন, যাতে আখেরাতে জুমু'আর দিন (আল্লাহর) প্রকাশ পাওয়ার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। যেখানে আছে:

"যখন জুমু'আর দিন হবে তখন তিনি ইল্লিয়্যিন থেকে কুরসীতে নেমে আসবেন। অতঃপর কুরসীকে ঘিরে থাকবে সোনার মিম্বর, যা মুক্তার মাল্যে ভূষিত। অতঃপর নবীগণ এসে তাতে বসবেন।"[৫১৯]

(১৫/১০০)।
পরবর্তী দ্বিতীয় অর্থটি অনুসারে তা বুখারীর হাদীসের অনুরূপ হয়, যেখানে এসেছে, "কেবল আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, তাঁর সাথে আর কিছু ছিল না।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩১৯১] অনুরূপ মুসনাদে আহমাদে এসেছে, 'সবকিছুর পূর্বে আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন।' [(৩৩/১০৯), হাদীস নং ১৯৮৭৭] এ অর্থ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীকে আল্লাহই কেবল ছিলেন সেটাই উত্তর দিয়েছেন, কোথায় ছিলেন সেটার উত্তর দেননি।

৫১৭. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুর রহমান খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী। আরবী ভাষার ইমাম, প্রথম যিনি ইলমুল 'আরূয রচনা করেন। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, আরবী ভাষার কর্ণধার ছিলেন, দীনদার ছিলেন, পরহেযগার ছিলেন, ইবাদতগুযার ছিলেন, বিনয়ী ছিলেন। তাঁর ছিল বিশাল মর্যাদা। তার মৃত্যু হিজরী ১৭০ সালে।
দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (২/২৪৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/৪২৯); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (১/২৭৫)। আর খলীল এর কিতাব 'আল-আইন গ্রন্থে তা এসেছে (২/২৬৬)।

৫১৮. ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ (১/২৫১)।

৫১৯. যারা হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন তারা হচ্ছেন,
১- ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (২/১৫০-১৫১), নং ৫৫৬০।
২- আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ, নং ৪২২৮।
৩- আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ, নং ৪৬০।
৪- ত্বাবারানী, আল-আওসাত্ব, হাদীস নং ৬৭১৭।
৫- খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৩/৪২৫)।
৬- ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ (১/২৯৯-৩০০), তার সনদ হচ্ছে, আমাকে বর্ণনা করেছেন ইসহাক, তিনি আহমাদ ইবন খালেদ থেকে, তিনি ইবন ওয়াদ্দাহ থেকে, তিনি আবু বকর

আর তিনি তা উল্লেখ করলেন যা উল্লেখ করেছেন প্রসিদ্ধ তাফসীর[৫২০] গ্রন্থকার ইয়াহইয়া ইবন সাল্লাম।[৫২১] তিনি বলেন:

আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবাহ থেকে। তিনি বলেন, আমাকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আল-মুহারেবী, তিনি লাইস থেকে, তিনি উসমান থেকে, তিনি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার কাছে জিবরীল জুমু'আর দিনকে নিয়ে আসল, তা যেন সাদা আয়না।" আর তিনি হাদীস উল্লেখ করলেন। তাতে এসেছে, নিশ্চয় রব্ব তা'আলা জান্নাতে একটি উপত্যকা গ্রহণ করেছেন, যা সাদা মিসকের; অতঃপর যখন জুমু'আর দিন হবে তখন তিনি সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তাঁর কুরসীর উপর অবতরণ করবেন, তারপর সে কুরসীকে ঘিরে স্বর্ণের মিম্বারসমূহ থাকবে, যাতে মুতির মালাসমূহ পরানো হবে। তারপর নবীগণ আসবেন, তারা তার উপর বসবেন।"

এ হাদীসটি আরও যারা বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

৭- আশ-শাফে'য়ী, আল-উম্ম (১/১৮৫)।
৮- আশ-শাফে'য়ী, আল-মুসনাদ, পৃ. ৭০-৭১।
৯- ইবন আবী শাইবাহ, কিতাবুল 'আরশ, পৃ. ৯৫।
১০- উসমান সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ১৭৬-১৭৭; দুই সূত্রে।
১১- ইমাম ত্বাবারী, আত-তাফসীর (২৬/১৮৫); তিন সূত্রে।
১২- ইবন মানদাহ, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ১০১।
১৩- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ২৬৫-২৬৬।
১৪- দারাকুত্বনী, আর-রুইয়াহ, পৃ. ৭৬-৮৫; বিভিন্ন সূত্রে
১৫- ইবনুন নাহহাস, আর রুইয়াহ, পৃ. ১৯-২০।
১৬- ইবন আদী, আল-কামেল (৪/১৩৭৩)।
১৭- উক্বাইলী, আদ-দু'আফা আল-কাবীর (১/২৯২-২৯৩)।
১৮- আবু নু'আইম, সিফাতুল জান্নাহ (৩/২৩৪-২৩৫); তাহকীক, আলী রেদ্বা আব্দুল্লাহ।
১৯- আবু নু'আইম, যিকরু আখবারু আসফাহান (১/২৭৮)।
২০- বাযযার, আল-মুসনাদ (কাশফুল আসতার) (৪/১৯৪-১৯৬)।
২১- ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতুল উলু, পৃ. ১০৯-১১০।
২২- যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ২৮-৩১; বিভিন্ন সূত্রে।
২৩- যাহাবী, আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৭৮।
২৪- ইবন হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (১/১৫৭-১৫৯)।
২৫- হাইসামী, মাজমা'উল বাহরাইন, মাজমাউয যাওয়ায়িদ (১০/৪২১-৪২২)।
২৬- ইবন আবী হাতেম, আল-ইলাল (১/১৯৯, ২০৬), নং ৫৭১, ৫৯৩।
২৭- মুনযেরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (১/৪৮৯)।

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (৩/২৭২)।

ইতোপূর্বেও হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ইবন কাসীর, হাফেয দ্বিয়াউদ্দীন আল-মাকদেসী প্রমুখ। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৪১১-৪১৬); মুখাতাসারুস সাওয়া'য়িক্ব (২/২৩৭-২৩৯); ইবনুল কাইয়্যেম, হাদীউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ, পৃ. ৩৫৪-৩৫৭; যাদুল মা'আদ (১/৪০৯-৪১০); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (২/২৮৭-২৮৮)। সুতরাং হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

৫২০. ইয়াহইয়া ইবন সাল্লামের এ তাফসীরটি ছাপা হয়নি। তার সংক্ষেপ করেছেন ইবন আবী যামানীন, তার কিছু অংশ তাহকীক হয়েছে, সৌদী আরবস্থ জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ আল-ইসলামিয়্যাহ'র আল-কুরআন বিভাগে।

৫২১. তিনি হচ্ছেন আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন সাল্লাম ইবন আবী সা'লাবাহ আল-বসরী। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বা, সাওরী ও মালেক প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার

عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه». وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم،

"আমার কাছে মু'আল্লা ইবন হিলাল[৫২২] বর্ণনা করেছেন, আম্মার আদ-দুহনী[৫২৩] থেকে, তিনি সা'ঈদ ইবনে জুবাইর[৫২৪] থেকে, তিনি ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আসমান-যমীন ব্যাপী কুরসী হচ্ছে দু' পায়ের স্থান। আর 'আরশের পরিমাণ তিনিই জানেন যিনি তা সৃষ্টি করেছেন।"[৫২৫] তিনি[৫২৬] আরও উল্লেখ করেন আসাদ ইবন মূসা[৫২৭] বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন,

সন্তান মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল হাকাম প্রমুখ।
আবু 'আমর আদ-দানী তার ভূয়শী প্রশংসা করেন এবং বলেন, তার কিরাআতের জ্ঞান ছিল। আর তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, প্রমাণ্য, কুরআন ও সুন্নাহ'র আলেম, আরবী ভাষাতে তার যথেষ্ট দখল ছিল। আর তিনি তার তাফসীরের কথা বর্ণনা করে বলেন, পূর্ববর্তী কেউ তার মত তাফসীর লিখতে পারেনি। তিনি হিজরী ২০০ সালে মারা যান।
দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৯/১৫৫); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/৩৯৬); ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান (৬/২৫৯); 'উমার রেদ্বা কাহহালাহ, মু'জামুল মুওয়াল্লেফীন (১৩/২০০-২০১)।

৫২২. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মু'আল্লা ইবন হিলাল ইবন সুওয়াইদ আল-হাদ্বরামী, আত-ত্বাহহান, আল-কূফী। আলেমগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। বুখারী বলেন, তারা তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ইবন মা'ঈন বলেন, সে তো মিথ্যা ও হাদীস বানানোতে বিখ্যাত। ইবন হাজার এর স্তর বিন্যাস অনুযায়ী অষ্টম স্তরের লোক।
দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৮/৩৩১); মিযযী, তাহযীবুল কামাল (৩/১৩৫৫); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (১০/২৪০); তাক্বরীব, পৃ. ৫৪১; ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (৪/১৫২)।

৫২৩. তিনি হচ্ছেন আবু মু'আওয়িয়াহ আম্মার ইবন মুআওয়িয়াহ ইবন আসলাম আল-বাজালী, আদ-দুহনী, আল-কূফী। সাদূক, তবে তার মধ্যে শিয়াবাদ ছিল। তাকে ইমাম আহমাদসহ অনেকেই সিক্বাহ বলেছেন। মৃত্যু হিজরী ১৩৩ সাল।

৫২৪. তিনি হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ সা'ঈদ ইবন জুবাইর ইবন হিশাম, আল-আসাদী, তাদের মাওলা, কূফী। ইসলামের বড় আমলদার আলেম। যুহদ ও ইবাদতে প্রসিদ্ধ। আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করতেন না। আলেমগণ তার অনেক প্রশংসা করেছেন। ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং প্রচুর করেছেন, ইবন আব্বাসের কাছ থেকেই কুরআনের জ্ঞান নিয়েছেন। আরও বর্ণনা করেছেন ইবন 'উমার প্রমুখ সাহাবীগণ থেকে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী, আবু বিশর জা'ফর ইবন আবী ওয়াহশিয়্যাহ প্রমুখ। ইবন আব্বাসের কাছে কূফার কেউ প্রশ্ন করতে আসলে বলতেন, তোমাদের মাঝে কি 'ইবন উম্মুদ দাহমা' নেই? (অর্থাৎ সা'ঈদ ইবন জুবাইর)।
তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, 'আল-ইমাম, আল-হাফেয, আল-মুক্বরী, আল-মুফাসসির, আশ-শহীদ'। আমর ইবন মাইমূন তার পিতা মাইমূন ইবন মিহরান থেকে বর্ণনা করে, তিনি বলেন, 'সাঈদ ইবন জুবাইর মারা গেলেন, অথচ পৃথিবীর সকলেই তাঁর ইলমের মুখাপেক্ষী ছিল।' তার মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ৯৫ সালে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের হাতে। তার হত্যার কাহিনী খুবই বিখ্যাত। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।
দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৬/২৫৬; আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৪/২৭২); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/৭১); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/৩২১)।

৫২৫. ইতোপূর্বে হাদীসটির তাখরীজ চলে গেছে।

৫২৬. অর্থাৎ ইবন আবী যামানীন রাহিমাহুল্লাহ।

৫২৭. তিনি হচ্ছেন আবু সা'ঈদ আসাদ ইবন মূসা ইবন ইবরাহীম ইবনুল খালীফা আল-ওয়ালীদ ইবন

عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمس مائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه» .

আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন হাম্মাদ ইবন সালামাহ, তিনি আসেম[৫২৮] থেকে, তিনি যির[৫২৯] থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, তিনি বলেন: "দুনিয়ার আসমান ও তার পরবর্তী আসমানের ব্যবধান পাঁচশত বছর, আবার প্রত্যেক আসমানের ব্যবধান পাঁচশত বছর, আবার সপ্তম আসমান ও কুরসীর ব্যবধান পাঁচশত বছর, কুরসী ও পানির মাঝে ব্যবধান পাঁচশত বছর, 'আরশ পানির উপরে। আর আল্লাহ 'আরশের উপরে। আর তোমরা যার উপর আছ তিনি তা জানেন।"[৫৩০]

আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান, আল-কুরাশী, আদ-দিমাশকী। তাকে 'আসাদ আস-সুন্নাহ' বলা হয়। সাদূক বর্ণনাকারী, মাঝে মাঝে বিরল কিছু বর্ণনা প্রদান করেন। তার মধ্যে কিছু নাসেবীপনা ছিল। তাঁর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম, হাফেয, সিক্বাহ, যুত তাসানীফ। হিজরী ২১২ সালে তার মৃত্যু হয়। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মাঝে বিখ্যাত হচ্ছে, কিতাবুয যুহদ।

দেখুন, ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/৪০২); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১/১৬২); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/২৮৭); ইবন হাজার, তাকরীব, পৃ. ১০৪।

৫২৮. তিনি হচ্ছেন আবু বকর 'আসেম ইবন বাহদালাহ ইবন আবিন নুজূদ, আল-আসাদী, তাদের মাওলা, কূফী। বড় কারীদের একজন। কূফায় বিরাট সময় তিনি সবার সেরা ছিলেন। আহমাদ আল-'ইজলী বলেন, 'আসেম সুন্নাহ ও কিরাআতে পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি কুরআনের ব্যাপারে প্রধান'। হিজরী ১২৭ সালে তার মৃত্যু হয়। তার বর্ণিত হাদীস হাসান পর্যায়ের।

দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৩/৯), যাহাবী, মা'রিফাতুল কুররা আল-কিবার (১/৮৮); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/২৫৬); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৫/৩৮); তাকরীব, পৃ. ২৮৫।

৫২৯. তিনি হচ্ছেন আবু মারইয়াম যির ইবন হুবাইশ ইবন হুবাশাহ ইবন আওস আল-কূফী, আল-আসাদী। তিনি জাহেলী যুগ পেয়েছেন। বড় বড় সাহাবীগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কারীদের মধ্যে ছিলেন। তিনি ইবন মাসউদ ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার কাছ থেকে ইলমুল কিরাআত গ্রহণ করেছেন। তার থেকে আসেম ইবন আবিন নাজূদ গ্রহণ করেছেন। তার সম্পর্কে আসেম বলেন, আমি যির থেকে বড় কোনো কারী দেখিনি। তিনি হিজরী ৮১ সালে মারা যান।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৬/১০৪); আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৪/১৮১); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/১৬৬)।

৫৩০. হাদীসটি যারা যারা তাদের গ্রন্থে আনয়ন করেছেন তারা হচ্ছেন:

১- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪৩), (২/৮৮৫), নং ১৫০, ৫৯৪।
২- উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৪৬।
৩- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৪৫)।
৪- আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৫৬৫-৫৬৬, ৬৮৮-৬৮৯)।
৫- আত-ত্বাবারানী, আল-কাবীর (৯/২০২), নং ৮৯৮৭।
৬- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৩৯৬)।
৭- ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৯)।
৮- যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ৩৯-৪০।
৯- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪১৩)।
১০- উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলা বিশর আল-মিররীসী (১/৪৭১)।
১১- ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৭১-১৭২), নং ১২৮।
১২- আদ-দীনাওয়ারী, আল-মুজালাসাহ ২৮৩০।

ثم قال: باب الإيمان بالحجب.

[قوله في الحجب]:

অতঃপর তিনি বলেন: অধ্যায়: পর্দার ওপর ঈমান[৫৩১]

[ইবন আবী যামানীন কর্তৃক আল্লাহর পর্দার[৫৩২] আলোচনা]

৫৩১. ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ (১/২৬৪)।

৫৩২. আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে পর্দার আড়ালে রয়েছেন। দুনিয়ার জগতে কেউ তাঁকে দেখতে সমর্থ নয়। কারণ এসব চোখ ও এসব শরীর ধ্বংস হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ দুনিয়া থাকাকালীন যদি আল্লাহ তাঁর পর্দা উন্মুক্ত করেন তবে তাঁর চেহারার নূর যতটুকু তাঁর চোখ যাবে সৃষ্টির ততটুকু পুড়িয়ে দিবে। আর সেভাবে চূর্ণ হয়ে যাবে যেভাবে মূসার পাহাড় চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ পর্দাগুলোর প্রকৃত ধরণ ও পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই জানেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন এমন চোখগুলো জুড়ে দেয়া হবে যা হবে স্থায়ী, তখন সেটাতে এমন ক্ষমতা দেয়া হবে যা দুনিয়ার জীবনে দেয়া হয়নি। ফলে তখন সে চোখগুলো আসমান ও যমীনের স্রষ্টা ও অভাব পূরণকারীর দিকে তাকাতে সমর্থ হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ'য় আল্লাহর পর্দা সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন,

১- আল্লাহর বাণী: "আর কোনো মানুষেরই এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া, অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন, তিনি সর্বোচ্চ, হিকমতওয়ালা।" [সূরা আশ-শূরা: ৫১]

২- সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস, আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে পাঁচটি বাণী নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না, আর ঘুমানো তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়, তিনি ইনসাফের দণ্ড নিচু করে ও উপরে উঠান, তাঁর কাছে রাতের আমল দীনের আমলের আগে উঠানো হয়, আর দিনের আমল রাতের আমলের আগে উঠানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূরের, অপর বর্ণনায়, নার বা আগুনের। যদি তিনি তার পর্দা উন্মুক্ত করতেন তবে তার চেহারার উজ্জ্বল্য তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তার চোখ পড়তো ততটুকু পুড়িয়ে দিত।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৯]

৩- ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আবুশ শাইখ ও বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে চারটি পর্দার আড়াল গ্রহণ করেছেন। আগুন, অন্ধকার, আলো ও অন্ধকার।" [উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, নং ১১৮; আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ, নং ২৬৮; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১২৬), নং ৬৯৩] শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ আছারটির সনদকে সহীহ বলেছেন। কোনো কোনো বিদ'আতী আল্লাহর জন্য পর্দা সাব্যস্ত করে না। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, জাহমিয়্যারা কোনোভাবেই আল্লাহর হিজাব আছে স্বীকার করে না; কারণ তিনি তাদের নিকট আরশের উপর নেই। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১০)]

বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীনে 'ইযাম থেকে পর্দার ব্যাপারে অনেক ভাষ্য এসেছে। ইমামগণ যুগ যুগ ধরে তাদের গ্রন্থে এ বিষয়ের ওপর অধ্যায় বিন্যাস করে তাতে এর উপর প্রমাণবহ নস ও আছার নিয়ে এসেছেন। যেমন, ইমাম দারেমী রাহিমাহুল্লাহ তার আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে পৃ. ৬০-৬২, অধ্যায়: পর্দা গ্রহণ, তারপর তিনি এর ওপর বেশ কিছু আয়াত-হাদীস ও আছার নিয়ে এসেছেন। তারপর বলেন, 'আর এমন কে আছে যে মহা অধিপতি যে পর্দা দ্বারা আড়াল নিয়েছেন তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে যাবে? আর কে জানতে পারবে সেটা কী রকম? একমাত্র তিনিই তো তা জানেন যিনি সকল কিছুকে ইলম দিয়ে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং সবকিছুকে সংখ্যায় গুনে রেখেছেন। সুতরাং এতেও প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাদের থেকে পর্দার আড়ালে। জিবরীল তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সেসব পর্দার নিকটে যাওয়ার সামর্থ রাখে না।... আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১০-১১)।

قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف:٥] وذكر آثارًا في الحجب.

তিনি বলেন, আহলুস সুন্নাহের কথা হচ্ছে- নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক। পর্দার দ্বারা তিনি তাদের থেকে আড়াল। সুতরাং যালিমরা যা বলে তার থেকে আল্লাহ বিশাল ঊর্ধ্বে।

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ٥]

"তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে।" [সূরা আল-কাহফ: ০৫] আর তিনি[৫৩৩] হাজাব তথা পর্দার অনেক হাদীস উল্লেখ করেন[৫৩৪]।

কোনো কোনো বিদ'আতপন্থী লোকেরা আল্লাহর পর্দার অপব্যাখ্যা দাঁড় করে তা অস্বীকার করে। যেমন,

১- বাইহাক্বী বলেন, হিজাব বা পর্দা মূলত সৃষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তিত স্রষ্টার নয়। [আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১২৬, ২৯৩)]

২- রাযী তার তা'সীসুত তাক্বদীস গ্রন্থে পৃ. ১৩২ বলেন, আল্লাহর জন্য প্রকৃত পর্দা হওয়া অসম্ভব; কারণ পর্দা বা আড়াল বলতে বুঝায় এমন দেহ যা দু'টি দেহের মাঝখানে অবস্থান নেয়। তাই আমাদের নিকট পর্দার অর্থ, আল্লাহ তাঁকে দেখা সম্পৃক্ত কিছু বান্দার মাঝে সৃষ্টি করবেন না। আর যারা আল্লাহকে দেখা অস্বীকার করে তাদের নিকট পর্দার অর্থ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ বান্দার কাছে পৌছাবেন না।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর যথার্থ জবাব দেন এবং বর্ণনা করেন যে, এ তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা দু'টিই বাতিল। কারণ দেখা সৃষ্টি না করা তো নিছক অস্তিত্বহীন জিনিস। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁর পর্দা হচ্ছে নূরের। তাহলে কীভাবে নিছক অস্তিত্বহীন জিনিস নূর হতে পারে? আর কীভাবেই এটা বলা যায় যে, "অতঃপর তিনি তাঁর পর্দা উন্মুক্ত করবেন তখন তারা তাঁর দিকে তাকাবে"। যে জিনিস নিছক অস্তিত্বহীন সেটাকে উন্মুক্ত কীভাবে করা যায়? তারপর এটি আমাদেরকে জানাও পৃথিবীর কোন ভাষায় কোনো নিছক অস্তিত্বহীন জিনিসকে 'হাজাব' বা পর্দা বলা হয়? আর জানা কথা যে, 'হিজাব' এর বিপরীত হচ্ছে 'হিজাবহীন'। তাহলে নিছক অস্তিত্বহীনকে কি এ গুণ দেয়া যায় যে, এটা হিজাব নয়? যদি হিজাব অস্তিত্বহীনকে বলা হতো তাহলে তো সেটা না হওয়ার দাবি হচ্ছে অস্তিত্বে আসা। তখন অস্তিত্বশীল বস্তু হয়ে দাঁড়াবে অস্তিত্বহীনের গুণ। আর এটা তো অত্যাবশ্যকভাবে নিষিদ্ধ।" দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৩৩৫-৩৩৬)।

আবার অনেকে হিজাব এর অন্য তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যাও করে, যেমন বিশর আল-মিররীসী সেগুলো নিয়ে এসেছে। কিন্তু ইমাম আবূ সা'ঈদ আদ-দারেমী সেগুলো নিয়ে এসে একটি একটি করে খণ্ডন করেছেন। দেখুন, উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল বিশর আল-মিররীসী (২/২৪৮).... অনুরূপ আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৭১-৭৩।

৫৩৩. অর্থাৎ ইমাম ইবন আবী যামানীন রাহিমাহুল্লাহ।

৫৩৪. এ হিজাব বা পর্দার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাত্রে আল্লাহকে দেখতে পাননি। সহীহ হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি বললেন, সেখানে তো নূর ছিল, কীভাবে আমি তাকে দেখতে পাব'। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৮]

অপর বর্ণনায় এসেছে, 'আমি তো কেবল নূর দেখতে পেয়েছি।' [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৮; ইবন হিব্বান, আস-সহীহ (১/২৫৫); ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৪৪১; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (২/৫১২)]

এ ব্যাপারে বিদ'আতপন্থীদের বিকৃতি ও সেটার জবাব দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫০৭-৫০৮), (৩/৩৮৬-৩৯); ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা'আদ (৩/৩৭)।

ثم قال: في باب الإيمان بالنزول.

[قوله في النزول]:

অতঃপর তিনি বলেন: অধ্যায়: অবতীর্ণ হওয়ার ওপর ঈমান[৫৩৫]

[ইবন আবী যামানীন কর্তৃক আল্লাহর অবতরণ করা[৫৩৬] সম্পর্কে দেয়া বক্তব্য]

---

৫৩৫. ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ (১/২৭৮)।

৫৩৬. আল্লাহ কর্তৃক নিকটতম আসমানে অবতরণ এটি আল্লাহ একটি গুণ যা সিফাতে ফি'লিয়্যাহ ইখতিয়ারিয়্যাহ নামে বিখ্যাত। এ গুণটিকে অন্যান্য গুণের মতোই সাব্যস্ত করতে হবে। বলতে হবে, আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও বড়ত্বের জন্য উপযোগী ভাবে তিনি নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, তবে সেটার ধরণ আমাদের জানা নেই। আমরা তাঁর অবতরণ করার গুণটিকে নিক্রীয়করণ করি না, অপব্যাখ্যাও দাঁড় করাই না। আলেমগণ এ গুণটির বর্ণনার জন্য অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ বিন্যাস করেছেন। বরং তাদের অনেকেই এর ওপর আলাদা গ্রন্থ লিখেছেন।

ইমাম আজুররী তার আশ-শরী'আহ গ্রন্থে পৃ. ৩০৬ বলেন, অধ্যায়: ঈমান ও সত্যায়ন করতে হবে যে মহান আল্লাহ নিকটতম আসমানে প্রতি রাতে অবতরণ করেন। তারপর বলেন, এর ওপর ঈমান আনা ফরয, বিবেকবান মুসলিমের জন্য কখনও এটা বলা শোভনীয় নয় যে, তিনি কীভাবে অবতরণ করেন? আর এ গুণটিকে মু'তাযিলারা ব্যতীত কেউ অস্বীকার করে না। হকপন্থীরা সর্বদা বলে, এর ওপর ঈমান আনা ফরয, কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ ছাড়াই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে হাদীস এসেছে যে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন।... তারপর তিনি এতদসংক্রান্ত আছারগুলো একে একে বর্ণনা করেন।

অনুরূপ ইমাম ইবন খুযাইমাহ তাঁর কিতাবুত তাওহীদে (১/২৮৯-২৯০) বলেন, অধ্যায়: সেসব সংবাদের বর্ণনায় যা প্রতিষ্ঠিত সহীহ সুন্নাহতে সাব্যস্ত হয়েছে, মহান রব্ব কর্তৃক প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নাযিল হওয়ার ওপর, যা হিজায ও ইরাকের আলেমগণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা এসব সংবাদ ও হাদীসের সত্যতার ওপর সাক্ষ্য দেই, এমন সাক্ষ্য যা মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে, এসব হাদীসে রব্ব কর্তৃক অবতরণ করার যে সংবাদ দেয়া হয়েছে যা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করার ওপর। তবে আমরা কোনো রকম ধরণ নির্ধারণ করি না। কারণ আমাদের নবী আমাদের জন্য আমাদের রব্ব আমাদের স্রষ্টা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নাযিল হওয়ার ধরণ বর্ণনা করেননি। তবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অবতরণ করেন। তারপর বলেন, সুতরাং আমরা সেটা বলি ও সেটা বিশ্বাস করি যা এসব হাদীসে অবতরণের ব্যাপারে এসেছে, ধরণ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা বা ভনিতার আশ্রয় গ্রহণ করি না।.... তারপর বলেন, এসব হাদীসে যা স্পষ্ট হলো, প্রকাশ পেলো ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হলো তা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানের উপরে, যা আমাদের নবী আমাদের জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সেখানে নেমে আসেন। কারণ আরবী ভাষায় এটা বলা অসম্ভব যে, নিচ থেকে উপরের দিকে অবতরণ করেছে। হাদীসসমূহের ভাষ্যের দাবি হচ্ছে অবতরণ হয় উপর থেকে নিচের দিকে।... তারপর তিনি এর ওপর প্রমাণবাহী আছারসমূহ বর্ণনা করেন।

ইমাম দারেমী তাঁর 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যিাহ' গ্রন্থে পৃ. ৬৩, ৭৯ বলেন, অধ্যায়: অবতরণ। তারপর তিনি এতসংক্রান্ত আছার ও নসসমূহ উল্লেখ করেন। তারপর বলেন, সুতরাং এসব হাদীস তার সবগুলোতে বা অধিকাংশে এসেছে যে, রব্ব সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা এসব স্থানে অবতরণ করেন। এসব হাদীস ও আছারে আসা বর্ণনার ওপর বিশ্বাস ও ঈমান আনার উপরেই আমি আমাদের ফিকহ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উস্তাদদের পেয়েছি। তাদের কেউই তা অস্বীকার করতেন না। তাদের কেউ তা বর্ণনা করতেও পিছপা হতেন না। তারপর তিনি বলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য যে আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন তাঁর এ কথার ওপর ঈমান আনা ফরয। মহান রব্বকে যা তিনি করেন তাতে জিজ্ঞেস করা যায় না যে, কীভাবে করবেন? বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।...."

অনুরূপভাবে ইমাম দারাকুত্বনী রাহিমাহুল্লাহ আলাদা করে একটি কিতাব রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন, "কিতাবুন নুযূল"; যাতে তিনি আল্লাহ তা'আলার অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো একে একে

قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يَحُدُّوا فيه حَدًّا.

وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير

তিনি বলেন, আহলুস সুন্নাহের কথা হচ্ছে- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন। কোনো সীমা নির্ধারণ ছাড়াই তারা এতে ঈমান রাখে।(৫৩৭)

আর তিনি(৫৩৮) ইমাম মালেক ও অন্যান্যদের(৫৩৯) সূত্রে হাদীস উল্লেখ করেন, অবশেষে বলেন: আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ওয়াহাব(৫৪০), তিনি ইবন

নিয়ে এসেছেন। কিতাবটি ইমাম দারাকুতনীরই আরেক কিতাব 'আস-সিফাত' এর সাথে একত্রে ছাপা হয়েছে, যা আমাদের উস্তাদ শাইখ ড. আলী ইবন মুহাম্মাদ নাসের ফাকীহী কর্তৃক তাহকীক করা।

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আল্লাহর অবতরণ সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় পূর্ণ একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন, 'শারহু হাদীসিন নুযূল'।

বস্তুত নুযুল বা অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের; সুতরাং তা অস্বীকার করা কিংবা তাতে ত্রুটি খুঁজে দোষ প্রদান করা অসম্ভব।

দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২১৭-২১৮); যাহাবী, আল-উলূ, পৃ. ৭৯; ইবন তাইমিয়্যাহ, শারহু হাদীসিন নুযূল, পৃ. ৫; ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১২৮-১২৯); আবু ইসমা'ঈল আস-সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদীস, পৃ. ২৬।

৫৩৭. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের মতাদর্শ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে অবতরণ করলেও তিনি 'আরশের উপর অবশ্যই রয়েছেন। তিনি কখনও তাঁর সৃষ্টির নিচে নন। কখনও সৃষ্টিকুলের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হন না। বরং তিনি সর্বোচ্চ পবিত্র সত্তা। নিকটে থাকলেও উপরে, উপরে থাকলেও বিশেষভাবে নিকটে। আর এ জন্যই একাধিক সালাফে সালেহীন ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আল্লাহ কখনও আসমানের অভ্যন্তরে নন। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৭/৭)। আর সেজন্যই সালাফে সালেহীনের কেউ কখনও তাঁর অবতরণকে 'সত্তাগত' বলেননি। সুতরাং কেউ যদি সেটা বলে থাকে তবে ভুলই বলেছে অথবা স্বয়ং অবতরণ করেন এটা বুঝানোর জন্য বলেছেন।

৫৩৮. অর্থাৎ ইমাম ইবন আবী যামানীন রাহিমাহুল্লাহ।

৫৩৯. যেমন তিনি বলেন, আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন সা'ঈদ ইবন ফাহলূল, তিনি আল-'আক্কী থেকে, তিনি ইবন বুকাইর থেকে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন মালেক, তিনি ইবন শিহাব থেকে, তিনি আবু আব্দিল্লাহ আল-আগার ও আবু সালামাহ ইবন আব্দির রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের মহান ও বরকতময় রব্ব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, যখন রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তারপর বলেন, কে আমাকে ডাকবে, ফলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে কিছু চাইবে, ফলে আমি তাকে প্রদান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ফলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।"

বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ (৩/২৯), হাদীস নং ১১৪৫; মুসলিম, আস-সহীহ (১/৫২১), হাদীস নং ৭৫৮।

৫৪০. তিনি হচ্ছেন আবু হাযম ওয়াহাব ইবন মাসাররাহ ইবন মুফরিজ ইবন বাকার, আত-তাইমী, আল-আন্দালুসী, আল-হিজাযী, আল-মালেকী। তিনি ইবন ওদ্দাহ থেকে ইবন আবী শাইবাহ এর মুসনাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ফিকহের শিরোমনি হাদীস ও তার রিজাল সম্পর্কে তীক্ষ্ম দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন লোক ছিলেন। সাথে সাথে পরহেযগারী, তাকওয়া ইত্যাদিতেও বিখ্যাত। তার শহরে যাবতীয় ফতোয়া তার উপরেই গড়াত। তিনি হিজরী ৩৪৬ সালে মারা যান।

দেখুন, মুহাম্মাদ ইবন ফাতূহ আল-হামীদী, জাযওয়াতুল মুকতাবিস, পৃ. ৩৬০; ইবনুল ফারাদী,

بن عباد قال: «من أدركت من المشائخ. مالك وسفيان الثوري وفُضَيْل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووَكِيع.

ওদ্দাহ(৫৪১) থেকে, তিনি যুহাইর ইবন 'আব্বাদ(৫৪২) থেকে, তিনি বলেন: আমি যেসব শাইখদের পেয়েছি তাদের মধ্যে রয়েছে মালেক, সুফইয়ান, ফুদ্বাইল ইবন ইয়াদ্ব, ঈসা(৫৪৩) ও ইবনুল মুবারক এবং ওকী'(৫৪৪)।

তারীখে উলামায়ে আন্দালুস (২/১৬৫-১৬৬); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/৮৯০); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৫/৫৫৬)।

৫৪১. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ওদ্দাহ ইবন বাযী', আল-মারওয়ানী, আল-কুরত্ববী। আন্দালুসের বড় নৃপতি আব্দুর রহমান ইবন মু'আওয়িয়াহ আদ-দাখিল এর মাওলা। তিনি হাদীস শুনেছেন ইবন মা'ঈন, ইসমা'ঈল ইবন আবী উওয়াইস প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে শুনেছেন আহমাদ ইবন খালেদ আল-জাব্বাব, কাসেম ইবন আসবাগ প্রমুখ।
তার সম্পর্কে ইবনুল ফারাদ্বী বলেন, 'তিনি ছিলেন হাদীসশাস্ত্রের পণ্ডিত, হাদীসের বিভিন্ন সূত্র সম্পর্কে দক্ষ, হাদীসের ইলাল সম্পর্কে মত দেয়ার অধিকারী, ইবাদতকারীদের অনেক ঘটনা বর্ণনাকারী ও দুনিয়াবিমুখ, ইলম প্রচার-প্রসারে সবরকারী, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মানুষ। যার মাধ্যমে আল্লাহ স্পেনবাসীর উপকার করেছেন। ইবনুল জাব্বাব তার সম্মান করতেন, তার আক্বল ও ফদ্বল এর প্রশংসা করতেন, তার ওপর কাউকে অগ্রণী করতেন না। তবে তিনি অনেক সময় ধারণাবশত অনেক সহীহ হাদীসকে হাদীস মনে করতেন না। তার রচিত একটি গ্রন্থ বিখ্যাত, তা হচ্ছে বাবু মা জাআ ফিল বিদা'য়ি। হিজরী ২৮৭ সালে তার মৃত্যু; অপর মতে ২৮৬; আর ইমাম যাহাবী মীযানুল ই'তিদালে বলেছেন ২৮০ এর দিকে। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ।
দেখুন, ইবনুল ফারাদ্বী, তারীখু উলামায়িল আন্দালুস (২/১৫-১৭); ইবন উমাইরাহ, বুগইয়াতুল মুলতামিস, পৃ. ১৩৩; ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/৪৪৫)।

৫৪২. তিনি হচ্ছেন যুহাইর ইবন আব্বাদ ইবন মালীহ ইবন যুহাইর আর-রুওয়াসী, আল-কূফী। তিনি প্রখ্যাত ইমাম ওকী' ইবনুল জাররাহ এর চাচাতো ভাই। হাদীস বর্ণনা করেছেন মালেক, ইবন 'উয়াইনাহ, ইবনুল মুবারক প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হাতেম আর-রাযী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 'আম্মার, তারা দু'জন তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। তার থেকে আরও হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু যুর'আহ আদ-দিমাশকী প্রমুখ। সালেহ জাযারাহ বলেন, তিনি সাদূক (হাসানুল হাদীস) ছিলেন। ইবনু আব্দিল বার তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অনুরূপ আবু যুর'আহ ও ইবন আবিল হুওয়ারী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হিজরী ২৩৮ সালে তার মৃত্যু হয়। দেখুন, ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (২/৮৩); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/৩৮৩); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৩/৩৪৪)।

৫৪৩. তিনি হচ্ছেন 'আবু আমর ঈসা ইবন ইউনুস ইবন আবী ইসহাক, আল-হামাদানী, আস-সাবী'ঈ, আল-কূফী। তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন সুলাইমান আত-তাইমী, হিশাম ইবন উরওয়া প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন হাম্মাদ ইবন সালামাহ, আবু বকর ইবন আবী শাইবাহ, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ প্রমুখ। তিনি এক বছর হজ করতেন আরেক বছর জিহাদ করতেন। সীমান্তে অবস্থান করা পছন্দ করতেন। ইমাম, আদর্শ ও হাফেয। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, প্রশস্ত ইলমের অধিকারী, অধিক সফরকারী, সম্মান ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ'। বলা হয়ে থাকে, তিনি ইবন 'উয়াইনাহ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন ইবন 'উয়াইনাহ তাকে বলেন, স্বাগতম ফকীহ ইবনুল ফকীহ ইবনুল ফকীহকে। হিজরী ১৮৭ সালে তার মৃত্যু হয়।
দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১১/১৫২); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/২৭৯); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৪৮৯)।

৫৪৪. তিনি হচ্ছেন আবু সুফইয়ান ওকী' ইবনুল জাররাহ ইবন মালীহ আর-রুওয়াসী, আল-কূফী। ইসলামের বড় হাফেয ও আলেমগণের অন্যতম। তার সময়ের লোকদের ইমাম। পরহেযগারী ও ইবাদতে প্রসিদ্ধ। তিনি হাদীস শুনেছেন হিশাম ইবন উরওয়া ও আল-আ'মাশ প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস শুনেছেন সাওরী (তার উস্তাদ), ইবনুল মুবারক, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী, আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবন মা'ঈন প্রমুখ। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, আমি ওকী' এর

كانوا يقولون: النزول حق».

قال ابن وَضَّاح: سألت يوسف بن عَدِيّ عن النزول، قال: «نعم أؤمن به ولا أحِدّ فيه حدًا».

وسألت عنه ابن معين فقال: «أُقِرُّ به ولا أحِدّ فيه حدًا».

তারা বলেন: নিশ্চয় (আল্লাহর) অবতরণ করা সত্য।"[৫৪৫]

ইবন ওদ্দাহ্ বলেন: আমি ইউসুফ ইবন 'আদীকে[৫৪৬] আল্লাহর অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: হ্যাঁ, আমি সেটা বিশ্বাস করি, তবে সে ব্যাপারে কোনো সীমা বর্ণনা করি না।

আবার ইবন মাঈনকে[৫৪৭] এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: হ্যাঁ, আমি তা বিশ্বাস করি, তবে কোনো সীমা নির্ধারণ করি না।[৫৪৮]

মতো কাউকে ইলম জমাকারী ও হিফয সম্পাদনকারী দেখিনি। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ছিলেন, ইলমের সমুদ্র, হিফযের ইমাম; আহমাদ তাকে খুব সম্মান করতেন ও তার মর্যাদা তুলে ধরতেন। ইবন মা'ঈন বলেন, ওকী' যেন তার সময়ের আওযা'ঈ। হিজরী ১৯৬ সালে তিনি মারা যান।

দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্কাতুল কুবরা (৬/৩৯৪); আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৮/৩৬৮); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১৩/৪৪৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/১৪০)।

৫৪৫. এ আছারটি ইবন আবী যামানীন ছাড়া আরও যারা তাদের কিতাবে এনেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, শারহু হাদীসিন নুযূল, পৃ. ১৮৮।

২- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৫৬)।

৫৪৬. তিনি হচ্ছেন, আবু ইয়া'কূব ইউসুফ ইবন 'আদী ইবন যুরাইক্ব আত-তাইমী আল-কূফী। তার সময়ের বড় আলেমগণের একজন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন শারীক, আবিল আহওয়াস, 'আমর ইবন আবিল মিকদাম ও মালেক ইবন আনাস প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বুখারী, আবু যুর'আহ, আবু হাতেম প্রমুখ। আবু যুর'আহ বলেন, সিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য। ব্যবসায়ের জন্য মিসরে যান এবং হিজরী ২৩২ সালে সেখানে মারা যান। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৪৮৪); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৪/১৮৯); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৭৫)।

৫৪৭. তিনি হচ্ছেন আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ইবন 'আওন ইবন যিয়াদ ইবন সাত্তাম আল-মুররী, তাদের মাওলা, আল-বাগদাদী। হাদীস শুনেছেন ইসমা'ঈল ইবন 'উলাইয়্যাহ, ইসমা'ঈল ইবন মুজালিদ ইবন সা'ঈদ, হাম্মাদ ইবন উসামাহ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, 'আব্দুল্লাহ ইবন রাজা আল-মাক্কী, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী প্রমুখ। তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেন বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবরাহীম ইবন ইয়া'কুব আল-জাওযাজানী, আহমাদ ইবন হাম্বল, আবু যুর'আহ আর-রাযী ও আবু যুর'আহ আদ-দিমাশকী প্রমুখ। তিনি ছিলেন আলেম ও ইমাম। রিজালশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত। রিজালশাস্ত্রের কিতাবসমূহ তার বক্তব্য ও মন্তব্যে ভরপুর। বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি নিজ হাতে দশ লক্ষ হাদীস লিখেছি। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন যা লিখেছেন তা কোনো ব্যক্তি লিখেছেন বলে আমি জানি না। তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ১৫৮ সালে, আর মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ২৩৩ সালে।

দেখুন, ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (১/৩১৪); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১৪/১৭৭); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৬/১৩৯); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/৭১)।

৫৪৮. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসা সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির সূত্র দ্বারা সাব্যস্ত, এ গুণটি জাহমিয়্যাদের ওপর অনেক কঠিন আঘাত।

[ذكره لبعض أدلة العلو]:

قال محمد: وهذا الحديث يُبَيِّن أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضًا بَيِّنٌ في كتاب الله وفي ما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى:

[ইবন আবী যামানীন কর্তৃক আল্লাহর সর্বোচ্চ সত্তা হওয়ার ওপর কিছু দলীল উপস্থাপন][৫৪৯]

মুহাম্মাদ [ইবন আবি যামানীন] বলেন: এ হাদীস বর্ণনা করে যে, আল্লাহ আসমানে 'আরশের উপরে, যমীনে নয়। এটা আল্লাহর কিতাব এবং অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

আল্লাহ কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসা সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী বলেন, "এটি জাহমিয়্যাদের সবচেয়ে বেশি ক্রোধ উৎপাদনকারী হাদীস ও তাদের দাবির মূলোৎপাটনে সবচেয়ে বেশি কার্যকর।" [আর-রাদ্দু আলাল মিররীসী (১/৫০০)]

নু'আইম ইবন হাম্মাদ বলেন, "অবতরণ করার হাদীস জাহমিয়্যাদের মতবাদকে খণ্ডন করে দেয়।" [ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/৪৪)]

আলেমগণ বলেন, 'অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর মুতাওয়াতির হওয়ার ওপর যেসব ইমাম স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- ইমাম আবু যুর'আহ আর-রাযী। যেমনটি বদরুদ্দীন আল-আইনী তার উমাদতুল কারীতে (৭/১৯৯) উল্লেখ করেছেন।
২- অনুরূপ ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ গ্রন্থে (৭/১৩৭)।
৩- আব্দুল গনী আল মাকদেসী, আল-ইক্বতেসাদ ফিল ই'তিকাদ, পৃ. ১০০।
৪- ইবন তাইমিয়্যাহ, শারহু হাদীসিন নুযুল, পৃ. ৩২৩।
৫- ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (৩/১১০৮)।
৬- ইমাম যাহাবী, আল-উলু (১/৭০০) প্রমুখ।

কোনো কোনো আলেম সেসব সাহাবীগণের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- ইমাম আবুল কাসেম লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৪৮১), যাতে তিনি তাদের সংখ্যা বিশ জন বলে বর্ণনা করেছেন।
২- উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল মিররীসী (১/৪৯৭)।
৩- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা, (আত-তিস'ঈনিয়্যাহ) (৬/৬৭)।
৪- যাহাবী, আল-আরবা'ঈন ফী সিফাতি রাব্বিল আলামীন, পৃ. ৭০; সেখানে বিশের ঊর্ধ্বে কয়েকজন সাহাবী থেকে তা তিনি উল্লেখ করেন।
৫- ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (৩/১১০৮); সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যারা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের সংখ্যা ২৮ জন।

আর যুগ যুগ ধরে আলেমগণ এ হাদীসটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন; তারা সেটাকে যেভাবে আল্লাহর মর্যাদা ও মহত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেভাবে সাব্যস্ত করেছেন। উক্ত হাদীসগুলো নিয়ে কেউ কেউ ভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমনটি ইমাম দারাকুতনী 'কিতাবুন নুযূল' নামে আলাদা একটি গ্রন্থই লিখেছেন। ইমাম যাহাবীও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ উলু, 'আরশ, আরবা'ঈন প্রভৃতিতে আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন।

ইমাম শাফে'য়ী বলেন, "সুন্নাত বা আকীদা-আদর্শের যার ওপর আমি ও আমার সাথী আসহাবুল হাদীস, যাদেরকে আমি দেখেছি, যাদের থেকে আমি গ্রহণ করেছি, যেমন সুফইয়ান, মালেক প্রমুখ তা হচ্ছে, স্বীকার করে নেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমানের উপর 'আরশের উপরে, যেভাবে ইচ্ছা তাঁর বান্দাদের নিকটে হন। আর তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন।" [দেখুন, ইসবাতু সিফাতিল উলু, ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, পৃ. ৩১]

৫৪৯. ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ (১/৩০২)।

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة:٥]، وقال تعالى: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ - أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ [الملك: ١٦-١٧]، وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام:١٨]، وقال تعالى: ﴿يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران:٥٥]، وقال تعالى: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللهُ

﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥]

"তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর তাঁর সমীপে উঠে যায়।" [সূরা আস-সাজদাহ: ০৫]

তিনি আরও বলেন:

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝﴾ [الملك: ١٦، ١٧]

"তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশের উপর যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশের উপর[৫৫০] যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। [সূরা আল-মুলক: ১৬, ১৭]

তিনি আরও বলেন:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠]

"তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায় আর সৎ আমল তিনিই তা উঠিয়ে নেন।" [সূরা ফাতির: ১০]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ﴾ [الانعام: ١٨]

"আর তিনিই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী তাঁর বান্দাদের উপর।" [সূরা আল-আন'আম: ১৮]

তিনি আরও বলেন:

﴿يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [ال عمران: ٥٥]

"হে 'ঈসা! নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব, আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব।" [সূরা আলে ইমরান: ৫৫]

তিনি আরও বলেন:

﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٨]

---

৫৫০. আয়াতে বর্ণিত 'সামা' অর্থ যদি ঊর্ধ্বালোক অর্থ করা হয়, তাহলে 'ফী' অর্থ 'মধ্যে' করা যায়। আর যদি 'সামা' অর্থ আসমান নামীয় একটি দেহ বিশিষ্ট স্তর ধরা হয় তখন 'ফী' অর্থ করা হবে 'উপরে'। আরবী ভাষায় এর বহু নযীর আছে। আর কুরআনে কারীমেও সে রকম ব্যবহার এসেছে।

﴿إِلَيْهِ﴾ [النساء:١٥٨].

وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «فأعتقها، فإنها مؤمنة». قال: «والأحاديث مثل هذه كثيرة جدًا، فسبحان من عِلْمُه بما في السماء كعِلْمِه بما في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم».

[قوله في الأسماء والصفات جملة]:

وقال قبل ذلك ﴿باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه﴾ قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علمًا، والعجز عن ما لم يدع إليه إيمانًا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه، وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى. وهو أصدق القائلين: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، وقال

"বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৫৮]

আর তিনি[৫৫১] ইমাম মালিক এর সূত্রে ঐ দাসীর কথা উল্লেখ করেন যাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন:

«أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

"আল্লাহ কোথায়? সে বলল আসমানের উপর। তিনি বললেন: আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: তাকে মুক্ত করে দাও; কেননা সে মুমিন দাসী।"[৫৫২]

তিনি[৫৫৩] বলেন, এ ধরনের আরও অসংখ্য হাদীস রয়েছে। সুতরাং তিনি কতইনা পবিত্র, যার জ্ঞান যমীনস্থ সবকিছু সম্পর্কে যেমন আসমানস্থ সবকিছু সম্পর্কেও তেমন। তিনি ভিন্ন সত্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি সুউচ্চ, মহান।

[ইবন আবী যামানীন কর্তৃক আল্লাহর নাম ও গুণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য][৫৫৪]

এর পূর্বে তিনি আল্লাহ নাম ও সিফাতের প্রতি ঈমান সম্পর্কে বলেন: "জেনে রাখো! আল্লাহ সম্পর্কে এবং তাঁর নবী-রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছিলেন সে সম্পর্কে যারা জ্ঞানী তারা মনে করেন, আল্লাহ নিজের ব্যাপারে যা বলেননি তা না জানাই ইলম এবং যেদিকে আহ্বান করেননি, তা করতে অপরাগ হওয়াই ঈমান। আর তারা তো সেখানেই থেমে যান যেখানে তিনি স্বীয় কিতাবে তাঁর নবীর যবানীর মাধ্যমে থামিয়ে দিয়েছেন।

আর মহান আল্লাহ বলেছেন বলেছেন- তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী-

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]

---

৫৫১. অর্থাৎ ইবন আবী যামানীন রাহিমাহুল্লাহ।

৫৫২. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৫৩৭। ইতোপূর্বে এর তাখরীজ চলে গেছে।

৫৫৩. অর্থাৎ ইবন আবী যামানীন রাহিমাহুল্লাহ তার উসূলুস সুন্নাহ গ্রন্থে।

৫৫৪. ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ (১/১০১)।

تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام:١٩]، وقال: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران:٣٠]، وقال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [ص:٧٢]، وقال:

"আল্লাহর চেহারাসহ সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।"[৫৫৫] [সূরা আল-কাসাস: ৮৮]

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ﴾ [الانعام: ١٩]

"বলুন, 'কোন জিনিস[৫৫৬] সবচেয়ে বড় সাক্ষী'? বলুন, 'আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতা'[৫৫৭]।" [সূরা আল-আন'আম: ১৯]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾ [آل عمران: ٣٠]

"আল্লাহ তাঁর নিজের সত্তা[558] সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে সাবধান করছেন।" [সূরা আলে ইমরান: ৩০]

অন্যত্র বলেন:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى﴾ [الحجر: ٢٩] [ص: ٧٢]

"অতঃপর যখন আমি তাকে সুন্দর সুসম করব[৫৫৯] আর তাতে আমার রূহ[৫৬০]

---

৫৫৫. এটি আল্লাহর সত্তাগত গুণ 'চেহারা' এর ওপর প্রমাণ। যদিও চেহারার সাথে সত্তাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ যে সত্তার চেহারা নেই সে সত্তাকে চেহারার দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না। [খালেদ আল-মুসলিহ, শারহুল হামাওয়িয়্যাহ]
আয়াতের আরেকটি বিশুদ্ধ অর্থ হচ্ছে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তবে কেবল তাই অবশিষ্ট থাকবে যা আল্লাহর চেহারা দর্শন লাভের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [খালেদ আল-মুসলিহ, শারহুল হামাওয়িয়্যাহ]

৫৫৬. এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলাকে 'শাই' বস্তু বা বিষয় বলা যাবে। তবে সেটা গুণ হিসেবে নয়, ইখবার বা সংবাদ হিসেবে। আয়াতে শেষে সাক্ষ্য হওয়া আল্লাহর একটি গুণ।

৫৫৭. আয়াত থেকে আল্লাহর 'শহীদ' নামটি সাব্যস্ত হচ্ছে।

৫৫৮. এখানে নফস বলে আল্লাহর সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। তাই বিশুদ্ধ মতে এ আয়াতটি সিফাতের আয়াত নয়।

৫৫৯. এখান থেকে আল্লাহর আরেকটি কর্মগত গুণ সাব্যস্ত হচ্ছে, তা হচ্ছে 'তাসওয়িয়াহ' আর তা হাত দিয়ে করেছেন, তাই সত্তাগত আরেকটি গুণ সাব্যস্ত হচ্ছে তা হচ্ছে হাত।

৫৬০. এ আয়াতে আসা রূহ কী আল্লাহর সিফাত? বস্তুত 'রূহ' আল্লাহর সিফাত হিসেবে এখানে যেমন আসেনি তেমনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথাও আসেনি। কুরআনে কারীমের কয়েক জায়গায় 'রূহ' হিসেবে জিবরীলকে ও 'ঈসাকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর উভয়েই সৃষ্ট আলাদা সত্তা। নিয়ম হচ্ছে, কোনো স্বতন্ত্র সত্তা যদি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন সেটা আল্লাহর গুণ হয় না। সেটা হয় আল্লাহর সৃষ্টি।
কারণ, আল্লাহর দিকে কোনো কিছু সম্পৃক্ত হওয়া তিন ভাবে হতে পারে:
১- সত্তার দিকে অপর সত্তার সম্পর্ক।
২- আল্লাহর সত্তার দিকে গুণের সম্পর্ক। কোনো সত্তার সাথে যদি এমন কিছুকে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় যার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই, তাহলে সেটা হয় মাওসূফের সাথে সিফাতের সম্পর্ক, সত্তার সাথে গুণের সম্পর্ক। যেমন, 'কুদরাতুল্লাহ' (আল্লাহর কুদরত) 'রহমাতুল্লাহ' (আল্লাহর রহমত) 'ইয়াদুল্লাহ' (আল্লাহর হাত) কারণ এগুলো আলাদা সত্তা হিসেবে পাওয়া যায় না।আর যখনই সৃষ্ট আলাদা সত্তার কোনো কিছু আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন সেটা হয়, মালিকের দিকে মালিকানার সম্পৃক্ততা। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক দেখানো। সে সম্পৃক্ততা সাধারণত সম্মানিত করার জন্য হয়ে থাকে। যেমন, বাইতুল্লাহ, (আল্লাহর ঘর), নাকাতুল্লাহ

﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور:٤٨] ، وقال: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ [طه:٣٩] ، وقال: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة:٦٤] ، وقال

ফুঁকে(৫৬১) দেব।" [সূরা আল-হিজর: ২৯; সূরা স্বদ: ৭২]

তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨]

"কারণ আপনি আমাদের চোখের সামনেই আছেন।"(৫৬২) [সূরা আন-তূর: ৪৮]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [طه: ٣٩]

"আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হন।"(৫৬৩) [সূরা ত্বা-হা: ৩৯]

তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]

"আর ইয়াহূদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত(৫৬৪) রুদ্ধ'। তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত, বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত।"(৫৬৫) [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৪]

(আল্লাহর উষ্ট্রী)। আর জানা কথা যে, ঘর ও উষ্ট্রী উভয়টিই সৃষ্ট আলাদা জিনিস। তাই আল্লাহর সাথে সেটার সম্পৃক্ততা মালিকের সাথে মালিকানার, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির। সে হিসেবে কুরআনে কারীমের যেখানে যেখানে 'রূহ' শব্দটি এসেছে, যেমন, [সূরা আন-নিসা: ১৭১; সূরা আল-হিজর: ২৯; স্বদ ৭২; সূরা মারইয়াম, ১৭; সূরা আস-সাজদাহ: ০৯] অনুরূপ হাদীসেও 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও জিবরীলের ব্যাপারে আল্লাহর 'রূহ' ব্যবহৃত হয়েছে, এসব স্থানে রূহ অবশ্যই সৃষ্ট জিনিস। তাই সৃষ্ট জিনিসের সাথে আল্লাহর সম্পৃক্ত হওয়া হচ্ছে মালিকের সাথে মালিকানার সম্পৃক্ততা, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পৃক্ততা, তা স্রষ্টার সাথে গুণের সম্পৃক্ততা নয়। তাই উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসে আসা 'রূহ' আল্লাহর গুণ নয়, বরং সৃষ্টি। এর বাইরে রূহ শব্দটি কোথাও আল্লাহর জন্য কুরআনে কারীম ও হাদীসে গুণ হিসেবে আসেনি। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, মাজমূ' ফাতাওয়া (৯/২৯০); ইবনুল কাইয়্যেম, কিতাবুর রূহ, পৃ. ৫০০]

৩- আল্লাহর সাথে কোনো কর্মের সম্পর্ক। এটা দু'ভাবে বিভক্ত, এক. যদি সে কর্মটি একান্তভাবে স্রষ্টার সাথেই সম্পৃক্ত থেকে যায়, তার মাধ্যমে অন্য কোনো সত্তার অস্তিত্ব না আসে, তবে সেটাকে বলা হবে কর্মবাচক গুণ। যেমন, 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, হাশরের মাঠে আগমন, কারো ওপর সন্তুষ্ট হওয়া, কারো ক্রোধান্বিত হওয়া ইত্যাদি। দুই. আর যদি সে কর্মের মাধ্যমে ওপর একটি ভিন্ন সত্তার সূত্রপাত হয় তবে সেটাকে আল্লাহর কর্ম বলা হবে। যেমন, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ পানি বর্ষণ করেছেন।

৫৬১. বুঝা গেল রূহ ফুঁকে দেয়া আল্লাহর একটি কাজ, যা তিনি করেছেন।

৫৬২. এখানে আল্লাহর সত্তাগত একটি গুণ সাব্যস্ত করা হচ্ছে, আর তা হচ্ছে আল্লাহর চোখ।

৫৬৩. এ আয়াত থেকেও আল্লাহর সত্তাগত গুণ 'চোখ' সাব্যস্ত হচ্ছে।

৫৬৪. এ আয়াতে আল্লাহর একটি গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা হচ্ছে: আল্লাহর হাত।

৫৬৫. গ্রন্থকার শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র 'হাত প্রসারিত করা'র অর্থ করেছেন 'বেশি দান করা ও প্রশস্তভাবে খরচ করা'। তিনি আরও বলেন, দু'হাত তাওরাত ও অন্যান্য নবুওয়াতেও সাব্যস্ত করা হয়েছে; যেমনিভাবে তা কুরআনে এসেছে। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ (৪/৪১২); মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৬৩)।

تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الزمر:٦٧]، وقال: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه:٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء:١٦٤]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور:٣٥]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة:٢٥٥] وقال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد:٣] ومثل هذا في القرآن كثير.

তিনি অন্যত্র বলেন: [الزمر: ٦٧] ﴿وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ "কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে(৫৬৬)।" [সূরা আয-যুমার: ৬৭]

তিনি অন্যত্র বলেন: [طه: ٤٦] ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ﴾ "আমি তো আপনাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।(৫৬৭)" [সূরা ত্বা-হা: ৪৬]

তিনি অন্যত্র বলেন: [النساء: ١٦٤] ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا﴾ "আর অবশ্যই আল্লাহ্ মূসার সাথে যথাযথভাবে কথা বলেছেন(৫৬৮)।" [সূরা আন-নিসা: ১৬৪]

তিনি আরও বলেন: [النور: ٣٥] ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ﴾ "আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর।(৫৬৯)" [সূরা আন-নূর: ৩৫]

তিনি আরও বলেন, [البقرة: ٢٥٥] ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾ "আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক(৫৭০)।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫]

তিনি আরও বলেন, [الحديد: ٣] ﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ﴾ "তিনিই আদি, অন্ত, সবকিছুর উপরে এবং নিকটে।(৫৭১)" [সূরা আল-হাদীদ: ০৩] এরূপ আরও বহু আয়াত কুরআনে রয়েছে(৫৭২)।

---

৫৬৬. এ আয়াতে আল্লাহর একটি সত্তাগত গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা হচ্ছে হাতের কব্জা বা মুষ্ঠি।

৫৬৭. এ আয়াতে আল্লাহর তিনটি কর্মগত গুণ সাব্যস্ত হচ্ছে, তা হলো, আল্লাহ কর্তৃক আরশের উপর থেকেও বান্দার সাথে থাকা, তাঁর শোনা ও দেখা। অর্থাৎ শোনা ও দেখার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সকল বান্দার সাথে আছেন। আর তাঁর বিশেষ বান্দাদের সাথে আরও একটু অতিরিক্ত হিসাবে সাথে আছে আছেন তা হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৫৬৮. এ আয়াতে আল্লাহর একটি গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা হচ্ছে কথা বলা। আল্লাহর এ গুণটি সত্তাগত ও কর্মগত উভয় প্রকারের।

৫৬৯. এ আয়াত থেকে সাব্যস্ত হচ্ছে যে আল্লাহর জন্য 'নূর' নামটি সাব্যস্ত হবে। যেমনটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তার বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে (২/৪২০) এবং ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশ, পৃ. ৪৪।

৫৭০. এ আয়াতে অনেকগুলো নাম ও গুণ রয়েছে। যেমন: ইলাহিয়াহ গুণ, হায়াত গুণ, কাইয়্যুমিয়্যাহ গুণ। এ গুণগুলো সত্তাগত।

৫৭১. এখানে চারটি নাম ও কমপক্ষে চারটি সত্তাগত গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।
বস্তুত এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক বান্দাহকে সর্বদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখা প্রমাণিত হচ্ছে। স্থান হোক কিংবা কাল হোক সবদিক থেকে বান্দা সবসময় ও সবজায়গায় আল্লাহর পরিবেষ্টনীর ভেতর রয়েছে। এ যেন অপর আয়াতের তাফসীর যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 'ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন মুহীত্ব' বা "আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সূরা ফুসসিলাত: ৫৪] এ পরিবেষ্টন, জ্ঞান, ক্ষমতা, তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

৫৭২. অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা হয়েছে এমন বহু আয়াত রয়েছে কুরআনে কারীমে।

فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما

সুতরাং মহান বরকতময় সত্তা যিনি আসমান ও যমীনের নূর, যেমনটি তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে জানিয়েছেন। আর তাঁর রয়েছে চেহারা, নফস বা সত্তা(৫৭৩) ইত্যাদি।

---

৫৭৩. এখানে 'নাফস' বলে আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। এটিই অধিকাংশ আলেমের মত। যেমনটি বেশ কিছু নস তথা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে এসেছে। যেমন, আল্লাহর বাণী, "মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁর নিজ সত্তার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।" [সূরা আলে ইমরান: ২৮], অনুরূপ "আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে, তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন তাদেরকে আপনি বলুন, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক', তোমাদের রব তাঁর নিজ সত্তার ওপর দয়া লিখে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি খারাপ কাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-আন'আম: ৫৪] আর হাদীসে কুদসীতে এসেছে, "... অতঃপর যদি আমাকে তার নিজ সত্তায় স্মরন করে আমিও তাকে নিজ সত্তায় স্মরণ করি" ইত্যাদি ভাষ্যসমূহে।

ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী বলেন, "আর আল্লাহর নফস বলে স্বয়ং আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। সত্তাতে সকল সিফাত একত্রিত হয়, যদি সত্তা অস্তিত্বহীন হয়ে যায় তখন সবকিছু অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। [আর-রাদ্দু 'আলাল বিশর আল-মিররীসী (২/৮৪৭-৮৪৮)]

ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র বলেন, 'আর তাঁর নফস বলতে তাঁর সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। [মাজমু' ফাতাওয়া (১৪/১৯৬)]

অন্যত্র তিনি বলেন, "অধিকাংশ আলেমের নিকট নফস বলে স্বয়ং আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে যা তাঁর সেই সত্তা যা সকল গুণে গুণান্বিত। এখানে নফস বলে এমন কোনো সত্তা বুঝানো হয়নি যা গুণ থেকে মুক্ত; আবার নফস দ্বারা সত্তার কোনো গুণকেও বুঝানো হয়নি। কোনো কোনো মানুষ নফসকে সিফাত বা গুণ গণ্য করে থাকে, আবার আরেক গোষ্ঠী এটাকে গুণমুক্ত একটি সত্তা মনে করে থাকে। উভয় মতই ভুল।" [মাজমূ' ফাতাওয়া (৯/২৯২); আরও দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৭/৪২৬)]

যারা যাত বা সত্তা বলে একটি সিফাত সাব্যস্ত করে থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, কাযী আবু ইয়া'লা, যেমনটি এসেছে তাঁর ইবত্বালুত তা'ওয়িলাত গ্রন্থে (২/৪৪২-৪৪৭)। সেটার ওপর তিনি 'নাফস' আসা আয়াতগুলো দিয়েই দলীল দিয়েছেন; অনুরূপ তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের একটি মত থেকেও সেটার দলীল নিয়েছেন যা ইমাম আহমাদ তার 'আর-রাদ্দু আলায যানাদিক্বাতি ওয়াল জাহমিয়্যাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তারপর তিনি বলেন, 'অতঃপর যদি কেউ বলে, এখানে 'নাফস' দ্বারা সিফাত সাব্যস্ত করা হচ্ছে না, এর দ্বারা তো কেবল 'যাত' বা সত্তাকের বুঝানো হচ্ছে, যেমন আরবরা বলে থাকেন, 'হাযা নাফসুল আমর', (এটা তো সে কাজটিই) তারা এর দ্বারা সে কাজটিই বুঝায়, এটা বুঝায় না যে কাজের 'নাফস' আছে।... বলা হবে যে এটা ভুল; কারণ

[১] যদি 'নাফস' বলে যাত বা সত্তা বুঝানো জায়েয হয় তাহলে হায়াত (জীবন) ও বাক্বা (স্থায়ী) বলেও সত্তা বুঝানো সম্ভব। তাই তখন বলা যাবে যে, যাতু হাইয়াহ, যাতু বাকীয়্যাহ। আর আমরা আর সকল সিফাত সাব্যস্তকারীরা এভাবে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা জীবন দ্বারা জীবিত, অবশিষ্ট থাকা দ্বারা স্থায়ী। তাই সে হিসাবে বলা জায়েয হবে যে, তিনি নফসসহ সত্তা।

[২] তাছাড়া আরও একটি কারণ হচ্ছে, তখন আল্লাহর ব্যাপারে বলা জায়েয হবে যে, আল্লাহ হচ্ছেন

وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه، فقال: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:٢٩]،

حي قيوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١]،

لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان» اهـ].

তিনি শোনেন, দেখেন, কথা বলেন। তিনি প্রথম, তাঁর পূর্বে কিছুই নেই। তিনি স্থায়ী, সর্বশেষ, তাঁর পরে কিছুই নেই। তিনি উপরে, সবকিছুর উপরে, তিনি নিকটে, সৃষ্টির ব্যাপারে তার ইলম খুবই সূক্ষ্ম। "তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৯], তিনি কাইয়্যুম বা চিরস্থায়ী, হাইয়্যুন বা চিরঞ্জীব, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।

অতঃপর তিনি সিফাত সংক্রান্ত অনকেগুলো হাদীস উল্লেখ করে বলেন[৫৭৪]:

এগুলো আমাদের প্রভুর সিফাত যা তিনি স্বীয় কিতাবে এবং তার নবী হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেগুলোর মধ্যে নেই কোনো সীমানা নির্ধারণ, সাদৃশ্যকরণ ও পরিমাণ বর্ণনা। "তার মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ১১]

কোনো চোখই তাঁকে দেখেনি যে তিনি কেমন তা সীমিত করবে।[৫৭৫] কিন্তু অন্তরসমূহ

নাফস।

[৩] তখন এভাবে আহ্বান করে বলাও জায়েয হতে হয়, 'হে নফস, আমাদের ক্ষমা করুন।' অথচ উম্মতের ইজমা' হয়েছে যে এটা বলা যাবে না।'

এ হচ্ছে 'নাফস'কে গুণ বলার ব্যাপারে কাযী আবু ইয়া'লার ব্যাখ্যা। অথচ তা শুদ্ধ নয়। আয়াতসমূহে 'নাফস' শব্দটি তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর-

[১] হায়াত ও বাকা শব্দদ্বয় তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

[২] এটা তো তা'কীদ হিসেবে এসেছে। যাতে মুআক্কাদ অবশিষ্টই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

[৩] তা'কীদকে ডাকা হয় না, মুআক্কাদকেই ডাকা হয়।

৫৭৪. ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ, পৃ. ১৬৬।

৫৭৫. সাধারণত কেউ কোনো কিছু দেখতে পেলে বলতে পারে যে, সেটা কেমন। দুনিয়ার বুকে জাগ্রত অবস্থায় কেউ আল্লাহকে দেখতে পায়নি; সুতরাং কীভাবে সে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে তাঁকে পরিবেষ্টন করবে?

অনুরূপ কথা ইবন কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ তার লুম'আতুল ই'তিক্বাদেও বলেছেন, 'তাকে কোনো বিবেক চিন্তা করে উদাহরণ পেশ করতে পারে না, অনুরূপ কোনো কলব তাঁকে ছবির মত ধারণা করতে পারে না, "তার মতো কোনো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা [সূরা আশ-শূরা: ১১]। সুতরাং এখানেও তিনি কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহর গুণাবলিকে কোনো প্রকার উদাহরণ কিংবা ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই সাব্যস্ত করেছেন।

وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم.

[قول الإمام الخطابي]: مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في «الغنية عن

তাঁকে ঈমানের হাকীকতে দেখেছে[৫৭৬]।[৫৭৭]

এ প্রসঙ্গে ইমামদের বক্তব্য এতো লম্বা ও বেশি যে, এই ফাতওয়ায় তার এক-দশমাংশও সংকুলান সম্ভব নয়।

[ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবীর উদ্ধৃতি]

তার উদাহরণ, যেমনটি আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী[৫৭৮] তার প্রসিদ্ধ "আল-গুনইয়াতু

---

৫৭৬. এখানে যা বলা হয়েছে তা সেটাই প্রমাণ করছে যে কথাটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অন্য জায়গায় বলেছেন, তিনি বলেন, 'যে কেউ দাবি করবে যে, সে তার রব্বকে মৃত্যুর পূর্বে তার দু চোখে দেখেছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট তার দাবি অবশ্যই বাতিল।... তবে যারা আল্লাহর প্রকৃত ঈমানদার বান্দা তারা আল্লাহর পরিচয়, কলবের দৃঢ়তা ও সেটার দর্শন ও আলোর মাধ্যমে যা লাভ করে তার রয়েছে অনেক স্তর। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে বলেছেন, ইহসান হচ্ছে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তা করতে না পার, তবে এমনভাবে করবে যেন তিনি তোমাকে দেখছেন। [আল-ওয়াসিয়্যাতুল কুবরা, পৃ. ২৭; তাহকীক: আল-হামূদ]

বস্তুত সেটা তখনই হবে যখন কেউ আল্লাহর কিতাবে আসা আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণাবলি, অনুরূপ আল্লাহর রাসূলের হাদীসে আসা আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণাবলির প্রতি অকাট্য ঈমান রাখবে, এমন দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যাতে কোনো সংশয় ও সন্দেহ প্রবেশ করার সুযোগ থাকবে না। যখন এগুলোর ধরণ নির্ধারণ ও উদাহরণ পেশ নিয়ে অযথা কৃত্তিমতা অবলম্বন করবে না। তখনই সে তার অন্তরে রাব্বুল আলামীনের নাম ও গুণকে দেখবে এমনভাবে যা চোখের দেখার চেয়েও বড় আকারে ধরা দিবে, বিশেষ করে যখন ঈমানী চেতনার সাথে তার সম্পৃক্ততা থাকবে। বর্ণিত আছে যে, উরওয়া ইবনুয যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার কাছে তার কন্যার বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করেন, তখন ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা তাওয়াফরত অবস্থায় ছিলেন। ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেন, তুমি কি এখন মহিলাদের ব্যাপারে আলোচনা করছ? অথচ আমরা এখন তাওয়াফে আল্লাহর দর্শনে ব্যস্ত আছি? এ প্রকাশ একজন মানুষের আল্লাহর ওপর ঈমান ও তার পরিচয় লাভ ও ভালোবাসা অনুযায়ী হয়ে থাকে; আর তাই তা মানুষের অবস্থা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হতে পারে।

দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, শারহু হাদীসিন নুযূল, পৃ. ১২৩-১৩৪।

৫৭৭. এখানে এসে ইবন আবী যামানীন থেকে উদ্ধৃত অংশ শেষ হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এখানে ইমাম আবি যামানীন এর উসূলুস সুন্নাহ্ গ্রন্থ থেকে আল্লাহর 'আরশ, কুরসী, অবতরণ ও 'আরশের উপর থাকা এতসংক্রান্ত বড় একটি অংশ নিয়ে এসেছেন। তবে কোথাও কোথাও তিনি কথা সংক্ষেপ করেছেন।

৫৭৮. তিনি হচ্ছেন আবু সুলাইমান হামাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবনুল খাত্তাব। যায়েদ ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এর বংশধর। আল-বুসতী। সে যমানার বড় আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত। বহু ইলমে তার কৃতিত্বের সাক্ষর রয়েছে। তিনি শুনেছেন আবু সা'ঈদ ইবনুল 'আরাবী থেকে মক্কায়, ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আস-সাফফার থেকে বাগদাদে, আবু বকর ইবন দাসাহ থেকে বসরায়। তার থেকে শুনেছেন আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, যদিও তিনি তার সাথী ও সমবয়সী, আবু ইসহাক আল-ইসফারায়ীনী প্রমুখ। যিনি হাদীস, ফিকহ, কবিতা, ভাষা সবই জমা করেছেন। তিনি ইমাম শাফে'য়ীর মাযহাবের ওপর ফিকহ অর্জন করেন। তার সম্পর্কে আবুত তাহের আস-সিলাফী বলেন, 'আর আবু সুলাইমান, যিনি আবু দাউদ এর কিতাবের ব্যাখ্যা করেছেন, যদি কোনো ইনসাফকারী তার গ্রন্থসমূহ পড়ে দেখে, তার গ্রন্থগুলোর অপূর্ব কর্মকাণ্ড অবলোকন করে, তবে স্পষ্টভাবে তিনি

الكلام وأهله» قال: «فأما ما سألت عنه من الصفات، وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها،

'আনিল কালামি ওয়া আহলিহী"(৫৭৯) গ্রন্থে বলেছেন: "অতঃপর তুমি সিফাত সম্পর্কে যা জানতে চেয়েছ, আর তার মধ্য হতে যা কুরআন-সুন্নাহ'য় এসেছে, সে ব্যাপারে কথা হচ্ছে- নিশ্চয় সালাফে সালেহীনের মত হচ্ছে- সেগুলো সাব্যস্ত করা এবং প্রকাশ্য অর্থের ওপর চালিয়ে দেয়া, কাইফিয়্যাত তথা ধরণ বর্ণনা ও সাদৃশ্যকরণ না করা।

যেসব তথ্য প্রদান করেছেন, অবশ্যই তার কাছে তাতে তার ইমামত ও দিয়ানত প্রমাণিত হবে। তার মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ৩৮৮ সালে। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মা'আলিমুস সুনান শারহু সুনানি আবী দাউদ, গারীবুল হাদীস, আল-উযলাহ, শারহু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, আল-গুনইয়াতু 'আনিল কালাম ইত্যাদি।

ইমাম খাত্তাবী আশ'আরী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তবে তিনি আল্লাহর জন্য কিছু সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি মা'আলিমুস সুনান, গারীবুল হাদীস, শারহু আসমায়িল্লাহিল হুসনা এ গ্রন্থগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আল্লাহর সিফাতের তা'ওয়ীল করেছেন। যেমন, সাক্ব, ক্বাদাম, রিজল, নুযূল (নিকটতম আসমানে নেমে আসা), দ্বাহক (হাঁসি), ফারহ (খুশি), আল্লাহর হাত, আঙুল, হাশরের মাঠে আগমন, উজব ইত্যাদির অপব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু তিনি কিছু গ্রন্থে সালাফদের মানহাজে ফিরে আসেন। যেমন, আল-গুনইয়াতু আনিল কালাম, শি'আরুদ্দীন, শা'নুদ দো'আ ইত্যাদি গ্রন্থে সালাফে সালেহীনের মত অনুসারে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন।

দেখুন, ইয়াকূত আল-হামাওয়ী, মু'জামুল উদাবা (৪/২৪৬); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (২/২১৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/২৩); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/১২৭); ফুয়াদ সিযকীন, তারীখ আত-তুরাস (১/৩২৭); আরও দেখুন, খাত্তাবী, আ'লামুল হাদীস (১/৬৩৯-৬৪০), (২/১৩৬৭), (৩/১৮৯৯, ১৯৯২, ২২৩৮)। আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৬৩৯-৬৪০); শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান, শারহু কিতাবুত তাওহীদ লিল বুখারী (১/৩১৮-৩২৪)।

৫৭৯. এ গ্রন্থটি হারিয়ে যাওয়া কিতাবের তালিকায়। বর্তমানে সরাসরি বইটি পাওয়া যায় না। তবে এ বইটি ইমাম খাত্তাবীর রচিত বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন, যেমন:

১- ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/২৬)।
২- ইমাম যাহাবী, আল-ইবার (৩/৪১)।
৩- ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/১০১৯)।
৪- তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৩/২৮৩)।
৫- সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত (৭/২০৮)।
৬- ইবন কাযী শুহবাহ, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ (১/১৫৭)।
৭- 'উমার রেদা কাহহালাহ, মু'জামুল মুওয়াল্লেফীন (৪/৭৪)।
আবার অনেকেই পরবর্তী এসব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, যেমন:
৮- আল-আসফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/৩১১-৩১৭)।
৯- কাযী আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৬৪)।
১০- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী, আল-আসনা ফী শারহি আসমায়িল্লাহিল হুসনা (২/১২৩)। এখানে তিনি শি'আরুদ্দীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি এনেছেন।
১১- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৭/২৭৮-৩১৬)।
১২- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, নাকদুত তা'সীস (১/২৫১, ২৫৪)।
১৩- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৩৭৮)।
১৪- যাহাবী, আল-'আরশ, পৃ. ২৭২।
১৫- যাহাবী, আল-উলু (২/১২৯৪), নং ৫১৬।
১৬- ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (৫/১০৩)।
১৭- ইমাম সুয়ূত্বী, সাওনুল মানত্বিকি ওয়াল কালাম, পৃ. ৯১-১০১ প্রমুখ।

وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في

আরেক সম্প্রদায় সেগুলোকে নাকচ করেছে, ফলে আল্লাহ যা সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে তারা বাতিল করেছে।(৫৮০)

অপর সম্প্রদায় সেগুলোকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে বেশি তাহকীকের নাম দিয়ে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে এক প্রকার সাদৃশ্য প্রদান ও স্বরূপ নির্ধারণের দিকে নিয়ে গেছে।(৫৮১)

অথচ মধ্যমপন্থা হলো দুটি(৫৮২) চিন্তার মাঝামাঝি থেকে সোজা পথে চলা। আল্লাহর দীন হচ্ছে- বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি করার মাঝামাঝিতে।

এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে- সিফাতের ব্যাপারে কথা বলাটা তার সত্তা সম্পর্কে কথা বলা থেকে নির্গত শাখা।(৫৮৩)

---

৫৮০. তারাই হচ্ছে মু'আত্তিলা গোষ্ঠী। জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিদিয়্যা সম্প্রদায়। অনুরূপ যারাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে তারা সবাই এদের দলে।
তন্মধ্যে যারা জাহমিয়্যাহ তারা সকল নাম ও গুণ অস্বীকার করেছে। আল্লাহ কোনো কিছু করেন সেটাও তারা অস্বীকার করেছে।
আর মু'তাযিলা, তারা আল্লাহর নামসমূহ সাব্যস্ত করেছে, এ হিসেবে যে সবগুলো দ্বারা এক সত্তাকে বুঝায়, নামের অর্থ সাব্যস্ত করেনি। আর তারা সকল সিফাত অস্বীকার করেছে।
বর্তমানে সকল শিয়া সম্প্রদায়, ইবাদ্বী খারেজী সম্প্রদায়ের সবাই মু'তাযিলাদের আকীদাহ পোষণ করে থাকে।
আর আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়্যা, তারা আল্লাহ তা'আলার ৭ বা ৮টি গুণ সাব্যস্ত করার পর বাকীগুলোকে অস্বীকার করেছে বা অর্থহীন করেছে কিংবা অপব্যাখ্যা করেছে।
দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৫৯); আত-তাবসীর ফিদ দীন, পৃ. ৬৩-৬৪, ৩৭; বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ৯০, ১০৯।

৫৮১. এরা হচ্ছে, সাদৃশ্যদানকারী, উদাহরণ প্রদানকারী। তারা অনেকগুলো সম্প্রদায়, তবে বেশিরভাগই প্রাক্তন শিয়াদের গোষ্ঠী। তাদের মধ্যে হিশামিয়্যা, জাওয়ালিকিয়্যাহ, দাউদ আল-জাওয়ারীবী, ইবরাহীম আল-আসলামী।
দেখুন, বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২১৪-২১৬; আত-তাবসীর ফী মা'আলিমিদ্দীন, পৃ. ৭১, ৭৬; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/১১৮-১২৩); ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/২৬১)।

৫৮২. তা'ত্বীল (নিষ্ক্রীয়করণ) ও তামসীল (সাদৃশ্যস্থাপন) এ দু'য়ের মাঝামাঝিতে। আর তা হচ্ছে সাদৃশ্য স্থাপন ব্যতীত সাব্যস্ত করণ, নিষ্ক্রীয়করণ ব্যতীত পবিত্রকরণ।

৫৮৩. এটি হচ্ছে একটি সাধারণ নীতি বা জেনারেল ম্যাক্সিম। তা সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়, 'আল কাওলু ফিস সিফাতি কাল-কাওলি ফিয যাতি' বা আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে যে বক্তব্য হবে গুণের ব্যাপারেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ কথারই ব্যাখ্যা করে ইতোপূর্বে বলেছিলেন, "যেমনিভাবে আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর তা'আলার সত্তা বাস্তবিকভাবেই প্রমাণিত সত্য, আল্লাহ তা'আলার কর্মকাণ্ড রয়েছে বাস্তবিকভাবেই, তেমনিভাবে তাঁর রয়েছে গুণাবলি তা বাস্তব অর্থেই।"..
এ নীতি অনুযায়ী বলা হবে, আল্লাহর জন্য গুণাবলি সাব্যস্ত হবে এমনভাবে যে, তা সৃষ্টিকুলের গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমনিভাবে তাঁর জন্য সত্তা সাব্যস্ত করা হবে, তা কোনোভাবেই অপর কোনো সত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, অপর কোনো সত্তার মতও নয়। কারণ কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়, তাঁর সত্তার সাথে সাদৃশ্য দিয়েও নয়, কর্মের সাথে মিল করেও নয়, আর নয় তাঁর গুণাবলির সাথে

الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.

فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح،

সুতরাং সিফাতের ক্ষেত্রে যাতের পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং যখন এটা জানা গেল যে, আল্লাহকে সাব্যস্ত করা অর্থই তাঁর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করণ; কাইফিয়্যাত বা ধরণ সাব্যস্তকরণ নয়। সুতরাং একইভাবে তাঁর সিফাত সাব্যস্তকরণ মানেও শুধু অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণ, সীমা ও ধরণ নির্ধারণ নয়।

কাজেই যখন আমরা বলব: হাত, কান, চোখ ইত্যাদি, তখন তার অর্থ হবে এগুলো কেবল আল্লাহর গুণ যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আমরা এটা বলব না যে, হাত অর্থ ক্ষমতা বা নি'আমত[৫৮৪], চোখ-কান এর অর্থ জানা।[৫৮৫] এটাও বলব না যে,

---

এক রকম করে।
সুতরাং যদি কেউ বলে, তিনি কীভাবে 'আরশের উপর উঠলেন? অথবা বললো, তিনি কীভাবে নিকটতম আসমানে নেমে আসলেন? অথবা বললো, তাঁর হাত কী রকম?... ইত্যাদি, তখন তার জবাবে বলা হবে, তিনি কেমন? তখন যদি বলে, আমি তার ধরণ জানি না, উত্তরে বলা হবে, আমরাও তদ্রূপ এ গুণগুলোর ধরণ জানি না। এভাবেই সকল বিষয়ে বলা হবে।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ মূলনীতিকে তার আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। অনুরূপ ইতোপূর্বে খতীব আল-বাগদাদী যারা সিফাত অস্বীকার করে তাদের জবাবে এ মূলনীতিটি ব্যবহার করেছেন। দেখুন, যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১৮৫।

৫৮৪. এ অপব্যাখ্যা বা বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে থাকে আশা'য়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায়। যেমনটি আমরা দেখি তা তাদের গ্রন্থসমূহে। যেমন, আবু বকর আল-বাকিল্লানী, তামহীদুল আওয়ায়েল ও তালখীসুদ দালায়েল, পৃ. ২৯৬; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১২৭, ১৬২-১৬৩); আল-বাগদাদী, উসূলুদদীন, পৃ. ১১০-১১২; জুওয়াইনী, আল-ইরশাদ, পৃ. ১৫৫; আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৫২২।
তাছাড়া ইমাম আবু উসমান আস-সাবূনী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর বাণী, ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص : ٧٥] "যা আমার দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি।" [সূরা স্বদ: ৭৫] এখানে দু'হাতকে দু'টি ক্ষমতা বা দু'টি নি'আমত বলার মূল হচ্ছে মু'তাযিলা জাহমিয়্যাদের বিকৃতি। তারাই এ কথা প্রথম বলেছে। দেখুন, আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস, পৃ. ১৬১-১৬২।
অথচ এখানে হক্বপন্থীদের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা দু'টি হাত গুণে গুণান্বিত। যে দু'টি হাত তাঁর সত্তাগত গুণ, যা তাঁর জন্য উপযোগী। তিনি নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, হাশরের দিন যমীনকে হাতের মুষ্টিতে রাখবেন আর আসমানকে ভাঁজ করে রাখবেন তাঁর ডান হাতে। বস্তুত এর পক্ষে বহু দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে।
দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৬৮, ৩৬৩), (৩/১৩৩); ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/১১৮-১৭০); ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক্ব (২/১৫৩-১৭৪); আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৩২০-৩২৩।

৫৮৫. এ অপব্যাখ্যা বা বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে থাকে মু'তাযিলারা ও তাদের পদাঙ্ক অনুসারীরা যেমন ইবন হাযম। দেখুন, কাযী আব্দুল জাব্বার, শারহুল উসূলিল খামসাহ, পৃ. ১৬৮; ইবন হাযম, আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল (৩/৩১৪)। আরও দেখুন, আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ১৭৫; বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ৯৬-৯৭; শাহরাস্তানী, নিহায়াতুল ইক্বদাম, পৃ. ৩৪১; আল-গাযালী, আল-ইকতেসাদ ফিল 'ই'তিক্বাদ, পৃ. ৯৮।
এর বিপরীতে আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত আল্লাহর জন্য শোনা ও দেখা গুণদ্বয় সাব্যস্ত করেন। আরও বলেন, এ দুটি গুণ হচ্ছে আল্লাহর সত্তাগত গুণ, যা যথাযথভাবে অন্যান্য গুণের মতোই সাব্যস্ত করতে হবে। বলতে হবে, এগুলো সাব্যস্ত হবে যেভাবে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما

এগুলো অঙ্গ।(৫৮৬) আবার এগুলোকে অঙ্গ ও কাজের মাধ্যম(৫৮৭) বলে পরিচিত এমন

কোনোভাবেই তা সৃষ্টির শোনা ও দেখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। এভাবেই আমরা এগুলোকে সৃষ্টির সাথে উদাহরণ প্রদান ব্যতীতই সাব্যস্ত করি, আর এগুলোর অর্থকে সৃষ্টির কারও সাথে সাদৃশ্যতা থেকে পবিত্রকরণের নামে নিষ্ক্রীয়করণ না করে সাব্যস্ত করি।

কুরআন ও সুন্নাহ'য় এর ওপর বহু প্রমাণ রয়েছে। দেখুন, ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/১০৬-১১৭); মাজমু' ফাতাওয়া (৩/১৩৩-১৩৪)।

৫৮৬. যারা অঙ্গ বলে তারা অধিকাংশই এরপর তা অস্বীকার করার জন্যই তা ব্যবহার করে থাকে। প্রথমে এগুলোকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য (তামসীল) দেয় তারপর তা তা'ত্বীল বা নিষ্ক্রীয়করণ করে। প্রথমেই অস্বীকার করে না। এ পদ্ধতি অবলম্বনকারী সম্প্রদায় হচ্ছে আশায়েরা ও মাতুরিদিয়্যাদের একটি গ্রুপ।

৫৮৭. এটি হচ্ছে 'আলফাযে মুজমালাহ' বা সংক্ষিপ্ত শব্দসমূহের একটি যার মাধ্যমে সিফাত অস্বীকারকারীরা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার অপপ্রয়াস চালায়। তারা এর মাধ্যমে অকাট্য প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যে আসা আল্লাহর সত্তাগত কিছু গুণকে অস্বীকার করে। বস্তুত আল্লাহর গুণাবলিকে কখনও 'জারেহাহ' বা অঙ্গ বলা যাবে না। কারণ অঙ্গ বলতে বুঝায় যা অর্জন করা হয় বা যা দ্বারা উপকৃত হয়।

অনুরূপভাবে কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহর সত্তাগত গুণগুলোকে 'আদওয়াত' বা যন্ত্র নাম দিয়ে কেউ কেউ অস্বীকার করে থাকে। এগুলোকে 'আদওয়াত' বা যন্ত্র নাম দেয়া কোনোভাবেই জায়েয নেই। কারণ 'আদওয়াত' বা যন্ত্র বলতে বুঝায় এমন কিছু সামগ্রী যা দিয়ে ভালো স্বার্থ সংরক্ষণ কিংবা হীন স্বার্থ দূরীকরণ করা সম্ভব হয়। এ হিসাবে আদওয়াত বলা কখনও জায়েয হবে না। দেখুন, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/৩৩৩-৩৩৫)।

ইমাম ইবন আবিল ইয্য রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উপরোক্ত অর্থগুলো আল্লাহর জন্য নয় সেটা নিশ্চিত করে বলতে হবে। আর সে জন্য সেগুলো আল্লাহর গুণাবলি হিসেবে আসেনি। শর'য়ী শব্দসমূহ অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধ; বিনষ্ট ধারণার উদ্রেক করার সম্ভাবনামুক্ত।

কিন্তু তাই বলে অঙ্গ হয়ে যায় বা যন্ত্র হয়ে যায় এমন দোহাই দিয়ে শর'য়ী যেসব শব্দ কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর ব্যবহার পরিত্যাগ করা যাবে না। কুরআন ও হাদীসে সেগুলোর হা বাচক ব্যবহার বা না বাচক ব্যবহার কোনোটিকেই বাদ দেয়া যাবে না। যেটা যেভাবে ব্যবহার হয়ে এসেছে সেটাকে সেভাবে ব্যবহার করা ফরয। কারণ সেটা না করা হলে ফাসিদ অর্থ সাব্যস্ত করা হবে, নতুবা বিশুদ্ধ অর্থ অস্বীকার করা হবে। বস্তুত এ সকল মুজমাল তথা 'ব্যাখ্যাসাপেক্ষ সংক্ষিপ্ত শব্দ' হকের অর্থও দেয় আবার বাতিলের অর্থও প্রদান করে। [শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/৩৩৫)]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এসব মুজমাল শব্দ যেমন ফা'য়েল (কর্তা), মুকতাসিব (অর্জনকারী) ইত্যাদি তিন প্রকার হতে পারে:

১- এমন প্রকার যা কেবল আল্লার জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন, বারী, বাদী', মুবদি'।

২- এমন প্রকার যা কেবল বান্দার জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন, কাসেব (অর্জনকারী), মুকতাসিব (অর্জনকারী)।

৩- যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন, সানে' (তৈরিকারী), ফা'য়েল (কর্মসম্পাদনকারী), আমেল (কর্মী)। দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, শিফাউল 'আলীল (২/৭৯৪), অধ্যায় ১৭।

মোটকথা, আল্লাহর জন্য মুজমাল শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। তবে এগুলোর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি অর্থ বিশুদ্ধ হয় তখন বলতে হবে যে শর'য়ী শব্দ দিয়ে তা ব্যক্ত করুন। আর যদি অর্থ বিশুদ্ধ না হয়, তখন বলা হবে আপনার শব্দ ও অর্থ উভয়টিই পরিত্যাজ্য। যেমন আল্লাহর হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল, গোছা ইত্যাদিকে যদি কেউ 'জারেহা' বা 'অঙ্গ' বলে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনি অঙ্গ কেন বলছেন?

যদি বলে যে, আমি এগুলো দ্বারা আল্লাহর এমন গুণ আছে বুঝাচ্ছি যা তাঁর জন্য উপযুক্ত, তখন তাকে বলা হবে, আপনার অর্থ ঠিক আছে এখন শব্দটিকেও ঠিক করে নিন। আল্লাহ যা ব্যবহার করেছেন তাই আপনি ব্যবহার করুন, আল্লাহ তাঁর গুণাবলিকে 'জারেহা' বা হাত বলেননি, আপনিও

وجب إثبات الصفات لأن التوقف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء»، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات».اهـ. هذا كله كلام الخطابي.
وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك.

হাত, শ্রবণ করা ও দেখার সাথে তুলনা করবো না। বরং বলব: আবশ্যক হচ্ছে সেগুলো সাব্যস্ত করা; কেননা এগুলো কুরআন ও সুন্নাহ'র নসে (স্পষ্ট ভাষ্যে) বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলোকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা ত্যাগ করাও আবশ্যক এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলার ন্যায় কিছুই নেই। সিফাতের হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য এ ভিত্তিতেই চলেছে। এসব হচ্ছে খাত্তাবীর বক্তব্য।[৫৮৮]

একই ধরনের বক্তব্য আরও দিয়েছেন আবু বকর আল-খতীব[৫৮৯] তাঁর এক ছোট্ট

বলবেন না। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেননি আপনি তা বলতে পারেন না। আর যদি বলে যে, আমি এগুলো দ্বারা সেটাই বুঝি যা সাধারণত সৃষ্টিকুলের মধ্যে থাকে, যেমন মানুষের হাত তার কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, সে উপকার অর্জন করার জন্য হাতের মুখাপেক্ষী, সেরকম অঙ্গই আমি আল্লাহর জন্য বুঝেছি, তখন তাকে বলা হবে, আপনার এ অর্থ ও বুঝ সম্পূর্ণরূপে শির্কী বুঝ। তাই তা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে এ রকম অর্থেও ব্যবহার করবেন না, এ রকম নামও প্রদান করবেন না।

৫৮৮. খাত্তাবী থেকে এ বর্ণনাটি আরও যারা আনয়ন করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১২৯৪), নং ৫১৬। অনুরূপ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৯৬)।

৫৮৯. তিনি হচ্ছেন আবু বকর আহমাদ ইবন আলী ইবন সাবেত ইবন আহমাদ ইবন মাহদী আল-বাগদাদী, যিনি খত্বীব বাগদাদী নামে বেশি বিখ্যাত। হাদীস শোনার কাজটি তিনি ছোটকাল থেকেই শুরু করেন, চতুর্দিকে তার নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে, তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ছোট-বড় প্রায় আশিটির মতো গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীস জমা করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাসহীহ করেছেন, দোষ-ত্রুটি তুলে ধরেছেন, বর্ণনাকারীদের জারহ করেছেন, তারীখ লিখেছেন ও প্রকাশ করেছেন। এভাবে যুগের শ্রেষ্ঠ হাফেযে পরিণত হয়েছিলেন। ইবন মাকুলা বলেন, আবু বকর সর্বশেষ বিশেষ লোক, যাকে আমরা দেখেছি, জানার দিক থেকে, হিফযের দিক থেকে, দৃঢ়তার দিক থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের স্বত্ব করার দিক থেকে, অনুরূপ হাদীসের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা ও সনদ এর দিক থেকে বৈচিত্রময় হওয়ার দিক থেকে, আবুল হাসান আদ-দারাকুত্বনীর পরে তার মতো বাগদাদীদের মধ্যে আর কেউ ছিল না।

ইমাম যাহাবী তার গুণ বর্ণনায় বলেন, 'একক ইমাম, আল্লামা, মুফতি, হাফেয, তথ্য বিচারক, সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, হাদীসের খোঁজ ও তালাশে নিয়োজিত ছিলেন, বিভিন্ন প্রদেশে গমন করেন, যে বিষয়ে লিখেছেন সে বিষয়ে যথার্থ কাজটি তুলে ধরেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন ও সংকলন করেছেন। তার গ্রন্থাবলি নিয়ে বাহনের বাহকরা সারা দুনিয়া সফর করেছেন, হাদীসের যাবতীয় বিষয়ে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন।'

যাহাবী আরও বলেন, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় দারাকুত্বনী। এ বিষয় জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে বাগদাদে তার পরে আর কেউ ছিল না। [যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১৩৩৬)]

তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ৩৯২ সালে, আর মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ৪৬৩ সালে।

তার ছাপা গ্রন্থসমূহের অন্যতম হচ্ছে, তারীখে বাগদাদ, শারাফু আসহাবিল হাদীস, আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, তাক্বয়ীদুল ইলম, আর-রিহলাতু ফী ত্বালাবিল হাদীস ইত্যাদি।

সিফাতের ক্ষেত্রে তিনি সালাফে সালেহীনের মতাদর্শে ছিলেন। যেমনটি তিনি নিজে স্পষ্ট করে বলেছেন আর ইমামগণও তার থেকে তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, 'খত্বীব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সিফাত সংক্রান্ত হাদীসমূহ যেভাবে এসেছে সেভাবে পরিচালনা করা হবে, কোনো প্রকার তা'ওয়ীল এর আশ্রয় নেয়া যাবে না।'

দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (১/৯২); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায

পুস্তিকায়[৫৯০], যেখানে তিনি জানিয়েছেন যে, সালাফে সালেহীন এ আকীদাহ'র ওপরই ছিলেন।[৫৯১]

(২/১১৩৫); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/২৭০); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/৩১১); ড. মাহমূদ আত-ত্বাহহান, আল-হাফেয আল-খত্বীব আল বাগদাদী ও আসারুহু ফী উলূমিল হাদীস, আরও দেখুন, ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লেমী, আত-তানকীল (১/১২৬-১২৭)।

৫৯০. এ পুস্তিকাটি সম্পর্কে যারা তথ্য দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- ইবন কুদামা, যাম্মুল তা'ওয়ীল, পৃ. ১৫।
২- আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ তার 'মুখতাসারুল 'উলু পৃ. ৪৭-৪৯' এবং বলেছেন যে তা এখনো ছাপা হয়নি। তিনি আরও বলেছেন, এ পুস্তিকাটির নাম হচ্ছে, রিসালাতুন ফিস সিফাত, আরও বলেছেন দারুল কুতুব আয-যাহেরিয়্যাহতে নং (মাজমূ' ১৬/৪৩-৪৪) এখানে সেটার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।
৩- ইমাম যাহাবী তার আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম গ্রন্থে সেটাকে নিয়ে এসেছেন (২/১৩৩৫), নং ৫৩৪।
৪- অনুরূপ ইমাম যাহাবী সেটার কথা এনেছেন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে (১৮/২৮৩-২৮৪)।
৫- তদ্রূপ তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে (৩/১১৪২-১১৪৩)।
৬- আরও এসেছে, ইমাম যাহাবীর কিতাবুল 'আরশ গ্রন্থে (২/৪৫৬-৪৫৮)।
৭- বর্তমানে সেটি আলাদা গ্রন্থ হিসেবে 'জাওয়াবু আবু বকর আল-খত্বীব আলা আসয়িলাতি বা'দ্বি আহলি দিমাশকা ফিস সিফাত, (সংক্ষেপিত) পৃ. ৭৩-৭৫, এ নামে ছাপা হয়েছে যা আবু বকর আল-ইসমা'ঈলীর ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাহ এর শেষে সংযুক্তি হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে। তাহকীক, জামাল 'আযযূন, তাকদীম; শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারী; দারুর রাইয়ান।

৫৯১. সে পুস্তিকাটি যা ইমাম যাহাবী তার সনদে আবু বকর আল-খত্বীব থেকে বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে, যাহাবী বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবু আলী ইবনুল খাল্লাল, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন জা'ফর, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুত ত্বাহের আল-হাফেয, তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবন মারযূক আয-যা'ফরানী, তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আল-হাফেয আবু বকর আল-খত্বীব, তিনি বলেন,

"গুণাবলির ব্যাপারে কথা হচ্ছে- যেসব গুণ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেসব গুণের ক্ষেত্রে সালাফদের নীতি হচ্ছে- তা সাব্যস্ত করা ও বাহ্যিকতার ওপর প্রয়োগ করা এবং ধরণ ও সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করা। এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে- গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলা আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে কথা বলার একটি শাখা। তাই সিফাত বা গুণের ক্ষেত্রে জাত তথা সত্তা ও তার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করবো।

আর যখন এটা জানা বিষয় যে, জগৎসমূহের রবকে সাব্যস্ত করা মানে তার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা, তাঁর সীমা ও ধরণ সাব্যস্ত করা নয়। তাই তাঁর গুণাবলিকে সাব্যস্ত করা মানে তার অর্থকে সাব্যস্ত করা, সীমা ও ধরণ সাব্যস্ত করা নয়।

যখন আমরা বলি, হাত, শ্রবণ ও চোখ, তখন এর দ্বারা শুধুমাত্র সেসব গুণাবলি সাব্যস্ত করা হয়, যে গুণাবলি স্বয়ং আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা বলি না, হাত অর্থ কুদরাত বা ক্ষমতা। বলি না, শ্রবণ ও দর্শন অর্থ জ্ঞান। বলি না, এসব অঙ্গ এবং কাজের উপাদান।

আমরা বলি- শুধুমাত্র সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ'য় তা বর্ণিত হয়েছে। তাশবীহ বা সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করা ওয়াজিব; কারণ, আল্লাহ বলেন: "তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" আরও বলেন- "আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।" [ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/২৮৩-২৮৪)]

এছাড়া খত্বীব আল-বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফে'য়ীর প্রশংসায় যা বলেছেন তাতেও তার বিশুদ্ধ আকীদাহ প্রকাশ পায়। তিনি ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ'র প্রশংসা করে বলেন,

أبىَ الله إِلَّا رَفْعهُ وعُلُوَّهُ ... وليسَ لما يُعْلِيْهِ ذو العرشِ واضِعُ.

"আল্লাহ তা'আলা উঁচু মর্যাদা ও উচ্চাসন তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য হওয়াকে অস্বীকার করছেন। আর 'আরশের অধিপতি যাকে উপরে উঠাবেন তাকে কেউ নীচে নামাতে পারে না।" যাহাবী, সিয়ারু

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل: أبي بكر الإسماعيلي، والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخُ شيخِ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري

এ বক্তব্য যা খাত্তাবী উল্লেখ করেছেন আরও অনেক উলামায়ে কিরাম অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন, যেমন আবু বকর আল-ইসমা'ঈলী[৫৯২], ইমাম ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সাজযী[৫৯৩] (যিনি ছিলেন 'মানাযিলুস সায়েরীন' ও 'যাম্মুল কালাম' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক ইমাম

আ'লামিন নুবালা (১০/৭৫)

৫৯২. তিনি হচ্ছেন আবু বকর আহমাদ ইবন ইবরাহীম ইবন ইসমা'ঈল, আল-জুরজানী, আল-ইসমা'ঈলী, আশ-শাফে'য়ী। জুরজান বাসীর ইমাম। শাফে'য়ী মাযহাবের অনুসারী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা।
হাকেম বলেন, 'ইসমাঈলী ছিলেন তার যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের উস্তাদ। নেতৃত্ব, মনুষত্ব ও দানের দিক থেকে তাদের সবার চেয়ে সম্মানিত। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন আবু ইয়া'লা আল-মাওসেলী, ইবন খুযাইমাহ প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম হাকেম, ইমাম আবু বকর আল-বারকানী, হামযাহ আস-সাহমী প্রমুখ। দারাকুত্বনী বলেন, আমি কয়েকবার ইমাম আবু বকর আল-ইসমা'ঈলীর কাছে সফর করে যাওয়ার ইরাদা করেছিলাম কিন্তু তার যিয়ারত আমার নসীব হয়নি। যাহাবী বলেন, এ সফরের উদ্দেশ্য ইলম অর্জন, নতুবা তিনি আবুল হাসানের চেয়ে উপরে নন। তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ২৭৭ সালে, আর মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ৩৭১ সালে। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল-মুস্তাখরাজ 'আলা সহীহিল বুখারী, আর তিনি ছিলেন আকীদাতে পূর্ণ সালাফী, যেমনটি ইমাম যাহাবী তাঁর থেকে বর্ণনা করেন।
দেখুন, ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/৯৪৭); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৬/২৯২); তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (২/৭৯); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/৭২)।
শাইখুল ইসলাম এখানে যা বর্ণনা করেছেন তা আবু বকর আল-ইসমা'ঈলীর 'ই'তিকাদুস সুন্নাহ গ্রন্থে রয়েছে, যা মাকতাবাতুয যাহেরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে নং (মাজমূ' ১৬/৩৮-৪৪) যা শাইখ আলবানী তাঁর মুখতাসারুল 'উলু গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, পৃ. ২৪৮।
আর তা ইমাম যাহাবী তার 'আল-'উলু' গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন, পৃ. ১৭৬; অনুরূপভাবে তিনি আরও এনেছেন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে (১৬/২৯৫); তদ্রূপ আরও এসেছে, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/৯৪৯)।
বর্তমানে তা ই'তিক্বাদু আহলিস সুন্নাহ' নামে ছাপা হয়েছে। তার এক ছাপার তাহকীক করেছেন জামাল আযূন। তার সাথে আরও কয়েকটি পুস্তিকাসহ। আমাদের শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ যা বর্ণনা করেছেন তা দেখুন, উপরোক্ত গ্রন্থের ৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা। সেখানে আরও কিছু বিস্তারিত এসেছে।

৫৯৩. তিনি হচ্ছেন আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার ইবন ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী। যিনি হিরাতে বসবাস করেন। উত্তম ওয়ায়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার দেশের মানুষের কাছে তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাফসীরে খুব বিখ্যাত ছিলেন। তার সম্পর্কে তার ছাত্র আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী বলেন, ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আলেমের পোষাকে বাদশাহ ছিলেন। ইমাম যাহাবী বলেন, 'তিনি বিদ'আতী ও জাহমিয়্যাহদের উপর আগুন ছিলেন; তা এতই তীব্র ছিল যে, কখনও কখনও সালাফদের পন্থাও অতিক্রম করে যেতেন, তবে হিরাতে তার ছিল আশ্চর্যজনক মর্যাদা, তার অনুসারী ও সাহায্যকারী। তিনি হিজরী ৪২২ সালে হিরাতে মারা যান।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'ইস্তেওয়া' গুণ এর মাসআলায় সালাফদের মত পোষণ করতেন। আর তিনি সালাফদের ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন সৃষ্ট নয়, আল্লাহ তা'আলাকে আখেরাতে দেখা যাবে, আর তিনি জগতের উপরে। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (১/২৪৫-২৪৭), (২/১০, ১৮-১৯)।
তাছাড়া ইবন তাইমিয়্যাহ তার থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, ইস্তেওয়া হচ্ছে কর্মগত গুণ, যা রাব্বুল আলামীনের সত্তা দ্বারা কৃত একটি কর্ম, যেমনটি হাদীসের ইমামগণের বক্তব্য। দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৬৩৯-৪০)।
ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বর্ণনা করেন, তার দেশের বাদশার প্রতি লেখা তার একটি চিঠি রয়েছে, যাতে তিনি এটা সাব্যস্ত করেছেন যে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর 'আরশের উপরে। দেখুন, মাজমূ'

الهروي ومثل: أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم.

আবু ইসমা'ঈল আল-হারাওয়ীর উস্তাদ, তিনি পরিচয় প্রদান করার চেয়ে বেশি বিখ্যাত), শাইখুল ইসলাম আবু 'উসমান আস-সাবূনী[৫৯৪] ও মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলের ইমাম আবু 'উমার ইবন আবদুল বার আন-নামেরী প্রমুখ।

ফাতাওয়া (৫/১৮৯)।
তাছাড়া ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার থেকে আরও বর্ণনা করেন, তিনি বলেছিলেন, মু'তাযিলা জাহমিয়্যারা হচ্ছে পুরুষ আর আশ'আরী জাহমিয়্যারা হচ্ছে মহিলা। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৫৯)।
ইমাম ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার এর সাথে এক ঘটনা ঘটেছিল ইমাম ইবন হিব্বান এর। আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আল-ওয়ায়েযকে বলতে শুনেছি, তাকে ইবন হিব্বান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন, আমরা তাকে সিজিস্তান থেকে বের করে দিয়েছি, তার অনেক ইলম ছিল, কিন্তু তার দীনদারী বেশি ছিল না, (আকীদাতে পরিশুদ্ধি ছিল না)। সে আমাদের কাছে আসলো, অতঃপর আল্লাহর জন্য হদ্দ বা সীমা সাব্যস্ত করা অস্বীকার করলো। ফলে আমরা তাকে বের করে দিলাম। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৬/৯৭-৯৮); মীযানুল ই'তিদাল (৩/৫০৭)।
বিস্তারিত দেখুন, আস-সাম'আনী, আল-আনসাব (৩/২২৩); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৪৮১); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/২২৬)।
ইমাম যাহাবী তার আল-উলু গ্রন্থে বেশ কিছু জিনিস বর্ণনা করেছেন যা শাইখুল ইসলাম এখানে ইঙ্গিত করেছেন।
যাহাবী বলেন, ইমাম আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী তার পুস্তিকায় বলেন, 'জাহমিয়্যারা যেমনটি বলে আমরা তেমনটি বলবো না যে, আল্লাহ প্রতিটি স্থানে প্রবেশ করেছেন, সবকিছুর সাথে মিশে আছেন, আমরা জানি না তিনি কোথায়? বরং আমরা বলি, তিনি সত্তাগতভাবে 'আরশের উপরে, আর তাঁর ইলম বা জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে; তাঁর জ্ঞান, তাঁর শোনা ও দেখা, ক্ষমতা সবকিছুকে অবশ্যই আয়ত্ত করে রাখে।... দেখুন, মুখতাসারুল 'উলু, পৃ. ২৬৩।

৫৯৪. তিনি হচ্ছেন আবু উসমান ইসমা'ঈল ইবন আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন ইসমা'ঈল আস-সাবূনী। শাইখুল ইসলাম, তিনি ছিলেন সুন্নাহ'র তরবারী। বিদ'আতীদের ওপর প্রবল। তাফসীর, হাদীস ও ওয়াজে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার প্রথম ওয়াজের মজলিস ছিল যখন তার পিতাকে হত্যা করা হয় তখন তার বয়স ছিল ৯ বছর। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন আবু সা'ঈদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব, আবু বকর ইবন মিহরান প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন কাত্তানী, বাইহাকী প্রমুখ। বাইহাকী তার কথা উঠলে বলতেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হক্ব ইমামুল মুসলিমীন, সত্য সঠিক শাইখুল ইসলাম, আবু উসমান আস-সাবূনী।'
তার সম্পর্কে আবু আব্দুল্লাহ আল-মালেকী বলেন, 'আবু উসমান এমন ব্যক্তি যার জন্য নির্দিষ্ট বড় বড় আলেমগণ তার হিফয ও তাফসীর জ্ঞানের ব্যুৎপত্তিতার সাক্ষ্য প্রদান করেন।'
যাহাবী বলেন, তিনি আছারী ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুন্নাহ ও সালাফদের আকীদায় তার একটি গ্রন্থ রয়েছে যা যেকোনো ইনসাফকারী দেখবে সে সেটার গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি দিবে। হিজরী ৪৪৯ সালে তার মৃত্যু হয়। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে যার দিকে ইমাম যাহাবী ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছে, আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস।
দেখুন, ইবন মানযূর, তাহযীবে তারীখে দিমাশক (৩/৩০); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৪০); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/২৮২)।
আর শাইখুল ইসলাম এখানে যে ভাষ্যটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা উক্ত কিতাবের ১৪-১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

[قول أبي نعيم الأصبهاني]:

وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» في عقيدة له في أولها: «طريقتنا طريق المتبعين

[ইমাম আবু নু'আইম আল-আসবাহানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি]

হিলইয়া[৫৯৫] গ্রন্থের লেখক আবু নু'আইম আল-ইস্পাহানি[৫৯৬] তার এক আকীদাহ গ্রন্থের

---

৫৯৫. গ্রন্থটির পুরো নাম হচ্ছে হিলইয়াতুল আউলিয়া ও ত্বাবাক্বাতুল আসফিয়া। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর নেককার দুনিয়াবিমুখ লোকদের জীবনী বর্ণনায় এটি উত্তম একটি গ্রন্থ। আরও বলেন, এতে যে সব বর্ণনা ও উদ্ধৃতি আনয়ন করা হয়েছে তা কুশাইরীর রিসালাহ, কুশাইরীর উস্তাদ আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, ইবনু খামীসের মানাকিবুল আবরার ইত্যাদি থেকে উত্তম। কারণ তাদের চেয়ে আবু নু'আইম হাদীস বেশি জানতেন, তার কাছে হাদীসের সম্ভার বেশি ছিল, বর্ণনার প্রামাণ্যতা ও বর্ণনা উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তিনি বেশি সচেতন। তারপর ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, ইমাম আহমাদের কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারকের কিতাবুয যুহদ, আবু নু'আইমের হিলইয়ার চেয়ে বেশি শুদ্ধ। আরও বলেন, এসব কিতাবে অবশ্যই কিছু দুর্বল হাদীস বরং কিছু দুর্বল ঘটনা বা বানোয়াট ঘটনা রয়েছে। তন্মধ্যে হিলইয়াতে তা অকাট্যভাবে আছে। তবে এ জাতীয় অন্য কিতাবে তা থেকে আরও বেশি রয়েছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৮/৭১-৭২)।

একাধিক সূত্রে এসেছে যে, আবু নু'আইম যখন হিলইয়া কিতাব রচনা করেছেন তখন সেটি নাইসাপুরে বহন করে নেয়া হয়েছিল আর তখনই তা চারশত দীনারে বিক্রি হয়েছিল। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৪৫৯); তাযকিরাতুল হুফফায (৩/১০৯৪); তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৪/২১)।

তাজউদ্দীন সুবুকী বলেন, হিলইয়া সুন্দর কিতাবের অন্তর্ভুক্ত; শাইখ ইমাম পিতা (ত্বকী উদ্দীন সুবুকী) এ কিতাবটির প্রচুর প্রশংসা করতেন এবং তা শুনতে পছন্দ করতেন। দেখুন, তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৪/২২)।

৫৯৬. তিনি হচ্ছেন আবু নু'আইম আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন ইসহাক্ব ইবন মূসা ইবন মিহরান আল-মিহরানী আল-আসফাহানী। পরহেযগারী ও ইলমের দিক থেকে বড় ইমামদের একজন। প্রচুর বর্ণনা করেছেন, অনেক দেশ সফর করেছেন। তার উস্তাদদের নিয়ে একটি মু'জাম (নাম কোষগ্রন্থ) লিখেছেন। আরও বেশ কিছু কিতাব লিখেছেন, তন্মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে, আল-মুস্তাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম, দালায়েলুন নাবুওয়াহ, তারীখে আসফাহান ইত্যাদি। খত্বীব বাগদাদী তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। খত্বীব বলতেন, আমি 'হিফয' এর গুণ দু'জন ব্যতীত অপর কারো জন্য ব্যবহৃত হতে দেখি না। আবু নু'আইম ও আবু হাযেম আল-আব্দুওয়ী। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, হাফেযরা দরজায় গিয়ে দাঁড়াতো তার ইলম, হিফয ও উঁচু সনদের কারণে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তার বেশ কিছু গ্রন্থের বর্ণনা দেয়ার পর তার সম্পর্কে বলেন, হাদীসের বড় হাফেযদের অন্তর্ভুক্ত, গ্রন্থ রচনার দিক থেকেও তাদের মাঝে বেশি রচনাকারী। যাদের লেখা থেকে লোকেরা বেশি উপকৃত হয়েছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাকে নির্ভরযোগ্য বলার চেয়ে তিনি বেশি সম্মানিত; কারণ তার স্তর আরও উপরে। হিজরী ৪৩০ সালে তার মৃত্যু হয়। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিলইয়াতুল আওলিয়া, যিকরু আখবারু আসফাহান, আল-মুস্তাখরাজ আলাস সহীহাইন, সিফাতুল জান্নাহ।

ইমাম ইবন কাসীর ইমাম ইবনুল জাওযী থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আবু নু'আইম আকীদাতে আশ'আরী মতবাদের দিকে অনেক বেশি ঝুঁকতেন। ইবন আসাকির আবু নু'আইমকে আবুল হাসান আল-আশ'আরীর লোক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা যদি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ও ইমাম যাহাবী কর্তৃক বর্ণনা করা তার আকীদাহ'র দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি আল্লাহর অনেক গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন যা তারা অস্বীকার করেছিল। তাই এটা বলা যায় যে, সম্ভবত তিনি জীবনের প্রথম অংশে আশ'আরী মতবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন, পরে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন অথবা তার দ্বারা কোনো কোনো সিফাতের তা'ওয়ীল করা হয়েছে দেখে কোনো কোনো আলেম তাকে আশ'আরী বলে দিয়েছে। বস্তুত তিনি সরাসরি আশ'আরী মতবাদের লোক ছিলেন না। তবে প্রভাবিত ছিলেন বলা যেতে পারে। তাছাড়া আবু নু'আইম কিছুটা তাসাউফেও প্রবেশ করেছিলেন।

للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال: «فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوٍ

শুরুতে বলেছেন, আমাদের তরীকা কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা'র অনুসারীদের তরীকা। তিনি বলেন, 'তাদের আকীদাহ ছিল এই যে, 'আরশ ও ইসতিওয়া (উপরে উঠা) সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো তারা বলতেন ও তা সাব্যস্ত করতেন। কোনো ধরণ নির্ধারণ, তুলনা বা সাদৃশ্য প্রদান ব্যতিরেকে। আর আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক[৫৯৭] এবং সৃষ্টিকুলও তাঁর থেকে পৃথক। তাদের মধ্যে প্রবিষ্টও হন না, তাদের সাথে মিশ্রিতও হন না। তিনি তাঁর আসমানের উপরে 'আরশের উপরে, যমীনে ও সৃষ্টিতে নয়[৫৯৮]।[৫৯৯]

দেখুন, ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (১/১৯১); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৮/৭১); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/১০৯২); আল-উলু, পৃ. ২৪৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৪৫৩); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১২/৪৫); ইবন আসাকির, তাবঈনে কিযবিল মুফতারী, পৃ. ২৪৬; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৭৯; ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/২৪৫); ব্রকেলম্যান, তারীখুল আদাবিল আরাবী (৬/২২৪)।

ঈমাম আবু নু'আইম ও ইমাম ইবন মান্দাহ এর মাঝে কুরআনের শব্দ নিয়ে ঝগড়া ও তর্কাতর্কি হয়েছিল। তখন ইমাম আবু নু'আইম ইমাম ইবন মান্দাহ এর বিরুদ্ধে 'আর-রাদ্দু আলাল হুরুফিয়্যাহ আল-হুলুলিয়্যাহ' গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে তিনি যারা বলে কুরআন তিলাওয়াত করলে সেটা সৃষ্ট হয়, তাদের কথার দিকে মত পেশ করেন। তখন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবন মানদাহ ইমাম আবু নু'আইমকে খণ্ডন করে 'আর-রাদ্দু আলাল লাফযিয়্যাহ' গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি যারা বলে তিলাওয়াত করলে সেটা সৃষ্ট হয় না, তাদের দিকে মত প্রকাশ করলেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ উভয়ের ব্যাপারে বলেন, তারা প্রত্যেকে সালাফদের থেকে যা তাদের মতের ও উদ্দেশ্যের দিকে যায় সেসব বর্ণনা চয়ন করেছেন। তবে তারা সবকিছু নিয়ে আসেননি। উভয়ের কথার মধ্যে যা হক্ক তা সালাফদের কথায় পাওয়া যায়। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (১/২৬৮); মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/২০৯)।

৫৯৭. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে জিনিস 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' বা সর্বেশ্বরবাদীদের লেজ কেটে দেয় তা হচ্ছে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য সাব্যস্তকরণ, অনুরূপ যখন কেউ আল্লাহকে সৃষ্টি থেকে আলাদা সাব্যস্ত করে। যার দিকে আহ্বান করে দু'টি হাত উঠে যায়। ... অনুরূপভাবে এভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া ও সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক সত্তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে কালামশাস্ত্রবিদদের মতবাদে কুঠারাঘাত করা হয়, যাতে তারা বলে থাকে যে আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করা যাবে না, আর সে নীতিটারও মুলোৎপাটন হয় যাতে তারা বলে থাকে, তিনি জগতের ভিতরেও নন, বাইরেও নন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৫৯৫) (আল-ঈমান আল-আওসাত্ব)।

৫৯৮. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এখানে ইমাম আবু নু'আইম আল-আসফাহানী এর জমা করা বেশ কিছু আকীদা নিয়ে এসেছেন। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এখানে যা এনেছেন তার সাথে অন্য জায়গায় যা আবু নু'আইম থেকে এনেছেন তা জমা করলে দাঁড়ায়, "নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর বাণী, অনুরূপভাবে তাঁর সকল নাযিলকৃত কিতাব, তাঁর বাণী সৃষ্ট নয়। আর কুরআনে কারীম পঠিত, তিলাওয়াতকৃত, সংরক্ষিত, শ্রুত, লিপিবদ্ধ, উচ্চারণকৃত, যাই হোক সবদিক থেকেই তা আল্লাহর বাণী প্রকৃত অর্থেই, আল্লাহর বাণীর বর্ণনা নয় বা আল্লাহর বাণীর অনুবাদ নয়। আর তা আমাদের স্বর ও শব্দে আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়। যারা এ ব্যাপারে কথা না বলে চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করে এবং যারা লফয বা আমাদের উচ্চারণ নিয়ে উচ্চবাচ্য করে তারা জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে কেউ উপরোক্ত কোনো একটি দিক দিয়ে আল্লাহর বাণীকে সৃষ্ট বলবে সে আলেমদের নিকট জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত। আর জাহমী আকীদার অনুসারী আলেমগণের নিকট কাফির।" দেখুন, [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৬৩-৬৪)]

৫৯৯. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্রও এ উদ্ধৃতি আনয়ন করেছেন। তাছাড়া অন্য ইমামরাও

على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه».

[وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب «محجة الواثقين ومدرجة الوامقين» تأليفه: «وأجمعوا أن الله فوق سماواته، عالٍ على عرشه مستوٍ عليه، لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافًا لما نزل في كتابه:

আবু নু'আইম তাঁর 'মাহাজ্জাতুল ওয়াসেক্বীন ও মাদরাজাতুল ওয়ামেক্বীন' গ্রন্থে[৬০০] বলেন, "তারা সকলেই একমত যে, আল্লাহ্ আসমানের উপর, 'আরশের উপরে আছেন, 'আরশের উপর সমুন্নত। আধিপত্য বিস্তারকারী নয়[৬০১]; যেমনটি জাহমিয়্যাহরা বলে থাকে, [তারা আরও বলে থাকে যে] তিনি সর্বত্র বিরাজমান।[৬০২] এটা কুরআনের বিপরীত। কেননা

এনেছেন, যেমন:

১- মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৯০-১৯১)।

২- দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৫২)।

৩- ইবনুল কাইয়েম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৭৯।

৪- যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, পৃ. ১৭৬। মুখতাসারুল উলু, পৃ. ২৬১।

৬০০. এ গ্রন্থের নাম 'মাহাজ্জাতুল ওয়াসেক্বীন ওয়া মাদরাজাতুল ওয়ামেক্বীন'। এটিকে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু নু'আইমের গ্রন্থসমূহের একটি বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৮/৭১)। আর এখানে যা এসেছে, দেখা গেছে সাফারীনীও অনুরূপ বর্ণনা নিয়ে এসেছেন তার লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ গ্রন্থে (২/১৯৬), আবু নু'আইম থেকে। তবে যারা আবু নু'আইমের জীবনী লিখেছেন তারা কেউ এমন কোনো গ্রন্থের কথা আবু নু'আইমের বলে উল্লেখ করেননি। তাই হতে পারে তা পূর্বে ছিল, যা শাইখুল ইসলামের হাতে পড়েছে, পরে তা হারিয়ে গেছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

৬০১. দেখুন, জাহমিয়্যাদের অনুসারী মু'তাযিলাদের গ্রন্থে সেটার প্রমাণ। কাযী আব্দুল জাব্বার আল-হামাদানী আল-মু'তাযেলী, শারহুল উসূলিল খামসাহ, পৃ. ২২৬-২২৭; বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ১১২-১১৪; ফখরুদ্দীন রাযী, তাফসীর মাফাতীহুল গাইব (৬/২-৬); বাগাওয়ী, আত-তাফসীর (২/২৩৭-২৩৮); মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/১৪৪)।

'ইস্তাওয়া' অর্থ যারা 'ইস্তাওলা' বা অধিকার করার অর্থ করে, শাইখুল ইসলাম তাদের সেসব সন্দেহের অপনোদন করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৪৪-১৪৯, ২২৬); দারউত তা'আরুদ্ব (১/২৭৮-২৭৯)। অনুরূপ এসব সন্দেহের অপনোদন করেছেন ইতোপূর্বে ইমাম ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩১-১৩২); তদ্রূপ ইমাম মার'ঈ ইবন ইউসুফ আল-হাম্বলী, পৃ. ১২৩-১২৬।

আর ইমাম ইবনুল কাইয়েম তিনি ৪২ প্রকারে সেটাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন, এভাবে আল্লাহ তাদের বানানো ঘরের ভীতকে ধ্বংস করে দিলেন, ফলে তাদের উপর থেকে ঘর তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দেখুন, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/১২৬-১৫২)।

৬০২. জাহমিয়্যাদের মধ্যকার যারা মুনাযারা করে তারা আল্লাহর উপরে থাকা, উর্ধ্বে অবস্থান ও 'আরশের উপর উঠাকে অস্বীকার করে, তাই তারা 'আরশের উপর উঠাকে দখল করা বা করায়ত্ব করা বা অধিকার করার অর্থে অপব্যাখ্যা করে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যকার যারা ইবাদতকারী তারা বলে আল্লাহ সর্বত্র।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া যারা অস্বীকার করে এমন জাহমিয়্যারা দু'ভাবে বিভক্ত:

• একদল বলে, আল্লাহ্ সর্বত্র, এরা হচ্ছে তাদের মধ্যকার সূফী, ইবাদতগুজার ও সাধারণ লোক।

• আরেকদল পুরোপুরি 'না সূচক' এর বক্তব্য দেয়, তারা পরস্পর বিরোধী দু'টি গুণই আল্লাহ থেকে অস্বীকার করে। যেমন বলবে, তিনি জগতের ভেতরেও নয়, জগতের বাইরেও নয়। এটি তাদের মধ্যকার যারা মুনাযারা করে, যারা কালামশাস্ত্র নিয়ে থাকে, গবেষণা ও কিয়াস করে, তাদের ভাষ্য।

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [الملك:١٦]، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وتعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة،

কুরআনে এসেছে:

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦﴾ [الملك: ١٦]

"তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশের উপর যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে।" [সূরা আল-মুলক: ১৬]

তিনি আরও বলেন:

﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠]

"তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায়, আর নেক আমলকে তিনি উঠিয়ে নেন।" [সূরা ফাতির: ১০]

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥﴾ [طه: ٥]

"রহমান আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

তাঁর রয়েছে 'আরশ, যার উপর তিনি উঠেছেন। আর কুরসী, যাতে আসমান-যমীন জায়গা হয়। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

"আসমানসমূহ ও যমীন তাঁর 'কুরসী'তে জায়গা হয়।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫]

আর তার কুরসীটি জিসম[৬০৩], সাত যমীন ও সাত আসমান কুরসীর নিকটে এমন, যেমন শূন্য ভূমিতে একটি আংটি।[৬০৪] তবে কুরসী তাঁর

এরাই জাহমিয়্যাদের দার্শনিক। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৭২-২৭৩)।

৬০৩. অর্থাৎ কুরসী সৃষ্ট বস্তু। এটা আল্লাহর কোনো সিফাত নয়।

৬০৪. এ বর্ণনাটি ইবন আব্বাস ও আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে এসেছে, যার বর্ণনা আগে চলে গেছে। যেখানে আমরা 'কুরসী আল্লাহর পা রাখার স্থান' এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে শুধু সে বর্ণনাটির কথা নিয়ে আসব যাতে কুরসীতে প্রকাণ্ডতা প্রমাণিত হয়। আবু যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন কুরসী সম্পর্কে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, সকল আসমান ও যমীন সাতটি সবই কুরসীর নিকট যেমন একটি গোলাকার আংটি যা বিস্তীর্ণ যমীনে ফেলে রাখা হয়েছে। আর 'আরশের বাড়তি কুরসীর উপর যেমন উক্ত গোল রিং এর উপর বিস্তীর্ণ ভূমির বাড়তি অবস্থা।

হাদীসটি যারা যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন,

১- ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ, পৃ. ৭৭।

২- ইবন জারীর, আত-তাফসীর (৩/১০)।
৩- আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৫৭৮)।
৪- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৪৮-১৪৯)।
৫- ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (১/৪৫৮)।
৬- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪১১) এবং তা থেকে চুপ থেকেছেন।
৭- সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (২/১৭)। তিনি সেটাকে ইবন মারদওইয়াহ এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।
৮- শাইখ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, নং ১০৯।

অনুরূপ মুজাহিদ ইবন জাবার রাহিমাহুল্লাহ থেকে মাওকূফ সনদে এসেছে, তিনি বলেন, আসমান ও যমীন সবই একটি রিং এর মতো যা বিস্তীর্ণ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আর তা কুরসীর ততটুকু জায়গাই দখল করেছে যা বিস্তীর্ণ ভূমিতে সে রিংটি দখল করেছে।
এটি যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন,
১- ইবন আবী শাইবাহ, পৃ. ৭৮।
২- আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/২৪৭)।
৩- আবুশ শাইখ, আল-'আযামাহ (২/৫৮৫)।
৪- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৪৯)।
৫- আস-সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (২/১৮)। আর তিনি সেটাকে সা'ঈদ ইবন মানসূর ও 'আবদ ইবন হুমাইদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।
৬- দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল বিশর আল-মিররীসী, পৃ. ৭৪।
৭- যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ৯৪।
৮- ইবন হাজার, আল-ফাতহ (১৩/৪১১) এবং বলেছেন সা'ঈদ ইবন মানসূর এটাকে সহীহ সনদে নিয়ে এসেছেন।

৬০৫. ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার দিকে সম্পৃক্ত করা হয় যে, তিনি কুরসী অর্থ 'ইলম' বলেছেন। যেমনটি ইবন জারীর আত-ত্বাবারী তার তাফসীরে (৫/৪০১) জা'ফার ইবন আবিল মুগীরাহ আল-খুযা'ঈ আল-কুম্মীর সূত্রে সা'ঈদ ইবন জুবাইর থেকে, ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, কুরসী অর্থ ইলম। আর এটিই ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু শাইখ আবুল আশবাল আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের তাফসীরে তাবারীর তাহকীকের সময় এখানে ইমাম ইবন জারীর কথার সমালোচনা করেছেন, যা দেখে নেয়া অত্যন্ত জরুরী।
বস্তুত ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার দিকে এ কথার সম্পৃক্ততা বিশুদ্ধ নয়। কারণ এর সনদ দুর্বল। কারণ জা'ফর ইবন আবিল মুগীরাহ একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী। তাকে বলা হয়, 'সাদূকুন ইয়াহেমু'। [ইবন হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ১৪১] অনুরূপভাবে সে সা'ঈদ ইবন জুবাইর এর বিষয়েও দুর্বল। ইমাম ইবন মান্দাহ বলেন, জা'ফর এর বর্ণনার সাথে কেউ একমত হয়নি। আর সে সা'ঈদ ইবন জুবাইর এর ব্যাপারে শক্তিশালী নয়। [আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২১] আরও দেখুন, ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (১/৩১৩০।
তাছাড়া সে তার চেয়ে আরও গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী প্রামাণ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করেছে। যেমনটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ নং ৫৮৬, ৫৯০, ১০২০, ১০২১; ইবন মান্দাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ২১; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৯৬), নং ৭৫৮। সবাই মুসলিম ইবনুল বাত্বীন এর সূত্রে, তিনি সা'ঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি বলেন, "কুরসী হচ্ছে দু' পা রাখার স্থান, আর 'আরশ- তার পরিমাণ তো কেউ পরিমাপ করার ক্ষমতা রাখে না।"
ইমাম আবুল মানসূর আল-আযহারী কুরসীর উপরোক্ত তাফসীর 'দু পা রাখার স্থান' সেটা বর্ণনা করার পর বলেন, এ বর্ণনাটি এমন যার বিশুদ্ধতার ওপর আলেমগণ একমত হয়েছেন। আর যে বর্ণনায় ইবন আব্বাস থেকে এসেছে যে, কুরসী হচ্ছে ইলম, তা হাদীসশাস্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাব্যস্ত করে না। [আযহারী, তাহযীবুল লুগাহ (১০/৩৩)] অনুরূপভাবে ইমাম ইবন কুতাইবাও কুরসীর তাফসীর ইলম দিয়ে করাকে বাতিল করেছেন। [ইবন কুতাইবাহ, আল-ইখতিলাফ ফিল লাফযি, পৃ.

بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم،

থাকে।(৬০৬) বরং সৃষ্টির মাঝে ফয়সালার জন্য কিয়ামতের দিন তাঁর কুরসী রাখা হবে; যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।(৬০৭)

২৪০]
অনুরূপভাবে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরসীকে 'ইলম' দ্বারা তাফসীর করা আরবী ভাষাতে কোনোভাবেই জানা যায় না। মহান আল্লাহ সবকিছুকে তাঁর ইলমে ঘিরে আছেন; সুতরাং তার ইলম কেবল আসমান ও যমীনের সাথে সম্পৃক্ত করার কোনো মানে হয় না। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৮/৩৬৩)।
অন্যত্র তিনি বলেন, "তাদের কারও কারও থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর ইলম। এটি দুর্বল কথা। কারণ আল্লাহর জ্ঞান আসমান ও যমীনের বাইরে সবকিছুকে ঘিরে ব্যপ্ত হয়ে আছে। যেমন আল্লাহ বলেন "হে আমাদের রব আপনি সবকিছুকে জ্ঞান ও রহমতে ঘিরে রেখেছেন"। [সূরা গাফির: ০৭] আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকেও জানেন, তিনি জানেন যা হয়েছে এবং যা হয়নি। তাই যদি বলা হয়, তাঁর জ্ঞান আসমান ও যমীনকে ব্যাপ্ত করে আছে তাহলে এ অর্থটি উপযোগী হয় না। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলা এর পরে বলেন, "আর এ দু'টির সংরক্ষণ তাঁর জন্য কষ্টকর হয় না"। [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫] অর্থাৎ তা করতে তাঁর সামান্যও বেগ পেতে হয় না, ভারী হয় না। এ কথাটি ক্ষমতার সাথে বেশি উপযোগী, ইলমের সাথে নয়। তাছাড়া অপরাপর আছারগুলোও এটার উপর প্রমাণবহ।" [মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫৮৪)]

৬০৬. জাহমিয়্যারা তা বলে থাকে। প্রমাণ হচ্ছে, যামাখশারী, আল-কাশশাফ (১/৫৮৫)। অনুরূপ তাদের থেকে তা বর্ণনা করেছেন ইমাম কুরতুবী (৩/২৭৬-২৭৮); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৩৭১); মার'ঈ ইবন ইউসুফ আল-হাম্বলী, আক্বাওয়িলুস সিক্বাত, পৃ. ১১৬।

৬০৭. জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমুদ্রের মুহাজিরগণ (হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে তিনি বললেন, "তোমার হাবশায় যেসব অনিষ্টজনক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছ তা কি আমার নিকট ব্যক্ত করবে না?" তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! একবার আমরা বসা ছিলাম, আমাদের সম্মুখ দিয়ে সেখানকার এক বৃদ্ধা নারী মাথায় পানি ভর্তি কলসসহ যাচ্ছিল। সে তাদের এক যুবককে অতিক্রমকালে উক্ত যুবক তার কাঁধে তার এক হাত রেখে তাকে ধাক্কা দিলে সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ফলে তার কলসটি ভেঙ্গে যায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকের দিকে তাকিলে বলল, হে দাগাবাজ! তুমি অচিরেই জানতে পারবে যখন আল্লাহ তা'আলা কুরসী স্থাপন করবেন, পূর্বাপর সকল মানুষকে সমবেত করবেন এবং হাত-পাগুলো তাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিবে -তখন তুমিও জানতে পারবে সেদিন তোমার ও আমার অবস্থা কী হবে। জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এই বৃদ্ধা সত্য কথাই বলেছে, সত্য কথাই বলেছে। আল্লাহ তা'আলা সেই উম্মতকে কীভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হয় না।"
হাদীসটি যারা যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন,
১- ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪০১০।
২- ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৫০৫৮।
৩- ইবন আবিদ দুনইয়া, আল-আহওয়াল, হাদীস নং ২৪২।
৪- যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ৬৮। হাদীসটির সনদ হাসান।
তাছাড়া হাদীসটি অপর বর্ণনায় বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও এসেছে, সে বর্ণনাটি হচ্ছে, বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সেখানে আশ্চর্যের কী বিষয় দেখলে?" তিনি বললেন, আমি দেখলাম একজন (বৃদ্ধা) মহিলা তার মাথায় খাদ্য ভর্তি পাত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক অশ্বরোহী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, ফলে ধাক্কা লেগে তার (মহিলার) খাদ্য মাথা থেকে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। মহিলা বসে বসে তার খাদ্য কুড়াচ্ছিল, আর সে (অশ্বরোহীর দিকে) তাকিয়ে বলল, তোমার ধ্বংস হোক! যেদিন মালিক (আল্লাহ) তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর কুরসী স্থাপন করবেন এবং যালিমের যুলুমের প্রতিশোধ নিবেন, সেদিন তোমার কী

وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفًّا صفًّا كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢]، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين، ويعذب من يشاء؛ كما قال تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ [آل عمران:١٢٩]» اهـ.

[قول معمر بن أحمد الأصبهاني]:

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني. شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده.

আর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের মাঝে বিচার ফয়সালা করার জন্য আগমন করবেন, আর ফিরিশতারাও আসবে কাতারে কাতারে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝﴾ [الفجر: ٢٢] "আর আপনার রব আসবেন এবং ফিরিশতাগণও আসবেন কাতারে কাতারে।" [সূরা আল-ফজর: ২২]

আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়তি বলেছেন(৬০৮) যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে বিচার-ফয়সালার পর তাওহীদপন্থী গোনাহগারদের মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; যেমনটি আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]

"অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৪]

[মা'মার ইবন আহমাদ আল-আসফাহানী এর বক্তব্য]

ইমাম, আরেফ, হিজরী চতুর্থ শতাব্দী সময়কালের সূফীকুলের শিক্ষক(৬০৯) মা'মার ইবন

অবস্থা হবে? মহিলার কথা সত্যায়ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে জাতি কখনো পবিত্র হতে পারে না অথবা তিনি বলেছেন, কীভাবে সে জাতিকে গুনাহ থেকে পবিত্র করা হবে —যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোর-জবরদস্তি ছাড়া সবলদের থেকে তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না।"

এটি যারা বর্ণনা করেছেন তারা হচ্ছেন,

১- আল-বাযযার, কাশফুল আসতার, হাদীস নং ১৫৯৬।

২- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস-সিফাত, হাদীস নং ৮৬০।

৩- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৫৭)। হাদীসটির সনদ হাসান।

তাছাড়া ইমাম ইবন খুযাইমাহ অনুরূপ বর্ণনা আসমা বিনতে উমাইস থেকেও নিয়ে এসেছেন। [১/২৪৬] এ সকলের সনদ হাসান। দেখুন, [আলবানী, আল-উলূ, ১০৬-১০৭]

৬০৮. এ বাড়তি একক কোনো হাদীসে আসেনি। তবে বহু হাদীসে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ঈমানদারদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার ছাড়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। আবার ঈমানদারদের কারও কারও জন্য শাস্তির ব্যবস্থার কথাও হাদীসে এসেছে।

৬০৯. সূফী পরিভাষাটি সম্পর্কে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এটি একটি 'মুজমাল' বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্য সংক্ষিপ্ত শব্দ, যাতে হক্ব ও বাতিল উভয় অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তিনি বলেন, "সূফিয়্যা" শব্দটি মুজমাল শব্দে পরিণত হয়েছে। তাতে আল্লাহর সত্যবাদী বন্ধু 'সিদ্দিক' যেমন প্রবেশ করে তেমনি তাতে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপকারী শত্রু 'যিন্দীক'ও প্রবেশ করে। [আর-রাদ্দু আলাশ শাযেলী, পৃ. ৭১]

قال: «أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله

আহমাদ আল-আসফাহানী[৬১০] বলেন, "আমি পছন্দ করেছি আমার সাথীদেরকে সুন্নাতের অসিয়্যাত করতে, হিকমতের উপদেশের অসিয়্যাত প্রদান করতে, আর যার ওপর একমত ছিলেন সকল হাদীস ও সুন্নাহ'র অনুসারী এবং আগের ও পরের মারেফাত ও তাসাওউফের অনুসারীগণ।

তিনি তাতে বলেন: আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন কোনো স্বরূপ নির্ধারণ, সাদৃশ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া। 'ইসতিওয়া' তো জ্ঞাত[৬১১] কিন্তু তার পদ্ধতি অজ্ঞাত।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'সূফী' শব্দটি একটি যুগ্ম অর্থবোধক মুশতারাক শব্দে পরিণত হয়েছে। [আস-সাফাদিয়্যাহ (১/২৭০)]

তিনি ছাড়া অন্যরাও বলেছেন, 'তাসাওউফ' শব্দটি মুজমাল শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন দেখুন, ইমাম শাত্বেবী, আল-ই'তিসাম (১/২৬৫), অনুরূপ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে শাইখ, ফাতাওয়াশ শাইখ (১১/১১৭-১১৮)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সূফী' শব্দটি প্রথম তিন সোনালী যুগে প্রসিদ্ধ ছিল না। উৎকৃষ্ট সে তিন যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর এ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক হতে শুরু করে। বড় বড় আলেম, ইমাম ও শাইখদের মধ্যে যাদের কথায় বা আলোচনায় শব্দটি এসেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আবু সুলাইমান আদ-দারানী প্রমুখ। তাছাড়া সুফিয়ান সাওরী কর্তৃক তা ব্যবহার করা হয়েছে বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। আবার কারও কারও নিকট হাসান বসরীও তা ব্যবহার করেছেন।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'সূফী' শব্দটি 'সুওফ' বা পশম এর কাপড় ব্যবহার করা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ অধিকাংশ দুনিয়াবিমুখরা এ পোষাকটি বেশি পরিধান করতেন। আর এটাই বিশুদ্ধ। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/১৯৫)। আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৩৬৯), (১১/৬, ১৯৫)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, যারা তাসাওউফ ও হাকীকত নিয়ে কথা বলে সেসব লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত:

(১) তাদের একগোষ্ঠী কুরআন ও সুন্নাহ'র অনুসারী ছিলেন। যেমন ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব, জুনাইদ প্রমুখ।

(২) তাদের একগোষ্ঠী কুল্লাবিয়্যাহ, আশ'আরিয়্যাহ, মাতুরিদিয়াহ কালামশাস্ত্রবিদদের মতের ওপর ছিলেন, যেমন আবুল কাসেম আল-কুশাইরী ও তার মতো লোকেরা।

(৩) তাদের আরেক গোষ্ঠী যুহদ ও তাকওয়ার নীতি পরিত্যাগ করে দার্শনিকদের মতের দিকে চলে গিয়েছিল। যেমন, যারা ইখওয়ানুস সাফার মানহাজ, আবু হাইয়্যান আত-তাওহীদীর মানহাজ অনুসরণ করেছে। [আর-রাদ্দু আলাশ শাযেলী, পৃ. ৩৯-৪০]

ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বর্ণনা করেন যে, এসব সূফীবাদী সংসারবিমুখ লোকেরা বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকে। শাম দেশে তাদেরকে বলা হয় জুও'ইয়্যাহ বা ভুখাগোষ্ঠী, বসরায় তাদের বলা হয় ফাকরিয়্যাহ বা ফিকরিয়্যাহ, খোরাসানে তাদের বলা হয়, মাগারিবাহ। আবার তাদেরকে সূফিয়্যাহ ও ফুকারা হিসেবেও ডাকা হয়। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৩৬৮)।

৬১০. তিনি হচ্ছেন আবু মানসূর মা'মার ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ আল-আসফাহানী। তার যুগে আসফাহানের সূফীদের শিক্ষক। হিজরী ৪১৮ সালে তার মৃত্যু হয়। তাসাওউফের ওপর তার লেখা একটি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানী, আবুশ শাইখ, ইবনুল মুকরি' প্রমুখ থেকে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন আবু ত্বালেব আল-কুন্দুলানী, আল-ক্বাসেম ইবনুল ফাদ্বল আস-সাকাফী, আবু মুতী' প্রমুখ।

দেখুন, যাহাবী, আল-'ইবার (৩/১৩১); তারীখুল ইসলাম (৯/৩০২); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/২১১); ফুয়াদ সিযকীন, তারীখুত তুরাস (৪/১৮৭-১৮৮)।

৬১১. অর্থাৎ তার অর্থ জানা সবার কাছেই। কারণ এ শব্দটি ভাষার দিক থেকে কোনো অপরিচিত শব্দ

استوى على عرشه بلا كيف، ولا تشبيه، ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة، ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه، الواحد الغني عن الخلق. وأن الله عز وجل سميع، بصير، عليم، خبير، يتكلم، ويرضى، ويسخط، ويضحك، ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكًا،

আর আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক, সৃষ্টিকুলও তাঁর থেকে পৃথক; সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নয়, তাদের সাথে মিশ্রিত নয়, সংযুক্ত নয়, মিলিতও নয়(৬১২); কেননা তিনি সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন একক সত্তা। সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী একক সত্তা।(৬১৩) আর আল্লাহ তা'আলা, তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত, কথা বলেন, সন্তুষ্ট হন, অসন্তুষ্ট হন, হাসেন(৬১৪), আশ্চর্য বা অভিভূত হন(৬১৫), কিয়ামতের দিন বান্দার সামনে হাসি দিয়ে

নয়। তাই সকলে সব জায়গাতেই এর অর্থ জেনে এসেছে। আর সে অর্থ হচ্ছে, উপরে উঠা, ঊর্ধ্বে উঠা, আরোহন করা ও উপরে অবস্থান করা।

৬১২. তিনটি শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার আলাদা সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতগুলো প্রায় সমার্থবোধক শব্দ দ্বারা জাহমিয়্যাহ ও তাদের মতাদর্শের লোকদের ঘৃণ্য আকীদাহ খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাধারণ নীতি হচ্ছে বাড়তি কথা না বলা। কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে, আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন। তার বেশি কিছু বলা হয়নি। তাই এসব বাড়তি শব্দ না বলাই উত্তম ছিল। বরং বলার দরকার ছিল, যেমনটি তাঁর সত্তার মর্যাদা ও শানের সাথে উপযুক্ত। দেখুন, ফাতাওয়া মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলুশ শাইখ (১/২১০)। আরও দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৮/৩৫-৪৫)।

৬১৩. তিনি যদি সৃষ্টির ভিতরে থাকেন তো তাঁর নিজের অস্তিত্বের জন্য তাকে সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হতে হয়। তাই সেটাকে বিশদভাবে বুঝানো হয়েছে। কেউ হয়ত বলতে পারে যে, তাহলে 'আরশের উপরে থাকলে তা 'আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী বুঝা যায়। তার এ সন্দেহের উত্তর ইমাম আবু হানীফা তার আল-ফিকহুল আকবর গ্রন্থে দিয়েছেন যে, "আরশ তাকে বহন করতে পারে না, 'আরশসহ সবকিছু কেবল তিনিই রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।" বস্তুত আল্লাহ যদি আমাদের না জানাতেন তিনি আরশের উপর তাহলে আমরা তা বলতাম না। আর আল্লাহর 'আরশের উপর হওয়া কোনো দু'টি সত্তার উপর-নিচে হওয়ার মতো কিয়াস করা যাবে না। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট।

৬১৪. আল্লাহ তা'আলা হাসেন এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস এসেছে। যেমন,

১- বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৮০৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮২। হাশরের দিন এক ব্যক্তির প্রতি যে জাহান্নাম থেকে বের হবে।

২- বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৮২৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৯০। এমন দু ব্যক্তির ব্যাপারে যারা দু'জন একে অপরকে হত্যা করবে কিন্তু জান্নাতে যাবে।

৩- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৯১; যখন আল্লাহ তা'আলা হাশরের মাঠে ঈমানদারদের কাছে আসবেন ও পরীক্ষা নিবেন।

৪- ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৮১; আবু দাউদ আত-ত্বায়ালিসী, হাদীস নং ১১৮৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ ১৬১৮৭। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি নিরাশ হয়ে যাচ্ছে অথচ তার অবস্থার পরিবর্তন আসন্ন।

৫- আহমাদ, আবু ইয়া'লা ও ত্বাবারানী, যেমনটি এসেছে, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (২/২৫৫)। রাতের বেলা যে সালাতের জন্য গোপনে উঠবে।

৬- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২২৪৭৬। উত্তম শহীদের বর্ণনায়।

৭- ত্বাবারানী, আদ-দো'আ, হাদীস নং ৭৮১। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা, ইন্নি যালামতু নাফসী ফাগফির লী, ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা' বলার ফযীলত।

৬১৫. আশ্চর্য হওয়া সাধারণত দু'টি কারণে হয়ে থাকে:

১- আশ্চর্যান্বিত যিনি হচ্ছেন তার কাছে ঘটনার কোনো কারণ গোপন ছিল পরবর্তীতে তা প্রকাশ

وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر»، ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه، ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا» .

উদ্ভাসিত হবেন।[৬১৬] তিনি প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, তিনি যেমন ইচ্ছা করেন সেভাবে, আর তখন বলেন, কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি যে, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব? কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি যে, আমি তাকে ক্ষমা করব? কোনো তাওবাকারী আছে কি যে, আমি তার তাওবা কবুল করব? এরূপ চলে ফজর পর্যন্ত।[৬১৭] আর রবের এই অবতরণ হওয়া কোনো ধরন নির্ধারণ ছাড়া, সাদৃশ্য প্রদান ছাড়া, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া। কাজেই যে অবতীর্ণ হওয়া অস্বীকার করে অথবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সে বিদ'আতী, পথভ্রষ্ট। এ মতের ওপর আছেন সকল শ্রেষ্ঠ আল্লাহর আরেফ তথা জ্ঞানীগণ।"[৬১৮]

হওয়ার কারণে আশ্চর্য হওয়া। এ অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য আশ্চর্য হওয়া সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ সবকিছু জানেন, কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই।

২- অথবা কোনো কিছু তার অনুরূপ কিছুর নীতির বিপরীত হওয়ার কারণে সেটার প্রতি সম্মান জানানোর জন্য আশ্চর্য হওয়া। যদিও তিনি ভালো করেই তা জানেন যা নিয়ে তিনি আশ্চর্যন্বিত হচ্ছেন। অনেকটা অভিভূত হওয়ার মতো। এ অর্থেই মূলত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য আশ্চর্যন্বিত হওয়া বা অভিভূত হওয়া হাদীসে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১২৩)।

আর আল্লার আশ্চর্য হওয়া সংক্রান্ত হাদীস ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৬১৬. হাদীসটি যারা বর্ণনা করেছেন,

১- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ, নং ১৫৩।
২- দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, নং ১৩৯, ১৮০।
৩- আহমাদ, আল-মুসনাদ (৩২/৪২৩), নং ১৯৬৫৪।
৪- আব্দ ইবন হুমাইদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৫৪০।
৫- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ২৮০।
৬- ইয়া'কুব ইবন সুফইয়ান আল-ফাসাওয়ী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ (১/২৭০)।
৭- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ, পৃ. ২৭৭।
৮- দারাকুতনী, আস-সিফাত, ৩৪।
৯- দারাকুতনী, আর-রু'ইয়াহ, নং ৪২, ৫৩।
১০- ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৭/৯৪), হাদীস নং ৬৮।
১১- তাম্মাম আর-রাযী, ফাওয়ায়িদ, নং ৫২৮।
১২- যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, মুখতাসার, নং ২৬২।

৬১৭. ইতোপূর্বে এ হাদীসটির তাখরীজ চলে গেছে।

৬১৮. এ বর্ণনাটির জন্য দেখুন,

১- আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাতু ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/২৩১-২৩৩)।
২- যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১৩০৮), নং ৫২২। মখতাসারুল উলু, পৃ. ২৬২।
৩- ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৯১)।
৪- ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৫৬-২৫৭)।
৫- ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইস্তিকামাহ (১/১৬৮-১৬৯)।
৬- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৭৬।
৭- ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৮৯)।

[قول الفضيل بن عياض]:

[وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب «السنة» حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث. يعني العبادي. حدثنا الليث بن يحيى، قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر. وهو صاحب الفضيل. قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، فقال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [سورة

[ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব এর বক্তব্য]

আশ-শাইখ, আল-ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হারূন আল-খাল্লাল তার কিতাবুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন, আমাদেরকে আবু বকর আল-আসরম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইবরাহীম ইবনুল হারেস অর্থাৎ আল-'আব্বাদী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে লাইস ইবন ইয়াহইয়া বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম ইবনুল আস'আসকে বলতে শুনেছি, আবু বকর আল-আসরম বলেন, তিনি (ইবরাহীম ইবনুল আস'আস) ফুদ্বাইল এর ছাত্র, তিনি বলেন, আমি ফুদ্বাইলকে[৬১৯] বলতে শুনেছি, আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের এই 'ওয়াহম' ধারণা[৬২০] করা ঠিক নয় যে, তিনি কেমন? কেননা আল্লাহ নিজের গুণের বর্ণনা নিজে দিয়েছেন এবং সেটাকে পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ① ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ③ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ④﴾ [الاخلاص: ١، ٤]

"বলুন, 'তিনি আল্লাহ্, এক, আল্লাহ্ হচ্ছেন 'সামাদ' (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী); তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" [সূরা আল-ইখলাস: ১-৪] কাজেই তিনি নিজের যে বর্ণনা দিয়েছেন

---

৬১৯. ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্বের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অনেক উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। অনেক গ্রন্থে তিনি ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্বের প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, তিনি হচ্ছেন মুসলিমদের মাঝে যুহদ ও ইবাদতে বিখ্যাত শাইখগণের অন্যতম। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২১/১১৭-১১৮)।
অনুরূপ যখন তিনি সীমালঙ্ঘনকারী সূফীদের নিকট বেলায়েত ও নবুওয়াত নিয়ে যে সমস্যা তার আলোচনা করেছেন তখন তিনি বলেন, বস্তুত তাসাওউফের বিখ্যাত শাইখগণ কখনও এমন কথা বলেননি, বরং তারা এসব কথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারপর তিনি বলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৫/৪)।
অন্যত্র তার প্রশংসা করে বলেন, তিনি হচ্ছেন ইবাদতকারী, হজকারী, হাদীসের ক্ষেত্রে প্রচুর দখল সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৪২)।
আরও বলেছেন, আকীদাহ সংক্রান্ত বিষয়ে তার কথা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি বিশুদ্ধ ও হক্বের পথে। দেখুন, আল-ইস্তিক্বামাহ (১/১৫৮)।

৬২০. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, ওয়াহম বা ধারণা দু' প্রকার:
১- এমন ধরণ ধারণা করে নেয়া যা কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রকাশ্য ভাষ্য সমর্থন করে না।
২- এমন অর্থ ধারণা করা যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রকাশ্য রূপ দাবি করে না।
দেখুন, মাদারিজুস সালেকীন (২/৮৭)।

الإخلاص: ١-٤] فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه.

وكل هذا: النزول، والضحك، وهذه المباهاة، وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع. فليس لنا أن نتوهَّم كيف وكيف.

তার থেকে পরিপূর্ণ বর্ণনা/সিফাত আর থাকতে পারে না।[৬২১]

আর এ সবই: অবতরণ করা, হাসা, গর্ব-অহংকার করা[৬২২], বিশেষভাবে তাকানো[৬২৩] যেভাবে তিনি যেমন ইচ্ছা করেন সেভাবে অবতর করেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে গর্ব করেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে হাসেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাকান। আমাদের এই 'ওয়াহ্‌ম' বা ধারণা[৬২৪] করা ঠিক নয় যে, কীভাবে?

---

৬২১. বস্তুত সূরা ইখলাস একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাধর্মী সূরা। কেননা আমরা তাতে কয়েকটি জিনিস দেখতে পাই:

১- রবুবিয়াতে তওহীদের আলোচনা।
২- নাম ও গুণের তাওহীদের আলোচনা।
৩- আল্লাহর সত্তার পূর্ণ পরিচয়।
৪- আল্লাহর নামের বর্ণনা।
৫- আল্লাহর গুণের হাঁ-বাচক ও না-বাচক পূর্ণ বর্ণনা।
৬- আল্লাহর ব্যাপারে নাস্তিক ও কাফিরদের সন্দেহের পূর্ণ জবাব। অনুরূপ মুসলিমদের কারও মনে আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ আসলে তাকেও এ সূরাটি তিলাওয়াত করতে বলা হয়েছে।
৭- ইয়াহূদী ও নাসারাদের সন্দেহের জবাব।
৮- অন্যান্য মুশরিক জাতি, যারা আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে কাউকে কাউকে দাঁড় করায় তাদের জবাব।
৯- মুসলিমদের অনেকেই যে শির্কে লিপ্ত তা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া, তার জবাব এখানে রয়েছে।
১০- মুসলিমদের মধ্যে যারা শির্কে লিপ্ত হয় তারা সাধারণত একক ক্ষমতাধর আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে সুপারিশকারী নির্ধারণ করে থাকে, এখানে প্রথম আয়াতের শেষে 'আহাদ' আর শেষ আয়াতের শেষে 'আহাদ' শব্দ নিয়ে এসে তারও মুলোৎপাটন ঘটানো হয়েছে।
১১- আর এজন্যই এ সূরা হচ্ছে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

৬২২. যেমনটি এসেছে সহীহ মুসলিমে, হাদীস নং ১৩৪৮; আর তা হচ্ছে যা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আরাফার দিনের চেয়ে এমন কোনো দিন নেই যাতে আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন, আর সেদিন তিনি তাদের নিকটবর্তী হন, তারপর তিনি আরাফাবাসীদের নিয়ে ফিরিশতাদের সাথে গর্ব-অহংকার করে বলেন: "এরা কী চায়?"

৬২৩. যেমনটি এসেছে সহীহ বুখারীতে, হাদীস নং ৩০০৭, ৩০৮১, ৩৯৮৩, ৬২৫৯, ৬৯৩৯, অনুরূপ সহীহ মুসলিমে, হাদীস নং ২৪৯৪; তাতে হাত্বেব ইবন আবী বুলতা'আহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর ঘটনায় এসেছে যে, 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ছাড় দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব, অর্থাৎ হাত্বেব এর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর তোমাকে কিসে জানাবে যে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা বদরবাসীদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছে করে যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।'

৬২৪. 'ওয়াহ্‌ম' হচ্ছে নিছক কল্পনা করে কোনো কিছুর ধারণা অন্তরে স্থাপন করা যে তা এই গুণের বা ঐ গুণের। এভাবে মানুষ এমন কিছুর নিছক কল্পনা করে গুণের ধরণ হিসেবে ধারণা করে বসে, যার অস্তিত্ব অন্তরের বাইরে বাস্তবে নেই। এভাবে নিছক কল্পনা করে ধারণা করা দ্বারা মানুষ কখনও কখনও আল্লাহর গুণাবলিকে বান্দার গুণাবলির সাথে সমতুল্য করে সাব্যস্ত করে অথবা মহান রাব্বুল আলামীনের গুণাবলিকে বিকৃত কিংবা অর্থহীন করে দেয়। তাই বুঝা গেল যে, এ জাতীয় 'ওয়াহ্‌ম'

فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء».

ونقل هذا عن الفضيل جماعة، منهم البخاري في «خلق أفعال العباد».

ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه «الفاروق» فقال: حدثني يحيي بن عمار، ثنا أبي ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا حَرَمِيّ بن علي البخاري، وهانئ بن النضر عن الفضيل.

অতএব, যখন কোনো জাহমী বলে: আমি ঐ রবকে স্বীকার করি না, যে স্বীয় স্থান থেকে সরে যায়।[৬২৫] তখন তাকে বল: আমি ঐ রবকে স্বীকার করি যিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।[৬২৬]

একথাটি ইমাম বুখারী স্বীয় 'খালক্বু আফ'আলিল 'ইবাদ' গ্রন্থে এনেছেন।[৬২৭] তেমনি শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারাওয়ী তার 'আল-ফারূক' গ্রন্থে স্বীয় সনদে সংকলন করেছেন। আর তা হচ্ছে, আমাকে বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার, তিনি বলেন, আমাকে বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাকে জানিয়েছেন ইউসুফ ইবন ইয়া'কূব, তিনি বলেন, আমাকে জানিয়েছেন হারমী ইবন আলী আল-বুখারী ও হানি' ইবনুন নাদ্বর, তারা দু'জন ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব থেকে।

এর পরিণতি হয় তামসীল (সাদৃশ্য স্থাপন) অথবা তা'ত্বীল (নিষ্ক্রীয়করণ)। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩১৩); ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (২/৮৭); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/৮৪)।

৬২৫. সাধারণত যারা আল্লাহর 'সিফাতে ইখতিয়ারিয়্যাহ' বা আল্লাহর পছন্দকৃত কর্মগত গুণ অস্বীকার করে, তারা এসব কথা বলে থাকে। তারা আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, হাশরের দিন বিচারের মাঠে আসা ইত্যাদি গুণগুলোকে আল্লাহর স্থানচ্যুতি বলে সেগুলোকে অস্বীকার করে থাকে। অথচ তারা নিজেরা আল্লাহর জন্য স্থান স্বীকার করে না, তারপর আবার আল্লাহর কর্মকাণ্ডকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের মত করে স্থানচ্যুতি কথা বলে। সন্দেহ নেই যে, এটিই প্রকৃত পথভ্রষ্টতা। এখানে আরও একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য। তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, হাশরের মাঠে আগমন ইত্যাতি আল্লা পছন্দ করা কাজগুলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত স্থানচ্যুতি নাম প্রদান করে না। যারা তা করে তারা স্রষ্টাকে সৃষ্টির উপর কিয়াস করে।

৬২৬. এ হচ্ছে সুন্নাতের মাধ্যমে বিদ'আত প্রতিরোধ করার একটি পদ্ধতি। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এটা বুঝাতে চাইলেন যে, ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ যখন সে জাহমীর বক্তব্য খণ্ডন করতে চাইলেন যার দাবি ছিল যে, আল্লাহর সাথে তাঁর কোনো পছন্দনীয় কাজ সম্পৃক্ত হতে পারে না, অর্থাৎ সিফাতে ইখতিয়ারিয়্যাহ ফি'লিয়্যাহ অস্বীকার করে বসলো, যাতে করে আল্লাহর আসা, আগমন করা, অবতরণ করা, উপরে উঠা, আরও অন্যান্য তাঁর পছন্দকৃত কর্মগত গুণ তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে অসম্ভব মনে করা হয়েছে, তখন ফুদ্বাইল বললেন, "যদি তোমাকে জাহমী বলে, আমি ঐ রবকে স্বীকার করি না, যে স্বীয় স্থান থেকে সরে যায়। তখন তাকে বল: আমি ঐ রবকে স্বীকার করি যিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।" এর মাধ্যমে ফুদ্বাইল নির্দেশ দিলেন যাতে এমন রবের ওপর ঈমান আনে যে সবকিছু করতে সক্ষম। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে রব্ব তাঁর সকল ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম তিনি সে ইলাহের চেয়ে উত্তম যিনি তা করতে পারেন না। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৭৭) (শারহু হাদীসিন নুযূল)।

৬২৭. আর তা কেবল সংক্ষিপ্ত আকারে, যদি তোমাকে জাহমী বলে.... থেকে শেষ পর্যন্ত। দেখুন, খালক্বু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩৬। অনুরূপ তা আরও এসেছে, ইমাম লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৭৭৫; অনুরূপ সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২৩৫।

[قول عمرو بن عثمان المكي]:

وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه «التعرف بأحوال العباد والمتعبدين» قال: «ما يجيء به الشيطان للتائبين» وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها والتعطيل.

['আমর ইবন উসমান আল-মাক্কীর বক্তব্য]

অনুরূপভাবে 'আমর ইবন উসমান আল-মাক্কী(৬২৮) তার "আত-তা'আররুফ বি আহওয়ালিল 'ইবাদি ওয়াল মুতা'আব্বেদীন"(৬২৯) নামক গ্রন্থে বলেন, অধ্যায়: "তাওবাকারীদের জন্য(৬৩০) শয়তান যা নিয়ে আসে।" তিনি উল্লেখ করেন যে, সে তাদেরকে কঠিন নৈরাশ্যের মধ্যে নিপতিত করে, অতঃপর ধোঁকা ও দীর্ঘ আশার মধ্যে, অতঃপর তাওহীদের মধ্যে(৬৩১)। অতঃপর তিনি বলেন, শয়তান সবচেয়ে বড় যে প্রবঞ্চনা দেয় তা হচ্ছে, তাওহীদের মধ্যে সন্দেহে নিপতিত করার মাধ্যমে অথবা আল্লাহর সিফাতের মধ্যে সেগুলোকে তুলনা করার মাধ্যমে, সাদৃশ্য দানের মাধ্যমে বা সেগুলোকে অস্বীকার ও নিষ্ক্রিয়করণের মাধ্যমে।(৬৩২)

৬২৮. তিনি হচ্ছেন, আবু আব্দুল্লাহ 'আমর ইবন উসমান ইবন কুরাব ইবন গুসাস, আল-মাক্কী। সূফীদের বড় শাইখ। তিনি হাদীস শুনেছেন ইউনুস ইবন আব্দিল আ'লা, রবী' ইবন সুলাইমান প্রমুখ থেকে। ফিকহের বড় আলেম। জুনাইদ এর সাথীত্ব বরণ করেছিলেন। বাগদাদে বসবাস করেছেন। তারপর সেখানেই হিজরী ২৯৭ সালে তার মৃত্যু হয়। তিনি বিভিন্ন প্রদেশে চিঠি লিখে হাল্লাজের ওপর লা'নত করেন এবং তার সম্পর্কে মানুষদেরকে সাবধান করেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার প্রশংসা করেন। আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি তাসাওউফের শাইখদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সিফাত সাব্যস্ত করতেন আর জাহমিয়্যাহ ও হুলুলিয়্যাহ সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড অস্বীকার করতেন।
দেখুন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (১০/২৯১); যিকরু আখবারি আসবাহান (২/৩৩); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১৪/১৩৬), নং ৬৬২৬; ইবনুল মুলাক্কিন, ত্বাবাক্বাতুল আওলিয়া, পৃ. ৩৪৪; ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/২২৫); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১১/১৩৫); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৫/৪-৯), (৬/২২২৬)।

৬২৯. এ গ্রন্থটি বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তবে যারাই 'আমর ইবন উসমান এর জীবনী লিখেছেন তারা সবাই উল্লেখ করেছেন যে, তাসাওউফে তার বেশ কিছু রচিত গ্রন্থ ছিল।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ 'আমর ইবন উসমান এর এ গ্রন্থ থেকে তার বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৫৯-৬০) গ্রন্থে বেশ কিছু তথ্য এনেছেন, সেখানে তিনি এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন, আদাবুল মুরীদীন ওয়াত তা'আররুফ লি আহওয়ালিল উব্বাদ। অনুরূপ ইমাম যাহাবী তার আল-উলু গ্রন্থে (২/১২২৫), নং ৪৮৯ এ তথ্য বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'আদাবুল মুরীদীন।

৬৩০. অর্থাৎ তাদের জন্য যেসব ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা নিয়ে আসে তার বর্ণনা। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৬০)।

৬৩১. এ কথার ব্যাখ্যা করেছেন ইবন তাইমিয়্যাহ তার বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৬০); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৭৪। তারা বলেন, "আর তৃতীয় দিক, যে দিক থেকে শয়তান মানুষের কাছে আসে, যখন তারা তার কথা মানতে অস্বীকার করে, আর তারা আল্লাহর নির্দেশকে আকঁড়ে ধরে, তখন শয়তান তাদের কাছে কুমন্ত্রণা নিয়ে আসে। সে তখন স্রষ্টার ব্যাপারেই তাদেরকে সন্দিহান করে তোলে, যাতে তাদের মাঝে তাওহীদের মূলনীতিই বিনষ্ট করতে পারে।"

৬৩২. বাস্তবে এ তিনটি অস্ত্র দিয়ে আজও শয়তান জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিদিয়া

فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم. رحمك الله تعالى. أن كُلَّ ما توهمه قلبك، أو سَنَح في مجاري فكرك، أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء، أو ضياء أو إشراق، أو جمال، أو شبح مائل، أو شخص متمثل: فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١]، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤] أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوٍ ولا مثل، أَوَلَمْ تعلم أنه تعالى لما تجلّى للجبل تدكدك لعظم هيبته، وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك،

অতঃপর তিনি ('আমর ইবন উসমান আল-মাক্কী) ওয়াসওয়াসার হাদীস[৬৩৩] উল্লেখ করে বলেন, জেনে রেখ! (আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন) যা কিছু তোমার হৃদয়ে ধারণা সৃষ্টি করে বা তোমার চিন্তার স্থলে উদিত হয় অথবা তোমার অন্তরে পেশ হওয়ার জায়গায় কল্পনায় আসে, যেমন- সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা, চাকচিক্য, শোভা অথবা দৃশ্যমান কোনো ছায়া, বা শরীর হিসেবে ফুটে উঠা কোনো কায়া, সে সবকিছু থেকে আল্লাহ অবশ্যই ভিন্ন। বরং তিনি অনেক মহান, অনেক শ্রেষ্ঠ ও বড়। তুমি কি শোন না যে, তিনি বলেছেন: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] "তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ১১] এবং ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ④﴾ [الاخلاص: ٤] "তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" [সূরা আল-ইখলাস: ০৪] অর্থাৎ নেই কোনো সদৃশ, তুলনার যোগ্য, সমকক্ষ ও উদাহরণ। তুমি কি জানো না যে, তিনি যখন পাহাড়ের প্রতি নিজেকে উদ্ভাসিত করলেন, তখন পাহাড় তাঁর ভয়ের প্রচণ্ডতায় ও সুউচ্চ ক্ষমতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।[৬৩৪] কাজেই যেমন তিনি কোনো কিছুতে উদ্ভাসিত হলে তা চূর্ণ হয়ে যায়। তেমনি কেউ তাঁর

সম্প্রদায়কে ঘায়েল করেছে। আজ পর্যন্ত তারা এ তিনটির মাঝে পড়ে আছে। আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করার জন্য প্রথমে তামসীল বা তাশবীহ প্রদান করে তারপর সেটাকে তা'ত্বীল করে।

৬৩৩. ওয়াসওয়াসার হাদীস বলতে সম্ভবত বুঝাচ্ছেন যা সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একদল লোক এসে জানতে চাইলেন, 'আমরা আমাদের অন্তরে এমনসব জিনিস পাই, আমাদের কেউ তা উচ্চারণ করাও বড় গুনাহের মনে করি'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি তা পেয়েছ? তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল বললেন, 'এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ঈমান'। [মুসলিম, আস-সহীহ (১/১১৯), হাদীস নং ১৩২; আবু দাউদ, আস-সুনান (৫/৩৩৬), হাদীস নং ৫১১১; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৯৫), হাদীস নং ৬৫৪; আবুল কাসেম আল-আসফাহানী, আল-হুজ্জাহ (২/২৮৫)]

৬৩৪. এখানে তিনি সূরা আল-আ'রাফের ১৪৩ নং আয়াতে মূসা 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক আল্লাহকে দেখার আব্দার করার পরে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ে তাঁর উজ্জ্বল আলো ফেললে তার কী অবস্থা হয়েছিল তাই তুলে ধরছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব্ব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। আপনি বরং পাহাড়ের দিকেই তাকিয়ে দেখুন, সেটা যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন।' যখন তাঁর রব্ব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, 'মহিমাময় আপনি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে তাওবাহ করছি এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম'।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৩]

সম্পর্কে ধারণা করে কিছু নির্ধারণ করলে ধ্বংস হয়ে যাবে।[৬৩৫]

৬৩৫. অর্থাৎ আল্লাহকে দেখার আব্দার করার কারণে যেহেতু পাহাড়ে তাঁর উদ্ভাসন পড়লো পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, সেহেতু যে কেউ আল্লাহকে দেখার জন্য অন্তরে আল্লাহর উদ্ভাসন কামনা করে সেখানে কোনো প্রকার (তাশবীহ) সাদৃশ্য, (তামসীল) উদাহরণ, (নাযীর) দৃষ্টান্ত, ও (মুসাওয়ী) সমপর্যায়ের কিছু আসবে তখন তার অন্তর চূর্ণ হয়ে যাবে।
এ ধরনের তাফসীরকে বলা হয় তাফসীরে ইশারী বা সূফীদের ইঙ্গিতপূর্ণ তাফসীর। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এগুলো অনেকটা ফকীহগণের কিয়াসের মতো। তা শুদ্ধও হতে পারে, আবার অশুদ্ধও হতে পারে। আবার তিনি স্পষ্ট করেও বলেছেন যে, এসবের অধিকাংশই তাফসীরের পর্যায়ে পড়ে না। বরং এগুলোকে শিক্ষা নেয়ার উপকরণ ও কিয়াসের মতো মনে করতে হবে। এগুলো জ্ঞানের একটি বিশুদ্ধ পদ্ধতিও হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী, "যারা সম্পূর্ণ পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ৭৯] এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী "ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যেখানে কুকুর থাকে"। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩২২৫; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২১০৬] যদি কুরআনের কাগজ ধরতেই 'পবিত্ররা ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করতে না পারে' [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ৭৯] তাহলে সেসব কাগজে লিখা বাণীর মর্মার্থ পবিত্র অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যরা কীভাবে প্রাপ্ত হবে? যদি ফিরিশতা এমন ঘরে প্রবেশ না করে যেখানে কুকুর রয়েছে, তাহলে যেসব মর্মার্থ ফিরিশতারা পছন্দ করে সেগুলো এমন অন্তরে প্রবেশ করবে না যেগুলোতে নিন্দিত কুকুরের চরিত্র রয়েছে। আর ফিরিশতারাও তাদের কাছে আসে না। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আস-সাব'ঈনিয়্যাহ, (বুগইয়াতুল মুরতাদ) পৃ. ২১৬; ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৫৫১); শারহু হাদীসিন নুযুল; জামে'উল মাসায়িল (৪/৬৫)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ ধরনের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর মধ্যকার যে কথাগুলো স্বয়ং বিশুদ্ধ ও যথাযথ, কিন্তু সেগুলোর পক্ষে যদি কেউ কুরআন ও সুন্নাহ'র এমন সব শব্দ দিয়ে প্রমাণ নেয়ার চেষ্টা করে যা আসলেই বাহ্যিকভাবে তা বুঝায় না, সেগুলোকেই বলা হয় 'ইশারাত' (ইঙ্গিতপূর্ণ) বা 'হাক্বায়িকুত তাফসীর' (হাক্বীকতের তাফসীর)। ইমাম আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী এ অধ্যায়ে অনেক বেশি লিখেছেন। অনেকের কাছে এ বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ মনে হতে পারে; কেননা এর অর্থ ও মর্মটি বিশুদ্ধ; এর ওপর কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আয়াতের ক্ষেত্রে এরা যা বলছে এ আয়াত থাকে তা কীভাবে গ্রহণ করা হবে?
বস্তুত এ সমস্ত তাফসীর দু' প্রকার:
প্রথম প্রকার: যদি বলা হয় এ অর্থগুলো এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য, তবে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ। যেমন কেউ বলল, 'তাযবাহু বাক্বারাহ' [সূরা আল-বাক্বারাহ: ৬৭] অর্থ আত্মাকে নিঃশেষ করে দাও, 'ইযহাব ইলা ফির'আউন' [সূরা ত্বা-হা: ২৪] অর্থ 'কলব বা হৃদয়'। 'ওয়াল্লাযীনা মা'আহু' অর্থ আবু বকর, 'আশিদ্দাউ আলাল কুফফার' অর্থ উমার, 'রুহামাউ বাইনাহুম' অর্থ উসমান, 'তারাহুম রুক্কা'আন সুজ্জাদান' এর অর্থ আলী [সূরা আল-ফাতহ: ২৯] এ রকম অর্থ করে যদি বলে যে এগুলো আরবী শব্দ থেকে বুঝা যায় তবে সে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করলো, হয় ইচ্ছা করে নতুবা ভুল করে মিথ্যারোপ করলো।
দ্বিতীয় প্রকার: আর যদি এ অর্থগুলোকে শিক্ষা অর্জন ও কিয়াস আকারে গ্রহণ করে, শব্দের দাবি হিসেবে নয়, তবে এটি কিয়াস এর অন্তর্ভুক্ত। তখন ফকীহগণ যেটাকে 'কিয়াস' বলে থাকেন সেটাই তাফসীরবিদগণের নিকট 'ইশারা' বলে বিবেচিত হবে। আর এ ধরনের 'ইশারা' বা ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ শুদ্ধও হতে পারে আবার বাতিলও হতে পারে, যেমনিভাবে কিয়াস কখনও শুদ্ধ হয় আবার কখনও তা বাতিল হয়। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/২৪০)।
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ যখন 'ফিরিশতারা প্রবেশ করে না...' এ হাদীস আলোচনা করলেন তখন বললেন, 'যদি কুকুর ও ছবি ফিরিশতাদেরকে ঘরে প্রবেশ করতে বাঁধা প্রদান করে, তাহলে রব্ব এর মা'রিফাত এমন অন্তরে কীভাবে প্রবেশ করবে যা প্রবৃত্তির কুকুর ও প্রবৃত্তির ছবিতে পূর্ণ হয়ে আছে?... এ জাতীয় 'ইশারা' বা ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ। এগুলো ফকীহগণের কিয়াসের মতোই। বরং ফকীহগণের অনেক কিয়াসের চেয়েও তা বেশি বিশুদ্ধ। দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম,

فرُدّ بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ.

فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك: إذا كان موصوفًا بكذا أو وصفته، أوجب له التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى.

فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد لا كالآحاد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. إلى أن قال.: خلصت له الأسماء السَّنيَّة فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق،

সুতরাং আল্লাহ তাঁর কিতাবে নিজেই নিজের ব্যাপারে তাঁর মত আর কেউ নেই বলে যা বর্ণনা দিয়েছেন তা দিয়ে তুমি সাদৃশ্য প্রদান, তুলনাদান, উপমা পেশ, সমকক্ষ নির্ধারণ করা প্রতিহত কর।

অতঃপর যদি তুমি এটি আঁকড়ে ধর এবং তা (সাদৃশ্য প্রদান, তুলনাদান, উপমা পেশ, সমকক্ষ নির্ধারণ করা) থেকে বিরত থাক, তাহলে দেখবে সে (শয়তান) তোমার কাছে পবিত্র, মহান আল্লাহর কিতাবে ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সাব্যস্তকৃত আল্লাহর গুণকে নিষ্ক্রীয়করণের জন্য এসে বলবে, তিনি যদি এসব গুণে গুণান্বিত হবেন, অথবা তুমি যদি তাকে এসব গুণে গুণান্বিত করো, তবে তো সাদৃশ্য প্রদান আবশ্যক হয়ে যায়। শয়তানের এ কুমন্ত্রণার জবাবে তাকে তুমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করো; কেননা সে তো অভিশপ্ত, সে তোমাকে পদস্খলন ঘটাতে চায়, তোমাকে পথভ্রষ্ট করে নাস্তিক বিভ্রান্ত সিফাত অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

অতঃপর জেনে রাখ! (মহান আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এক সত্তা, অন্য একজনের মতো না, একক, অমুখাপেক্ষী, কাউকে জন্ম দেননি, তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই। ...

শেষে তিনি ('আমর ইবন উসমান আল-মাক্কী) বলেন, "আল্লাহর জন্য উন্নত আলোকোজ্জ্বল[৬৩৬] নামসমূহ সাব্যস্ত রয়েছে, যেটা সৃষ্টির আদিতে[৬৩৭] বাস্তবে সত্যতার সাথেই তাঁর ছিল।

আল-কালামু আলা মাসআলাতি সামা' পৃ. ৩৯৭-৩৯৮ সংক্ষিপ্তাকারে।

আলেমগণ এ ধরনের ইশারী তাফসীর ও ইশারী ব্যাখ্যা নিয়ে দু'টি মতে বিভক্ত। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে উপরে ইবন তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুমাল্লাহ থেকে ইতোপূর্বে যা আমরা উল্লেখ করেছি তাই।

সূফীদের তাফসীরে ইশারী বিষয়ে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন (২/৩৮১); ড. খালেদ আব্দুর রহমান আল-'আক, উসূলুত তাফসীর ওয়া ক্বাওয়া'য়িদুহু, পৃ. ২০৫; ড. ত্বাহের মুহাম্মাদ ইয়া'কূব, আসবাবুল খাত্বা ফিত তাফসীর (২/৭৪০)।

৬৩৬. এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য আল্লাহর সর্বোচ্চ ও সর্বোজ্জ্বল সত্তা হওয়ার কথা বলা।

৬৩৭. আল্লাহ তা'আলার সকল গুণকে 'কাদীম' বলা সঠিক নয়। কারণ তাঁর কর্মগত গুণগুলো তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যখন ইচ্ছা তখন তিনি করেন। তবে কর্মের মূল সূত্র 'কাদীম' কিন্তু সেটার একক কোনো কাজ নতুন করে সংঘটিত হয়। যেমনটি শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী বলেন, 'কর্মগত গুণগুলোর আসল অবশ্যই 'ক্বাদীম' যা সর্বদা ছিল ও সর্বদা থাকবে। আর তার একক কোনো অংশ সর্বদা নতুনভাবে সংঘটিত হবে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে'। [আজওয়িবাতুস সা'দিয়্যাহ, পৃ. ১৩৯]

لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليًا، أو اسمًا كان منه بريًا تبارك وتعالى، فكان هاديًا سيهدي، وخالقًا سيخلق، ورازقًا سيرزق، وغافرًا سيغفر، وفاعلاً سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد

এমন কোনো গুণ তিনি উদ্ভব করেননি যা থেকে তিনি খালি ছিলেন(৬৩৮), অথবা এমন নামেরও উদ্ভব করেননি যা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।(৬৩৯) তিনি ছিলেন হাদী, অচিরেই হিদায়াত করবেন। তিনি ছিলেন সৃষ্টিকর্তা, অচিরেই সৃষ্টি করবেন; তিনি ছিলেন রিযিকদাতা, অচিরেই রিযিক দান করবেন; তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, অচিরেই তিনি ক্ষমা করবেন; তিনি ছিলেন কর্তা, অচিরেই তিনি করবেন।(৬৪০) তিনি তাঁর ইসতিওয়া সিফাতটিতে গুণান্বিত,

৬৩৮. আল্লাহর সত্তাগত গুণের ব্যাপারে এটি সঠিক কথা। কিন্তু আল্লাহর কর্মগত পছন্দ করা গুণের ব্যাপারে এটি যথাযথ নয়। কারণ আল্লাহর কর্মগত পছন্দ করা গুণগুলো তিনি যখন ইচ্ছা তখন করবেন এটাই হচ্ছে তাঁর পূর্ণতার ওপর প্রমাণ।

বস্তুত আল্লাহর কর্মের ব্যাপারে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত:

১- জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারীদের মতে, আল্লাহর কোনো গুণই নেই, সবই আল্লাহ থেকে আলাদা কর্ম বা সৃষ্টি।

২- কুল্লাবিয়্যাহ সম্প্রদায় দু'টি নীতিতে বিশ্বাসী। হয় এসব কর্ম আল্লাহর সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত আর সত্তার মতোই 'ক্বাদীম' (সত্তাগত গুণ)। অথবা এগুলো আল্লাহ থেকে আলাদা কর্ম, তাঁর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় (সৃষ্টি)।

৩- অধিকাংশ আসহাবুল হাদীস ও আহলে কালামদের একটি গোষ্ঠীর মত হচ্ছে, আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড তিন প্রকার: এক. যা সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, (সত্তাগত গুণ) দুই. যা সত্তা থেকে আলাদা কর্ম (সৃষ্টি) তিন. আরেকটি প্রকার রয়েছে যা উপরের দু' শ্রেণির লোক উল্লেখ করেনি, তা হচ্ছে, আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু কর্ম যা তিনি যখন ইচ্ছা তখন ঘটিয়ে থাকেন। আর সেগুলো ভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়নি। যেমন আরশের উপরে উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ, সন্তুষ্ট হওয়া, রাগ করা ইত্যাদি।

এরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত:

ক. যারা এ তৃতীয় প্রকার কর্মটিকে সম্পূর্ণ নতুন বা 'হাদেস' বলে থাকে; তারা হচ্ছে কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়।

খ. যারা এ তৃতীয় প্রকার কর্মটিকে মৌলিকভাবে (তিনি আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম এ হিসেবে) 'ক্বাদীম' তবে এর এককটি অনুষ্ঠিত হওয়ার দিক থেকে হাদেস। তারা মৌলিকভাবে 'হাদেস' হওয়া ও বিশেষ একক 'হাদেস' হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। আর তাই হচ্ছে অধিকাংশ আসহাবুল হাদীস ও তাদের অনুসারীগণের মত।

তারা বলেন, কোনো জিনিসের প্রকার অবশিষ্ট থাকা ও নির্দিষ্ট একক অবশিষ্ট থাকা এক কথা নয়। তারা উদাহরণ দিয়ে বলে থাকেন, জান্নাতের নি'আমতগুলোর প্রকার-প্রকরণ কখনও নিঃশেষ হবে না, কিন্তু তা থেকে যা একবার খাওয়া হবে সে একক তো আর অবশিষ্ট থাকবে না।

অপরদিকে সব 'হাদেস' নিঃশেষ হয়ে যাবে এমন নয়। নির্দিষ্ট কোনো হাদেসও অবশিষ্ট থাকে, যেমন মানুষের রূহ; তা অবশ্যই 'হাদেস', আগে ছিল না, পরে অস্তিত্বে এসেছে। কিন্তু সেগুলো অবশিষ্ট থাকবে (সুতরাং 'হাদেস' হলেই সেটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সেটা সঠিক নয়)। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (২/১৪৭-১৪৮)।

৬৩৯. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর (সিফাতে ইখতিয়ারিয়্যাহ) পছন্দনীয় কর্মগত গুণগুলো যখন অস্তিত্বে আসে তখন সেটি আল্লাহর পূর্ণগুণের অর্থজ্ঞাপক হয়। সেগুলো অস্তিত্বে আসার আগে সে পূর্ণতার অর্থ প্রদান করতো না। যেমন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা, তাকে ডাকা। এখানে যখন আল্লাহ তা'আলা নবী মূসাকে ডেকেছেন তখন সেটি পূর্ণ গুণের অর্থজ্ঞাপক হয়েছে। যদি মূসা 'আলাইহিস সালাম সেখানে আসার আগে তাকে ডাকতেন তবে সেটা অপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। সুতরাং আল্লাহর গুণ যখন যেটা তিনি অস্তিত্বে আনয়ন করেন তখন সেটা পূর্ণতার ওপর প্রমাণবহ থাকে। অস্তিত্বে আসার আগে সেটি পূর্ণতা জ্ঞাপক নয়। বরং যে সময় অস্তিত্বে আসা তার হিকমত ও প্রজ্ঞার চাহিদা বলে বিবেচিত হয় সেসময়ের আগে তা অস্তিত্বে আসা অপূর্ণতার ওপরই প্রমাণবহ। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/২৪১)।

৬৪০. অর্থাৎ এ গুণগুলো দ্বারা তিনি সর্বদা গুণান্বিত ছিলেন, আযালী কাল থেকেই। কখনও তিনি এগুলো

كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك، قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢] بمعنى أنه سيجي، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودًا بصفة لا تلحقه

এটা তিনি তখনও ঘটাননি।(৬৪১) অবশ্যই তাঁর থেকে এ গুণটি হওয়া আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল যে অচিরেই তা হবে। তাঁর কর্মসমূহের মধ্যে তাঁকে এ (আরোহনকারী) নাম দেয়া হবে।

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝﴾ [الفجر: ٢٢] "আর আপনার রব্ব আসবেন এবং ফেরেশতাগণও কাতারে কাতারে আসবেন।" [সূরা আল-ফাজর: ২২] এর অর্থ, নিশ্চয় অচিরেই তিনি আসবেন, তবে আসার দ্বারা 'আগমনকারী' নাম উদ্ভাবন করেননি।(৬৪২) শুধু কর্মটি আসার সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত। সুতরাং তিনি আগমন করেছেন তথা অচিরেই আগমন করবেন। তাঁর আসাটা এমনভাবে অস্তিত্বে রয়েছে(৬৪৩) যার

থেকে মুক্ত ছিলেন না। এজন্যই ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা আল্লাহর বাণী, "আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল ও দয়ার্দ্র", অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ ও সর্ববিজ্ঞ", এবং অনুরূপ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, তিনি সর্বদা এগুলো দ্বারা গুণান্বিত ছিলেন, এখনো আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৫৩৮-৫৩৯, ৫৫২-৫৫৩।

৬৪১. বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। সত্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, পূর্বে তিনি 'আরশের উপর ছিলেন না। যেমনটি 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন' [সূরা আল-আ'রাফ, ৫৪ সূরা ইউনুস: ৩; সূরা আর-রা'দ: ২; সূরা ত্বা-হা: ০৫; সূরা আল-ফুরকান: ৫৯; সূরা আস-সাজদাহ: ০৪; সূরা আল-হাদীদ: ০৪] এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৫০)।

সুতরাং ইমাম 'আমর ইবন উসমান আল-মক্কীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে হয়ত কারো মনে হতে পারে যে, তিনি আল্লাহর 'আরশের উপর উঠাকে সত্তাগত গুণ বলেছেন। আসলে কিন্তু তা নয়, বস্তুত তা কর্মগত গুণ। ইস্তেওয়া বা 'আরশের উপর উঠা তাঁর একটি গুণ, যা তিনি তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় করেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২১৬, ৫২৩, ৪১০)।

ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'যারা 'ইস্তেওয়া'কে আল্লাহর সত্তাগত গুণ বলেন তারা এ তা'ওয়ীল করে থাকে যে, তিনি 'আরশের উপর ক্ষমতাবান হলেন। বস্তুত এটা শুদ্ধ নয়; কারণ যেহেতু ক্ষমতা তার পূর্বেই ছিল, সর্বদাই তিনি সম্মানের দিক থেকে উপরে ছিলেন; সুতরাং বুঝা গেল যে, যারা এ গুণটিকে সত্তাগত গুণ বলেছেন তাদের বক্তব্য অতিশয় দুর্বল; কারণ:

১- আল্লাহ বলেছেন, 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন'। আর 'তারপর' অর্থই হচ্ছে তা পরে করেছেন।

২- আল্লাহ তা'আলা এর আগে বলেছেন, সৃষ্টি করেছেন.... উপরে উঠেছেন। সুতরাং একটি ক্রিয়ার উপর আরেকটি ক্রিয়ার 'আত্বফ' বা সংযুক্তি স্থাপন করেছেন। যাতে বুঝা যায় তা কর্মই ছিল যেমনটি সৃষ্টি একটি কর্ম। অর্থাৎ সৃষ্টি করেছেন তারপর উঠেছেন। [মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৩৯৫)]

এখানে অবশ্য 'আমর ইবন উসমান আল-মাক্কীর কথার আরেকটি অর্থ করা যায়, তা হচ্ছে, তিনি আল্লাহ 'আরশের উপর উঠা' এটা না করেও পরিপূর্ণ ছিলেন, এটা করে পূর্ণ হয়েছেন এমন নয়, তাহলে সে অর্থ শুদ্ধ হবে।

৬৪২. এর দ্বারা 'আমর ইবন উসমান আল-মাক্কীর উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে আল্লাহ তা'আলা আযাল বা পূর্ব থেকেই পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত তাহলে সেটা বিশুদ্ধ অর্থ। কিন্তু যদি এটা মনে করে থাকেন যে মহান আল্লাহর কর্মকাণ্ড নতুন করে হয় না, তাহলে তার কথা অগ্রহণযোগ্য।

৬৪৩. এটিও সঠিক নয়। কারণ কর্ম যখন কর্তা ইচ্ছা করেন তখনই হয়। কর্তা ইচ্ছা করার আগেই কর্ম হয়ে আছে এমন কথা বলা ঠিক নয়। সম্ভবত 'আমর ইবন উসমান আল-মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর

الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلاً، ولا مشبهًا، وارضَ لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلمًا، مستسلمًا، مصدقًا؛ بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير.

إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: ﴿أَنَا ٱللَّهُ﴾ [القصص:٣٠] لا الشجرة، الجائي قبل

সাথে কোনো স্বরূপ নির্ধারণ ও সাদৃশ্যদান যুক্ত নেই। কেননা সেটা রবুবিয়াত বা প্রভুত্বের কাজ; কাজেই মা'বুদের স্বরূপ উদঘাটনের মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করলেই বুদ্ধি পেরেশান হবে, মন বিচ্ছিন্ন হবে। কাজেই তুমি দুদিকের একদিকেও যেও না। না নিষ্ক্রীয়কারী হও, আর না হও সাদৃশ্যপ্রদানকারী। আর আল্লাহর জন্য তাতেই সন্তুষ্ট থাকো যাতে তিনি নিজের জন্য সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তুমি তার নিজের ব্যাপারে তার সংবাদে অনুগত আত্মসমর্পণকারী বিশ্বাসী হয়ে থেমে যাও। সেখানে কোনো প্রকার ভিন্নতা আনার চেষ্টায় যাবে না, অনুরূপ গভীরে তালাশের চেষ্টায়ও রত হবে না।

শেষে তিনি বলেন, "কাজেই মহান আল্লাহ তিনিই বলেছেন, "আমি আল্লাহ", গাছ না[৬৪৪]। তিনিই আগন্তুক হওয়ার পূর্বেই আগমনকারী।[৬৪৫] তাঁর নির্দেশ নয়, তিনি স্বয়ং আসবেন

কর্মগত সিফাতকেও প্রাচীন মনে করতেন।

৬৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ বাণীতে যেখানে আল্লাহ বলেছেন, "অতঃপর যখন মূসা আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন উপত্যকার ডান পাশে বরকতময় ভূমির উপর অবস্থিত সুনির্দিষ্ট গাছের দিক থেকে তাকে ডেকে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ, সৃষ্টিকুলের রব্ব।" [সূরা আল-কাসাস: ৩০]
এর মাধ্যমে জাহমিয়্যাহ ও পরবর্তী মু'তাযিলাদের বক্তব্যের খণ্ডন রয়েছে, যারা বলে থাকে যে উপরোক্ত বাণী গাছ থেকেই এসেছে, আল্লাহ থেকে নয়। কেননা তারা আল্লাহর বান্দাকে সৃষ্ট বলে থাকে, গুণ বলে না। তাদের কথার দাবি হচ্ছে গাছই বলেছে, "হে মূসা নিশ্চয় আমিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন"! দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/১৫৩); ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১৮২); ইবনুল কাইয়েম, নূনিয়্যাহ, হাররাসের ব্যাখ্যাসহ (১/১১৪-১১৫)।

৬৪৫. বক্তব্যটি বিবিধ অর্থের সম্ভাবনাময়। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের মাঠে আসবেন, আগমনকারী না থাকার পরে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/১৫১)। যেমনটি ইবন তাইমিয়্যাহ'র বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে এসেছে, 'তিনি আগমনকারী হবেন, আগমনকারী না থাকার পরে।
তবে এ অর্থটি (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং যা বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে এসেছে) বর্তমান ফাতওয়া আল-হামাউইয়্যাহ এর সকল ছাপা ও ইমাম যাহাবীর আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম গ্রন্থে যা এসেছে তার বিপরীত। সেখানে এসেছে, 'তিনি আগমনকারী হবেন, আগমনকারী হওয়ার আগেই'। [শাইখ, ড. আব্দুল আযীয আলে আব্দুল লতীফ, আত-তা'লীক্ব আলাল ফাতাওয়া আল-হামওয়িয়্যাহ আল-কুবরা, পৃ. ১৭১]
অবশ্য কেউ কেউ বুঝেছেন যে, তিনি (আমর ইবন উসমান আল-মাক্কী) এখানে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হাশরের মাঠে আগমনের জন্য 'জাআ' বা অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহারের কারণ বর্ণনা করছেন। [সূরা আল-ফাজর: ২২] আর তা হচ্ছে তিনি আগমনকারী গুণে গুণান্বিত হবেন যেভাবে তাঁর জন্য উপযোগী সে রকম করে, যদিও সে কর্মটি এখনও ঘটেনি, কারণ তা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্যত্রও বলেছেন, 'আল্লাহ নির্দেশ এসে গেছে সুতরাং তোমরা সেটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি করো না' [সূরা আন-নাহল: ০১] এখানেও কাফেরদের শাস্তি আসার বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় অতীত কালের ক্রিয়া 'আতা' ব্যবহার করা হয়েছে।
আবার কেউ কেউ বুঝেছেন, মহান আল্লাহ যেভাবে ক্ষমা করার আগেও ক্ষমা করার গুণে গুণান্বিত, দয়া করার আগেও দয়া করার গুণে গুণান্বিত সে হিসেবে আল্লাহ তা'আলা হাশরের মাঠে আসার আগেই 'আগমনকারী' গুণটি তাঁর জন্য ব্যবহার করা যাবে, কারণ তা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। [আল-

أن يكون جائيًا لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد؛ فتبيَضُّ به وجوههم، وتَفْلُج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذى كلم موسى تكليمًا، وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله؛ لأنه قرَّبه نَجِيًّا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقًا أو محدثًا أو مربوبًا، والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم،

আখেরাতে স্বীয় বন্ধুদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে[৬৪৬], এতে তাদের চেহারা শুভ্রোজ্জ্বল হবে[৬৪৭], অস্বীকারকারীদের দলীল-প্রমাণ তাতে ব্যর্থ হবে। মহান আল্লাহ সর্বস্থানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে সমুন্নত, যাবতীয় মহৎ সম্মানের সাথে। যিনি মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে যথযথভাবে কথা বলেছেন। তাকে তাঁর নিদর্শনাবলি[৬৪৮] দেখিয়েছেন। অতঃপর মূসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর কালাম শুনেছিলেন; কারণ তিনি তাকে আলাপের মাধ্যমে নৈকট্য দান করেছিলেন। তাঁর কালাম বা বাণী সৃষ্ট হওয়া, উদ্ভাবিত হওয়া, লালিত-পালিত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি সৃষ্টিকুলের ওয়ারিশ[৬৪৯], তাদের আওয়াজ শ্রবণকারী,

---

ফাতাওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ'র ওপর হামাদ আত-তুয়াইজরীর ব্যাখ্যা, পৃ. ৩৮৩]

৬৪৬. এর মাধ্যমে আশায়েরাদের অপব্যাখ্যাকে খণ্ডন করা হয়েছে। কারণ তাদের কেউ কেউ বলে থাকে যে, হাশরের মাঠে আল্লাহর আসার অর্থ তাঁর নির্দেশ আসা। তাছাড়া তাঁর নির্দেশ তো সর্বদাই আসছে তাহলে কিয়ামতের দিন সেটাকে আলাদা করে বর্ণনা করার কী প্রয়োজন? তদ্রূপ যদি তোমরা এভাবে শব্দ উহ্য ধরে নিয়ে অর্থ করে যাও তাহলে তোমরা যে সাতটি গুণ সাব্যস্ত করেছ সেখানেও উহ্য ধরা যাবে। যদি সেখানে ধরতে তোমরা রাযী না হও তাহলে অন্যত্রও এভাবে শব্দ উহ্য ধরতে পার না। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪১৯)।

৬৪৭. যেমন কুরআনে কারীমে এসেছে, "সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে; যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে'।" [সূরা আলে ইমরান: ১০৬] আরও এসেছে, "সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জল হবে।" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২] আরও এসেছে, "পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে প্রদান করবেন হাস্যোজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা।" [সূরা আল-ইনসান: ১১] আরও এসেছে, "আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন।" [সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ২৪]

৬৪৮. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এটা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন যে, নবীদের নবুওয়াতের ওপর প্রমাণাদিকে কুরআনে কারীমে তিনটি নামে অভিহিত করা হয়েছে:

১- আয়াত বা নিদর্শনাবলি।

২- বারাহীন বা প্রমাণাদি।

৩- বাইয়্যেনাত বা স্পষ্টকারী দলীল।

দেখুন, আন-নাবুওয়াত (২/৮২৮-৮২৯)।

৬৪৯. যেমন আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় যমীন ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমাদেরই থাকবে এবং আমাদেরই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [সূরা মারইয়াম: ৪০] অন্যত্র বলেন, "আর আমরা বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের অহংকার করত! এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর আমরাই তো চূড়ান্ত ওয়ারিশ (প্রকৃত মালিক)!" [সূরা আল-ক্বাসাস: ৫৮] অন্যত্র বলেন, "আর আমরাই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমরাই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।" [সূরা আল-হিজর: ২৩] এসব আয়াতে ওয়ারিস হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির ওপর ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়া লিখে দিয়েছেন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং তিনিই সকল সৃষ্টির একমাত্র ওয়ারিস। এ অবস্থায় যেন তিনিই যমীনের বুকে যারা আছে তাদের সবার ওয়ারিস হলেন।

الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان، وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه
. وهو أمره . تعالى وتقدس أن يحل بجسم، أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك
علوًا كبيرًا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء
الدنيا، ليتقرب إليه خلقه بالعبادة، وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد،

স্বীয় চোখে তাদের দেহ অবলোকনকারী, তাঁর দুহাত বিস্তৃত, তাঁর হাত তাঁর নি'আমত নয়[৬৫০]। আদমকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে তার রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, এটা তাঁর নির্দেশ[৬৫১]। কোনো শরীরের মধ্যে অনুপ্রবেশ হওয়া, মিশে যাওয়া, তার সাথে লেগে যাওয়া[৬৫২] থেকে অতি পবিত্র, অনেক ঊর্ধ্বে।[৬৫৩] তিনি ইচ্ছাকারী, তাঁর ইচ্ছা আছে। তিনি জ্ঞানী, তাঁর জ্ঞান আছে। স্বীয় দু' হাত রহমত নিয়ে বিস্তৃত। প্রতি রাতে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণকারী, যাতে তাঁর বান্দারা ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে আর যাতে তারা তাঁর নৈকট্যের ব্যাপারে আগ্রহী হয়। তিনি অতি নিকটবর্তী, তাঁর সে নৈকট্যের মাধ্যমে তিনি ঘাঁড়ের শিরার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী[৬৫৪],

---

ইবন আবী হাতেম 'উমার ইবন আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার কূফার গভর্নরকে লিখে পাঠালেন, 'তারপর, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে যখন সৃষ্টি করেছেন তখনই তাদের ওপর মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। আর তিনি তাঁর কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যা সত্য, যা তিনি নিজ ইলম অনুযায়ী নাযিল করেছেন আর ফিরিশতাদের তাঁর সৃষ্টির ওপর সাক্ষ্য বানিয়েছেন, তা হচ্ছে, তিনি যমীন ও তার উপর যা আছে সকলের ওয়ারিস হবেন এবং তারা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।
দেখুন ইবন কাসীর (৫/২২৯), সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (৫/৫১৩); শাওকানী ফাতহুল ক্বাদীর (৩/৩৩৪); শানকীত্বী, আদওয়াউল বায়ান (৪/২৮২)।

৬৫০. এখানেও দেখা যাচ্ছে, তিনি আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়াদের মত খণ্ডন করেছেন। কারণ আমরা জানি যে, আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়ারা 'ইয়াদ' এর অর্থ হাত না করে 'নি'আমত' করে থাকে।

৬৫১. সম্ভবত এখানে নির্দেশ দ্বারা বুঝিয়েছেন সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫ নং আয়াতের কথা বলেছেন। যেখানে রূহকে আল্লাহর নির্দেশের একটি বলা হয়েছে। কিন্তু সে রূহকে অনেকেই মানুষের রূহ বললেও সকলে এ ব্যাপারে একমত নয়।
তবে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এখানে 'আমর' বা নির্দেশ বলে 'মা'মুর' বা 'নির্দেশদ্বারা সৃষ্ট' এটা বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহর 'আমর' তার বাণী। আর তার বাণী দ্বারা সৃষ্ট জিনিসই রূহ। 'আমর' বা নির্দেশ তো বাণী, যা কখনো সৃষ্ট নয়। আর রূহ অবশ্যই সৃষ্ট জিনিস। বিষয়টি অন্য জায়গাতেও প্রযোজ্য। আর রূহ তাঁর সিফাতও নয়।

৬৫২. 'লেগে যাওয়া' কথাটি অতিরিক্ত। তিনি যদি তা না বলতেন তবে অনেক ভালো হতো। কারণ এ শব্দটি কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি আবার নিষেধও করা হয়নি। বরং এভাবে 'লেগে যাওয়া থেকে পবিত্র' কথাটি বিশুদ্ধ না হওয়াই বেশি যৌক্তিক। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে জান্নাতু আদনের গাছ লাগিয়েছেন, আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যায় সৃষ্টির সাথে লেগে যাওয়া দোষণীয় নয়। তাছাড়া তিনি 'আরশের উপর সত্তাগতভাবে থাকা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে সেটার উপরে থাকাকে অস্বীকার করে না। যা থেকে বুঝা গেল যে এ শেষোক্ত বাক্য 'লেগে থাকা থেকে পবিত্র' এটা বলা যাবে না। বরং এখানে চুপ থাকা আবশ্যক। তাই এটি সাব্যস্ত কিংবা অসাব্যস্ত কিছুই করা যাবে না। [সালেহ আব্দুল আযীয আলে আশ-শাইখ, শারহুল হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৭৫]

৬৫৩. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর কোনো গুণ সৃষ্টির কারও অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, কোনো শরীরে মিশে যাওয়া, কারও সাথে লেগে যাওয়া থেকে পবিত্র। আদম সৃষ্টির পরে যে ফুঁক ও নির্দেশ দানের মাধ্যমে তাতে রূহের সঞ্চার করেছেন তা অবশ্যই সৃষ্ট। মহান আল্লাহর কোনো অংশ সৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকার কথা ঈমানদার কখনো বলতে পারে না।

৬৫৪. আল্লাহ 'আমর ইবন উসমান' রাহিমাহুল্লাহকে ক্ষমা করুন, তিনি সম্ভবত সূরা 'ক্বাফ' এর ১৬ নং

البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. إلى أن قال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ القائل: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ - أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ [الملك:١٦، ١٧] تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوًا كبيرًا». ا. هـ.

তিনি ঊর্ধ্বে থাকার মাধ্যমে সকল দূরবর্তী স্থান থেকে দূরবর্তী।(৬৫৫) তিনি মানুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নন।

অবশেষে তিনি বলেন: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠] "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায়, আর সৎ আমল তিনি তো তা (তার দিকে) উঠিয়ে নেন।" [সূরা ফাতির: ১০]
এবং

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ۝ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ [الملك:١٦، ١٧]

"তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানের ওপর রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থরথর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, আসমানের উপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন?" [সূরা আল-মুলক: ১৬-১৭] তিনি যেমনিভাবে আসমানের উপর আছেন তেমনি তিনি যমীনে থাকার থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে।(৬৫৬)

আয়াতের মাধ্যমে দলীল নিয়ে 'ঘাঁড়ের রগের নিকটবর্তী' বলে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝাতে চেয়েছেন। অথচ আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, আল্লাহর নৈকট্য কেবল বিশেষ লোকদের জন্য হয়, আর তা হয় সাড়া দেয়া ও সাওয়াব দেয়া এ দু'টির জন্য। এভাবে সর্বসাধারণের ব্যাপারে আসা 'কুরব' দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়নি, আল্লাহর বাহিনী ফিরিশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তাফসীরে ইবনে কাসীর দেখা যেতে পারে। তাছাড়া এটিই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বিভিন্ন গ্রন্থে সাব্যস্ত করেছেন।

৬৫৫. আল্লাহ 'আমর ইবন উসমান' রাহিমাহুল্লাহকে ক্ষমা করুন। আমরা আগেই জেনেছি যে, আল্লাহ তা'আলাকে দূরবর্তী গুণে গুণান্বিত করা যাবে না। এ গুণটি আল্লাহর জন্য কুরআন ও হাদীসে সাব্যস্ত হয়নি।

৬৫৬. 'আমর ইবন উসমান আল-মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ'র এ বক্তব্য যে গ্রন্থ থেকে শাইখুল ইসলাম নিয়েছেন তা বর্তমানে হারিয়ে গেছে। তবে অন্য যেসব কিতাবে তা এসেছে তন্মধ্যে রয়েছে:
১- আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (১০/২৯১-২৯২)।
২- খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১/২২৩-২৩৪)।
৩- সুলামী, ত্বাবাক্বাতুস সূফিয়্যাহ, পৃ. ২০২।
৪- যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, পৃ. ১৫৫।
৫- মুখতাসারুল উলু, ২২৯-২৩০।
৬- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৭৪।
৭- ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/২২৬)।
৮- মানাওয়ী, আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফী তারাজিমিস সাদাতিস সূফিয়্যাহ, পৃ. ২৫৯।
৯- শা'রানী, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (১/৯৮)।
তবে অনেকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ বিস্তারিত নিয়ে এসেছেন।

[قول الحارث المحاسبي]:

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى:

[হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী এর বক্তব্য]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-হারিস ইবন ইসমা'ঈল ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী(৬৫৭) তাঁর

৬৫৭. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ আল-হারেস ইবন ইসমা'ঈল ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী, আল-আনাযী, আল-বাগদাদী। মুহাসেবী অর্থ হিসাব গ্রহণকারী। তাকে মুহাসেবী বলার কারণ হচ্ছে তিনি প্রচুর পরিমাণে নিজের হিসাব গ্রহণ করতেন। তিনি তার যুগে ফিকহও তাসাওউফের ইমাম বিবেচিত হতেন। তবে পরহেযগারী ও দুনিয়াবিমুখতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি হাদীস শুনেন ইয়াযীদ ইবন হারূন থেকে, আর তার থেকে হাদীস শুনেন ইবন মাসরূক, আহমাদ আল-কাসেম, জুনাইদ, আহমাদ ইবনুল হাসান আস-সূফী প্রমুখ।

তার সম্পর্কে খত্বীব বলেন, 'যুহদ, দীনের মূলনীতি, মু'তাযিলা ও রাফেদ্বী শিয়াদের মতামত খণ্ডন নিয়ে তার অনেক গ্রন্থ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, 'মুহাসেবী অনেক বড় মর্যাদাবান মানুষ ছিলেন, কালামশাস্ত্রে তার কিছু অনুপ্রবেশ ছিল, ফলে তার ওপর সেটা দোষণীয় হয়েছিল। আর ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল থেকে তার ব্যাপারে একদিকে যেমন প্রশংসা এসেছে, অপর দিকে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশনাও এসেছে।

তিনি তার পিতার সাথে মতবিরোধে ছিলেন; কারণ তার পিতা কুরআন সৃষ্ট কী না? এ মাস'আলাতে মতামত দেয়া থেকে বিরত ছিলেন। তার পিতা কুরআনকে সৃষ্টও বলতেন না, আবার অসৃষ্টও বলতেন না। ফলে আল-হারেস তার পিতার এ কাজকে অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি বলা হয় যে, তিনি তাঁর পিতার থেকে ওয়ারিশ হিসাবে কিছু গ্রহণ করেননি। এ হিসাবে যে দু' মিল্লাতের লোকেরা পরস্পর ওয়ারিস হয় না।

হিজরী ১৭০ সালে তার জন্ম হয়, আর হিজরী ২৪৩ সালে তার মৃত্যু হয়।

তাঁর অনেক গ্রন্থের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে, হিদায়াতুল মুস্তারশিদীন, (বর্তমানের এর নাম রিসালাতুল মুস্তারশিদীন), আদাবুন নুফূস, কিতাবুত তাওয়াহহুম, কিতাবুল ইলম, কিতাবুর রি'আয়াহ; মুহাসাবাতুন নুফূস, ফাহমুল কুরআন, আল-আক্বল।

যেমনটি আগেই বলেছি, তিনি কিছুটা ইলমে কালাম চর্চা করেছিলেন, তাতে গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্লাব এর মতাদর্শ অনুযায়ী আল্লাহর সত্তার সাথে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতানুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছাকৃত কোনো কিছু সংশ্লিষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করতেন। আর এজন্যই ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আল-হারেসকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য বলা হয়ে থাকে যে, আল-হারেস ইবন আসাদ সেসব থেকে ফিরে এসেছিলেন। তাছাড়া তাসাওউফের বিবিধ বিষয়েও জড়িত ছিলেন ও গ্রন্থ লিখেছেন, সেজন্যও হয়তো ইমাম আহমাদ তার থেকে সাবধান করেছেন।

সা'ঈদ ইবন 'আমর আল-বিরয'ঈ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবু যুর'আহ আর রাযীকে আল-হারেস আল-মুহাসেবী ও তার গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, 'তুমি এসব কিতাব থেকে বেঁচে থাক। এসব হচ্ছে বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট গ্রন্থ। তুমি আছার (কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের ভাষ্য) গ্রহণ করে, সেগুলো তোমাকে এসব গ্রন্থ থেকে বিমুখ করে দিবে। তোমাদের কাছে এমন কিছু পৌঁছেছে যে মালেক, সাওরী ও আওযা'ঈ এসব অন্তরে আসা জিনিস ও ওয়াসওয়াসা নিয়ে লিখেছে? মানুষ কত তাড়াতাড়ি বিদ'আতের দিকে ধাবিত হচ্ছে!

বস্তুত আল-হারেস আল-মুহাসেবী তাসাওউফের দিকে আহবান জানাতেন। তবে তার আহ্বানকে তিনি ওহীর অনুগামী করতেন। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, তিনি তাসাওউফকে হাদীসশাস্ত্র ও কালামশাস্ত্রের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। তার থেকে এমন সব সূক্ষ্ম পরহেযগারীর বর্ণনা এসেছে যাতে তার কোনো সালাফ ছিল না। এজন্য বহু আলেম যেমন, ইমাম আবু যুর'আহ, ইমাম আহমদ তার কর্মকাণ্ড পছন্দ করতেন না। ফলে তার মৃত্যুর পর স্বল্প সংখ্যক লোকই তার জানাযায় শরীক হয়েছিল। ইমাম গাযালী বলেন, কালামশাস্ত্রে নিজেকে সম্পৃক্ত করার কারণে ইমাম আহমাদ তার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, মূলত কালামশাস্ত্রের জন্য তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ সাবধান করেছেন সেটা নয়, বরং ইবন কুল্লাবের মত গ্রহণ করার কারণে ইমাম আহমাদ তাকে অপছন্দ করতেন। তবে তিনি ও তার সাথীরা আল্লাহর জন্য 'উলু সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া সাব্যস্ত করতেন। যদিও

«فَهْم القرآن» قال في كلامه على . الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار .
قال: «لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء».

'ফাহমুল কুরআন' গ্রন্থে 'আন-নাসেখ ওয়াল মানসূখ' আলোচনার মধ্যে বলেন, "আর সংবাদের মধ্যে নাসখ জায়েয নেই।(৬৫৮)" তিনি বলেন, "কারও জন্য এই বিশ্বাস করা জায়েয নেই যে, আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর নাম ও গুণাবলির কিছু মানসূখ হতে পারে।"(৬৫৯)

তারা সেটা বিবেকের দাবি থেকে সাব্যস্ত করেছেন, নসের মাধ্যমে নয়। তাছাড়া তারা মূলনীতির দিক থেকে আল্লাহর কর্মগত গুণকে সাব্যস্ত না করার কথাই বলতো।
আশ্চর্যের বিষয়, সূফী আলেম সিররী আস-সাকত্বী নিষেধ করতেন জুনাইদ আল-বাগদাদীকে আল-হারেস আল-মুহাসেবীর এসব বক্তব্য গ্রহণ করা হতে।
অবশ্য ইমাম আবু বকর আল-কালাবাযী তাঁর আত-তা'আররুফ লি মাযাহিবিত তাসাওউফ গ্রন্থে সাব্যস্ত করেছেন যে, আল-হারেস আল-মুহাসেবী রাহিমাহুল্লাহ ইবন কুল্যাব এর নীতি থেকে বিশুদ্ধ আক্বীদায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা স্বর ও বর্ণ দ্বারা কথা বলেন।
দেখুন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (১০/৭৩); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৮/২১১); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/১১০); তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (২/৩৭); ফুয়াদ সাযকীন, তারীখুত তুরাস (৪/১১৩)।
বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৭/১৪৭-১৪৯), (২/৬); আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১০৩), (৫/৪১১, ৫৩৩), (৬/৫২১), (৭/৪৩৩), (৮/৪৯৬-৪৯৭), (১০/৩৬১), (১২/৯৫, ৩৬৮)। অনুরূপ ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১০/৩৪২); তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (২/২৭৭)।

৬৫৮. ইবনুল জাওযী তাঁর নাওয়াসিখুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, পৃ. ৯৩, 'কোনো সংবাদ (আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন) সেটার ওপর নাসখ বা রহিত হওয়ার বিষয়টি আপতিত হয় না। কারণ এটি মিথ্যার দিকে ধাবিত করে আর তা অসম্ভব।... শেষে বলেন, আবু জা'ফর আন-নাহহাস বলেন, 'আল্লাহর দেয়া কোনো সংবাদে নাসখ বা রহিতকরণ' এটি মারাত্মক কথা, যার পরিণতি কুফরীর দিকে নিয়ে যাবে। কারণ কোনো বক্তা যদি বলেন, অমুক দাঁড়িয়েছে, তারপর বলেন, দাঁড়ায়নি, আর বলে যে, আমি আগের কথা রহিত করলাম, সে তখন মিথ্যাবাদী হবে। এখানেও হারেস আল-মুহাসেবী বর্ণনা করছেন যে, দু'টি অর্থে নাসখ বা রহিত করার বিষয়টি আপতিত হবে না, তা হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণে এবং আল্লাহর সংবাদে। আর তিনি এসব বিষয়ে রহিত বলাকে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দেখুন, ফাহমুল কুরআন, পৃ. ৩৩২।

৬৫৯. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাওহীদের বিধিবিধান, যাতে সকল রাসূলগণের দাওয়াত একত্রিত হয়েছে, তাতে নাসখ বা রহিতকরণের প্রবেশ অসম্ভব। দেখুন, বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ (১/২৪৮)। সুতরাং যেগুলো শুধু সংবাদ যেমন গায়েবী বিষয়াদি, পূর্ববর্তী উম্মতদের বিভিন্ন সংবাদ, আল্লাহ সম্পর্কে প্রদত্ত খবর, এগুলো দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়গুলোতে কোনোভাবেই নাসখ বা রহিতকরণ প্রবেশ করতে পারে না। কারণ কোনো সংবাদদাতা কোনো ঘটনা ঘটেছে বা ঘটবে সে সংবাদ দেয়ার পরে যদি সে সংবাদ থেকে ফিরে আসে তখন ফিরে আসার দু'টি কারণ থাকতে পারে:
এক. নিজের ওপর মিথ্যার অপবাদ ডেকে আনা।
দুই. নিজে সে সংবাদ দিয়েছে তাতে ভুল করা অথবা তা ভুলে যাওয়া।
আল্লাহর তা'আলা উপরোক্ত দু'টি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর শরী'আতও এমন কিছু থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। কারণ কুরআন সেটার ওপর প্রমাণবহ, যেমন আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই; অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্যবাদী কে?" [সূরা আন-নিসা: ৮৭], "আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আমরা তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আল্লাহর চেয়ে কথায় সত্যবাদী?" [সূরা আন-নিসা: ১২২] তাছাড়া বিবেকের যুক্তিও তার ওপর প্রমাণবহ, আর তা হচ্ছে, মিথ্যা হচ্ছে ত্রুটি, আল্লাহর ব্যাপারে ত্রুটি সাব্যস্ত করা অসম্ভব।
দেখুন, ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৩/২১৫); সাম'আনী, কাওয়াতি'উল আদিল্লাহ (১/৪২৩);

إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك.

فإذا عرفتَ ذلك واستيقنته: علمتَ ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره؛ كقوله عن فرعون: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ﴾ [يونس: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [محمد: ٣١].

তিনি আরও বলেন, "অনুরূপভাবে যখন বলা হয় তাঁর সিফাতসমূহ সুন্দর ও উন্নত, তখন এই সংবাদ দেয়া জায়েয নেই যে, সেগুলো নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের। কাজেই তিনি (আল্লাহ) সকল গায়েবী বিষয় জানেন, এই সংবাদ দেয়ার পর নিজের বর্ণনা এভাবে দেয়া যে, তিনি কোনো কোনো অদৃশ্য জানেন না, তিনি সব দেখেন না, আওয়াজ শুনেন না, তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই, তিনি কথা বলেন না, তাঁর থেকে কোনো কথা সংঘটিত হয়নি, তিনি যমীনের নিচে 'আরশের উপরে নয়, এসব থেকে তিনি মহান ও ঊর্ধ্বে।

অতঃপর যখন তুমি এটা বুঝলে এবং দৃঢ় বিশ্বাস করলে, তখন ভালো করেই জানতে পারলে যে, কিসে নাসখ (রহিতকরণ) জায়েয আর কিসে জায়েয নেই।" সুতরাং তুমি যদি কোনো আয়াত প্রকাশ্য তিলাওয়াতের মাধ্যমে পড়ো তবে মনে হবে যে, এটা আল্লাহর কোনো সংবাদকে রহিত করে দিয়েছে; যেমন ফির'আউন সম্পর্কে তাঁর বাণী:

﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ﴾ [يونس: ٩٠]

"পরিশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল তখন বলল, আমি ঈমান আনলাম"(৬৬০) [সূরা ইউনুস: ৯০] অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [محمد: ٣١]

"আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১](৬৬১)

যারকাশী, আল-বাহরুল মুহীত্ব (৪/৯৮); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৫/২৯)।

৬৬০. অর্থাৎ এখানে আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, ফির'আউন যখন ডুবে মরতে লাগল, তখন বললো: 'আমি ঈমান আনলাম' [সূরা ইউনুস: ৯০] এ আয়াতটিতে ফির'আউনের সর্বশেষ অবস্থার সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তাহলে কি এ আয়াত দ্বারা ফির'আউনের পূর্বে সংঘটিত বক্তব্য 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো রব্ব আমি জানি না' [সূরা আল-কাসাস: ৩৮] অনুরূপ তার কথা 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব্ব' [সূরা আন-নাযি'আত: ২৪] এর জবাবে আসা আল্লাহর বাণী 'অতঃপর আল্লাহ তাকে আগের ও পরের কথার জন্য কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলেন' [সূরা আন-নাযি'আত: ২৫] এ সংবাদ কি রহিত হয়ে যাবে? এ রহিত হওয়ার কথা কোনো কোনো জাহমী, মুরজিয়া ও সূফী (যেমন ইবন আরাবী) বললেও এটি আসলে যে শুদ্ধ নয় তা বর্ণনা করাই আল-হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবীর উদ্দেশ্য। কারণ সংবাদে কোনো নাসখ বা রহিতকরণ প্রবেশ করে না। [হামাদ আত-তুওয়াইজরী, শারহু ফাতওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ আল-কুবরা, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫]

৬৬১. এ আয়াতে আসা 'ইলম' বা জানার অর্থ সম্পর্কে আল-হারেস আল-মুহাসেবী পরে আলোচনা আবার

وقال: قد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود:٩٨]، وقال:

তিনি বলেন, 'এক সম্প্রদায় (ফির'আউন সংক্রান্ত আয়াতের) এ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, জাহান্নাম থেকে ফির'আউনের শরীরকে মুক্তি দেয়া; কেননা সে ডুবার সময় ঈমান এনেছিল। তারা বলে, আল্লাহ তো উল্লেখ করেছেন, ফির'আউন সম্প্রদায় জাহান্নামে যাবে, ফির'আউন নয়।(৬৬২) আল্লাহ বলেছেন:

করবেন। আগে ফির'আউন বিষয়ক সমস্যা তুলে ধরে তার উত্তর প্রদান করবেন।

৬৬২. আল-হারেস আল-মুহাসেবী এখানে যে দিকটির কথা আলোচনা করছেন সেটা সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, সূফীদের মধ্যকার কিছু যিনদীক গোষ্ঠী মনে করে ফির'আউন ঈমানের ওপর মারা গেছে আর তাকে আখেরাতে 'আযাব দেয়া হবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, তাকে ডুবানো হয়েছে যাতে তার ইসলামের নিয়মে গোসল হয়ে যায়! তারা এসব কথার ওপর দলীল হিসেবে আল্লাহর বাণী 'অতঃপর সে তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করালো'। [সূরা হূদ: ৯৮] পেশ করে থাকে। তারা বলে, সে তাদেরকে প্রবেশ করিয়েছে, কিন্তু নিজে প্রবেশ করেনি। আর তারা আরও দলীল নেয় আল্লাহর বাণী: 'তোমরা ফির'আউনের পরিবারকে প্রবেশ করাও' [সূরা গাফির: ৪৬] তারা বলে, ফির'আউন তো আর ফির'আউনের পরিবার নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, ফির'আউন জাহান্নামে আগুনে প্রবেশ করার বিষয়টি মুসলিম, ইয়াহূদী ও নাসারাদের দীনের অবশ্যম্ভাবী অংশ হিসেবে সকলেই জানে। আর কুরআন পূর্ণ প্রায় চল্লিশ স্থানে এর ওপর প্রমাণবহ। যেখানে আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবের কথা বলেছেন। আর আল্লাহর বাণী, "সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের সামনে থাকবে। অতঃপর সে তাদেরকে আগুনে উপনীত করবে। আর যেখানে তারা উপনীত হবে তা উপনীত হওয়ার কত নিকৃষ্ট স্থান!" [সূরা হূদ: ৯৮] এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সে তার জাতির নেতৃত্ব দিয়ে সামনে থেকে জাহান্নামের আগুনে তাদের নিক্ষেপ করবে, তারা ততক্ষণ প্রবেশ করবে না যতক্ষণ সে প্রবেশ না করছে। তারপরও যদি (তর্কের খাতিরে) ধরে নেয়া হয় যে, এ আয়াতে তার জাহান্নামের আগুনে ঢুকার প্রমাণ নেই তবে অন্যান্য বহু আয়াত তার জাহান্নামে প্রবেশের ওপর প্রমাণবহ।

আর তারা যে বলে যে, ফির'আউন তো আর ফির'আউনের বংশধর নয়, এটা তাদের আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এসেছে। এজন্য নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতকে সুদৃঢ় করেননি। বরং তিনি তাঁর আয়াতকে অবশ্যই সুদৃঢ় করেছেন। বরং একজন যখন বলে, অমুক পরিবার, তখন তাতে সে ব্যক্তি অবশ্যই প্রবেশ করবে, আর তার সাথে প্রবেশ করবে যারা তার পরিবারের সদস্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ্ ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর মনোনীত করেছেন।" [সূরা আলে ইমরান: ৩৩] অনুরূপ আল্লাহর বাণী "অতঃপর ফিরিশতাগণ যখন লূত পরিবারের কাছে আসল, তখন লূত বললেন, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক'।" [সূরা আল-হিজর: ৬১-৬২] এখানেও লূত অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিলেন। সুতরাং লূত অবশ্যই আলে লূত এর অন্তর্ভুক্ত। যেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাসান ইবন আলীকে সাবধান করা হয়েছিল এই বলে যে, 'أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد' 'তুমি কী জান না যে মুহাম্মাদ পরিবারের জন্য সাদাকা হালাল নয়?' এখানেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আলে মুহাম্মাদ এর অন্তর্ভুক্ত। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৮/৩৭১)।

তাছাড়া ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর একটি আলাদা পুস্তিকা রয়েছে যাতে তিনি ইবন আরাবী আল-হাতেমী (তথাকথিত শাইখে আকফর) কর্তৃক ফির'আউনের ঈমান দাবি করাকে খণ্ডন করেছেন। দেখুন, জামে'উর রাসায়িল (১/৩৭১)।

ইমাম ইবন কাসীর বলেন, আল্লাহর বাণী, 'আজকের দিনে আমরা তোমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখবো, যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার' [সূরা ইউনুস: ৯২] এর তাফসীরে বলেন, বনী ইসরাঈলের কেউ কেউ ফির'আউনের মৃত্যুর বিষয়ে সন্দেহ করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা চাইলেন

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [غافر:٤٥]، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ [النازعات:٢٥]، وكذلك

﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: ٩٨]

"সে তাদেরকে জাহান্নামে নামালো।" [সূরা হূদ: ৯৮] অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٥]

"ফির'আউন পরিবারকে নিকৃষ্ট শাস্তি পরিবেষ্টন করল।" [সূরা গাফির: ৪৫] তিনি তো বলেননি যে, ফির'আউনকে।[৬৬৩]

আল-হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী বলেন, এভাবেই আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলা হয়; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝﴾ [النازعات: ٢٥]

"আল্লাহ তাকে শেষ ও প্রথমটির শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।" [সূরা আন-নাযি'আত: ২৫][৬৬৪]

অনুরূপ তার বাণী:[৬৬৫]

তাদের কাছে তার মরা শরীরটি দেখাবেন। তাই তিনি তাদের জন্য ফির'আউনের মরা শরীরটি বের করে দিলেন, অথবা সমুদ্রকে বলার পর সমুদ্র সেটাকে তীরে নিক্ষেপ করলেন। এভাবে আল্লাহ ফির'আউনের দেহ বাঁচিয়ে রাখার কারণ বর্ণনা করলেন। কিন্তু এ সময়ে তার ঈমানের বিষয়টি যে গ্রহণযোগ্য হয়নি সেটি তো আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসে নিজেই বলে দিয়েছেন যে, 'এখন! তুমি তো ইতোপূর্বে ঘোর অবাধ্য ছিলে' [সূরা ইউনুস: ৯১] সুতরাং ফির'আউনের ঈমান আনার সংবাদ শুদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, আর তাই তাতে নাসখও নেই।

৬৬৩. এতটুকু হচ্ছে তথাকথিত জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া ও দুষ্ট নাস্তিক টাইপের তাসাওউফপন্থী কোনো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ফির'আউনের নাজাত প্রাপ্তির ওপর প্রমাণ পেশ করার অপচেষ্টার বর্ণনা। এরপরেই আল-হারেস আল-মুহাসেবী তার বক্তব্য পেশ করেছেন।

৬৬৪. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনকে কঠিন 'আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছেন। কারণ সে নিজেকে তার প্রজাদের বড় রব্ব বলে দাবি করেছিল, নিজের জন্য এ রুবুবিয়্যাতের আহ্বান জানিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা তার এ আহ্বানকেই সরাসরি কুফর হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন, আল্লাহ বলেন, "কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অবাধ্য হলো। তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো। অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে ঘোষণা দিল, অতঃপর বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব্ব। অতঃপর আল্লাহ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।" [সূরা আন-নাযি'আত: ২১-২৫] আলেমগণ বলেছেন, শেষটি ও প্রথমটি দ্বারা যা বুঝিয়েছেন তা হচ্ছে, প্রথমটি হচ্ছে তার সে কথাটি যা সে পূর্বে বলেছিল, "আর ফির'আউন বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে জানি না! অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর; হয়ত আমি সেটাতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পারি। আর আমি তো মনে করি, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আল-ক্বাসাস: ৩৮] আর দ্বিতীয় কথাটি ছিল "অতঃপর বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব্ব।" [সূরা আন-নাযি'আত: ২৪] আর তার এ দ্বিতীয় কথাটি অবশ্যই প্রথম কথার চেয়ে জঘন্য ছিল।' দেখুন, আস-সাব'ঈনিয়্যাহ, (বুগইয়াতুল মুরতাদ) পৃ. ৩৮০; আরও দেখুন, জামে'উর রাসায়েল (১/২১১)।

৬৬৫. এখান থেকে পরবর্তী পৃষ্ঠায় তিনি পূর্বের আয়াতে বর্ণিত, "যাতে আমরা জেনে নিই তোমাদের মধ্যকার কারা মুজাহিদ ও কারা সবরকারী" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১], তদ্রূপ "অতঃপর অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন সত্যবাদীদের" [সূরা আল-'আনকাবূত: ৩] ও অনুরূপ আয়াতে যেখানে যেখানে আল্লাহ তা'আলার 'জেনে নেয়া' কথাটি কুরআনে এসেছে তার জবাব প্রদান করছেন।

قوله تعالى: ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ [العنكبوت:٣] فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علمًا بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر

﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ [العنكبوت: ٣]

"আর অবশ্যই আল্লাহ্ জানবেন, কারা সত্যবাদী।" [সূরা আল-'আনকাবূত: ০৩] এখানে আয়াতটি তিলাওয়াত করা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর জন্য ইলম নতুন করে হওয়াকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি কোনো কিছুর ইলম নতুন করে নিচ্ছেন।[৬৬৬] মহান আল্লাহ্ নতুন করে কোনো কিছু জানা থেকে পবিত্র[৬৬৭]; কেননা যিনি কোনো কিছু

---

৬৬৬. অর্থাৎ আয়াত থেকে বাহ্যিকভাবে হয়ত কেউ বুঝতে পারে যে, এসব বিষয়ে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান বিগত সময়ে ছিল না, আল্লাহ তা অর্জন করতে যাচ্ছেন। যেন এটা বলতে যাচ্ছেন যে, 'অতঃপর অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন' ভবিষ্যতে 'যারা সততা অবলম্বন করেছে'। আর এজন্যই আল-হারেস আল-মুহাসেবীর 'ফাহমুল কুরআন' গ্রন্থে এ কথার পরে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য তিলাওয়াতের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ মুজাহিদদের জিহাদ, সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা, মিথ্যবাদীদের মিথ্যাশ্রয়িতা নতুন করে জানছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর ইলম নতুন করে নিবেন তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এর অর্থ হচ্ছে, আল-হারেস আল-মুহাসেবী বলতে চাচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য যে তিনি কোনো কিছু পরে জানবেন যা তিনি পূর্বে জানতেন না। কারণ তিনি অন্য অনেক আয়াতে বলেছেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞানী, যা গত হয়েছে তা তিনি জানেন, যা আসবে ও ঘটবে তাও তিনি জানেন। তাহলে বুঝা গেল যে, (অতঃপর অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন সত্যবাদীদের... বা অনুরূপ) আয়াতে প্রদত্ত সংবাদ কখনও আল্লাহর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞ হওয়া সংক্রান্ত আসা আয়াতগুলোর সংবাদকে নাসখ বা রহিত করবে না। কারণ সংবাদের মধ্যে রহিতকরণ চলে না। [হামাদ আত-তুওয়াইজরী, শারহুল ফাতাওয়া আল-হামাওয়িয়্যাতুল কুবরা, পৃ. ৩৮৫]

তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা কী হবে? আয়াতের অর্থ কী? তিনি বলেন, এটা সর্বজন স্বীকৃত আবশ্যক বিষয় যে, যিনি কোনো কিছুকে কী করতে ইচ্ছা করেছেন সেটা না জানবেন তিনি সেটা করতে সমর্থই হবেন না। অথচ আল্লাহ তা'আলা পূর্ব জ্ঞান দ্বারা গুণান্বিত। কোনো কিছু অস্তিত্বে আসা ও সৃষ্টি হওয়া কেবল তখনই সম্ভব যখন তিনি সেটা সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত থাকবেন। কারণ যে জিনিস অজ্ঞাত অর্থাৎ যে জিনিস সম্পর্কে তুমি কিছু জানবে না, (আর আল্লাহর জন্য তো রয়েছে সর্বোচ্চ উদাহরণ) সে জিনিস তুমি কখনও অস্তিত্বে আনতে কিংবা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। কোনো মানুষ যদি লিখতেই না জানে বা ভালো করে লিখাই না জানে তাহলে সে কি এমন কোনো বই রচনা করতে পারে যা অর্থপূর্ণ, যার শব্দ গাঁথুনি যথার্থ? কখনও নয়। অবশ্যই যা লিখবে সেটা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান থাকতে হবে, তারপরই একজন মানুষ তা লিখতে পারে। আর আল্লাহ তা'আলা তিনি তো মহান ও সর্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁর জ্ঞান নতুন করে অর্জিত হবে এমন কথা বলা কখনো শোভনীয় নয়। তিনি এমন নন যে কোনো কিছু না জানার পরে সেটা সম্পর্কে জানবেন।

৬৬৭. মুহাসেবী এখানে আল্লাহর প্রাচীন কাদীম আযালী ইলম সাব্যস্ত করছেন। এর মাধ্যমে তিনি সেসব চরমপন্থী কাদরিয়্যা ফির্কার লোকদের চিন্তা-চেতনার রদ্দ করছেন যারা আল্লাহর কাদীম আযালী ইলম অস্বীকার করে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর জ্ঞান ভবিষ্যত বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে এমন লোকদের তিনটি মত রয়েছে:

১) তিনি (আল্লাহ) ভবিষ্যত বিষয়াদি জানেন তাঁর প্রাচীন কাদীম ইলমের মাধ্যমে, যে ইলম তার সত্তার সাথে অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িত। নতুন কোনো কিছু হলে সেখানে কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্য জড়িত হয় না। কেবলমাত্র তাতে ইলম (জ্ঞান) ও মা'লুম (জানা বিষয়) এর মাঝে একটি সম্পর্ক তৈরী হয় মাত্র। এমতটি কুল্যাবিয়্যাহ, আশ'আরিয়্যাহদের এক গোষ্ঠীর অভিমত। তাদের সাথে একাত্ম হয়েছেন বেশ কিছু ফকীহ, সূফী ও বেশ কিছু আহলুল হাদীস, ইমাম আহমাদ, শাফেঈ, মালেক ও আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র অনেক অনুসারী (উল্লেখ্য যে, মুহাসেবীও এ মতের

সৃষ্টি করতে চান তার যদি সেটার জ্ঞান না থাকে তাহলে সে তা সৃষ্টি করতে পারে না। আর এ কথাটি অত্যাবশ্যকভাবে আমরা পাই; কারণ আল্লাহ বলেন:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ⑭﴾ [الملك: ١٤]

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুলক: ১৪][৬৬৮]

প্রবক্তা)।

২) তিনি (আল্লাহ) নতুন কোনো কিছু ঘটার আগে তা জানেন না, এটি মূলত চরমপন্থী কাদারিয়্যাহ মতবাদের লোকদের অভিমত। যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানেন না, যতক্ষণ তা সংঘটিত না হচ্ছে। কেবল সংঘটিত হওয়ার পরই তিনি তা জানতে পারেন। আর যে কোনো কাজ একেবারে নতুনভাবে ঘটে। তাকদীরে কোনো দুর্ভাগা কিংবা সৌভাগ্যের কথা আগে লিখা হয়নি। এরা হচ্ছে চরমপন্থী কাদারিয়্যাহ ফের্কার লোক, ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর জীবনের শেষ সময়ে যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তখন ইবন 'উমার তাদের থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করেছেন। মালেক, শাফে'য়ী, আহমাদ এ ইমামগণ উক্ত সম্প্রদায়কে কাফের বলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন।

৩) তিনি সবকিছু ঘটার আগেই প্রাচীন ইলমের মাধ্যমে জানেন, আবার তিনি অপর এক ইলমের মাধ্যমে ঘটনা ঘটার সময় জানেন। বস্তুত এ মতটিই হক্ক ও সত্য। এ ব্যাপারে দেখুন, জামেউর রাসায়িল (১/১৭৭); রিসালাতুন ফী তাহকীকে মাসআলাতি ইলমিল্লাহ।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আর সকল সালাফে সালেহীন, সুন্নাহ ও হাদীসের সকল ইমাম এ মতের উপর যে, নতুন করে ঘটা একটি সাব্যস্ত জিনিস, যেমনটি কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য থেকে বুঝা যায়। আর এটি একটি কারণ যার ফলে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ হারেস আল-মুহাসেবীকে পরিত্যাগ করেছিলেন; কারণ হারেস আল-মুহাসবী নতুন করে ঘটা কাজের বাস্তবতা অস্বীকার করেছেন। তিনি ইবন কুল্লাবের মত অনুযায়ী চলতেন ও বলতেন, ফলে তিনি সাব্যস্ত হওয়া কাজটি নতুন করে হচ্ছে সেটা সাব্যস্ত করতেন না, সেটার দাবিকে মানতেন, (অর্থাৎ আল্লাহ জেনে নেন এ কথাটি বলতেন না, জেনে নেওয়ার দাবি অনুযায়ী প্রকাশ করা কিংবা সেটার পরিণতি নির্ধারণ করার কথা বলতেন)। এভাবে তিনি কুরআন, হাদীস, সালাফে সালেহীন আছার এসবের বিরোধিতা করলেন, যার ফলে একটি আকিতাগত বিদ'আতের অনুপ্রবেশ আবশ্যক হয়ে পড়ে, যে কারণে ইমাম আহমাদ তাকে ত্যাগ করা ও তার থেকে লোকদের সাবধান করা জরুরী মনে করেছেন।..." দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৪৯৬)।

৬৬৮. এ আয়াত দিয়ে আল-হারেস আল-মুহাসেবী সেসব লোকদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করেছেন, যারা মনে করতো যে আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর অস্তিত্ব লাভের পর তা জানতে পারেন। অর্থাৎ তিনি অবশ্যই জানেন, কারণ তিনি তো সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা না জেনে কীভাবে সৃষ্টি করেন? তাছাড়া তাঁর নাম হচ্ছে লাত্বীফ বা সূক্ষ্মদর্শী, খবীর বা যথার্থ খবরদার। তাঁর জ্ঞান অবশ্যই তাঁর দ্বারা সেটি সৃষ্টি করার আগেই বিদ্যমান।

কেননা, কোনো কিছু সৃষ্টি করা দাবি করে যিনি সৃষ্টি করবেন তিনি সেটার ইচ্ছা করবেন আর ইচ্ছা করা দাবি করে যে তিনি সেটা জানেন, সুতরাং সৃষ্টি করা দাবি করে যে, তিনি অবশ্যই জানেন।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "সৃষ্টি জ্ঞানকে আবশ্যক করে, যেমন আল্লাহ বলেছেন" 'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না, অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আল-মুলক: ১৪] আর এটা জন্য যে, সৃষ্টি করা দাবি করে যে, স্রষ্টার সেখানে ইচ্ছা কাজ করেছে। কারণ কোনো কিছুকে বিশেষ গুণাবলি, বিশেষ পরিমাণ দিয়ে সৃষ্টি করে অন্য কিছু থেকে ভিন্নতর করা তখনই সম্ভব যখন সেখানে এমন কোনো ইচ্ছা থাকবে যা এরকম বিশিষ্ট রূপ প্রদান করবে। আর ইচ্ছা করা ইলম (জ্ঞান) থাকা আবশ্যক করে, কারণ ইচ্ছাকারী তো কেবল তাই ইচ্ছা করবে যা অনুভূতিতে ধরা পড়ে ও যার সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা আছে। অনুভূতি ব্যতীত ইচ্ছা অসম্ভব। তাছাড়া স্বয়ং সৃষ্টি অর্থাৎ মানব সৃষ্টি, সেটা মানুষের মাঝে এমন এক কর্ম যা সৃষ্টিকুলের মাঝে

قال: وإنما قوله ﴿حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ﴾ إنما يريد حتى نراه، فيكون معلومًا موجودًا،

তাই তিনি (আল-হারেস আল-মুহাসেবী) বলেন, তাহলে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ﴾ [محمد: ٣١]

"যতক্ষণ না আমরা জেনে নিই(৬৬৯) তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীদেরকে।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১] এর অর্থ, যাতে আমরা (তাদের) দেখতে পাই।(৬৭০) ফলে তা জ্ঞাত ও অস্তিত্বশীল

সবচেয়ে বড় আশ্চর্যজনক। তাতে সবকিছু এত সুন্দর পরিপাটি ও সুদৃঢ় করা হয়েছে যে বিবেককে চমকে দেয়। আর এমন সুদৃঢ় ও পরিপাটি কাজ কেবল সে জ্ঞানী থেকে হওয়া সম্ভব, যিনি জানেন তিনি কী করেন। এটা অত্যবশ্যকভাবে জানা বিষয়।

সুতরাং সৃষ্টি অভিনবত্ব আল্লাহর জ্ঞানের ওপর প্রমাণবহ, এভাবেও যেমন তা প্রমাণিত হচ্ছে ঠিক ওভাবেও না প্রমাণিত হচ্ছে (অর্থাৎ স্রষ্টার দিক থেকেও, সৃষ্টির দিক থেকেও)। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মুলকে বলেন, 'তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সবিশেষ অবহিত'। এতে সৃষ্টির মাঝে সে সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা কার্যকর রয়েছে সেটার বর্ণনা রয়েছে। সে সূক্ষ্ম প্রজ্ঞাতে কার্যকর রয়েছে কীভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে প্রতিটি বস্তুকে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে।" মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৩৫৪); আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/২১১), (১৯/১৩০); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/২১৪)।

৬৬৯. এখানে বলা হয়েছে 'জেনে নিই' এ জানার ব্যাপারে অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য, এমন ইলম বা জ্ঞান যা কোনো (অস্তিত্বহীন) বস্তুর অস্তিত্বে আসার পরের সাথে সম্পৃক্ত হয়। যে ইলমটির সাথে প্রশংসা কিংবা নিন্দা, সাওয়াব কিংবা শাস্তি জড়িত হয়। এর বিপরীতে যে ইলম ছিল আযালী, তার সাথে কোনো প্রশংসা কিংবা নিন্দা, সাওয়াব কিংবা শাস্তি জড়িত হয় না। কারণ এ ইলমটি হয় কর্মটি অস্তিত্ব আসার পরে। এ মতটিই গ্রহণ করেছেন ইমাম ইবনুস সাম'আনী তার তাফসীরে (১/১৫০); বাগাওয়ী, মা'আলিমুত তানযীল (২/১৬০); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (১০/১৮৬); ইবনুল কাইয়্যেম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ; রশীদ রেদ্বা, তাফসীরুল মানার (২/৮); আমীন আশ-শানক্বীত্বী, দাফ'উ ঈহামিল ইদ্বত্বিরাব, পৃ. ২১৬; খালেদ আদ-দুমাইজী, আয়াতুল আকীদাহ আল্লাতী ইউহিমু যাহিরুহাত তা'আরুদ্ব (১/৩৪৮)।

৬৭০. এটি হচ্ছে গ্রন্থকার অথবা আল-হারেস আল-মুহাসেবী কর্তৃক এ আয়াতের করা তাফসীর। উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলার 'ইলম' দ্বারা এখানে 'রুইয়াহ' বা দেখা উদ্দেশ্য। এটি মূলত হারেস আল-মুহাসেবী ও তার মত কুল্লাবী, আশ'আরীদের অভিমত।

বস্তুত আল্লাহর বাণী 'লি না'লামা' এর অর্থ 'যাতে আমরা দেখে নিই' এ অর্থ করাতে কোনো সমস্যা আমাদের কাছেও নেই। কারণ 'ইলম' দেখার চেয়েও ব্যাপক, কারণ আল্লাহর ইলম অস্তিত্বহীন জিনিসের ব্যাপারেও হয়, তিনি অস্তিত্বহীন জিনিস আগে থেকেই জানেন, অনুরূপভাবে অস্তিত্বশীল জিনিসের ব্যাপারে 'ইলম' ব্যবহৃত হয়, আর সেটাকে 'দেখা' অর্থ করাতে যদি অস্তিত্বশীল জিনিসের অর্থে করা হয় তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ এটাও এক প্রকার 'ইলম'।

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও এমন তাফসীর বর্ণিত আছে। ইবন কাসীর বলেন, 'কারণ 'ইলম' (জ্ঞান) এমন একটি বিষয় যা অস্তিত্বশীল জিনিসের ক্ষেত্রেও হয়, আবার অস্তিত্বহীন জিনিসের ক্ষেত্রেও হয়।' [ইবন কাসীর (৬/২৬৩); অনুরূপ (২/১২৭)]

যেমন 'আমরা ইনশা'আল্লাহ আগামীকাল ক্লাসে পড়াতে আসব' এটা এখন আমার জ্ঞানে আছে, আর যখন আমরা আগামীকাল সত্যিই এখানে ক্লাসে হাজির হবো, তখন সেটাও জ্ঞান। সেটা হবে অনুভূত জ্ঞান। একই জিনিসের ক্ষেত্রে দু'টি জ্ঞান এখানে হওয়া সম্ভব। একটি অস্তিত্বে আসার আগে, আরেকটি অস্তিত্বে আসার পরে। কিন্তু 'রুইয়াহ' বা দেখা কখনো তা অস্তিত্বহীন জিনিসে হওয়া সম্ভব নয়, সেটা কেবল অস্তিত্বশীল জিনিসেই হওয়া সম্ভব। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা 'হাত্তা নারা আল-মুজাহিদীনা' অর্থাৎ 'যাতে আমি মুজাহিদদের দেখি' এটা বলেননি; কারণ যদি তিনি তা বলতেন তবে তা কেবল দৃশ্যমান অস্তিত্বশীল জিনিসকে শামিল করতো, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, "যতক্ষণ না আমরা জেনে নিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীদেরকে।" যাতে এটা স্পষ্ট করে বুঝে নেয়া যায় যে, আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান অস্তিত্বহীন বস্তুগুলোতে অস্তিত্বে আসার আগেও বিদ্যমান, যেমনিভাবে অস্তিত্বশীল

لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا من قبل أن يكون، ويعلمه موجودًا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدومًا موجودًا وإن لم يكن، وهذا المحال.

হবে। কারণ এটা জায়েয নয় যে কোনো বস্তু হওয়ার আগেই অস্তিত্বহীন হিসেবে জানবেন আবার সে বস্তুকে অস্তিত্বশীল হিসেবে জানবেন যা আগে জানা হয়ে গিয়েছে। তাহলে তো একই সময় তিনি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বশীল জানবেন, যদিও সেটা এখনো হয়নি। আর তা অসম্ভব।[৬৭১]

বস্তুসমূহেও তার জ্ঞান সমানভাবে বিদ্যমান।

তাহলে আল-হারেস আল-মুহাসেবী কর্তৃক এ আয়াতের 'হাত্তা না'লামা' এর ব্যাখ্যায় 'হাত্তা নারা' করার অর্থ হচ্ছে এটা বুঝানো যে, যাতে আমরা দেখে নিই বাস্তবে এসব মুজাহিদরা সত্যিই তা করেছে, যাতে তাদের সত্যবাদিতা প্রকাশ পায়, এর মাধ্যমে প্রকাশিত হবে যে, এরা সত্যিকার অর্থেই মুজাহিদ। আর কারা মুনাফিক। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বজ্ঞানে এসব কিছু আগে থেকেই জানেন।

আমরা আগেই বলেছি, হারেস আল-মুহাসেবীর সমস্যা হচ্ছে তিনি পরবর্তী ইলম সাব্যস্ত করেন না। তাই তিনি এ ব্যাখ্যাটি নিজের ওপর বাধ্য করে নিয়েছেন। অথচ এ ব্যাখ্যা করতে আমরা বাধ্য নই। কারণ যেমনটি আমরা আগেই জেনেছি, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহর ইলম অবশ্যই প্রাচীন, কাদীম, আযালী, যা অস্তিত্বহীন অবস্থার জ্ঞান। কিন্তু ঘটনা ঘটার সময় আরেক প্রকার ইলম হয়, যা অস্তিত্বশীল অবস্থার জ্ঞান। এর ফলে সেখানে অস্তিত্বহীন অবস্থার জ্ঞান আর অস্তিত্বশীল অবস্থার জ্ঞান একসাথ হয়। এভাবে দু'টি ইলম হওয়া দোষণীয় নয়।

অবশ্য ইমাম ইবন জারীর আত-ত্বাবারী এ জাতীয় স্থানে ভিন্নরূপ তাফসীর করেছেন, তিনি অর্থ করেছেন, 'যাতে আমার দলের লোকেরা ও আমার ওলীরা মুজাহিদদের জেনে নেন।' ইবন জারীর আত-তাবারী, আত-তাফসীর (১/৬০-৬১), (২/১৩), (২০/১২৯)। কারণ আমরা জানি যে অহুদের যুদ্ধের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুনাফিকদের বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। অতঃপর যখন বের হওয়ার পরে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই তার লোকদের নিয়ে বের হয়ে গেল তখনই সব স্পষ্ট হয়ে গেল। ইবন জারীর আত-ত্বাবারীর বক্তব্যের এটাই উদ্দেশ্য।

৬৭১. অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা একই সময়ে একই জিনিসকে অস্তিত্বহীন আবার অস্তিত্বশীল জানবেন। কারণ তা বিপরীতমুখী দু'টি জিনিসকে একত্রিত করার নাম। তাহলে কী দাড়ালো? আল্লাহ তা'আলা সেটাকে অস্তিত্বহীন জেনেছেন, তারপর যখন সেটা অস্তিত্বে আসল তখন সেটাকে অস্তিত্বশীল জানলেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু সম্পর্কে না জানা থাকার পরে জেনেছেন।

এ হচ্ছে আল-হারেস আল-মুহাসিবীর বক্তব্যের অর্থ। আমরা যদি এটা নিয়ে বেশি ভাবতে আরম্ভ করি তবে আরও বেশি গুলিয়ে ফেলব, এসব মূলত আল-হারেস আল-মুহাসিবীর ইলমুল কালামে প্রবেশের কুফল। এগুলো দ্বারা দীনের কোনো উপকার তিনি করেননি। কিছু মানুষের বিবেককে সমস্যাগ্রস্ত করেছেন মাত্র। এজন্যই ইমাম আহমাদ তার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। কারণ যারাই এগুলোতে একবার ঢুকেছে তারাই শান্তি নিয়ে তা থেকে বের হতে পারেনি। এগুলোর মুসলিমের কোনো কাজে লাগে না। যদি এতই প্রয়োজনীয় বিষয় হতো তবে অবশ্যই রাসূল বলতেন, সাহাবায়ে কিরাম বক্তব্য দিতেন, তাবে'য়ীরা উৎসাহ দিতেন, অথবা হিদায়াতের বিখ্যাত ইমামরা তাতে জড়াতেন। তারা এসব কারণেই ইলমুল কালাম থেকে নিজেরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন এবং অন্যদের সাবধান করেছেন।

বস্তুত হারেস আল-মুহাসেবীর সমস্যা হচ্ছে, তিনি আল্লাহর জন্য কাদীম আযালী 'ইলম' সাব্যস্ত করেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি অস্বীকার করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার হওয়ার সময় তা জানবেন। এর কারণ তিনি তার 'ফাহমুল কুরআন' গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন (যা ইবনে তাইমিয়্যাহ এখানে নিয়ে আসেননি)। সেখানে তিনি সে সন্দেহটিই উল্লেখ করেছেন যা তাবৎ কালামশাস্ত্রবিদরা আল্লাহর 'সিফাতে ফি'লিয়্যাহ ইখতিয়ারিয়্যাহ' বা কর্মগত ইচ্ছাকৃত গুণাবলির ব্যাপারে বলে থাকে, তা হচ্ছে এটা বললে তো 'হুলুলুল হাওয়াদিস' আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর তা তো আল্লাহর জন্য নিষিদ্ধ। বস্তুত এ একটি নীতির ওপর ভিত্তি করেই ইবন কুল্লাব ও তার অনুসারীরা আল্লাহর যাবতীয় সিফাতে ফি'লিয়্যাহ অস্বীকার করেছে।

সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন তা সংঘটিত হওয়ার আগেই, আর সে জানা তার কাদীম, আযালী জ্ঞানের মাধ্যমে, কিন্তু তিনি সেটা আবারও জানেন সংঘটিত হওয়ার পর। কারণ কুরআনে কারীম দশোর্ধ্ব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তিনি ঘটনা ঘটার পর তা জেনে নেন, অথচ তাঁর কাদীম জ্ঞানে জানা ছিল যে, সেটা অবশ্যই হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, দারউত্ত তা'আরুদ্ব (১০/১৮৬)।

এখানে হারেস আল-মুহাসেবী দাবি করেছেন, 'একই জিনিস কীভাবে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীন ও অস্তিত্বশীল জানবেন' এটা অসম্ভব। মুহাসেবীর এ 'অসম্ভব' দাবি করা অগ্রহণযোগ্য; কারণ কোনো বিষয়ের অস্তিত্বের একটি বিবেকীয় জ্ঞান থাকে, যেমনিভাবে কোনো বিষয়ের বাস্তব অস্তিত্ব থাকে, সুতরাং অস্তিত্বের স্তরের মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই আগে থেকেই জানেন যেমনটি তা বাস্তবে রয়েছে।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যারাই 'ইল্লা লি না'লামা', 'হাত্তা না'লামা ও অনুরূপ আয়াতসমূহে মাঝে সমস্যায় নিপতিত হয়েছে তার মূল কারণ হচ্ছে, তারা মনে করছে যে, এসব আয়াতে যদি 'জানা' অর্থ করা হয় তবে তো তা পূর্বে জানা থাকাকে অস্বীকার করা হয়। বস্তুত এটি তাদের মূর্খতা। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বহু জায়গায় এটা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি অবশ্যই জানেন যা হবে, তারপর তিনি যখন তা সৃষ্টি করেছেন তখন তা হওয়া অবস্থায় জেনেছেন, আর তা পূর্বে থাকা জ্ঞানের সাথেই যাতে তিনি জানতেন যে তা হবে।" দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল মানত্বিক্বিয়্যীন, পৃ. ৪৬৫।

সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার পর তার সাথে মহান আল্লাহর গুণাবলির সম্পৃক্ততা বিশাল একটি মাসআলা; কারণ মানুষ এ ব্যাপারে একমত যে, যেসব সম্পর্ক ও সম্বন্ধ মহান আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত নয়, তা নতুনভাবে হতে পারে। তবে তারা মতভেদ করেছে সেসব সম্পর্ক ও সম্বন্ধের ব্যাপারে যা মহান আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, সেটা কি রবের কৃত কোনো কিছু যা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত কোনো নির্দেশ ছাড়াই তাঁর সৃষ্টির মাঝে নতুন করে ঘটান, নাকি সেটার জন্য তাঁর সাথে সম্পৃক্ত কোনো নির্দেশ জড়িত থাকে? এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। কুল্লাবিয়্যাহ ও মু'তাযিলারা আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন কোনো নির্দেশের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে। অপরদিকে অধিকাংশ আহলুল হাদীস, অনেক কালামশাস্ত্রবিদ তা জায়েয মনে করেন। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৯/৩৯৪)।

অন্যত্র ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বিবেকবানরা সকলে একমত যে, সম্পর্ক ও সম্বন্ধ নতুন করে হতে পারে, যেমন 'সাথে থাকা' (যেমন আল্লাহ তা'আলার সাথে থাকার সম্পর্ক সকলের সাথে এক রকম নয়, নতুন করে হতে পারে)। বিবাদ শুধু মহান সত্তার সাথে তাঁর পছন্দকৃত কোনো কাজ কি নতুন করে সংঘটিত হতে পারে? বস্তুত এটা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে যে কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ও সম্বন্ধিত হওয়া দাবি করে যে সেটা অবশ্যই সাব্যস্ত জিনিস হবে, সাব্যস্ত জিনিস ছাড়া সম্পৃক্ততা ও সম্বন্ধিত হওয়া অস্তিত্বে আসা অসম্ভব।' মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/১০৫)।

হারেস আল-মুহাসেবীর মতবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে অন্যত্র তিনি বলেন, '...আর আল-হারেস আল-মুহাসেবী দ্বিতীয় মতটি পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ এ সম্বন্ধ বা সম্পর্ক কাদীম ও আযালী গুণের সাথে), আর সে জন্যই তিনি যত জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত কোনো কাজ করেছেন বলে তিনি বলেছেন, সকল জায়গার তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা) করে বলেছেন, এ গুলোর মধ্যে হাদেস বা নতুন কেবল ইচ্ছাকে 'সময়' এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, মূল ইচ্ছার সাথে নয় (কারণ তার কাছে ইচ্ছা নতুন করে হতে পারে না)। অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে শ্রোতাদের অন্তর্ভুক্ত" [সূরা আশ-শু'আরা: ১৫] ও আল্লাহর বাণী "অচিরেই আল্লাহ দেখবেন তোমাদের আমল।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৫] এ আয়াতগুলোর তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা) করে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রুত জিনিস ও দেখা জিনিস সে সময়ে ঘটানো, (যা আগেই তিনি শুনেছেন ও দেখেছেন)। অনুরূপভাবে, তিনি আল্লাহর বাণী "যাতে আমরা জেনে নিই" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১] এর তা'ওয়ীল করেছেন 'যাতে করে জানা জিনিস প্রকাশ পায়, কোনো প্রকার হাদেস বা নতুন কিছু হয়নি আল্লাহর ইলমে, অনুরূপ নতুন কোনো কিছু হয়েছে তাঁর দেখাতেও হয়নি, তাঁর শোনাতেও হয়নি। তদ্রূপ এ অর্থেও নয় যে তাঁর সত্তায় কোনো হাদেস বা নতুন কিছু হয়েছে, আল্লাহ তার নিজ সত্তায় কোনো কিছু (হাওয়াদেস) এর উদ্ভব করবেন তা থেকে পবিত্র।' দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (২/৪৭)।

অন্যত্র তিনি বলেন, (আল্লাহর প্রাচীন ইলমের বাইরে নতুন কোনো ইলম হয়নি) এটা কীভাবে সত্য হতে পারে? অথচ কুরআনের দশোর্ধ্ব আয়াত প্রমাণ করছে যে, তিনি কোনো কিছু সংঘটিত হওয়ার

وذكر كلامًا في هذا في الإرادة. إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء:١٥] ليس معناه أن يحدث له سمعًا، ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم

আর তিনি ইচ্ছা গুণের ব্যাপারেও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৬৭২] শেষে বলেন, অনুরূপ আল্লাহর বাণী, [الشعراء : ١٥] ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۝﴾ "নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, শুনছি" [সূরা আশ-শু'আরা: ১৫] এর অর্থ এটা নয় যে, তাদের কথা বলার সময় তাঁর কোনো শ্রবণ নতুন করে হবে, আর তাদের কথা যা সংঘটিত হয়েছে তা শোনার জন্য কষ্ট করতে হবে।[৬৭৩]

পর জেনেছেন, যদিও তিনি জানতেন যে তা সংঘটিত হবে।' দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (১০/১৮৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, যা কিছু সংঘটিত হবে তিনি তা জানেন। যেমন সেসব বিষয় যা হবার আগে তিনি জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে জানা গেল যে, তিনি যে কোনো কিছু অস্তিত্বে আসার আগেই সেটা সম্পর্কে জানেন। আবার তিনিই সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন সে সব বিষয় অস্তিত্ব লাভ করে তখনও তিনি তা জেনেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, "আর আপনি যে কিবলায় ছিলেন সেটা আমরা এজন্য নির্ধারণ করেছিলাম যাতে আমরা জেনে নিই, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে তার পিছনের দিকে ফিরে যায়।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৩] আর কুরআনে কারীমে দশোর্ধ্ব স্থানে এ রকম এসেছে। ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ, 'যাতে আমরা দেখে নিই'। আর একদল মুফাসসির বলেছেন, এর অর্থ 'কেবল তা অস্তিত্ববান হিসেবে জেনে নিই।' দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (১০/১৭৯)। আরও দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৯/৩৯৬-৩৯৭); মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৪৯৬)। এ মাসআলাটি বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, জামে'উর রাসায়িল (১/১৮১); রিসালাতুন ফী তাহকীকে মাসআলাতি ইলমিল্লাহ। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এ দুটি অপব্যাখ্যার জবাব দেয়া হয়েছে।

৬৭২. অর্থাৎ ইচ্ছাকেও নতুন করে হতে পারে না বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আল-হারেস আল-মুহাসিবীর নিকট আল্লহর ইচ্ছাও কাদীম ও আযালী, সেটা দ্বারাই সবকিছু হয়, তবে পরবর্তী সময়ের সাথে তা সম্পৃক্ত হয়েছে মাত্র। নতুন করে তিনি কোনো ইচ্ছা করেন না। বস্তুত এটিও কুল্লাবী মতবাদ অনুসরণের কারণে হয়েছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে আল্লাহ তা'আলা যখন যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাঁর প্রাচীন আযালী ও কাদীম ইচ্ছা যেমন আছে তেমনি পরবর্তীতে তার সে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা তখন প্রয়োগ করতে পারেন।

৬৭৩. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আল-হারেস আল-মুহাসেবীর এ বক্তব্য অন্যত্র খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন,

যদি তিনি (আল্লাহ) কোনো কিছু অস্তিত্বে আসার পরে সে কথা ও কাজ শুনেন ও দেখেন, তখন সেটার ব্যাপারে,

হয় এটা বলা হবে যে, তার জন্য কিছু (তাজাদ্দুদ) নতুন হয়েছে অথবা বলা হবে যে কোনো কিছুই (তাজাদ্দুদ) নতুন হয়নি,

যদি কোনো কিছুই 'তাজাদ্দুদ' নতুন না হয়ে থাকে, আর তিনি আগেও সেটা শুনতেন না ও দেখতেন না (কারণ অস্তিত্বহীন দেখা যায় না বা শোনা যায় না), তাহলে তা সৃষ্টি করার পরও দেখবেন না ও জানবেন না।

আর যদি কিছুর তাজাদ্দুদ বা নতুন হয়েছে, তাহলে,

হয় সেটা অস্তিত্বশীল জিনিস হবে অথবা সেটা অস্তিত্বহীন জিনিস হবে,

যদি অস্তিত্বহীন জিনিস হয় তবে তো কোনো কিছুরই (তাজাদ্দুদ) নতুন হয়নি।

আর যদি অস্তিত্বশীল জিনিস হয় তাহলে,

হয় সেটা আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে, অথবা আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে,

যদি দ্বিতীয়টি অর্থাৎ অন্য কোনো সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তো উক্ত অন্য সত্তাই তা শুনবে ও দেখবে (আল্লাহ তা'আলা নন, আর এটা হলে তো মূল আলোচনাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে, যা কোনো কুল্লাবী বা আশ'আরীরাই বলে না)।

وقد ذهب قومٌ من أهل السنة أن لله استماعًا حادثًا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله؛ لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت، وكذلك قوله: ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة:١٠٥]، لا يستحدث بصرًا محدثًا في ذاته،

আহলুস সুন্নাহ'র এক গোষ্ঠী বলেছে, আল্লাহ তা'আলার সত্তাগতভাবে নতুন করে (ইচ্ছা ও পছন্দ অনুসারে) 'শোনা' রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে তারা বলে, সৃষ্টি থেকে জানার ব্যাপারে যা কিছু নতুন করে হওয়া সম্ভব তিনি তাদের সে কথা শুনবেন।(৬৭৪) কারণ মাখলুক যখন কোনো কিছু শুনে তখন তা তাদের বুঝ সৃষ্টি করে, তার কান দিয়ে যে আওয়াজ পায় সেটার মাধ্যমে।(৬৭৫)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী, ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ١٠٥] "আর বলুন, 'তোমরা কাজ করতে থাক; আল্লাহ তো তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও'।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৫] তিনি তাঁর সত্তায় নতুন কোনো 'দেখা'র উদ্ভব ঘটাবেন না।(৬৭৬)

তাহলে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, এ শোনা ও দেখা যা অস্তিত্বে এসেছে তা কেবল আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। আর এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

আর কুল্লাবিয়্যা সম্প্রদায়, (যেমন হারেস আল-মুহাসেবী) তারা এ অধ্যায়ের সকল বিষয়ে বলে যে, এখানে তাজাদ্দুদ বা নতুনত্ব হয়েছে, তবে তা কেবল নির্দেশ ও নির্দেশিত বস্তুর মাঝে, ইচ্ছা ও ইচ্ছাকৃত বস্তুর মাঝে, দেখা-শোনা ও শ্রুত ও দৃশ্যমান বস্তুর মাঝে এক প্রকার (তা'আল্লুক) বা সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।

তখন তাদেরকে বলা হবে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বলুন এই যে তা'আল্লুক বা সম্পৃক্ততা সেটা কি কোনো অস্তিত্বশীল জিনিস নাকি সেটা অস্তিত্বহীন জিনিস?

যদি বলে যে অস্তিত্বহীন তবে তো কোনো কিছুই (তাজাদ্দুদ) নতুন হয়নি; কারণ অস্তিত্বহীন জিনিস তো কিছুই না।

আর যদি বলে যে সেটা তো অস্তিত্বশীল, তবে তাদের কথা বাতিল হয়ে যায় (কারণ অস্তিত্বশীল হলেই সেটা হয় আল্লাহর সত্তার সাথে হবে না হয় সৃষ্টির কারো সাথে সম্পৃক্ত হবে, সৃষ্টির কারো সাথে সম্পৃক্ত হলো তো আর আল্লাহর সাথে তা'আল্লুক বা সম্পৃক্ততা থাকার কথাই শুদ্ধ হচ্ছে না, বা তারা বলে থাকে। তাহলে বাকী থাকলো আল্লাহর সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত হওয়া। আর এটা সাব্যস্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে এটা বলা যে, নতুন করে স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে যা পূর্বের সম্পৃক্ততা থেকে আলাদা, আর সেটা বলা হলেই সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু সৃষ্টি করার পর সেটার সাথে তাঁর নতুন ইচ্ছা, নতুন মাহাব্বাত, নতুন শোনা, নতুন দেখা, নতুন দৃষ্টি দেয়া, নতুন জ্ঞান এসবই সম্পৃক্ত হলো, যা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য।) দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/২২৮-২২৯)।

৬৭৪. আমরা আগেই বলেছি যে, এটা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত। যদিও আল-হারেস আল-মুহাসেবী এ বক্তব্যকে অনেকটা নেগেটিভ হিসেবে পেশ করেছেন।

৬৭৫. এ কারণটি আল-হারেস আল-মুহাসেবীর তৈরি করা কারণ; এর মাধ্যমে তিনি সম্ভবত বুঝাতে চেয়েছেন যে, উপরে যারাই আল্লাহর জন্য নতুন করে শোনা সাব্যস্ত করছে তারা সেটাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করছে। বাস্তবে আল-হারেস আল-মুহাসেবীর এ 'কারণ' আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পক্ষ থেকে নয়। কারণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নতুন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিছু (সিফাতে ফি'লিয়্যাহ) হওয়ার ব্যাপারে তা সৃষ্টির ওপর কিয়াস করে বলে না। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তা কিসের ওপর ভিত্তি করে বলে তা পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

৬৭৬. এটিও আল-হারেস আল-মুহাসেবীর ভুল আকীদাহ, যা তিনি কুল্লাবী আকীদায় থাকার কারণে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছেন। তিনি মূলত আল্লাহ কর্তৃক নতুন করে শোনাকে অস্বীকার করছেন। অথচ

وانما يحدث الشيء فيراه مكونًا كما لم يزل يعلم قبل كونه.

বরং তিনি কিছু একটা ঘটাবেন, ফলে তিনি সেটাকে হওয়া দেখতে পাবেন, যেভাবে তিনি হওয়ার আগে সেটা সম্পর্কে সর্বদা জানতেন।[৬৭৭]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হচ্ছে তিনি আল্লাহ আযালী ও কাদীম কাল থেকেই শুনেন, আবার নতুন করেও তাঁর এক প্রকার শোনা রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হারেস আল-মুহাসেবীর এ আকীদাহ'র অসারতা ইতোপূর্বে যেমন সাব্যস্ত করেছেন, তেমনি অন্যত্র আরও বলেন, 'আল্লাহর বাণী, "অচিরেই আল্লাহ দেখবেন" [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৫] এটা প্রমাণ করে যে আল্লাহ তা'আলা তা দেখবেন এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরে। যারা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে তাদেরকে হয় এ দেখাকে অস্বীকার করতে হবে (যেমনটি করেছে মু'তাযিলারা) অথবা বলতে হবে যে এখানে আযালিয়্যাহ, কাদীমাহ দেখাকেই বুঝানো হয়েছে (যা বলে থাকে আশ'আরীরা)। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/২২৭)।

আর এর উত্তর আমরা ইতোপূর্বে শোনার বিষয়ে তাদের বক্তব্য রদ করার সময় প্রদান করেছি।

৬৭৭. এটিও আল-হারেস আল-মুহাসেবীর ভুল আকীদাহ, যা তিনি কুল্লাবী আকীদায় থাকার কারণে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছেন। বস্তুত তিনি যা অস্বীকার করেছেন তা সঠিক নয়। বরং নতুন দেখা ও নতুন কথার উদ্ভব ঘটাবেন এটাই সত্য।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তায় তার নতুন কথার উদ্ভব ঘটান এটা কী বলা যাবে? এখানে দু'টি মত রয়েছে, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে অবশ্যই তা বলা যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ﴾ [الانبياء: ٢] "তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে নতুন করে যে যিকরই আসে না কেন..."। [সূরা আল-আম্বিয়া: ০২] তদ্রূপ হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দেশের যা ইচ্ছা নতুন করে উদ্ভব ঘটান।" [আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৯২৪] দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/২১৮, ২৭১)।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ গ্রন্থে এটার অবতারণা করেছেন, তিনি কুরআনে কারীম থেকে এর দলীল নিয়ে এসেছেন, "আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।" [সূরা আর-রহমান: ২৯] অনুরূপ "যখনই তাদের কাছে তাদের রবের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা শোনে কৌতুকচ্ছলে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ০২] তদ্রূপ "হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে কর তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তোমরা ইদ্দতের হিসেব রেখো। আর তোমাদের রব্ব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও বের হবে না, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই ওপর অত্যাচার করে। আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ এর পর নতুন করে কোনো কিছু উদ্ভব ঘটাবেন।" [সূরা আত-ত্বালাক: ০১] তারপর বলেন, তবে তাঁর উদ্ভব বা ঘটানো সৃষ্টির কারও ঘটানোর মতো নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ১১] অনুরূপ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দেশ হতে যা ইচ্ছা তার নতুন উদ্ভব ঘটান, তিনি যা উদ্ভব ঘটিয়েছেন তন্মধ্যে রয়েছে, তোমরা সালাতে কথা বলবে না।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ (৯/১৫২), অধ্যায়: আল্লাহর বাণী, প্রতিদিন তিনি একটি বিশেষ শানে থাকেন, (সূরা আর-রহমান: ২৯)] এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারী সিফাতে ইখতিয়ারিয়্যাহ (ফি'লিয়্যাহ) সাব্যস্ত করতেন এবং এর পক্ষে জোরালো দলীল প্রদান করতেন।

[قول المحاسبي في العلو]:

إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام:١٨]، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، وقوله: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك:١٦]، وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، وقال تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة:٥]، وقال تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج:٤]، وقال لعيسى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران:٥٥]، وقال تعالى: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء:١٥٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأعراف:٢٠٦].

[মুহাসেবী কর্তৃক আল্লাহকে সর্বোচ্চ সত্তা সাব্যস্তকরণ][৬৭৮]

শেষে আল-হারেস আল-মুহাসেবী বলেন, 'অনুরূপ মহান আল্লাহর বাণী, ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ﴾ [الانعام: ١٨] "আর তিনিই আপন বান্দাদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী।" [সূরা আল-আন'আম: ১৮], অন্য বাণী, ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝﴾ [طه: ٥] "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫] অপর বাণী, ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ [الملك: ١٦] "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানের উপর রয়েছেন...।" [সূরা আল-মুলক: ১৬] অপর বাণী ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠] "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায় এবং সৎকাজ, তিনি তা উপরে উঠান।" [সূরা ফাতির: ১০] অনুরূপ অপর বাণী, ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥] "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুই তাঁর দিকে উঠে যায়।" [সূরা আস-সাজদাহ: ০৫], তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন, ﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] "ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।" [সূরা আল-মা'আরিজ: ০৪] আর 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে বলেন, ﴿إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [ال عمران: ٥٥] "নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব, আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব এবং যারা কুফরী করে তাদের মধ্য থেকে আপনাকে পবিত্র করব।" [সূরা আলে ইমরান: ৫৫], আরও বলেন, ﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٨] "বরং আল্লাহ

---

৬৭৮. আল-হারেস আল-মুহাসেবী রাহিমাহুল্লাহ মহান আল্লাহর জন্য তাঁর গুণ 'উলু' সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দলীল প্রমাণাদি খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। অথচ তারই উত্তরসূরী আশ'আরী ও কুল্লাবী মতবাদের পরবর্তী লোকেরা আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ সত্তা সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করে থাকে। তবে এটা মনে রাখতেই হবে যে, আল-মুহাসেবী ও তার মতো পূর্ববর্তী কুল্লাবী ও আশ'আরী মতবাদের লোকেরা আল্লাহর জন্য উলু বা সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া সাব্যস্ত করলেও তাদের ব্যাখ্যা পুরোপুরি সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যার সাথে খাপ খায় না। যেমনটি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ পুস্তিকার শেষে সাবধান করেছেন, তারপরও যতটুকু হক্ব তাদের মুখ থেকে এসেছে ততটুকু গ্রহণ করতে সমস্যা নেই। এর মাধ্যমে আমরা অন্তত আশ'আরী-মাতুরিদীদের পরবর্তী অনুসারীদের বিরুদ্ধে সেটাকে পেশ করতে পারব, যারা নিজেদেরকে আল-হারেস আল-মুহাসেবী গংদের দিকে সম্পৃক্ত করে থাকে। তাদেরকে বলা যাবে যে, আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ সত্তা ও সর্বোপরে থাকা সত্তা সাব্যস্ত কর যেমনটি তোমাদের পূর্বসূরী আল-হারেস আল-মুহাসেবী সাব্যস্ত করেছেন।

وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً إلى طلبه حيث هو، فقال: ﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء:٤٢]، وقال تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى:١].

قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدًا. كذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ [الزخرف:٨٤]، وقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦]،

তাকে তাঁর দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৫৮] আরও বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الاعراف: ٢٠٦] "নিশ্চয় যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে অহঙ্কার করে না।" [সূরা আল-আ'রাফ: ২০৬]

আর তিনি উপাস্যদের কথা উল্লেখ করেছেন যে, যদি আরও ইলাহ থাকতো তাহলে তারা 'আরশওয়ালার কাছে যাওয়ার রাস্তা খুঁজত, যেখানে তিনি আছেন। তাই বলেন,
﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾﴾ [الإسراء: ٤٢]
"বলুন, যদি তাঁর সাথে আরও ইলাহ থাকত যেমন তারা বলে, তবে তারা 'আরশ-অধিপতির (নৈকট্য লাভের) উপায় খুঁজে বেড়াত।" [সূরা আল-ইসরা: ৪২] অর্থাৎ তালাশ করতো।[৬৭৯]

আরও বলেন, ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾﴾ [الأعلى: ١] "আপনি আপনার সর্বোচ্চ রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।" [সূরা আল-আ'লা: ০১]

আবু আব্দুল্লাহ আল-হারেস আল-মুহাসেবী বলেন, ওটা কখনো এটাকে রহিত করবে না।[৬৮০]

অনুরূপ তাঁর বাণী: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] "আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে।"[৬৮১] [সূরা আয-যুখরুফ: ৮৪] এবং

---

৬৭৯. এ আয়াতের দু'টি অর্থ মুফাসসিরদের থেকে এসেছে:
এক. আল্লাহর বাণী لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا "তাহলে তারা 'আরশওয়ালার প্রতি পথ তালাশ করতো" [সূরা আল-ইসরা: ৪২] এর দ্বারা উদ্দেশ্য, তারা তাঁর নৈকট্য অর্জন, তাঁর ইবাদত ও তাঁর কাছে যাচ্ঞা করে নিজেদের ধন্য করতো।
দুই. এর দ্বারা উদ্দেশ্য, তারা তাঁর 'আরশ দখলে নেয়ার জন্য পথ খুজতো। এটি আল-হারেস আল-মুহাসেবী পছন্দ করেছেন।
কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ আর তাই সালাফদের থেকে এসেছে। ইবন জারীর আত-ত্বাবারী প্রথম মতটিই বর্ণনা করেছেন। আর এটাই পরবর্তী মুহাক্কিক আলেমগণ বর্ণনা করে থাকেন। যেমন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৯/৩৫০); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১৪০)।

৬৮০. কারণ, আল্লাহর কাছে যাওয়ার পথ খোঁজার অর্থ এ নয় যে, তিনি সর্বোচ্চ সত্তা হবেন না, অথবা এটা তো সংবাদ বা খবর, যাতে রহিত হওয়ার নিয়ম নেই।

৬৮১. অর্থাৎ ঊর্ধ্বাকাশে যারা আছেন তাদের উপাস্য হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, তেমনি নিম্ন ধরনীতে যারা আছে তাদের উপাস্যও আল্লাহ তা'আলা। এখানে উপাস্যের স্থান নির্দেশ করা হচ্ছে না, বরং উপাসনাকারীদের অবস্থান ও তাদের উপাসনা কার জন্য হচ্ছে সেটা জানানো হয়েছে। এটিই সকল মুফাসসিরের অভিমত।
আর এর মাধ্যমেই 'ইলাহ' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ইলাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে মা'বুদ বা উপাস্য, যা রব্ব শব্দের অর্থের চেয়ে আলাদা। কারণ রব্ব হচ্ছেন ইবাদত বা উপাসনা যিনি

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام:٣]، وقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة:٧]، فليس هذا بناسخ لهذا، ولا هذا ضد لذلك.

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء، أو ينتقل فيها لانتقالها، ويتبعض فيها على أقدارها، ويزول عنها عند فنائها، جل وعز عن ذلك،

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]

"আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর।"[৬৮২] [সূরা ক্বাফ: ১৬] এবং তাঁর বাণী:

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الانعام: ٣]

"আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ[৬৮৩], তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন।" [সূরা আল-আন'আম: ০৩] এবং তাঁর বাণী:

﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]

"তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭]

এটা ('সাথে থাকা' সংক্রান্ত আয়াত) ওটাকে ('উপরে ও ঊর্ধ্বে থাকা' সংক্রান্ত আয়াতকে) রহিতকারী নয়। আর এটা ওটার বিপরীতও নয়।

আর জেনে রেখো, এসব আয়াতের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ "সত্তাগতভাবে" থাকা উদ্দেশ্য করেছেন, তাই তিনি সবকিছুর নিচে হবেন অথবা সেগুলোর স্থানান্তরে তিনি স্থানান্তরিত হবেন অথবা সেগুলোর পরিমাণ মোতাবেক ভেতরের অংশ হয়ে যাবেন, আর সেগুলো ধ্বংস হলে তিনি মরে যাবেন।[৬৮৪] তিনি তো এসব হওয়া থেকে পবিত্র, ঊর্ধ্বে।

পাবেন সে সত্তা। ইবাদত করা বান্দার কাজ, আর রব্ব বা লালন করা আল্লাহর কাজ। এ পার্থক্য বুঝে আসলে আকীদাহ'র বহু বিষয়ের সমাধান হয়ে যাবে, নতুবা অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়াতে হবে।

৬৮২. এ আয়াতটি দিয়ে এখানে দলীল প্রদান করা বেমানান। কারণ আমরা আগেই জেনেছি যে, এ আয়াতে 'আমরা নিকটে' বলে ফিরিশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহর নৈকট্য কখনো সর্বসাধারণের জন্য নয়। তাঁর নৈকট্য কেবল বিশেষ লোকদের জন্য হয়ে থাকে, শুধু ঈমানদারদের জন্য হয়ে থাকে, যারা তাঁকে ডাকে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য, যারা তাঁর ইবাদত করে তাদের সাওয়াব দেয়ার জন্য। ইতোপূর্বে আমরা সেটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৬৮৩. এখানেও আল্লাহ তা'আলার অবস্থানের স্থান নির্দেশ করা হচ্ছে না। বরং 'আল্লাহ' শব্দের অর্থের দিকে চিন্তা করে অনুবাদ করতে হবে যে, তিনিই আসমানে ও যমীনে সর্বত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য সত্তা। আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই তাঁরই ইবাদত করে, এটাই বলা হচ্ছে। সকল মুফাসসিররা এ তাফসীরই করেছেন।
এটা বলা হচ্ছে না যে, তিনি আসমানেও আর তিনি যমীনেও যেমনটি কোনো কোনো অজ্ঞ লোকেরা মনে করে থাকবে। আর আল-হারেস আল-মুহাসেবী নিজেই এ অর্থ অচিরেই তার আলোচনার মাধ্যমে বাতিল করবেন।

৬৮৪. এখানে তিনি দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন, এক. স্থানান্তর, দুই. অংশ। এ শব্দ দু'টি আল্লাহর জন্য ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে আসেনি, সাব্যস্ত করার জন্যও নয়, অসাব্যস্ত করার জন্যও নয়।

وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنًا، كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئًا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغنِ عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنًا ثم نفوا معنى ما أثبتوا، فقالوا: لا كالشيء في الشيء.

قال أبو عبد الله: أما قوله: ﴿حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾ [محمد:٣١] ، ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ﴾ و ﴿إِنَّا مَعَكُم

এসব দ্বারা কোনো কোনো পথভ্রষ্ট[৬৮৫] গোষ্ঠী তাদের মতবাদ দাঁড় করিয়েছে, তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সর্বত্র আছেন। যেমন তিনি 'আরশের উপরে আছেন। এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।[৬৮৬] অতঃপর তারা তা সরিয়ে নাকচের দিকে নিয়ে গেছে এটা সাব্যস্ত করার পরে, যা তাদের কথায় তারা নাকচ করেছে। কেননা যে ব্যক্তি কোনো কিছু অর্থের দিক দিয়ে সাব্যস্ত করে, অতঃপর কথায় তা নাকচ করে, তারপর আর সেটাকে তার জবানে (ভিন্ন কথা দ্বারা) নাকচ করাতে কোনো লাভ নেই। আর তারা এসব আয়াত দ্বারা দলীল দেয় যে, আল্লাহ স্বয়ং সবকিছুর মধ্যে আছেন। অতঃপর তারা যা সাব্যস্ত করেছে তা নাকচ করে বলে যে, "একটি জিনিস আরেকটি জিনিসের মধ্যে" এ ধরনের নয়।

আবু আব্দুল্লাহ (আল-মুহাসেবী) বলেন, আমাদের দলীল: আল্লাহর বাণী: ﴿حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾ "যাতে আমরা জানতে পারি।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১] এবং ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ﴾ "শীঘ্রই আল্লাহ

তাই এগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এগুলোকে 'আলফাযে মুজমালাহ' (ব্যাখ্যাসাপেক্ষ্য সংক্ষিপ্ত শব্দ) হিসেবে ধরতে হবে। আর আল্লাহর জন্য আলফাযে মুজমালাহ ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে এটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত হবে, যদি ভালো হয় তবে গ্রহণ করা হবে, খারাপ অর্থ হলো বর্জন করতে হবে।

এখানেও যদি স্থানান্তর অস্বীকার দ্বারা এমন কোনো অর্থ উদ্দেশ্য হয় যা কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসেনি, তবে তা অবশ্যই সঠিক বলতে হবে। কিন্তু যদি স্থানান্তর অস্বীকার করার দ্বারা আল্লাহর নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, হাশরের মাঠে আগমন করা, মুমিনদের কাছে আসা অস্বীকার করা হয়, যা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত, তবে তার এ শব্দ ও অর্থ কোনোভাবেই গ্রহণ করা হবে না। অনুরূপভাবে অংশ না হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তিনি কোনো সৃষ্টির অংশ নন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু যদি অংশ না হওয়া দ্বারা আল্লাহর হাত, পা, গোছা, আঙুল, চোখ ইত্যাদি সত্তাগত গুণাবলিকে অস্বীকার করা হয় তবে এ শব্দ ও অর্থ কোনোভাবেই গ্রহণ করা হবে না।

অবশ্য যাওয়াল বা দূর হওয়া বা ধ্বংস হওয়া তা দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি সর্বদা আছেন ও থাকবেন; পৃথিবী ধ্বংস হলেও তিনি থাকবেন তবে সে অর্থ বিশুদ্ধ। কিন্তু সেটা বুঝানোর জন্য এ শব্দ ব্যবহার না করে 'ফানা' বা 'হালাক' শব্দ ব্যবহার করা উত্তম হবে, কারণ তা-ই কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে।

৬৮৫. তিনি এর দ্বারা হুলুলী ও ইত্তিহাদী সম্প্রদায়ের দিকে ইঙ্গিত করছেন। হুলুলীরা মনে করে থাকে যে স্রষ্টা সৃষ্টির ভেতরে প্রবেশ করেন। আর ইত্তিহাদীরা মনে করে থাকে সৃষ্টি স্রষ্টার ভেতরে লীন হয়ে যায়। অনুরূপ তারাও এর দ্বারা উদ্দেশ্য যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একাকার করে দেখে, যাদেরকে সর্বেশ্বরবাদী বলা হয়ে থাকে। তদ্রূপ তারাও এর দ্বারা উদ্দেশ্য যারা আল্লাহকে সর্বত্র বিরাজমান মনে করে থাকে।

৬৮৬. মনে হয় যেন এখানে আল-হারেস আল-মুহাসেবী সেসব ভণ্ড সূফী ও কিছু পথভ্রষ্ট কালামশাস্ত্রবিদদের দিকে ইঙ্গিত করছেন যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সৃষ্টিজগতের উপরে আবার তিনিই সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান। এসব কালামশাস্ত্রবিদ ও সূফীদের বক্তব্যের ব্যাপারে দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/২৯৯), (৫/২২৮)।

مُسْتَمِعُونَ﴾ فإنما معناه: حتى يكون الموجود فيعلمه موجودًا، ويسمعه مسموعًا، ويبصره مبصرًا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر.

وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا﴾ : إذا جاء وقت كون المراد فيه. وأن قوله ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ ﴿إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى

দেখবেন।" ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ﴾ "নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে শ্রবণকারী।" কেননা এগুলোর অর্থ: যাতে সেটা অস্তিত্বশীল হয় এবং তিনি একে অস্তিত্বশীল জানেন। শ্রুত অবস্থায় একে শোনেন, দৃষ্ট অবস্থায় দেখেন। জানা, শোনা, দেখা উদ্ভব করার ভিত্তিতে নয়।(৬৮৭)

আর তাঁর বাণী: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا﴾ "আর যখন আমরা ইচ্ছা করি" এর অর্থ: তাতে উদ্দেশ্য হওয়ার সময় আসে।(৬৮৮)

---

৬৮৭. আবারও আল-মুহাসেবী পূর্বোক্ত দাবির পূণরাবৃত্তি করছেন। কোনো কিছু ঘটে যাওয়ার পরে সেটার জন্য ওয়াসফে সুবূতী বা সাব্যস্তকৃত গুণ প্রদান করতে তিনি রাযী নন। তিনি কেবল সত্তাগত আযালী গুণ সাব্যস্ত করছেন, কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করছেন না। বস্তুত এটিই হচ্ছে ইবন কুল্যাবের মতবাদ। ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, শোনা ও দেখা কখনো অস্তিত্বহীন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি সেটা দেখেন, যখন তার বান্দারা তাকে ডাকেন, তখন তিনি তাদের দো'আ শোনেন, তাদের গোপন চুপিস্বরে বলা কথা শ্রবণ করেন। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০১] আর আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের দশোর্ধ্ব স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কোনো কিছু কীভাবে হবে সেটা হওয়ার পর জানেন। আবার তিনি এর চেয়ে বেশি জায়গায় জানিয়েছেন যে, কোনো কিছু হওয়ার আগেই যা হবে তা জানেন। অনুরূপভাবে কুরআনে কারীমে এমন সব ভবিষ্যত বিষয়াদির সংবাদ দিয়েছেন যা এখনো হয়নি, যা আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে হবে। বরং এসব ভবিষ্যত বিষয়াদির অনেক কিছু তাঁর নবীকে জানিয়েছেন (তা অবশ্যই হওয়ার পরে পুনরায় জানবেন)। আর ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে তিনি কুরআনের আয়াত "কেবল এ জন্যই যে যাতে আমরা জেনে নিই"। [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৩] এর অর্থ, لنرى 'যাতে আমরা দেখি'। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় لنميز 'যাতে আমরা পৃথক করে দিই'। অধিকাংশ মুফাসসির এ অর্থই করেছেন, لنرى ونميز 'যাতে আমরা দেখি' ও 'যাতে আমরা পৃথক করে দিই'। অনুরূপ একদল আলেম তা বলেছেন, তারা বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, لنعلمه موجوداً واقعاً بعد أن كان قد علم أنه سيكون 'যাতে আমরা সেটাকে অস্তিত্বশীল সংঘটিত হিসাবে জানতে পারি, আগে সেটাকে অচিরেই হবে এমনটি জানার পরে।' কোনো কোনো আলেমের বক্তব্য হচ্ছে, العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده، وعلم به بعد وجوده، والحكم للعلم به بعد وجوده؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب 'জ্ঞানের দু'টি স্তর: এক. অস্তিত্বে আসার আগে এক প্রকার জ্ঞান, দুই. অস্তিত্বে আসার পর আরেক প্রকার জ্ঞান, আর বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে তখনই যখন সেটার অস্তিত্বে আসার জ্ঞান হবে, কারণ এটিই সাওয়াব বা শাস্তি আবশ্যক করে'। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আর-রাদ্দু আলাল মানত্বিকিয়্যীন, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।

৬৮৮. এখানেও আল-হারেস আল-মুহাসেবী আগের ভুলটি করেছেন। তিনি আল্লাহর ইচ্ছা বলতে 'সময়' বুঝেছেন। তার অভিমত হচ্ছে আল্লাহর কোনো নতুন ইচ্ছা নেই। যখন যা ইচ্ছা করেন না। তাঁর ইচ্ছা শুধু কাদীম, আযালী বা প্রাচীন, সেটার সাথে সময়ের সংযুক্তি ঘটে মাত্র। তিনি নতুন কোনো ইচ্ছা করেন না। আমরা ইতোপূর্বে আল-হারেস আল-মুহাসেবীর এ বক্তব্যের মূলকথা কার থেকে এসেছে তা জেনেছি, আর সেটা যে ভুল মতাদর্শ সেটা প্রমাণ করে এসেছি। সত্য কথা হচ্ছে, আমরা আল্লাহর ইচ্ছাকে তাঁর চাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করবো, যখন যা তিনি চাইবেন তার ইচ্ছা তিনি করবেন, সাথে সাথে আমরা আল্লাহর আযালী ও কাদীম ইচ্ছাকেও স্বীকার করি। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (২/৪৭)।

ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً﴾ فهذا وغيره مثل قوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك قال: ﴿فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ﴾ [التوبة:٢] يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها.

وكذلك قوله ﴿وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١] يعني: فوقها عليها.

আর তাঁর কথা: ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ "তিনি 'আরশে উঠেছেন" ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ﴾ "তিনি বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান" ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ﴾ "তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশের উপর যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না?" [সূরা আল-মুলক: ১৬] ﴿إِذًا لَّٱبْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ "তবে তারা 'আরশ-অধিপতির (নৈকট্য লাভের) উপায় খুঁজে বেড়াত।" [সূরা বনী ইসরাঈল: ৪২] এবং তাঁর বাণী: ﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ "ফিরিশতাগণ এবং রূহ তাঁর দিকে উঠে যায়।" [সূরা আল-মা'আরিজ: ৪] ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾ "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত এবং সৎকাজ, তিনি তা করেন উন্নীত।" [সূরা ফাত্বির: ৪] এগুলো 'ফাসল'[৬৮৯] বা অকাট্য (বাণী, যা) আবশ্যক করে যে, তিনি 'আরশের উপরে সবকিছুর উপরে, সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হতে মুক্ত, তাদের কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়। কেননা তিনি এসব আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি উদ্দেশ্য করেছেন, তিনি স্বয়ং বান্দাদের উপরে। কেননা তিনি বলেছেন: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ﴾ "তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, উপরে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না?" [সূরা আল-মুলক: ১৬] অর্থাৎ 'আরশের উপরে, আর 'আরশ আসমানের উপরে; কারণ যিনি সবকিছুর উপরে আসমানের উপরে হবেন, তিনি হবেন আসমানে। অনুরূপ বলা হয়েছে, তাঁর বাণীতে: ﴿فَسِيحُواْ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ "অতএব তোমরা যমীনে বিচরণ করো।" [সূরা আত-তাওবাহ: ০২] অর্থাৎ যমীনের উপরে, তার অভ্যন্তরে নয়; তেমনিভাবে, ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ "তারা যমীনে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে" অর্থাৎ যমীনের উপরে, তার অভ্যন্তরে নয়। অনুরূপ আল্লাহর বাণী, ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ "এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডে শূলিবিদ্ধ করবই" [সূরা ত্বা-হা: ৭১] অর্থাৎ খেজুর গাছের কাণ্ডের উপরে।

---

৬৮৯. বুঝা যাচ্ছে, এখানে মানতেক ও বালাগাত শাস্ত্রের একটি পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন। তা হচ্ছে ফাসল। ফাসল বলা হয় এমন বাক্যকে যাতে একটি বস্তুর একটি হুকুম লাগানো হয়েছে। যেমন এ আয়াতে 'উত্তম কালেমাসমূহের ব্যাপারে হুকুম দেয়া হয়েছে যে তাঁর দিকেই উঠে যায়।' এ ধরনের বর্ণনাকে ফাসল বলা হয়, আর তার দাবি হয় অকাট্য। গ্রন্থকার আল-হারেস আল-মুহাসেবী এটা বারবার ব্যবহার করেছেন। এ 'ফাসল' এর বিপরীত হচ্ছে 'ওয়াসল' যা কোনো অব্যয় দিয়ে আলাদা আত্মক করে বর্ণনা করা হয় যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

وقال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ ثم فصل فقال: ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ﴾ ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله: ﴿مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ ثم استأنف التخويف بالخسف، إلا أنه على عرشه فوق السماء.

وقال تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة:٥]، وقال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج:٤] فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج:٤]، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله: ﴿إِلَيْهِ﴾ كقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه، ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض

আরও বলেন, ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ "তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ তার ব্যাপারে, যিনি উপরে রয়েছেন" তারপর সেটাকে ফাসল[৬৯০] করে বলেছেন, ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ "তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন" সেখানে আর কিছুর সাথে 'ওয়াসল'[৬৯১] করেননি বা মিলাননি, তখন এটার আর কোনো অর্থ হতে পারে না এটা ব্যতীত যে, তিনি 'আরশের উপরে, আসমানের উপরে।[৬৯২] কেননা 'মান ফিস সামায়ি' বলে 'ফাসল' করা হয়েছে, তারপর নতুন করে 'খসফ' তথা ধসিয়ে দেয়ার ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে (সুতরাং তাতে অকাট্যভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল যে আল্লাহ আসমানের উপর)।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة : ٥] "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুই তাঁর দিকে উঠে যায়।" [সূরা আস-সাজদাহ: ০৫] আরও বলেন, ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] "ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।" [সূরা আল-মা'আরিজ: ০৪] এর মাধ্যমে বর্ণনা করলেন যে, বিভিন্ন বিষয় উপরে উঠে যায়, যেমন ফিরিশতারাও উপরে উঠে যায়। তারপর সে উপরে উঠার সময়ের গুণ বর্ণনা করে বলছেন যে, তা উপরের দিকে চড়ে যায়, তাই বলেন, ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [السجدة : ٥] "এমন এক দিনে যায় পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর।" সুতরাং তিনি বললেন, এগুলো তাঁর দিকে আরোহন করে যায়। এখানে 'ইলাইহি' তার দিকে আলাদা করে বর্ণনা করেছেন। যেমন কেউ বলে, অমুকের দিকে আরোহন করে যাও, রাতে অথবা দিনে। আর আরোহন করার দিক হচ্ছে ঊর্ধ্ব বা উপরের দিকে। আর তার দিকে তোমার আরোহন হবে দিনের মধ্যে। সুতরাং যখন তারা 'আরশের দিকে আরোহন করে গেল তখন তো তারা মহান আল্লাহর দিকেই আরোহন করে গেল, যদিও তারা তাকে দেখেনি ও তার মতো সম ঊর্ধ্বেও উঠতে পারেনি; কারণ তারা যমীন থেকে আরোহন করে গেছে আর

---

৬৯০. ফাসল অর্থ আগে বর্ণিত হয়েছে। একই কথার একই অকাট্য জবাব হওয়া। যাতে 'হরফে আত্বফ' ব্যবহার করা হয়নি।

৬৯১. ওয়াসল অর্থ হারফে আত্বফ যোগ করে অন্য বাক্যকে সেটার সাথে যোগ করা। মানতেক ও বালাগাত অনুসারীদের নিকট তখন সেটা আর অকাট্য থাকে না।

৬৯২. দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, নাক্বদুত তা'সীস (১/৫৫৭-৫৬১)।

وعرجوا بالأمر إلى العلو قال الله تعالى: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء:١٥٨] ولم يقل: عنده. وقال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ﴾ ثم استأنف الكلام فقال: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر:٣٦-٣٧] فيما قال لي إن إلهه فوق السموات. فبيّنَ الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى إنه كاذب، ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان بذاته، لطلبه في بيته أو بدنه، أو حُشّه، فتعالى الله عن ذلك، ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح.

قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها. ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي

কোনো বিষয় নিয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء : ١٥٨] "বরং আল্লাহ তাকে তাঁর দিকে তুলে নিয়েছেন" [সূরা আন-নিসা: ১৫৮] সেখানে বলেননি যে, তাঁর নিকটে।(৬৯৩)

আর ফির'আউনের বলেছিল:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ ۝ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧]

"ফির'আউন বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর; যাতে আমি অবলম্বন পেতে পারি। আকাশে আরোহণের অবলম্বন এবং মূসার উপাস্যকে দেখতে পাই।' [সূরা গাফির: ৩৬-৩৭] তারপর সে কথা নতুন করে শুরু করেছে, এটা বলে যে, ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا﴾ [غافر: ٣٧] 'আর আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।' [সূরা গাফির: ৩৭]

এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ফির'আউন মূসা 'আলাইহিস সালামকে তার কথায় মিথ্যুক ভেবেছিল এবং মূসা 'আলাইহিস সালাম যেখানে কথা বলেছিলেন সেখানে সে রবকে খোঁজ করলো। যদিও 'মূসা 'আলাইহিস সালামকে সে মিথ্যাবাদীই মনে করেছিল। যদি মূসা 'আলাইহিস সালাম বলতেন যে, তিনি সর্বত্র, তাহলে সে তাকে বাড়িতে বা বাথরুমে বা বাগানে খোঁজ করত। আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, ঊর্ধ্বে। আর ফির'আউনও প্রাসাদ নির্মাণ করার পরিশ্রম করতো না।

আবু আব্দুল্লাহ (আল-মুহাসেবী) বলেন, তবে সেসব আয়াত যেগুলো সম্পর্কে তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা ওয়াসল(৬৯৪) করেছেন, ('ফাসল' করেননি; যেমন তিনি ফাসল বা

---

৬৯৩. শেষোক্ত আয়াতটি এটার দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে যে, ফিরিশতারা যতই উপরে উঠে যাক তারা কখনো আল্লাহকে দেখতে পায় না আর তারা তাঁর সম উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারে না। কারণ 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ উপরের দিকে তুলে নিয়েছেন কিন্তু তিনি দ্বিতীয় আসমানে রয়ে গেছেন। ফিরিশতারা আরও উপরে উঠলেও 'আরশের সমতায় বা তত উঁচুতে উঠতে সক্ষম হয় না।

৬৯৪. 'ওয়াসল' অলঙ্কারশাস্ত্রবিদদের একটি পরিভাষা, যার সাথে মানতেক শাস্ত্র জড়িত। কোনো কিছু অনবরত বর্ণনা করার নাম ওয়াসল। যাতে হারফে আত্বফ ব্যবহার করে কয়েকটি বাক্যকে একত্রিত করা যায়। এর বিপরীতে বাক্যের অর্থপূর্ণ একক অংশ বর্ণনা করার নাম 'ফাসল'। অর্থাৎ এক বাক্যকে আরেক বাক্যের ওপর 'আত্বফ' করে বর্ণনা করলে সেটাকে ওয়াসল বলে। আত্বফ ব্যতীত

أراد به أنه على عرشه فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [المجادلة:٧] فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فبدأ بالعلم، وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه، ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو، فقال: إني لم أزل أراكم،

অকাট্য করেছেন ঐ কথা যার দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে, তিনি 'আরশের উপরে।) তিনি বলেছেন:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝٧﴾ [المجادلة: ٧]

"আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ট জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] এখানে তিনি জানার সংবাদ দিয়েছেন, আবার জানিয়েছেন যে, তিনি প্রত্যেক অপ্রকাশ্য বাক্যলাপকারীর সাথে আছেন। অতঃপর 'জানার' দ্বারা সমাপ্তি টেনে বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে জানেন।"

তিনি জানার দ্বারা শুরু করেছেন এবং জানার দ্বারা শেষ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করেছেন তাদেরকে জানতে যেখানে তারা থাকুক না কেন তারা তাঁর কাছে গোপন নয়, তাদের গোপন আলাপও তাঁর কাছে গোপন নয়। যদি (দুনিয়ার) লোকেরা নিচে একত্রিত হয় এবং কেউ তাদের প্রতি ঊর্ধ্বে থেকে তাকান এবং বলেন, আমি সর্বদা

যা বর্ণিত হয় সেটাকে 'ফাসল' বলে। যেমন, আল্লাহর বাণী, ﴿وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [فصلت: ٣٤] "আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৪] এখানে ﴿ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ এ অংশটুকুকে বলা হয় 'ফাসল'। কারণ সেখানে এক বাক্যকে অপর বাক্যের উপর 'আত্ফ' করা হয়নি।

অপর আয়াত [التوبة: ١١٩] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝١١٩﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১১৯] এখানে ﴿وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ এ অংশটুকুকে বলা হয় 'ওয়াসল' কারণ তা 'আত্ফ' করে বর্ণনা করা হয়েছে।

পার্থক্য হচ্ছে ওয়াসল এর হুকুমের চেয়ে ফাসলের হুকুম অকাট্য হয়ে থাকে। এটাই গ্রন্থকার বুঝাতে চেয়েছেন।

এখানে বর্ণনা করছেন যে, যেখানে ওয়াসল করা হয়েছে সেখানে আগ পিছ ভেবে অর্থ করতে হয়, সেখানে ফাসলের মত অকাট্য হয় না। তাই আলোচ্য আয়াতের মধ্যে প্রথম আল্লাহর ইলমের কথা বলা হয়েছে, আর শেষেও ইলমের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ মাঝখানে সাথে থাকার যে কথা এসেছে তাও ইলমের ওপরই নির্ধারিত হবে।

وأعلم مناجاتكم لكان صادقًا. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق. فإن أبوْا إلا ظاهر التلاوة، وقالوا: هذا منكم دعوى، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه وهذا خروج من قولهم.

তোমাদের দেখি এবং তোমাদের গোপন আলাপ শুনি তাহলে তিনি অবশ্যই সত্যবাদী বলে বিবেচিত হবেন। (তাহলে আল্লাহর ব্যাপারটি তো আরও স্পষ্ট, শুধু উদাহরণের জন্যই উপরের কথাটি পেশ করা হলো, নতুবা) সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে আল্লাহর অবস্থা আরও উপরে।(৬৯৫) অতঃপর তারা যদি প্রকাশ্য তিলাওয়াতই মানতে চায় এবং বলে: এটা তোমাদের পক্ষ থেকে দাবি, তাহলে প্রকাশ্য তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারা তাদের কথা হতে বের হয়ে গেল; কেননা যিনি দুই বা ততোধিকের সাথে আছেন, তিনি তাদের সাথে আছেন, তাদের মধ্যে না।(৬৯৬) আর যিনি কোনো কিছুর সাথে আছেন, তিনি অপর জিসম মুক্তই সাথে হবেন। এটা তাদের কথা হতে বের হয়ে যাওয়া, (কারণ তারা সত্তাগতভাবে সাথে থাকার কথাই বলে)।

---

৬৯৫. আল্লাহ কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা' এর যে তাফসীর ও ব্যাখ্যাটি আল-হারেস আল-মুহাসেবী দিয়েছেন, এ ব্যাখ্যাটিই সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম, হিদায়াতের ইমামগণ সর্বদা দিয়ে এসেছেন। তারা সর্বদা বলেছেন, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর কিন্তু তার ইলম বা জ্ঞান সর্বত্র। সবকিছু তিনি জানেন, দেখেন ও শ্রবণ করেন। সর্বত্র তাঁর ক্ষমতা বিদ্যমান। তাহলে বুঝা গেল যে, আল্লাহ কর্তৃক বান্দার সাথে থাকার অর্থ হবে তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সাথে আছেন, এ আয়াতটি তার স্পষ্ট প্রমাণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শুরুতে জ্ঞানের কথা বলেছেন আবার জ্ঞানের কথা বলে আয়াতটির সমাপ্তি টেনেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলকে জাহমিয়্যারা বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟﴾ [المجادلة: ٧]

"তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] এর দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে সাথে আছেন? তখন আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা আয়াতের প্রথম অংশ তিলাওয়াত করে দেখ না কেন? সেখানে তো এসেছে, [المجادلة: ٧] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন?" অর্থাৎ সেখানে বলা আছে যে, তিনি ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমেই তাদের সাথে আছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২২১, ২৬৩), (১১/২৪৯); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫৪৮); মিনহাজুস সুন্নাহ (৮/৩৭৮)।

৬৯৬. 'তিনি তাদের সাথে আছেন, তাদের মধ্যে না।' এটা দ্বারা সম্ভবত আল-হারেস আল-মুহাসেবীর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বলা যে, 'সাথে থাকা' মানে 'লেগে থাকা' কিংবা 'মিশে যাওয়া' নয়। এটিই কুরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষা থেকে বুঝা যায়। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, مع 'সাথে' শব্দটি কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় এসেছে, সকল জায়গায় কোথাও এটা আবশ্যক করে না যে, প্রথম সত্তা দ্বিতীয় সত্তার মধ্যে অবস্থান করবেন।' [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/২১)] তাছাড়া ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যান্য কিতাবেও তা স্পষ্ট করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আমার 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' এ গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে। তাতে অনেক কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে 'সাথে থাকা' এর অর্থ যে প্রথম সত্তা কর্তৃক দ্বিতীয় সত্তার সাথে লেগে থাকা বা মিশে যাওয়া নয় তা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦] لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد.

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦]

"আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর।" [সূরা কাফ: ১৬] সেখানেও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সাথে লেগে থাকা বা বান্দার সাথে মিশে থাকা বুঝায়নি; কারণ, কোনো কিছু অপর কোনো কিছুর নিকটে থাকার অর্থই হচ্ছে সে অপর জিনিসের অভ্যন্তরে নয়। প্রকাশ্য তিলাওয়াতের দাবি অনুসারেও এটা প্রমাণিত হলো যে, তিনি গ্রীবাস্থিত শিরার অভ্যন্তরে নয়।(৬৯৭)

---

৬৯৭. মুহাসেবী এখানে বলেছেন তা আয়াতের একটি তাফসীর। যাতে রাব্বুল আলামীন বান্দার ঘাঁড়ের শিরার নিকটবর্তী বলা হয়েছে। এ তাফসীরটি অনেকে পছন্দ করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সাম'আনী তার তাফসীরে (৫/২৩৯); সা'দী তার তাফসীরে, পৃ. ৮০৫।
এ আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে আরেকদল আলেমের মত হচ্ছে এখানে নিকটে বলে আল্লাহর 'ইলম' তাদের ঘাঁড়ের শিরার চেয়েও তাদের নিকটে বুঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ওয়াহেদী, আল-ওয়াসীত্ব (৪/১৬৪); বাগাওয়ী, মা'আলিমুত তানযীল (৭/৩৫৮); যামাখশারী, আল-কাশশাফ (৪/২০); রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর (২৮/১৪০); আবু হাইয়ান, আল-বাহরুল মুহীত্ব (৮/১২৩); আলূসী, রূহুল মা'আনী (২৬/১৭৮); ত্বাহের ইবন 'আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর (২৬/৩০১)। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারা সেটাকে 'সাথে থাকা' বা 'মা'য়িয়্যাহ' এর মতো মনে করেছেন। আরেকদল আলেম এ আয়াতের তাফসীর করে বলেছেন, এখানে 'আমরা নিকটে' বলে উদ্দেশ্য নিয়েছেন আমরা তাদের ওপর ক্ষমতাবান ও তাদের ওপর কব্জা করতে সক্ষম, তারা আমার মালিকানাধীন। এটি পছন্দ করেছেন, আল-আখফাশ, মা'আনিল কুরআন (২/৫২৩); ইবন আতিয়্যাহ, আল-মুহারার আল-ওয়জীয (১৩/৫৩৯)। উপরোক্ত সবগুলো অর্থই ইবন জারীর আত-ত্বাবারী বর্ণনা করেছেন তার তাফসীরে (২২/৩৪২)।
কিন্তু সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ আয়াতের অর্থে যে মতটি প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন তা হচ্ছে, এখানে ফিরিশতাদের নিকটে থাকা বুঝানো হয়েছে এবং বলেছেন, পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীন এটিই বুঝতেন। এমতটি পছন্দ করেছেন ইবনুল কাইয়্যেম, ইবন কাসীরসহ পরবর্তী অনেকেই। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/২৫৩), (৫/১২৯, ৩৩৫-৩৩৬, ৪৯৪), (৬/১৯-২০); ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (২/২৯০); ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনীল আযীম (৭/৩৯৮)।
ইবন তাইমিয়্যাহ এ তাফসীরটি বর্ণনা করার পর বলেন, এ আয়াতের তাফসীরে অন্যান্য যেসব মত বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল। তারপর তিনি সেগুলোর যথাযথ সমালোচনা ও খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা 'নিকটে' থাকার বিষয়টি এখানে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করার কারণ হচ্ছে, সাধারণত মহান ও বড় যারা তারা বহুবচন ব্যবহার করে তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডও নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করেন। তারা বলে থাকেন, আমরা করেছি, আমরা হারিয়ে দিয়েছি। অথচ জানা কথা যে, তারা নিজেরা করেনি, তাদের লোকদের দ্বারা সেটা করিয়েছেন। আর কুরআনে কারীমেও আমরা সেটার বহু নযীর দেখতে পাই। যেমন, আল্লাহ বলেন, "কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৮] অথচ যিনি কুরআন রাসূলের ওপর পাঠ করেছেন তিনি হচ্ছেন জিবরীল 'আলাইহিস সালাম। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং এটা মুমিনদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষার (মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করার) জন্য; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আল-আনফাল: ১৭] অথচ বদরের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা ছিলেন আল্লাহর ফিরিশতা।

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ [الزخرف:٨٤] لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ ثم قطع فقال: ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾، فقال ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ إله أهل السماء وإله أهل الأرض،

অনুরূপ তাঁর বাণী:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤]

"আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৮৪] তিনি আসমানে বলে বিচ্ছিন্ন করে দেননি।(৬৯৮) যেমন ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ বলে বিচ্ছিন্ন (ফাসল) করে বলেছেন: ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ﴾ তাই (পূর্বের) আয়াতে ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ বলে বুঝিয়েছেন তিনিই إله أهل السماء وإله أهل الأرض 'আসমানবাসীর ইলাহ ও যমীনবাসীর ইলাহ'।(৬৯৯)

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যান্য মতগুলো খণ্ডন করার ব্যাপারে যা বলেন তা হচ্ছে,

১- আল্লাহ তা'আলা কখনও ব্যাপকভাবে সকল অস্তিত্বশীল জিনিসের 'নিকটে' তা কখনো বলেননি। কুরআন ও সুন্নাহ'র আল্লাহর নৈকট্য সর্বদা বিশেষ হয়ে থাকে, তাকে জেনারালাইজড করা হয়নি। যেমন, "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৬] অনুরূপ আল্লাহর বাণী "আর আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর তাঁর দিকেই ফিরে আস। নিশ্চয় আমার রব খুব কাছেই, ডাকে সাড়া প্রদানকারী।" [সূরা হূদ: ৬১]
আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৩৫-৩৩৬, ৪৯৪), (৬/১৯-২৩); মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২৬৭-২৬৯); তাফসীর ত্বাবারী (২৬/১৫৭); তাফসীর ইবন কাসীর (৭/৩৭৬); তাফসীর খাযেন (৬/২৩৫); তাফসীর বাগাওয়ী (৬/২৩৫)।

২- আয়াতে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। অথচ যদি আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা অর্থ করা হতো তাহলে সেটাকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষায়িত করা হতো না।

৩- আয়াতের আগের বক্তব্য ফিরিশতাদের নিয়ে, তাই আয়াতে ফিরিশতাদের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে মৃত্যুপথ যাত্রীর কথা বর্ণিত হয়েছে। আর মৃত্যুপথ যাত্রী ঈমানদার যেমন হয় তেমনি কাফেরও হয়। আল্লাহ কাফেরদের নিকটবর্তী হবেন এটা অন্য আয়াত ও হাদীসে আসেনি।

৪- আয়াতে বহুবচন এর সর্বনাম 'নাহনু' ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে যখনই এ রকম বহুবচন ব্যবহার করে কোনো কাজ নির্বাহ করার কথা বলা হয়, তখন সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তিনি সেটা তাঁর ফিরিশতা ও বাহিনী দিয়ে সম্পন্ন করে থাকেন, যার বর্ণনা আগে করা হয়েছে।

৬৯৮. অর্থাৎ ফাসল করেননি। বরং আত্বফ এনে ওয়াসল করেছেন।

৬৯৯. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ কখনো এটা নয় যে, আল্লাহ সত্তা আসমানসমূহ ও যমীনে। কারণ তিনি তো বলেননি যে, 'আর তিনি আসমানসমূহে আছেন' বরং তিনি বলেছেন, 'তিনিই আল্লাহ বা মা'বূদ'। সুতরাং কোথায় কোথায় 'আল্লাহ' বা মা'বুদ হিসাবে তার ইবাদত করা হয় এখানে সেটা বলাই উদ্দেশ্য। তখন সেটা আল্লাহর অপর বাণী "আর তিনিই

وذلك موجود في اللغة؛ تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند وإنما هو موضع واحد، ويخفي عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفي عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرًا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. اهـ.

[قول الإمام ابن خفيف واتفاق الصحابة في أصول الدين]:

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه: «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء

আরবী ভাষায় এমন ব্যবহার রয়েছে। যেমন বলা হয়: فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند অর্থাৎ অমুক খোরাসানবাসীদের আমীর, বালখবাসীদের আমীর, সামারকন্দবাসীদের আমীর। অথচ তিনি এক স্থানে আছেন, অন্য সব স্থান তার কাছে গোপন থাকে। তাহলে সবকিছুর উপরে যিনি, যার কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়, সবকিছু পরিচালনা করেন, তিনি তো উভয়ের ইলাহ, যেহেতু তিনি উভয়ের পরিচালনকারী। তিনি স্বীয় 'আরশের উপরে, সবকিছুর উপরে। সমকক্ষতা ও সাদৃশ্যতা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।[৭০০]

[ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন খফীফ এর বক্তব্য ও সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক দীনের মূলনীতিসমূহে ঐকমত্য থাকা]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন খফীফ[৭০১] স্বীয় 'ই'তিক্বাদুত তাওহীদ বি-ইসবাতিল

সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে।" [সূরা আয-যুখরুফ ৮৪] এর মতো হবে। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৩১৪)। আর এটিই ইমাম আহমাদ এর করা তাফসীর, তিনি বলেছেন: আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তিনি (আল্লাহ) আসমান ও যমীনে মা'বুদ বা উপাস্য। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৪০৬, ৪৬৫), (১১/২৫০)।

৭০০. এখানে এসে আল-হারেস আল-মুহাসেবীর বক্তব্য শেষ হয়েছে। এ দীর্ঘ বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে,

১- পূর্ববর্তী অনেক কালামশাস্ত্রবিদ আল্লাহর সর্বোচ্চ সত্তা হওয়ার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করতেন।

২- তারা এর বিপরীত আকীদাহ পোষণকারীদের জাহমী ও মু'তাযিলী হিসেবে মনে করে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করতেন।

৩- কালামশাস্ত্রবিদ হওয়ার কারণে তারা আল্লাহর কর্মগত গুণাবলি (সিফাতে ফি'লিয়্যাহ) স্বীকার করতো না।

৪- অনেক সময় তারা আল্লাহর কর্মগত সিফাত অস্বীকার করার জন্য জটিল কালামশাস্ত্রের আশ্রয় নিত। যাতে কেউ প্রবেশ করলে নিরাপদে বের হওয়া অনেকটাই অসম্ভব।

৭০১. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন খাফীফ, আদ-দ্বিব্বী আল-ফারেসী, আশ-শীরাযী। সূফীদের মাশায়েখদের একজন। বারবার হজ করেছেন। আবুল হাসান আশ'আরীর কাছে পড়ালেখা করেন। ফিকহ অর্জন করেন আবুল 'আব্বাস ইবন সুরাইজ থেকে। তার থেকে কাযী আবু বকর আল-বাকেল্লানী বর্ণনা করেন। তার অনেক গ্রন্থ রয়েছে। আবুল আব্বাস আল-ফাসাওয়ী বলেন, 'আমাদের শাইখ ইবন খাফীফ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন যা অন্যরা রচনা করতে পারেননি। তার দ্বারা অনেকেই উপকৃত হয়েছেন, তার ছাত্ররাই অনুসরণযোগ্য ইমামে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি বহু বছর বেঁচে ছিলেন, ফলে দেশ ও দশের উপকার সাধন করেন।

ইমাম যাহাবী বলেন, 'এ শাইখ ইলম, আমল, উঁচু সনদ, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এসবকে একত্রিত করেছিলেন। আল্লাহর আনুগত্যে অনেক দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন।

তার জন্ম হয়েছে হিজরী ২৬৮ সালে, মৃত্যু হয়েছে হিজরী ৩৭১ সালে। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে

والصفات» ، قال في آخر خطبته: «فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه، قولاً واحدًا، وشرعًا ظاهرًا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.

حتى قال: «عليكم بسنتي» وذكر الحديث. وحديث «لعن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا»

وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنُقل إلينا كما نُقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة

আসমা ওয়াস সিফাত' (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) গ্রন্থে[৭০২] ভূমিকার শেষাংশে বলেন: "আনসার ও মুহাজিরদের সকলে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর নাম, গুণ ও ফয়সালা জানার ব্যাপারে, এককথা ও প্রকাশ্য শরী'আতে একাত্ম হয়েছে। তারাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এগুলো সংকলন করেছেন।

অবশেষে বলেন, (রাসূল বলেন) عليكم بسنتي "তোমাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে আমার আদর্শ ধারণ করা...." তারপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন, আরও বর্ণনা করেন এ হাদীসটি لعن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا "আল্লাহ লা'নত করুন যে দীনে নতুন কিছু ঘটাবে বা যে ঘটাবে তাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবে"।[৭০৩]

অতঃপর তিনি বলেন, সকল সাহাবীর কথা এক, তাতে কোনো মতপার্থক্য নেই। তাদের থেকে গ্রহণ করতেই তো আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রশংসা যে তারা তাওহীদ ও দীনের মূল বিষয়ে আল্লাহর নাম ও সিফাতে মতানৈক্য করেননি; যেমনটি শাখা মাসআলায় করেছেন। যদি আকীদাহ'র মাসআলায় মত পার্থক্য থাকতো তবে সেটা অবশ্যই আমাদের কাছে বর্ণিত হয়ে আসতো যেমন অন্যান্য মতপার্থক্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং এটাই যে সত্য (আকীদায় মতভেদ না থাকা) তা তাদের সাধারণ ও বিশেষ লোকদের কাছে বিশুদ্ধ হিসেবে স্থিরিকৃত হয়েছে আর এটাই তাদের স্থির সিদ্ধান্ত যা তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীগণ তাদের থেকে পেয়েছেন এবং পরবর্তী উলামায়ে

অন্যতম হচ্ছে, আল-ওসিয়্যাত, আল-'আকীদা অথবা আল-মু'তাক্বাদ, কিতাবুল ইক্বতিসাদ। দেখুন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (১০/৩৮৫); ইবন আসাকির, তাবয়ীনু কিযবিল মুফতারী, পৃ. ১৯০; ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৬/৩৪২); আস-সুলামী, ত্বাবাক্বাতুস সূফিয়্যাহ, পৃ. ৪৮৫; ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/৭৬); সিযকীন, তারীখুত তুরাস (৪/১৬২)।

৭০২. সিযকীন তার তারীখুত তুরাস (৪/১৬৩)তে ইবন খাফীফ এর গ্রন্থের মধ্যে আল-আকীদা বা আল-মু'তাক্বাদ গ্রন্থটি উল্লেখ করে বলেছেন, এর একাধিক পাণ্ডুলিপি আয়া সুফিয়া লাইব্রেরিতে, নং ৪৭৯২, আল-ফাতেহ লাইব্রেরি, ৫৩৯১, সায়েব আনকারাহ তে ১৫৫৯ নং এ আছে। তাছাড়া ইবরাহীম আদ-দাসূকী তার গ্রন্থ 'সীরাতুশ শাইখ আল-কাবীর আবি আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন খাফীফ.. পৃ. ২৫৭ তে তাঁর গ্রন্থের মাঝে 'আল-ই'তিক্বাদ' নামের একটি গ্রন্থ রয়েছে বলেছে, সম্ভবত তা এ গ্রন্থটিই।

৭০৩. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭৩০৬, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৩৭০।

ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، ولله المنة.

ثم إني قائل. وبالله أقول. إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة،

কিরাম তাদের যুগের পর প্রজন্মের পর প্রজন্ম লাভ করেছেন। এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করা তাদের নিকট কুফরী বলে বিবেচিত ছিল। সকল দয়া প্রদর্শন আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত।[৭০৪]

অতঃপর আমি বলব: আল্লাহর তাওফীক নিয়েই আমি বলবো, পরবর্তী কালের কিছু লোক (মু'তাযিলারা) যখন তাওহীদের বিধানে ও আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে মতভেদ করেছে, এর মাধ্যমে তখন তারা পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবে'য়ীদের পদ্ধতির খেলাপ করেছে। অতএব তাতে লিপ্ত হয়েছে এমন সব লোকেরাই যাদের হাদীস ও আছার বিষয়ে জ্ঞান ছিল না, আবার তাদের এসব কথাকে পূর্ববর্তীদের থেকে সংবাদ নিয়ে বিবেকগ্রাহ্যও করতে পারেনি[৭০৫] বরং তাদের নির্ভরতা ছিল মনের খেয়াল-খুশির ওপর, যা সুন্নতের খেলাফ এবং হাদীসের প্রতি খারাপ ধারণা থেকে উদ্ভূত।[৭০৬]

---

৭০৪. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, সাহাবায়ে কিরাম বহু ফিকহী মাসআলায় মতভেদ করেছেন। তারা মুমিনগণের নেতা। উম্মতের সকলের চেয়ে ঈমানে পরিপূর্ণ। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তারা কেউ আল্লাহর নাম, গুণ ও কর্ম সংক্রান্ত কোনো একটি মাসআলাতেও মতভেদ করেননি। বরং তারা সকলেই তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই কুরআন ও সুন্নাহয় যে বক্তব্য এসেছে তা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এক কথার উপর ছিলেন। [ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন (১/৪৯)]

৭০৫. ইবন খাফীফ রাহিমাহুল্লাহ এখানে তিনটি বিষয় সাব্যস্ত করছেন:

১- সাহাবায়ে কিরামের মাঝে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ইজমা' বা ঐকমত্য ছিল। আর তাদের ইজমা' অবশ্যই অকাট্য দলীল। তারা এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ করেননি। তবে তাদের মধ্যে ফিকহী ও শাখা-প্রশাখাগত মাসআলায় মতভেদ ছিল।

২- যদি তারা আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মতভেদ করতেন তবে তা অবশ্যই বর্ণিত হয়ে আসতো, যেমন ফিকহী ও শাখা-প্রশাখাগত মাসআলায় তাদের মতভেদ আমাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে, যেগুলোতে মতভেদ করা বৈধ। কারণ সেগুলো বর্ণিত হয়ে না আসার কোনো কারণ নেই। বরং তাদের কাছ থেকে তা বর্ণিত হওয়ার দাবি যথাযথ ছিল। কিন্তু তা না আসার অর্থ হচ্ছে তাদের মাঝে আকীদাহ'র এসব মৌলিক বিষয়ে মতভেদ হয়নি।

৩- পরবর্তী যারাই সাহাবায়ে কিরামের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে মতভেদ করেছে তারা হাদীস বা আছার বর্ণনায় বিখ্যাত কেউ নয়। তারা হাদীসের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল নয়।

৭০৬. ইবন খাফীফ রাহিমাহুল্লাহ এখানে মু'তাযিলা ও তাদের মত লোকদের পথভ্রষ্টতার দু'টি কারণ নির্দেশ করছেন:

১- অজ্ঞতা, মুর্খতা বা বুঝের ঘাটতি।

২- খারাপ উদ্দেশ্য।

বস্তুত অজ্ঞতা, মুর্খতা ও বুঝের ঘাটতির সাথে বিদ'আতের বিশাল সম্পর্ক রয়েছে। যখনই কোথাও

والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم، وصححوا بذلك مذاهبهم: احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفًا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. وحديث: «لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكم متكئًا على أريكته».

তারা কুরআনের সেসব আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে যেগুলো তাদের মনের মতো হয়ে তাদের সৌভাগ্যবান করেনি, তাই সেগুলোকে তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক অপব্যাখ্যা করে নিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা তাদের তাদের মাযহাবকে সঠিক করার অপচেষ্টা করেছে। সেজন্যই আমি চেয়েছি উম্মাতের পূর্ববর্তীদের বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করতে, মুমিনদের প্রমাণ বের করতে, প্রথম যুগের লোকদের পদ্ধতি উন্মুক্ত করতে। কারণ আমার ভয় হচ্ছে যে, এটা না করলে এগুলো সেসব বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে যেসব বক্তব্যের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সাবধান করেছেন আর যারা সেসব ডাকে সাড়া দিবে তাদের অনুসরন করতে নিষেধ করে সাবধান করেছেন।

অতঃপর আবু আব্দুল্লাহ ইবন খফীফ যে হাদীসে রয়েছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বের হওয়ার কথা এসেছে সেটা বর্ণনা করেন, যখন তারা তাকদীর নিয়ে দ্বন্দ্ব করছিল এবং তিনি রাগান্বিত হয়েছিলেন।[৭০৭] আরও উল্লেখ করেন অন্য হাদীস "তোমাদের কাউকে যেন না পাওয়া যায় এমন অবস্থায় যে, সে খাটে হেলান দিয়ে বসা...."[৭০৮]

কুরআন-সুন্নাহ ও আছারের ইলম হ্রাস পাবে সেখানেই বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ দেখা দিবে। যেমনটি ইমাম মালেক বলেছেন, "যখনই আছারের প্রসারে কমতি বা ঘাটতি দেখা দিবে সেখানেই প্রবৃত্তির অনুসরণ বৃদ্ধি পাবে।"

৭০৭. হাদীসটির পূর্ণরূপ হচ্ছে, আমর ইবন শু'আইব তার পিতা, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর সাহাবীদের কাছে বের হয়ে আসলেন, তখন তারা তাকদীর নিয়ে ঝগড়া করছিলেন। তখন এ ঝগড়া দেখে তাঁর ক্রোধের অবস্থা এমন হয়েছিল যেন আনারের দানা তার মুখে গলিয়ে ফেলা হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাদেরকে কি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে? তোমাদেরকে কি এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা কুরআনের একাংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছ? তোমাদের পূর্ববর্তীরা তো এভাবেই ধ্বংস হয়েছে"। [ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৫৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ (২/১৭৮); লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৬২৭); আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ (১১/২১৬), নং ২০৩৬৭; বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (১/২৬০), নং ১২১]

৭০৮. হাদীসটি বর্ণনা করেন, আবু দাউদ, আস-সুনান (৫/১২), নং ৪৬০৫; তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ (৫/৩), নং ২৬৬৩; ইবন মাজাহ, আস-সুনান (১/৬-৭); হাদীস নং ১৩, ভূমিকা; আহমাদ, আল-মুসনাদ (৬/৮); শাফে'য়ী, আর-রিসালাহ, পৃ. ৮৯, নং ২৯৫, তাঁর মুসনাদ, পৃ. ১৫১; হুমাইদী, আল-মুসনাদ (১/২৫২), নং ৫৫১; আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৫০; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/২২৯); ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (১/২৯৫), নং ৯৩৪; ইবন হিব্বান, পৃ. ৫৫, নং ৯৮; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/১০৮); লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/৮২); বাইহাক্বী, আদ-দালায়েল (১/২৪); আস-সুনানুল কুবরা (৭/৭৬); বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (১/২০০-২০১); ত্বাহাওয়ী, শারহু মা'আনিল আছার (৪/২০৯); খত্বীব আল-বাগদাদী, আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, নং ৮৮১; ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (২/২৩২); জামে'উ

وحديث: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه.

এবং অন্য হাদীস: "আমাদের উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে...." ।(৭০৯) কারণ তা থেকে নাজাত তারাই পাবে যারা রাসূলের আদর্শ ও তাঁর সাহাবীগণের আছার এর উপর থাকবে।(৭১০)

বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী, পৃ. ১৫১।

৭০৯. হাদীসটির তাখরীজ ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৭১০. এ হাদীসটিকে আলেমগণ হাদীসুল ইফতিরাক্ব বলে থাকেন। এ হাদীসটির ব্যাপারে কিছু বিষয় না বললেই নয়। তা হচ্ছে,

- হাদীসটি আলেমগণের কাছে দুটি নামে প্রসিদ্ধ:

১- ইফতিরাকুল উম্মাহ। যেমনটি অধ্যায় বিন্যাস করেছেন, তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৬৪০; দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং ২৫১৮। অনুরূপ আরও যারা এ নাম দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ৩-৪; ইবন হাজার, আল-মাত্বালিবুল 'আলিয়া (৩/২৮৬); 'আজলূনী, কাশফুল খাফা (২/৫৭০)।

২- ইফতিরাকুল উমাম। যেমনটি অধ্যায় বিন্যাস করেছেন, ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৯৯১; ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (২/১৪৯); হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৭/২৫৭)।

- এ হাদীসটি যারা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন, তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন,

১- তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ (৫/২৬), কিতাবুল ঈমান, বাবু মা জাআ ফী ইফতিরাকিল উম্মাহ, হাদীস নং ২৬৪১। তারপর তিনি বলেছেন, হাদীসুন হাসানুন সহীহ, যা তার নিকট সর্বোচ্চ সহীহের অর্থে।

২- ইবন হিব্বান, আস-সহীহ (১৪/১৪০), হাদীস নং ৬২৪৭।

৩- হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, আল-মুস্তাদরাক (১/৬১), (১/১২৮); কিতাবুল ইলম, আর বলেছেন, এটি একটি সহীহ হাদীস, ইমাম মুসলিমের শর্তে, অথচ ইমাম বুখারী ও মুসলিম তা সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবী তার মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

৪- ইমাম বাগাওয়ী, মা'আলিমুত তানযীল (৪/৩০০-৩০১)।

৫- আদ-দ্বিয়া আল-মাক্বদেসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (৭/৭৫)। অনুরূপ তার টীকায় আব্দুল মালেক ইবন দুহাইশ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

৬- ইমাম ইবনুল 'আরাবী।

৭- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু' ফাতাওয়া (৩/৩৪৫)।

৮- ইমাম শাত্বেবী, আল-ই'তিসাম (২/৬৯৮)।

৯- ইমাম আব্দুল হক্ব আল-ইশবীলী।

১০- ইমাম ইবন কাসীর।

১১- ইমাম যাহাবী।

১২- হাফেয আল-ইরাক্বী।

১৩- ইবন হাজার।

১৪- সাখাওয়ী।

১৫- বুসীরী, তিনি তার ইতহাফুল খিয়ারাতুল মাহারাহ গ্রন্থে বলেন, এটার সনদ সহীহ, তার সকল বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত (৪/১৮০)।

১৬- হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৬/২৩৩-২৩৪), তিনি বলেন, হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, আর তার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত। আরও দেখুন, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৭/২৫৭, ২৭৮)। মাওয়ারিদুয যামআন, পৃ. ৪৫৪।

১৭- সুয়ূত্বী, আল-জামে'উস সাগীর (২/২০), নং ১২২৩।

১৮- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-আমীর আস-সান'আনী, হাদীসু ইফতিরাক্বিল উম্মাহ ইলা নাইয়্যিফিন ও সাব'ঈনা ফিরকাহ।

১৯- মুহাদ্দিসুল ইয়ামান শাইখ সালেহ ইবন মাহদী আল-মুক্ববিলী, আল-আলামুশ শামিখ ফী ঈসারিল হাক্কি 'আলাল আবায়ি ওয়াল মাশায়িখ, পৃ. ৫১২। তিনি বলেন, এ হাদীসটির এতো বেশি বর্ণনা যে তা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও অবশিষ্ট থাকে না।

২০- শাইখ আবুল আশবাল আহমাদ শাকির, জামেউল বায়ান (৭/৭৫), টীকা।
২১- আশ-শাইখ আল-মুহাদ্দিস আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী, টীকা, সহীহ সুনান আবী দাউদ (৪/১৬৭), নং ৪৫৯৬। তাছাড়া তিনি ইবন মাজাহ কর্তৃক সংকলিত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস এর টীকা দিয়ে বলেন, হাদীসটি সহীহ, আর তা অকাট্যভাবেই সহীহ; কেননা আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে তা আরও ছয়টি সূত্রে এসেছে; তাছাড়া তিনি হাদীসটিকে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে তার আস-সিলসিলাতুস সহীহায় এনে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ (১/৩৭৫)।
২২- আশ-শাইখ আল-মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত্ব, টীকা, মুসনাদে আহমাদ (১৪/১২৪)।
২৩- আশ-শাইখ আল-মুহাদ্দিস সালীম ইবন ঈদ আল-হিলালী, নাসহুল উম্মাহ ফী ফাহমি আহাদীসে ইফতিরাক্বিল উম্মাহ, পৃ. ১৯-২১। আরও দেখুন, দারউল ইরতিয়াব 'আন আহাদীসি 'মা আনা আলাইহি আল-ইয়াওমা ওয়াল আসহাব।
২৪- বাশশার আওয়াদ মা'রূফ, সুনান ইবন মাজাহ এর টীকা (৫/৪৭২)।

- তাছাড়া অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে মুতাওয়াতির বলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- মুনাওয়ী, ফাইদ্বুল কাদীর শারহুল জামে'উস সাগীর, হাদীস নং ১২২৩।
২- সুয়ূত্বী, আদদুররারুল মুনতাসিরাহ ফীল আহাদীসিল মুতাওয়াতিরাহ, নং ৪৮৮।
৩- কাত্তানী, নাযমুল মুতানাসির মিনাল হাদীস আল-মুতাওয়াতির, নং ১৮।
৪- ইয়াহইয়া ইবনুল কাসেম ইবন মুহাম্মাদ, আল-মাসালিক ফী যিকরিন নাজী মিনাল ফিরাক্ব ওয়াল হালিক, পৃ. ১৮১।
৫- আল-মুহাদ্দিস আস-সিদ্দিক আল-গুমারী, ফাক্বুর রিবক্বাহ ফী তাওয়াতুরি হাদীসিস সালাসি ওয়া সাব'ঈনা ফিরকাহ, পৃ. ৬।
৬- আব্দুল কারীম আল-খুদ্বাইর, মুহাদ্বারাহ সাওতিয়্যাহ।

- অনেক সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন:

১- আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, আবু দাউদ, আস-সুনান (৫/৪); কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু শারহিস সুন্নাহ; তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ (৫/২৫); কিতাবুল ঈমান, বাবু মা জাআ ফী ইফতিরাক্বি হাযিহিল উম্মাহ, আর বলেছেন, হাদীসুন হাসানুন সহীহ; ইবন মাজাহ ২/১৩২১; কিতাবুল ফিতান, বাবু ইফতিরাক্বিল উমাম; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/৬১), (১/১২৮); কিতাবুল ইলম, আর বলেছেন, এটি একটি সহীহ হাদীস, ইমাম মুসলিমের শর্তে, অথচ ইমাম বুখারী ও মুসলিম তা সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবী তার মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

এ হাদীসের সনদে মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন আলকামাহ নামীয় যে বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন আলকামাহ'র হাদীসকে হাসান লি যাতিহীর বর্ণনাকারী বলে নিম্নোক্ত মুহাদ্দিসগণ উদাহরণ পেশ করেছেন।

- আল-হাফেয আল-ইরাক্বী, আলফিয়াতুল ইরাক্বী (আত-তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ) (১/৯২-৯৪)।
- হাফেয ইবনুস সালাহ, মুকাদ্দামাতু ইবনুস সালাহ, পৃ. ১৮০।
- আল-হাফেয ইবন হাজার আল-আসকালানী, আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ (১/৪২০-৪২১)।
- আল-হাফেয আস-সাখাওয়ী, ফাতহুল মুগীস (১/৮৪-৮৫)।
- আল-হাফেয আস-সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাওয়ী (১/১৭৫-১৭৬)।
- ইমাম নাওয়াওয়ী, যেমনটি তার থেকে বর্ণনা করেছেন শাইখ আলবানী, সিলসিলাহ সহীহাহ (১/৩৫৭), নং ২০৩।
- হাফেয যাহাবী, মান তুকুল্লিমা ফীহি ওহুয়া মুওয়াসসাক, পৃ. ১৬৫, জীবনী নং ৩০৭; অনুরূপ আল-মুগনী ফিদ দু'আফাহ (২/৬২১), জীবনী নং ৪০১৫, সেখানে বলেছেন, তিনি হাসানুল হাদীস; অনুরূপ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৬/১৩৬); সেখানে বলেছেন, তার হাদীসগুলো হাসান হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।
- হাফেয হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ এর অনেক জায়গায়, দেখুন, সূচিপত্র (৩/৩৯২)।

এখানে জানিয়ে রাখা দরকার যে, ইবন হাজার তার আত-তাকরীব, জীবনী নং ৬১৮৮, সেখানে তার বক্তব্য 'সাদূকুন ইউখত্বিউ' দ্বারা দুর্বল বুঝানো হয়নি। দেখুন, আলবানীর তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ২০৩। তিনি বলেন, ইবন হাজার নিজে এমন বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকে হাসান সাব্যস্ত করেন বলে আমরা পূর্ণ গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

আরও দেখুন, ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৩/৬৬২-৬৬৩); হাদইউস সারী, পৃ. ৪৪১; ইবন রাজাব, শারহু ইলালিত তিরমিযী, পৃ. ৩৯৫-৪০৩)

মোটকথা: এ হাদীসটিকে যারা সহীহ বলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

ক. ইমাম তিরমিযী, তিনি হাসান সহীহ বলেছেন, আল-জামে'উস সহীহ (৫/২৬); তার এ মতটিকে ইমাম মুনযিরী, মুখতাসার সুনান আবী দাউদে (৭/৩); ইমাম সাখাওয়ী, আল-মাকাসিদুল হাসানায় ও ইমাম শাওকানী, আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আয় সমর্থন করেছেন।

খ. ইমাম ইবন হিব্বান, তার সহীহ গ্রন্থের (১৪/১৪০), হাদীস নং ৬২৪৭। অনুরূপভাবে শাইখ শু'আইব আরনাউত্বের টীকা।

গ. আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/৪৫); অনুরূপ (১/৬)।

ঘ. বাইহাক্বী, তার পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ বলার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, যারকাশী, আল-লাআলিল মানসূরাহ, পৃ. ১৬৫; সুয়ূত্বী, আল-লাআলিল মুনতাসারাহ, পৃ. ২২০, নং ৪৪৮; আজলূনী, কাশফুল খাফা (১/৩৬৯)।

ঙ. ইমাম শাত্বেবী, আল-ই'তিসাম (২/৬৯৮)।

চ. ইমাম সুয়ূত্বী, আল-জামে'উস সগীর। সেখানে তিনি সহীহ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

ছ. ইমাম ইরাক্বী, তার থেকে তা মানাওয়ী বর্ণনা করেছেন, ফাইদুল কাদীর (২/২১)।

জ. ইমাম মানাওয়ী, প্রাগুক্ত (২/২১)।

ঝ. ইমাম কাত্তানী, নাযমুল মুতানাসার, পৃ. ৪৫।

ঞ. শাইখ আলবানী, সিলসিলা সহীহাহ (১/৩৫৬-৩৫৮), নং ২০৩; যিলালুল জান্নাহ (১/৬৬-৬৭), নং ৩৩-৩৪।

ট. শাইখ সালীম আল-হিলালী, নাসহুল উম্মাহ, পৃ. ৯-১০।

ঠ. আলী হাসান আব্দুল হামীদ আল-আছারী, হাওয়াদিস ওয়াল বিদা' লিত তারতূসী, এর তাহকীকে পৃ. ৩৩-৩৪।

ড. শাইখ আব্দুল করীম মুরাদ, হাদীস তাফাররুকিল উম্মাহ, পৃ. ৪৮।

ঢ. শাইখ শু'আইব আল-আরনাউত্ব, আল-ইহসান ফী তারতীবি সহীহ ইবন হিব্বান (১৪/১৪০), টীকা ২, (১৫/১২৫), টীকা ৩।

উল্লেখ্য যে, মাত্র দু'জন মানুষ এ হাদীসকে দুর্বল বলেছে, তারা হচ্ছে: যাহেদ আল-কাউসারী ও ইউসুফ আল-কারাদাওয়ী; আমাদের জানামতে তাদের পূর্বে কেউ এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেনি।

২- আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ (৫/২৬), কিতাবুল ঈমান, বাবুন মা জাআ ফী ইফতিরাকিল উম্মাহ, হাদীস নং ২৬৪১; ইবন ওয়াদ্বাহ আল-ক্বুরতুবী, আল-বিদা' ওয়ান নাহয়ু আনহা, পৃ. ১৬৭, বাবুন ফীমা ইয়ুদালুল নাসু বা'দ্বুহুম মিন বা'দ্বিন, নং ২৪৭; আজুররী, আশ-শরী'আহ (১/৩০৭-৩০৯), নং ২৩, ২৪; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/২০৭); কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৪৪৪; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/৯৯-১০০), নং ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন। দেখুন, সহীহুত তিরমিযী (২/৩৩৪), হাদীস নং ২১২৯।

৩- 'আউফ ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, ইবন মাজাহ (২/১৩২২), কিতাবুল ফিতান, বাবু ইফতিরাকিল উমাম; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১০১); ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/৩২), নং ৬৩; আত-ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (১২/৪৪১), হাদীস নং ১৪৫৫৫। আলবানী বলেন, হাদীসটির সনদ উত্তম। অন্যত্র বলেছেন সহীহ। দেখুন, সহীহ সুনান ইবন মাজাহ (২/৩৬৪), নং ৩২২৬; সহীহুল জামে'উস সাগীর (১/২৪৫), নং ১০৮৫।

৪- আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, আহমাদ, আল-মুসনাদ (৩/১২০, ১৪৫); প্রাচীন ছাপা; ইবন মাজাহ, আস-সুনান (২/১৩২২); কিতাবুল ফিতান, বাবু ইফতিরাকিল উমাম, হাদীস

নং ৩৯৯৩; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/৩২), নং ৬৪, বাবু মা আখবারা বিহিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্না উম্মাতাহু সাতাফতারিক; বাইহাক্বী, দালায়িলুন নাবুওয়াহ, ফী জিমা'য়ি আসয়িলাতিল ইয়াহূদ ওয়াগাইরিহিম (৭/২৫৪৫)। আবু ইয়া'লা আল-মুওসেলী, মুসনাদ (৮/৪৬০), নং ৩৮৩২, বূসীরী তার ইতহাফুল খিয়ারাতুল মাহারাহ গ্রন্থে বলেন, এটার সনদ সহীহ, তার সকল বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত। (৪/১৮০); ইরাকী বলেন, হাদীসটির সনদ উত্তম। দেখুন, আল-মুগনী আন হামলিল আসফারি ফিল আসফার (২/৮৮৪-৮৮৫)।

৫- আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, ইবন আবী শাইবাহ (১৫/৩০৭-৩০৮), নং ১৯৭৩৮; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, বাবু মা আখবারা বিহিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্না উম্মাতাহু সাতাফতারিক্বু আলা ইসনাতাইনি ওয়া সাব'ঈনা ফিরকাহ (১/৩৪), নং ৬৮; আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (৮/৩২১), নং ৮০৩৫। হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী।

৬- ইবন মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, সা'ঈদ ইবন মানসূর এর সুনান, যেমনটি তার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন ইমাম শাত্বেবী, আল-ই'তিসাম (২/৪৭৯) অনুরূপ আব্দ ইবন হুমাইদ এর মুসনাদ, যেমনটি তার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (৪/৫৯); ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/৩৫, ৩৬), নং ৭০-৭১; মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৬; আবু ইয়া'লা, যেমনটি তার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (৪/৩১৭) ও সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (৮/৬৪-৬৫); ইবন জারীর আত-তাবারী, জামে'উল বায়ান (২৭/২৩৯-২৪০); ত্বাবারানী, আল-কাবীর (১০/২১১-২১২), নং ১০৩৫৭, (১০/২৭১-২৭২), নং ১০৫৩১; আল-আওসাত্ব (৪/২৭৬-২৭৭), নং ৪৪৭৯; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৫৬৫-৫৬৬), নং ৩৮৪৭; বাইহাক্বী, শু'আবুল ঈমান (৬/৯৫-৯৬), নং ৭৫৮৯, (৭/৬৯), নং ৯৫১০; বাগাওয়ী, মা'আলিমুত তানযীল (৪/৩০০-৩০১)। হাদীসটির সনদ হাসান।

৭- আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা। দেখুন, ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩৭৭, ২৭৯), নং ২৭৭। হাদীসটির সনদ হাসান লিগাইরিহী।

৮- জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, আসলাম ইবন সাহল আল-ওয়াসেত্বী (বাহশাল), তারীখে ওয়াসিত্ব, পৃ. ২৩৫। এর সনদ হাসান লিগাইরিহী।

৯- আলী ইবন আবী তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, সাইফ ইবন 'উমার আত-তামীমী, আল-ফিতনাতু ওয়া মাওকা'আতু জামাল, পৃ. ১৩৫-১৩৬; আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াহাব, যেমনটি তার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন ইমাম শাত্বেবী, আল-ই'তিসাম (২/৭৪৭-৭৪৮); আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল-ফাযারী, আস-সিয়ার, পৃ. ২৯৮, নং ৫৪৯; দেখুন: ইউসুফ বেগ রচিত, মুসনাদে আলী ইবন আবী ত্বালেব ৩/৯৫৩, নং ৫২; মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবী উমার আল-'আদনী, যেমনটি বূসিরী তার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, ইতহাফুল খিয়ারাহ আল-মাহারাহ (৬/৪৪), নং ৫২৯৫, (৮/৩৫-৩৬), নং ৭৪২৬; মাত্বালিবুল আলীয়া (৩/১৬৬), নং ২৬৭৪; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (২/৪৬৭), নং ৯৯৫; ইবন ওয়াদ্বাহ, আল-বিদা'উ ওয়ান নাহইয়ু আনহা, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ২৪৭; মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৮-১৯; আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ (৬/৩৪০-৩৪২), নং ৩৬৬৮; ইবন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (৪/৪৭৮-৪৭৯), ঘটনা ৩৬ হিজরী; ইবন আবী হাতেম, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (৫/১৫৮৭-১৫৮৮), নং ৮৩৭০; আজুররী, আশ-শরী'আহ (১/৩০৯-৩১১), নং ২৫; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩৭১-৩৭২), নং ২৬৯, (১/৩৭৫-৩৭৬), নং ২৭৪-২৭৫। সকল সনদ মিলে হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

১০- মু'আওয়িয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, আহমাদ, আল-মুসনাদ (৪/১০২); দারেমী, আস-সুনান (২/৩১৪), নং ২৫১৮; আবু দাউদ, আস-সুনান (৫/৫-৬), নং ৪৫৯৭; ফাসাওয়ী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ (২/৩৩১-৩৩২); ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/৭), নং ১-২; মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৪-১৫; আজুররী, আশ-শারী'আহ (১/৩১৪, ৩১৫), নং ২৯; ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (১৯/৩৭৬-৩৭৭), নং ৮৮৪, ৮৮৫; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩৭০-৩৭১), নং ২৬৬-২৬৮; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১০১-১০২), নং ১৫০; বাইহাক্বী, দালায়েলুন নাবুওয়াহ (৬/৫৪১-৫৪২)। হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী।

উপরোক্ত হাদীসগুলো সবই সহীহ বা হাসান।

এর বাইরে কয়েকটি হাদীস এসেছে, যাতে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে, আর তা হচ্ছে,

১- আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা। দেখুন, আবু ইয়া'লা (১০/৬৫), নং ৫৭০১। এর সনদ দুর্বল।

২- সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসনাদ, ইতহাফুল খিয়ারাহ আল-মাহারাহ বি যাওয়ায়িদিল মাসানীদিল 'আশারাহ (১০/১৫৬); আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাক্বী, মুসনাদে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, পৃ. ১৪৮; আব্দ ইবন হুমাইদ, আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদে আব্দ ইবন হুমাইদ (১/১৮১); আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবন ইসহাক্ব আল-হারবী, গারীবুল হাদীস (২/৩৪৫); বাযযার, আল-বাহরুয যাখখার (৪/৩৭-৩৮); মুহাম্মাদ ইবন নসর আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৭; আজুররী, আশ-শরী'আহ (১/৩১৩-৩১৪), নং ২৮; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩৬৭-৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১), নং ২৬৩, ২৬৬, ২৬৭। তবে এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

আমর ইবন 'আউফ আল-মুযানী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। দেখুন, ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৫), হাদীস নং ৪৫; ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (১৭/১৩); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/২০৭), নং ৪৪৫। তবে হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

এর বাইরে আরও তিনজন সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর সনদ বেশি দুর্বল থাকায় এখানে তা নিয়ে আসা হলো না।

ইমাম যাইলা'ঈ, যিনি হানাফী মাযহাবের একজন বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস, তিনি এ হাদীসের বিখ্যাত তাখরীজ করে ষোলো জন সাহাবী থেকে তা আনয়ন করেছেন। দেখুন, তাখরীজুল আহাদীস ওয়াল আছার ফী তাফসীরে কাশশাফ, আহাদীসু সূরাতিল আন'আম (১/৪৪৭-৪৪৮)।

- আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আলেমগণ এ হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করে এটাকে নবুওয়াতের নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা যথার্থভাবে সংঘটিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে।

যারা যারা এ হাদীসকে নবুওয়াতের আলামত, নিদর্শন ও প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, মৃত্যু ২৫৬ হিজরী। দেখুন, সহীহ বুখারী, আল-ফাতহসহ (৬/৫৮০-৬৩২)। তবে তিনি এ হাদীস সরাসরি না এনে, হাদীসের একাংশ যাতে 'সাহায্যপ্রাপ্ত গোষ্ঠী' কারা সেটা নিয়ে এসেছেন।

২- ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাক্বী, মৃত্যু ৪৫৮ হিজরী। দেখুন, দালায়েলুন নাবুওয়াত (৬/৫৪২)।

৩- ইমাম আবুল মুযাফফার ত্বাহির ইবন মুহাম্মাদ আল-ইসফারায়ীনী, মৃত্যু ৪৭১ হিজরী। দেখুন, আত-তাবসীর ফিদ-দীন, পৃ. ১৫-১৬, ২৩।

৪- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবী বকর আল-কুরতুবী, মৃত্যু ৬৭১ হিজরী। দেখুন, আল-ই'লাম বিমা ফী দীনিন নাসারা মিনাল ফাসাদি ওয়াল আওহামি, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।

৫- ইমাম আবু যাকারিয়্যাহ ইয়াহইয়া ইবন শারাফ আন-নাওয়াওয়ী, মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী। দেখুন, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত (১/৪৫, ৫৭-৫৮)।

৬- ইমাম বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবন আহমাদ আল-'আইনী, মৃত্যু ৭৫৫ হিজরী। দেখুন, 'উমদাতুল কারী (২/৫২)।

৭- ইমাম 'ইদুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আহমাদ আল-ঈজী, মৃত্যু ৭৫৬ হিজরী। দেখুন, আল-মাওয়াক্বিফ, পৃ. ৪১৪।

৮- ইমাম আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন 'উমার ইবন কাসীর, মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী। দেখুন, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (১/৩৪৭)।

৯- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, ইবন আমীর হাজ, মৃত্যু ৮৭৯ হিজরী। দেখুন, আত-তাক্বরীর ওয়াত তাহবীর (৩/৪২৩)।

১০- ইমাম 'আব্দুর রঊফ মানাওয়ী, মৃত্যু ১০৩১ হিজরী। দেখুন, ফায়দ্বুল কাদীর (৬/৩৯৫-৩৯৭)।

১১- আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আদ-দেহলাওয়ী, মৃত্যু ১৩৭৫ হিজরী। দেখুন, তারীখে আহলিল হাদীস, পৃ. ৭৯, ১১৪-১১৯।

ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنًا بعد قرن ممن عُرفوا بالعدالة والأمانة، المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة.

إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما [أوردنا] هذه المسألة من أجلها، ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بيّن صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته،

অতঃপর তিনি বলেন, সকল উম্মতের জন্য অপরিহার্য সেটা অবগত হওয়া, যার ওপর সাহাবীগণ ছিলেন। আর তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীদের মাধ্যম ছাড়া যেখানে পৌঁছানো যায় না, যারা হাদীস সংকলনে প্রসিদ্ধ, যারা নব উদ্ভূত (বিদ'আতী) মতাদর্শ গ্রহণ করেননি। কাজেই তা নিরবিচ্ছিন্ন সূত্রে তাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যারা ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততায় প্রসিদ্ধ, যারা সুন্নাহ সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে উম্মতকে যা তাদের পক্ষে যাবে আর যা তাদের বিপক্ষে যাবে সেটার যথাযথ সংরক্ষণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ।

তারপর তিনি বলেন: সুতরাং প্রথম যে বিষয়টার মাধ্যমে আমরা শুরু করব, যা সবচেয়ে সম্মানিত বিষয়, সে মাসআলাটির অবতারণা আমরা করতে যাচ্ছি, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত, যা তিনি তাঁর কিতাব আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা স্বীয় সুন্নাহ'তে বর্ণনা করেছেন।

১২- হাফেয ইবন আহমাদ আল-হিকামী, মৃত্যু ১৩৭৭ হিজরী। দেখুন, মা'আরিজুল কবুল (১/৬০)।

উম্মতের মতভেদে পড়ার এ হাদীসের ব্যাপারে ভিন্ন মতের লোকসকল:

আমরা দেখতে পেলাম যে, উম্মত বিভিন্ন ফির্কায় বিভক্ত হবে এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ। আর তা নবুওয়াতের একটি আলামত। এমনকি আলেমগণ যুগ যুগ ধরে সেটার বাস্তবতা বর্ণনা করে যাচ্ছেন।

কিন্তু এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু লোক উম্মত ফির্কায় নিপতিত হওয়া সংক্রান্ত হাদীসগুলো নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তি হচ্ছেন তিনজন: ১) ইবন হাযম, ২) ইবনুল ওয়াযীর ও ৩) শাওকানী।

তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন ইমাম শাওকানী, তিনি শুধু 'কুল্লুহা ফিন নার' (সবাই জাহান্নামে যাবে) এ অংশের বিরোধিতা করেছেন। সম্ভবত তিনি মনে করেছেন এর দ্বারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী বুঝানো হয়েছে, বস্তুত তা দ্বারা চিরস্থায়ী বুঝায় না। যা মুহাক্কিক আলেমগণ যুগ যুগ ধরে বর্ণনা করেছেন; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত। এখানে যারা ঈমানের দাওয়াত কবুল করেছে তাদের বুঝানো হয়েছে, সুতরাং কোনোভাবেই তা দ্বারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী বুঝানো হয়নি। অতএব, শাওকানী রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য মূলত হাদীসে একটি অংশ নিয়ে যা তিনি ভুল বুঝেছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হলেন ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বস্তুত এখানে ভুলই করেছেন। আর আকীদাহ'র অনেক মাসআলাতে তার এমনিতেই সমস্যা ছিল, এটিও তেমন একটি।

আর তৃতীয় ব্যক্তিত্ব হলেন ইবনুল ওয়াযীর রাহিমাহুল্লাহ, তিনি ইবন হাযমের অনুসরণ করেছেন।

এ তিনজনের আলেমে দীনের বক্তব্যের বাইরে বর্তমানে কিছু চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবি তাদের চিন্তা ও বুদ্ধির সংকীর্ণতায় পড়ে এ হাদীসের ব্যাপারে সর্বজন মান্য মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যের বাইরে গিয়েছেন, তারপর বর্তমানে এ সাব্যস্ত হাদীসের বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে লাগা বেশ কিছু বিভ্রান্ত লোককে আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের দীনকে, আমাদের সুন্নাতকে তাদের অপহাত ও অপচিন্তা থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

এ কয়েকজন মাত্র এ বিষয়ে ভুল বুঝের শিকার হয়েছেন। ইতোপূর্বে মুহাদ্দিসগণ যা যা বলেছেন তাই ধর্তব্য, তাই গ্রহণযোগ্য, তাই অনুসরণীয়। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবীন।

وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له.

إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية: أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق، بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه السلام بقوله، فقبلوا منه كقبولهم، لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله.

[إثبات ابن خفيف النفس لله] :

إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ

এ ব্যাপারে যারা কথা বলেছেন তাদের মতামত আমরা বর্ণনা করব। যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের জন্য বিবেকের যুক্তি খাটিয়ে ধরণ বের করতে চেষ্টা করা জায়েয নয়; আর যেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে চুপচাপ মেনে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শেষে তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাওহীদ বা একক স্রষ্টা ও একক মা'বুদ হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করার পর, স্বীয় কিতাবে যথাযথভাবে আমাদের নিকট নিজের পরিচিতি দান করার জন্য যা দিয়ে শুরু করেছেন তা হচ্ছে, তাঁর নাম ও সিফাত উল্লেখ, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার ওপর তাকীদ দিয়েছেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে। ফলে সাহাবায়ে কিরাম সেগুলোকে তেমনভাবে কবুল করে নিয়েছেন যেমনভাবে তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকাশ্য রূপ থেকে প্রাথমিক তাওহীদ মেনে নিয়েছেন।

[ইবন খাফীফ কর্তৃক আল্লাহর জন্য 'নাফস' সাব্যস্তকরণ]

তারপর বলেন, তিনি (আল্লাহ) নিজের জন্য 'নাফস'(৭১১) সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করার পর

---

৭১১. এ মাসআলার আলোচনা আগেই গত হয়েছে যে, 'নাফস' বলে আল্লাহর সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং অধিকাংশ আলেম এ মতই পোষণ করেছেন।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আবু আব্দুল্লাহ ইবন খাফীফ এ আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা আল্লাহর জন্য 'নাফস' সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন এমনভাবে যে এ 'নাফস' সৃষ্টিকুলের নাফস থেকে ভিন্ন; কারণ তাঁর মতো কোনো কিছু নেই।

বস্তুত সালাফে সালেহীন এসব আয়াত ও হাদীসে আসা 'নাফস' নিয়ে মতভেদ করেছেন, এগুলো কি আল্লাহর সত্তার গুণ নাকি এর দ্বারা সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। ইবন খাফীফ অনুরূপ ইবন খুযাইমার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তারা এগুলোকে সত্তার গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন। ইবন খুযাইমা বলেন, 'আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা তাঁর কিতাবের একাধিক আয়াতে সাব্যস্ত করছেন যে, তাঁর 'নাফস' রয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর নবীর যবানীতেও সাব্যস্ত করেছেন যে, তাঁর নাফস রয়েছে, যেমনটি তাঁর কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন। আর জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় এসব আয়াত ও হাদীস অস্বীকার করে থাকে। ... [আত-তাওহীদ (১/১৯)]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র মত হচ্ছে 'নাফস' বলে সত্তাই বুঝানো হয়েছে। সত্তার চেয়ে বাড়তি কোনো গুণ তা নয়। তিনি বলেন, 'আর 'নাফস' বলে উদ্দেশ্য নেয়া হয়, সত্তা ও একই বস্তু, যেমন বলা হয়, رأيت زيداً نفسه অর্থাৎ আমি যায়েদকেই দেখেছি। আর আল্লাহ বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, "আপনি জানেন যা আমার মনে আছে, কিন্তু আমি জানি না যা আপনার নিজের কাছে আছে।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১১৬] ... তারপর ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বেশ কিছু ভাষ্য নিয়ে এসেছেন যাতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। এরপর বলেন, এসব জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠ

لِنَفْسِي﴾[طه: ٤١]، وقال: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾[آل عمران: ٣٠]. ولصحة ذلك، واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقال ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الانعام: ٥٤]

وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: «يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» .وقال صلى الله عليه وسلم: «كتب كتابًا بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي». وقال: «سبحان الله رضى نفسه» ، وقال في محاجة آدم لموسى: «أنت الذي اصطفاك

বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি মূসা ‘আলাইহিস সালামকে বলেছেন: ﴿وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١] “আর আমি আপনাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।” [সূরা ত্বা-হা: ৪১] এবং ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾ [ال عمران: ٣٠] “আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন।” [সূরা আলে ইমরান: ৩০] আর এটা বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে ও সেটা সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণেই মাসীহ ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় বলেছিলেন: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] “আমার মনের কথা আপনি জানেন, কিন্তু আপনার নিজের কাছে যা আছে তা আমি জানি না।” [সূরা আল-মায়েদাহ: ১১৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ﴾ [الانعام: ٥٤] “তোমাদের রব তাঁর নিজের ওপর দয়া লিখে নিয়েছেন।” [সূরা আল-আন‘আম: ৫৪]

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এটিকে আরও জোরালো করেছেন। তিনি বলেন, «يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» “আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমাকে যে তার মনে স্মরণ করবে, আমিও তাকে আমার নিজের সত্তায় স্মরণ করব।”(৭১২)

অন্যত্র তিনি বলেন, «كتب كتابًا بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي» “তিনি স্বীয় হাতে একটি গ্রন্থ লিখেছেন যাতে নিজের ওপর অবধারিত করেছেন যে, নিশ্চয় আমার দয়া আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে।”(৭১৩)

তিনি আরও বলেন, «سبحان الله رضى نفسه» “আল্লাহর পবিত্রতা তার নিজের সন্তুষ্টি অনুযায়ী।”(৭১৪)

আলেমগণের মতে, আল্লাহর সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে যা তার গুণে গুণান্বিত। এর দ্বারা তাঁর সত্তার বাইরে কোনো আলাদা সত্তাকে বুঝানো হয়নি, অনুরূপ আলাদা কোনো গুণকেও বুঝানো হয়নি। একদল লোক এ আয়াতগুলোকে গুণের অধ্যায় হিসেবে নিয়ে থাকে, আবার অপর দল এগুলোকে আলাদা একটি সত্তা মনে করে থাকে যাতে কোনো গুণ নেই। উভয় মতই ভুল।’ মাজমূ‘ ফাতাওয়া (৯/২৯২-২৯৩)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ যা বুঝেছেন সেটা ইমাম দারেমীরও মত। দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল মিররীসী, পৃ. ১৯৬। আরও দেখুন, ইবন হাযম, আল-ফাসলু (২/১৭২)।

৭১২. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, আল-জামে‘উস সহীহ (১৩/৩৮৪), নং ৭৪০৫; মুসলিম, আস-সহীহ (৪/২০৬১), হাদীস নং ২৬৭৫।

৭১৩. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৭৫১; অনুরূপ বুখারী, আল-জামে‘উস সহীহ, হাদীস নং ৪৭০৪।

৭১৪. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৭২৬।

الله واصطنعك لنفسه؟». فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسًا، وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه ويكون ذلك مبنيًا على ظاهر قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام.

[إثبات النور لله تعالى]:

وأن مما قص الله علينا في كتابه، ووصف به نفسه، ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ثم قال عقيب ذلك: ﴿نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ﴾ [النور:٣٥] وبذلك دعاه صلى

আদম-মূসার বিতর্কে তিনি বলেন, «أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه؟» "তুমি সেই মূসা যাকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন এবং নিজের জন্য প্রস্তুত করেছেন।"(৭১৫)

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রকাশ্য বাণীর মাধ্যমে তাঁর নিজের জন্য 'নাফস' সাব্যস্ত করেছেন, তেমনি তাঁর জন্য তাঁর নবীও তা সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে সেটা বিশ্বাস করা যা আল্লাহ্ তাঁর নিজের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। আর সেটা সাব্যস্ত করার ভিত্তি হবে মহান আল্লাহর বাণী ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ﴾ "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই" [সূরা আশ-শূরা: ১১] এর প্রকাশ্য বক্তব্য।

তারপর তিনি বলেন, 'অতঃপর মুমিন বান্দা সাধারণ হোক যা বিশেষ হোক সবার ওপর কর্তব্য হচ্ছে সেসব কিছু কবুল করে নেয়া, যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণ অপর এক ন্যায়পরায়ণের মাধ্যম হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সংযুক্ত হয়ে পৌঁছে যাবে।

[ইবন খাফীফ কর্তৃক মহান আল্লাহর 'নূর' সাব্যস্ত করা]

অনুরূপ আল্লাহ তাঁর কুরআনে আমাদের জন্য যে জানিয়েছেন, আর যা দিয়ে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অনুরূপ সুন্নাতুর রাসূলেও যা বিশুদ্ধ আকারে এসেছে, তন্মধ্যে রয়েছে, তিনি বলেছেন, [النور: ٣٥] ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ "আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর।"(৭১৬) [সূরা আন-নূর: ৩৫]

---

৭১৫. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৪৭৩৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৬৫২।

৭১৬. ইবন খাফীফ এটা সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর নামসমূহের অন্যতম হচ্ছে নূর। আর তা এমন নূর যা আল্লাহর মর্যাদা ও মহত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটা অপর কোনো নূরের মতো নয়। কুরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরে বলা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ নূর, তাঁর রয়েছে নূর, তাঁর পর্দা হচ্ছে নূরের। সালাফদের মধ্যে যদি কারো থেকে এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তারা এ আয়াতের তাফসীরে এটা বলেছেন যে, 'আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের অধিবাসীদের হিদায়াতকারী' তাহলে এটা বুঝে নিতে হবে যে, এটি আয়াতের একটি তাফসীর, যেটাকে উপজীব্য করে আল্লাহ্ তা'আলার স্বয়ং 'নূর' হওয়াকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ আরবরা যখন কোনো কিছুর তাফসীর বা ব্যাখ্যা করে তখন তারা যেটার ব্যাখ্যা

করা হচ্ছে সেটার বিবিধ নাম বা কিছু প্রকার বর্ণনা করে থাকেন, যা দ্বারা উক্ত জিনিসের অপরাপর গুণাবলি সাব্যস্ত হওয়াকে না করে না। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৯০)।

কিন্তু পরবর্তীদের মধ্যে যারা আল্লাহর নূর সাব্যস্ত না করে সেটার তা'ওয়ীল করে বলে যে, এর অর্থ হিদায়াতকারী অথবা আলোকিতকারী অথবা সৌন্দর্যমণ্ডিতকারী, তাদের এ ব্যাখ্যা কখনও বিশুদ্ধ হবে না; কারণ তারা আসল অর্থ 'নূর' সাব্যস্ত না করার জন্য দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'নূর' নামটি স্রষ্টার জন্যও সত্য আর সৃষ্টির জন্যও সত্য। স্বয়ং সে সত্তার জন্যও তা বলা যাবে যার সাথে তার অস্তিত্ব এসেছে, অনুরূপভাবে কোনো কিছুর গুণ হিসেবেও বলা যাবে, যার সাথে তার অস্তিত্ব রয়েছে, তদ্রূপ তারও গুণ হতে পারে যেটা সে অন্যের কাছ থেকে পেয়েছে, যেমন আলোকরশ্মির প্রতিবিম্ব। আর আল্লাহর বাণী, "আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর, তাঁর নূরের উদাহরণ এমন যেন একটি (বন্ধ দেয়ালের খোপে থাকা) তাক, যাতে চেরাগ রাখা আছে।" [সূরা আন-নূর: ৩৫] এখানে তিন প্রকার নূরের কথাই আছে। প্রথমেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে তিনি নূর, আরও বলা হয়েছে যে তাঁর রয়েছে নূর, আরও বলা হয়েছে যে তিনি যেন তাকের উপরে থাকা চেরাগ। আর জানা কথা যে, তাকের উপরে থাকা চেরাগে এমন নূর রয়েছে যা তার নিজের উপর নির্ভর করে আছে, আর সেটার এমন নূরও রয়েছে যা তার থেকে উৎসারিত হয়ে যমীন ও দেয়ালে পড়েছে। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৮/৭৫-৭৬)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট করে এটা সাব্যস্ত করছেন যে, বেশিরভাগ সৃষ্টির অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নূর, এমনকি যারা আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে সেসব জাহমিয়্যারাও তাকে নূর বলে স্বীকৃতি দিত। তবে এটা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা তিনিই স্বয়ং সূর্যের, চাঁদের, আগুনের আলো, এমন কথা কোনো মুসলিম বলে না। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৮/৬৬-৬৭)।

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অন্য কোনো সত্তার দিকে যখন 'নূর' সম্পৃক্ত করা হবে তখন সেটা আর আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হবে না। সুতরাং দুনিয়ার চেরাগের আলোকে কখনো আল্লাহর আলো বলা যাবে না। মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৯২)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, 'নূর' আল্লাহর দিকে দু'ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে:

এক. সিফাতকে মাওসূফের দিকে সম্পৃক্ত করা, অর্থাৎ গুণকে তার গুণান্বিত সত্তার দিকে সম্পৃক্ত করা, যেমন আল্লাহর বাণী, "আর যমীন আলোকিত হয়ে গেছে তার রবের নূরে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৯] অনুরূপ হাদীস বা আছারে এসেছে, "আর আমি আপনার চেহারার নূরের আশ্রয় নিচ্ছি, যে নূরের আলোতে সকল অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়েছে।" [দিয়া আল-মাকদেসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (৯/১৮১); তাবারানী, আদ-দু'আ, হাদীস নং ১০৩৬; আল-মু'জামুল কাবীর (১৩/৭৩)]

দুই. ফা'য়েলকে মাফ'উলের দিকে সম্পৃক্ত করা, অর্থাৎ কর্মকে তার কর্তার দিকে সম্পৃক্ত করা। যেমন আল্লাহর বাণী, "তাঁর নূর যেন তাকের উপর থাকা একটি চেরাগ।" [সূরা আন-নূর: ৩৫] অনুরূপ হাদীস বা আছারে এসেছে, 'মুমিনের অন্তরে আল্লাহর নূরের উদাহরণ' সেটা এ অর্থে যে, তিনিই সেটা প্রদান করেন, তিনিই সেটার বান্দার অন্তরে সঞ্চার করে দেন। দেখুন, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৫ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠা।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে,

১- আল্লাহ তা'আলার একটি নাম 'আন-নূর'। [শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান, শারহু কিতাবিত তাওহীদ মিন সহীহিল বুখারী (১/১৭০-১৭৭); শাইখ আলাওয়ী আস-সাক্কাফ, সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৬০-২৬১] সুতরাং তিনি আল্লাহ নূর যে নূরের মাধ্যমে তিনি সবকিছুকে হিদায়াত দিয়েছেন।

২- আল্লাহ তাআলার একটি সত্তাগত গুণ হচ্ছে 'নূর'। [শাইখ আলাওয়ী আস-সাক্কাফ, সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৫৯-২৬১] তাঁর গুণ হিসেবে তা তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তাঁর নূরের উদাহরণ হচ্ছে...।" [সূরা আন-নূর: ৩৫] অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যমীন উদ্ভাসিত হলো তার রবের নূরে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৯]

৩- আল্লাহ তা'আলার চেহারাও নূরের। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৯; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৯৫] হাদীসে আরও এসেছে, "আপনার চেহারার নূরের উসীলায় আশ্রয় নিচ্ছি"। আরও এসেছে, "আসমান ও যমীনের আলো তাঁর চেহারার আলো হতে।" [শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান, শারহু কিতাবিত তাওহীদ মিন সহীহিল বুখারী (১/১৭০-১৭৭)]

তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দো'আয় বলতেন: أنت نور السماوات والأرض "আপনি আসমান এবং যমীনের নূর।"(৭১৭)

৪- আল্লাহ তা'আলার পর্দাও নূরের। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৯]
৪- আল্লাহ তা'আলার নূর যে সৃষ্টির উপর পড়েছে সেই ঈমানদার হবে, আর যার উপর পড়েনি, সে ঈমানদার হয়নি। [তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৬৪২]
৫- আসমান ও যমীনের যত নূর সবই তাঁর থেকে প্রাপ্ত। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নূরে বলেছেন, "তাঁর নূরের উদাহরণ হচ্ছে চেরাগদানী, যাতে রয়েছে চেরাগ।" [সূরা আন-নূর: ৩৫; আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৮৬)] এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি তাঁর গুণ? শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান বলেন, এটা তাঁর সিফাত বা গুণ নয়। [শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান, শারহু কিতাবিত তাওহীদ মিন সহীহিল বুখারী (১/১৭০-১৭৭)]
আর যদি 'আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর' বলে সেটাকে সিফাতী নূর ধরা হয় তবে সে নূরের ধরণ আমরা জানি না। এটাই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৪৮৬-৪৯৩)। আরও দেখুন, https://www.alukah.net/web/refai/0/123379/
কিন্তু সর্বাবস্থায় কোনোক্রমেই এ নূর বলতে সূর্য কিংবা চন্দ্র অথবা কোনো বিদ্যুত বা তারকা বা চেরাগের আলো বুঝানো হয়নি। [শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান, শারহু কিতাবিত তাওহীদ মিন সহীহিল বুখারী (১/১৭০-১৭৭)]
৬- হাশরের মাঠের যমীন যে নূরে আলোকিত হবে তাও আল্লাহ তা'আলার নূর। [সূরা আয-যুমার: ৬৯] ইবন তাইমিয়্যাহ এখানে সৃষ্ট নূর অর্থ করা যাবে না। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৯২)]
৭- জান্নাতও আলোকিত হবে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের নূরের দ্বারা, আর 'আরশের নূর তো আল্লাহর চেহারার নূর থেকে প্রাপ্ত। [ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তা বর্ণনা করেছেন। দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল মিররীসী, পৃ. ৪৪৯; ইবন মান্দাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৯৯; ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, হাদীসটি ত্বাবারানী তার মু'জামে বর্ণনা করেছেন ও তার আস-সুন্নাহতে বর্ণনা করেছনে। ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ৬। আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৩১২); শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান, শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ (৭/৫)।

আর যারা 'আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' এ আয়াতটিকে 'আল্লাহু নাওয়ারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' এমন করে পড়ে আয়াতের অর্থ করেছে যে, الله نَوَّر السموات والأرض "আল্লাহ আসমান ও যমীনকে আলোকিত করেছেন।" এটা অগ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবন খুযাইমাহ এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এট গ্রহণযোগ্য কোনো কিরাআত নয় বলে ঘোষণা করেছেন। দেখুন, ইবন খুযাইমাহ, কিতাবুত তাওহীদ (১/৭৮-৭৯)।

আর যারা আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণ হিসেবে 'নূর' সাব্যস্ত করেননি, [যেমন, ফখরুদ্দীন রাযী, শারহু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮ ও অন্যান্য গ্রন্থ; অনুরূপ গাযালী, তার আল-মাকসাদুল আসনা, পৃ. ১৪৬ ও মিশকাতুল আনওয়ার] তারা সেটার অপব্যাখ্যা করে বলেছেন এর অর্থ, আল্লাহ আসমান ও যমীনের হিদায়াতকারী অথবা আলোকিতকারী অথবা সংশোধনকারী। এ জাতীয় অপব্যাখ্যাকারীদের যাবতীয় সন্দেহের জবাব শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তার বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ কিতাবে প্রদান করেছেন। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৪৮৬-৪৯৩)। আর ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ চৌদ্দটি উপায়ে এসব অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে সাব্যস্ত করেছেন যে, আল্লাহর রয়েছে নূর গুণ।

দেখুন, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক্ব (২/১৮৮-২০৫); মার'ঈ ইবন ইউসুফ আল-হাম্বলী, আক্বাওয়ীলুস সিক্বাত ফী তা'ওয়ীলিল আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ১৯৪-১৯৬; আরও দেখুন, শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান, শারহু কিতাবিত তাওহীদ মিন সহীহিল বুখারী, পৃ. ১৬৯-১৭৭।

৭১৭. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭৩৮৫; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৭৬৯।

النار. لو كشفه لأحرقت سُبُحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وقال: سبحات وجهه: جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه.

ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة:٢٥٥]، والحديث: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

তারপর আবু আব্দুল্লাহ ইবন খাফীফ উল্লেখ করেছেন আবু মূসার হাদীস: حجابه النور. أو النار. لو كشفه لأحرقت سُبُحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه "তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর বা আগুন, যদি তিনি সেটা খুলে দিতেন তাহলে তাঁর দৃষ্টির শেষ পর্যন্ত সকল মাখলূক তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতায় পুড়ে যেত।"[৭১৮] তিনি বলেন, سبحات وجهه হচ্ছে তার ঔজ্জ্বল্য, মহত্ব ও নূর। তিনি সেটা খলীল ও আবু উবাইদ থেকে বর্ণনা করেন।[৭১৯]

আরও বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: نور السماوات من نور وجهه অর্থ আসমানের যত আলো তা হচ্ছে তাঁর চেহারার উজ্জ্বল আলো থেকে।[৭২০]

[ইবন খাফীফ কর্তৃক মহান আল্লাহর জন্য 'হায়াত' বা জীবন গুণ সাব্যস্তকরণ]

তারপর তিনি বলেন, তেমনি নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি জীবিত। আর তিনি উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ "তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫; সূরা আলে ইমরান: ০২]

আর হাদীস: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» "হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আপনার রহমতের মাধ্যমে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[৭২১]

---

৭১৮. হাদীসটির তাখরীজ ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৭১৯. দেখা যেতে পারে, খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী, আল-আইন (৩/১৫২); আবু উবাইদ, গারীবুল হাদীস (৩/১৭৩)।

৭২০. এটি আরও বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবন মানদাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৯৯; তার শব্দ হচ্ছে,

إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، ونور السماوات نور من نور وجهه

"তোমাদের রব্ব, তাঁর কাছে তো কোনো রাত বা দিন নেই। আর আসমানসমূহ ও যমীনের যত আলো সবই তাঁর চেহারার উজ্জ্বল আলো থেকে একটি আলো"।

আছারটি ইমাম বাইহাক্বীও বর্ণনা করেছেন, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৭); তারপর বলেছেন, এটি মাওকূফ, আর এর বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ নন।

অনুরূপভাবে আসারটি ইমাম ইবন কাসীরও নিয়ে এসেছেন, তাফসীর ইবন কাসীর (৬/৬১); সেখানে এসেছে, نور العرش من نور وجهه "আরশের নূর তাঁর চেহারার নূরের উজ্জ্বল্য থেকে"।

অনুরূপ আরো বর্ণনা করেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক্ব (২/১৯৩)।

৭২১. হাদীসটি বর্ণনা করেন, তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৫২৪; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/৫০৯); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (১/১৯২); ত্বাবারানী, আল-মু'জামুস সগীর (১/১৫৯)। হাদীসটি আলবানী হাসান বলেছেন, আত-তাওয়াসুল আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু, পৃ. ৩০।

[إثبات الوجه لله] :

قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهًا موصوفًا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجهًا، وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال: في هذا الحديث من

[ইবন খাফীফ কর্তৃক মহান আল্লাহর চেহারা সাব্যস্তকরণ]

ইবন খাফীফ বলেন, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের কাছে পরিচিত হয়েছেন যা দ্বারা তার মধ্যে রয়েছে যে, তিনি নিজের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাঁর চেহারা আছে(৭২২), যা মহত্ব ও সম্মানের গুণে গুণান্বিত। এভাবে তিনি নিজের জন্য চেহারা সাব্যস্ত করেছেন। আর তিনি অনেকগুলো আয়াত নিয়ে এসেছেন।(৭২৩)

আর পূর্বে বর্ণিত আবু মূসার হাদীস উল্লেখ করেন।(৭২৪) অতঃপর তিনি বলেন যে, এই

---

৭২২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহর রয়েছে চেহারা যা বাস্তবেই, আর সেটা তাঁর মর্যাদার সাথে উপযুক্ত করে সাব্যস্ত করা হবে। কোনো প্রকার বিকৃতি সাধন না করে, নিষ্ক্রীয়করণ না করে, ধরণ নির্ধারণ না করে এবং সাদৃশ্য স্থাপন না করে। আর এ গুণটি কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

আর যারা আল্লাহর সিফাতকে নিষ্ক্রীয়করণ করে সেসব মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ ও তাদের অনুসারী কালামশাস্ত্রবিদরা এটাকে অপব্যাখ্যা করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে, এখানে চেহারা বলে পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। আবার অপর কেউ কেউ অপব্যাখ্যা করে বলে, চেহারা বলে অস্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ এটার অপব্যাখ্যা করে বলে এর দ্বারা সাওয়াব ও সন্তুষ্টি বুঝানো হয়েছে।

এসব অপব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে বাতিল। কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ এগুলোকে অসার করে দেয়। তাছাড়া আরবী ভাষাতেও তা আসে না। এখানে এসব কিছুর সমালোচনা ও খণ্ডন করার স্থান সংকুলান হবে না। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ছাব্বিশটি পদ্ধতিতে এসব অপব্যাখ্যার অপনোদন করেছেন। তাছাড়া তিনি ব্যতীত অন্য আলেমগণও তা খণ্ডন করেছেন।

দেখুন, ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪-৪৪); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫১); ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/১৭৪-১৮৮); বাইহাকী, আল-ই'তিকাদ, পৃ. ২৯-৩০; ইবন মানদাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৯৪; বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ২৯৫-২৯৮; আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ১৮৯; বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ১০৯-১১০; মার'ঈ ইবন ইউসুফ আল-হাম্বলী, আক্বাওয়ীলুস সিক্বাত, পৃ. ১৪১-১৪৬; আশ-শানক্বীত্বী, আদওয়াউল বায়ান (৭/৭৫)।

আর যারা এসব তা'ওয়ীল করেছে তাদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, ইবনুল জাওযী, দাফ'উ শুবাহিত তাশবীহ, পৃ. ৩১; যামাখশারী, আল-কাশশাফ (৪/৬৪); কাযী আব্দুল জাব্বার, শারহুল উসূলিল খামসা, পৃ. ২২৭; বদরুদ্দীন ইবন জামা'আহ, ঈযাহুদ দলীল ফী কাত্ব'য়ি হুজাজি আহলিত তা'ত্বীল, পৃ. ১২০-১২২; ফখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর (১/৪৫৪); কুরত্বুবী, তাফসীর (১৭/১৬৫)।

৭২৩. তন্মধ্যে আছে আল্লাহর বাণী, ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর-রহমান: ২৭] ও আল্লাহর বাণী, ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص: ٨٨] "তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। আল্লাহর সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।" [সূরা আল-কাসাস: ৮৮]

এ আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে আল্লাহর চেহারা সাব্যস্ত করছে।

৭২৪. হাদীসটি ইতোপূর্বে আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে এসেছে, 'তাঁর পর্দা হচ্ছে নূরের অথবা আগুনের....। উক্ত হাদীসের শুরুতে এসেছে, "নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না, আর ঘুমানো তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়।" আল-হাদীস।

أوصاف الله عز وجل «لا ينام» موافق لظاهر الكتاب ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة:٢٥٥]
، وأن له وجهًا موصوفًا بالأنوار وأن له بصرًا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير.
ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه، وفي إثبات السمع والبصر، والآيات الدالة على ذلك.

[إثبات اليدين والقدمين لله تعالى] :

ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين، وأنه قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث: «يلقى في النار وتقول هل

হাদীসে আছে যে, তিনি ঘুমান না, যা কুরআনের প্রকাশ্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। সে আয়াতটি হচ্ছে, [البقرة: ٢٥٥] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ﴾ "তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫] (আবু মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর) হাদীস থেকে আরও জানা গেল যে, তাঁর রয়েছে চেহারা যা আলোকোজ্জ্বলতার গুণে গুণান্বিত। আরও জানা গেল যে, তাঁর রয়েছে চোখ, যেমনটি আমাদেরকে তিনি তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন যে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

অতঃপর ইবন খাফীফ সেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন যাতে আল্লাহর চেহারা প্রমাণিত হয়।[৭২৫] আর তাঁর শ্রবণ ও দর্শন সাব্যস্ত হয়। আর সেসব আয়াতও উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়।

[ইবন খাফীফ কর্তৃক মহান আল্লাহর দু' হাত ও দু' পা সাব্যস্তকরণ]

তারপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছেন যে, তাঁর রয়েছে দুটি হাত[৭২৬] যেগুলো তিনি রহমতসহ প্রশস্ত করে রেখেছেন। এরপর তিনি এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেন। তারপর তিনি উমাইয়া ইবন আবিস সালতের কবিতা উল্লেখ করেন।

তারপর উল্লেখ করেছেন হাদীস «يلقى في النار وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله» 'জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে, আর জাহান্নাম বলতেই থাকবে, 'আরও বেশি আছে?' [সূরা ক্বাফ: ৩০][৭২৭] অবশেষে তিনি তাতে তাঁর পা রাখবেন।' এ হচ্ছে বুখারীর

---

৭২৫. এসব হাদীসের অধিকাংশই ইবন খুযাইমাহ রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাবুত তাওহীদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, (১/২৭-৪৪)।

৭২৬. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহ মহান আল্লাহর জন্য দু'টি হাত সাব্যস্ত করেন, যা বাস্তবেই হাত অন্যকিছু নয়, তবে তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর সেটা সাব্যস্ত করতে হবে যেভাবে সেটা তার জন্য উপযুক্ত হবে সেভাবে। কোনো প্রকার নিষ্ক্রীয়করণ, ধরণ নির্ধারণ, কিংবা সাদৃশ্য প্রদান করা যাবে না।

৭২৭. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এ আয়াতে অনুরূপ এমন হাদীসে 'আরও বেশি আছে' এ কথা বলে কী বুঝানো হয়েছে?
উত্তরে তিনি বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, হাদীসে 'আরও বেশি আছে' বলে বুঝানো হয়েছে যে, আমার মধ্যে আর বাড়তি ধারণ ক্ষমতা নেই।
তবে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন, বস্তুত জাহান্নাম 'আরও বেশি আছে কি? এটা বলে বেশি চাইবে। অর্থাৎ আরও বাড়তি কিছু আছে যা দিয়ে আমাকে যোগান দেয়া হবে? (আল্লাহ আমাদেরকে

من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله»، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى: «يضع عليها قدمه».
ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: «أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله» وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه، وأبي

বর্ণনা। অপর বর্ণনায় এসেছে, «يضع عليها قدمه» "তিনি তাতে তাঁর পা রাখবেন।"[৭২৮]

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] বর্ণনা করলেন, যা মুসলিম আল-বাত্বীন[৭২৯] বর্ণনা করেছেন ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে যে, "কুরসী হচ্ছে দু' পায়ের জায়গা। আর আরশ, তার পরিমাণ তো আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।"

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] বর্ণনা করেন মুসলিম আল-বাত্বীন এর বক্তব্য[৭৩০], সুদ্দী[৭৩১]র বক্তব্য, ওয়াহাব ইবন

জাহান্নামের আগুন ও জাহান্নামী হওয়া থেকে আশ্রয় দিন), বরং বাড়তি বলে এখানে জিন্ন ও মানবদের মধ্য থেকে আল্লাহ যা বাড়িয়ে দিবেন তা চাওয়া হচ্ছে। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাহান্নামে অনবরত ফেলা হতে থাকবে, আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরও বেশি আছে কী? অবশেষে মহান রব্ব তাতে তাঁর পা রাখবেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, তার উপরে তাঁর পা রাখবেন। তখন তার একাংশ অপর অংশের সাথে মিশে যাবে, আর জাহান্নাম বলবে, কাত্ব, কাত্ব অর্থাৎ পূর্ণ হয়ে গেছি। অপর যখন জাহান্নাম বলবে, আমি যথেষ্ট হয়েছি, আমি যথেষ্ট হয়েছি, তখন তার কাছে যা ফেলা হয়েছে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। তারপর আর বলবে না, 'আরও বেশি আছে কী'? বরং তখন তা পূর্ণ হয়ে যাবে, কারণ তার একাংশ অপর অংশের সাথে মিশে যাবে। তখন আল্লাহ সেটাকে তার ভেতরে যারা রয়েছে তাদের জন্য প্রশস্ততাকে সংকীর্ণ করে দিবেন। কারণ তিনি মানুষ ও জিন্ন দিয়ে জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়টিকেই পূর্ণ করার ওয়াদা করেছিলেন। জাহান্নাম তো প্রশস্ত, সেটা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে যারা আছে তাদের নিয়ে সংকীর্ণ না করে দিবেন ততক্ষণ সেটা পূর্ণ হবে না। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪৬-৪৭)।

৭২৮. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৪৮৪৮, ৪৮৪৯, ৪৮৫০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮৪৮।

৭২৯. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ মুসলিম ইবন ইমরান, বলা হয়ে থাকে ইবন আবী ইমরান আল-বাত্বীন, আল-কূফী। তিনি হাদীস বর্ণনা করছেন আত্বা, মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবন জুবাইর থেকে। তাকে আহমাদ, ইবন মা'ঈন, আবু হাতেম ও নাসায়ী নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবন হাজার এর স্তর বিন্যাস অনুযায়ী ষষ্ঠ স্তরের বর্ণনাকারী। দেখুন, মিযযী, তাহযীবুল কামাল (৩/১৩২৬); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (১০/১৩৪); তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৩০।

৭৩০. এর আছারটি বর্ণনা করেছেন ইবন জারীর আত-ত্বাবারী, জামে'উল বায়ান (৩/১০), নং ৫৭৯২; সেখানে এসেছে, মুসলিম আল-বাত্বীন বলেন, কুরসী দু' পায়ের স্থান। অনুরূপ তা বর্ণনা করেছেন ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (১/৪৫৭)।

৭৩১. তিনি হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল ইবন 'আব্দুর রহমান ইবন আবী কারীমাহ আল-কুফী আস-সুদ্দী, কুরাইশদের একজন মুক্তদাস। তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম। তিনি আনাস ও ইবন সীরীন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'ইজলী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, তাফসীরের আলেম, তাফসীরের বর্ণনাকারী। ইমাম যাহাবী তার প্রশংসা করে বলেন, ইমাম ও মুফাসসির।
সুদ্দী শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে কোনো বাঁধে অবস্থানকারী। তাকে 'সুদ্দী' বলার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি মদীনার এমন এক জায়গায় বসবাস করতেন যে জায়গাকে বলা হতো 'সাদ্দ'। তিনি হিজরী ১২৭ সালে মারা যান। দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৬/৩২৩); সাম'আনী, আল-আনসাব (৩/২৩৮); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/২৬৪); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (১/৩১৩)।
এখানে সুদ্দীর যে আছারটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন ইবন জারীর আত-ত্বাবারী,

মুনাব্বিহ[৭৩২], আবু মালেক[৭৩৩] এর বক্তব্য।

জামে'উল বায়ান (৩/১০)। সেখানে সুদ্দী বলেন, আসমান ও যমীন কুরসীর অভ্যন্তরে। আর কুরসী 'আরশের সামনে। আর তা (কুরসী) হচ্ছে দু' পায়ের স্থান।
আর সুয়ূত্বী আদ-দুররুল মানসূর গ্রন্থে বলেন (২/১৮) যে, এটি ইবন আবী হাতেমও সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন।
অনুরূপ আরও বর্ণনা করেছেন ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (১/৪৫৭)।

৭৩২. তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ ইবন কামিল, আল-ইয়ামানী, আয-যিমারী আস-সান'আনী। তিনি হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ এর ভাই। কোনো কোনো সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে এবং তাদের থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তার জন্ম হয়েছে হিজরী ৩৪ সালে, উসমান ইবন 'আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফতকালে। তিনি ইবাদত ও যুহদে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ওয়ায করতেন এবং হিকমতের কথা বলতেন।
তার প্রসিদ্ধ বাণীর মধ্যে রয়েছে,
১- মুমিন কোনো দিকে দৃষ্টি দেয় শিক্ষা নেয়ার জন্য, কথা বলে বুঝার জন্য, চুপ থাকে নিরাপদ থাকার জন্য।
২- ঈমান হচ্ছে উলঙ্গ, তার পোষাক হচ্ছে তাকওয়া, তার সৌন্দর্য হচ্ছে লজ্জা, তার সম্পদ হচ্ছে ফিকহ।
তিনি হিজরী ১১০ সালে মারা যান।
দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৫/৫৪৩); আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৪/২৩); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/৫৪৪)।
তিনি এখানে যে আছারটির দিকে ইঙ্গিত করছেন তা বর্ণনা করেছেন: আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৬২৩); সেখানকার শব্দ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশ ও কুরসী নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, বাইতুল মা'মূর ফাঁপা মুক্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, 'আরশ কুরসীর সাথে লাগোয়া। তাছাড়া এ বর্ণনাটি সূয়ূত্বী তার আদ-দুররুল মানসূর গ্রন্থেও এনেছেন, (২/১৭); অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, তার আস-সুন্নাহ (২/৪৭৭), নং ১০৯২; যাহাবী, আল-আরবা'ঈন, পৃ. ১২৫-১২৬।

৭৩৩. তিনি হচ্ছেন আবু মালেক গাযওয়ান আল-গিফারী, আল-কূফী, কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ। তিনি বর্ণনা করেছেন 'আম্মার ইবন ইয়াসির, ইবন আব্বাস, বারা ইবন আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে। আর তার থেকে বর্ণনা করেছেন ইসমা'ঈল ইবন সামী', ইসমা'ঈল ইবন আব্দুর রহমান আস-সুদ্দী, হুসাইন ইবন আব্দুর রহমান, সালামাহ ইবন কুহাইল। ইবন আবী খাইসামাহ বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈনকে আবু মালেক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সে তো গিফারী, কূফী, নির্ভরযোগ্য। ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে গন্য করেছেন। তার থেকে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন হাজার এর বর্ণনাকারীদের স্তর বিন্যাস অনুযায়ী তৃতীয় স্তরের বর্ণনাকারী।
দেখুন, ইবন হিব্বান, আস-সিক্বাত (৫/২৯৩); মিযযী, তাহযীবুল কামাল (২/১০৮৯); ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (৮/২৪৫); ইবন হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ৪৪২।
এখানে ইবন খাফীফ যে আছারটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা বর্ণনা করেন ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীর, হাদীস নং ২৬০২; আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/৩০৩), নং ৫৮৯; সেখানকার শব্দ হচ্ছে, আর কুরসী 'আরশের নিচে, তিনি আরও বলেন, তিনি আল্লাহ তাঁর মহান পদ মুবারক কুরসীর উপরে রেখেছেন। তাছাড়া বর্ণনাটি আরও যারা এনেছেন, তারা হচ্ছেন আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৫৫১); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/২৯৫-২৯৬), নং ৮৫৭; সামান্য শব্দের হেরফের রয়েছে; সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (২/১৭), আব্দ ইবন হুমাইদ ও ইবন আবী হাতেম এর বরাতে; ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (১/৪৫৭); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪১১); যাহাবী, আল-আরবা'ঈন, পৃ. ১২৬।
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবন আব্বাস, মুসলিম আল-বাত্বীন, সুদ্দী, এদের বর্ণনাগুলো কেবল নিজেদের মত বা ইজতিহাদ করে দিয়েছেন তা হতে পারে না; কারণ এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ

وبعضهم يقول: «موضع قدميه» وبعضهم يقول: «واضع رجليه عليه».

[موقف السلف من نصوص الصفات] :

ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقًا لقول النبي صلى

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, কুরসী তাঁর দু' পা রাখার স্থান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তাতে তাঁর পা রেখে আছেন।

[আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের অবস্থান]

তারপর [ইবন খাফীফ] বলেন, এসব ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে উম্মতের প্রথম দিকের লোকদের থেকে, যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অনুযায়ী এসেছে(৭৩৪), যা কথায়

দেয়া হচ্ছে, আর আল্লাহর ব্যাপারে ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলা অগ্রহণযোগ্য। বরং এটা স্পষ্ট যে, তারা এগুলো কোনো বিশেষ কোনো ভাষ্যের ওপর ভিত্তি করেই বলে থাকবেন। সম্ভবত তাদের নির্ভরতার স্থানটি হচ্ছে সে হাদীস যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, "আল্লাহ তা'আলা তাতে তার পা রাখবেন।' শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'অনুরূপভাবে কোনো কোনো আলেম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বিনা ইলমে কুরআনের তাফসীর করার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন।... অবশেষে বলেন, তাহলে তাদের ব্যাপারে এটা ধারণা করা যায় না যে, তারা কুরআনকে বিনা ইলম অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করবেন।..." মুকাদ্দিমাতু উসূলিত তাফসীর লি শাইখিল ইসলাম, পৃ. ৩৮।

৭৩৪. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহর বাণী, 'তাঁর কুরসীতে আসমান ও যমীন জায়গা হয়' [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫] এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বলেন, "তাঁর কুরসী তো তাঁর দু' পা রাখার স্থান, আর 'আরশ তার পরিমাণ তো তিনি ব্যতীত কেউ পরিমাপ করতে সক্ষম নয়।"

এটি যারা বর্ণনা করেছেন তারা হচ্ছেন,

১- ইমাম দারাকুতনী সংকলন করেছেন তার কিতাবুস সিফাতে, পৃ. ৩০।

২- অনুরূপ ইবন মান্দাহ তাঁর 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে, পৃ. ৪৪-৪৫।
ইবন মান্দাহ বলেন, 'অনুরূপভাবে তা শুজা' ইবন মাখলাদ তাঁর তাফসীরেও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন। আর ইসহাক ইবন সাইয়্যার তার হাদীসে আবু আসেম থেকে বর্ণনা করার পর তা ইবন আব্বাস এর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম সাওরীর ছাত্ররাও এটাকে ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তদ্রূপ তা আম্মার আদ-দুহনীর মাধ্যমেও মাওকুফভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩- খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৯/২৫১)। তারপর তিনি বলেন, ইবনুল মুযাফফার বলেন, আমাদেরকে আমাদের শাইখ আবু আব্দুল্লাহ বলেছেন, অনুরূপই আমাদেরকে শুজা' বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

খত্বীব বলেন, আমি বলি: এ হাদীসটিকে ইমাম আবু মুসলিম আল-কজ্জী ও আহমাদ ইবন মানসূর আর-রামাদী উভয়েই আবু আসেম থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা কেউই হাদীসটিকে মারফূ' বলেননি। অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান ইবন মাহদী ও ওকী' এরা সকলেই সুফইয়ান থেকে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ওপর মাওকূফ সূত্রে তার কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কেউই তা মারফূ করেননি।

ইমাম ইবনুল জাওযী হাদীসটি আল-ইলালুল মুতানাহিয়া (১/৬-৭) হাদীসটি আনয়ন করার পর বলেন, এ হাদীসটির ব্যাপারে শুজা' ইবন মাখলাদ ধারণার বশবর্তী হয়ে মারফূ করেছেন। কারণ এটিকে মুসলিম আল-কজী, আহমাদ ইবন মানসূর আর-রামাদী উভয়েই আবু আসেম থেকে মাওকুফ বর্ণনা করেছেন, মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। অনুরূপভাবে হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবন মাহদী ও ওকী' উভয়েই সুফইয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, তারাও সেটাকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি, তারাও সেটিকে ইবন আব্বাসের উপর ওয়াকফ করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধ।

الله عليه وسلم متداولاً في الأقوال، ومحفوظًا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم، ولا نشيع جنائزهم،

কথায় মুখে মুখে আলোচিত হয়ে চলে এসেছে, আর তা অন্তরে সংরক্ষিত হতে হতে এসে পৌঁছেছে। পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের এগুলো অস্বীকার করেননি। তাদের সমপর্যায়ের কেউ তাদের ওপর এগুলো খারাপভাবে উল্লেখ করেননি। সাধারণ ও বিশেষ সকলেই তা বর্ণনা করেছে, তাদের কিতাবাদিতেও তা লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অবশেষে উম্মতের শেষ দিকে প্রকাশ পেল কিছু নগণ্য সংখ্যক লোক (যারা এগুলো নিয়ে মতভেদ করেছে কিংবা অস্বীকার করেছে), আল্লাহ তাদের সংখ্যা হ্রাস করে দিন, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছিলেন, তাদের সাথে বসতে, তাদের সাথে কথা বলতে। আর আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন না যাই তাদের রোগীদের সেবা করতে এবং তাদের জানাযার পিছনে চলতে।(৭৩৫)

আর হাদীসটিকে ইমাম সুয়ূত্বী তার আদ-দুররুল মানসূর কিতাবে (২/১৬) খত্বীব আল-বাগদাদীর বরাতে এনেছেন, অনুরূপ ইবন কাসীর তার তাফসীরে এনেছেন (১/৪৫৭)। তারপর বলেছেন, এটি মারফূ হিসাবে শুদ্ধ নয়, বরং এ ভুলটি করেছেন শুজা' ইবন মাখলাদ আল-ফাল্লাস। সে কারণে শাইখ আল-আলবানী হাদীসটিকে মারফূ হিসেবে দুর্বল বলেছেন। দেখুন সিলসিলাহ সহীহাহ (১/১৬), নং ১০৯।

৭৩৫. এ ব্যাপারে কয়েকটি মারাফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা কাদরিয়াদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এসেছে। এসব হাদীসের শব্দ কাছাকাছি, বিভিন্ন সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোর মূল কথা হচ্ছে যা গ্রন্থকার বলেছেন, তাদের সাথে বসা পরিত্যাগ করতে, তাদের এড়িয়ে যেতে, তাদের রুগীদের সেবা করা থেকে বিরত থাকতে, তাদের জানাযার পিছু নেয়া বর্জন করতে। এসব বর্ণনার মধ্যে যা এসেছে,

১- আবু দাঊদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৬৯১, ৪৬৯২।
২- ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৯২।
৩- আহমাদ, আল-মুসনাদ (১/৩০), (২/২৫, ৮৬)।
৪- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/১৪৪-১৪৫)।
৫- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ ২/৩৮৭, নং ৮৪১।
৬- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ১৯০-১৯১।
৭- আত-তাবারানী, আল-মু'জামুস সাগীর (১/২২১)।
৮- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৬৩০, ৬৩৯-৬৪০), নং ১১২৪, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২, ১১৫৪।
৯- হাকেম, আল-মুস্তাদরাক (১/৮৫)। হাকেম আরও বলেন, এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, যদি আবু হাযেম তিনি ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে সত্যিই শুনে থাকেন। যদিও হাদীসটি তারা (বুখারী ও মুসলিম) দু'জন সংকলন করেননি। আর ইমাম যাহাবী এ ব্যাপারে হাকেম এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।
১০- বাইহাকী, আল-কুবরা (১০/২০৩)।
১১- ইবনুল জাওযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ (১/১৫০-১৫১)।
১২- হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৭/২০৫)। তারপর বলেছেন এর একটি ত্বাবারানী তার আল-আওসাত্ব গ্রন্থে এনেছেন, যার বর্ণনাকারী রিজালগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য কেবল হারূন ইবন মূসা আল-গারওয়ী, তিনিও নির্ভরযোগ্য।

তবে ইমাম ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী বলেন, কাদারিয়্যাদের ব্যাপারে সাবধান করে আসা মারফূ' হাদীসগুলোর সবই দুর্বল। অবশ্য সেগুলো মাওকূফ হিসেবে বিশুদ্ধ। দেখুন, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ,

فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفَّروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس، وجوابه لنجدة الحروري ثم

অতঃপর পরবর্তী এসব লোক এসে এ বর্ণনাসমূহের (অপব্যাখ্যার) ইচ্ছা করে এবং সেগুলোতে সাদৃশ্যের অজুহাত দিতে থাকে। আর সেসব সহীহ হাদীসগুলোর প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে তারা প্রতিরোধ করার জন্য যুক্তির নীতির দ্বারস্থ হয়। পরবর্তী সালাফে সালেহীনকে কাফির বলার মতো দৃষ্টতা দেখায়। এভাবে তারা সাহাবীগণের নীতিকে (গ্রহণ করতে) অস্বীকার করে বসে। মুজতাহিদ ইমামদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তাদের বক্তব্য ও নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে বসে। এভাবে এরা সরল পথ থেকে নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহ বানিয়ে দেয়।

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] উল্লেখ করেছেন, ইবন আব্বাস থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, আর যা তিনি নাজদাহ আল-হারূরী[৭৩৬]কে জবাব দিয়েছিলেন।[৭৩৭]

পৃ. ৩০৫। আরও দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/৩৫); তিনি বলেন, বস্তুত তা বিশুদ্ধভাবে এসেছে ইবন আব্বাস ও ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে। আর শাইখ আবু আব্দুর রহমান ইমাম মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসগুলোর সর্বসাকুল্য মান হিসেবে হাসান বলেছেন। তিনি এ হাদীসগুলোর বিস্তারিত তাখরীজ করেছেন। দেখুন, আস-সুন্নাহ (১/১৪৪-১৪৫)।

এ হাদীসের ওপর কিয়াস করে এমন সব বিদ'আতীকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে যারা তাদের বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানাবে।

৭৩৬. নাজদাহ আল-হারূরী। তিনি হচ্ছেন নাজদাহ ইবন 'আমের আল-হানাফী, আল-খারেজী, আল-হারূরী। খারেজীদের নেতাদের একজন। তার দিকে একটি ফির্কার সম্পৃক্ত করে বলা হয়, আন-নাজদাত। প্রথমে তারা নাফে' ইবনুল আযরাক্ব এর অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীরা নিজেদের মধ্যে মতভেদে লিপ্ত হয়ে নাফে' এর বিরুদ্ধে নাজদাত এর নেতৃত্বে বের হয়। তারপর নাজদাহ এর সাথীরা তার বিরুদ্ধে বের হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। আর তা ছিল হিজরী ৬৯ সালের ঘটনা। দেখুন, যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (৩/৮৮); ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান (৬/১৪৮)।

আর হারূরী: হারূরা জায়গার দিকে সম্পৃক্ত করে এ নামকরণ করা হয়। হারূরা জায়গাটি কূফার নিকটবর্তী একটি স্থান। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বিরুদ্ধে বের হয়ে তারা এখানে জমায়েত হয়েছিল। ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ নাজদাহ সম্পর্কে বলেন, নাজদাহ ইবন আমের আল-হারূরী, খারেজীদের প্রধান নেতাদের একজন, হক্ব পথ থেকে বিচ্যুত।

দেখুন, যাহাবী, আল-'ইবার (১/৫৬); ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (৬/১৪৮); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (১/৭৬); আল-আসফারায়িনী, আত-তাবসীর ফিদ-দীন, পৃ. ৩০; মালাত্বী, আত-তানবীহ ওয়ার রাদ্দ, পৃ. ৫২; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব, পৃ. ৬৬; সাম'আনী, আল-আনসাব (২/২০৭)।

৭৩৭. এ আছারটি হারাওয়ী বর্ণনা করেছেন ইকরিমাহ সূত্রে। আর তা হচ্ছে, নাজদাহ আল হারূরী ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে বললেন, আপনি আপনার রবকে কীভাবে চেনেন? কেননা আমাদের পূর্ববর্তীরা আমাদের কাছ মতভেদ করেছে। তখন ইবন আব্বাস বললেন, (ইন্না মান ইয়ানসিবু দীনাহু লিল কিয়াস, না ইয়াযালুদ দাহরা ফী ইলতিবাস, মায়েলান 'আনিল মিনহাজ, যা'য়িনান ফিল ই'ওয়িজাজ) অর্থাৎ যে কেউ দীনকে বানাবে নিজের ধারণার ওপর নির্ভরশীল সে সর্বদা সন্দেহে পড়ে থাকবে। হক্ব পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বক্রতায় নিমজ্জিত থাকবে, বক্রতায় বহু দূর গমনকারী হবে। তারপর ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আমি তাঁকে চিনি সে রকম, যেমনটি তিনি নিজের পরিচয় নিজে দিয়েছেন, কোনো প্রকার চিন্তা-গবেষণার ধার না ধরে, আর আমি তাকে গুণান্বিত

ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابًا مفردًا واختلاف الناس في تأويله.

তারপর তিনি আল্লাহর 'সূরত' সম্পর্কিত হাদীস[৭৩৮] উল্লেখ করেন। আর তিনি এটাও

করি সেসব গুণে, যাতে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন।" [সুয়ূত্বী, সাওনিল মানত্বিকি ওয়াল কালাম, পৃ. ৫০, হারাওয়ী থেকে, আর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাকলি (৮/৫১১)তে এর কিয়দংশ বর্ণনা করেছেন।] অবশ্য এ বর্ণনার সনদে আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাকীম আল-ফুরইয়ানানী রয়েছে, যার সম্পর্কে বানোয়াট কথা প্রচারের অভিযোগ রয়েছে, যেমনটি আবু নু'আইম আল-আসফাহানী বলেছেন। দেখুন, নাসায়ী, আদ-দু'আফাউ ওয়াল মাতরূকীন, পৃ. ১৫৭; ইবন 'আদী, আল-কামিল (১/১৭২); ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (১/১০৮); ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (১/৪৯৬)।

নাজদাহ আল-হারূরী ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে এ রকম অনেক প্রশ্ন করেছেন যা আমরা দেখতে পাই, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮১২।

৭৩৮. 'সূরত' সংক্রান্ত হাদীস কয়েকটি রয়েছে, এখানে কোনটি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে আল্লাহর 'সূরত' সংক্রান্ত হাদীস বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে,

- আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, যাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সাথে মারামারি করবে, তখন যেন তার চেহারায় আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকে; কারণ আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন।' হাদীসটি সংকলন করেছেন,

১- ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৬১২।
২- অনুরূপ তা এসেছে, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৬২২৭।

- তাছাড়া আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরেকটি হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন, তখন তার দৈর্ঘ ছিল ৬০ হাত। অতঃপর যখন তিনি তাঁকে সৃষ্টি করলেন তখন বললেন, যাও, তুমি এসব লোকদের কাছে যাও, তাদের সালাম দাও। আর তারা ছিল ফিরিশতাদের কিছু গোষ্ঠী, তারা সেখানে বসা ছিলেন, তারপর তুমি শোন তারা তোমাকে কী দিয়ে সম্ভাষণ জানায়? কারণ তা তোমার জন্য অভিবাদন হবে ও তোমার সন্তানদের জন্যও অভিবাদন হবে। রাসূল বলেন, অতঃপর আদম বললেন, আসসালামু আলাইকুম, তখন তারা বললো, আসসালামু 'আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি। রাসূল বলেন, ফিরিশতারা তাঁকে 'ওয়ারাহমাতুহূ' বাড়িয়ে বললো। তারপর রাসূল বললেন, সুতরাং যারাই জান্নাতে যাবে তারাই আদমের সূরতে জান্নাতে যাবে, আর তাদের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত। অতঃপর সৃষ্টি তারপর খাটো হতে থাকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।" হাদীসটি সংকলন করেন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৩২৬, ৬২২৭, ৫৮৭৩; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮৪১।
- ঠিক অনুরূপ হাদীস ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে, যেখানে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা চেহারাকে কুৎসিত বলিও না; কারণ আল্লাহ তা'আলা চেহারাকে রহমানের সূরতে সৃষ্টি করেছেন।' এটি সংকলন করেছেন,

১- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/২৬৮), নং ৪৯৮।
২- দারাকুতনী, আস-সিফাত, নং ৪৮।
৩- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২২৯)।
৪- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/৮৫)।
৫- আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (১২/৪৩০)।
৬- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৩১৫।
৭- আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৯৬)।
৮- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৮)।
৯- হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৮/১০৬)। আর বলেছেন, এটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, তার রিজালগণ সহীহ (বুখারীর) হাদীসের রিজাল, তবে ইসহাক্ব ইবন ইসমা'ঈল আত-ত্বালেক্বানী, তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য, তার মাঝে কিছু দুর্বলতাও আছে।

আর ইবন খুযাইমাহ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। দেখুন, আত-তাওহীদ (১/৮৭)।

উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি কিতাব লিখেছেন[৭৩৯] এবং মানুষদের দ্বারা এসবের যে অপব্যাখ্যা হয়েছে সেটা তাতে বর্ণনা করেছেন।[৭৪০]

অনুরূপ যারা হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, মাযেরী, যেমনটি ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতহুল বারী (৫/১৮৩) এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য ইবন খুযাইমাহ এর এ বক্তব্য মানা হয়নি। এর বিপরীতে অনেক আলেমই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক্ব ইবন রাহওয়িয়াহ, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন হাজার। অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যারা এতে দোষ ধরেছেন তাদের দোষ খণ্ডন করেছেন। দেখুন, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৫/৪৫০); ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (২/৪২০); আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৮১); শাইখ হামূদ আত-তুওয়াইজরী, আকীদাতু আহলিল ঈমান, পৃ. ৭৩-৭৬।

৭৩৯. এ নামে তার কোনো কিতাব পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তা হারিয়ে গেছে অথবা তারই অন্য কোনো বড় কিতাবে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে।

৭৪০. এ হাদীসটি যা 'সূরত এর হাদীস' নামে প্রসিদ্ধ; তার ব্যাখ্যায় আলেমগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে। বিশেষ করে মতভেদের কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে 'সূরাতিহি' শব্দের শেষে অবস্থিত 'হি' সর্বনামটি কোন দিকে ইঙ্গিত করছে সেটা নির্ধারনে? এখানে বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

এক. ইমাম ইবন খুযাইমাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, (যে হাদীসে বলা হয়েছে তোমরা চেহারায় মেরো না), এখানে 'তার সূরত' বলতে 'মাদ্বরূব' বা যাকে প্রহার করা হচ্ছে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'যাদের কাছে ইলম বা জ্ঞানের গভীরতা নেই তারা মনে করেছে, 'তাঁর সূরত' বলতে আমাদের রব্ব 'রহমান' এর সূরতকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের রব্ব মহান ও পবিত্র এ হাদীসের অর্থ হওয়া থেকে। বরং হাদীস 'খালাক্বা আদামা আলা সূরাতিহী' এখানে 'হি' সর্বনামটি দ্বারা প্রহৃত বা প্রহারকৃত বা গালি প্রদানকৃত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আদম 'আলাইহিস সালামকে এ প্রহৃত ব্যক্তির সূরতে সৃষ্টি করেছেন।

এ হচ্ছে উপরোক্ত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবন খুযাইমাহ'র বক্তব্য। আর ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণিত হাদীসটিকে তিনি দুর্বল বলেছেন, যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে জানিয়েছি। তারপর ইবন খুযাইমাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি ইবন 'উমার এর হাদীসটি মারফূ' হিসেবে সনদের দিক থেকে সাব্যস্ত হয়েও যায়, তবুও আমরা বলবো, ইবন 'উমার এর এ হাদীসে 'সূরত'কে রহমানের দিকে সম্বন্ধকৃত করা ঠিক তেমনি মনে করতে হবে যেমনটি স্রষ্টার দিকে সৃষ্টিকে সম্বন্ধকৃত করা হয়। কারণ সৃষ্টিকেও স্রষ্টার দিকে সম্বন্ধ করা হয়, কেননা আল্লাহই তো সেটাকে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ 'সূরত'কে রহমানের দিকে সম্বন্ধকৃত করা হয়, কারণ তিনিই তো 'সূরত' নির্ধারণ করেছেন।' [ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/৮৪-৮৫, ৮৭-৯২)]

ইমাম ইবন খুযাইমাহ'র এ বক্তব্যটিকে আলেমগণ মেনে নেননি। বরং তারা এ বক্তব্যের ভুল ধরেছেন। যেমন:

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ শাইখ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালেক আল-কারজী আশ-শাফে'য়ীর বক্তব্য নিয়ে এসেছেন যে, তিনি তার 'আল-ফুসূল ফিল উসূল' গ্রন্থে বলেন, 'আর যে তা'ওয়ীল এর ওপর ইমামগণ চলেন না, যে তা'ওয়ীলের অনুসরণ ইমামগণ করেন না সেটা অগ্রহণযোগ্য তা'ওয়ীল। যদিও সে তা'ওয়ীলটি কোনো বিখ্যাত ইমাম, অচেনা ব্যক্তি নয়, এমন লোক থেকেই প্রকাশ পেয়ে যাক না কেন, যেমনটি আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন খুযাইমাহ'র দিকে সম্বন্ধ করা হয় যে, তিনি 'খালাক্বা আদামা আলা সূরাতিহী' এর তা'ওয়ীল করেছেন।

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ হাফেয আবু মূসা আল-মাদীনী থেকে বর্ণনা করেন, যা তিনি হাফেয ইমাম কিওয়ামুস সুন্নাহ বলে খ্যাত আবুল কাসেম ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আত-তাইমী যিনি আত-তারগীব ওয়াত তারহীব এর গ্রন্থকার, তার জীবনীতে যা জমা করেছেন তাতে বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব ইবন খুযাইমাহ সূরত সংক্রান্ত হাদীসে ভুল করেছেন। তবে এ কারণেই তার ওপর দোষ দেয়া যাবে না। বরং তার থেকে তা গ্রহণ করা যাবে না এতটুকুই। হাফেয আবু মূসা বলেন, এর দ্বারা আবুল কাসেম আত-তাইমীর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বলা যে, 'এমন ইমাম কমই আছে যার কোনো সামান্য পদস্খলন নেই, যদি এসব ইমামকে এসব পদস্খলনের কারণে পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে অনেক ইমামকেই বাদ দিয়ে

দিতে হবে। আর এটা কখনো করা উচিত হবে না।' [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৪০৯-৪১১); জাওয়াবুল ই'তিরাদ্বাতিল মিসরিয়্যাহ আলাল ফুতইয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ, ১৬৮-১৬৯; আরও দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২০/৮৮)]

তারপর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্নভাবে ইবন খুযাইমাহ'র উপরোক্ত তা'ওয়ীল খণ্ডন করেছেন।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবন খুযাইমাহ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেন, "আর তাওহীদ এর উপর লেখা তার কিতাব, তাতে তিনি 'সূরত' সংক্রান্ত হাদীসের তা'ওয়ীল করেছেন। তাহলে কেউ সিফাতের ক্ষেত্রে এমন তা'ওয়ীল করলে তার জন্যও ওযর তালাশ করা যাবে।... **যদি যারাই তাদের ইজতিহাদে ভুল করে,.. অথচ তার ঈমান বিশুদ্ধ, হকের অনুসরণে তার প্রচেষ্টা নিরন্তর, এমন সকলকে যদি পরিত্যাগ করে বসি তাহলে আমাদের এ নীতিতে তো ইমামগণের মধ্য হতে খুব কমই নিরাপত্তা পাবে। আল্লাহ সকলকে রহমত করুন, তাঁর একান্ত দয়া ও দানে।"** ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/৩৭৬)।

উপরোক্ত মাসআলায় ইমাম ইবন খুযাইমার এর মতটি ইমাম বাইহাকী গ্রহণ করেছেন। দেখুন, বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৭)।

দুই. ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ মনে করেন, এখানে হাদীসে 'সূরত' এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, মালিকানার ভিত্তিতে। যেমন, আল্লাহর ঘর, আল্লাহর উষ্ট্রী,...।' দেখুন, ইবন হাযম, আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল (২/১৭৬)।

তিন. কেউ কেউ হাদীসের তা'ওয়ীল করেছেন এমনভাবে যে, সর্বনামটি আবার আদমের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, এ মতটি নিয়েছেন ফখরুদ্দীন আর-রাযী, আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী আর তাদের অনুসারী কালামশাস্ত্রবিদরা।

চার. কেউ কেউ তা'ওয়ীল করেছেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর কাছে থাকা একটি 'সূরত' অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন।

পাঁচ. কারও কারও মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বক্তব্যের মাধ্যমে নাস্তিক ও সময়ের পূজারী দাহরীদের মতামত খণ্ডন করেছেন। কারণ তারা বলতো, মানুষ তো সর্বদাই বীর্য থেকে এসেছে, আর বীর্য মানুষ থেকে; সুতরাং আলাদা কোনো প্রথম সৃষ্টি ছিল না। তখন এ হাদীস দিয়ে বর্ণনা করে দেয়া হলো যে, আদম 'আলাইহিস সালামকে প্রথমবারেই এ সূরতে সৃষ্টি করা হয়েছে, বীর্য থেকে নয়।

ছয়. কারও কারও মতে, এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য প্রকৃতিবাদীদের বক্তব্য খণ্ডন করা, যারা মনে করে থাকে মানুষ সম্ভবত প্রকৃতির কর্ম ও তার প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হয়েছে, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করলেন।" অর্থাৎ প্রকৃতির কোনো কারসাজি ও প্রভাবে নয়।

এ রকম বহু বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এখানে রয়েছে।

দেখুন, ইবন কুতাইবাহ, তা'ওয়ীলু মুখতালাফুল হাদীস, পৃ. ১৪৮-১৪৯; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৬); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১১/৩), (৫/১৮৩); ইবন ফুওরাক, মুশকিলুল হাদীস, ৬-৫; ইবন জামা'আহ, ঈদ্বাহুদ দলীল ফী কাত'য়ি হুজাজি আহলিত তা'ত্বীল, পৃ. ১৫৪-১৫৫; নাওয়াওয়ী, শারহু মুসলিম (১৬/১৬৬); গাযালী, ইলজামুল 'আওয়াম 'আন ইলমিল কালাম, পৃ. ৫৬; ইবনুল জাওযী, দাফ'উ শুবাহিত তাশবীহ বি আকুফফিত তানযীহ, পৃ. ৪৬-৫৪, শাইখ হামূদ আত-তুওয়াইজরী, আকীদাতু আহলিল ঈমান, পৃ. ৫০-৫১।

ইমাম ও আলেমগণ এসব ফাসিদ তা'ওয়ীল ও তাহরীফ এর যথাযোগ্য জবাব দিয়েছেন এবং এগুলোকে খণ্ডন করেছেন।

সাত. বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এর মধ্যস্থিত সর্বনাম 'তাঁর' দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আদমকে আল্লাহর সূরতে সৃষ্টি করেছেন। এ মতটিই পূর্বাপর যুগ যুগ ধরে সালাফে সালেহীনের অনুসারী আলেম ও ইমামগণের। তারা আল্লাহর জন্য 'সূরত' গুণটি সাব্যস্ত করেন অন্যান্য গুণের মতোই। সুতরাং আল্লাহর জন্য তা তেমনিভাবে সাব্যস্ত হবে যেভাবে তাঁর জন্য শোনা, দেখা, চেহারা, পা ইত্যাদি গুণ সাব্যস্ত করা হয় যা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণে যাওয়া যাবে না, আর আল্লাহ তা'আলাকে কোনো সাদৃশ্য ও কারো মত হওয়া থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

ইমাম ইবন কুতাইবাহ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর জন্য 'সূরত' গুণটি সাব্যস্ত করেছেন এবং তিনি বাকী সকল তা'ওয়ীল অস্বীকার করেছেন এবং সেগুলোকে বাতিল বলেছেন। তারপর বলেন, 'আর যা আমার নিকট গ্রহণযোগ্য তা হচ্ছে, আল্লাহ ভালো জানেন, আল্লাহর জন্য 'সূরত' সাব্যস্ত করা কোনোভাবেই তাঁর জন্য দু' হাত, আঙুল ও চোখ সাব্যস্ত করার চেয়ে আশ্চর্যজনক নয়। এগুলো

কুরআনে আসার কারণে সেগুলো সহজ সাবলীলভাবে গ্রহণীয় হয়েছে, আর এটি কুরআনে না আসার কারণে অসাবলীল মনে হচ্ছে, আর আমরা এসবের ওপরই ঈমান আনি, এসবের কোনো কিছুতেই আমরা ধরণ বা সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে সীমা নির্ধারণ করি না।' দেখুন, ইবন কুতাইবাহ, তা'ওয়ীলু মুখতালাফুল হাদীস, পৃ. ৬০০।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল থেকেও এ গুণটি সাব্যস্ত করা এবং যারা এ অর্থের বাইরে অন্য প্রকার তা'ওয়ীল করেছে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি খাল্লাল বর্ণনা করেন আবু ত্বালেব থেকে দু' সূত্রে। তিনি বলেন, আমি আবু আব্দিল্লাহ (আহমাদ ইবন হাম্বল)কে বলতে শুনেছি, যে বলবে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে আদমের সূরতে সৃষ্টি করেছেন সে জাহমী; আদমকে সৃষ্টি করার আগে আদমের সূরত কোত্থেকে এলো?

অপর বর্ণনায়, ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হে আবু আব্দুল্লাহ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন', এর দ্বারা কি আদমের সূরত বুঝানো হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, তাহলে অপর হাদীস 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে রহমানের সূরতে সৃষ্টি করেছেন' সেটা কোথায় যাবে? আর আদম সৃষ্টির আগে তার সূরত কোত্থেকে আসলো?' দেখুন, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৮৮, ৯০)।

তার ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, এক লোক আমার পিতাকে প্রশ্ন করেন, অমুকে বলে, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' হাদীসটিতে তাঁর সূরত বলে লোকটির সূরত বুঝানো হয়েছে, তখন আমার পিতা বললেন, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে, এ তো জাহমিয়্যাদের কথা, তাহলে কথার উপকারিতা কোথায়? দেখুন, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৮৮)।

অনুরূপ খাল্লাল বর্ণনা করেন আবু বকর আল-মাররূযী থেকে, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দিল্লাহকে বলতে শুনেছি, আমি অবশ্যই হুমাইদীকে সুফইয়ান ইবন উয়াইনাহ এর উপস্থিতিতে আলোচনা করতে শুনেছি, তারপর সেখানে এ হাদীস 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এর আলোচনা আসলে হুমাইদী বললেন, যে কেউ আদমকে আল্লাহর সূরতে সৃষ্টি করার কথা বলবে না, সে এমন এমন, অর্থাৎ তিনি গালি দিচ্ছিলেন। আর সুফইয়ান চুপ ছিলেন, তার কথার কোনো প্রত্যুত্তর করেননি।

মাররূযী বলেন, আমার মনে হচ্ছে, আমি আবু আব্দিল্লাহর নিকট বসরার এমন এক মুহাদ্দিসের কথা উল্লেখ করেছি যিনি বলে থাকেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তার সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এর অর্থ মাটির সূরতে। তখন ইমাম আহমাদ বললেন, সে জাহমী। আর তিনি বলেন, হাদীস যেভাবে এসেছে সেভাবে আমরা মেনে নিব।

বরং ইমাম আহমাদ তাদেরকে জাহমী বলেছেন, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদিকে সর্বনামটিকে ঘুরিয়ে নেয়। তিনি বলেন, যে বলবে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে আদমের সূরতে সৃষ্টি করেছেন, সে জাহমী। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার আগে তার সূরত কোত্থেকে আসলো? দেখুন, ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/২৬৬), নং ১৯৮; তাতিম্মাতুর রাদ্দি আলাল জাহমিয়্যাহ।

আবু বকর আল-খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ ইসহাক ইবন মানসূর আল-কাউসাজ হতে তার বিখ্যাত প্রশ্নোত্তরে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক থেকে জানার বিষয়ে বলেন, তিনি আহমাদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা চেহারাকে বিকৃত বলো না; কারণ, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' আপনি কি এ হাদীস অনুসারে বলেন? তিনি বলেন, বিশুদ্ধ। আর ইসহাক বললেন, বিশুদ্ধ। আর এটিকে কেবল বিদ'আতী অথবা দুর্বল মতের অধিকারী ব্যক্তিই পরিত্যাগ করতে পারে।' [আজুররী, আশ-শরী'আহ ৬৯৭; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/৫২), নং ৪৬, তাতিম্মাতুর রাদ্দি আলাল জাহমিয়্যাহ; আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৮১)]

এসবই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার নাক্বদুত তা'সীস গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন।

ইমাম আজুররী রাহিমাহুল্লাহ তিনি 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' ও নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আদমকে রহমানের সূরতে সৃষ্টি করেছেন' হাদীসদ্বয়ের বিভিন্ন সূত্র নিয়ে আসার পর বলেন, এসব হচ্ছে এমন সব সুন্নাহ বা রাসূলের দেয়া আদর্শ মুসলিমদের ওপর ফরয হচ্ছে এর ওপর ঈমান আনা। এগুলোতে বলা হবে না, কেমন সেটা? কেন সেটা? বরং সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করতে হবে। আর বেহুদা চিন্তা-গবেষণা করা পরিত্যাগ করতে হবে। যেমনটি মুসলিমগণের পূর্ববর্তী ইমামগণ বলেছেন। দেখুন, আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৩৫১।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ হাদীসের বিভিন্ন সূত্র ও বর্ণনা আনয়ন করার পর বলেন, 'এর ওপর ভিত্তি করে এটা বলা হবে যে, এ হাদীসের ব্যাপারে প্রথম তিন প্রজন্মের সালাফদের মাঝে কোনো মতভেদ ছিল না যে, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এর মধ্যস্থিত 'তাঁর' সর্বনামটি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ তা বিভিন্নভাবে বিখ্যাত হয়ে বর্ণিত হয়েছে একাধিক সাহাবী থেকে। আর হাদীসের পূর্বাপর সম্পর্ক সেটাই প্রমাণ করে।....[বায়ানু তালবীসিল

জাহমিয়াহ (৬/৩৭৩)]

তিনি আরও বলেন, অনুরূপ বর্ণনা আহলে কিতাবদের নিকটে থাকা গ্রন্থসমূহেও নবীদের থেকে এসেছে, যেমন তাওরাত ইত্যাদিতে। সালাফে সালেহীনের কেউ কখনো এটাকে তা'ওয়ীল করতেন না।.. জাওয়াবুল ই'তিরাদ্বাতুল মিসরিয়্যাহ আলাল ফুতইয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

এ হাদীস সম্পর্কে অন্যত্র বলেন, উম্মতের মধ্যে যাদের ইমামত বা নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলে একমত তারা সবাই এ হাদীস সর্বদা বর্ণনা করেছেন, কেউ এ হাদীসকে অস্বীকার করেননি, কেউ তা'ওয়ীলও করেননি। তাদের থেকে এটাই সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। সর্বপ্রথম যার কাছ থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি এটার তা'ওয়ীল করেছেন, যার ইলমে প্রসিদ্ধি ছিল, তিনি হচ্ছেন ইমাম আবু সাওর। জাওয়াবুল ই'তিরাদ্বাতুল মিসরিয়্যাহ আলাল ফুতইয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

তারপর তিনি বলেন, অতঃপর যখন তৃতীয় শতাব্দীতে জাহমিয়্যাদের প্রাদুর্ভাব ঘটলো তখন তারা এ সর্বনামটিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে ফেরানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়; তাদের এ প্রচারে প্রভাবিত হয়ে এমন কথা ইলম ও সুন্নাহ'য় প্রসিদ্ধ এক দল লোক থেকেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আবু সাওর, ইবন খুযাইমাহ, আবুশ শাইখ আল-আসাফানী প্রমুখ। আর সে জন্য দীনের ইমাম আলেমগণ তাদের এসব কথার প্রতিবাদ করেছেন।... (ইবন তাইমিয়্যাহ, নাক্বদুত তা'সীস।)

ইমাম যাহাবী বলেন, আর 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এ হাদীসের প্রকৃত অর্থকে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিব, আর সেভাবেই চুপ থাকবো যেভাবে সালাফগণ চুপ ছিলেন; তবে সাথে সাথে দৃঢ়ভাবে এটা বলবো যে, তাঁর মতো কোনো কিছু নাই।' **দেখুন,** ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (২/৪২০)।

অন্যত্র ইমাম যাহাবী 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, 'সুতরাং আমরা এর অর্থের ওপর ঈমান আনব, ধরণকে সোপর্দ করবো, আর মেনে নিব, যাতে আমাদের কোনো উপকার নেই তাতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো না, তবে অবশ্যই আমরা দৃঢ়ভাবে জানি যে, তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/৪৫০)।

ইমাম আবু ইয়া'লা বলেন, 'দ্বিতীয় অধ্যায়, এটা নিঃশর্তভাবে বলা যে, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' আর এখানকার 'তার' শব্দটি রহমানের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তারপর তিনি হাদীস 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এটিকে নিয়ে আসলেন। তারপর বললেন, এর কারণ হচ্ছে, এটিকে প্রকাশ্য অর্থে বহন করা হলে তা আল্লাহর গুণ হতে অসম্ভব কিছু আসে না, আর সে গুণটিকে যা সে সাব্যস্ত করছে তা যা তার জন্য উপযুক্ত তা থেকে বের করে দিচ্ছে না। কারণ আমরা তাঁর জন্য 'সূরত' শব্দটি ব্যবহার করি তবে তা অন্য সূরতের মত নয়। যেমনিভাবে আমরা তাঁর জন্য যাত ও সত্তা ব্যবহার করি যা অন্য যাত ও সত্তার মত নয়।' ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৮১)।

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আবু বাত্বীন, যিনি নাজদ কেন্দ্রিক দাওয়াতের ইমামগণের একজন, তিনি এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেন এবং যারা এর সর্বনামটিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে বলে মত প্রকাশ করেন তাদের মতামত খণ্ডন করেন, আর আলেমগণ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি নিয়ে আসেন যে, বিশুদ্ধ মতে এ সর্বনামটি 'আল্লাহ তা'আলা' এর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে, এর দ্বারা আল্লাহর সূরতই উদ্দেশ্য। তারপর তিনি বলেন, সুতরাং যা এ রকম হাদীসের ক্ষেত্রে আবশ্যক তা হচ্ছে, এ হাদীসগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে গ্রহণ করা, সন্তুষ্ট হওয়া ও মেনে নেয়া, সাথে সাথে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহই ভালো জানেন।' দেখুন, মাজমূ'আতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল আন-নাজদিয়্যাহ (২/২২১-২২৩)।

এ হচ্ছে এ হাদীসের ব্যাপারে ইমামগণের সঠিক মতের সংক্ষিপ্ত চিত্র। বস্তুত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কেবল এ হাদীস দিয়েই আল্লাহর জন্য 'সূরত' গুণটি সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সমর্থনে তাদের নিকট আরও হাদীস রয়েছে, যেমন:

১- **আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস, যাতে এসেছে, "অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে আসবেন, তাঁর যে সূরত তাদের কাছে পরিচিত তা ব্যতীত অন্য সূরতে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব্ব। তারা বলবে, আমরা আল্লাহর কাছে আপনার থেকে আশ্রয় চাই, এটা আমাদের অবস্থানের জায়গা, আমাদের রব্ব যতক্ষণ না আসবেন ততক্ষণ আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না, আমরা যখন তাঁকে চিনতে পারবো তখনই কেবল অনুসরণ করবো, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে সে 'সূরতে' আগমন করবেন যে সূরতে তারা তাঁকে চিনে।' ... আল-হাদীস। বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭৪৩৭; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮২। **ইমাম আবু ইয়া'লা এ হাদীস বর্ণনার**

পর বলেন, জেনে রাখ যে, এ হাদীসটি আল্লাহর জন্য 'সূরত' সাব্যস্ত করছে, তাঁর জন্য 'আগমন' সাব্যস্ত করছে। আর এটা নিষিদ্ধ নয় যে, তাঁর জন্য আমরা 'সূরত' সাব্যস্ত করবো, যে সূরত অন্য কোনা সূরত এর মতো নয়। যেমনিভাবে তাঁর জন্য নাফস ও যাত ব্যবহার করি তবে অন্য কোনো নাফস ও যাত এর মত নয়।' ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/১৫১)।

২- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন, যার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত, অতঃপর যখন তাকে সৃষ্টি করলেন তখন বললেন, যাও সেসব ফিরিশতাদের দিকে, তাদেরকে সালাম দাও, শোন তারা তোমাকে কী অভিবাদন জানায়?...' বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৫৮৭৩, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮৪১।

৩. অনুরূপ ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা চেহারাকে বিকৃত করো না, বা বিকৃত হোক বলে গালি দিও না; কারণ বনী আদমকে রহমানের সূরতে সৃষ্টি করা হয়েছে।' যা সংকলন করেছেন,

- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/৩৬২), নং ৫২৯।
- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ ৪৯৮, ১০৭৬।
- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ, ৪১।
- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৬৪), নং ৬৪০।

৪. তাছাড়া অপর একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি আমার রবকে সুন্দর সূরতে দেখেছি...।" যা সংকলন করেছেন,

- আহমাদ, আল-মুসনাদ (৫/২৪৩)।
- তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩২৩৫।
- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৪৬৫-৪৭১।

হাদীসটিকে ইমাম ইবন আরাবী তাঁর আহকামুল কুরআন (৪/৭৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শাইখ আহমাদ শাকের ও শাইখ আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন। সুতরাং এ হাদীস থেকেও আমরা আল্লাহর জন্য 'সূরত' গুণটি সাব্যস্ত করতে পারি।

তবে একটি বিষয় এখানে সাবধান করা দরকার তা হচ্ছে,

এ হাদীসে বর্ণিত 'সূরত' গুণটি সাব্যস্ত করার ব্যাপারে যেসব আলেম তা'ওয়ীলের আশ্রয় নিয়েছেন, তারা সবাই সুন্নাত থেকে সমান দূরত্বে নন। তাদের মাঝে যাদের ইমাম হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত, যেমন আবু সাওর, ইবন খুযাইমাহ, ইবন মান্দাহ, আবুশ শাইখ আল-আসফাহানী, এদের ব্যাপারে দোষারোপ করে কথা বলা ঠিক হবে না। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৪০৯-৪১১); জাওয়াবুল ই'তিরাদ্বাতিল মিসরিয়্যাহ আলাল ফুতইয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ১৬৮-১৬৯।

এ হাদীসের ব্যাপারে যিনি বেশি আলোচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তার বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে প্রায় একশত পৃষ্ঠা এ নিয়ে আলোচনা করেছেন (৬/৩৫৫-৬২১)। তার আলোচনা থেকে কিছু ফায়েদা এখানে বর্ণনা করা হলো:

১- 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এ হাদীস ও অনুরূপ হাদীসের ভাষ্যে শরী'আতে যা এসেছে তা শুধু বিশেষভাবে প্রমাণিত, সাধারণ বিবেকের যুক্তি দ্বারা যা জানা যায় তা থেকে আরও বেশি বিশেষ অর্থে সেটা; কারণ সাধারণ বিবেকের যুক্তি হচ্ছে, যে কোনো অস্তিত্বশীল বস্তু ও তার মতো অপর অস্তিত্বশীল বস্তুর মাঝে অর্থের দিক থেকে মুশতারাক বা কমন অংশিদারিত্বের বিষয় থাকে। অনুরূপ প্রতিটি অস্তিত্বশীল দু'টি জীবিত সত্তার মাঝেও কমন একটি অংশে মিল থাকে। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৫১৬)]

২- 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এ হাদীস দ্বারা এক ধরণের সাদৃশ্য বুঝায় মাত্র, একই রকম হওয়া কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না, বাস্তবেও না, পরিমাণেও না। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৫৩২)]

৩- হাদীস 'তোমরা চেহারাকে তাক্ববীহ করো না' এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা বলো না যে আল্লাহ তোমার চেহারা বিকৃত করে দিন বা অনুরূপ কিছু। কারণ 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, চেহারা বিকৃত করার বদ-দো'আ করতে বাধার কারণ হচ্ছে তার চেহারা আল্লাহর সূরতের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য রাখে, যদি এমন 'সূরত' উদ্দেশ্য হতো যা আল্লাহ সৃষ্টি করবেন, তাহলে সে অবস্থায় তিনি যে আল্লাহর মাখলুক বা সৃষ্ট সেটা আরো বেশি নিষেধের কারণ হতো, সেটার তুলনায় যেটি তিনি সৃষ্টি করবেন। তখন পূর্ণ কারণ থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ কারণের দিকে কথাকে ফিরোনো হয়ে যায়। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৫৩৯)]

৪- যদি হাদীস 'আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এখানে সূরত এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে মালিকানা কিংবা সৃষ্টির সম্বন্ধ হতো তাহলে তো শরীরের কোনো অঙ্গেই আঘাত করা নিষিদ্ধ হতো; কারণ সে অংশকে আল্লাহর মালিকানা বা সৃষ্টির দিকে সম্পৃক্ত করা কোনোভাবেই চেহারার সেদিকে সম্পৃক্ত হওয়ার চেয়ে কম নয়, বরং সমপর্যায়ের। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৫৩৮)]

৫- একই হাদীসের বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্য করে রাখা হাদীসের ব্যাখ্যায় ভুল করার বড় কারণ। কারণ এ হাদীসটি যদি সকল শব্দে বর্ণনা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে কোনোভাবেই 'তাঁর' সর্বনামটি আদমের দিকে ফিরানোর কোনো সুযোগ নেই। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৪৩৪-৪৩৫)]

৬- যেসব গুণাবলি অন্যের ওপর ভর করে থাকে, যেমন জ্ঞান, ক্ষমতা, কথা ইত্যাদি যখন তা কোনো কিছুর দিকে সম্বন্ধিত হয় তখন সেটি সত্তার সাথে গুণাবলির সম্বন্ধ বলে বিবেচিত হয়। কারণ এগুলোর জন্য একটি মাওসুফ বা সত্তা লাগবেই যার সাথে তা সম্পৃক্ত হবে, সম্বন্ধিত হবে। যদি তাই হয়, তবে 'সূরত' এমন একটি গুণ যা কেবল সূরত দেয়া সত্তার সাথেই থাকতে পারে, আলাদাভাবে অস্তিত্বে আসতে পারে না। তাই আল্লাহর 'সূরত' হবে আল্লাহর চেহারা, আল্লাহর হাত, আল্লাহর ইলম, আল্লাহর কুদরত ইত্যাদির মতই, যা শুধু সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে, অন্য কিছুর ওপর দাঁড়াতে পারে না। [বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৫৩৪-৫৩৬)]

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে 'আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে রহমানের সূরতে সৃষ্টি করেছেন' এ হাদীসের ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আদমকে আল্লাহর সূরতে সৃষ্টি করেছেন এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে শ্রোতা, দ্রষ্টা, যখন ইচ্ছা কথা বলতে সক্ষম করে সৃষ্টি করেছেন, তারও রয়েছে চেহারা, আর এগুলো আল্লাহরও গুণ, তিনিও সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, যখন ইচ্ছা তখন কথা বলতে সক্ষম, তাঁরও রয়েছে চেহারা।

মনে রাখা দরকার যে, এ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সাদৃশ্য প্রদান করা যাবে না। বরং আল্লাহর যে সূরত সৃষ্টির কারও এ সূরত নেই। বরং অর্থ হচ্ছে, তিনি আল্লাহ শ্রোতা, দর্শক, যখন যা ইচ্ছা কথা বলতে সক্ষম, অনুরূপভাবে তিনি আদমকেও শ্রোতা, দর্শক, চেহারাওয়ালা, হাতওয়ালা, পা ওয়ালা করে সৃষ্টি করেছেন। তবে আল্লাহর শোনা আর বান্দার শোনা সমান নয়, আল্লাহর দেখা আর বান্দার দেখা সমান নয়, আল্লাহর কথা বলা আর কথা বলা সমান নয়, বরং আল্লাহর গুণাবলি তাঁর সম্মান ও মর্যাদার উপযোগী। আর বান্দার গুণাবলি তার সাথে উপযোগী করেই সাব্যস্ত করতে হবে, যে গুণাবলিতে দোষ-ত্রুটি আপতিত হয়, অপর দিকে আল্লাহর গুণাবলি পূর্ণ, যাতে কোনো প্রকার ত্রুটি, বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া আপতিত হওয়ার নয়। এজন্যই আল্লাহ বলেন, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ১১] অনুরূপ আল্লাহ বলেন, "আর তাঁর সমকক্ষ কেউ হতে পারে না।" [সূরা আল-ইখলাস: ৪] সুতরাং চেহারাতে আঘাত করা ও চেহারাকে বিকৃত করা বা করার জন্য দো'আ করা জায়েয হবে না। দেখুন, ইবন বায, মাজমূ' ফাতাওয়াশ শাইখ (৪/২২৬)।

এ হাদীসটিকে যা স্পষ্ট করে দিবে তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদীস। যাতে বলা হয়েছে, 'প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা চাঁদের সূরতে প্রবেশ করবে'। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩২৪৫, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮৩৪] এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য, প্রথম দল যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা মানুষের সূরতে প্রবেশ করবে তারা তাদের সৌন্দর্য, ঔজ্জ্বল্য, কমনীয়তা, চেহারার গোলাকৃতি ও অনুরূপ দিক থেকে চাঁদের সূরতে হবে। এ হাদীসেও তাদের সূরতকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু পূর্ণ সমতা কিংবা পুরো সাদৃশ্য করে নয়। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কোনো কিছু অপর কিছুর সূরতে বলা হলেই তা দ্বারা সর্বদিক থেকে তা অন্যটির মতো হতে হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর সূরতে সৃষ্টি করেছেন' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আদমকে মহান আল্লাহর নিজ সূরতে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যেমন রয়েছে চেহারা ও চোখ, রয়েছে তাঁর হাত ও পা, তেমনি আদমেরও রয়েছে চেহারা, তার রয়েছে চোখ, তার রয়েছে হাত, তার রয়েছে পা।.... কিন্তু আল্লাহর এসব গুণ কক্ষনো মানুষের গুণের মত হওয়া আবশ্যক করে না। তবে সেখানে একপ্রকার সার্বিক মিল থাকবে, কিন্তু কখনো তা হুবহু নয়। যেমনিভাবে যারা জান্নাতে প্রথম যাবে তাদের সাথে চাঁদের একটি মিল থাকবে, কিন্তু তা হুবহু নয়।

এভাবেই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহ তা'আলার নাম গুণের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেছে তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহের কোনোটিই সৃষ্টির

[قول أهل الحق في بعض المسائل التي خالف فيها أهل البدع]:

ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها: وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة.

ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر.

[কিছু মাসআলায় বিদ'আতীদের বিরোধীতার জবাবে হকপন্থীদের বক্তব্য]

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, আর আমরা 'উসূলুস সুন্নাহ' বা আকীদাহ'র মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করব, অনুরূপভাবে আমরা যা বিশ্বাস করি তাতে পথভ্রষ্ট বক্রপথ অবলম্বনকারীদের দ্বারা তাতে যে মতভেদ করে আমাদের বিরোধিতা করা হয়েছে তাও বর্ণনা করবো। আর তাও বর্ণনা করবো, যাতে আমরা সিফাত সাব্যস্তকারী আহলুল হাদীসের সাথে একমত হয়েছি।

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] ইমামত তথা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ উল্লেখ করেছেন, সেখানে ইমামতের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতির পক্ষে দলীল প্রমাণাদি পেশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুহাজির ও আনসারগণ আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে তাদের খলীফা হিসাবে সবার অগ্রে গ্রহণ করেছেন, এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।[৭৪১]

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, 'বান্দার কর্মসমূহ সৃষ্ট' হওয়ার পর মতভেদ হয়েছিল যে, এগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর এর অন্তর্ভুক্ত কী না? তারপর তিনি বলেন, আর আমাদের কথা হচ্ছে, নিশ্চয় বান্দাদের যাবতীয় কর্ম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর

কারও গুণের সাথে সমপর্যায়ের নয়। তাই আল্লাহর গুণাবলিকে কোনো প্রকার বিকৃতি, নিষ্ক্রীয়করণ, কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ ও সাদৃশ্য প্রদান ব্যতীতই সাব্যস্ত করতে হবে। [এর চেয়ে বেশি বুঝার জন্য দেখুন, মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন, শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ (১/১০৭, ২৯৩); আরও দেখুন, শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান, শারহু কিতাবুত তাওহীদ (২/৩৩-৯৮)]

৭৪১. এখানে যা উল্লেখ করা হলো বর্তমান শিয়াদের শিংহভাগ এর বিরোধিতা করে থাকে। তারা মনে করে থাকে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে ইমাম বা খলীফা হচ্ছেন আলী ইবন আবী তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু, তাদের নিকট আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর ইমাম হওয়ার বিষয়টি সরাসরি রাসূলের নস বা দ্ব্যর্থহীন ভাষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে বলে দেয়া। তারা আরও বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর কথা শুনতে ও তার আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দেখুন, ত্বাবারসী, ই'লামুল ওরা বিআ'লামিল হুদা, পৃ ১৬২; আন-নু'মানী, আল-গাইবাতু, পৃ. ৩৫-৩৬; আব্দুল হুসাইন আল-মুযাফফর, আশ-শাফী ফী শারহি উসূলিল কাফী (২/২৯৪)।

আর তাদের এসব দাবীর খণ্ডন দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (১/৪৮৬-৫৩২); মাকদেসী, আর-রাদ্দু আলার রাফেদ্বাহ, পৃ. ৭২; ইবন হাযম, আল-ফাসলু (৪/১৭৬-১৭৯); শাহ আব্দুল আযীয আদ-দেহলাওয়ী, মুখতাসারুত তুহফাহ আল-ইসনা আল-আশারিয়্যাহ, পৃ. ১২৩, ১৩৮-২৪০; সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৮৭-৮৯; ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৬৯৮-৭১০)।

ইমাম মাকদেসী রাহিমাহুল্লাহ যখন তার 'আর-রাদ্দু আলার রাফিদ্বাহ' গ্রন্থে শিয়াদের মতামত খণ্ডন করছিলেন তখন আবু আব্দিল্লাহ ইবন খাফীফ এর উক্ত মতটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এর অন্তর্ভুক্ত; আর সেগুলো আল্লাহর জানা রয়েছে।(৭৪২) আর তিনি তাক্বদীর সাব্যস্ত করার

---

৭৪২. ইবন খাফীফ রাহিমাহুল্লাহর এ কথার মাঝে কাদরিয়া মু'তাযিলাদের সে কথার খণ্ডন রয়েছে, যাতে তারা দাবি করে বলে থাকে যে, বান্দা তার নিজে কর্মকাণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজের কাজ নিজে সৃষ্টি করে, এতে আল্লাহর কোনো ইচ্ছা কিংবা সৃষ্টি কিংবা চাওয়া নেই; এভাবে তারা আল্লাহর ব্যাপক চাওয়া ও সৃষ্টি অস্বীকার করে। এরাই হচ্ছে মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারী লোকেরা।

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী বলেন, মু'তাযিলারা সকলেই একমত যে, আল্লাহ তা'আলা কুফর ও গোনাহ সৃষ্টি করেননি। অনুরূপভাবে তারা এটাতেও একমত যে, তিনি অন্য কারও কর্ম সৃষ্টি করেননি। দেখুন, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২২৭।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আর বান্দাদের কর্ম, কাদারিয়া ব্যতীত কেউ বলেনি যে, এগুলো আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। কাদারিয়ারা বলে, আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করেননি, তাদের অন্যতম গোষ্ঠী হচ্ছে মু'তাযিলা ও অনুরূপ গোষ্ঠীর লোকেরা। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৪১৫)।

তিনি এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, বান্দার কর্মকে যারা আল্লাহর সৃষ্টি থেকে বের করে দেয় তাদের মধ্যে রয়েছে কিছু ফিকহের দাবিদার, কিছু কালামশাস্ত্রবিদ। আর এ নীতির ওপরই রয়েছে পরবর্তী শিয়া সম্প্রদায়। তিনি বলেন, 'এটিতে ফিকহের দাবিদার ও কালামশাস্ত্রবিদদের অনেকেই পতিত হয়, হয় বিশ্বাসের দিক থেকে অথবা বাস্তব অবস্থার দিক থেকে, যেমন তাতে পতিত হয়েছে আকীদাহ'র দিক থেকে মু'তাযিলারা ও পরবর্তী শিয়ারা। আর এর দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছেন বেশ কিছু বসরী ও শামী লোকজন। আবার কখনও কখনও যারা আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধকে সম্মান করে, কিন্তু যথাযথভাবে তাক্বদীর ও ফয়সালার বিষয়টির দিকে লক্ষ্য না রাখার কারণে বাস্তব অবস্থায় কেউ তাতে পতিত হয় যদিও আকীদাগত তার সে রকম বিশ্বাস নেই।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/২৫৮-২৫৯); ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (১/৭২, ১৩৪)।

তাদের বিপরীতে আরেক দলের উদ্ভব হলো, যারা তাক্বদীর সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করলো, এমনকি বান্দাকে তার কাজ করতে বাধ্য হিসেবে সাব্যস্ত করলো, তাদের মতে বান্দার কোনো পছন্দ করার কিছু নেই। তার কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই, তার কোনো ইচ্ছা নেই, তার দিকে রূপকভাবে শুধু কোনো কাজ করার সম্পর্ক করা হবে। তারা আরও বলে, বরং সে যেন বাতাসে পাখির পালকের মতো, অনুরূপ যেন একটি যন্ত্র যা যেভাবে ইচ্ছা যন্ত্রের মালিক নড়াচড়া করছে। বস্তুত এটিই হচ্ছে জাহমিয়্যাদের মতাদর্শ। এ মতাদর্শকে জাবরিয়া মতাদর্শ বলা হয়; কারণ তারা বলে আমাদের কর্মকাণ্ড করার ক্ষেত্রে মাজবূর বা বাধ্যগত। তাদের এ মতের প্রচ্ছন্ন অনুসরণ রয়েছে আশ'আরীদের কাছে, যা (জাবরে মা'নাউয়ী) বা অস্পষ্ট (অভ্যন্তরীন) বাধ্য-বাধকতা নামে খ্যাত। আর সেটাকেই তারা 'কাসব' বলে থাকে।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাদের এ মতাদর্শের বিষয়টি একাধিক গ্রন্থের অনেক জায়গায় আমাদের জানিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আর তারা বান্দার পছন্দ করার ক্ষমতা, বান্দার সক্ষমতা, বান্দার ইচ্ছা করার সুযোগ এসবই ছিনিয়ে নিয়ে থাকে, বান্দাকে তারা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বাধ্য বলে মনে করে, তারা মনে করে বান্দার যাবতীয় কর্মকাণ্ড জড়পদার্থের নড়াচাড়ার মতোই। তারা বান্দার যাবতীয় পছন্দনীয় কর্মকাণ্ড ও বাধ্যগত কর্মকাণ্ডকে একই ধরনের মনে করে থাকে।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৪৪৪-৪৪৫)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, সর্বপ্রথম এ কথাটি যে ব্যক্তি বলেছে বলে প্রসিদ্ধ সে হচ্ছে জাহম ইবন সাফওয়ান। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৪৬০)।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে জাবরিয়াদের এ মতবাদটি অনেক সূফীদের মাঝে ব্যাপক প্রচার-প্রসার পেয়েছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/২৩০)।

এরা তাদের মতাদর্শ সাব্যস্ত করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে, যেসব আয়াতে বান্দার কর্মকাণ্ডকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে:

১- আল্লাহর বাণী, "সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং এটা মুমিনদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষার (মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করার) জন্য; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আল-আনফাল: ১৭]

২- আল্লাহর বাণী, "তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আল্লাহর

কাছ থেকে।' আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আপনার কাছ থেকে।' বলুন, 'সবকিছুই আল্লাহর কাছ থেকে।' এ সম্প্রদায়ের কি হল যে, এরা একেবারেই কোন কথা বুঝে না!" [সূরা আন-নিসা: ৭৮]

৩- আল্লাহর বাণী, "আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ ইচ্ছে করেন।" [সূরা আত-তাকওয়ীর: ২৯] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

অপরদিকে পূর্বোল্লিখিত কাদারিয়া মতবাদের লোকেরা তাদের দাবির সপক্ষে কুরআনের সেসব আয়াত দিয়ে দলীল দিয়ে থাকে, যাতে বান্দার জন্য কর্ম ও ইচ্ছা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যেমন:

১- আল্লাহর বাণী, "যা কিছু কল্যাণ আপনার হয় তা আল্লাহর কাছ থেকে এবং যাকিছু অকল্যাণ আপনার হয় তা আপনার নিজের কারণে এবং আপনাকে আমরা মানুষের জন্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছি; আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" [সূরা আন-নিসা: ৭৯]

২- আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক!" [সূরা আল-মুযযাম্মিল: ১৯]

৩- আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় এ কুরআন তো সকলের জন্য উপদেশবাণী। অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৫৪-৫৫] ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

আমরা বলি, প্রতিটি গোষ্ঠীই এখানে দলীলসমূহের একটি অংশ ধরেছে আর অপর অংশকে নিষ্ক্রীয়করণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের সালাফে সালেহীন ও তাদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, তারা উভয় প্রকার দলীল গ্রহণ করেছেন। তারা উভয় মতাদর্শের মধ্যখানে অবস্থান করেছে। তারা বলে, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের নির্ধারণ ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না, আর বান্দার ভালো বা মন্দ সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ যাবতীয় অবাধ্যতা ও আনুগত্য, কুফর ও ঈমান এসবের কোনো কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালার বাইরে নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ইচ্ছা ও পছন্দ করার ইখতিয়ার প্রদান করেছেন এবং তাকে তা করার ক্ষেত্রে সামর্থ্য প্রদান করেছেন। তাই সে যদি চায় ঈমান আনতে পারে, আর যদি চায় কুফরী করতে পারে। আর বান্দা বাস্তবেই তার কর্ম করতে সক্ষম, আর তার দিকেই তার কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা তৈরি হবে। আল্লাহ তা'আলা কাফেরের কুফরীর ইচ্ছা করেন ও তা সংঘটিত হওয়া চান, কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট নন, পছন্দও করেন না। তাঁর সে চাওয়াটি হচ্ছে প্রাকৃতিক বা রুবুবিয়াত কেন্দ্রিক চাওয়া। আর কুফুরীর অপছন্দ করা, কুফুরীর কারণে অসন্তুষ্ট হওয়াটি হচ্ছে তাঁর দীনী বা উবুদিয়াত কেন্দ্রিক, তাই তিনি তা দীনীভাবে চান না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ মতাদর্শের ওপর সালাফে সালেহীনের ঐক্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আহলুস সুন্নাহ'র মধ্যে অধিকাংশ যারা সালাফ ও খালাফ রয়েছেন তারা বলেন, বান্দার রয়েছে ক্ষমতা, ইচ্ছা ও কর্ম। বান্দা সেটা বাস্তবেই করে, আল্লাহ তা'আলা সেসব কিছুরই স্রষ্টা, যেমন তিনি যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা। এর ওপরই কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণবহ। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৩/১১০); মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৪৬০)।

তিনি আরও বলেন, বিবেকের যুক্তিও এটাই প্রমাণ করে যে, বান্দার কাজ বান্দার দিকেই সম্পৃক্ত করা হবে, অন্যের দিকে নয়, তিনি সেটার ব্যাখ্যা করে বলেন, 'শরী'আত ও আকল তথা বিবেকের যুক্তি উভয়েই এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো মানুষকে তার কর্মের কারণে প্রশংসা করা হবে কিংবা নিন্দা করা হবে। আর সেটা তার জন্য নেক হবে অথবা বদ হবে। যদি অন্যের দিকেই সেসব কর্ম সম্পৃক্ত করা হবে তবে তো সেটার জন্য সে অন্য ব্যক্তিই প্রশংসিত কিংবা নিন্দিত হতো।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/১২); আরও দেখুন, আস-সাফাদিয়্যাহ (১/১৫৪)।

এ অধ্যায়ে বিভিন্ন ফির্কার পথভ্রষ্টতার মূল কারণ, যা তাদেরকে এ ভ্রষ্টতায় নিপতিত করেছে তা হচ্ছে, আল্লাহর চাওয়া ও ইচ্ছা আর আল্লাহর ভালোবাসা ও পছন্দকে একাকার করে দেখা। জাবরিয়া ও কাদরিয়া উভয় ফের্কা এখানে সমান। জাবরিয়াদের কথা হলো, জগতের সবকিছু যেহেতু মহান আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের মাধ্যমে নির্ধারিত সুতরাং সেসব কিছুই তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক হতে বাধ্য। অপরদিকে কাদারিয়ারা বলে, যেহেতু গুনাহ ও অপরাধ আল্লাহর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক বিষয় নয়, তাই সেগুলো তাঁর ফয়সালা ও তাকদীরের অধীনও নয়।

এভাবেই উভয় ফির্কা পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। আর আল্লাহ তা'আলা আহলুস

বিষয়টি উল্লেখ করেন।

তারপর তিনি 'কবীরা গুনাহকারী'দের ব্যাপারে মতভেদ উল্লেখ করেন।(৭৪৩)

সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে এর মাঝখানে এনে উভয় ফির্কার বিভ্রান্তিগুলো বুঝে সেগুলোর মাঝে পার্থক্য করার তৌফিক দিয়ে হিদায়াত দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহ'র সরাসরি প্রমাণের ওপর নির্ভর করেছে, তারা সকল আয়াত ও হাদীসের ওপর যথাযথ আমল করতে সমর্থ হয়েছে।

দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/২৫৬-২৬১), (১৩/৩৬-৩৭); মাজমূ'আতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল, পৃ. ১৫০-১৫২, ১৬৯; বাইহাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ পৃ. ৫৩-৭৩; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৫৩৪-৭৪৬); আল-আইন ওয়াল আসার ফী আক্বায়িদি আহলিল আছার, পৃ. ৪১; সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (১/২৯৮-৩২০); হাকামী, মা'আরিজুল কবুল (৩/৩৪৮-৩৬৩)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে আলাদা গ্রন্থও লিখেছেন, যার নাম: শিফাউল আলীল ফিল ক্বাদায়ি ওয়াল কাদারি ওয়াল হিকমাতি ওয়াত তা'লীল। তাছাড়া শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এর মাজমূ' ফাতাওয়া ৮ম খণ্ড এ বিষয়ের আলোচনা সমৃদ্ধ।

বিষয়টি সম্পর্কে আরো দেখুন, বাগদাদী, উসূলুদ দীন, পৃ. ১৩১-১৩৪, ১৪৫; বাকেল্লানী, আল-ইনসাফ, পৃ. ২০৫-২৩৯; জুওয়াইনী, লুমা'উল আদিল্লাহ, পৃ. ১২০-১২১; আল-গুনইয়াতু ফী উসূলিদ-দীন, পৃ. ১২৬-১২৭; বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ৩১৭-৩৬৮; আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২২৭-২২৮; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/৯৮); আব্দুল জাব্বার আল-মু'তাযেলী, শারহুল উসূলিল খামসাহ, পৃ. ২২৯।

৭৪৩. কবীরা গুনাহকারীদের বিষয়টি এমন একটি মারাত্মক মাসআলা যা নিয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাহাবায়ে কিরামের পরে কিছু মানুষের মাঝে মতভেদ হয়েছিল। বরং অনেক আলেম গুনাহের কারণে কাফের বলার বিষয়টি উম্মতের মাঝে সংঘটিত প্রথম বিদ'আতও বলেছেন। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/৩১)] ইবন কাসীর বলেন, তখন খারেজীদের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গিয়েছিল, তারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বিরোধিতা করছিল এমনকি সরাসরি কাফেরও বলছিল। [ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১০/৫৭৭)] মুহাক্কিকগণ একমত যে খারেজীরা প্রথম আলী, উসমান, জামালের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, যুদ্ধের মীমাংসাকারী পক্ষদ্বয়, আর যারা মীমাংসায় রাযী হয়েছিল তাদের সকলকে কাফের ঘোষণা করেছিল। [আল-আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন (১/১৬৭); বাগদাদী, আল-ফারক্বু বাইনাল ফিরাক্ব, পৃ. ৭৩; আসফারায়ীনী, আত-তাবসীর ফিদ দীন, পৃ. ৪৫] এভাবে খারেজী ও তাদের অনুসারী মু'তাযিলারা যারা ঈমানদার হওয়ার পর গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে তাদেরকে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া আবশ্যক করে ফেলে। তাদের মত হচ্ছে, যে কেউ জাহান্নামে যাবে সে সেখানে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। তাদের মতে একই ব্যক্তির জন্য সাওয়াব ও শাস্তি একত্রিত হতে পারে না। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মু'তাযিলা ও খারেজীদেরকে (ধমক বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক এ নীতির কারণে) 'ও'য়ীদিয়্যাহ' বলে নাম দিয়ে থাকেন। কারণ মু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা কবীরা গুনাহকারীর ওপর শাস্তির বাস্তবায়ন আল্লাহর ওপর ফরয করে দেয়; কেননা তাদের মতে কুরআন ও সুন্নাহ'য় তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ধমকি এসেছে, আর আল্লাহ ওয়াদার বিপরীত করেন না। মু'তাযিলারা এ বিষয়টিকে এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, তারা সেটাকে ঈমানের মূনীতির মতই একটি মূলনীতি হিসাবে দেখে তাদের বিখ্যাত পাঁচ মূলনীতির একটি বানিয়ে নিয়েছে। তাদের মতে যারা এ পাঁচ মূলনীতির বিরোধিতা করবে তারা কাফের। তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতের বিরোধিতা করে কবীরা গুনাহকারীর ওপরে ধমকির বাস্তবায়ন ও তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কথা বলে। এজন্য খারেজী ও মু'তাযিলারা কবীরা গুনাহকারীর জন্য আমাদের নবীর সেসব সুপারিশকে অস্বীকার করে যাতে কবীরা গুনাহকারীকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে বলা হয়েছে। অথচ মু'তাযিলাদের এসব বক্তব্য সাফা'আত সংক্রান্ত মুতাওয়াতির হাদীসের বিরোধী। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৪৭৮-৪৮০), (১৩/৩৮, ৫০), (২২/১২৯)।

বস্তুত এ মাসআলাটি নাম ও নামকৃত মাসআলা নামে খ্যাত। অর্থাৎ দীনের নামসমূহ কার ওপর বর্তাবে, যেমন মুসলিম, কাফের, ফাসিক ইত্যাদি। আর সে নামের কারণে তাদের বিধান কী হবে?

জান্নাতী নাকি জাহান্নামী একটি মৌলিক মাসআলা। কারণ দীনের অনেক কিছুই এর ওপর নির্ভর করছে। মানুষের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, প্রশংসা কিংবা নিন্দার সাথে সম্পৃক্ত ঈমান এবং কুফর নামটির চেয়ে বড় কোনো কথা ও বক্তব্য নেই। এজন্য এ মাসআলাটির গুরুত্ব অপরিসীম। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/৫৮)। এ তো গেল এক পক্ষের কথা, যারা কবীরা গুনাহকারীকে ঈমান থেকে বের করে দেয় ও আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে বলে মনে করে থাকে।

তাদের বিপরীতে বের হয়েছিল মুরজিয়া সম্প্রদায়, যারা খারেজী বিদ'আতকে আরেক বিদ'আত দিয়ে মুকাবিলা করে। তারা বলতে থাকে গোনাহর কোনো প্রভাব ঈমানে পড়ে না। তারা আমলকে ঈমানের অধীন বলাও অস্বীকার করে। [শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/৩৮)] তাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষের দিকে। [শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৩১১), (১৩/৩৪), (১০/৩৪৭)]

উম্মতের সালাফে সালেহীন একদিকে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে মুরজিয়াদের রদ্দ করেছেন। আবার কাদারিয়্যাহ ও জাবরিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। যারা এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইবন আব্বাস, ইবন 'উমার, জাবের, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' প্রমুখ। সালাফে সালেহীন মুরজিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে দাঁড়ালেন যখন তারা আমলকে ঈমান থেকে বের করে দিল এবং বললো যে, সব মানুষ ঈমানের ব্যাপারে সমান। [মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৩৫৭)]

এরপর মু'তাযিলাদের ফিতনা আসলো, যারা ঈমান ও কুফরের দু স্থানের মাঝে একটি স্থান আবিষ্কার করলো যা হাসান বসরীর যুগে প্রথম বলেছিল ওয়াসিল ইবন আতা। [মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৫৫৫)]

মোটকথা: কবীরাগুনাহকারীর বিধান নিয়ে ফির্কাবন্দীর প্রথম থেকেই একদল ভুল পথে ছিল। তাই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। আমরা এখানে কেবল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ বর্ণনা করবো:

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত:

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের নাম। সে কথা দু' প্রকার, অন্তরের কথা ও মুখের কথা। আর কাজ তিন প্রকার, মুখের কাজ, অন্তরের কাজ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ। সুতরাং ঈমান বাড়ে ও কমে। গুনাহের কারণে ঈমান কমে যায়, আর আনুগত্যের কারণে ঈমান বেড়ে যায়। বড় কুফরী, বড় শির্ক ও বড় নিফাক ব্যতীত অন্য কোনো গুনাহের কারণে কারও ঈমান চলে যায় না।

[আজুররী, আশ-শরীআহ (২/৬১১); ইসমা'ঈলী, ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ৩৯; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৫/৮৮৬, ৮৮৭)]

আর যেহেতু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট ঈমান ভগ্নাংশ হয়, অংশ বিশেষ হয়, কারণ এর রয়েছে অনেক শাখা, যা হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সত্তরের উপরে বা ষাটের উপরে, সেহেতু তার কোনো অংশ চলে গেলেও অপর অংশ থেকে যায়। ইমাম ইবন হাজার বলেন, অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত কথা ও কাজ ২৪টি। জিহ্বার সাথে সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজ সাতটি। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের সংখ্যা ৩৮টি। এসব মিলে সংখ্যা ৬৯ দাঁড়ায়, যা আরও বিস্তারিত আলোচনা করলে ৭৯ পর্যন্ত পৌঁছবে। [ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১/৫২)]

আর জানা কথা যে, যে জিনিস এর অনেক অংশ রয়েছে তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় না। তাই কবীরা গুনাহকারীকে সকল গুনাহের কারণে কাফের যেমন বলা যাবে না, তেমনি তাকে পূর্ণ ঈমানদারও বলা যাবে না। তবে মনে রাখতেই হবে ঈমানের এসব অঙ্গ কখনো এক পর্যায়ের নয়। কোনোটি চলে গেলে মূল ঈমান চলে যায়, আর কোনোটি চলে গেলে পূর্ণ ঈমান চলে যায়। [ইবনুল কাইয়্যেম, কিতাবুস সালাত ওয়া হুকমু তারিকিহা, পৃ. ৩৪]

কবীরা গুনাহকারীর দুনিয়াবী বিধানের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ বলেন, দুনিয়ার দৃষ্টিতে এদেরকে ফাসিক মুসলিম বলা হবে, গুনাহের কারণে দীনে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হবে না, তবে তাকে পূর্ণ ঈমানদারও বলা যাবে না। বরং সে ঈমানের কারণে মুমিন, আর কবীরা গুনাহের কারণে ফাসেক। [ইবন আবিল ইয্য এর ব্যাখ্যাসহ আকীদাহ ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৪৩২; ইবন আবি যাইদ আল-কাইরোয়ানী, পৃ. ৬০; ইবন বাত্তাহ, আশ-শারহু ওয়াল ইবানাহ, পৃ. ২৬৫; সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২৭৬; ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৩/১৫১); ইবন আবিল

ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৪৪২]
সুতরাং দুনিয়ার জীবনে সে জান ও মালের নিরাপত্তা পাবে, তার সাথে মুসলিমদের মতো লেনদেন, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি করা হবে। মীরাস, যবাই, হুদুদ ইত্যাদি মুসলিমদের মতোই হবে। তবে কারও কারও মতে তাকে মুসলিম বলা হবে, মুমিন বলা হবে না। অপর কারও মতে, তাকে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যাবে। আবার কারও কারও মতে, তাকে ঈমানদারও বলা যাবে। [শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৩৫৪)]

আর কবীরা গুনাহকারীর আখেরাতের বিধানের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান:
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, কবীরা গুনাহকারী আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন, যা তার ইনসাফের দাবি অথবা তাকে তিনি ক্ষমা করবেন, যা তার রহমত ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ। [ত্বাহাওয়ী, ইবন আবিল ইয্য এর ব্যাখ্যাসহ, পৃ. ৫২৪; সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২৭৬; বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (১/১১৭)]
মোটকথা: কবীরা গুনাহকারীর আখেরাতের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত নিম্নোক্ত ছয়টি বিষয়ে জড়িত:

- যে কবীরা গুনাহ করবে সে আখেরাতে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে, তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন, আর চাইলে ক্ষমা করবেন।
- কবীরা গুনাহকারী তার গুনাহের কারণে শাস্তির হকদার ও জাহান্নামে প্রবেশের অধিকারী হয়ে গেছে।
- যার অন্তরে দানা পরিমাণ বা সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে কবীরা গুনাহকারী যদি জাহান্নামে প্রবেশ করে তবে সেখানে চিরস্থায়ী হবে না।
- জাহান্নামে কবীরা গুনাহকারীর 'আযাব কখনো কাফেরদের 'আযাবের মতো হবে না।
- কবীরা গুনাহকারীর সর্বশেষ পরিণতি জান্নাত হবে, তার শাস্তি পর্ব পূর্ণ হওয়ার পর।
- কবীরা গুনাহকারী আল্লাহর অনুমতিক্রমে শাফায়াত প্রাপ্ত হবে, আর আল্লাহর রহমতেও বের জাহান্নাম থেকে বের হবে।

কবীরা গুনাহকারীর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র মূলনীতি:
কবীরা গুনাহকারীর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র মূলনীতি হচ্ছে,
১- ঈমান অংশ বিশিষ্ট সাব্যস্তকরণ।
২- ঈমানের শাখাগুলোর সব একই মর্যাদার না হওয়া।
৩- ঈমান ও গুনাহ একসাথে হতে পারা। [ইবন তাইমিয়্যাহ, শারহুল আকীদাতিল আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ২৩৫, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৮/২৭০)]

এ মতের সপক্ষে দলীল:
১- আল্লাহ বলেন, [النساء : ٤٨] ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ "আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শির্ক করাকে কখনো ক্ষমা করবেন না, এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের সকল গুনাহ যার জন্য ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।" [সূরা আন-নিসা: ৪৮, ১১৬] ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত স্পষ্ট করে দিল যে, প্রত্যেক কবীরা গুনাহকারী আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি চাইলে ক্ষমা করবেন, চাইলে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহটি শির্কের পর্যায়ে চলে না যাবে। [তাবারী, আত-তাফসীর (৫/১২৬)]
২- আল্লাহর বাণী, [الحجرات: ٩] ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا﴾ "আর যদি ঈমানদারদের দু'টি দল পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মাঝে তোমরা মীমাংসা করে দিবে।" [সূরা আল-হুজুরাত: ০৯] ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতটি তার সহীহ গ্রন্থে এটা প্রমাণ করার জন্য এনেছেন যে, মুমিন গুনাহ করলে তাকে কাফের বলা হবে না, তার থেকে ঈমান নামটি রহিত করা হবে না; কারণ আল্লাহ তা'আলা পরস্পর যুদ্ধ করার পরও তাদেরকে ঈমানদার বলেছেন। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ (১/৮৪)]
৩- আল্লাহর বাণী,
﴿قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣]
"বলুন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের নাফসের ওপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন।" [সূরা আয-যুমার: ৫৩] অর্থাৎ যারা ঈমানের ওপর আছে, এমন গোনাহকারীকে তাঁর বান্দা হিসেবে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি

তাদের ক্ষমা করবেন। সুতরাং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।

৪- আল্লাহর বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨]

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর হত্যার ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ ফরয করা হয়েছে, স্বাধীন স্বাধীনের বিপরীতে, দাস দাসের বিপরীতে, নারী নারীর বিপরীতে, অতঃপর যে কেউ তার ভাই থেকে কিছু ক্ষমা করে দেয়, তবে সেটা যেন হয় প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে এবং ইহসানের সাথে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে।” [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৮] এ আয়াতে হত্যার পরও হত্যাকারীকে হত্যাকৃত পরিবারের ভাই বলা হয়েছে, যা প্রমাণ করছে যে, গুনাহগার ব্যক্তি ঈমানদার থাকবে।

৫- আল্লাহর বাণী,

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝﴾ [الانفال: ٣٨]

“হে নবী, আপনি কাফেরদের বলে দিন, যদি তারা কুফরী পরিত্যাগ করে তবে তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, আর যদি তারা আবার শির্ক ও কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করে তবে তাদের জন্য পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি তো গত হয়েছেই।” [সূরা আল-আনফাল: ৩৮] এ আয়াতে কাফেরদেরকে ঈমানে আসলে পূর্বে করা কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তাহলে ঈমানদার কাফেরদের মত কেন হবে? তাদের তো গুনাহ ক্ষমা হবেই। তাদের অবস্থা আর কাফের এর অবস্থা একরকম হবে না। ইবন আব্দুল বার বলেন, আর এটা জানা কথা যে এটি মৃত্যুর পরে যে তাওবা করে মারা যায়নি তার জন্য, কারণ শির্ক থেকে তো সে মৃত্যুর আগে তাওবা করেছে, আর তা থেকে মুক্ত থেকেছে, তাকে ক্ষমা করা হবে, যেমনটি তাওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, “হে নবী আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা কুফরি থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদের থেকে যা ইতোপূর্বে হয়েছে তা ক্ষমা করা হবে।” [আত-তামহীদ (১৭/১৬)]

৬- নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ»

“এমন কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে, আর এমন কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহঙ্কার অবশিষ্ট আছে”। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৯১]

৭- অপর হাদীস, যা উবাদাহ ইবনুস সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাবার রাত্রিতে আমাদের বলেন, তাঁর চারপাশে সাহাবীগণ বসা ছিলেন,

«بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

“তোমরা আমার হাতে বাই‘আত করো এটার ওপর যে, আল্লাহর সাথে কাউকে সামান্যতমও শরীক করবে না। চুরি করবে না। ব্যভিচার করবে না। তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। এমন কোনো অপবাদ নিয়ে আসবে না, যা তোমরা রটনা করে থাক তোমাদের সামনে বা পশ্চাতে। ভালো কাজে অবাধ্যতা করবে না। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে কেউ সেটাকে পূর্ণ করবে তার সাওয়াব তো আল্লাহর যিম্মাদারীতে। আর যে কেউ উপরে বর্ণিত গুনাহসমূহের কোনোটি করবে, অতঃপর তার শাস্তি দুনিয়াতে দেয়া হয়ে যাবে, তবে সেটা তার জন্য কাফফারা হবে, আর যে কেউ উপরে বর্ণিত গুনাহসমূহ করবে কিন্তু আল্লাহ তাকে গোপন করে রেখেছেন, তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে, তিনি চাইল তাকে ক্ষমা করবেন, আর চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর আমরা তাঁর হাতে এর ওপর বাই‘আত করলাম।” [বুখারী, আল-জামে‘উস সহীহ, হাদীস নং ১৮]

৮- অপর হাদীসে আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ»، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ»

"জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা বের করে আনো এমন প্রত্যেককে যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২২; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৪]

৯- তাছাড়া শাফা'আতের হাদীসে এসেছে,

«انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَانْطَلِقْ فَأَفْعَلُ»

"আপনি যান, অতঃপর যার অন্তরে সামান্য সামান্য সামান্য সরিষা দানা পারিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনুন, অতঃপর আমি যাব এবং তা করবো।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৯৩]

১০- অনুরূপ আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»

"আমার কাছে জিবরীল এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে শরীক না করে মারা যাবে, তারা জান্নাত প্রবেশ করবে, আমি বললাম, যদি সে যিনা করে ও চুরি করে? তিনি বললেন, যদি সে যিনা করে ও চুরি করে তবুও।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৯৪; বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩২২২, ৫৮২৭, ৬২৬৮, ৬৪৪৪] অর্থাৎ তার শেষ পরিনতি জান্নাত হবেই।

১১- অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ»

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল, এ দু'টি সাক্ষ্য নিয়ে সন্দেহমুক্ত হয়ে যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে বাধা দেয়া হবে না।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৭] অর্থাৎ তার শেষ পরিনতি জান্নাত হবেই।

১২- অনুরূপ আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً»

"যে কেউ যমীন পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করবে, তবে আমার সাথে সামান্যতমও শির্ক করেনি, আমি তার জন্য সম পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করবো।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৬৮৭]

১৩- আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ»

"সাবধান তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক, কারণ মিথ্যা ঈমানকে পাশ কাটিয়ে দেয়।" [লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৬/১০৯১), নং ১৮৭৩]

১৪- আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«الْإِيمَانُ نَزِهٌ فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الْإِيمَانُ، فَإِنْ لَامَ نَفْسَهُ وَرَجَعَ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ»

"ঈমান পবিত্র জিনিস, সুতরাং যে কেউ যিনা করবে ঈমান তার থেকে আলাদা হয়ে যাবে, অতঃপর যদি নিজেকে সে তিরস্কার করে ও দীনে ফিরে আসে ঈমানও তার দিকে ফিরে আসে।" [লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৬/১০৯০), নং ১৮৭০]

১৫- আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«مَا الْإِيمَانُ إِلَّا كَقَمِيصِ أَحَدِكُمْ يَخْلَعُهُ مَرَّةً، وَيَلْبَسُهُ أُخْرَى، وَاللهِ مَا أَمِنَ عَبْدٌ عَلَى إِيمَانِهِ إِلَّا سُلِبَهُ فَوَجَدَ فَقْدَهُ»

"ঈমান তো কেবল তেমনি, যেমন তোমাদের কেউ তার জামা একবার খুলে, আবার পরিধান করে, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যখনই কোনো বান্দা তার ঈমানের ব্যাপারে শঙ্কাহীন হয়, তখন সেটি তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় আর সে সেটা হারিয়ে যাওয়া অনুভব করতে পারে।" [লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৬/১০৯১), নং ১৮৭১]

১৬- ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা (মৃত: ৬৮ হিজরী) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর দাসদের একজন একজন করে ডাকতেন এবং বলতেন,

أَلَا أُزَوِّجُكَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَزْنِي إِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْهُ نُورَ الْإِيمَانِ قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: «هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»

"তোমাকে কি বিয়ে করিয়ে দিব? কোনো বান্দা যখন যিনায় লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেন।"

ইকরিমাহ (মৃত: ১০৫ হিজরী) বলেন, আমি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে বললাম, কীভাবে ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়? তিনি বললেন, এভাবে, আর তিনি হাতের আঙ্গুলিগুলো একটি অপরটি ভিতরে প্রবেশ করিয়ে বের করে আনলেন। তারপর যদি সে তাওবা করে তাহলে আবার এভাবে প্রবেশ করে এবং তিনি আঙুলগুলো আবার একটির ভিতরে আরেকটি প্রবেশ করালেন। [প্রথম অংশ ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১২/৫৯); লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ১৮৬৬; আর দ্বিতীয় অংশ, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৬৮০৯]

১৭- ইমাম আবু হানীফা (মৃত: ১৫০ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلَا نكفر مُسلما بذنب من الذُّنُوب وَإِن كَانَت كَبِيرَة إِذا لم يستحلها

"আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো গুনাহের কারণে কাফের বলি না, যদিও সেটি কবীরা গুনাহ হয়, যতক্ষণ না সে সেটাকে হালাল মনে না করছে।" [আল-ফিকহুল আকবার এর ভাষ্য, পৃ. ৪৩]

১৮- ইমাম মালেক (মৃত: ১৭৯ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(لو أن رجلاً ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله؛ ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع؛ دخل الجنة)

"কোনো মানুষ যদি আল্লাহর সাথে শির্ক না করে যাবতীয় গোনাহে লিপ্ত হয়, তারপর বিদ'আতীদের মত ও পথ থেকে মুক্ত থাকতে পারে, তবে সে জান্নাতে যাবে।" [আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৬/৩২৫)] অর্থাৎ তার শেষ পরিণতি জান্নাত হবেই।

১৯- ইমাম শাফে'য়ী (মৃত: ২০৪ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(أَمَّا الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ السَّخَطُ... إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا ... إِلَى فِئَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ... وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى خِفْتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ)

"আর যা তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত করে, তা হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো, যদি না যুদ্ধের মোড় ঘুরার জন্য, অথবা মুসলিম শক্তির সাথে মিলিত হওয়ার জন্য হয়, সেটা ভিন্ন কথা, আর যদি এ অর্থ ব্যতীত অন্য কারণে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে আমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করি যে তাকে আল্লাহর ক্রোধ পেয়ে বসবে, তবে যদি তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেয় সেটা ভিন্ন কথা।" [আশ-শাফে'ঈ, আল-উম্ম (৪/২৫৭)]

২০- ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃত: ২৪১ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو برد فريضة من فرائض الله - عز وجل - جاحداً بها؛ فإن تركها كسلاً، أو تهاوناً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه)

"একজন মানুষ ঈমান থেকে ইসলামের গণ্ডিতে চলে আসে, তবে মহান আল্লাহর সাথে শির্ক না করলে কেউ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। অথবা যদি আল্লাহর ফরযসমূহের কোনোটি অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করে, আর যদি অলসতা করে ছাড়ে, অথবা গুরুত্বহীন মনে করে ছাড়ে তবে সে

আল্লাহর ইচ্ছার অধীন হবে, তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন, আর চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন।" [ইবন রাজাব আল-হাম্বলী, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (১/৩৪৩)] উল্লেখ্য, গুরুত্বহীন মনে করে সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে এটি একটি মত। অপর মতে সে কাফির হয়ে যাবে।

২১- ইমাম আবু 'উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম (মৃত: ২২৪ হিজরী) বলেন,

(إن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً، ولا توجب كفراً، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه)

"গুনাহ ও অপরাধ ঈমানকে তিরোহিত করে দেয় না, কুফরকেও আবশ্যক করে না। তবে তা ঈমানের সে প্রকৃত অবস্থা ও ইখলাস বিনষ্ট করে দেয়, যে গুণের কারণে আল্লাহ ঈমানদারদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে তা তাদের ওপর শর্ত করেছেন।" [আবু উবাইদ, কিতাবুল ঈমান, পৃ. ৪০]

২২- ইমাম বুখারী (মৃত: ২৫৬ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ তাঁর আল-জামে'উস সহীহ গ্রন্থে অধ্যায় বিন্যাস করে সেখানে অকাট্যভাবে এটা বর্ণনা করেছেন যে, গুনাহের কারণে গুনাহকারীকে কাফের বলা যাবে না। তিনি বলেন, 'অধ্যায়, গুনাহসমূহ জাহেলী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, যারা গুনাহ করবে তাদেরকে শির্ক না করলে কাফের বলা যাবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় তুমি একজন লোক, যার মাঝে জাহেলিয়াত কাজ করছে।" আর আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।" [সূরা আন-নিসা: ৪৮]

২৩- ইমাম আবু জা'ফর আত-তাহাওয়ী (মৃত: ৩২১ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ তার আকীদাহ গ্রন্থে বলেন,

(ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) .

"আর আমরা কিবলার অনুসারী (সালাত আদায়কারী) কাউকে কোনো গুনাহের কারণে কাফের বলি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সেটাকে হালাল মনে না করবে।" [বায়ানু আকীদাতি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ]

২৪- ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী (মৃত: ৩২৪ হিজরী) বলেন,

(وندين بأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر؛ مثل الزنا والسرقة وما أشبهها، مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها؛ كان كافراً)

"আর আমরা এটা দীন হিসেবে গ্রহণ করি যে, কিবলার অনুসারী (সালাত আদায়কারী) কাউকে কোনো গুনাহে পতিত হওয়ার কারণে তাকে কাফের বলি না, যেমন: যিনা, চুরি, মদপান; যেমনটি খারেজীরা দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মনে করেছে যে, এ কাজগুলো যারা করবে তারা কাফের হয়ে যাবে; বরং আমরা বলি, যে কেউ এসব কবীরা গুনাহ হতে কোনো কবীরা গুনাহ করবে যেমন যিনা, চুরি ও অনুরূপ কিছু, সেগুলোকে হালাল মনে করে করবে, সেগুলোকে হারাম মনে না করে করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।" [আশ'আরী, আল-ইবানাহ 'আন উসূলিদ দিয়ানাহ, পৃ. ২৬]

২৫- ইমাম আবু বকর আল-ইসমা'ঈলী (মৃত: ৩৭০ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ তার ই'তিক্বাদু আহলিল হাদীস ওয়া আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ গ্রন্থে বলেন,

ويقولون: إن أحداً من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين؛ لو ارتكب ذنباً، أو ذنوباً كثيرة، صغائر، أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله، والإقرار بما التزمه وقبله عن الله؛ فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة، قال تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ}

"আর আহলুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে, তাওহীদের অনুসারী, আর যারা মুসলিমদের কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, তাদের কেউ যদি কোনো গুনাহ করে, অথবা অনেক গুনাহ করে, ছোট হোক কিংবা বড়, কিন্তু সে আল্লাহর জন্য তাওহীদ ঠিক রেখেছে, আল্লাহ থেকে যা আবশ্যক হিসেবে নিয়েছে ও তা গ্রহণ করে নিয়েছে তাকে উক্ত গুনাহের কারণে কাফের বলা যাবে না। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তার জন্য ক্ষমার আশা করে"। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তিনি এর চেয়ে ছোট পর্যায়ের যা আছে তা ক্ষমা করবেন যার জন্য ইচ্ছা।' [আল-ইমাম আল-ইসমা'ঈলী, ই'তিক্বাদু আহলিল হাদীস, পৃ. ৪৩; তাহক্বীক, মুহাম্মাদ আল-

খুমাইয়েস]
২৬- ইমাম ইবন বাত্তাহ আল-উকবারী (মৃত: ৩৮৭ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(وقد أجمعت العلماء - لا خلاف بينهم - أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية؛ نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء)

"আলেমগণ একমত হয়েছেন, তাদের মাঝে মতভেদ নেই যে, কোনো কিবলার অনুসারী কাউকে গোনাহের কারণে কাফের বলা যাবে না, কোনো অবাধ্যতার কারণে তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়া যাবে না; ইহসানকারীর জন্য আশা করি, আর অপরাধকারীর জন্য আশঙ্কা করি।" [আশ-শারহু ওয়াল ইবানাহ আলা উসূলিস সুন্নাতি ওয়াদ দিয়ানাহ, আল-ইবানাতুস সুগরা, পৃ. ২৯২; তাহকীক: ড. রেদ্বা ইবন না'সান মু'ত্বী]
২৭- ইমাম আবু ইসমা'ঈল আস-সাবুনী (মৃত: ৪৪৯ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ তার ই'তিক্বাদু আয়িম্মাতিস সালাফ আসহাবুল হাদীস আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ গ্রন্থে বলেন,

(ويعتقد أهل السنة: أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر كانت، أو كبائر؛ فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله - عز وجل - إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً، غير مبتلى بالنار، ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب، واكتسبه ثم استصحبه - إلى يوم القيامة - من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)

"আর আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে যে, মুমিন ব্যক্তি যদিও অনেক গুনাহ করে, ছোট হোক কিংবা বড়, তাকে সেটার জন্য কাফের বলা যাবে না, যদিও সে দুনিয়া থেকে তাওবা না করে চলে যায়, তবে তাওহীদ ও ইখলাস নিয়ে মারা যায়; কারণ তার বিষয়টি মহান আল্লাহর নিকট ন্যস্ত, তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করে কিয়ামতের দিন তাকে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে লাভবান করে, কোনো প্রকার আগুনের পরীক্ষা না করেই। যে গুনাহ সে করেছে, যা সে অর্জন করেছে, যা সাথে নিয়ে সে কিয়ামতের মাঠে উঠে এসেছে সেসব গুনাহ ও অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি না দিয়ে। আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন, আযাব দিবেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দিয়ে, আর যদি তাকে আযাবও প্রদান করেন তাকে সেখানে চিরস্থায়ী করবেন না, বরং তাকে মুক্তি দিবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে স্থায়ী আবাস জান্নাতে প্রদান করবেন।" ['আকীদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২৭৬; তাহকীক ড. নাসের ইবন আব্দুর রহমান আল-জুদা'ই]
২৮- ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাওয়ী (মৃত: ৫১৬ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر، إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئاً منها؛ فمات قبل التوبة، لا يخلد في النار؛ كما جاء به الحديث؛ بل هو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته)

"আহলুস সুন্নাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মুমিন কোনো কবীরা গুনাহের কারণে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে না, যদি না সে সেটাকে বৈধ হওয়া বিশ্বাস করে বসে; আর যদি এর কোনো কিছু সে করে বসে, তারপর তাওবা করার আগেই মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না, যেমনটি হাদীসে এসেছে, বরং তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন, আর চাইলে তাকে গোনাহ পরিমাণ শাস্তি প্রদান করবেন, তারপর তাকে তাঁর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" [বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (১/১০৩)]
২৯- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (মৃত: ৭২৮ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(من أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك:

لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي؛ كما قال سبحانه في آية القصاص: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} .. ولا يسلبون الفاسق الملي

অনুরূপ 'নাম ও বিধান' তথা মুসলিম নাম কে পাবে আর কে পাবে না, আর দুনিয়া ও আখেরাতে এর বিধান কী হবে? এতদসংক্রান্ত মতভেদও বর্ণনা করেন।(৭৪৪)

الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار، كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم)

"আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, দীন ও ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের নাম। অন্তরের কথা ও মুখের কথা, অন্তরের কাজ, মুখের কাজ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ। আর ঈমান আনুগত্যের মাধ্যমে বাড়ে আর গোনাহের মাধ্যমে কমে, এরপরও তারা:
কিবলার অনুসারী, সে দিকে ফিরে সালাত আদায়কারীদেরকে নিছক গুনাহ ও কবীরার জন্য কাফের বলে না, যেমনটি খারেজী সম্প্রদায় করে থাকে, বরং পাপাচারে লিপ্ত হলেও তাদের জন্য ঈমানী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'অতঃপর যে তার ভাই থেকে কোনো কিছু ক্ষমা করে দেয়, তাহলে প্রচলিত নিয়মে তা করবে..."
আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মুসলিম মিল্লাতের কোনো ফাসেক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পরে তাকে জাহান্নামী চিরস্থায়ী হওয়ার কথা বলে না, যেমন বলে থাকে মু'তাযিলারা। বরং ফাসেক সাধারণ নিঃশর্ত ঈমানে প্রবেশ করবে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে যেন একজন মুমিন দাস মুক্ত করে"। আবার কখনো কখনো সে সাধারণ নিঃশর্ত ঈমানে প্রবেশ করতে পারবে না, যেমন আল্লাহ বলেন, "ঈমানদার তো তারাই, যাদের কাছে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে কম্পন আসে, আর যখন তার আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বর্ধিত হয়, আর তারা তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে"। তাই উপরোক্ত গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমরা বলবো, 'তারা ত্রুটিপূর্ণ মুমিন, অথবা বলবো, তার মধ্যে ঈমান থাকার কারণে সে মুমিন, আর কবীরা গুনাহ থাকার কারণে সে ফাসিক। সুতরাং তাদের পূর্ণ ঈমানদার বলা যাবে না এবং মুমিন পদবী তার থেকে একেবারে ছিনিয়েও নেয়া যাবে না।"
[আল-আকীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ, পৃ. ৮১]
৩০- ইমাম ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী (মৃত: ৭৯২ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة؛ لكان مرتداً يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين)

"আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, কবীরা গুনাহকারীকে এমন ভাবে কাফের বলা হবে না যে সে দীন ও মিল্লাত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গেছে। যেমনটি খারেজী সম্প্রদায় বলে থাকে। কারণ যদি মিল্লাত থেকে বের হওয়ার মতো কুফরী করত তবে তো মুরতাদ হয়ে যেতো, সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা হতো, কিসাস নেওয়ার অধিকারী ওলীর পক্ষ থেকে ক্ষমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হতো না। আর যিনা-ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপানের মত গুনাহের শাস্তি তার ওপর প্রয়োগ করা যেতো না। আর এটি যে বাতিল কথা তা সবার জানা, এটি অগ্রহণযোগ্য কথা হওয়ার বিষয়টি দীনে ইসলামের আবশ্যকীয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত এ ব্যাপারেও একমত যে, সে ঈমান ও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না, কাফের এর গণ্ডিতেও প্রবেশ করবে না আর জাহান্নামে কাফেরদের সাথে চিরস্থায়ীও হবে না।" [শারহু ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, আলাল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৪৪২]

৭৪৪. আল-আসমা ওয়াল আহকাম, বা নাম ও বিধান কথাটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, নাম বলতে দীনের মধ্যে যে সব স্তর রয়েছে যেমন মুমিন, মুসলিম, ফাসেক এ নামগুলো কাদের জন্য প্রযোজ্য হবে? আর বিধান

وقال: قولنا: إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم.

আর তিনি বলেন, তাদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, তারা (দুনিয়াতে) নিঃশর্তভাবে মুমিন[৭৪৫], আর তাদের (আখেরাতের) বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা, তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দিবেন, আর চাইলে তাদের ক্ষমা করে দিবেন।[৭৪৬]

বলতে দুনিয়া ও আখেরাতে মুমিন, মুসলিম ও ফাসেকদের কী গতি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করা। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ফুরকান, মাজমূ'আতুর রাসায়িলিল কুবরা এর অধীন (১/২৮)। আরও দেখুন, আব্দুল আযীয আলে-রশীদ, আত-তাম্বীহাতুস সানিয়্যাহ, পৃ .২০১; আল-বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ২৮৮।

৭৪৫. তবে কবীরাগুনাহকারীকে নিঃশর্তভাবে মুমিন বলা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ নয়। কারণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, কবীরা গুনাহকারী থেকে নাম মাত্র ঈমান (মুতলাকুল ঈমান) ছিনিয়ে নেয়া হবে না, অর্থাৎ বলা হবে যে তিনি নামমাত্র ঈমানদার, কিন্তু তাঁকে (আল-ঈমানুল মুত্বলাক) 'নিঃশর্তভাবে ঈমানদার' বলা যাবে না। যেমনটি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার ওয়াসেত্বীয়্যাহ কিতাবে স্পষ্ট করে বলেছেন। (দেখুন, পৃ. ১২৪-১২৫) সেখানে তিনি বলেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কখনো কবীরা গুনাহকারী মিল্লাতে ফাসিক ব্যক্তি থেকে পুরোপুরি ঈমান থেকে খারিজ বলে না, তাকে জাহান্নামেও চিরস্থায়ী বলে না, যেমনটি মু'তাযিলারা করে থাকে, বরং ফাসিককে কখনও কখনও ঈমানে মুতলাক বা ঈমানদার হিসেবে আখ্যায়িত করা হতে পারে যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাহলে সে যেন একটি ঈমানদার দাস মুক্ত করে" [সূরা আন-নিসা: ৯২] (কারণ উম্মতের সবাই একমত যে, দাস শুধু মুসলিম হলেই আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও আয়াতে তাকে মুমিন নাম দেয়া হয়েছে)। আবার কখনো কখনো মিল্লাতের ফাসেক লোককে 'ঈমানে মুতলাক' নিঃশর্ত ঈমানদার হিসেবে গণ্য করা হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢﴾ [الانفال: ٢]

"মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে। আর তারা তাদের রবের ওপরই নির্ভর করে।" [সূরা আল-আনফাল: ০২] অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"যিনাকার যখন যিনায় লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। কেউ যখন মদপান করে তখন সে মুমিন থাকে না। যে চুরি করে চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না এবং কোন ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তার দিকে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকে; তখন সে মুমিন থাকে না।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৬৭৭২; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৫৭, শব্দ বুখারীর] এজন্য আমরা বলি, সে মুমিন তবে ঈমানের ঘাটতিসহ অথবা বলি, সে তার ঈমানের কারণে মুমিন, আর তার কবীরা গুনাহের কারণে ফাসিক। সুতরাং তাকে পূর্ণ ঈমানদারের গুণ দেয়া যাবে না, আর তার থেকে নামমাত্র ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হবে না অথবা এটা বলা যেতে পারে যে, কবীরা গুনাহকারীরা দুনিয়ার প্রকাশ্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ঈমানদার। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, কিতাব আল-ঈমান, পৃ. ৩৩৮।

৭৪৬. এর মাধ্যমে খারেজী, মু'তাযিলাদের বক্তব্য যেমন খণ্ডন করা হয়েছে, অপরদিকে মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাদের বক্তব্যও রদ্দ করা হয়েছে।

কারণ খারেজীরা কবীরা গুনাহকারী থেকে ঈমান নামটি হরণ করে নেন, বরং কবীরা গুনাহকারীকে কাফের বলেন। আর মু'তাযিলা সম্প্রদায়, তাদের নিকট যে কেউ কোনো কবীরা গুনাহ করবে সে

وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال، وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا: إنه يزيد وينقص.

তিনি [ইবন খাফীফ] আরও বলেন, 'ঈমান' এর ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে তা (আল্লাহর) প্রদান করা বিশেষ দান[৭৪৭]; যা থেকে বান্দার আমলসমূহের সূত্রপাত হয়। সুতরাং ঈমানের মূল হচ্ছে, সত্যায়ন করা, স্বীকার করা ও আমল করা। আর তিনি [ইবন খাফীফ] ঈমান বাড়ে কিংবা কমে কী না সে মতভেদ উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমাদের কথা হচ্ছে, ঈমান বাড়ে ও কমে।[৭৪৮]

ফাসেক হবে, দু স্থানের মাঝে অবস্থান করবে, মুমিনও নয়, কাফেরও নয়। তবে আখেরাতে তার বিধান হচ্ছে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী, সেখান থেকে কখনও বের হবে না।

খারেজী ও মু'তাযিলাদের বিপরীতে আরেক দলের আগমন ঘটে, এদেরকে বলা হয় মুরজিয়া। তারা বলতে শুরু করে যে, ঈমান আনার পরে আর গোনাহ কোনো ক্ষতি করবে না, তাদের মত অনুসারের সবচেয়ে বড় ফাসিকের ঈমান নবীদের ঈমানের মতো। কবীরা গুনাহগার তাদের নিকট ঈমানদার, পাক্কা ঈমানের অধিকারী। কারণ ঈমান তাদের নিকট একটি মৌলিক জিনিস, যা বাড়ে কিংবা কমে না। আর তা হয় মা'রিফাত তথা আল্লাহকে চেনার নাম, না হয় শুধু বিশ্বাসের নাম। তাদের মাঝে এ ব্যাপারে ব্যাপক মত পার্থক্য বিদ্যমান।

মুরজিয়া সম্প্রদায় আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক জান্নাতের ওয়াদা সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করে। অপরদিকে খারেজী ও মু'তাযিলারা আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক জাহান্নামের ধমকি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করে থাকে।

এদের উভয় সম্প্রদায়ের বিপরীতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত উভয় শ্রেণির দলীল দিয়ে দলীল গ্রহণ করেন। সকল দলীলের মাঝে সমন্বয় করে তারা বলেন, কবীরা গুনাহগার ঈমানদার তবে তার ঈমান অপূর্ণাঙ্গ। আবার কখনো কখনো তারা বলে, কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি তার ঈমানের কারণে মুমিন, আর কবীরা গুনাহের কারণে ফাসেক। তারা আরও বলেন, তার কাছে নামমাত্র ঈমান আছে, তবে পূর্ণাঙ্গ সাধারণ ঈমান তার কাছে নেই। সুতরাং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কবীরা গুনাহগার থেকে পুরোপুরি ঈমান নামটি হরণ করে নেয় না। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে থাকেন যে, সে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে, যদি তিনি চান তবে প্রথম বারেই তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর যদি তিনি চান তো তাকে শাস্তি দিবেন, কিন্তু সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না, বরং সুপারিশকারীদের সুপারিশ কিংবা সর্বোচ্চ দয়াময় সত্তার রহমতে সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।

দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৫১-১৫২), (৭/৪৮২), (১৩/৩৭-৩৮, ৩৮৭); মাজমূ'উর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল (৩/৭-৮); সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৭১-৭৩; ইবন আবিল ইয্য, শারহুল আক্বিদাতি ত্বাহাওয়িয়্যাহ ২/৪৪২-৪৪৮, ৫২৪, ৫৩৭-৫৪০; বাইহাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ, পৃ. ৮৫-৯৭; বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ৩৯৮-৪৩১; আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৪৭৪; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/৯৯); আব্দুল জাব্বার, শারহুল উসূলিল খামসাহ, পৃ. ৬৯৫।

৭৪৭. সূফীদের দু'টি টার্ম বা পরিভাষা রয়েছে। একটি হচ্ছে হাল (আহওয়াল) বা অবস্থা, আরেকটি হচ্ছে মাকাম (মাকামাত) বা অবস্থান। একটি (অর্থাৎ হাল, তা) কেবল আল্লাহ প্রদত্ত, বান্দার তাতে কোনো কিছু করার নেই, অপরটি (অর্থাৎ মাকাম, তা) বান্দা অনেক চেষ্টা-সাধনা করার পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করে। এখানে তিনি 'মাওহিবাহ' বা একান্ত দান বলে ঈমানকে 'হাল' এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ তা একান্ত আল্লাহর দান, একান্তভাবে মহান রাব্বুল ইয্যতের পক্ষ থেকে দয়া ও রহমত। অন্যত্র ইবন খাফীফ আরও বলেছেন, 'ঈমান হচ্ছে, বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গায়েবী ভাণ্ডার থেকে যা জানাবে সেটাকে তাদের অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করা।' শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইস্তেকামাহ (১/১৪৮)।

৭৪৮. এ হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা উম্মতের সালাফে সালেহীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম এবং যারা তাদের পথে চলেছেন আর যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এমন

সকলের মতাদর্শ। তারা সবাই বলেন,

১- ঈমান কথা ও কাজের নাম।

২- ঈমানে মুখের কথা ও অন্তরের কথার সমন্বয় হবে। মুখের কথা হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ, আর অন্তরের কথা এটার রুকন ও শর্তসমূহের বিশ্বাস লালন করা।

৩- ঈমান মুখের কাজ, অন্তরের কাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের মিশ্রণ। মুখের কাজ যেমন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদির যিকির করা। আর অন্তরের কাজ যেমন তাওয়াক্কুল করা, ভয় পাওয়া, আশা করা, ভালোবাসা ইত্যাদি। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ যেমন, সালাত, সাওম, হজ, যাকাত আদায় ইত্যাদি।

৪- আর ঈমান আনুগত্য করলে বাড়ে, আর অবাধ্যতা করলে কমে যায়।

৫- যাবতীয় আনুগত্যের বিষয় ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

৬- ঈমানে ইনশা-আল্লাহ বলা যাবে, অর্থাৎ 'ইনশা-আল্লাহ আমি ঈমানদার' এ কথা বলা যাবে; কারণ সকল আমল করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইমাম লালেকাঈ তার সনদসহ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হাজার বা তার চেয়ে বেশি আলেম থেকে হাদীস লিখেছি, তবে আমি কেবল তাদের থেকেই হাদীস লিখেছি যারা বলে, ঈমান কথা ও কাজের নাম। তাদের থেকে হাদীস নিইনি যারা বলে ঈমান হচ্ছে কথার নাম। লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৮৮৯), নং ১৫৯৭; ইবন হাজার এ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন, দেখুন, ফাতহুল বারী (১/৪৭)।

ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'সত্তর জন তাবে'য়ী, মুসলিমগণের ইমাম, বিখ্যাত ফকীহগণ এ ব্যাপারে ইজমা' বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসের ওপর বিশ্বাস ও আমলের জন্য আমাদেরকে প্রদান করে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তন্মধ্যে রয়েছে, ঈমান কথা ও কাজের নাম, আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, আর অবাধ্যতার মাধ্যমে হ্রাস পায়।' দেখুন, ইবনুল জাওযী, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, পৃ. ১৭৬।

ঈমানের সংজ্ঞার ব্যাপারে বাহ্যিক দৃষ্টিতে খারেজী ও মু'তাযিলারা সালাফে সালেহীনের মতের অনুসরণ করেছে। কারণ তারা বলেছে, ঈমান আকীদাহ, কথা ও কাজের নাম। কিন্তু বাস্তবে তারা আহলুস সুন্নাত, সালাফে সালেহীনের বিরোধিতা করেছে কয়েক দিক দিয়ে, তা হচ্ছে, তারা বলে,

১- ঈমান একটি জিনিসের নাম। ঈমানের কোনো অঙ্গ বা অংশবিশেষ হয় না।

২- ঈমান বাড়ে না, আর ঈমান কমে না।

৩- ঈমানের কোনো এক অংশ চলে গেলে পুরোটা চলে যায়।

৪- ঈমানের মধ্যে ইনশা-আল্লাহ বলা জায়েয নাই।

আর মুরজিয়া মতবাদের লোকদের সাথে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বাহ্যিকভাবে একটি মিল লক্ষ্য করা যায় যে, তারা উভয়েই কবীরা গুনাহকারীকে কাফের বলে না। কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান, যেমন তারা বলে,

১- ঈমান একটি জিনিসের নাম। ঈমানের কোনো অঙ্গ বা অংশবিশেষ হতে পারে না। যদিও সে একটি জিনিস নির্ধারণের ব্যাপারে তারা প্রচুর মতভেদ করেছে। সে একটি জিনিস কী তা নির্ধারণে তারা আবার মতভেদ করেছে। যেমন,

 * তাদের কারও কারও কাছে ঈমান হচ্ছে শুধু মা'রিফাত তথা চেনা জানা (জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়)। এ কথার দাবি অনুযায়ী ফির'আউন ঈমানদার।
 * তাদের কারও কারও নিকট ঈমান হচ্ছে নিছক অন্তরের বিশ্বাস (মুরজিয়া, আশ'আরী ও মাতুরিদী ফির্কা)। এ কথার দাবি অনুযায়ী ইবলিস ঈমানদার।
 * তাদের কারও কারও নিকট ঈমান শুধু মৌখিক স্বীকৃতি (কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়)। এ কথার দাবি অনুযায়ী মুনাফিকরা ঈমানদার।

২- ঈমান বাড়েও না, কমেও না।

৩- আমল বা কর্ম কখনো ঈমানের অংশ নয়।

৪- ঈমানের কোনো অংশ চলে যেতে পারে না।

৫- গুনাহ ঈমানের কোনো ক্ষতি করবে না। কেউ ঈমান নিয়ে মারা গেলে তার জন্য জান্নাত

অবধারিত।

৬- মূল ঈমানের দিক থেকে মানুষরা সকলেই সমান।

৭- ঈমানের ব্যাপারে ইনশা-আল্লাহ্ বলা জায়েয নেই।

এর বাইরে আরেকটি গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের অবস্থান আহলুস সুন্নাতের অভ্যন্তরে ধরা হয়, তারা হচ্ছেন 'মুরজিয়াতুল ফুক্বাহা' বা ফকীহগণের মাঝে যারা 'ইরজা' মতবাদে বিশ্বাসী। ইমাম আবু হানীফা ও তার অনুসারীদেরকে এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। তাদের মতে,

১- ঈমান আকীদাহ ও কথার নাম।

২- ঈমান বাড়েও না কমেও না।

৩- আমল ঈমানের মূল রুকন নয়, তবে তা শর্ত বা অতিরিক্ত রুকন।

৪- মূল ঈমানে মানুষরা সকলেই সমান।

৫- ঈমানে কোনো ইস্তেসনা তথা ইনশা-আল্লাহ্ বলা চলবে না।

ইবন আবিল ইয্য বলেন, "আমাদের (তিনি আমাদের বলে হানাফী আলেমদের বুঝিয়েছেন) অনেক আলেমের মত হচ্ছে তাই যা ইমাম ত্বাহাওয়ী বলেছেন, আর তা হচ্ছে ঈমান মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাসের নাম।" ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৪৫৯)।

আবুল লাইস আস-সামারকান্দী আল-মাতুরিদী বলেন, "সুতরাং যে কেউ দৃঢ়ভাবে তা অন্তরে গ্রহণ করবে, আর তার স্বীকৃতি দিবে, সেই মুমিন। কারণ সে সঠিকটির ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে। কেননা ঈমান তো মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাসেরই নাম। সুতরাং যে কেউ অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করবে, মুখে স্বীকৃতি দিবে সেই মুমিন।" দেখুন, আবুল লাইস আস-সামারকান্দী আল-মাতুরিদী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৯; আরও দেখুন, আবু মানসূর আল-মাতুরিদী, আত-তাওহীদ, পৃ. ৩৭৩-৩৮১।

এ হচ্ছে ঈমানের ব্যাপারে মানুষদের মূল মতাদর্শ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ এ ব্যাপারে প্রচুর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন,

১- ইবন আবী শাইবাহ, আল-ঈমান।

২- আবু উবাইদ, আল-ঈমান।

৩- ইমাম বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, কিতাবুত তাওহীদ।

৪- ইবন আবি আমর আল-আদনী, আল-ঈমান।

৫- আবু ইয়া'লা, মাসায়িলুল ঈমান।

৬- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ঈমান, আল-ঈমান আওসাত্ব, আল-ঈমান আল-আসগার।

ঈমানের ব্যাপারে বিভিন্ন ফির্কার মতভেদ বিস্তারিত জানতে দেখুন,

- ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৭৬০-৮৮১)।
- আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ (১/৫৬২)।
- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৮০৯-৮৩০)।
- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ১১১-১৩৬।
- সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৬৭-৭১।
- বাইহাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ ৭৯-৮৫।
- আল-বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ৩৮৮-৩৯০।
- আল-বাকেল্লানী, আল-ইনসাফ, পৃ. ৮৪-৮৯।
- আবু সা'ঈদ আন-নাইসাপূরী, আল-গুনইয়াতু ফী উসূলিদদীন, পৃ. ১৭৩-১৭৫।
- বাগদাদী, উসূলিদ-দীন পৃ. ২৫২-২৫৩।
- ইবন হাযম, আল-উসূল ওয়াল ফুরূ', পৃ. ৮-১৫।
- ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'আতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল (৩/৮)।
- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৪৫৯-৪৮৭)।
- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১/৪৬-৪৭)।
- আইনী, উমদাতুল কারী (১/১০২-১১১)।
- সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার (১/৪০৩-৪২৬)।

قال: ثم كان الاختلاف في القرآن: مخلوقًا أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا: إن القرآن كلام [الله] غير مخلوق وأنه صفة منه بدأ قولًا،

তিনি [ইবন খাফীফ] আরও বলেন, তারপর মতভেদ হয়েছে কুরআনের ব্যাপারে। তা কি সৃষ্ট নাকি সৃষ্ট নয়। আমাদের মত ও আমাদের ইমামগণের মত হচ্ছে, কুরআন আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়। আর এটি আল্লাহর গুণ।(৭৪৯) আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে কথা হিসেবে,

- আল-হাফেয আল-হেকামী, মা'আরিজুল কবুল ২/১৭, ৪৫০-৪০৮।

৭৪৯. এ হচ্ছে আল্লাহর কালাম বা বাণীর ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আর বিশেষ করে কুরআনের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতের মত। এটি এমন এক মাসআলা, যেখানে মতভেদ হয়েছে প্রচুর। এর কারণে মানুষ দলে দলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর এর সাথেই যুক্ত হয়েছে 'ফিতনাতু খালকিল কুরআন' বা কুরআন সৃষ্ট নাকি সৃষ্ট নয় এ মাসআলার কারণে মানুষদের পরীক্ষা করে বিপদে নিপতিত করা।

কুরআন সংক্রান্ত এ মতভেদের সূত্রপাত হয় 'জাহম ইবন সাফওয়ান' এর হাতে। তখন ছিল তাবে'য়ীদের যুগের শেষের দিক। তখন সুন্নাহ'র জয়জয়কার অবস্থা থাকায় জাহম ইবন সাফওয়ানের কথা কেউ আমলে নেয়নি, আর লোকেরাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, তার মতবাদ গ্রহণ করেনি। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের মাঝে ইলমের চর্চা কমে যেতে থাকে, বড় বড় তাবে'য়ীগণ চলে যেতে থাকেন, যারা সাহাবায়ে কিরামের কাছ থেকে সরাসরি বিশুদ্ধ ইলম নিয়েছেন ধীরে ধীরে তারা দুনিয়া থেকে চলে যান। আর এর মাধ্যমে রাসূল প্রশংসাকৃত তিন প্রজন্মের লোকেরা শেষ হয়ে যায়। আর ঠিক তখনই বিদ'আত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এ বিদ'আতের ঝাণ্ডা বহনকারী ব্যক্তিটি হচ্ছে, বিশর ইবন গিয়াস আল-মিররীসী। সে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এর মাধ্যমে আলেমদের ওপর চড়াও হয়, তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার যুলুম নির্যাতন করা হয়, সেই মযলূম মনীষীদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল। তিনি এ বিষয়ে ভীষণ কষ্ট ভোগ করেছেন, উত্তম পরীক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়ে সুন্নাত ও আহলুস সুন্নাতকে সাহায্য করেছেন। তিনি বিদ'আতীদের চেহারার সামনে বাঁধার বিন্ধ্যাচল হয়ে অবস্থান নেন।

আমরা এখানে এ মাসআলাটিতে আহলুস সুন্নাত ও অন্যান্য পথভ্রষ্টদের মত বর্ণনা করব:

প্রথম মত: আল্লাহর কালাম বা কথা বলার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র সারসংক্ষেপ:

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে,

১- আল্লাহ তা'আলার কথা বলেন, বাক্য বিনিময় করেন, ব্যক্ত করেন ও ডাকেন।
২- আল্লাহ তা'আলার কথা বলা অক্ষর ও বর্ণের মাধ্যমে হয়। সেটা যেকোনো ভাষায় হতে পারে।
৩- আল্লাহ তা'আলার বাণীর আওয়াজ রয়েছে, যা শোনা যায়।
৪- আল্লাহ তা'আলার বাণী বলে তাঁর নিজেরই কথা বুঝানো হয়, অন্য কারো কথা নয়।
৫- আল্লাহ তা'আলার বাণী সৃষ্ট নয়, কারণ তা তাঁর গুণ। আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণকে সৃষ্ট বলা যাবে না।
৬- আল্লাহ তা'আলার বাণী তাঁর কাছ থেকে এসেছে এবং তাঁরই দিকে আবার ফিরে চলে যাবে।
৭- আল্লাহ তা'আলার বাণীর আশ্রয় অবলম্বন করা যায়।
৮- আল্লাহ তা'আলার বাণীর শপথ করা যায় ও অসীলা প্রদান করা যায়।
৯- আল্লাহ তা'আলার বাণী লিখিতও হতে পারে, আবার শোনা জিনিসও হতে পারে।
১০- আল্লাহ তা'আলার বাণী তাঁর সত্তাগত ও কর্মগত বা ইচ্ছাকৃত গুণের অন্তর্ভুক্ত।
১১- আল্লাহ তা'আলার বাণী তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত; তাঁর থেকে পৃথক কোনো কিছু হয়ে যায়নি।
১২- আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা তাঁর গুণান্বিত হওয়ার কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই।
১৩- আল্লাহ তা'আলার বাণী উত্তম বাণী; যার সাথে সৃষ্টিকুলের কারো বাণীর সাদৃশ্য কিংবা তুলনা করা যাবে না।
১৪- আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীকে যাকে ইচ্ছা শুনান, তিনি তাঁর ফিরিশতাদের, নবী-রাসূলদের শুনান। আর আখেরাতে সকল বান্দাদের শুনাবেন। বিশেষ করে জান্নাতীদের শুনাবেন।
১৫- আল্লাহ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে স্বয়ং কথা বলেছেন, গাছ থেকে তাঁরই শব্দ

মূসা আলাইহিস সালাম শুনেছিলেন।

১৬- আল্লাহ তা'আলার বাণী কোনো দিন নিঃশেষ হবে না। যত পানি আছে তা কালি বানালে আর যত গাছ আছে তা কলম বানালেও আল্লাহর বাণী লিখে শেষ করা যাবে না।

১৭- আল্লাহর তা'আলার বাণীর মধ্যে রয়েছে, তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন, অনুরূপ ইবরাহীমের সহীফা ও মূসার সহীফা।

১৮- কুরআনে কারীম আল্লাহ তা'আলার বাণী, তার সূরা, আয়াত, বাক্য দিয়ে তিনি কথা বলেছেন। সে বাক্য ও বাণী শব্দের সমষ্টি ও অর্থের সম্ভার বিশিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেকার কারও উপরে নাযিল করেননি। কুরআনে কারীমকে আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে শুনিয়েছেন, জিবরীল তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছেন, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তাঁর উম্মতকে শুনিয়েছেন। কুরআনে কারীম লাওহে মাহফূয ও বাইতুল ইয্যতে থাকলেও জিবরীল আলাইহিস সালাম তা সেখান থেকে গ্রহণ করেননি। সরাসরি আল্লাহর ওহী হিসেবে শুনে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেন। জিবরীল ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব কেবল তা গ্রহণ করা, প্রচার করা ও আদায় করা। এ কুরআন লাওহে মাহফূযে লিখিত, হুবহু তা-ই আমাদের গ্রন্থসমূহে লিখিত যা একজন তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত করে থাকে। যারা পাঠকারী তারা তাদের আওয়াজে পাঠ করে থাকে, যারা শুনে তারা আল্লাহর বাণীকে তাদের কান দিয়ে উক্ত আওয়াজে শুনে। যারা কপি করে, যা ছাপায় তারা এ বাণীকেই কপি করে ও এ বাণীকেই ছাপায়। তা হুবহু তা-ই যা মুখস্থকারীর অন্তরে সংরক্ষিত। তার বর্ণ ও অর্থ সবই আল্লাহর। সুতরাং যে কেউ কুরআন শুনে তা সৃষ্ট বলবে সে কাফের হয়ে যাবে। কুরআন পড়ার সময় মানুষের কণ্ঠস্বর, কাগজ, কালি, বাঁধাই সামগ্রী এগুলো সৃষ্ট ও বানানো জিনিস।

১৯- আল্লাহ তা'আলার বাণী বিভাজন করা যায়, অংশ বিশেষ নির্ধারণ করা যায়, কিছু অংশ বলা ও পড়া যায়।

২০- আল্লাহর বাণী সব একই বাণী নয়, সুতরাং যা কুরআন তা হুবহু তাওরাত বা ইঞ্জীলে থাকা বাণী নয়। কুরআনে এমন সব অর্থ সম্ভার এসেছে যা তাওরাত কিংবা ইঞ্জীলের নয়। অনুরূপ ইঞ্জীল ও তাওরাতে যেসব অর্থসম্ভার এসেছে তা পুরোপুরি কুরআনে নয়।

২১- আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছেন, কুরআন আরবীতে, তাওরাত হিব্রুতে, আর ইঞ্জীল সুরিয়ানী ভাষায়।

২২- আল্লাহ তা'আলার বাণী কিছু অংশের উপর অপর কিছু অংশের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যেমন, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাসের ফযীলত অন্যান্য সূরার চেয়ে বেশি।

২৩- আল্লাহ তা'আলার বাণী এক অংশের পরে আরেক অংশ আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন এবং এভাবেই আলাদা আলাদা পরপর সময়ে নাযিল করেছেন।

দ্বিতীয় মত: জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের মত, তারা বলে, কুরআন সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তাঁর সত্তা থেকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন শোনা যায় না, কুরআন নিয়ে আল্লাহ কথা বলেননি।

তৃতীয় মত: তথাকথিত দার্শনিকদের মত, তারা বলে, কুরআন আর কিছু নয়, তা 'আকলুল ফা'আল' কর্মক্ষম বিবেক থেকে যা পবিত্র অন্তরের উপর 'ফাইদ্ব' হয় বা উপচে পড়ে। সুতরাং তাদের নিকট আল্লাহ নামক সত্তা নেই শুধু একটি নাম মাত্র সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। তার কোনো নাম নেই, গুণ নেই, কর্ম নেই। তাই তাঁর কোনো কথা নেই, ফিরিশতা তা আনেনি।

চতুর্থ মত: আল্লাহর বাণী এমন একটি অর্থ বা ভাব, যা আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। সে ভাবটি একাই নির্দেশ, নিষেধ, সংবাদ, সংবাদের চাহিদা, যদি তা আরবীতে বলা হয় তখন তা কুরআন হয়ে যায়, আর যদি হিব্রুতে বলা হয়, তখন তা তাওরাত হয়, এভাবেই... । এ মতটি কুল্লাবিয়্যাহ সম্প্রদায়ের, অনুরূপ যারা তাদের অনুসরণ করছে সেসব আশ'আরী মতবাদের লোকদের। এটাকেই তারা কালামে নাফসী বলে থাকে।

পঞ্চম মত: মাতুরিদীদের মত, আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন, তবে তার কথা প্রাচীন, বা আযালী, যেমনিভাবে তার সকল গুণ কাদীম বা সর্বপ্রাচীন। তার কথা সৃষ্ট নয়, আবার হাদেসও নয়, অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তখন কথা বলেন এমন নয়। কুল্লাবিয়্যাদের মত তারাও মনে করে আল্লাহর বাণী,

কালামে নাফসী, যার কোনো অক্ষর কিংবা আওয়াজ নেই। তাদের নিকট মূসা যে শব্দ শুনেছেন তা সৃষ্ট। নাউযুবিল্লাহ। এভাবেই তারা মু'তাযিলাদের কাছাকাছি মতে ফিরে গেছে।

ষষ্ঠ মত: কাররামিয়্যাহদের মত, তারা বলে, আল্লাহর বাণী কিছু অক্ষর ও আওয়াজের সমষ্টি, যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর সত্তার সাথে জড়িত। তবে তা আগে ছিল না, পরে হয়েছে বা হাদেস। আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে কথা বলেছেন, আগে তিনি কথা বলতেন না।

সপ্তম মত: ওয়াহদাতুল ওজুদ এর প্রবক্তাদের মত, তাদের মতে জগতের যত কথা সবই আল্লাহ তা'আলার কথা। সেটা গদ্য হোক কিংবা পদ্য, হক্ব হোক কিংবা বাতিল, জাদু হোক কিংবা কুফরী। নাউযুবিল্লাহ।

যুগ যুগ ধরে আলেমগণ বিভিন্নভাবে এসব মতাদর্শ খণ্ডন করেছেন। বস্তুত এ মতামতগুলোর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করলেই এগুলোর অসারতা ধরা পড়ে। এখানে এ মতামত খণ্ডানো উদ্দেশ্য নয়, শুধু এ অধ্যায়ে পথভ্রষ্টদের মতামত তুলে ধরা হলো। তারপরও অনেক আলেম তাদের সেসব সন্দেহের সুন্দর সমাধান প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ইমাম বুখারী তার খালকু আফ'আলিল ইবাদ, আহমাদ ইবন সুলাইমান আন-নাজ্জার তার আর-রাদ্দু মান ইয়াকুলু বি খালকিল কুরআন, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আল-জুদা'ই তার আল-আকীদাতুস সালাফিয়্যাহ ফী কালামি রাব্বিল বারিয়্যাহ।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/২১৬-৩৬৯), (২/৩৭৮-৩৮৫)।
২- ইমাম আহমাদ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ১১৪-১২৬।
৩- ইমাম উসমান ইবন সাঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ১৫৯-১৭০।
৪- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/৪০৪-৪০৫)।
৫- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৭৫-৭৬।
৬- সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৭-১৪।
৭- বাইহাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ, পৃ. ৩২-৪০।
৮- বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ২৬৮-২৮৩।
৯- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৩৯-৪০, ১৬২, ২৩৪), (৩/১৭৪-১৭৬); মাজমূ'আতুর রাসায়িলিল মুনীরিয়্যাহ (২/১৮৪)।
১০- ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২৭৭-৩৩২)।
১১- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১৭২-২০৬)।
১২- হাফেয আল-হেকামী, মা'আরিজুল কবুল (১/২৩০-২৫৩)।

৭৫০. গ্রন্থকারের বক্তব্য, "আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে কথা হিসেবে, আর তার কিছেই প্রত্যাবর্তন করবে বিধান হিসেবে।" এর দ্বারা ইমামগণ দু'টি বিষয় উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন,

এক. আল্লাহর বাণী আল্লাহর একটি গুণ, আর গুণ সবসময় যার জন্য নামটি প্রযোজ্য তাঁরই মালিকানাধীন, অন্য কারও নয়। আর এটা তেমনি হবে যেমনটি ইমাম আহমাদ বলেন, 'ইলম' আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সেটা তাঁরই মালিকানাধীন, আর আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান, তার থেকেই এসেছে। অনুরূপ ইমাম আহমাদ বলতেন, আল্লাহর সিফাতসমূহ তাঁর থেকেই এসেছে। তদ্রূপ ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ বলতেন, যা আল্লাহ তাঁর নিজের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন আর যা আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে নাম দিয়েছেন। আর এতে সন্দেহ নেই যে, সকল গুণের ব্যাপারেই এমনটি বলা যাবে, যেমন ক্ষমতা (কুদরত), জীবন (হায়াত), সাম' (শোনা), বাসার (দেখা), ইত্যাদি। কারণ এসব গুণাবলির সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে, অর্থাৎ তাঁর নাম দিয়ে যে সত্তাকে বুঝানো হয়েছে সে সত্তার অধীন।

দুই. অপর যে অর্থটি তারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন তা হচ্ছে, তিনি আল্লাহ স্বয়ং এ কুরআন নিয়ে কথা বলেছেন, তা তাঁর থেকেই বের হয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য

ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يُرى في يوم القيامة، وذكر الحجة.

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] আল্লাহকে দেখার বিষয়ে মতভেদ বর্ণনা করলেন(৭৫১) এবং বললেন, আমাদের বক্তব্য ও আমাদের ইমামদের বক্তব্য যা আমরা বিশ্বাস করি তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে কিয়ামতের দিন দেখা যাবে।(৭৫২) আর তিনি তার প্রমাণ উল্লেখ করেন।

কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে।" [সূরা আল-কাহাফ: ০৫] আরও বলেছেন, "কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ বাণী অবধারিত হয়েছে...।" [সূরা আস-সাজদাহ: ১৩]

আল্লাহর বাণী কুরআনের ব্যাপারে 'কুরআন আল্লাহর বাণী তাঁর কাছ থেকে এসেছে আর তাঁর কাছেই ফিরে যাবে' এভাবে বলা সালাফে সালেহীন থেকে প্রচুর পরিমাণে এসেছে। যেমন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা, ওকী' ইবনুল জাররাহ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল প্রমুখ। দেখুন, আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (১/৩৬৩)

সুতরাং এ কুরআন অন্য কারও কাছ থেকে আসেনি, যেমনটি জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা ও মু'তাযিলারা বিশ্বাস করে থাকে, তারা মনে করে থাকে তিনি সেটা বাতাসে সৃষ্টি করেছেন, অথবা তার আসার সূত্রপাত অন্য কারও কাছ থেকে হয়েছে।

আর এটিই সবশেষে মাতুরিদিয়াদের বিশ্বাস গিয়ে ঠেকেছে। কারণ তারা কুরআনের অক্ষর ও আওয়াজকে আল্লাহর বাণী বলতে নারাজ।

অনুরূপভাবে এতে আশা'য়েরাও ভুল করে থাকে, কারণ তারা মনে করে থাকে এ কুরআন এর শুরু হয়েছে লাওহে মাহফূয থেকে। জিবরীল সেটাকে লাওহে মাহফূযের সেখান থেকে গ্রহণ করে নবীর কাছে পৌঁছিয়েছেন। [নাউযুবিল্লাহ] অনুরূপভাবে আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদর কারও কারও মতে এ কুরআনকে জিবরীল বাইতুল ইয্যত থেকে ২৩ বছর নবুওয়াতী যিন্দেগীতে বাচাই করে এনে রাসূলের কাছ নাযিল করেছেন। [নাউযুবিল্লাহ]

আর গ্রন্থকারের বক্তব্য, "আর তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে বিধান হিসেবে" এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার জীবনের শেষ সময়ে এ কুরআন লিখিত খাতা ও অন্তর থেকে তুলে নেয়া হবে ও তাকে উপরের দিকে পরিভ্রমণ করিয়ে দেয়া হবে। তখন আর মানুষের অন্তরে একটি কালেমাও অবশিষ্ট থাকবে না, যেমনিভাবে লিখিত গ্রন্থ মুসহাফে একটি বর্ণও বাকী থাকবে না।

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলাম মিটে যাবে যেমন কাপড়ের নকশা মিটে যায়, তখন এমন অবস্থা হবে যে, মানুষ জানবে না, সিয়াম কী? সালাত কী? হজ কী? সাদাকাহ কী? আর অবশ্যই মহান আল্লাহর কিতাবের ওপর একটি রাত অতিবাহিত হবে, তখন যমীনের বুকে তার একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না।'

বর্ণনাটি সংকলন করেছেন ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪০৪৯; বাযযার, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৮৩৮; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৪/৪৭৩); বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ২০২৮।

অনুরূপভাবে ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুরআনের ওপর এমন এক রাত অবশ্যই অতিবাহিত হবে, যাতে মুসহাফে একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না, আর কোনো মানুষের অন্তরেও সেটার কিছু থাকবে না, সবই উত্থিত হয়ে যাবে।

বর্ণনাটি সংকলন করেছেন, ইমাম দারেমী, আস-সুনান (২/৪৩৮); অনুরূপ মারফূ' সূত্রে ইবন মাজাহ (২/১৩৪৪), নং ৪০৪৮; দারেমী, আস-সুনান (২/৪৩৮)। আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৭৪-১৭৫)।

৭৫১. আল্লাহকে দেখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৭৫২. জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলারা সালাফে সালেহীন ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যা বলেছে তার বিরোধিতা করেছে। তারা বলে, আল্লাহকে কোনোভাবেই দেখা যাবে না। বরং তাদের নিকট আল্লাহকে দেখা কখনো হবে না। তথাকথিত দার্শনিকরাও জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করেছে। দেখুন, আস-সাব'ঈনিয়্যাহ (বুগইয়াতুল মুরতাদ) পৃ. ৪৭২; মাজমূ' ফাতাওয়া (১৪/১৬৩); অনুরূপভাবে শিয়াদের যায়দিয়া সম্প্রদায়, বাতেনী সম্প্রদায় ও মুরজিয়াদের কিছু গোষ্ঠীও একই মত পোষণ করে থাকে। আর ইমামীয়া শিয়াদের পরবর্তীরা সকলেই এ মত পোষণ করে থাকে, যেমনটি

ثم قال: واعلم. رحمك الله. أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدِّثين في كل الأزمنة. وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه:5] و ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة:5] ولا نقول: إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه؛

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, আমি উল্লেখ করেছি মতভেদপূর্ণ বিধানসমূহ সর্বযুগের মুহাদ্দিসদের কাছে যে নিয়মে তা আলোচিত হয়ে এসেছে। এখন আমি শুরু করছি আকীদাহ-বিশ্বাস সংক্রান্ত কিছু বিধান তুলে ধরতে। তাই আমরা বলি ও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলার 'আরশ রয়েছে। তিনি সাত আসমানের উপর তাঁর সকল নাম ও গুণসহ তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন।(৭৫৩) যেমনটি তিনি বলেছেন, "রহমান আরশের উপর উঠেছেন"। [সূরা ত্বা-হা: ৫] আরও বলেন, "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুই তাঁর সমীপে উঠে যাবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর।" [সূরা সাজদাহ: ০৫]

আমরা বলি না যে, তিনি যমীনেও, যেমনটি তিনি আসমানে তাঁর 'আরশের উপর(৭৫৪);

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, তিনি বলেন, 'আর ইমামিয়াদের এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। তাদের প্রাক্তন আলেমরা আল্লাহকে দেখা সাব্যস্ত করতো, কিন্তু তাদের অধিকাংশ পরবর্তীরা এটাকে অস্বীকার করে থাকে।' ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৩১৫)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সালাফে সালেহীনের অধিকাংশের মত হচ্ছে, যে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে আখেরাতে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। অতঃপর দেখা হবে সে এমন লোক কিনা যার কাছে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই, যদি তাই দেখা যায় তবে তাকে জ্ঞান দিতে হবে; যেমনিভাবে যারা ইসলাম জানে না, তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে। তারপর যদি জ্ঞান পৌঁছানোর পরেও অস্বীকার করেই যায় তাহলে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৪৮৬)।

৭৫৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার অপর গ্রন্থ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" দেখার অনুরোধ রইল।

৭৫৪. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির উপরে থাকা এবং তাঁকে আহ্বানকারী ও তাঁর ইবাদতকারীর নিকটে থাকার ব্যাপারে মানুষ চারভাবে বিভক্ত। তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় রয়েছে যারা বলে আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে আবার তিনি সব জায়গাতেও। আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপরের মতো যমীনের উপরও যারা বলে তারা সালেমিয়্যাহ ও সূফিয়্যাহদের দু'টি সম্প্রদায়। তারা মনে করেছে যে, তারা সকল ধরনের নস (কুরআন ও সুন্নাহ'র) ভাষ্যের ওপর আমল করছে। তাদের ধারণা, এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর 'আরশের উপরে থাকার ভাষ্যসমূহ এবং আল্লাহ কর্তৃক বান্দার সাথে ও নিকটে থাকার মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তাদের এ মতের যথাযথ খণ্ডন করেছেন, বলেছেন যে এটি কুরআন, সুন্নাহ, উম্মতের সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের ইজমা'র বিরোধী, তাছাড়া তা সে ফিতরাত বা স্বাভাবিক বিবেকেরও বিরোধী যার ওপর আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে তা স্পষ্ট বিবেকের যুক্তিরও বিরোধী, তদ্রূপ তা বহু দলীল-প্রমাণ বিরোধী কথা। তারপর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ দেখিয়ে দিয়েছেন যে তারা মূলত স্ববিরোধিতায় লিপ্ত।

لأنه عالم بما يجري على عباده.

إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنها مخلوقتان للبقاء لا للفناء.

কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর যা কিছু ঘটছে সেসব জানেন[৭৫৫]।

শেষে তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, আর আমরা বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।[৭৫৬] আর এ দু'টিকে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী করে বানিয়েছেন ধ্বংসের জন্য নয়।[৭৫৭]

দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২২৯-২৩১)।

৭৫৫. এর মাধ্যমে সম্ভবত তিনি সেসব 'নস' (কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য) এর দিকে ইঙ্গিত করছেন, যাতে আল্লাহ কর্তৃক বান্দার সাথে থাকার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, এসব নস এর বক্তব্য অনুযায়ী বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে আছেন, তবে সে সাথে থাকার অর্থ বান্দাকে জ্ঞানের মাধ্যমে বেষ্টন করে রাখা, এর দ্বারা লেগে থাকা কিংবা মিশে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।

৭৫৬. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকলেই একমত যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে অস্তিত্বে আছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সর্বদা এ আকীদাহ'র ওপরই ছিল। অবশেষে মু'তাযিলা ও কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান হলো, তারা বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বে থাকা অস্বীকার করলো। তারা বললো, আল্লাহ তা'আলা এ দু'টিকে কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করবেন!! আর যে কারণে তারা এ মতটি পোষণ করলো, যা তাদর নিকট একটি নীতিতে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর জন্য শরী'আত প্রবর্তন করেছে, সেটা হচ্ছে, এটা বলা যে, আল্লাহর জন্য এটা করা আবশ্যক, তাঁর জন্য এটা করা উচিত নয় ইত্যাদি। তারা এসব ব্যাপারে আল্লাহকে মানুষের কর্মকাণ্ডের ওপর কিয়াস করেছে। সুতরাং তারা 'মুশাব্বিহাতুল আফ'আল' বা আল্লাহর কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মুশাব্বিহাদের অন্তর্ভুক্ত, এভাবে জাহমিয়্যাদের নীতি তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারপরও তারা (আল্লাহর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে) মু'আত্তিলা। তারা বলে বসেছে যে, প্রতিদান নির্ধারিত হওয়ার আগে এভাবে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা বেহুদা কাজ; কারণ তা তো অনেক লম্বা সময় নিষ্ক্রীয় থাকবে!! তাদের এসব বক্তব্যের জন্য দেখুন, ইবনুল কাইয়েম, হাদীউল আরওয়াহ (১/২৪-২৫); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৬৪১)।

৭৫৭. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত হচ্ছে, জান্নাত ও জাহান্নাম সর্বদা থাকবে, কখনো ধ্বংস হবে না, এ দু'টিকে অবশিষ্ট থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ধ্বংস করার জন্য নয়। এ বিষয়ে বিখ্যাত কেউ মতভেদ করেনি, তবে জাহাম ইবন সাফওয়ান তার বিপরীত কথা বলতো। সে মনে করতো, জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। তার এ মতের অনুসরণ করেছে মু'তাযিলা ফির্কার আবুল হুযাইল আল-আল্লাফ। সে বলতো, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের নড়াচড়া বিনষ্ট হয়ে যাবে, তাদের দেহ অবশিষ্ট থাকবে। তাদের এ কথার বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যমীনের সর্বত্র সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন এবং তাদের এ বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উম্মতের নেককার বদকার সবাই একমত হয়েছে যে, জান্নাতের নি'আমতসমূহ কখনও ধ্বংস হবে না, অনুরূপ জাহান্নামের আযাবসমূহও নিশ্চিহ্ন হবে না। এ দু'টির বাসিন্দা সেখানে চিরস্থায়ী হবে, সর্বদা তাতে থাকবে, অনন্তকাল ধরে তারা সেখানে অবস্থান করবে। তবে এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছে জাহম ইবন সাফওয়ান ও আবুল হুযাইল আল-আল্লাফ। তারপর ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ জাহম ইবন সাফওয়ান ও আবুল হুযাইল আল-আল্লাফের বক্তব্য খণ্ডন করেন। দেখুন, ইবন হাযম, আল-উসূল ওয়াল ফুরূ', পৃ. ৪৩-৪৫।

ইমাম আবু উসমান আস-সাবূনী বলেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাক্ষ্য দেয় ও বিশ্বাস করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম দুটিই সৃষ্ট। আর এ দু'টি অবশিষ্ট থাকবে, কখনো ধ্বংস হবে না। জান্নাতীরা কখনো সেখান থেকে বের হবে না, অনুরূপ জাহান্নামীরা যারা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা সেখান থেকে কখনো বের হবে না। দেখুন, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৬৬।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "…. উম্মতের সালাফ ও ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে,

إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.

শেষে তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, আর আমরা বিশ্বাস রাখি যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন সত্তাসহ(৭৫৮) মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত।(৭৫৯)

কিছু সৃষ্ট কখনো ধ্বংস হবে না, পুরোপুরি নিঃশেষ হবে না, যেমন জান্নাত ও জাহান্নাম, 'আরশ ইত্যাদি। সকল সৃষ্ট ধ্বংস হবে এ কথা কেবল এক শ্রেণির কালামশাস্ত্রবিদ ও বিদ'আতীরাই বলে থাকে, যেমন: জাহাম ইবন সাফওয়ান এবং মু'তাযিলাহ্ ও অনুরূপদের মধ্যে যারা তার সাথে একাত্ম হয়েছে। তাদের এ বক্তব্য আল্লাহর কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও উম্মতের সালাফ এবং ইমামগণের ঐকমত্যের বিরোধী কথা।" দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৮/৩০৭)।

এ ব্যাপারে আরও দেখুন,

১- আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৩৮৭-৪০১।
২- ইবন তাইমিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩০৪), (৮/৩৮০), (১২/৪৫); নাক্বদুত তা'সীস (১/১৫২-১৫৩), (২/১৮০); দারউত তা'আরুদ্ব (১/৩৮, ৩০৪-৩০৫), (২/৩৫৭), (৩/১৫৭-১৫৮), (৮/৩৪৫)।
৩- ইবনুল কাইয়্যেম, হাদীউল আরওয়াহ, পৃ. ৩৮৩-৪২৪।
৪- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৬১৪-৬৩১)।
৫- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১১/৪২১-৪২৪)।
৬- সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (২/২৩০-২৩৫)।

এ বিষয়ে উপকারী একটি গ্রন্থ হচ্ছে, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র লেখা 'আর-রাদ্দু আলা মান কালা বি ফানায়িল জান্নাতি ওয়ান নারি, যা তাহকীক করেছেন, ড. মুহাম্মাদ আস-সামহারী। অনুরূপ ইমাম সান'আনীর লেখা গ্রন্থ, রাফ'উল আসতার লি ইবত্বালি আদিল্লাতিল কায়িলীনা বি ফানায়িন নার, তাহকীক করেছেন, শাইখ আলবানী, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫, প্রথম সংস্করণ। তদ্রূপ শাইখ মার'ঈ ইবন ইউসুফ আল-হাম্বলী রচিত তাওফীকুল ফারীকাইন আলা খুলূদে আহলিদ দারাইন, তাহকীক খলীল আস-সুবাই'য়ী, প্রথম সংস্করণ ১৪১১ হিজরী। অনুরূপভাবে, ড. আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-ইয়ামানী রচিত, কাশফুল আসতার লি ইবত্বালি ইদ্দি'আয়ে ফানায়িন নার, দারু ত্বাইবাহ এর ছাপা।

৭৫৮. অর্থাৎ রাসূলের শরীর দেহ ও রূহ সহকারে।

৭৫৯. ইসরা ও মি'রাজ দু'টি শব্দ। ইসরা শব্দের অর্থ রাতের একাংশে সফর করা। আর মি'রাজ শব্দের অর্থ উপরে উঠার যন্ত্র বা উপরে উঠা। তম্মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইসরা বা রাতের কিয়দংশে সফর এর বিষয়টি কুরআনে কারীম দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ বলেন, "পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের মাধ্যমে ভ্রমণ করালেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমরা দিয়েছি বরকত, যেন আমরা তাকে আমাদের নিদর্শন দেখাতে পারি; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আল-ইসরা: ০১] অনুরূপভাবে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত উপরে উঠানোর বিষয়টিও কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত, আল্লাহ বলেন, "শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত, তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়, তাকে শিক্ষা দান করেছেন প্রচণ্ড শক্তিশালী, সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন, আর তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বদিগন্তে, তারপর তিনি তার কাছাকাছি হলেন, অতঃপর খুব কাছাকাছি, ফলে তাদের মধ্যে দু' ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। যা তিনি দেখেছেন, তার অন্তঃকরণ তা মিথ্যা বলেনি; তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি সে বিষয়ে তাঁর সংগে বিতর্ক করবে? আর অবশ্যই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন 'সিদরাতুল মুন্তাহা' তথা প্রান্তবর্তী কুল গাছ এর কাছে, যার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত। যখন কুল গাছটিকে যা আচ্ছাদিত করার তা আচ্ছাদিত করেছিল, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। অবশ্যই তিনি তার রবের মহান নিদর্শনাবলির কিছু দেখেছিলেন।" [সূরা আন-নাজম: ১-১৮] তাছাড়া বহু হাদীসে ইসরা ও মি'রাজ সাব্যস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে আলেমগণ আলাদা গ্রন্থও লিখেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ মুবারক সফর কী শরীর ও রূহের সমন্বয়ে হয়েছে? নাকি রূহের জগতের সফর ছিল তা? এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত ও অন্য মতগুলো তুলে ধরছি:

প্রথম মত: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সফর রূহ ও শরীর উভয়টি দ্বারাই হয়েছে এবং সেটা জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে, স্বপ্নে নয়। এটিই হচ্ছে সকল কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা

إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: «هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار».
ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضًا،

শেষে তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, আর আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা দু' মুষ্ঠি গ্রহণ করেছেন, অতঃপর বলেছেন, 'এগুলো জান্নাতের জন্য, এর এগুলো জাহান্নামের জন্য।[৭৬০] আর আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রয়েছে হাউয[৭৬১],

---

প্রমাণিত সত্য। আর এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত, আর এদিকেই উপরে গ্রন্থকার ইঙ্গিত করেছেন।

দ্বিতীয় মত: তা কেবল স্বপ্নে হয়েছিল, আর নবীদের স্বপ্ন সত্য ও ওহীস্বরূপ।

তৃতীয় মত: তা দু'বার হয়েছিল, একবার জাগ্রত অবস্থায় অপরবার স্বপ্নে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের যাবতীয় দলীল-প্রমাণাদির দাবি। বাকী মতগুলো অগ্রহণযোগ্য। যুগ যুগ ধরে আলেমগণ প্রথম মতটিকেই সমর্থন করেছেন এবং বাকী মতগুলোকে অসার প্রমাণ করেছেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- আজুররী, আশ-শরী'আহ ১৮১-১৯১।
২- তাফসীর আত-তাবারী (১৫/৫-১৭)।
৩- সীরাতে ইবন হিশাম (২/৫-৬)।
৪- তাফসীর ইবন কাসীর (৫/৪০-৪১)।
৫- ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা'আদ (৩/৪২)।
৬- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১/৪৫৯-৪৬১)।
৭- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/২৭০-২৭৬)।
৮- সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল বাহিয়্যাহ (২/২৮০-২৮৯)।
৯- শানকীত্বী, আদ্বওয়াউল বায়ান (৩/৩৯১-৩৯৩)।

৭৬০. এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে ও বিভিন্ন সূত্রে এসেছে, যেমন:

১- আহমাদ, আল-মুসনাদ (৪/১৭৬-১৭৭), (৫/৬৮)।
২- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/১১১)।
৩- দুওলাবী, আল-কুনা ওয়াল আসমা (২/৪৮)।
৪- উকাইলী, আদ-দু'আফা (১/২৫৭) এবং বলেছেন, আল্লাহর দুই মুষ্ঠি সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস গ্রহণযোগ্য সনদে এসেছে।
৫- ইবন আদী, আল-কামেল (২/৬২৪)।
৬- ইবন মান্দাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, নং ২৮।
৭- বাযযার, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৩০৩২।
৮- ত্বাবারানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত্ব, হাদীস নং ৯৩৭৫।
৯- আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৩৪২২।
১০- আত-তাবারানী, আল-মু'জাম আস-সগীর, হাদীস নং ৩৬২।
১১- আত-তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর (২০/১৭২), নং ৩৬৫।

ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এ হাদীসের অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাশহূরভাবে সাব্যস্ত, যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৬৫)।

হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৭/১৮৫-১৮৭) গ্রন্থে বলেন, দু' কজা বা মুষ্ঠি সংক্রান্ত বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদ বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।

অনুরূপ হাফেয ইবন হাজার, আল-মাত্বালিবুল আলিয়াহ (৩/৭৭), হাদীস নং ২৯২৫ তা নিয়ে এসেছেন এবং চুপ থেকেছেন।

তদ্রূপ শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আস-সহীহাহ (১/৭৬), নং ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০। আরও দেখুন, যিলালুল জান্নাহ ফী তাখরীজি কিতাবিস সুন্নাহ লি ইবন আবী আসেম (১/১১১)।

৭৬১. হাউয বা জলাধার। পানির বিশাল অঞ্চল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউয মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। হাফেয ইবন কাসীর বলেন, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লামের হাউয, আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে পান করার সুযোগ দিন, এটি বিভিন্নভাবে বহু সূত্রে সন্দেহাতীতভাবে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। যদিও বহু বিদ'আতী, অস্বীকারকারী ও অহংকারীর নাকে মাটি লাগুক, যারা এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। দেখুন, আন-নিহায়াহ (২/৩)।
ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, হাউয সংক্রান্ত হাদীসগুলো চল্লিশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন তাহযীবুস সুনান (৭/১৩৫); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/৩৪৪)।
ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কাযী ইয়াদ্ব যাদের কাছ থেকে হাউয সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের সংখ্যা ২৫ জন। ইমাম নাওয়াওয়ী তার ওপর তিনজন যোগ করেছেন। আর তারা যা বলেছেন আমি তাদের ওপর তার সমপরিমাণ যোগ করলাম। ফলে এ সংখ্যা বেড়ে ৫০ জন দাঁড়ালো। আর আমার কাছে এ ব্যাপারে সংবাদ এসেছে যে পরবর্তী কোনো কোনো আলেম সেটাকে ৮০ জন সাহাবীর বর্ণনা পর্যন্ত দেখিয়েছেন।" ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১১/৪৬৯)।
সাফারীনী বলেন, 'হাউয' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর তার ওপর প্রমাণ দিচ্ছে কুরআনের বাহ্যিক অর্থ ও হকপন্থীদের ইজমা' বা ঐকমত্য। দেখুন, লাওয়াইহুল আনওয়ার আস-সানিয়্যাহ (২/১৭৪); আরও দেখুন, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল বাহিয়্যাহ (২/২০২)।
হাউযের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বহু হাদীস এসেছে, সংক্ষেপে বর্ণনা করলে তা নিম্নোক্ত রকম দাঁড়ায়:

১- এটি একটি বড় জলাশয়, উত্তম পানির ঘাট।
২- জান্নাতের নাহর কাউসার থেকে তাতে পানি সরবরাহ করা হয়।
৩- যা দুধের চেয়ে শুভ্র।
৪- বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা।
৫- মধুর চেয়েও মিষ্টি।
৬- তা অনেক বেশি প্রশস্ত।
৭- যার দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান।
৮- প্রতিটি কোণ এক মাসের দূরত্বের রাস্তা পরিমাণ।

দেখুন, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/২৮০-২৮১)।
হাউযের এসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বহু হাদীস ও আসার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যার অধিকাংশই ইমাম ইবন আবী আসেম তার আস-সুন্নাহ, কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ ও ইবন কাসীর আন-নিহায়াহ গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন।
কোনো কোনো বিদ'আতী ফিরকা ও গোষ্ঠী হাউয অস্বীকার করেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খারেজী ও মু'তাযিলারা। যেমনটি উল্লেখ করেছেন হাফেয ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ ও সাফারীনী রাহিমাহুল্লাহ।
ইমাম ইবন আবী আসেম রাহিমাহুল্লাহ আস-সুন্নাহ গ্রন্থে 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'অচিরেই একটি গোষ্ঠী আসবে, যারা তাকদীর অস্বীকার করবে, হাউযকে মিথ্যা বলবে, শাফা'আতকে অস্বীকার করবে, জাহান্নাম থেকে কিছু মানুষ বের হবে সেটাও অস্বীকার করবে।' [(২/৩২১), হাদীস নং ৬৯৭] শাইখ আল-ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এ হাদীসের সনদকে হাসান বলেছেন।
হাউযের ব্যাপারে সালাফে সালেহীন আলেমগণের বক্তব্য নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীতে দেখা যেতে পারে:

১- আজুররী, আশ-শরী'আহ পৃ. ৩৫২-৩৫৭।
২- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (২/৩২১-৩৬১)।
৩- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/১১১৬-১১২৬)।
৪- বাইহাকী, আল-বা'সু ওয়ান নুশূর, পৃ. ১১০-১৩০।
৫- কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ (১/৩৪৩-৩৫০)।
৬- বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ২৪৬।
৭- আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৪৭৩।
৮- ইবন কাসীর, আন-নিহায়াহ (২/৩-৩৯)।
৯- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১১/৩৬৩-৩৬৯)।
১০- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ ১/২৭৭-২৮২।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, তিনি প্রথম সুপারিশকারী এবং প্রথম সুপারিশ কবুলকৃত ব্যক্তি।(৭৬২)

১১- সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (২/১৯৪-২০৪)।

৭৬২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সরাসরি এ শব্দগুলো এসেছে, "আমি কিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তানের নেতা, আমি প্রথম ব্যক্তি যিনি কবর ফেটে বের হবো, আমি প্রথম সুপারিশকারী, আর প্রথম আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২২৭৮] অপর হাদীসে এসেছে, 'আমি জান্নাতের ব্যাপারে প্রথম সুপারিশকারী।' দেখুন, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৯৬।

শাফা'আত সংক্রান্ত আলোচনা:

শাফা'আত শব্দের অর্থ কোনো এককের সাথে যোগ করা। একজন দো'আ করছে আর আপনি তার সাথে তার জন্য দো'আ করলেন, অর্থাৎ আপনি শাফা'আত করলেন। তার দো'আর সাথে জোড়া হলো। পরিভাষায় এর অর্থ, কারও জন্য মধ্যস্থতা করা কোনো উপকার লাভ কিংবা ক্ষতি দূরীকরণের জন্য। শাফা'আতকে বাংলা ভাষায় সুপারিশ বলা হয়।

সুপারিশ দু' প্রকার:

দুনিয়ার সুপারিশ: দুনিয়ার সুপারিশ করার জন্য শর্ত হচ্ছে,

১- সুপারিশ বৈধ কাজে হতে হবে।

২- কারো অধিকার বঞ্চিত করার জন্য অপরের কাছে সুপারিশ না হওয়া।

৩- আল্লাহর কোনো হদ্দ বা নির্ধারিত শাস্তি রহিত করার জন্য সুপারিশ না হওয়া।

আখেরাতের সুপারিশ:

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, আখেরাতে শাফা'আত বা সুপারিশ অবশ্যই সাব্যস্ত, যা কুরআন-সুন্নাহ ও আছার দ্বারা প্রমাণিত।

কাযী ইয়াদ্ব বলেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত হচ্ছে, শাফা'আত বা সুপারিশ হওয়া বিবেকের যুক্তি অনুযায়ী বৈধ বিষয়, আর কুরআন ও সুন্নাহ'র দাবি অনুযায়ী তা অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রমাণিত। তারপর তিনি এর ওপর বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ করেন। তারপর বলেন, বহু আছার এসেছে যার সম্মিলিত সমন্বিত দাবি হচ্ছে আখেরাতে গুনাহগার মুমিনদের জন্য শাফা'আত বা সুপারিশ হওয়ার বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত। আর সালাফ, খালাফ ও তাদের পরবর্তী আহলুস সুন্নাত এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এর বিপরীতে খারেজী ও মু'তাযিলারা তাদের ভ্রান্ত মূলনীতির কারণে তা অস্বীকার করে, সে মূলনীতি হচ্ছে, কবীরা দগুনাহগার চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কাযী আব্দুল জাব্বার বলেন, 'উম্মতের মধ্যে মতভেদ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত অবশ্যই সাব্যস্ত, তবে মতভেদ হয়েছে সেটার কার জন্য হবে? ... তারপর বলেন, 'আমাদের নিকট তা কেবল ঈমানদারদের মধ্য হতে যারা তাওবা করে মারা যাবে তাদের জন্য।' [শারহুল উসূলিল খামসাহ, পৃ. ৬৮৮-৬৯০]

অন্যত্র বলেন, 'সুতরাং উপরোক্ত বাক্য দ্বারা তুমি বুঝতে পারলে যে, শাফা'আত শুধু ঈমানদারদের জন্য সাব্যস্ত হবে, সালাত আদায়কারী কিন্তু ফাসেক লোকদের জন্য নয়।' [আব্দুল জাব্বার, ফাদ্বলুল ই'তিযাল ওয়া ত্বাবাকাতুল মু'তাযিলাহ, পৃ. ২০৭-২০৯] বস্তুত তাদের এসব বক্তব্য কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের আছার বিরোধী।

কুরআন ও সুন্নাহ'র সকল ভাষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, আমাদের নবীর জন্য আখেরাতে যেসব শাফা'আত সাব্যস্ত হয়েছে তা কয়েক প্রকার। তা থেকে কিছু প্রকার কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। যেমনটি ইমাম ইবন কাসীর ও ইমাম ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যদি আমরা সেগুলোকে সংক্ষেপে বলতে পারি, তাহলে তা নিম্নোক্ত অবস্থা দাঁড়ায়:

১- আশ-শাফা'আতুল উযমা বা বড় সুপারিশ, যা একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস, যা একাধিক হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। বরং সেটি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৩০৯); আস-সাফাদিয়্যাহ (২/২৯০-২৯১)। মু'তাযিলারা সাধারণত এ সুপারিশ মেনে নেয়।

[দেখুন, ফাতহুল বারী (১১/৪২৮)]

২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, যাদের সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান হয়ে গেছে। তখন তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন যাতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করে।

৩- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, যাদের গুনাহের পাল্লা ভারী হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ হয়ে গেছে, কিন্তু তারা এখনো তাতে প্রবেশ করেনি। তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশের আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ পেয়ে বসবে। উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার সুপারিশের কথা বর্ণনা করেছেন ইমাম নাওয়াওয়ী, শারহু মুসলিম (১/৪৪৩); কুরতুবী ও কাযী ইয়াদ্ব, আত-তাযকিরাহ, পৃ. ৩০১; সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (২/২১১); ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ২৫৭, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১১/৪২৮)।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত ২ ও ৩ নং এর ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, এখন পর্যন্ত আমি এগুলোর দলীল হাদীস থেকে পাইনি। দেখুন, হাশিয়াতুস সুনান (১৩/৭৭), আউনুল মা'বূদের হাশিয়ায়। অবশ্য এ ব্যাপারে ইমাম ইবন হাজার তাঁর ফাতহুল বারীতে একটি হাদীস দিয়ে দলীল নিয়েছেন, তা হচ্ছে, সহীহ মুসলিমে এসেছে, "আর তোমাদের নবী সিরাতের উপর দণ্ডায়মান থেকে বলতে থাকবেন, হে রব্ব নিরাপত্তা দিন, নিরাপত্তা দিন।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৯৫]

৪- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তাদের মর্যাদা নিচে হওয়ায় তাদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির তিনি সুপারিশ করবেন। [খারেজী ও মু'তাযিলারা এ অংশ মেনে নেয়, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে] এর পক্ষে দলীল দেয়া হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, যা তিনি আবু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর জন্য দো'আয় বলেছেন, "আল্লাহুম্মা ইরফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিয়্যীন" হে আল্লাহ, তার মর্যাদাকে আপনি হিদায়াতকারীদের পর্যায়ে উন্নীত করুন [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৯২০] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাইদ আবী আমেরকে বলেছিলেন, "ওয়াজ'আলহু ফাওকা কাসীরিন মিন খালক্বিকা" হে আল্লাহ, আপনি তাকে অনেক সৃষ্টির উপরে রাখুন। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৪৩২৩, ৬৩৮৩; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৪৯৮] আর কুরআন থেকেও এর দলীল দেয়া যায়, আল্লাহর বাণী, "আর যারা ঈমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, আমরা তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমরা একটুও কমাবো না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।" [সূরা আত-তূর: ২১]

৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কিছু লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা। যেমনটি তিনি উক্কাশাহ ইবন মুহসিন এর জন্য দো'আ করেছেন, যাতে তাকে সত্তর হাজার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। [দেখুন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৫৮১১; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২১৬-২১৭]

৬- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জাহান্নামে যাওয়া ব্যক্তির আযাব কম হওয়ার সুপারিশ করা। যেমন তিনি আবু তালিব এর জন্য সুপারিশ করবেন। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৮৮৩, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২০৯]

৭- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সকল প্রকার মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের সুপারিশ। কারণ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি জান্নাতে প্রবেশের জন্য প্রথম সুপারিশকারী। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৯৬]

৮- মদীনাবাসীদের জন্য রাসূলের সুপারিশ: এটি একটি বিশেষ সুপারিশ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কষ্ট সহ্য করে যারা সেখানে মারা যাবে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন বলেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে কেউ মদীনার আবহাওয়ার রুক্ষতা ও কষ্ট সহ্য করে সেখানে মারা যাবে আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবো অথবা সাক্ষ্য হবো।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৩৭৪, ১৩৭৭, ১৩৭৮]

৯- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সকল নবী, সকল নেককার জান্নাতী ঈমানদার

এরপর তিনি সিরাত(৭৬৩),

ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক এ উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য সুপারিশকরণ, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তখন সুপারিশের কারণে সেখান থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার সুপারিশ আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য' [আহমাদ, আল-মুসনাদ (৩/২১৩); আবু দাউদ, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৪৭৩৯; তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৪৩৫; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/৬৯), ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন]

মু'তাযিলা ও খারেজীরা এ প্রকার শাফা'আতকে অস্বীকার করে। কারণ তা তাদের মূলনীতির বিপরীত হয়েছে। সে মূলনীতি তাদের বিবেক নির্ধারণ করা নীতি, 'যারা জাহান্নামে যাবে তারা আর বের হবে না, তারা সেখানে স্থায়ী হবে'। এ সর্বনাশা মূলনীতির কারণে তারা বহু হাদীস অস্বীকার করেছে।

তবে এ কথা স্মরণ থাকা দরকার যে,

১- আখেরাতের সুপারিশের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা।

২- সে সুপারিশ পেতে হলে কয়েকটি শর্ত পূরণ হতে হবে:

এক. সুপারিশের জন্য আল্লাহর অনুমতি। তার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী, "এমন কে আছে যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতীত?" [সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৫]

দুই. সুপারিশকারীর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি। তার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী, "সেদিন কারও সুপারিশ কাজে আসবে না, তবে যার জন্য রহমান অনুমতি দিবেন এবং তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন।" [সূরা ত্বা-হা: ১০৯] অর্থাৎ তার সুপারিশ যার জন্য আল্লাহর অনুমতি রয়েছে।

তিন. যার জন্য সুপারিশ করা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি সামান্যতম সন্তুষ্টি (ঈমান ও ইসলামের অংশ থাকা)। তার দলীল, আল্লাহর বাণী, "আর তারা কেউ সুপারিশ করবে না, তবে যার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি আছে তার জন্য তা হবে...।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৮] সুতরাং তাওহীদ থাকতেই হবে, যদিও কবীরা গুনাহকারী হয়। [শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (৩/৪০৬)]

এ শর্তগুলো সব একই আয়াতে একসাথে এসেছে, আল্লাহ বলেন, "আর আসমানে বহু ফিরিশতা রয়েছে, তাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না, তবে যার জন্য ইচ্ছা তার অনুমতি হবে এবং যার ওপর ও যাদের জন্য সন্তুষ্টি থাকবে।" [সূরা আন-নাজম: ২৬] অর্থাৎ সুপারিশকারীর জন্য অনুমতি আর সুপারিশকারী ও সুপারিশকৃতের জন্য সন্তুষ্টি। [আস-সা'দী, আত-তাফসীর (৫/১৯১)]

৭৬৩. **সিরাত সংক্রান্ত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ:**

'সিরাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ বা রাস্তা। কিন্তু শরী'আতের পরিভাষায় সিরাত হচ্ছে জাহান্নামের পিঠের উপর রাখা একটি ব্রীজ, জান্নাত তার উপরে অবস্থিত। সে ব্রীজের উপর দিয়ে মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী গমন করবে। [ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১১/৩৯৯)]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হচ্ছে সিরাত সাব্যস্ত করার ওপর ঈমান আনতে হবে। কারণ এর ওপর কুরআন ও সুন্নাহ'র বহু হাদীস প্রমাণবহ। দেখুন, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৬৩২)।

সুতরাং সিরাত হক্ব ও যথাযথ। আর তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

১- জাহান্নামের পিঠের উপর বিস্তৃত একটি পুল,

২- যা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম,

৩- তরবারীর চেয়েও ধারালো,

৪- মানুষ তা দিয়ে অতিক্রম করবে,

৫- মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী তার উপর দিয়ে পার হবে।

৬- তাদের মধ্যে কেউ বিদ্যুৎ গতিতে পার হবে, কেউ বাতাসের গতিতে পার হবে, কেউ উন্নতমানের ঘোড়ার উপর দিয়ে পার হবে। কেউ যেখানে হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। কেউ শরীর ছিলে যাবে, কেউ আটকা পড়বে, কেউ তা দিয়ে নিচে পড়ে যাবে।

এসব কিছুই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কোনো কোনো ইমাম এর ওপর আলাদা গ্রন্থও লিখেছেন।

মীযান(৭৬৪), মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন।

জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও কিছু কিছু খারেজী সিরাতকে অস্বীকার করেছে। তারা কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা সিরাত সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণাদির তা'ওয়ীল তথা অপব্যাখ্যা করেছে। তারা বলে এর দ্বারা পথ উদ্দেশ্য। অপর গোষ্ঠী অস্বীকার করেছে যে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম কিছু হতে পারে না, তরবারীর চেয়েও ধারালো কিছু হতে পারে না, এর উপর দিয়ে পার হওয়া যায় না। তারা আরও বলে যে এটা তো শাস্তি দেয়া, কেন আল্লাহ এ শাস্তি দিবেন? ইত্যাদি। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৫/৩৪৮)। মু'তাযিলা ও শিয়াদের মধ্যে যদি কেউ সিরাত সাব্যস্তও করে তবে তারা সিরাতের ব্যাপারে আসা বৈশিষ্ট্যগুলো অস্বীকার করে। দেখুন, কাযী আব্দুল জাব্বার আল-মু'তাযিলী, শারহুল উসূলিল খামসাহ, পৃ. ৭৩৭; অনুরূপ সাফারীনী তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা সিরাতের বৈশিষ্ট্যগুলো অস্বীকার করে। দেখুন, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (২/১৯৩)। অনুরূপভাবে বর্তমানের বিখ্যাত খারেজী ইবাদী ফির্কার লোকেরাও সীরাত ও মীযান অস্বীকার করে থাকে, তারা সেগুলোর অপব্যাখ্যা দাঁড় করায়। দেখুন, আব্দুল্লাহ ইবন হুমাইদ আস-সালেমী আল-ইবাদী, মাশারিক্বু আনওয়ারিল উকূল (২/১২৯); আম্মার তালেবী, আরাউল খাওয়ারিজ, পৃ. ১৮০। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যসমূহ তাদের এসব সন্দেহের অপনোদন করে দেয়। এটি গায়েবী জিনিস যা ঈমান বিল গাইবের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তার ওপর ঈমান আনতে হবে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/১১৭৭-১১৭৯)।
২- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৪৬-১৪৭), (৪/২৭৯)।
৩- কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ (২/২৬-৩৬)।
৪- ইবন কাসীর, আন-নিহায়াহ (২/১১৮-১৩৮)।
৫- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১১/৪৪৪-৪৪৫)।
৬- সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার (২/১৮৯-১৯৪)।
৭- হাফেয হেকামী, মা'আরিজুল কবুল (২/২৭২-২৭৯)।
৮- আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৪৭২।
৯- বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ২৪৬।
১০- জুওয়াইনী, আল-ইরশাদ, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।
১১- ঈজী, আল-মাওয়াক্বিফ, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪।
১২- কাযী আব্দুল জাব্বার, শারহুল উসূলিল খামসাহ, পৃ. ৭৩৭-৭৩৮; ফাদ্বলুল ই'তিযাল ওয়া ত্বাবাকাতুল মু'তাযিলাহ, পৃ. ২০৫-২০৬।

৭৬৪. **মীযান সংক্রান্ত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর আকীদাহ:**

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হচ্ছে, মীযান হক্ব ও যথাযথ। যেমনটি কুরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, "আর কিয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়-বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না এবং কারো কাজ যদি শষ্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব; আর হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭] অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-মুমিনূন: ১০২-১০৩] মহান আল্লাহ আরও বলেন: "সুতরাং তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, পক্ষান্তরে যার পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।" [সূরা আল-কারি'আহ: ৬-৯]

অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)

"দু'টি বাক্য এমন যা দয়াময়ের কাছে প্রিয়, জিহ্বার ওপর হাল্কা, মীযানের মধ্যে ভারী, আর তা হলো: 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে), 'সুবহানাল্লাহিল 'আজীম' (মহান আল্লাহ কতই না পবিত্র)"। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস

নং ৭৫৬৩; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৬৯৪]
তদ্রুপভাবে ইমাম আহমাদ, হাকিম এবং অন্যান্যগণ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'আরাক' গাছে উঠলেন, তিনি ছিলেন সরু গোড়ালী বিশিষ্ট মানুষ, ফলে বাতাস তাকে নাড়াচ্ছিল তাতে উপস্থিত লোকেরা হেসে উঠল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমরা হাসছ কেন?" তারা বলল: হে আল্লাহর নবী! তার সরু গোড়ালীর কারণে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد)

"যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ দু'টি মীযানের উপর উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী।" [আহমাদ, আল-মুসনাদ (১/৪২০-৪২১); হাকেম, আল-মুস্তাদরাক (৩/৩১৭)] হাকিম হাদীসটি সহীহ বলেছেন আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মীযান হচ্ছে যা দিয়ে আমল ওযন করা হবে। সেটা 'ইনসাফ করা' অর্থে নয়। আর তার ধরণ সম্পর্কে এটাই বলা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সেটার প্রকৃত জ্ঞান নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এটা বলা যে, ওযন বলতে দুনিয়ার মানুষ যেভাবে ওযন করে সেরকমের ওযন। তবে তার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান অন্যান্য গায়েবী বিষয়ের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৩০২); জামে'উল মাসায়িল (৭/৩১)।
তাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে,
১- মীযান বা ওজনের যন্ত্র তা অনুভূতিসম্পন্ন, অর্থপূর্ণ বা নিছক কর্মের মানদণ্ড নয়।
২- তার রয়েছে দু'টি পাল্লা।
৩- যে পাল্লাগুলোতে ওযন করা হবে আমল।
৪- ওযন করা হবে আমলকারী।
৫- ওযন করা হবে আমলনামা।
৫- মীযান একটিই, তবে কুরআনে কারীমে বহুবচন ব্যবহার হয়েছে যেমন, 'আর আমরা রাখব মীযানসমূহ' তা কেবল বিভিন্ন জিনিস ওযন হওয়ার দিক থেকে।
জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলা গোষ্ঠী (বিশেষ করে তাদের মধ্যকার বাগদাদীরা) মীযানকে অস্বীকার করেছে। অনুরূপভাবে খারেজীদের মধ্য হতে ইবাদ্বী ফির্কার লোকেরো মীযানকে অস্বীকার করে ইনসাফের মানদণ্ড নামে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে থাকে। দেখুন, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৫৩৮)।
এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,
১- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (২/৩৬১-৩৬৩)।
২- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৩৮২-৩৮৭।
৩- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/১১৭০-১১৭৩)।
৪- মালাত্বী, আত-তানবীহ ওয়ার রাদ্দ, পৃ. ৯৮, ১১০-১১১।
৫- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৪৫-১৪৬), (৪/৩০২); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৫/৩৪৮); শারহুল আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ৪৭৬।
৬- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৬০৮-৬১৪)।
৭- কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ (২/৩-১৩)।
৮- ইবন কাসীর, আন-নিহায়াহ (২/৫৬-৬৮)।
৯- সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার (২/১৮৪-১৮৯)।
১০- হাফেয হেকামী, মা'আরিজুল কবুল (২/২৬৭-২৭২)।
১১- আশআরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৪৭২-৪৭৩।
১২- বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ২৪৬।
১৩- ঈজী, আল-মাওয়াক্বিফ, পৃ. ৩৮২-৩৮৪।
১৪- গাযালী, আল-ইক্বতেসাদ ফিল ই'তিক্বাদ, পৃ. ১৮২।
১৫- কাযী আব্দুল জাব্বার, ফাদ্বলুল ই'তিযাল ও ত্বাবাকাতুল মু'তাযিলাহ, পৃ. ২০৪-২০৫।
১৬- আব্দুল্লাহ ইবন হুমাইদ আস-সালেমী আল-ইবাদ্বী, মাশারিকু আনওয়ারিল উকূল (২/১২৬)।

আরও উল্লেখ করেন যে, হত্যাকৃত ব্যক্তি তার নির্ধারিত আয়ূতেই হত্যাকৃত হয়েছেন আর সে তার রিযিক পূর্ণ করে নিয়েছেন।[৭৬৫]

১৬- মার'ঈ ইবন ইউসুফ আল-হাম্বলী, আল-বুরহান ফী ইসবাতি হাকীকাতিল মীযান।

৭৬৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ-বিশ্বাস হচ্ছে, অবশ্যই হত্যাকৃত ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট সময়েই মারা গেছে, আর সে তার রিযিক পূর্ণ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ মু'তাযিলা বলে থাকে, হত্যাকৃত ব্যক্তি তার আয়ূ শেষ করেনি, সে তার রিযিকও পূর্ণ করেনি। তাদের মতে, যদি হত্যা না হতো তাহলে সে আরও বাঁচতো, আরও রিযিক পেতো।

আবু মানসূর আল-বাগদাদী মু'তাযিলাদের বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন, 'এর মাধ্যমে মু'তাযিলারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত মানুষের আয়ূ বাড়ানো আর কমানোর ক্ষমতা বান্দাদের হাতে প্রদান করে নিয়েছে। অথচ যদি তা জায়েয হতো তবে যার জন্য আল্লাহ্ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ লিখেছেন তারা সেটাকেও বাড়িয়ে ফেলতে পারতো। আর যেহেতু সকলের ঐকমত্যেই কেউ তার আয়ূ বাড়াতে পারে না তাহলে অবশ্যই কেউ তা কমাতেও পারে না।

বস্তুত এ হচ্ছে আক্বলী দলীল। এর বাইরে অনেক শর'য়ী দলীল আমাদের কাছে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أيها النَّاسُ اتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ»

"হে মানুষেরা, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো আর অন্বেষণের ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করো, কারণ কোনো আত্মাই তার রিযিক পূর্ণ না করে মারা যাবে না, যদিও সেটা তার কাছে পৌঁছতে দেরী করে, সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সুন্দর পদ্ধতিতে তা তালাশ করো, যা হালাল তা গ্রহণ করো আর যা হারাম তা পরিত্যাগ করো।" [ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ২১৪৪]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله"

"রিযিক বান্দাকে এমনভাবে তালাশ করে বেড়ায় যেমন তাকে তার আয়ূ তালাশ করে বেড়ায়।" [ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৩২৩৮]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فِي الْحَلَالِ، وَتَرْكِ الْحَرَامِ»

"রিযিক দেরী করছে মনে করো না; কারণ কোনো বান্দাহ ততক্ষণ মারা যাবে না যতক্ষণ তার সর্বশেষ রিযিকটি সে নিঃশেষ না করছে, সুতরাং তোমরা সুন্দরভাবে রিযিক তালাশ করো, হালাল থেকে এবং হারাম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে।" [ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৩২৪১]

সুতরাং উপরোক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে আলেমগণ বলেছেন, হত্যাকৃত ব্যক্তি অপরাপর মৃত মানুষের মতোই। কেউ তার আয়ূ শেষ না করে মারা যায় না, আর কেউ তার নির্ধারিত আয়ূর পরে জীবিত থাকতে পারে না। বরং সকল জীব-জন্তু, গাছ-পালা সবারই নির্ধারিত আয়ূ রয়েছে বা আগাবেও না আবার পিছাবেও না। কারণ কোনো কিছু আয়ূ অর্থই হচ্ছে তার জীবনের সমাপ্তি। আর তার জীবন তো ততটুকুই যতটুকু সে অবশিষ্ট আছে, আর আয়ূ হচ্ছে সে সময় শেষ হয়ে যাওয়া।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৫১৬)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় ব্যতীত সকল মুসলিমদের নিকট হত্যাকৃত মানুষ তাদের নির্দিষ্ট আয়ূতেই মারা যায়। কাদারিয়ারা বলে, হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির আয়ূ কেটে দিয়েছে।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আচ্ছা যদি হত্যা না করা হতো তাহলে কী হতো? তখন একদল বলে

إلى أن قال: وما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول: «ألا هل من سائل» الحديث وليلة النصف،

শেষে তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, 'আর আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে আরও রয়েছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন; অতঃপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে দেন এবং বলেন, শোন, এমন কী কোনো যাচঞাকারী আছ? হাদীসের শেষ পর্যন্ত[৭৬৬], আর শা'বানের মধ্যরাত্রিতে[৭৬৭],

---

যে তাহলেও সে মারা যেতো, কারণ তার আয়ূ শেষ হয়েছে। আরেকদল বলে, সে মারা যেতো না, কারণ মারা যাওয়ার কারণ তো পাওয়া যায়নি। বস্তুত উভয় মতটিই এখানে ভুল; কেননা তাকদীরে তার মৃত্যু যদি নির্ধারিত হয়েছে যে সে এ কারণেই মারা যাবে, অন্য কারণে নয়, তাহলে এ কারণ না হওয়ার জিনিসটা ধরে নেয়া তাকদীর বিরোধী কথা ধরে নিয়ে ঝগড়া করা। আর যদি তাকদীরে তার মৃত্যুর কারণ এটি না হয়, তাহলে দু'টি অবস্থা হতে পারে, হয় সে অন্য কারণে মারা যাবে, না হয় তার তাকদীরে মৃত্যুই লেখা হয়নি। সুতরাং যে কোনো একটি নির্ধারণ করা এখানে মূর্খতা। বস্তুত যে জিনিসের একাধিক কারণ থাকে সেখানে একটি কারণ না পাওয়া গেলেই সে জিনিসটি না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, যদিও অন্য কোনো কারণ না পাওয়া গেলে সেটা দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা যায় না। অন্যদিকে যে জিনিসের কারণ একটিই থাকে সেটা সম্পর্কে বলা যায় যে, যদি সে কারণ না পাওয়া যায় তাহলে তা ঘটবে না। যেমন: জাহান্নামে যাওয়া, তার একটিই কারণ, আর তা হচ্ছে, নাফরমানি করা। এখন তাকদীরে যদি লেখা থাকে যে, সে নাফরমানি করবে না, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, জামে'উর রাসায়িল (১/৯৪); মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৫১৭-৫১৮)।

৭৬৬. এ হাদীস এবং রহমান নিকটতম আসমানে নেমে আসার মাসআলা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৭৬৭. শা'বানের মধ্যরাত্রিতে আল্লাহ কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসা সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহের জন্য আলেমগণ আলাদা অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম দারাকুতনী তার কিতাবুন নুযূল, দারেমী তার আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ প্রমুখ।

এতদসংক্রান্ত হাদীস অনেক পন্থা ও কাছাকাছি শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

১- যা আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা শা'বানের মধ্যরাত্রিতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন, অতঃপর প্রতিটি মানুষকে ক্ষমা করে দেন, তবে যার অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ বা বিদ'আত আছে অথবা মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করে আছে।"

এটি যারা যারা বর্ণনা করেছেন,

- দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৬৯।
- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২২২), নং ৫০৯।
- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/৩২৬)।
- দারাকুতনী, আন-নুযূল, পৃ. ১৫৫-১৫৭।
- ইবন আদী, আল-কামেল ফিদ দু'আফা (৫/১৯৪৬)। আর বলেছেন, আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল মালেক নামক সনদের বর্ণনাকারী এ হাদীসে বিখ্যাত, আর এ হাদীস তার থেকে কেবল 'আমর ইবনুল হারেস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি এ সনদে মুনকার।
- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৪৩৮), নং ৭৫০।
- আবু নু'আইম, যিকরু আখবারু আসফাহান (২/৩)।
- বাযযার, মুসনাদ, কাশফুল আসতার (২/৪৩৫), নং ৪০২৫। আর বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ পন্থা ব্যতীত তা বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে আবু বকর ব্যতীত অন্যদের থেকেও তা বর্ণিত হয়েছে, তবে সর্বোচ্চ যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন আবু বকর। যদিও এর সনদে কিছু সমস্যা আছে, তবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মর্যাদা তাকে হাসান করে দেয়। আর আব্দুল মালেক অজানা-অচেনা ব্যক্তি। আলেমগণ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তা সহ্য করে নিয়েছেন।' তবে আল্লামা হাইসামী রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত কথা

বর্ণনা করার বলেন, এ বক্তব্যটি একেবারেই ফালতু।

- আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/২৫৫)। তারপর বলেন, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এ হাদীসটিকে বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে তা আবুল কাসেম তার সনদসহ আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি তা বর্ণনা করেন।

হাদীসটিকে বুখারী রাহিমাহুল্লাহ দুর্বল বলেছেন আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল মালেক এর সূত্রে। দেখুন, ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (২/৬৫৯)। ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (৪/৬৭)। আর হাদীসটিকে হাইসামী তার মাজমা'উয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন (৮/৬৫), আর বলেছেন, এটিকে বাযযার সংকলন করেছেন, তবে তাতে আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল মালেক বর্ণনাকারী রয়েছে, যাকে ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে নিয়ে আসার পর কোনো দুর্বলতার কথা বলেননি, অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য লোক। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে হাদীসটি প্রমাণিত নয়।

২- যা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি তার কাহিনী বর্ণনা করলেন, কীভাবে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছু নিয়েছিলেন বাকী' গোরস্থান পর্যন্ত। সেখানে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ শা'বানের মধ্যরাত্রিতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, তারপর তিনি কালব গোত্রের ছাগলের পশমের পরিমাণের চেয়ে বেশি লোকদেরকে ক্ষমা করে দেন।"

হাদীসটি যারা সংকলন করেছেন,

- তিরমিযী, আল-জামে'উস সুনান (৩/১১৬), হাদীস নং ৭৩৯। আর বলেন, এ অধ্যায়ে আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, তারপর বলেন, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার এ হাদীসটি আমরা কেবল হাজ্জাজ ইবন আরত্বাআর সূত্রেই কেবল জানতে পারি। আমি মুহাম্মাদ অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে এ হাদীস দুর্বল বলতে শুনেছি। তিনি আরও বলেন, ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর উরওয়া থেকে শুনেননি। আর হাজ্জাজ ইবন আরত্বাআ তিনিও ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর থেকে শুনেননি। [দেখুন, বাইহাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৩৮২৪]
- ইবন মাজাহ, আস-সুনান (১/৪৪৪), হাদীস নং ১৩৮৯।
- আহমাদ, আল-মুসনাদ (৬/২৩৮)।
- দারাকুতনী, আন-নুযুল, পৃ. ১৬৯-১৭২।
- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৪৪৮), নং ৭৬৩।
- মিযযী, তাহযীবুল কামাল (১/৪২৫)।

আল্লামা বূসীরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু মূসা এর হাদীসের সনদ দুর্বল; কারণ তাতে আব্দুল্লাহ ইবন লাহী'আহ রয়েছেন, তিনি দুর্বল। তাছাড়া তাতে ওয়ালীদ ইবন মুসলিম এর তাদলীস রয়েছে। তবে হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, আর যা তিরমিযী ও ইবন মাজাহ কর্তৃক সংকলিত। [বূসীরী, মিসবাহুস যুজাজাহ (১/৪৪৭)]

আর এ অধ্যায়ে আলী ইবন আবী তালেব ও কাসীর ইবন মুররাহ থেকে বর্ণনা এসেছে।

দেখুন, সুনান ইবন মাজাহ (১/৪৪৪); দারা কুতনী, আন-নুযূল, পৃ. ১৬৫-১৬৮।

হাদীসটিকে শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী বিভিন্ন সূত্র বিবেচনায় সহীহ বলেছেন। দেখুন, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ (৩/১৩৫-১৩৯), নং ১১৪৪; অনুরূপ তার যিলালিল জান্নাহ ফী তাখরীজে কিতাবিস সুন্নাহ লি ইবন আবী আসেম (১/২২২-২২৪)।

৩- যা আলী ইবন আবী তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মধ্য শা'বানে উপনীত হলে তোমরা রাত্রিতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, আর দিনে দাঁড়িয়ে সাওম পালন করো, কারণ আল্লাহ তা'আলা সে দিন সূর্যাস্ত হওয়ার সময়ে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, এমন কেউ কি আছে যাকে আমি ক্ষমা করে দিব? এমন কেউ কি আছে আমার কাছে রিযিক চাইবে? এমন কেউ কি বিপদগ্রস্ত আছে, আমি তাকে মুক্ত করবো? এমন কেউ আছে, এমন কেউ কি আছে, এভাবে বলতে থাকেন সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত।"

এটি যারা সংকলন করেছেন, তারা হচ্ছেন,

- ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৩৮৮।

- বাইহাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৮২২; ফাযায়িলুল আওক্বাত, হাদীস নং ২৪।
- ইবনুল জাওযী, আল-'ইলালুল মুতানাহিয়াহ (২/৭১), নং ৯২৩।

তবে সর্বাবস্থায় এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইবন আবী সুবরাহ রয়েছেন, যিনি হাদীস বানাতেন বলে বলা হয়ে থাকে। সুতরাং হাদীসটি বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। ইবন আবি সুবরাহ হচ্ছেন আবু বকর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী সুবরাহ, আল-ক্বুরাশী, আল-আমেরী, আল-মাদানী। বলা হয় তার নাম আব্দুল্লাহ, কারও কারও মতে মুহাম্মাদ, কখনও কখনও তার দাদার দিকে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়। তার ওপর হাদীস বানানোর দোষ আরোপ করা হয়। বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বলেছেন, সে হাদীস বানাতো। ইবন মা'ঈন বলেন, তার হাদীস কিছুই না। নাসায়ী বলেন, মাতরূক বা সে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী তাই সে পরিত্যাজ্য। ইবন হিব্বান বলেন, সে বিখ্যাত প্রামাণ্য ব্যক্তিদের থেকে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতো, তার হাদীস বর্ণনা করা হালাল হবে না, তার দ্বারা প্রমাণ নেয়াও জায়েয হবে না। ইবন আদী বলেন, যারা হাদীস বানাতো সে তাদের একজন। দেখুন, ইবন আবী হাতেম, আল-মাজরূহীন (৩/১২০); উক্বাইলী, আদ-দ্বু'আফা (২/২৭১); ইবন আদী, আল-কামেল ফিদ-দ্বু'আফা (৭/২৭৫০-২৭৫২); ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (৪/৫০৩-৫০৪)।

৪- মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা শা'বানের মধ্য তারিখের রাত্রিতে তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তাঁর সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন, তবে যদি কেউ মুশরিক হয় কিংবা হিংসুটে বা বিদ'আতী হয় সেটা ভিন্ন কথা।"

যারা হাদীসটি সংকলন করেছেন তারা হচ্ছেন,

- ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৫৬৬৫। তবে তার বর্ণনাকারীদের একজন হিশাম ইবন খালেদ আল-আযরাক্ব, তিনি উতবাহ ইবন খালেদ থেকে, তিনি আওযা'ঈ ও ইবন সাওবান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি মাকহূল থেকে, তিনি মালেক ইবন ইউখামির থেকে, তিনি মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে।
- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৫১২।
- ত্বাবারানী, আল-কাবীর (২০/২১৫)। হাইসামী বলেন, ত্বাবারানী হাদীসটিকে তার কাবীর ও আওসাত্ব গ্রন্থে এনেছেন, তার বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত। মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৪/৬৫)। এরা সবাই পূর্বোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।
- অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৫/১৯১); তবে তার বর্ণনাকারীদের একজনের নাম আযহার ইবনুল মারযুবান, তিনি উতবাহ ইবন হাম্মাদ থেকে, তিনি আওযা'ঈ থেকে, তিনি মালেক ইবন ইউখামের থেকে, তিনি মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে এ হাদীসের সনদে মারাত্মক অস্থিরতা রয়েছে। কখনও তা মাকহূলের মুরসাল, কখনও তা আবু ইদ্রীস আল-খাওলানীর মুরসাল হিসেবে, ফলে বুঝা যায় যে, এর যাবতীয় বর্ণনাই অসংরক্ষিত। যেমনটি দারাকুতনী তার 'ইলাল গ্রন্থে বলেছেন (নং ৯৭০)। অনুরূপ হাদীস নং ১১৬৯ এর আলোচনায় বলেছেন, অস্থির, অসাব্যস্ত। তাছাড়া আবু হাতিম আর রাযী হাদীসটিকে ইস্তেনকার বা অপরিচিত হিসেবে নিয়েছেন, দেখুন, আল-ইলাল, হাদীস নং ২০১২।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, আসলে হাদীসটি সাব্যস্ত নয়, সুতরাং শাইখ আলবানী ও শাইখ শু'আইব যা বলেছেন তা শক্তিশালী মত নয়।

তাছাড়া তাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসার কথা নেই যা আমাদের এখানকার অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে যদি ﴾১৮﴿ অর্থ অবতরণ করা হয় সেটি ভিন্ন কথা।

এসব কারণে হাফেয ইবন দিহইয়া বলেন, 'আহলুত তা'দীল ওয়াত তাজরীহ বলেন, শা'বানের অর্ধরাত্রি নিয়ে আসা কোনো হাদীস সহীহ নয়। দেখুন, আবু শামাহ, আল-বা'য়িস আলা ইনকারিল বিদা' ওয়াল হাওয়াদিস, পৃ. ৩৬।

হাফেয ইবন রাজাব বলেন, 'শা'বানের অর্ধ রাত্রির ফযীলত বর্ণনায় বেশ কিছু হাদীস এসেছে, এগুলোর ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে। অধিকাংশ আলেম সেগুলোকে দুর্বল বলেছেন, ইবন হিব্বান কোনো কোনোটিকে সহীহ বলেছেন আর তার সহীহতে সংকলন করে নিয়ে এসেছেন। দেখুন, ইবন রাজাব, লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃ. ৩২২।

হাফেয ইবন রাজাব বলেন, শামদেশের কিছু তাবে'য়ী যেমন, খালেদ ইবন মা'দান, মাকহূল, লুকমান

وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك.

قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليمًا، واتخذ إبراهيم خليلاً، وأن الخُلّة غير الفقر،

অনুরূপ আরাফার বিকালে(৭৬৮) এবং তিনি এর ওপর হাদীস উল্লেখ করেন।

তিনি [ইবন খাফীফ] আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেছেন কথা বলার মতই, ইবরাহীমকে খলীল তথা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর 'খুল্লাহ' বা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব কখনও 'ফক্কর' বা নিঃস্বতা (অভাব) নয়,

---

ইবন আমের, অনুরূপ তাদের মত কেউ কেউ সে রাত্রিটির সম্মান করতো, সে রাত্রিতে ইবাদতের চেষ্টা চালাতো, লোকেরা তাদের থেকে এ রাত্রির ফযীলত ও সম্মানের বিষয়টি গ্রহণ করেছে। দেখুন, ইবন রাজাব, লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃ. ৩২৭।

আর সে রাত্রির জাগরণ, শামবাসীরা সে রাত্রিতে মসজিদে জমায়েত হয়ে ইবাদত করা পছন্দ করতো। আর হারব আল-কিরমানী তার মাসায়েলে ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এ রাত্রিতে মসজিদে ইবাদতের জন্য জমায়েত হওয়াকে বিদ'আত গণ্য করতেন না।

কিন্তু ইমাম আওযা'ঈ শামবাসীদের এসব কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছেন। তিনি এ রাত্রিতে ইবাদতের জন্য মসজিদে জমায়েত হওয়াকে অপছন্দ করতেন। তার মতে, একজন মানুষ সে রাত্রিতে তার ঘরে ইবাদত করতে পারে। ইবন রাজাব বলেন, এটা অনেকটা কাছাকাছি মত ইনশা-আল্লাহ। দেখুন, লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃ. ৩২৭।

ইমাম ইবন রাজাব বলেন, ইমাম আহমাদ থেকে শা'বানের মধ্য রাত্রিতে ইবাদতের ব্যাপারে কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি। দেখুন, লাত্বায়িফুল মা'আরিফ, পৃ. ৩২৮। আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, ইক্বতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকীম (২/১৩৭)।

বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এ রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা জায়েয নেই। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ'তে এ ব্যাপারে কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল প্রমাণ নেই। আর এটিই হচ্ছে প্রতি মাযহাবের মুহাক্কিক আলেমগণের অভিমত। যেমন, বাইহাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৮৪১; ইবনুল জাওযী, আল-মাওদু'আত (২/৪৪০, ৪৪৫), নং ১০১০, ১০১৪; ইবনুল কাইয়েম, আল-মানারুল মুনীফ, পৃ. ৯৮; ইরাক্বী, তাখরীজু আহাদীসিল এহইয়া (১/১৫৭) ও অন্যান্যগণ। আর বর্তমান কালের শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায ও শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন সহ আমাদের মদীনার উস্তাদগণ এ রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা বিদ'আত বলেছেন। বিদ'আত থেকে দূরে থাকার জন্য এ রাত্রিকে বিশেষ কোনো ইবাদত কিংবা তার পরের দিন বিশেষ কোনো সাওম রাখা থেকে বিরত থাকা প্রতিটি বিশুদ্ধ আকীদাহ ও মানহাজের মানুষের উচিত।

৭৬৮. আরাফার মাঠের বিকালে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসার হাদীস ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। 'আরাফার মাঠের বিকালে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসার বিষয়ে কিছু হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে, যা নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ সংকলিত হয়েছে।

১- ইবন মান্দাহ, আত-তাওহীদ (৩/৩০১), নং ৮৮৫।
২- আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ (৪/৬৯), হাদীস নং ২০৯০।
৩- ইবন খুযাইমাহ, আস-সহীহ (৪/২৬৩), হাদীস নং ২৮৪০।
৪- ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৭/২২৬), নং ১৭৭, ১৭৮।
৫- আস-সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৩৮, নং ৬৭।
৬- ইবন হিব্বান, আস-সহীহ (৯/১৬৪), নং ৩৮৫৩।
৭- ত্বাহাওয়ী, শারহু মুশকিলুল আছার (৪/১১৪)।
৮- বাযযার, আল-মুসনাদ, কাশফুল আসতার (২/২৮), নং ১১২৮।
৯- বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (৭/১৫৯), নং ১৯৩১।

ইমাম ইবন মান্দাহ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [আত-তাওহীদ (৩/৩০১)]; অনুরূপ হাইসামীও তা হাসান বলেছেন, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (৪/১৭)।

لا كما قال أهل البدع.

তেমনটি নয় যা বিদ'আতীরা বলে থাকে।(৭৬৯)

৭৬৯. 'খুল্লাহ' শব্দের সাধারণ অর্থ পরিপূর্ণ এমন ভালোবাসা, যাতে যার জন্য সে ভালোবাসা হবে তার ভালোবাসায় সে পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন হবে। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৬৭)।

আর সে ভালোবাসার স্বরূপ বান্দার পক্ষ থেকে হবে এমন যে, যার অন্তরে তা প্রবেশ করেছে তিনি আল্লাহর দাসত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে 'খুল্লাহ' অর্থ হবে তাঁর পক্ষ থেকে যাকে তিনি ভালোবাসেন এবং তাকে যারা ভালোবাসেন এমন দাসদেরকে পূর্ণরূপে প্রতিপালন করবেন, ফলে তাদের চিন্তা-চেতনা কেবল তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব কেন্দ্রিক পরিচালিত হবে। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/২০৩)।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত বা ভালোবাসা, খুল্লাহ বা অন্তরঙ্গ ভালোবাসা ইত্যাদি গুণে গুনান্বিত করা যাবে। আর সেটা হবে তাঁরই জন্য উপযোগী পদ্ধতিতে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সাধারণ ভালোবাসার চেয়ে 'খুল্লাহ' এর ভালোবাসা অনেক বেশি বিশেষিত। কারণ তা সাধারণ ভালোবাসার চেয়ে পূর্ণতর পর্যায়ের। এ ভালোবাসা যখন কারো কাছে থাকবে তখন সে ভালোবাসা সত্তাগত ভালোবাসার রূপ নিবে, সত্তাকই শুধু ভালোবাসবে, অন্য কিছুকে নয়। কারণ সত্তাগত ভালোবাসা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য ভালোবাসা তো সে জিনিসটির পরে আসে। আর ভালোবাসা যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন সেখানো আর কোনো ভেজাল বা খাদ প্রবেশ করতে পারে না, অন্য কারও জন্য সেখানে কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ সে ভালোবাসা তার অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে ফেলেছে। এ ভালোবাসাই পরিপূর্ণ তাওহীদ, আর এ ভালোবাসাই পরিপূর্ণ ভালোবাসা। তাহলে এটা স্পষ্ট হলো যে, 'খুল্লাহ' পর্যায়ের ভালোবাসা থাকলে সেখানে অন্য কারো ভালোবাসা ভীড় করে না, অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ থাকে না। অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, ভালোবাসার সত্তাটি তখন একান্তভাবে সত্তাগত ভালোবাসায় পরিণত হয়, সেখানে অন্য কিছুর ভালোবাসা ভীড় করে না। আর এ পর্যায়ের ভালোবাসা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য হওয়ার সুযোগ নেই। এ ভালোবাসায় অন্য কারো অংশিদারিত্ব জায়েয নয়। কারণ তিনি রাব্বুল আলামীন একমাত্র সত্তাগত ভালোবাসার পাত্র। তিনি ব্যতীত আর যাকে ভালোবাসা হয় সে ভালোবাসা যদি শরী'আত সমর্থিত ভালোবাসা হয় তবে সেটা কেবল তাঁর জন্যই হয়ে থাকে (যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা, দীনকে ভালোবাসা)। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৬৮-৬৯)।

জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও তাদের দোসররা আল্লাহর এ গুণটিকে অস্বীকার করে। তারা সেটাকে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে বলে, এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি নিঃস্ব হওয়া, অভাবী হওয়া অথবা মুখাপেক্ষী হওয়া বুঝানো হয়েছে। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাদের এসব কথার প্রতিবাদ করে বলেন, 'বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, খুল্লাহ বা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ভালোবাসার একটি প্রকার, আর যার মাঝে এরকম ভালোবাসা থাকবে সে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে সে আল্লাহর প্রতি নিজের অভাব ও মুখাপেক্ষিতা সর্বদা প্রকাশ করবে। আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ ভালোবাসা থাকলে সে ইবাদতে তাঁর প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। আর সে সর্বদা আল্লাহর অভাব অনুভব করবে, আল্লাহর মুখাপেক্ষিতা তার মাঝে চরম আকারে দেখা দিবে...।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/৩৫২)।

সর্বপ্রথম যে আল্লাহর এ গুণটি অস্বীকার করেছে জানা যায় তার নাম হচ্ছে, জা'দ ইবন দিরহাম, যাকে খালেদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-কাসরী হত্যা করেন।

জা'দ ইবন দিরহাম আল্লাহর নবী ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর বন্ধুত্ব অস্বীকার করতো, তেমনিভাবে সে মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর কথা বলা অস্বীকার করতো। বস্তুত সে এটা গ্রহণ করেছে তার পূর্বপুরুষ সাবেয়ী সম্প্রদায় ও মুশরিকদের কাছ থেকে, যারা ইবরাহীম খলীল 'আলাইহিস সালাম ও মূসা কালীম 'আলাইহিস সালামের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, জা'দ ইবন দিরহাম সে কুরআন ও হাদীসে আসা 'আল্লাহর খলীল'

ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'দেখা' দ্বারা বিশেষিত করেছেন(৭৭০) আর তাঁকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যেমন তিনি

এর অর্থ করতো, 'মুখাপেক্ষী হওয়া'। সে হিসেবে তো আল্লাহর প্রতি যারা মুখাপেক্ষী তারাই খলীল, সে ঈমানদার হোক বা কাফের, নেককার হোক বা বদকার। [নাউযুবিল্লাহ] দেখুন, মাদারিজুস সালেকীন (৩/২৭); আরও দেখা যায়, ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত (১/৩৫১-৩৫২)।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৪৭৭), (১০/৬৬-৭১, ২০২-২০৪); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১৬৪-১৬৭), (২/৩৯৪-৩৯৮)।

অস্বীকার করার ব্যাপারে দেখুন, যামাখশারী, কাশশাফ (১/৫৬৬-৫৬৭)।

৭৭০. **এ মাসআলাটি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর রবকে দেখেছেন?**

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনের বুকে অবস্থান করা অবস্থায় তাঁর রবকে দু' চোখে দেখেননি। যেসব হাদীসে এমন কথা এসেছে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনে থাকা অবস্থায় তাঁর রবকে দু' চোখে দেখেছেন' সেসব হাদীস মুসলিমগণ ও তাদের আলেমগণের ঐকমত্যে মিথ্যা। এ কথাটি কোনো দিনই কোনো মুসলিম আলেম বলেননি, আর না তা কোনো মুসলিম কোনো আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কেবল এ বিষয়ে মতভেদ হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তার রবকে মি'রাজের রাত্রিতে দেখেছেন? কিন্তু সকল মুসলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো যমীনে থাকা অবস্থায় তাঁর রবকে দেখেননি, তারা এতেও একমত যে, আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যমীনে অবতরণ করেননি।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩৮৬-৩৮৭), (২/২৩০)।

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর রবকে মি'রাজের রাত্রিতে দেখেছেন? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকে মতভেদ চলে আসছে। মৌলিক ভাবে সেটিকে তিনটি মতে ভাগ করা যায়:

প্রথম মত: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেননি। এ মতের প্রবক্তাদের অন্যতম হচ্ছেন, আয়েশা, ইবন মাসঊদ, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, 'তিনটি বিষয় যে কেউ তোমাকে হাদীস বর্ণনা করবে সে মিথ্যা বলেছে। যে বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যা বলছে। ... আল-হাদীস। বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৮৮৫৫; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৭।

এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ এ মতের দিকে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় মত: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন। এ মতটি ইবন আব্বাস, ও আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের। এ মতের সপক্ষে রয়েছেন ইকরিমাহ, হাসান বসরী, রবী ইবন সুলাইমান, ইবন খুযাইমাহ, ইমাম আহমাদ অপর বর্ণনায়, আবু ইসমাঈল আল-হারওয়ী, কা'ব আল-আহবার, যুহরী, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, মা'মার। আর এটিই আবুল হাসান আল-আশ'আরী ও তার অধিকাংশ অনুসারীদের মত। ইমাম নাওয়াওয়ী তাই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি 'তাহরীর' গ্রন্থকার থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে দেখার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়, তবে সেদিকে যাওয়াই আবশ্যক। কারণ তা বিবেক দিয়ে জ্ঞাত হওয়ার বিষয় নয়, ধারণা করেও নয়, তাহলে নিশ্চয় তিনি শুনে বলছেন। ইবন আব্বাস এ মাসআলাতে কেবল ইজতিহাদ ও ধারণার বশবর্তী হয়ে বলবেন সেটা মেনে নেয়া যায় না।' ইমাম নাওয়াওয়ী এ মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। তারপর তিনি বলেন, 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা দেখার বিষয়টি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীসের আশ্রয় নিয়ে বলেননি, যদি হাদীস থাকতো তাহলে তিনি ঠিকই উল্লেখ করতেন। সম্ভবত তিনি কুরআনের আয়াত থেকে মাসআলা বের করে তা বলেছেন।'

তৃতীয় মত: এ মাসআলায় তাওয়াক্কুফ বা মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকা, যা কাযী ইয়াদ্ব উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আর কিছু মাশায়েখ এ মাসআলায় মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকার কথা ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন, এর ওপর কোনো সুস্পষ্ট দলীল নেই, তবে তা হওয়া সম্ভব।' ইমাম

কুরতুবী বলেন, এ মাসআলাতে চুপ থাকা ও মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। তিনি আরও বলেন, এ অধ্যায়ে কোনো অকাট্য দলীল নেই, উভয় গোষ্ঠী যেসব দলীল দেয় তা কেবল যাহের যা একটির বিরুদ্ধে অপরটি আসতে পারে, যাতে তা'ওয়ীল চলতে পারে...।'

বস্তুত প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, আল্লাহই ভালো জানেন, যা ইমাম ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন, আর তা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, সেটা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন, মাথার দু' চোখ দিয়ে নয়। এর মাধ্যমে সকল দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। আর উপরোক্ত দু'টি মত অর্থাৎ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ও ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার মতের মধ্যেও মিল করা সম্ভব। সুতরাং যারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর রবকে দেখা অস্বীকার করেছে তাদের কথাকে চোখে দেখার ওপর নেয়া হবে। আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর রবকে দেখার বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন, তাদের কথাকে অন্তর দিয়ে দেখার ওপর নেয়া হবে। আর এটি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে সাব্যস্তও বটে। তিনি বলেছেন, 'অন্তর দিয়ে দেখেছেন'। অপর বর্ণনায় 'অন্তর দিয়ে দু'বার দেখেছেন'। দেখুন, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৬। এভাবে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার মুতলাক বা নিঃশর্ত কথাকে শর্তযুক্ত করা হবে। আর এ মাধ্যমে সকল মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য করা সম্ভব।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে যেসব আছার এসেছে, সেগুলো কখনও মুতলাক (নিঃশর্ত) কখনও মুকাইয়্যাদ বা অন্তরে দেখার সাথে শর্তযুক্ত। কখনও তিনি বলতেন, মুহাম্মাদ তাঁর রবকে দেখেছেন, আবার কখনও বলতেন, তাঁকে মুহাম্মাদ দেখেছেন, তিনি কখনও মুহাম্মাদ তার রবকে চোখে দেখেছেন এমন কথা বলেননি।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ কখনো কখনো বলেছেন, মুহাম্মাদ তাঁর রবকে দেখেছেন, আবার কখনও কখনও বলেছেন, অন্তর দিয়ে দেখেছেন।... শেষে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দলীল প্রমাণাদিতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে মাথার চোখে দেখেছেন, অনুরূপভাবে তা কোনো সাহাবী থেকেই সাব্যস্ত নয়। তাছাড়া তা কুরআন ও সুন্নাহতেও এভাবে আসেনি। বরং কুরআন ও সুন্নাহ'র বিশুদ্ধ ভাষ্য চোখে দেখার মতটিকে অস্বীকার করার ব্যাপারে বেশি প্রমাণবহ। যেমন সহীহ মুসলিমে আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছি, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি বলেন, তিনি তো নূর, কীভাবে আমি তাঁকে দেখতে পাব? দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫০৯-৫১০)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'বস্তুত কর্তব্য হচ্ছে সেসব আছারের অনুসরণ করা যা এ ব্যাপারে প্রমাণিত হয়েছে, আর যার ওপর উম্মতের সালাফ ও ইমামগণ ছিলেন। আর তা হচ্ছে, শুধু দেখা সাব্যস্ত করা, অথবা অন্তরের দেখার সাথে শর্তযুক্ত করে সাব্যস্ত করা। কিন্তু মি'রাজের রাত্রিতে বা অন্য সময়ে চোখের দেখার বিষয়ে আমরা মুসলিমগণের মধ্যে যারাই এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার সংখ্যা প্রায় একশতটির মত, সেগুলোতে পর্যালোচনা চালিয়ে আমরা দেখলাম, তাদের কেউই প্রমাণিত সনদে কোনো সাহাবী কিংবা ইমাম থেকে এমন কোনো তথ্য দিতে পারেনি যাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে তাঁর মাথার চোখে দেখেছেন।' দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, জামেউল মাসায়িল (১/১০৮)।

আর এ মতটিকেই শাইখ মুহাম্মাদ আমীন আশ-শানক্বীত্বী রাহিমাহুল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন।

অনুরূপ মতই সৌদী আরবের ফতোয়া ও ইলমী গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি পোষণ করেছেন।

আর অন্তর দিয়ে দেখার অর্থ হচ্ছে, যেমনটি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, জ্ঞাত জিনিসের একটি নমুনা প্রকাশ পাওয়া, যা অন্তরে তেমনি প্রভাব ফেলে যেমনি দেখা জিনিস চোখে প্রভাব ফেলে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন,

১- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/৪৭৭-৫৪৭), (২/৫৪৮-৫৬০)।
২- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৪৯১-৪৯৭।
৩- হারওয়ী, আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৮১-৯৩।
৪- দারা কুতনী, আর-রুওইয়া, পৃ. ১৮৬-১৮৯।
৫- আসফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ, পৃ. ৫০৯-৫১০।
৬- তাফসীর আত-তাবারী (২৭/৪৬-৪৭)।

ইবরাহীমকে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।(৭৭১)

৭- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩৮৬-৩৮৭); (৬/৫০৭-৫১১)।
৮- ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (৩/২৪৬)।
৯- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/২২২-২২৫)।
১০- নাওয়াওয়ী, শারহু মুসলিম (৩/৪-১৪)।
১১- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৮/৬০৮-৬০৯)।
১২- শিব্বীর আহমাদ উসমানী, ফাতহুল মুলহিম (১/৩৩৭-৩৪০)।
১৩- সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (২/২৫০-২৫৬)।
১৪- মার'ঈ হাম্বলী, আক্বাওয়ীলুস সিক্বাত, পৃ. ১৯৬-১৯৭।
১৫- বাকেল্লানী, আল-ইনসাফ, পৃ. ২৪১।
১৬- শানক্বীত্বী, আদওয়াউল বায়ান (৩/৩৯৯-৪০০)।
১৭- ফাতাওয়া আল-লাজনাতিদ দায়েমাহ লিল বুহূসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (২/১২৮-১৩০)।

৭৭১. কুরআন ও হাদীসে একই কথা এসেছে। যেমন,
কুরআনে কারীমে এসেছে, "তার চেয়ে দীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।" [সূরা আন-নিসা: ১২৫]
আর একাধিক হাদীসে তা এসেছে যেমন,

১- আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি আমি যমীনের অধিবাসীদের কারও সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে আবুবকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম, কিন্তু তোমাদের সাথী তো আল্লাহর খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু।" [এটি ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফের শব্দ (১১/৪৭৩), তা আরও এসেছে, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৬৫৪; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৩৮২]
২- অন্য বর্ণনায়, আমি প্রত্যেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করছি, যদি আমি জগতবাসীর কাউকে খালীল হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৫৩২]
৩- অপর বর্ণনায় জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যেমনটি ইবরাহীমকে গ্রহণ করেছেন।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৫৩২]
৪- অপর বর্ণনায় ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি আমি যমীনের কাউকে খলীল হিসেবে নিতাম তবে আবু বকরকে খলীল হিসেবে নিতাম, কিন্তু তোমাদের সাথী রহমান আল্লাহর খলীল।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৩৮৩]

এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে,

এক. ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে 'খুল্লাহ' বা অন্তরঙ্গ ভালোবাসা, যার ভালোবাসা অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, সেখানে আর কারও স্থান নেই।
দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা 'খুল্লাহ' এর স্তর দিয়ে সম্মানিত করেছেন।
তিন. এর দ্বারা বুঝা যায় যে, 'হাবীব' বা মহব্বতের চেয়েও খুল্লাহর মর্যাদা অনেক উপরে।
চার. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে 'খুল্লাহ' এর স্তর প্রদান করেছেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু রাব্বুল আলামীনের 'হাবীব' বললে কম বলা হবে।
পাঁচ. কুরআনে কারীম বা কোনো সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর 'হাবীব' নামে ভূষিত করা হয়নি। সুতরাং যারাই এমন কথা বলবে, তাদের কথা অগ্রহণযোগ্য হবে। বিশেষ করে যারা বলে থাকে যে, ইবরাহীমের জন্য খুল্লাহ আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 'মহাব্বাত' এ কথাটি সঠিক নয়।
ছয়. যে হাদীসটি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, 'ইবরাহীম আল্লাহর খলীল, আর আমি আল্লাহর হাবীব, অহঙ্কার করে বলছি না' [তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৩৬১৬] এ হাদীসটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তিরমিযী নিজেই বলেছেন, গরীব (অর্থাৎ দুর্বল,

ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآية [لقمان:٣٤]

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা গায়েবের পাঁচটি চাবিকাঠি নিজের জন্য বিশেষভাবে রেখে দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না। "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান।" [সূরা লুকমান: ৩৪][৭৭২]

এটাই তিরমিযীর পরিভাষা), তার সনদে যাম'আহ ইবন সালেহ ও সালামাহ ইবন ওহরাম রয়েছেন, উভয়েই দুর্বল। আর হাদীসটিকে শাইখ আলবানী ও শাইখ আল-আরনাঊত্ব উভয়েই দুর্বল বলেছেন। দেখুন, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ এর তাহকীক, পৃ. ১৭৫, ১৬৫।

সাত. এর আরেকটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসা অন্যান্য নেককার বান্দাদের জন্যও সাব্যস্ত করেছেন, যেমন বলেছেন, "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা আলে ইমরান: ১৩৪], "হ্যাঁ অবশ্যই, কেউ যদি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা আলে ইমরান: ৭৬], "আর তারা আপনাকে রজঃস্রাব (হায়েয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'তা অশুচি'। কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম থেকে বিরত থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত (সংগমের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হবে না। তারপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং তাদেরকেও ভালোবাসেন যারা পবিত্র থাকে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২২২] কিন্তু খুল্লাহ এর বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ'য় কেবল ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই এসেছে।

আট. অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মহব্বাত' এর কথা অপর সাহাবীদেরকেও বলেছেন, যেমন তিনি মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, মু'আয আমি তোমাকে মহব্বত করি।" [আহমাদ, আল-মুসনাদ (৫/২৪৫, ২৪৭); আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৫২২; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ১৩০৩; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/২৭৩)] অনুরূপভাবে তিনি আনসারদেরকে ভালোবাসার কথাও বলেছেন। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৭৮৫] তদ্রূপ তিনি আয়েশা ও আবু বকরকে মহব্বত করা তথা ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৪৩৫৮; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৩৮৪]

কিন্তু কাউকে খুল্লাহর জন্য নির্বাচন করেননি। যদি করতেন তো আবু বকরকে নির্বাচন করতেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, খুল্লাহর মর্যাদার সাথে অপর কোনো প্রকার ভালোবাসার মর্যাদা কখনও আসতে পারে না।

৭৭২. মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" [সূরা লুকমান: ৩৪] অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি... তারপর তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন। দেখুন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৪৬২৭, ৪৭৭৮। আরও দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর (৬/৩৫৫)। তদ্রূপ আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের নবীকে সকল কিছুর চাবিকাঠি প্রদান করা হয়েছে তবে পাঁচটি বিষয় ব্যতীত। "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" [সূরা লুকমান: ৩৪] হাদীসটি ইমাম আহমাদ সংকলন করেছেন। হাদীস নং ৩৬৫৯, ৪১৬৭।

ইমাম আবুল আব্বাস আল-কুরতুবী বলেন, এ পাঁচটি বিষয়ের কোনো কিছু জানা কঠিন। বরং সেটা

ونعتقد المسح على الخفين. ثلاثًا للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

আমরা আরও বিশ্বাস করি মোজার উপর মাসেহ্ করার বৈধতার ওপর, তিনদিন মুসাফিরের জন্য আর একদিন এক রাত্রি মুকীমের জন্য।[৭৭৩]

কখনো সম্ভব নয়। কেউ ধারণা করে কিছু বললে সেটা সত্যও হয়ে যেতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে, যেমনটি করে থাকে গণকরা, বালুর উপর আঁকিঝুকিকারী ব্যক্তিরা। দেখুন, আল-মুফহিম (১/১৫৬)।

সুতরাং বুঝা গেল যে, গায়েবী বিষয় নিঃসন্দেহে আল্লাহর একান্ত জ্ঞান। তা কেউ দাবি করলে বা কারও জন্য সাব্যস্ত করলে সে আল্লাহর রুবুবিয়াত ও আসমা ওয়াস সিফাতে যুগপৎ শির্ক করলো। এ বিষয়ে জানার জন্য দেখতে পারেন, আমার গ্রন্থ "আশ-শির্কু ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস" (২/৯৪৮-৯৮৪)। সেখানে যারা ইলমুল গায়েবের দাবি করে তাদের মত খণ্ডনও দেখতে পাবেন।

৭৭৩. মোজার উপর মাসেহ করার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে সাব্যস্ত। দেখুন, যাবীদী, 'লুক্বাতুল লাআলিল মুতনাসিরাহ ফিল আহাদীস আল-মুতাওয়াতিরাহ, পৃ. ২৩৬-২৫০; আরও দেখুন, কাত্তানী, নাযমুল মুতানাসির লিল হাদীস আল-মুতাওয়াতির, পৃ. ৪২-৪৬। মোজার উপর মাসেহ এর মাসআলাটি একটি ফিকহের মাসআলা, কিন্তু আকীদাহ'র ক্ষেত্রে এর প্রবেশাধিকার কেন? কারণ এটি একটি গোষ্ঠীর শি'আর বা জাতীয় চিহ্নতে পরিণত হয়েছে। আহলুস সুন্নাত তারাই যারা এটাকে বৈধ মনে করে। এর বিপরীতে যারা এটাকে বৈধ মনে করে না, তারা বিদ'আতী। এ নিক্তিতে মাপার পর দেখা গেছে যে খারেজী ও শিয়ারা মোজার উপর মাসেহ জায়েয মনে করে না। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বহু আগে আহলুস সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য হিসেবে মোজার উপর মাসেহ এর কথা উল্লেখ করেছেন। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, যুগ যুগ ধরে এ মাসআলাটি আহলুস সুন্নাত ও অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্যকারী রেখা হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানেও আপনি শিয়াদের দেখবেন পায়ের মোজা খোলে পায়ের উপর মাসেহ করছে, কিন্তু মোজার উপর মাসেহ করবে না। আর পা তো তারা মোটেই ধৌত করে না।

এ বিষয়ে জানার জন্য দেখা যেতে পারে,

১- আত-তূসী (শিয়া), আল-ইস্তেবসার (১/৭৬)।
২- ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩৬১-৩৬৩)।
৩- মুহাম্মাদ ইবন নসর আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১০৪।
৪- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩৮২); ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (১/৩৩)।
৫- নাওয়াওয়ী, শারহু মুসলিম (৩/১৬০)।
৬- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ ২/৫৫১-৫৫৫।
৭- আল-আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৪৭০।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মোজার উপর মাসেহ করা ও দু' পা ধৌত করার ব্যাপারে মুতাওয়াতির হাদীস এসেছে। রাফেযীরা এসব মুতাওয়াতির হাদীস অস্বীকার করে, যেমনিভাবে খারেজীরা অনুরূপ করে থাকে, তারা ধারণা করে থাকে যে, এটি কুরআনের যাহের বা প্রকাশ্য ভাষ্যের বিরোধী (অথচ তা কখনো বিরোধী নয়)। ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৪/১৭৪); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২২/৪২৩)।

অনুরূপভাবে এ অধ্যায়ে সুফইয়ান আস-সাওরীর বক্তব্য হচ্ছে, যা তার আকীদাতে এসেছে, তাকে কোনো ব্যক্তি তার আকীদাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, হে শু'আইব ইবন হারব, তোমার জন্য আমি যা লিখে দিয়েছি তা তোমার কোনো কাজে আসবে না, যদি না তুমি মোজার উপর মাসেহ করার পক্ষে মত না দাও, আর তা সেগুলো না খুলে পা ধোয়ার চেয়ে বেশি ন্যায়নিষ্ঠ কথা।' লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১৫৪); আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৪/১৫১)।

সুফইয়ান সাওরী থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'যে কেউ মোজার উপর মাসেহ করবে না, তার দীনের ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করো। তা সংকলন করেছেন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৭/৩২)।

আরও যারা মোজার উপর মাসেহ করাকে আকীদাহ'র বিষয় হিসেবে আকীদাহ'র কিতাবে আলোচনা

ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة

আমরা আরও বিশ্বাস করি কুরাইশ রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপারে তার যুলুম বা ইনসাফ যাই থাকুক সর্বাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে; যতক্ষণ তারা জুমু'আহ ও ঈদসহ সালাত কায়েম রাখবেন।(৭৭৪) আর জিহাদ তাদের সাথে চলবে কিয়ামত

করেছেন, তারা হচ্ছেন, ইমাম আবু হানীফা, যেমনটি আগেই আগেই বলেছি, দেখুন, আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪; আবুল হাসান আল-আশ'আরী, আল-ইবানাহ, পৃ. ২৫৩; ইমাম ত্বাহাওয়ী, তার আকীদাহ, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৫৮৪); আবু 'আমর আদ-দানী, আর-রিসালাতুল ওয়াফিয়া, পৃ. ১৪৫; এছাড়াও আরো অনেকে।

৭৭৪. ইমাম বা শাসকবর্গের আনুগত্য করার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান মধ্যপন্থা। তারা খারেজীদের মত বাড়াবাড়ি আর মুরজিয়াদের মত ছাড়াছাড়ির মধ্যভাগে অবস্থান করছে। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মধ্য পন্থা, যা কেবল দীনে ইসলামে এসেছে, তা হচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যেমন সেসব লোক যাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে, অর্থাৎ তাতারদের বিরুদ্ধে, এ জিহাদ করা হবে এমন সকল শাসক ও গোষ্ঠীর সাথে মিলে, যারা তাদের (তাতার ও তাতারদের মত লোকদের) থেকে ইসলামের দিক দিয়ে উত্তম। যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উপায় কার্যকর থাকবে না। আরও আবশ্যক হচ্ছে যে সম্প্রদায়ের সাহায্যে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মাঝে সংঘটিত আল্লাহর অবাধ্যতার বিষয়সমূহে কোনোরূপ সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা। বরং আল্লাহর আনুগত্য যেখানে হবে সেখানেই কেবল তাদের আনুগত্য করা হবে; কারণ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কারও আনুগত্য করা কোনোভাবেই অনুমোদিত নয়।

এ হচ্ছে উম্মতের উত্তম লোকদের পদ্ধতি, আগেও তারা এ পদ্ধতিতে ছিলেন, পরেও তারা এ পদ্ধতিতে চলে। প্রতিটি মুকাল্লাফ (শরী'আতের আদেশ-নিষেধ আপতিত) ব্যক্তির ওপর এটা করা ফরয। এ পথ ও পদ্ধতি খারেজীদের নীতি ও মুরজিয়াদের নীতির মধ্যবর্তী পন্থা। কারণ হারূরী (খারেজী) ও তাদের মতো লোকেরা, যারা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মাত্রাতিরিক্ত পরহেযগারীর দোহাই দিয়ে শাসকদের আনুগত্য করা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরে গেছে, অপরদিকে মুরজিয়া ও তাদের মত লোকেরা নিঃশর্তভাবে সকল শাসকদের আনগত্য করার নির্দেশনা দিচ্ছে যদিও তারা নেককার না হয়। মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৫০৮)।

অন্যত্র শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'খারেজী, শিয়া, মু'তাযিলা ও তাদের মত বিদ'আতীরা বিশ্বাস করে যে যুলুমকারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে বের হতে হবে, যখন তারা কোনো যুলুম করে বা যখন তারা এমন কোনো কাজ করে যা তাদের নিকট যুলুম বলে মনে হয়, তারা সেটাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বলে মনে করে। অপরদিকে মুরজিয়া সম্প্রদায় ও পাপাচারীরা মনে করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ পরিত্যাগ করতে হবে, এ ধারণায় যে এটা ফিতনা পরিত্যাগ করার অন্তর্ভুক্ত। এরা একে অপরের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। আর সে জন্যই কালামশাস্ত্র ও উসূলুদ্দীনের একজন লেখক হানাফী আলেম উস্তাদ আবু মানসূর আল-মাতুরিদী, যিনি মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে 'মা ওরাআন নাহর' বা জাইহুন Transoxiana নদীর ওপারে মুনাযারা করতেন, সেখানে মু'তাযিলারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মূলনীতির মাধ্যমে শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়া জরুরী মনে করলে উস্তাদ মাতুরিদী তখন বলে ফেললেন যে, বর্তমানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এর বিধানের বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে গেছে।' যা ইমাম ইবন মুফলিহ তার থেকে আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ (১/১৭৭) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ তার থেকে তা বর্ণনা করেছেন শাইখ ইবন কাসেম, আল-মুস্তাদরাক আলাল মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২০৭) গ্রন্থে।

বস্তুত বাড়াবাড়িও করা যাবে না আর ছাড়াছাড়িও করা যাবে না। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার পরিধি ও অবস্থা বিবেচনা করে করতে হবে। অন্যায় ও যুলুমের কারণে শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়া (সশস্ত্র সংগ্রাম, গৃহ যুদ্ধ, আভ্যন্তরীন যুদ্ধ, অস্ত্র ব্যবহার, উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য

পর্যন্ত।(৭৭৩)

রাজনৈতিক সন্ত্রাস এসব কিছুই করা) যাবে না, যুদ্ধও করা যাবে না। আবার একেবারেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের নীতি থেকে অমনোযোগীও হওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে সময়-সুযোগ মোতাবেক তা চালু রাখতে হবে। সেটাকে রহিত বা সেটা বাদ দেয়ার সুযোগও নেই। অবশ্যই নসীহত ও অবমাননা করা এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। শাসককে নসীহত করতে হলে এমনভাবে করা উচিত যাতে তিনি সেটা গ্রহণ করেন, অপমানবোধ না করেন। শত্রুতামূলকভাবে সেটা যেন না হয়, যতক্ষণ তাকে নরম ভাষায় বলা যাবে ততক্ষণ কঠোরতার নীতি গ্রহণ করা যাবে না।

৭৭৫. এটিই হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শ। তাদের নীতি হচ্ছে এটা যে, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিম শাসকের সাথে মিলে আল্লাহর পথে জিহাদ চালু থাকবে, শাসক নেককার হোক কিংবা বদকার। শাসকের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে শাসককে ইনসাফকারী হতে হবে এমন শর্ত কেবল খারেজীরাই দিয়ে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহ'র যাবতীয় দলীল এর ওপরই প্রমাণবহ যে, যাবতীয় ভালো কাজে শাসকের আনুগত্য করতে হবে, কোনো খারাপ কাজে শাসকের আনুগত্য চলবে না। যেমন,

১- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" [সূরা আন-নিসা: ৫৯]

২- আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বাই'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ১২]

৩- অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না। আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ!" [সূরা আন-নিসা: ৩৮]

৪- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের ওপর কোনো হাবশী দাসকে শাসক করা হয়, যার মাথা কিসমিসের মত, যতক্ষণ সে আল্লাহর কিতাবকে তোমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখবে।" বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৬৯৬।

৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "অচিরেই আমার পরে তোমরা তোমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দিতে দেখতে পাবে, আর কিছু অন্যায় কাজও দেখতে পাবে, সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কেউ সে অবস্থা পেলে তখন আমাদেরকে কী করতে নির্দেশ প্রদান করেন? রাসূল বলেন, শাসকের জন্য তোমাদের ওপর যে অধিকার বর্তায় সেটা আদায় করবে, আর তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চাইবে।" বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৬০৩; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৪৩; তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২১৯০।

৬- সা'ঈদ ইবন হুদ্বাইর বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অমুককে চাকুরী দিলেন, আমাকে দিলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পরে তোমরা অন্যদের প্রাধান্য দেয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা সবর করবে, যতক্ষণ না আমার সাথে হাউযে সাক্ষাত করছ। বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৭৯২; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৪৫।

৭- সালামাহ ইবন ইয়াযীদ বলেন, তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের খবর দিন যদি আমাদের ওপর এমন সব শাসকরা ক্ষমতায় আসে যারা তাদের অধিকার আমাদের কাছে চায়, কিন্তু আমাদের অধিকার আমাদেরকে প্রদান না করে? রাসূল তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন,

তারপর আবার লোকটি প্রশ্ন করল, আবারও রাসূল মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে রাসূল তাকে বললেন, শোন ও আনুগত্য করো, কারণ তাদের ওপর যে দায়িত্ব সেটার জন্য তারা জিজ্ঞাসিত হবে, আর তোমাদের ওপর যে দায়িত্ব সেটার জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৪৬।

৮- হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো খুব খারাপ অবস্থায় ছিলাম, তারপর আল্লাহর আমাদের জন্য কল্যাণ দিয়েছেন যাতে আমরা আছি, এ কল্যাণের পর কি আর কোনো অকল্যাণ আছে? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সে অকল্যাণের পর কি আর কল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটা কেমন? তখন রাসূল বললেন, আমার পরে কিছু শাসক হবে, যারা আমার আদর্শ মোতাবেক চলবে না, আমার চরিত্র গ্রহণ করবে না। আর তোমাদের মাঝে কিছু লোকের আবির্ভাব হবে যাদের অন্তরগুলো মানুষের শরীরে শয়তানের অন্তর। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি সে সময় পাই তো কী করব? রাসূল বললেন, 'শুনবে ও আনুগত্য করবে, যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয়, তোমার সম্পদ হরণ করা হয়, তারপরও শুনবে ও আনুগত্য করবে।' বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৬০৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৪৭।

৯- নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে কেউ শাসকের আনুগত্য করলো সে তো আমার আনুগত্য করলো, আর যে কেউ আমীরের অবাধ্য হলো সে তো আমার অবাধ্য হলো।" বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৯৫৭; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৩৫।

১০- ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই (মদীনা থেকে), তবে জিহাদ রয়েছে ও নিয়্যতও অবশিষ্ট আছে, আর যখন তোমাদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয় তখন তোমরা বের হয়ে পড়বে।" বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৭৮৩; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৩৫৩।

১১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মুসলিম ব্যক্তির ওপর কর্তব্য হচ্ছে শোনা ও আনুগত্য করা, তার ভালো অবস্থায় ও খারাপ অবস্থায়, খুশী অবস্থায় ও বেজার অবস্থায় ও তাও উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া অবস্থায়।" বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭০৫৬ কাছাকাছি শব্দে; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৮৬৬। অনুরূপ শব্দে মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৪৩৬।

১২- জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত করেছি এ সাক্ষ্য দেয়ার ওপর যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, শোনা ও আনুগত্য করা, আর প্রতিটি মুসলিমের জন্য কল্যাণকামী হওয়ার ওপর।" বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২১৫৭।

১৩- ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শোনা ও আনুগত্য করা কর্তব্য, যতক্ষণ না গুনাহের নির্দেশ দিবে, যখন গুনাহের নির্দেশ দিবে তখন সেখানে কোনো শোনাও নেই, আনুগত্যও নেই।" বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৯৫৫।

১৪- ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত করতাম তখন বাই'আত করতাম শোনা ও আনুগত্যের ওপর। তখন তিনি আমাদের বলতেন, 'যতটুকু তোমাদের সামর্থ্যে আছে।' বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭২০২।

১৫- ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা যখন শুনলেন লোকেরা আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ানকে আমীর বানিয়েছে, তখন তিনি আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ানের কাছে চিঠি লিখে জানালেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ানের জন্য শোনা ও আনুগত্য করার স্বীকৃতি দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ওপর, যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে, আর আমার সন্তানরাও অনুরূপ স্বীকৃতি দিচ্ছে।' বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস

নং ৭২০৩।

১৬- উবাদাহ ইবনুস সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত নিয়েছি শোনা ও আনুগত্যের ওপর, আমাদের খুশি ও বেজার, কষ্ট ও সহজ, আর আমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়ার সময়েও। আর আমরা যারা শাসক হবে তাদের ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি না করার ওপর, তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও, যাতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।" বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭০৫৬। অপর বর্ণনায় বাড়তি আছে, আর আমরা যেন হক কথা বলি যেখানেই থাকি, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি। বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭১৯৯।

১৭- হারেস আল-আশ'আরী বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আর আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশনা দিচ্ছি যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, শোনা ও আনুগত্য করা, জিহাদ ও হিজরত করা, আর ঐক্যবদ্ধ থাকা। কারণ যে কেউ ঐক্যবদ্ধ অবস্থা থেকে এক বিঘত পরিমাণ আলাদা হবে সে তো ইসলামের রজ্জুকে তার ঘাড় থেকে খুলে ফেলল, যতক্ষণ না আবার ফিরে আসছে।...' তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৮৬৩।

এ হাদীসসমূহ ও এর মতো আরও বহু হাদীসে কল্যাণের কাজে শাসকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। যদিও সে শাসক যালিম হয়, কারও সম্পদ কুক্ষিগত করে, কাউকে আঘাত করে। তাই ঈমানদারের উচিত হবে যাবতীয় সৎ কাজে শাসকের আনুগত্য করা। আর জিহাদ তো ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সুতরাং যখনই কোনো শাসক জিহাদের ডাক দিবে তখনই তার আনুগত্য করতে হবে। যুগে যুগে আলেম ও মুহাদ্দিসগণ এটাই বুঝেছেন এ জন্য আমরা দেখতে পাই ইমাম মালেককে উপরোক্ত আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা কর্তৃক রাসূলের হাতে বাই'আতের বিষয়ের হাদীসের জন্য শিরোনাম প্রদান করতে, 'জিহাদের ওপর বাই'আত'। ইমাম বুখারী শিরেনাম প্রদান করেন, 'শাসকের কথা শোনা ও আনুগত্য করা।' আরও বলেন, 'শাসকের কথা শোনা ও আনগত্য করা যতক্ষণ না গুনাহের নির্দেশনা দিচ্ছে।' ইমাম মুসলিমের শিরোনাম হচ্ছে, শোনা ও আনুগত্য করার ওপর বাই'আত, যতটুকু সামর্থ্যে কুলোয়। ইমাম নাসায়ী শিরোনাম দিয়েছেন, 'শোনা ও আনুগত্য করার ওপর বাই'আত'।

ইমাম আহমাদের সময়ে যখন মামুন ও মু'তাসিম ইমাম আহমাদকে বেত্রাঘাত করছিল, তারা মু'তাযিলা আকীদাহ গ্রহণ করে প্রকাশ্য বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছিল যা কুফরী পর্যায়ের, তারপরও ইমাম আহমাদ 'বাবেক আল-খুরমী'র মতো নাস্তিকদের বিরুদ্ধে মামুন ও মু'তাসিমের অধীন যুদ্ধ করার জন্য লোকদেরকে উৎসাহ দিতেন। দেখুন, খাল্লাল, আস-সুন্নাহ (১/১৪৭-১৪৮)। তা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম যদি বিদ'আতী ও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিও হয়, তারপরও তার সাথে জিহাদ করতে হবে। তবে ফিতনা তথা মুসলিমদের মধ্যে অকারণ যুদ্ধের সময় ইমামের অনুসরণ করে যুদ্ধ করা যাবে না। কারণ ফিতনার সময় যুদ্ধ করতে কুরআন ও সুন্নাহ'য় নিষেধ করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এ জন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র একটি মূলনীতি হচ্ছে, নেককার-বদকার সকল শাসকের সাথেই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে ফাসেক-ফাজের এবং এমনসব ব্যক্তিদের দ্বারা সাহায্য করবেন দীনের মধ্যে তাদের তেমন কিছু নেই। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন। কারণ, যদি খারাপ শাসক ও খারাপ সেনাবাহিনীর সাথে মিলে মিশে যুদ্ধে অংশ না নেয়া হয় তবে দু'টি অবস্থার একটি আপতিত হবে:

এক. তাদের সাথে জিহাদ না করার কারণে শত্রুরা মুসলিমদের আক্রমণ করবে, যার ফলে মুসলিম খারাপ শাসকদের চেয়ে তারা আরও বেশি ক্ষতি করবে।

দুই. খারাপ শাসকদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে তাদের অন্যায় প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে, অনেক ইসলামী নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা যাবে, যদিও সবগুলো করা না যায়। সুতরাং এসব অবস্থায় তাদের সাথে থেকে জিহাদ করতে হবে। বরং খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে অধিকাংশ যুদ্ধ এ জাতীয় বদকার মুসলিম শাসকদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েই মুসলিমরা করেছিল। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৫০৬-৫০৭)।

এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকে খারেজী ও মু'তাযিলারা। আর শিয়া রাফেযীদের মতে, সালাত

কেবল মা'সুম নিরপরাধের ইমামের পিছনেই বিশুদ্ধ। এভাবে তারা জিহাদ বাতিল করেছে যতক্ষণ না তাদের (তথাকথিত গর্তে ঢুকে পড়া) ইমাম বের হচ্ছেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (২/৪৯১-৫১৪)।

২- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ১/১৬০-১৬১, ১৬৭-১৬৮।

৩- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৫০৬-৫০৮)।

৪- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ ২/৫৪০-৫৪৪, ৫৫৫-৫৫৭।

৫- আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৫৮, ১২৫, ৪৫০, ৪৫২, ৪৬৬, ৪৬৭।

৬- বাগদাদী, আল-ফারক্ব বাইনাল ফিরাক্ব, পৃ. ৫৫।

এখানে আরেকটি মাসআলা বর্তমানে খুব বেশি আলোচিত হয়ে থাকে, আর তা হচ্ছে, জিহাদের জন্য ইমাম থাকা শর্ত কী না?

বস্তুত এ মাসআলাটি রাসূলের পরবর্তী যুগে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীদের মাঝে খুব বেশি আলোচিত হয়েছে দেখা যায় না, তার কারণ সম্ভবত দু'টি:

১- মুসলিমদের শাসক হবে আর জিহাদ করবে না, এটা তখন কোনো শাসকের চিন্তা-চেতনাতেও ছিল না। বরং সবাই ধরেই নিয়েছিলেন যে, মুসলিম শাসক জিহাদ করবেন, আর সাধারণ প্রজারা তার নেতৃত্বে জিহাদ করবে। তখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, যদি সে শাসক যালেম হয় তবুও কি আমরা জিহাদের ব্যাপারে তার আনুগত্য করবো? তার নেতৃত্বে জিহাদ করবো? এর উত্তর আমরা উপরে প্রদান করেছি।

২- অথবা আরেকটি কারণ এটাও হতে পারে যে, যুগ যুগ ধরে জিহাদের জন্য নেতৃত্ব অপরিহার্যভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। নেতৃত্ব ব্যতীত কখনও কোনো জিহাদ হয়েছে তা নবী যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ, তাবে'য়ীদের যুগ, ইমামদের যুগ বা তার পরবর্তী যুগে কখনও কাউকে কোনো সুশৃঙ্খল নেতৃত্বের অধীনে থাকা ব্যতীত জিহাদ করতে দেখা যায় না। তাহলে জিহাদের জন্য কি কোনো স্বীকৃত শাসক বা গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব জরুরী কি না?

এ প্রশ্নের উত্তরে বর্তমানে দু'টি মত খুব প্রচলিত আছে:

এক. জিহাদ কোনো শাসকের নেতৃত্বের অধীন হওয়া জরুরী নয়। তাদের দলীল হচ্ছে,

১- কুরআনে কারীমে ও হাদীসুন নাবাওয়ীতে যেসব ভাষ্যে জিহাদের কথা বলা হয়েছে তাতে এসব কোনো শর্ত আসেনি, সুতরাং এসব শর্ত দেয়া যাবে না; কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০], অনুরূপ "নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের হক্ব ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১১১] "কাজেই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন এবং মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন, হয়ত আল্লাহ কাফেরদের শক্তি সংযত করবেন। আর আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর।" [সূরা আন-নিসা: ৮৪] তদ্রূপ রাসূলের হাদীস, "তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, তোমাদের সম্পদ, জান ও যবানী দ্বারা।" [আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৫০৪] এসব আয়াত ও হাদীস, অনুরূপ আরও বহু ভাষ্যে সকল মুসলিমকে জিহাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশনার অধীনে জিহাদ হতে হবে তা বাড়তি শর্ত যা গ্রহণ করা যাবে না।

আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান ইবনুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কোনো সন্দেহ নেই যে জিহাদের ফরয সর্বদা অবশিষ্ট থাকবে, আর জিহাদ করার জন্য সম্বোধন করা হয়েছে মুমিনদেরকে, একটি গোষ্ঠী জমায়েত হলে তাদের শক্তি সামর্থ্য থাকলেই তাদের ওপর আল্লাহর পথে জিহাদ করা ফরয, যতটুকু তারা পারবে, তাদের থেকে সেটার ফরযিয়াত বাদ যাবে না, তারা ব্যতীত অন্যান্য সকলের থেকেও নয়।

দেখুন, আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (৭/৯৮)।

২- এ ব্যাপারে ইজমা' বা মুসলিম আলেমগণের ঐকমত্য হয়েছে যে, জিহাদ ফরযে কিফায়াহ, যার সম্বোধন সকল মুসলিম, যতক্ষণ না এমন লোকেরা তা আদায় করবে যাদের দ্বারা সেটা পালন করা যথেষ্ট হয়ে যায়, তখনি কেবল অন্যদের থেকে সেটার ফরয হওয়ার আবশ্যকতা বাদ পড়বে, যতক্ষণ জিহাদ ফরযে আইনে রূপান্তরিত না হয়। যেমনটি মুফাসসিরদের শাইখ ইবন জারীর আত-তাবারী তার তাফসীরে বলেছেন, 'জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর, যতক্ষণ না এমন লোকেরা সেটা নিয়ে না দাঁড়াবে, যারা সেটা নিয়ে দাঁড়ালে যথেষ্ট হয়ে যাবে, আর তখনই কেবল সকল মুসলিম থেকে সেটার ফরয হওয়ার বাধ্যবাধকতা মুক্ত হবে।... আর এর ওপরই সকল মুসলিম আলেমগণ একমত।' দেখুন, ইবন জারীর আত-ত্বাবারী, জামে'উল বায়ান (৪/২৬৯)। ইবন 'আতিয়্যাহ তার তাফসীরে বলেন, 'যার ওপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে তা হচ্ছে, জিহাদ উম্মতে মুসলিমার প্রতিটি ব্যক্তির ওপর ফরযে কিফায়াহ, যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে এমন কিছু লোক সেটা নিয়ে দাঁড়াবে, যাদের কারণে সেটা যথেষ্ট হয়ে যাবে তখন অন্যদের থেকে সেটার ফরযিয়াত বাদ যাবে, তবে যদি শত্রু ইসলামের আঙ্গিনায় অবতরণ করে বসে তখন সেটা ফরযে আইনে পরিণত হবে। দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী (৩/৩৮)।

৩- জিহাদ দু' প্রকার, জিহাদুল ফাতহ বা বিজয়ের জন্য জিহাদ, এর মাধ্যমে শত্রুকে তার দেশে খুঁজে দেখতে হয়। এ রকম জিহাদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শাসক থাকা শর্ত নয়, বরং শাসক যদি জিহাদ নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার বিরোধিতা করা কিংবা তার অগ্রে যাওয়া তার অনুমতি ব্যতীত জায়েয হবে না। কারণ তখন বিষয়টি তাঁর হাতে, তাই তার অনুমতি প্রয়োজন হবে। কিন্তু এটি জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। তখন যদি কেউ তার অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করে তবে সে গুনাহগার হবে, কিন্তু তার জিহাদ শুদ্ধ হবে। আর যদি সেখানে শাসক না থাকে অথবা হারিয়ে যায় অথবা হত্যা হয়ে যায়, তখন সে জিহাদ বন্ধ হবে না।

ইবন কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি শাসক না থাকে তাহলে সেখানে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না, কারণ দেরী করলে জিহাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে, যদি সে শাসকবিহীন যুদ্ধে গনীমত পাওয়া যায় তবে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী গনীমতের হকদারদের মধ্যে তা বণ্টিত হবে।' দেখুন, ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী (১০/৩৭৫)। তার কথা থেকে বুঝা গেল যে, শাসকের উপস্থিত থাকা শর্ত নয়, যদি জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শাসকের উপস্থিতি শর্ত হতো তবে জিহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়া ও শাসকের আগমন পর্যন্ত দেরী করা আবশ্যক হতো, তাহলে তো স্বার্থ বিবেচনায় জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ঠিক কাজ হতো না আর গনীমতও হালাল হতো না।

অনুরূপভাবে যদি শাসক বর্তমান থাকে, কিন্তু জিহাদকারীদের পক্ষে তার কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার উপায় না থাকে, সে অবস্থাতেও তারা শাসকের অনুমতি ব্যতীতই প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করে জিহাদ চালিয়ে যাবে।

ইবন কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তারা ইমামের অনুমতি ব্যতীত বের হবে না, কারণ যুদ্ধের বিষয়টি তার ওপর ন্যস্ত, তবে যদি অনুমতি নেয়া অসম্ভব হয়, যেমন শত্রু হঠাৎ করে আক্রমণ করে বসেছে, তখন আর অনুমতির প্রয়োজন হবে না; কারণ তখনকার মাসলাহাত বা স্বার্থ সংরক্ষিত হবে কেবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মাধ্যমে, আর তাদের বিরুদ্ধে বের হওয়ার মাধ্যমে। যদি তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দেয়া হয় তবে সেখানে মুসলিমদের অস্তিত্ব ও তাদের ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে।' দেখুন, ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী (১০/৩৯০)। যদি কাফেরদের তালাশের জিহাদে তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শাসকের উপস্থিতি কিংবা তার অনুমতি শর্ত থাকতো, তাহলে তো শাসকের উপস্থিতি ব্যতীত সে জিহাদ শুদ্ধ হতো না। আর প্রয়োজনের সময়েও তার উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত সে জিহাদ শুদ্ধ হতো না। কারণ শর্ত তো তা-ই যার অনুপস্থিতি সে কাজটির অস্তিত্বকে না করে দেয়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফকীহগণ এ দু' অবস্থায় তালাবী জিহাদকে বাতিল বলেননি। যা দ্বারা বুঝা গেল যে, এ জাতীয় জিহাদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শাসকের উপস্থিতি শর্ত নয়। বরং উভয় অবস্থাতেই দেখতে হবে মুসলিমদের স্বার্থ কিসের মাধ্যমে সংরক্ষিত হবে ও ক্ষতি কিসের মাধ্যমে নিরোধিত থাকবে। যেমনটি ইবন কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার জিহাদ হচ্ছে, দিফা'য়ী জিহাদ বা প্রতিরোধমূলক জিহাদ, যার মাধ্যমে মুসলিম ভূমি থেকে কাফেরদের তাড়ানো হবে। এখানে শাসক থাকার শর্ত অপরিহার্য না হওয়ার

বিষয়টি আরও স্পষ্ট ও প্রকাশিত। তখন কোনোভাবেই শাসক শর্ত করা যাবে না। তখন প্রতিটি মুসলিমের ওপর কর্তব্য হবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করা। তখন কোনো সন্তান তার পিতার অনুমতি নিবে না, স্ত্রী তার স্বামী থেকে অনুমতি নিবে না, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতা থেকে অনুমতি নিবে না। অথচ শাসকের অনুমতির চেয়ে এদের থেকে অনুমতি নেয়ার বিষয়টি বেশি দরকার, তারপরও যখন এদের অনুমতি নেয়া লাগবে না, তখন শাসকের উপস্থিতি কিংবা অনুমতির কী প্রয়োজন? কারণ তখন জিহাদ সকলের ওপরই ফরযে আইন হয়ে যাবে। তাই তখন শাসকের উপস্থিতি কিংবা অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, আর সম্মান ও দীন থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ সেটা সকলের ইজমা' বা ঐকমত্যে ফরয। কারণ যে শত্রু আক্রমণ করে দীন ও দুনিয়া বরবাদ করে দিচ্ছে ঈমানের পরে তাকে প্রতিরোধ করার চেয়ে বড় ফরয আর নেই। তখন তার জন্য কোনো শর্তের প্রয়োজন নেই, বরং প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।' দেখুন, আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ (৪/৫০৮)।

তিনি আরও বলেন, 'যখন শত্রু মুসলিম দেশে প্রবেশ করবে, তখন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তখন তাকে প্রতিরোধ করা ফরয, নিকটতম লোকদের ওপর আগে, তারপর তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম নিকটতম লোকদের ওপর; কারণ সকল মুসলিম দেশ একই দেশের মতো, সে দেশের দিকে জিহাদের জন্য যাওয়া সকল মুসলিমের ওপর ফরয হয়ে যাবে, সেখানে যাওয়ার জন্য পিতা কিংবা ঋণদাতার অনুমতি লাগবে না।' দেখুন, আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ (৪/৫০৮); আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২১৮)।

ইমাম ইবন হাযম তার মুহাল্লা গ্রন্থে বলেন, 'তবে যদি শত্রু মুসলিমদের কোনো গোষ্ঠীর ওপর চড়াওহয়, তখন প্রতিটি সক্ষম মানুষের ওপর ফরয হচ্ছে তাদের সাহায্য করার জন্য তাদের দিকে যাওয়া তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য।' দেখুন, ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা (৭/২৯২)।

অনুরূপভাবে জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আর মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাসে এটা জানা কথা যে যখন সীমান্তের লোকেরা শত্রুর আক্রমনের আশঙ্কা করবে, আর সীমান্তের লোকদের মাঝে তাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকবে, তারা তাদের দেশ, জান ও সন্তান-সন্ততির ক্ষতি হওয়ার ভয় করবে, তখন উম্মতের সকলের ওপর ফরয হবে তাদের দিকে বের হয়ে যাওয়া, যারা মুসলিমদের থেকে আক্রমণ প্রতিহত করবে। আর এতে উম্মতের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।' দেখুন, জাসসাস, আহকামুল কুরআন (৪/৩১২)।

অনুরূপভাবে খত্বীব আশ-শারবীনী তার আল-ইকনা' গ্রন্থে বলেন, 'আর কাফেরদের অবস্থার মধ্য হতে দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, তারা আমাদের কোনো দেশে প্রবেশ করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের কর্তব্য হবে যতটুকু তাদের সামর্থ্য আছে সেটা দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করা। আর জিহাদ তখন ফরযে আইন হয়ে যাবে।' দেখুন, খত্বীব আশ-শারবীনী, আল-ইক্বনা' (২/৫১০)।

সুতরাং এটিই হচ্ছে ফরযে আইন হওয়ার অর্থ। যদি সে জিহাদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শাসক বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি বা তার অনুমতি শর্ত করা হতো, তাহলে মুসলিমদের উপর আক্রমণের অবস্থায় তা ফরযে আইন হতো না। আর এটি উম্মতের কোনো আলেমই বলেননি। সে জন্যই ইমাম মাওয়ারদী বলেছেন, 'জিহাদের ফরয ফরযে কিফায়াহ, যা ইমাম দায়িত্ব নিয়ে পরিচালনা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ফরযে আইনে পরিণত হবে।' দেখুন, আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, আল-ইকনা' ফিল ফিকহিশ শাফে'য়ী, পৃ. ১৭৫।

৪- তাছাড়া সকল ফিকহের কিতাব জিহাদের অধ্যায়ে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে তা ফরয হওয়ার শর্তসমূহ কী কী? কার ওপর তা ফরয? কখন সেটা ফরযে আইন হয়ে যাবে? সেগুলোর কোনোটিতেই ইমামের উপস্থিতি কিংবা তার ঝাণ্ডা থাকার শর্ত করা হয়নি। আর সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিছু মানুষের কী হলো যে তারা এমনসব শর্ত প্রদান করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, যে কেউ এমন কোনো শর্ত করবে যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল।' বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২১৫৫।

শাইখ আল্লামা আব্দুর রহমান ইবন হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব এ শর্ত বাতিল করে বলেন, 'কুরআনের কোনো আয়াত অথবা কোনো প্রমাণে আছে যে, জিহাদ অবশ্যই অনুসৃত ইমামের অধীন হতে হবে? এটি নিঃসন্দেহে দীনের মধ্যে বানোয়াট কথা, আর মুমিনদের পথ থেকে বিমুখ থাকা, এ কথা যে বাতিল তার ওপর প্রমাণসমূহ এত স্পষ্ট যে তা

উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, জিহাদের ব্যাপক নির্দেশ সংক্রান্ত বাণী, তাতে উৎসাহ প্রদানকারী ভাষ্য আর তা না করার পরিণতি সম্পর্কে আসা সাবধানবাণীসমূহ।' দেখুন, আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (৭/৯৭)।

অনুরূপভাবে শাইখ সিদ্দিক হাসান খান তার আর-রাওদ্বাতুন নাদিয়্যাহ গ্রন্থে জিহাদ সম্পর্কে বলেন, এটি হচ্ছে দীনের ফরয নির্দেশনাসমূহের একটি ফরয, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন মুসলিম বান্দাদের ওপর আবশ্যক করে দিয়েছেন; সেখানে কোনো সময়, স্থান, ব্যক্তি, নেককার কিংবা বদকার এমন কোনো শর্তে আবর্তিত করেননি। দেখুন, সিদ্দিক হাসান খান, আর-রাওদ্বাতুন নাদিয়্যাহ, পৃ. ৩৩৩।

সুতরাং বুঝা গেল যে, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে সেখানে শাসক পাওয়া যাক বা না যাক, সেখানে কোনো ঝাণ্ডা থাকুক বা না থাকুক।

৫- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যেম, যেমনটি যাদুল মাআদে এসেছে (৩/৩০৯), অনুরূপভাবে শাইখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান তারা আবু বাসীর ও তার সাথে থাকা মুসলিমদের দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ, তাদের পথে আক্রমন ইত্যাদি ঘটনা তুলে ধরে জিহাদের জন্য শাসক শর্ত নয় এ দলীল গ্রহণ করেছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ধ্বংস হোক তার মায়ের, সে তো দেখছি যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলনকারী, যদি তার সাথে অন্য কেউ থাকত'। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৭৩১] এ আবু বাসীর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বের অধীন ছিলেন না, আর না কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন ছিলেন। আর তিনি নিজেও কোনো শাসক ছিলেন না, তার কাছে কোনো ঝাণ্ডাও ছিল না। বরং তিনি মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করতেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন, তাদের গনীমত গ্রহণ করতেন, স্বাধীনভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, তারপরও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার প্রশংসা করেছেন। আর তাই আব্দুর রহমান ইবন হাসান এ ঘটনা দিয়ে দলীল দিয়ে বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাকে বলেছেন যে, তোমরা কাফের কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করে ভুল করেছ, কারণ তোমাদের সাথে তো রাষ্ট্রপ্রধান নেই? সুবহানাল্লাহ মূর্খতার ক্ষতি মূর্খদের ওপর কত বেশি ও মারাত্মক!' দেখুন, আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (৭/৯৭)।

৬- শাসক মনোনীত করা ফরয বিধান, যা জিহাদ চালু করার মতোই। সুতরাং মুজাহিদদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা মনোনীত করা, যদি সেখানে সার্বজনীন শাসক না থাকে। যেমনটি শাইখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান বলেছেন, 'যে কেউ আল্লাহর পথে জিহাদে দাঁড়িয়েছে সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করলো, আল্লাহ তার ওপর যা ফরয করে দিয়েছে তা আদায় করলো, শাসক তো তখনই প্রকৃত শাসক হবে যখন তিনি জিহাদ করবেন, কারণ শাসক ব্যতীত জিহাদ হয় না। হক্ব হচ্ছে এর বিপরীতে, তুমি যা বলেছ হে লোক, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বলুন, 'আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ---তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র।" [সূরা সাবা: ৪৬] তিনি আরও বলেন, "আর যে কেউ প্রচেষ্টা চালায়, সে তা নিজের জন্যই প্রচেষ্টা চালায়; আল্লাহ তো সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।" [সূরা আল-'আনকাবূত: ০৬] আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বদা একদল লোক থাকবে"। আর সে দলটির আলহামদুলিল্লাহ অস্তিত্ব রয়েছে, যারা হক্বের ওপর একসাথ হয়েছে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, কোনো তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারকে তারা ভয় পায় না। দেখুন, আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (৭/৯৭)।

আর জানা কথা যে, শাসকদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সীমান্ত সংরক্ষণ করা, দীন প্রতিষ্ঠা করা। যদি তিনি জিহাদ করতে ও উম্মত তথা মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করতে অপারগ হন, তিনি তো তখন ইমাম হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন, বরং তার থাকা বা না থাকা সমান পর্যায়ের। তারপর যদি তিনি মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদের ভূমি ও সম্মান মর্যাদার প্রতিরোধের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ান তখন তো তার না থাকাই বেশি উত্তম হবে থাকার চেয়ে। তখন তো তার নেতৃত্বই বাতিল হয়ে যাবে; কারণ যে উদ্দেশ্যে তাকে বসানো হয়েছে তাই ব্যর্থ হতে চলেছে। সহীহ হাদীসে এসেছে, "শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন ঢাল, যার পিছনে অবস্থান করে যুদ্ধ করা হয়,

আর যাকে দিয়ে আঘাত থেকে বাঁচা যায়।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৯৫৭; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৪১৬] সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ দিতে হবে, যাতে ঢাল ও বাঁচার মাধ্যম হিসেবে হতে পারেন, তার দ্বারা উম্মত সংরক্ষিত থাকবে ও হিফাযতে থাকবে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে উম্মত যুদ্ধ করবে। কিন্তু যদি তিনি শত্রুর জন্যই ঢাল হন, তাহলে তো অকাট্যভাবে বলা যায় যে, তিনি কখনো শরী'আতের দৃষ্টিতে মুসলিমদের শাসক বা পরিচালক হতে পারেন না; যদিও বাস্তব অবস্থায় তিনি ইমাম বলে বিবেচিত হতে থাকেন।

ইমাম শাওকানী তার ওবলুল গামাম গ্রন্থে বলেন, শাসন কর্তৃত্বের মূলকথা, বড় শর্ত ও শ্রেষ্ঠ রুকন হচ্ছে, পথ-ঘাটের নিরাপত্তা প্রদান, যালিমদের থেকে মযলুমের জন্য ইনসাফের ব্যবস্থাকরণ, মুসলিমদের থেকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে যোগ্য বিবেচিত হওয়া; যখন তাদের ওপর এমন কোনো বিপদ এসে পড়ে যাতে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, যেমন কাফেরদের দ্বারা আক্রমণ অথবা সন্ত্রাসীদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হন। সুতরাং শাসক যখন এমন হবেন তখনই তিনি সত্যিকারের শাসক বিবেচিত হবেন, যার আনুগত্য করা আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন, যার বিরোধিতা করা হারাম করে দিয়েছেন। বরং এ কাজটির জন্যই মূলত আল্লাহ তা'আলা শাসক নিয়োগ বিধিবদ্ধ করেছেন আর সেটাকে দীনের বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। দেখুন, সিদ্দিক হাসান খান, ইকলীলুল কারামাহ, পৃ. ১১৪-১১৫।

এ হচ্ছে তাদের দলীল যারা বলে, জিহাদের নেতৃত্বের জন্য শাসক থাকা জরুরী নয়।

দুই. জিহাদের জন্য অবশ্যই শাসকের নেতৃত্ব থাকতে হবে অথবা তার অনুমতি থাকতে হবে। তাদের দলীল হচ্ছে,

১- আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেন, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা আপনার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?" [সূরা আত-তাওবাহ: ৪৩]

২- আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে যেতে আপনার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৪৪]

এ আয়াত দুটি গাযওয়ায়ে তাবুকের সাথে সম্পৃক্ত; যা ফরযে আইন ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে বের হতে বলেছিলেন, কারও জন্যই সে নির্দেশের বাইরে থাকা সম্ভব ছিল না। সেখানেও শাসকের নির্দেশের ওপর নির্ভর করে সাহাবায়ে কিরাম বের হয়েছিলেন, তাহলে যেখানে জিহাদ ফরযে কিফায়াহ থাকবে তখন তো অবশ্যই শাসকের অনুমতি নিতে হবে, যা এটা প্রমাণ করছে যে, জিহাদের বিষয়টি মুসলিম শাসকের অনুমতির অধীন।

৩- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল; আর আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন, ফলে তারা জানতে পারে না।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৯৩] এ আয়াত স্পষ্ট করে বলছে যে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার জন্য শাসকের অনুমতি লাগবে, যখন মুসলিম শাসক জিহাদে বের হতে বলবেন।

৪- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর আল্লাহ যদি আপনাকে তাদের কোনো দলের কাছে ফেরত আনেন এবং তারা অভিযানে বের হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন আপনি বলবেন, 'তোমরা তো আমার সাথে কখনো বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে; কাজেই যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসেই থাক'।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৮৩]

৫- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না; নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান রাখে। অতএব তারা তাদের কোনো কাজের জন্য আপনার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে আপনি অনুমতি দিবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আন-নূর: ৬২] এখানে 'আমরে জামে' বলে জিহাদের মত কর্মকাণ্ডকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন, ইবন জারীর আত-তাবারী, জামেউল বায়ান

'আন তা'ওয়ীলে আয়িল কুরআন (১৭/৩৮৬)।

মুহাল্লাব বলেন, এ আয়াত একটি মূলনীতি যা সাব্যস্ত করছে যে শাসক যখন মুসলিমদেরকে কোনো কাজে একত্রিত করবেন যাতে মুসলিমদের প্রয়োজন রয়েছে অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য, তখন কেউ তার অনুমতি ব্যতীত চলে যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অতঃপর যদি তাদের কোনো কাজে আপনার কাছে অনুমতি চায়, তবে আপনি তাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছা করবেন অনুমতি দিবেন" [সূরা আন-নূর: ৬২] এর মাধ্যমে জানা গেল যে, শাসক অনুমতির বিষয়টি দেখবেন, যার অনুমতি দেয়ার প্রয়োজন মনে করবেন তাকে অনুমতি দিবেন, আর যার অনুমতির প্রয়োজন অনুভূত হবে না তাকে অনুমতি দিবেন না।' [ইবন বাত্তাল, শারহু সহীহিল বুখারী ৫/১৩৫] এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে জিহাদের পুরো বিষয়টি শাসকের অনুমতির ওপর নির্ভর করছে।

৬- অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে, "মক্কা বিজয়ের পরে কোনো হিজরত নেই, আছে জিহাদ ও নিয়্যত; অতঃপর যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়া চাওয়া হয়, তখন তোমরা বের হবে।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৮২৫; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৩৫৩]

৭- আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, 'তোমাদের জিহাদ হচ্ছে হজ'। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৮৭৫]

এতে বুঝা গেল যে, জিহাদের জন্য শাসকের অনুমতি লাগে।

৮- ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'আমাকে উহুদের যুদ্ধের সময় জিহাদে যাওয়ার জন্য পেশ করা হয়েছিল তখন আমার বয়স হয়েছিল ১৪ বছর, রাসূল আমাকে অনুমতি দেননি। তারপর খন্দকের বছর আমাকে পেশ করা হয়েছিল তখন আমার বয়স ১৫ বছর, তখন আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

৯- আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন ঢাল; যার পিছনে অবস্থান করে যুদ্ধ করা হয়, আর যাকে দিয়ে আঘাত থেকে বাঁচা যায়।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৯৫৭; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৪১৬]

১০- আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ শাসকের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো, আর যে শাসকের অবাধ্য হলো সে আমার অবাধ্য হলো।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৯৫৭; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৩৫]

১১- বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধের বাহিনীর পরিচালক নিয়োগ দিতেন অথবা কোনো ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তাকে তার নিজের ব্যপারে ও তার সাথে যারা আছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়ার অসিয়ত করতেন।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৩১]

১২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যুদ্ধের পরিচালক নিয়োগ দিতেন। খলীফাগণও তাই করতেন, অনুরূপভাবে পরবর্তীতে বনী উমাইয়া ও আব্বাসীয়রাও যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ দিতেন।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব কাজ করেছেন, তা নবী হিসেবে যেমন করতেন, তেমনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও করতেন, শরী'আতপ্রণেতা হিসেবেও করেছেন।

১৩- আরও যে কারণে সেটাকে আমলে নেয়া দরকার তা হচ্ছে, জিহাদের জন্য বিশেষ করে যখন শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ হবে তখন তাতে শক্তির প্রয়োজন হয়। আর শক্তি কেবল ঐকমত্যে থাকলেই অর্জিত হয়। আর ঐকমত্যে থাকতে শাসকের অধীনেই সেটা সম্ভব। আর শাসকের নেতৃত্ব তখনই বিশুদ্ধ হবে যখন শোনা ও আনুগত্য থাকবে। এ জিনিসগুলো একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোৎভাবে জড়িত, একটি ব্যতীত আরেকটি হয় না, একটি ব্যতীত অপরটি যথাযথভাবে হয় না, বরং দীন ও দুনিয়ার কর্মকাণ্ড এগুলো ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৩৯০); আদ-দুরারুস সানিয়াহ, পৃ. ৭/৩২৮।

১৪- হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইসলামের কাজের মধ্যে চারটি রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে, বিচার,

ফাই (শত্রু থেকে লব্ধ সম্পদ যা বিনা যুদ্ধে পাওয়া যাবে), জিহাদ ও জুমু'আহ। দেখুন, হারব আল-কিরমানী বর্ণিত মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ওয়া ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, পৃ. ৩৯২।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, জিহাদের বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে। আর এ জন্যই ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তাদের দাবি খণ্ডন করেছেন যারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে খলীফা বলা থেকে পিছপা হতো, তিনি বলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তো জিহাদ করেছেন, বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ফাই বণ্টন করতেন, রাজম করতেন, হদ্দ জারী করতেন আর তাকে আমীরুল মুমিনীন বলা হতো। দেখুন, আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ (১/৪২৭), নং ৬৪৮।

অপর বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ শাসকদের ব্যাপারে বলেন, তারা আমাদের পাঁচটি জিনিসের দায়িত্ব নিবে, জুমু'আহ, জামা'আত, ঈদ, সীমান্ত ও আল্লাহর দেয়া শাস্তির বাস্তবায়ন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাদের ছাড়া আমাদের দীন কখনো সঠিক লাইনে থাকবে না, যদিও তারা যুলুম করে, অত্যাচার করে, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা যা নষ্ট করে তার চেয়ে তারা বেশি ঠিক করে, আল্লাহর শপথ তাদের আনুগত্য করতে পারা ঈর্ষার বিষয়, আর তাদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা কুফরী।' ইবন রাজাব, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ২৬২।

১৫- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি যুদ্ধে বের হওয়ার ডাক আসলে রাষ্ট্রপ্রধান যদি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন তবে তাদের তাতে বের হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

আমি আমার পিতাকে বললাম, যদি তারা শাসকের অনুমতি ব্যতীত বের হয়? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ না শাসক অনুমতি দিচ্ছেন। তবে যদি শত্রু তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে, আর তাদের পক্ষে শাসকের অনুমতি নেয়ার সুযোগ না থাকে, তখন আমি আশা করি সেটা মুসলিমদের থেকে প্রতিরোধ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।

তিনি আরও বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, খোরাসানের কিছু লোক, তাদের মাঝে ও শত্রুদের মাঝে মাত্র দেয়ালের ব্যবধান এসে গেছে, আপনি কি মনে করেন তারা যুদ্ধ করবে? তখন ইমাম আহমাদ বললেন, যদি তারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির ওপর আশঙ্কা করে তখন তারা শাসকের অনুমতি আসার আগেই যুদ্ধ করতে আমি দোষ দেখি না। কিন্তু যদি তাদের নিজের ও পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আশঙ্কা না করে তবে যতক্ষণ শাসকের অনুমতি না হবে ততক্ষণ যুদ্ধে জড়াবে না। মাসায়িলি ইমাম আহমাদ, তার ছেলে আব্দুল্লাহর বর্ণনা (২/৮৫২-৮৫৩)।

১৬- মুখতাসারুল মুযানীতে এসেছে, তিনি বলেন, 'আর যদি কোনো গোষ্ঠী শাসকের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ করে তবে আমি সেটা অপছন্দ (হারাম মনে) করি। কারণ শাসকের অনুমতি নেয়ার মধ্যে তাদের যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তার জানা থাকবে, তাদের থেকে কোনো সংবাদ আসলে তিনি তাদের জন্য সাহায্য পাঠাবেন, যখন তাদের ধ্বংসোন্মুখ কোনো অবস্থা হবে...।' মুখতাসারুল মুযানী (৪/৩৭৯)। এখানে মাকরূহ বলে হারাম বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দেখুন, শীরাযীর আল-মুহাযযাব (২/২২৯); ইবনুল কাইয়্যেমে, ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন ২/৭৫; তাহকীক মাশহূর হাসান সালমান।

১৭- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবী যামানীন (৩৯৯ হিজরী) বলেন, 'আর তিনি তাঁর কিতাবে আমাদেরকে জিহাদের ফযীলত জানিয়েছেন। আর তিনি জেনেছেন সেসব রাষ্ট্রনায়কদের অবস্থা যাদের ব্যতীত হজ ও জিহাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।' দেখুন, ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ, পৃ. ২৮৮।

১৮- ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবন কুদামা বলেন, 'জিহাদের বিষয়টি ইমাম ও তার ইজতিহাদের প্রতি ন্যস্ত।' দেখুন, আল-মুগনী (১৩/১৬)।

তিনি আরও বলেন, 'আর যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, তখন শাসকের অনুমতি ব্যতীত কেউ যুদ্ধে বের হবে না; কারণ যুদ্ধের বিষয়টি তার প্রতিই ন্যস্ত; তিনি সংখ্যা কম বা বেশি হওয়ার বিষয়টি বেশি জানবেন, শত্রুর লুকিয়ে রাখা গোপন আস্তানা, বিভিন্ন ষড়যন্ত্রও বেশি জানবেন। তাই তার মতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করা উচিত; কারণ এটিই মুসলিমদের জন্য

সাবধানতার বিষয়।' আল-মুগনী (১৩/৩৩)।
তিনি আরও বলেন, তিনি যুদ্ধে মল্লযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, 'আর এটিও শাসকের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নেই। কারণ যুদ্ধের যাবতীয় বিষয় তার প্রতি ন্যস্ত; তিনি তার লোকদের ব্যাপারে ভালো জানবেন। সুতরাং তার বিরোধিতা করে কিছু করা হলে এমন কিছু ঘটে যেতে পারে যাতে আপন বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।' আল-কাফী ফী কিফহি ইবন হাম্বল (৪/২৮২)।

১৯- ইবন আবী হাতেম বলেন, আমি আমার পিতাকে ও আবু যুরআকে প্রশ্ন করেছি, উসূলুদ্দীন তথা আকীদাতে আহলুস সুন্নাহ এর মতাদর্শ কী, যার ওপর তিনি সকল দেশে আলেমগণকে পেয়েছেন, আর তারা সেসব ব্যাপারে কী আকীদাহ পোষণ করেন? তখন উভয়েই বললেন, আমরা হিজায, ইরাক, শাম, ইয়ামেন এ সকল দেশের আলেমগণকে পেয়েছি, তাদের মতাদর্শ ছিল,... 'অবশ্যই জিহাদ যেদিন থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, আর তা হবে মুসলিম শাসকদের কারো সাথে, সেটাকে কেউ বাতিল করতে পারবে না।' লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৩২১।

২০- ইমাম আবু জা'ফর ত্বাহাওয়ী বলেন, "আর হজ ও জিহাদ মুসলিম শাসকদের সাথে হবে, নেককার ও বদকার তাদের সবার সাথেই চলবে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত, এটাকে কোনো কিছু বাতিল করতে পারবে না, সেটাকে কেউ কমাতেও পারবে না।" শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৫৫৫।

২১- ইমাম বারবাহারী বলেন, 'আর যে ব্যক্তি বলবে, নেককার-বদকার সবার পিছনে সালাত আদায় করবো, প্রত্যেক শাসকের সাথে জিহাদ করবো, কোনো শাসকের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে বের হবে না আর তাদের পরিশুদ্ধিতার জন্য দো'আ করবে, সে অবশ্যই খারেজীদের কথার প্রথম ও শেষটি থেকে বেরিয়ে গেল।' বারবাহারী, শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৭।

২২- ইমাম আবু ইসহাক্ব আশ-শীরাযী বলেন, 'আর অপছন্দনীয় হচ্ছে কেউ শাসকের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ করতে যাওয়া, আর শাসক যুদ্ধের ঘোড়া ও যোদ্ধাদের খোঁজ-খবর নিবেন, যেগুলো যুদ্ধের জন্য উপযোগী নয় তিনি সেগুলোকে যুদ্ধের জন্য যুদ্ধের দেশে প্রবেশ করাবেন না, যারা যুদ্ধে বিড়ম্বনা তৈরি করে কিংবা মুসলিমদের মাঝে মিথ্যা কথা ছড়ায় তাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিবেন না।' আত-তানবীহ, পৃ. ২৩২।

২৩- ইমাম হাত্তাব বলেন, মাসআলা: ইবন আরাফা আশ-শাইখ আল-মাওয়াযিয়্যাহ থেকে বলেন, 'শাসকের অনুমতি ব্যতীত কি যুদ্ধ করা যাবে? তিনি বললেন, না। সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ তারা শাসকের অনুমতি ব্যতীত তা করবে না, অথবা শাসকের পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত নয়। তারপর বলেন, ইবন হাবীব বলেন, আমি আলেমগণকে বলতে শুনেছি, যদি শাসক বিশেষ কোনো স্বার্থ দেখে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে তবে তার বিরোধিতা করা হারাম হবে, তবে যদি শত্রু তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে সেটা ভিন্ন কথা।' মাওয়াহিবুল জালীল (৩/৩৪৯)।

২৪- ইবন আরাবী আল-মালেকী বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিহাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, হয় বিভিন্ন বাহিনী পাঠিয়ে অথবা শাসকের সাথে একত্র হয়ে, তাই যদি কোনো বাহিনী প্রেরণ করা হয় তা যেন শাসকের অনুমতি ব্যতীত বের না হয়। যাতে তিনি তাদের খোঁজ-খবর নিতে পারেন, তাদের পিছনে শক্তির যোগান দিতে পারেন, আবার হতে পারে তিনি তাদের উদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। আহকামুল কুরআন (১/৫৮১)।

২৫- ইমাম ক্বারাফী রাহিমাহুল্লাহ ইজমা' সংকলন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও হয়, বিচারক হিসেবেও হয়, মুফতি হিসেবেও হয়। আর কিছু কর্মকাণ্ড আছে যা এগুলোর মাঝে অনির্ধারিত থাকে। তাহলে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মকাণ্ড চার প্রকার হতে পারে, প্রথম প্রকার হচ্ছে যা তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে, হদ-বিচার বাস্তবায়ন, যুদ্ধ বাহিনী প্রেরণ ইত্যাদি। [ক্বারাফী, আল-আহকাম ফী তাময়ীযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসাররুফাতিল কাযী ওয়াল ইমাম, পৃ. ১০৯]

২৬- ইমাম মাজদুদ্দিন ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, শাসকের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ করা জায়েয নেই, তবে যদি অতর্কিতে শত্রুরা আক্রমণ করে বসে আর তাতে অনুমতি নিতে গেলে ক্ষতির সমূহ

সম্ভাবনা থাকে তখন অনুমতি নেয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না।' আল-মুহাররার ফিল ফিকহ (২/১৭০)।

২৭- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী বলেন, 'কোনো ছোট বাহিনী শাসকের অনুমতি ব্যতীত বের হবে না, যাতে করে তিনি তাদের চলে যাবার পরে পিছন থেকে খোঁজ-খবর রাখতে পারেন, পিছন থেকে সাহায্য করতে পারেন, হতে পারে তারা তার উদ্ধারের প্রয়োজনবোধ করতে পারে।' তাফসীর আল-কুরতুবী (৫/২৭৫)।

২৮- ইমাম যারকাশী বলেন, গ্রন্থকার বলেছেন, আর শত্রুর বিরুদ্ধে শাসকের অনুমতি ব্যতীত বের হবে না, তবে যদি শত্রু তাদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করে বসে যার পাকড়াওকে লোকেরা ভয় করবে, আর তখন অনুমতি নেয়া সম্ভব না হয়।

ব্যাখ্যা: শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর বিরুদ্ধে বের হওয়া জায়েয নেই; কারণ যুদ্ধের পুরো বিষয়টি তার প্রতি ন্যস্ত। তিনি শত্রুদের বেশি কিংবা কম হওয়া, তাদের গোপন জায়গা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, সুতরাং সেখানে তার মতকে অনুসরণ করা হবে। তবে যদি অনুমতি নেয়া অসম্ভব হয়ে যায়, যেমন, হঠাৎ করে যদি কোনো শত্রু কারো ওপর আক্রমণ করে বসে, যদি অনুমতি নিতে যায় তার অকল্যাণের ভয় করা হয়, তখন অনুমতির বিষয়টি ধর্তব্য থাকবে না, এটি হচ্ছে দু'টি বিনষ্ট জিনিসের মধ্য থেকে বড়টিকে প্রতিরোধ করার নীতি। শারহুয যারকাশী (৩/১৭২)।

২৯- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ হচ্ছে, অনুরূপভাবে তা সকল খুলাফায়ে রাশেদারও আদর্শ, আর বনী উমাইয়া ও বনু আব্বাসের মধ্য হতে যারা উক্ত পথে চলেছে তাদের সবার আদর্শ, তা হচ্ছে, ইমাম এ দু'টি মৌলিক বিষয়ে নেতৃত্ব দিবেন। সালাত ও জিহাদ। যিনি সালাতের ইমামতি করবেন তিনিই জিহাদের নেতৃত্ব দিবেন।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা (৫/১১৭)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, এটা জানা আবশ্যক যে মানুষের শাসনকার্য পরিচালনা করা দীনের ফরয কাজসমূহের একটি। বরং দীন ও দুনিয়া এটি ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। কারণ বনী আদম ততক্ষণ তাদের স্বার্থ হাসিল করতে পারে না যতক্ষণ না তারা একতাবদ্ধ হচ্ছে, কারণ তাদের একের প্রতি অন্যের প্রয়োজন রয়েছে। আর যখনই একতাবদ্ধ হবে সেখানে একজন মাথা থাকতে হয়।... তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করেছেন, আর এটি করতে হলে শক্তি ও শাসন লাগে। অনুরূপভাবে অপরাপর যাবতীয় ফরয কাজসমূহ যেমন জিহাদ, ইনসাফ কায়েম করা, হজ, জুমু'আহ, ঈদ, মযলুমের সাহায্য করা, হদ বা সুনির্দিষ্ট বিচার চালু রাখা এসবের জন্য শক্তি ও শাসক লাগে। এজন্যই বর্ণিত আছে যে, শাসক হচ্ছে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর ছায়া। আরও বলা হয়, ষাট বছর জালেম শাসক থাকা এক রাত্রি শাসকবিহীন থাকার চেয়ে বেশি উত্তম। আর অভিজ্ঞতা তা স্পষ্ট করে দেয়। ... সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে শাসক হওয়াকে দীন ও নৈকট্য হিসেবে গ্রহণ করা; কারণ শাসনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে উৎকৃষ্ট নৈকট্য হিসাবে নেয়া যায়, সেখানে তো তখনই ফিতনা-ফাসাদ অধিকাংশ মানুষের মাঝে ঢুকে যখন কর্তৃত্ব কিংবা সম্পদের উদ্দেশ্য শাসন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৩৯০-৩৯১)।

৩০- ইমাম ইবন মুফলিহ বলেন, 'শাসকের অনুমতি ব্যতীত কোনো যুদ্ধ করা যাবে না, কারণ যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি ভালো জানেন, আর যুদ্ধ তার প্রতি ন্যস্ত। তাছাড়া যদি শাসকের অনুমতি ব্যতীত মল্লযুদ্ধই জায়েয না হয় তাহলে যুদ্ধ তো আরো আগে জায়েয না হওয়ার বিষয়, তবে যদি শত্রু তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে যে শত্রুর ক্ষতি ও কষ্টকে তারা ভয় পায়।' আল-মুবদি' (৩/৩৪৯)।

৩১- ইমাম বাহুতী বলেন, 'যদি কাফেররা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে করতে এগিয়ে আসে, তখন মুসলিমদের জন্য জায়েয হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে দাওয়াতের জন্য যুদ্ধ করবে, এর মাধ্যমে তারা নিজেদের নাফস ও পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবেন। আর যুদ্ধের বিষয়টি শাসক ও তার ইজতিহাদ তথা গবেষণালব্ধ মতের ওপর ন্যস্ত করা হয়। কারণ তিনি মানুষের অবস্থা, শত্রুর অবস্থা, শত্রুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা, তাদের কাছে কিংবা দূরে থাকার

বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আর প্রজাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে এ বিষয়ে তিনি যা ভালো মনে করেন সেটার আনুগত্য করা।' কাশশাফুল কানা' (৩/৪১)।

তিনি আরও বলেন, 'যুদ্ধ শাসকের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নেই, কারণ তিনি যুদ্ধ ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাই বিষয়টি তার প্রতিই ন্যস্ত। আর যেহেতু মল্প যুদ্ধের জন্যও তার অনুমতি লাগে তাহলে বড় যুদ্ধের জন্য তো লাগবেই, এটাই স্বাভাবিক।' কাশশাফুল কানা' (৩/৭২)।

৩২- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আর জিহাদের বিষয়টি শাসকের ওপর ন্যস্ত, আর তখন প্রজাদের ওপর ফরয হচ্ছে ইমাম যা মত দেন সেটার আনুগত্য করা।' দেখুন, শাইখের গ্রন্থাবলি, ফিকহ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩৬০।

৩৩- শাইখ সা'দ ইবন হামাদ ইবন আতীক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এখানে কিছু মূর্খ ধোকাগ্রস্ত যা চালু করছে তা হচ্ছে শাসকের বিষয়টিকে হাল্কা করে দেখা, শাসকের নির্দেশের বিরোধিতাকে সহজ করে নেয়া, তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া, যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। বস্তুত এ কাজ মূর্খতা ও যমীনে বড় ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি, যারই আকল-বুদ্ধি ও ঈমান আছে সেই তা বুঝতে সক্ষম। দীনে ইসলামের অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে এটা জানা গেছে যে, জামা'আতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ অবস্থা ব্যতীত দীন নেই, শাসক ছাড়া জামা'আত বা একতাবদ্ধ হওয়ার কিছু নেই, আর শাসক হওয়া তখনই পূর্ণ হয় যখন সেখানে শোনা ও আনুগত্য থাকে। আরও জানা কথা যে, মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা থেকে বেরিয়ে যাওয়া দেশ ও দশের মাঝে বড় ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি করা ও আল্লাহর সহজ সরল পথ থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত হওয়া।' আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (৯/১৩৯)।

৩৪- শাইখ 'উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শাসকের নির্দেশনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধে যাওয়া জায়েয নেই, তার অনুমতি ব্যতীত যিম্মী ও চুক্তি কোনোটিই করা যাবে না; কারণ জামা'আত ব্যতীত দীন নেই, আর শাসক ব্যতীত কোনো জামা'আত হয় না। অনুরূপভাবে শোনা ও আনুগত্য করা ছাড়া শাসকও মানা হয় না; কারণ শাসকের আনুগত্য থেকে বের হওয়া দেশ ও দশের বড় ফাসাদের কারণ।' আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ৯/১৬৬।

৩৫- ইমাম শাওকানী বলেন, যেসব বিষয়ে শাসকের আনুগত্য করা আবশ্যক তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনাগত কাজ, যা মানুষের ওপর এসে পড়ে, তাতে শাসকদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে কাজ করতে হবে।' শাওকানী, আল-কাওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ, পৃ. ১২।

৩৬- শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন বলেন, 'বস্তুত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের রয়েছে দূরদৃষ্টি। কারণ এসব বিষয়ে শাসকের বিরোধিতা করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা, আর তাতে বড় ধরনের ফিতনা আপতিত হয়। শাসকদের কথার বাইরে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ইসলামের মধ্যে এত ফিতনা ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধের অবতারণা হয়নি।' শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ (২/৩৩৮)।

যারা রাষ্ট্রনায়ক শর্ত করেন না, তাদের বিভিন্ন দলীলের জবাব:

প্রথমত: যারা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন ভাষ্য উল্লেখ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদকে সার্বজনীন নির্দেশনা বুঝাতে চাচ্ছেন, তারা আসলে এ ব্যাপারে ব্যাপক দলীলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বস্তুত ব্যাপক নির্দেশনার বিষয়টি এসব ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনার সাথে যুক্ত করে বুঝতে হবে। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ'র যত নির্দেশনা আছে তা বাস্তবায়ন করার জন্য সকলেই আদিষ্ট নন। আর সকলে তা প্রতিপালন করতে গেলে হানাহানি ও মারামারি আরও বাড়বে, তাতে সমস্যা আরও বাড়বে বই কমবে না।

বর্তমান সময়ে কেউ কেউ 'সুতরাং আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন, আপনাকে ব্যতীত কাউকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না, আর মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন' [সূরা আন-নিসা: ৮৪] এ আয়াত দ্বারা জিহাদের নির্দেশের সার্বজনীনতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করে থাকে। তাদের ব্যাপারে ইবন উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হচ্ছে তিনি রাষ্ট্রনায়ককে সম্বোধন করেন, তিনি প্রত্যেককে আলাদা নির্দেশনা দেন না। আর এ জন্যই বলেছেন, 'আর আপনি মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করুন'। সুতরাং এ লোক যদি শাসকের অনুমতি ব্যতীত বের হয় তবে সে জামা'আতের গণ্ডী থেকে বের হয়ে গেল, এ ভুল সে নিজের ওপর করেছে। বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সময়ে; কারণ

যখন সে জিহাদ করার জন্য বের হবে, তারপর তাকে পাকড়াও করা হবে, আর তার রাষ্ট্র সম্পর্কে জানা যাবে, তখন দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্যা বাড়তে থাকবে। সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে মানুষ শরী'আতের ভাষ্যগুলোকে একপেশে এক দিক থেকে গ্রহণ না করা, কানার চোখ দিয়ে সেগুলো না দেখা। বরং ওয়াজিব হচ্ছে, প্রতিটি ভাষ্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখা, আর তাই আলেমগণ বলেছেন, রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ করা জায়েয নেই।' দেখুন, উসাইমীন, শারহু কিতাব আস-সিয়াসাতুশ শার'ইয়্যাহ, পৃ. ৪১।

এ আয়াত দিয়ে দলীল গ্রহণকারী ব্যক্তির এসব ভাষ্যের দিকে কেবল একদিক দিয়ে তাকিয়েছে, অন্য ভাষ্যগুলোর কথা সে ভুলে গেছে; এই যে মূসা 'আলাইহিস সালাম ও তার ভাই হারূন, তারা দু'জন আল্লাহর নবী, তাদের জাতি জিহাদ করা অস্বীকার করে বললো, 'আপনি ও আপনার রব্ব যান, যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকলাম' [সূরা আল-মায়িদাহ: ২৪] তখন কিন্তু মূসা ও হারূন যুদ্ধে যাননি, বরং তারা আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করলেন এটা বলে যে, 'হে আমার রব্ব, আমি আমার নিজেকে ও আমার ভাইকে ছাড়া কাউকে যুদ্ধের জন্য পাচ্ছি না, সুতরাং আপনি আমাদের মাঝে ও ফাসেক সম্প্রদায়ের মাঝে পৃথকীকরণ করে দিন।' [সূরা আল-মায়েদাহ: ২৫]

দ্বিতীয়ত: তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবু বাসীর এর কাহিনী দিয়ে প্রমাণ পেশ করে থাকেন, শাইখ সালেহ আল-ফাওযান তাদের কথা খণ্ডন করে বলেন, 'আবু বাসীর কোনো শাসকের অধীন ছিলেন না, কারও নির্দেশনা তার ওপর চলতো না, বরং তিনি কাফেরদের কব্জাতে ছিলেন ও তাদের অঞ্চলের অধীন ছিলেন, তিনি শুধু নিজেকে তাদের কব্জা ও কর্তৃত্ব থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসিত এলাকার ভিতরে ছিলেন না; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সন্ধি ও অঙ্গীকারের শর্ত অনুযায়ী কাফেরদের হাতে সোপর্দ করলেন, সুতরাং তিনি তো মুসলিমদের দেশের অধীন ছিলেন না, তার ওপর তো কোনো মুসলিম শাসকের কর্তৃত্বও ছিল না।' দেখুন, শাইখ সা'ঈদ আল-কাহত্বানী, আল-জিহাদ, আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু, পৃ. ৯৪।

শাইখ আব্দুর রাযযাক ইবন আব্বাদ বলেন, অঙ্গীকারাবদ্ধ কাফের হত্যা ও তাদের সন্তান ও নারীদের যিম্মি করা, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য কেউ কেউ আবু বাসীরের ঘটনা দিয়ে যে দলীল নেয়ার চেষ্টা করে, এ ভিত্তিতে যে, তিনি মুশরিকদের কাফেলায় লুটতরাজ করতেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের অঙ্গীকার ও সন্ধিচুক্তি ছিল। বস্তুত এ দলীলটি তার আসল স্থানে ব্যবহৃত হয়নি। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, 'আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুশরিকদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল সেটি আবু বাসীর ও তার সাথীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আর এর ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে, যদি মুসলিমদের কোনো শাসকের সাথে খ্রিস্টান বা তাদের মতো কাফের মুশরিকদের কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার হয় সেটি অপর মুসলিম শাসকের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে না। তাদের জন্য জায়েয আছে উক্ত খ্রিস্টান বা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাদের সম্পদ গ্রহণ করা, যদি তাদের মাঝে অনুরূপ চুক্তি না হয়ে থাকে; যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ মালাত্বিয়ার নাসারাদের ব্যাপারে ও তাদের বন্দীদের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে মুশরিকদের সাথে আবু বাসীর এর ঘটনা দিয়ে দলীল দিয়েছেন।' ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা'আদ (৩/৩০৯); আরও দেখুন, 'আলাউদ্দীন আল-বা'লী, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়্যাহ লি শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃ. ৩১৬-৩১৭।

তৃতীয়ত: যারা বলে জিহাদের জন্য শাসকের অনুমতি লাগে না, তাদের আরেকটি সন্দেহ হচ্ছে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে কোনো একক শাসক নেই। কুরআন ও হাদীসে যে শাসকের কথা বলা হয়েছে তা তো সকল মুসলিম দেশের শাসক, কোনো একটি অংশের ওপর যারা শাসন পরিচালনা করছে তারা উদ্দেশ্য নয়।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল মাযহাবের ইমামগণ একমত যে, কেউ যদি কোনো দেশ বা একাধিক দেশের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তার জন্য সকল কিছুতেই শাসকের বিধান চালু হয়ে যাবে, যদি এটা না হতো তবে দুনিয়া কখনও সুস্থির থাকতো না। কারণ ইমাম আহমাদের পূর্বকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষেরা কখনও একক শাসকের অধীন হয়নি, আর আলেমগণের মধ্যে কারো কাছ থেকেই জানা যায় না যে, তারা শাসক সংক্রান্ত বিধি-বিধানকে কেবল সর্বোচ্চ বড় শাসকের জন্য ছাড়া অন্য কারো জন্য হবে না, এমনটি বলতে। দেখুন, আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (৭/২৩৯)।

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এর মাধ্যমে জানা যাবে সেসব নবীনদের পথভ্রষ্টতা, যারা বলে, বর্তমানে মুসলিমদের কোনো ইমাম বা শাসক নেই, সুতরাং কারও কোনো কিছু মানার দায়িত্ব আমাদের ওপর পড়ে না। আল্লাহর কাছে এসব কথা থেকে নিরাপত্তা চাই, আমি জানি না, তারা কি অরাজকতা ছড়াতে চায়? সকল কাজ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কোনো নিয়ম-নীতির বাইরে চলবে? কারণ যখন মানুষের কোনো প্রশাসক থাকবে না, যিনি তাদের পরিচালনা করবেন, তখন তো হ-য-ব-র-ল অবস্থার জন্ম দিবে। নাকি তারা বলতে চায় তাদের প্রত্যেকেই নিজের শাসক? তারা যদি রাষ্ট্র সরকারের অধীনতা না মেনে এ রকম অরাজক অবস্থায় মারা যায় তবে তাদের মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে। কারণ অনেক আগ থেকেই এটি স্থিরিকৃত নিয়ম হয়ে গেছে যে, কোনো এলাকার ওপর কেউ তার প্রভাব বিস্তার করে অধিকার করার পরে যদি তার কথা চলে তবে সে উক্ত এলাকার জন্য শাসক বলে বিবেচিত হবেন।' দেখুন, উসাইমীন, আশ-শারহুল মুমতি' (৮/১২-১৩)।

তিনি আরও বলেন, 'যদি শাসকের অনুমতি ব্যতীত সাধারণ মানুষের জন্য জিহাদের দ্বার উন্মোচন করা হয়, তাহলে সেটাতে বড় ধরনের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। যে কেউ চাইবে তার ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়বে, আর মানুষদের যদি এমন কাজ করতে সুযোগ দেয়া হয় তাহলে সেখানে বড় আকারের ফেতনা-ফাসাদ তৈরি হবে। এভাবে একদলকে দেখা যাবে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য, অথচ তারা আসলে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্যই তা করছে অথবা দেখা যাবে তারা অপর কোনো গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করার জন্যই তা করছে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, 'যদি মুমিনদের মাঝে দু'টি গোষ্ঠী যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও' [সূরা আল-হুজুরাত: ০৯], এ তিনটি কারণে ও অন্যান্য আরও কারণে এটাই বিশুদ্ধ কথা যে, 'রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ব্যতীত কোনো যুদ্ধ নেই।' উসাইমীন, আশ-শারহুল মুমতি' (৮/২৫-২৬)।

চতুর্থত: তাদের মধ্যে কেউ কেউ শাইখ আব্দুর রহমান ইবনুল হাসান আলুশ শাইখ এর কথা দিয়ে দলীল গ্রহণ করতে চায় যে, তিনি বলেছেন জিহাদের জন্য শাসকের অনুমতির প্রয়োজন নেই। এর উত্তর হচ্ছে,

- প্রথমত, এটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে নাজদভিত্তিক দাওয়াতের ইমামদের কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তার পক্ষে দলীল খুঁজতে হবে, তাদের দিয়ে দলীল দেয়া যাবে না।
- দ্বিতীয়ত, একজন দলীল গ্রহণকারী ব্যক্তিকে এটা জানতে হবে যে, তিনি কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাগুলো বলেছেন? এখানে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে উসমানীয় শাসকদের নির্দেশে তাদের মিশরের শাসক তখনকার সৌদী রাজ বংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করে তাওহীদী রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে দেয়। মিশরের যালিম শাসক ইবরাহীম পাশা তাওহীদ রাষ্ট্রের শাসককে মিশরে নিয়ে যায়, এমনকি শাইখ আল্লামাহ আব্দুর রহমান ইবন হাসান আলুশ শাইখকেও তারা ১২৩৪ হিজরীতে মিশরে নিয়ে যায়, অনুরূপভাবে তার সন্তান আব্দুল লতীফকেও মাত্র ৮ বছর বয়সে নিয়ে যায়, সেখান থেকে তারা ১২৪০ হিজরীতে রিয়াদে ফিরে আসেন। [দেখুন, মুকাদ্দামাতু তাহকীকি 'উয়ূনুর রাসায়িল (১/৩৮)], তখনকার অবস্থায় যেহেতু তাদের শাসক পরদেশে জেলে ছিল, যাতে কেউ এ কারণ দেখিয়ে জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয় যে তোমাদের তো প্রশাসক নেই, সে জন্য তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন। এটা দিয়ে যেখানে শাসক আছে সেখানে দলীল দেয়া যাবে না।
- তৃতীয়ত, নাজদ কেন্দ্রিক দাওয়াতের সকল ইমাম জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত থাকার কথাই বলেছেন। দাওয়াতের ইমামগণের মাঝে পরস্পর মতের মিল দেখা যায়; কারণ তারা একই উৎস থেকে তাদের জ্ঞান গ্রহণ করেছেন, আর তা হচ্ছে সালাফে সালেহীনরে বুঝের ওপর নির্ভর করে কুরআন ও সুন্নাহ। তাহলে দাওয়াতের ইমামগণের সকলের কথা বাদ দিয়ে কেবল একজনের কথা কেন নেয়া হলো? কেন তার কথার প্রকৃত অবস্থা না বুঝে ও পুরো বক্তব্য না নিয়ে একটি অংশ দিয়ে দলীল দেয়া হচ্ছে?।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলুশ শাইখ বলেন, আর জিহাদ, যে জিহাদ আল্লাহর শত্রু কাফিরদের বিরুদ্ধে হয়, তা অবশ্যই শাসকদের সাথে হতে হয়, কারণ তারাই তো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, যেমন তারাই ফাই ও খুমুস ইত্যাদি গ্রহণ করবেন। অনুরূপ তারাই জিহাদ প্রতিষ্ঠা করবেন, সেটা পরিচালনা করবেন, সেটার যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবেন, এ ব্যাপারে

তাদের সাথে ঝগড়া করা যাবে না। কারণ শাসক ছাড়া কোনো জামা'আত নেই আর শোনা ও আনুগত্য ছাড়া কোনো শাসনকার্য চলতে পারে না। [শারহুল আকীদাতিল ওয়াসেতিয়্যাহ, পৃ. ২৩৮]

পঞ্চমত: যেসব আলেমগণ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান শর্ত নয় এমন কথা এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিরোধমূলক জিহাদ। কারণ তখন প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করবে। এটাকে টেনে অগ্রণী জিহাদে নিয়ে যাওয়া যাবে না। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আর প্রতিরোধমূলক জিহাদ, সেটি অনেক বড় কঠিন। আক্রমণকে প্রতিহত করা, যার মাধ্যমে নিজের দীন ও সম্মান বাঁচাতে পারবে, সেটি সর্বসম্মতভাবে ফরয। কারণ আক্রমণকারী শত্রু দীন ও দুনিয়া উভয়টিকেই বরবাদ করে দেয়, ঈমানের পরে তাকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় কর্তব্য আর কিছু নেই। সেটার জন্য কোনো শর্ত লাগবে না, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিহত করা হবে, এ বিষয়ে আলেমগণ স্পষ্ট করে বক্তব্য দিয়েছেন, আমাদের আলেমগণ এবং অন্যান্য মাযহাবের আলেমগণ। সুতরাং যুলুমকারী কাফের এর আক্রমণ প্রতিহত করা ও কাফেরের দেশে গিয়ে আক্রমণ করার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে।' শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ (৪/৬০৮)।

সারকথা হচ্ছে,

১- জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে; শাসকের সাথে জিহাদ হবে এটিই সাধারণ নিয়ম। শাসক ন্যায়পরায়ণ হোক বা ফাসিক-ফাজির।

২- জিহাদ যখন অগ্রণী বা ইকদামী বা জয়ের জন্য হবে তখন সেখানে অবশ্যই রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি লাগবে অথবা তার উপস্থিতি বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি লাগবে।

৩- জিহাদ যখন প্রতিরোধমূলক হবে, তখনও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি লাগবে, তবে কয়েকটি অবস্থায় তা শিথিলযোগ্য:

ক. যখন শত্রু অতর্কিতে আক্রমন করবে আর রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি নেয়ার মতো সুযোগ না থাকে, তখন যার যতটুকু সামর্থ্য থাকবে ততটুকু নিয়ে প্রতিরোধ করবে। অথবা যখন কাফিরদের দ্বারা মুসলিমদের বড় কোনো স্বার্থহানি হচ্ছে, তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব অথবা তাদের ক্ষতি কমানো সম্ভব, আর তখন শাসকের অনুমতি নেয়া সময় সাপেক্ষ্য হওয়ায় সে স্বার্থ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে, তখন যদি সে স্বার্থ রক্ষার চেয়ে বড় কোনো সমস্যা দেখা দেয়ার সমূহ সমস্যা আপতিত না হয় তবে সেখানে শাসকের অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যেমনটি করেছিলেন, সালামাহ ইবনুল আকওয়া' রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাতের উটের ওপর আক্রমণ করে সেগুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দাজ। তিনি তীরের মাধ্যমে তাদেরকে তা রেখে পালাতে বাধ্য করেন। এখানে তার সব রকমের সক্ষমতা ছিল, আর শত্রুরা ছিল তস্কর জাতীয় লোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই সালামাহ ইবনুল আকওয়া' রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর সে কাজটি পছন্দ করেছিলেন। [দেখুন, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮০৭]

খ. যদি কোথাও শাসক না থাকে বা তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হয় আর আক্রান্ত মুসলিমদের পক্ষে শত্রুকে পরাস্ত করা বা শত্রুর ক্ষতি কমানো, শত্রুকে ব্যস্ত রাখার মত সামর্থ্য থাকে তখন নিজেদের মধ্য হতে পরিচালক নিয়োগ করে জিহাদ পরিচালনা করতে হবে।

গ. যদি জিহাদের সামর্থ্য না থাকে তো সবর করবে। আর তাদের কাছাকাছি মুসলিমদের ওপর তাদের সাহায্য করা আবশ্যক হবে, এভাবে পুরো মুসলিম জনতার ওপর কর্তব্য হবে তাদের সাহায্য করা। তবে সেখানেও সামর্থ্যের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. যদি সবর করার সামর্থ্য না থাকে তো হিজরত করবে। মুসলিম শাসকদের ওপর কর্তব্য হবে তাদের জন্য হিজরতের জায়গা করে দেয়া।

ঙ. পরবর্তীতে সামর্থ্য হওয়ার সাথে সাথে সেখানে কোনো দক্ষ পরিচালকের নেতৃত্বে জিহাদ করতে হবে।

৪- আল্লাহর পথে জিহাদের বিধান ও তার আবশ্যকতা সম্পর্কে মুসলিম দেশের সরকার ও জনগণকে বিশুদ্ধভাবে অবহিত করতে হবে।

৫- আমরা যেমন আমাদের শাসকরাও সে রকম হবেন এটাই স্বাভাবিক, সুতরাং যত খারাপই হোক তারা আমাদের শাসক ও তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার মাধ্যমেই 'আল-জামা'আত' এর সাথে থাকার যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা বাস্তবায়িত হবে। তবে কোনোভাবেই তাদের খারাপ

কাজগুলোর সমর্থন করা যাবে না। আর ভালো কাজগুলোর জন্য তাদের প্রশংসা বাদ দেয়া যাবে না।

৬- আল্লাহর পথের জিহাদের ব্যাপারে মুসলিমদের শক্তি ও দুর্বলতার বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। কারণ ইসলামে আল্লাহর পথে জিহাদ কয়েকটি স্তরে ফরয করা হয়েছে:

এক. মক্কার যিন্দেগীতে জিহাদ ফরয ছিল না, হাত দিয়েও না, তরবারী দিয়েও না। কারণ তারা সংখ্যায় কম ও ক্ষমতায় দুর্বল ছিল। তখন অন্তর ও মুখের জিহাদ ছিল, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, "কাজেই আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে বড় জিহাদ চালিয়ে যান।" [সূরা আল-ফুরক্বান: ৫২] এখানে কুরআন দিয়ে জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

দুই. মদীনায় হিজরতের পর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ বলেন, "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৩৯]

তিন. তারপর জিহাদ ফরয হয়েছিল, যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা, যারা যুদ্ধ করবে না, তাদের সাথে যুদ্ধ না করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, "আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০]

চার. তারপর সর্বাত্মক জিহাদ ফরয করা হয়েছিল, তখন আল্লাহর দীনের দাওয়াতের জন্য জিহাদের নির্দেশনা ব্যাপক করা হয়, হয় যুদ্ধ না হয় জিযইয়া। আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দুর হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-আনফাল: ৩৯]

মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন, এসব পর্যায় ও অধ্যায়ের আয়াতসমূহের কোনোটিই রহিত নয়। বরং অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী মুসলিমরা সেটাকে কাজে লাগাবে। দেখুন, শাইখ ইবন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৩১, ১৩৩, ১৩৬-১৩৭।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি মুমিনগণ এমন কোনো দেশে থাকেন যেখানে তারা দুর্বল, অথবা এমন সময়ে থাকেন যখন তাদের মধ্যে দুর্বলতা থাকবে, তখন তাদের উচিত হবে সবরের আয়াত অনুযায়ী আমল করা আর সেসব আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়।' দেখুন, আস-সারেমুল মাসলূল (২/৪১৩)।

আল্লামা ইবন সা'দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আর তারা এবং যারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় তারা যেন জেনে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা কারো সাধ্য ও সামর্থের বাইরে কাউকে দায়িত্ব দেন না, আর মুমিনগণের জন্য তাদের রাসূলের কর্মকাণ্ডে উত্তম আদর্শ রয়েছে। কারণ দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি অবস্থা ছিল। প্রত্যেক অবস্থায় সে অবস্থার সাথে উপযোগী কর্ম করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যখন মুসলিমদের অবস্থা দুর্বল হবে, শত্রু তাদের ওপর প্রবল হবে তখন শুধু প্রতিরোধ ও আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তখন হাতে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ তখন হাতে যুদ্ধ করার মাঝে এমন সব ক্ষতি রয়েছে যা ইসলামী স্বার্থকে ক্ষুন্ন করবে। আর যখন মুসলিমদের অবস্থা ভালো হবে তখন সব রকমের ক্ষমতা ব্যবহার করে শত্রুদের ক্ষতি প্রতিরোধ করা হবে, যার সাথে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করা অবস্থার দাবি তার সাথে সন্ধি স্থাপন করবে, আর সীমালঙ্ঘনকারীদের সাথে স্বার্থ বিবেচনায় রেখে প্রতিরোধ করবে, বরং তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই আবশ্যক হবে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত তাদের নবীর যথাযথ অনুসরণ অনুকরণ করা, আর তাই হচ্ছে প্রকৃত সঠিক কাজ ও মৌলিক সফলতা।' দেখুন, সা'দী, ওজুবুত তা'আউন বাইনাল মুসলিমীন, (তার গ্রন্থসমগ্র) (৫/১৯০)।

৭- কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধে যেন তখনই নামা হয় যখন সে যুদ্ধ প্রাধান্যাপ্রাপ্ত স্বার্থ নিয়ে আসবে। আর সে যুদ্ধের কারণে যেন আরও বড় ক্ষতির সম্মুখীন যেন মুসলিমরা না হয় সেটাকে যথাযথভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ সব রকমের জিহাদ কেবল ইসলাম ও

মুসলিমদের একক ও সামষ্টিক সুস্বার্থ সংরক্ষণ ও অস্বার্থ দূরীকরণের জন্য শরী'আত কর্তৃক বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং তা ততক্ষণ বিধিবদ্ধ থাকবে যতক্ষণ শরী'আতের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে বলে দৃঢ় জ্ঞান কিংবা অধিক ধারণা হবে। তারপর যখন দৃঢ় বিশ্বাস হবে অথবা এ ধারণা করা হবে যে, জিহাদ বাস্তবায়ন করতে গেলে সুস্বার্থ আহরণের চেয়ে বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তখন আর সেটি শরী'আত অনুমোদিত বিষয় থাকবে না, শরী'আত নির্দেশিত জিহাদও হবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিহাদ ও সৎ আমল সেটিই যাতে রাব্বে কারীমের আনুগত্য বেশি করা হবে, মানুষের উপকার বেশি হবে। তাই যদি কোথাও জিহাদ করা মুসলিমদের ক্ষতির কারণ হয়, অথবা তার দ্বারা আহরিত উপকার গ্রহণ থেকে বিশেষ কোনো বাঁধা আপতিত হয়ে দাঁড়াবে, তখন সেটি করা আর ঠিক থাকবে না।' মাজমূ' ফাতাওয়া (২২/৩০০)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, 'যখন অবস্থা এমন, তখন এটা জানা কথা যে, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ করা আর সেটিকে জিহাদের মাধ্যমে পূর্ণতা প্রদান করা সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ যা করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর সেজন্যই বলা হয়, যেন তোমার সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে নিষেধ করার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে না হয়। আর যেহেতু জিহাদ ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তা বড় ধরনের ওয়াজিব কাজ ও মোস্তাহাব কাজ, সেহেতু এসব ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কাজ করার সময় অবশ্যই স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি ক্ষতির উপর প্রাধান্য পেতে হবে। কারণ রাসূলগণকে এটির জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে, আর এটির যথাযথ খেয়াল রাখার জন্যই কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। আর আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টি করেন না, বরং আল্লাহ তা'আলা যা নির্দেশ দিয়েছেন সবই স্বার্থসংরক্ষক। আল্লাহ তা'আলা সংশোধন, স্বার্থ সংরক্ষণ ও সংশোধনকারী, স্বার্থসংরক্ষণকারীদের প্রশংসা করেছেন, অনুরূপভাবে যারা ঈমান ও আমলে সালেহ করে তাদের প্রশংসা করেছেন। অপরদিকে তিনি কুরআনের বহু জায়গায় ধ্বংসকারী, বিনষ্টকারী ও ফাসাদকারীদের নিন্দা করেছেন। সুতরাং যেখানেই আদেশ নিষেধের দ্বারা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া সেটার স্বার্থ সংরক্ষণের চেয়ে বড় আকারে দেখা দিবে, সেটা তখন আর আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় থাকতে পারে না।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/১২৬); ইস্তেকামাহ (২/২০৯-২১১)।

তিনি আরও বলেন, 'এ জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হচ্ছে, জামা'আত তথা মুসলিমদের সাথে থাকা আবশ্যক করে নেয়া, শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা আর ফিতনার (মুসলিমদের পারস্পরিক যুদ্ধের) সময় যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/১২৮)।

৮- শুধু কাফের হত্যা করাই আল্লাহর পথে জিহাদ নয়। ইসলামে বিনা বিচারে ঈমানদার ও কাফের কারো রক্ত ঝরানোই অনুমোদন করেনি। ইসলামে তা হারাম। যে কেউ কাফের হত্যা করাকেই জিহাদ মনে করবে সে নিজে পথভ্রষ্ট, অপরকে পথভ্রষ্টকারী, মুসলিমদের ইজমা' থেকে বের হয়ে গেছে, বরং এটি সকল আসমানী শরী'আতের বিরোধী কথা ও কাজ। দেখুন, মূসা 'আলাইহিস সালামের কাহিনীতে যখন তিনি ক্বিবতীকে হত্যা করে ফেললেন, তখন সেটা তার জন্য আফসোসের কারণ হয়েছিল, যদিও ক্বিবতীটি তখন ইসরাঈলী লোকটির ওপর যুলুম করছিল। তারপরও মূসা 'আলাইহিস সালাম সেটাকে শয়তানের কারসাজি বললেন, তিনি হত্যা করতে চাননি, কিন্তু লোকটি মরে গেল। মূসা 'আলাইহিস সালাম সেটিকে নিজের ওপর যুলুম হিসেবে নিয়েছিলেন। তাহলে যারা বর্তমানে কাফের হত্যার ঢালাও ফতোয়া দিচ্ছে কিংবা কাফের হত্যার কাজে নিজেদের নিয়োগ করছে তারা কতবড় যালিম ও বিভ্রান্ত তা সহজেই অনুমেয়।

৯- আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য মূলকথা হচ্ছে ছোটবড় সকল ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ব্যাপারে কিছু সংক্ষিপ্ত নিয়ম-নীতি বর্ণনা করেই এ আলোচনার এখানে ইতি টানতে চাই, তা হচ্ছে:

ক. আকীদাহ বিশুদ্ধ হতে হবে। যে মুজাহিদের আকীদাহ পরিশুদ্ধ নয় তার কথা ও কাজ ফাসাদ ও বিকৃতি থেকে মুক্ত হবে না। কারণ কথা ও কাজ বিশুদ্ধ তখনই হবে যখন সেটা বিশুদ্ধ

আকীদাহ'র ওপর ভিত্তি করে হবে।

খ. নিয়্যত পরিশুদ্ধ হয়ে খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য তা হতে হবে। যে মুজাহিদ তার কথা ও কাজে নিয়্যতকে খালেস করবে না, তার জিহাদ আল্লাহর জন্য হবে না, আল্লাহর বাণীকে উপরে উঠানোও তার উদ্দেশ্য হবে না, বরং নিজের নাফসের অংশ ও প্রবৃত্তির তাড়নার জন্যই তার কাজ নিবেদিত হয়ে যাবে।

গ. আল্লাহর ওপর সত্য ও সঠিক ভরসা রাখতে হবে। যে মুজাহিদ যথাযথভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে না সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে দৃঢ়পদ থাকতে পারবে না। জিহাদের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, বরং তার হিম্মত কমে যাবে, আর আল্লাহর সাহায্যের ওপর তার আশা কমে যাবে।

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গ সুন্দর অনুসরণ থাকতে হবে। যে মুজাহিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুন্দরভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে তার জিহাদ বিশুদ্ধ হবে না, সে বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকতে পারবে না, বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়িতে নিমজ্জিত হবে। বরং তার জিহাদ নিজের জন্য ও অন্যের জন্য বিপদের কারণ হবে, সে আল্লাহর পথে সংশোধন ও দাওয়াত প্রদানের চেয়ে ফিতনা ও ফাসাদকে প্রমোট করবে, যেমনটি বর্তমান কালে তথাকথিত কিছু সন্ত্রাসীদের মাঝে দেখা যায়।

ঙ. আল্লাহর পথে জিহাদের নামে কারো কারো মাঝে যেসব বিকৃত মানসিকতা কাজ করছে সেগুলো জানতে হবে, কারণ কেউ জিহাদ করে দুনিয়ার বীরত্ব প্রকাশের জন্য, কেউ করছে দুনিয়া লাভের জন্য, কেউ করছে বিভিন্ন প্রকার দলীয় কিংবা জাতীয় গোড়ামী প্রতিষ্ঠার জন্য, কেউ নারী, বৃদ্ধ পুরুষ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকেও হত্যা করছে, কেউ জিহাদের নামে আত্মহত্যা করছে, কেউ মৃতদের বিকৃত করছে, কেউ লুটতরাজ চালাচ্ছে, কেউ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে, কেউ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাউকে হত্যা করছে, কেউ মানুষের সম্পদ জোর করে নিয়ে নিচ্ছে, কেউ অঙ্গীকারাবদ্ধ কাফেরদের হত্যা করছে, এসবের কোনোটিই ইসলামের জিহাদ নয়।

১০- জিহাদের নামে মুসলিমদের দুর্বল করা ও কাফেরদের নিজেদের ওপর আক্রমণ করার অজুহাত তৈরি করা যাবে না। যখনই কেউ শরী'আতের নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে নিজেরা কোনো শাসকের অনুমতি কিংবা উপস্থিতি বাদে ইকদামী জিহাদের জন্য অন্য দেশে যাবে তখন তাদের কেউ কোথাও ধরা পড়লে সেটা হবে সে মুসলিম দেশের জন্য সমূহ বিপদের কারণ। কোনোভাবেই সন্ত্রাসী বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীকে অন্য কোনো সরকার সাহায্য করে না। আমাদের বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থা ও অবস্থান কখনও জিহাদের জন্য বের হওয়ার পক্ষে নয়। যারা এখন আমাদের যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে তারা মাসালিহ আর মাফাসিদের মধ্যকার মুওয়াযানাত করার ক্ষমতা রাখে না। অর্থাৎ তারা স্বার্থ ও অস্বার্থের মধ্যে তুলনামূলক জ্ঞানই রাখে না। তারা যদি আমাদের দেশের অবস্থা বুঝতো তাহলে যুবকদের সস্তা জিহাদী বাণী আওড়িয়ে বিভ্রান্ত করতো না। বাংলাদেশের শক্তি অনেক সীমিত। আমাদের ওপর জিহাদের কর্তব্যও সে কারণে বিশাল নয়। আমরা আমাদের পাশের ভাই রোহিঙ্গাদের জন্যই যুদ্ধের মাধ্যমে কিছু করার ক্ষমতা রাখি না, সেখানে দূরের মাযলুম মুসলিম রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য উত্তম কথা বলা, মত দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো, আর্থিক সহায়তার সুযোগ তৈরি হলে তা করা ও তাদের জন্য দো'আ করা ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব অকারণে নিজেদের কাঁধে গ্রহণ করা কখনও ইসলামের নির্দেশিত বা অনুমোদিত বিধান নয়।

১১- তাওহীদের ঝাণ্ডা ব্যতীত অন্য কোনো ঝাণ্ডার অধীন জিহাদ হতে পারে না। যে জনগোষ্ঠী তাওহীদই বুঝে না, যারা দীনী আবেগ দিয়ে চলে এমন একদল মুসলিম হচ্ছে বাংলাদেশী মুসলিমগণ। যারা ইসলামপ্রিয় কিন্তু ইসলাম বুঝে না। সুতরাং তাদের নিয়ে জিহাদের ডাক দেয়া বা তাদের নিয়ে আবেগী করে তোলার চেয়ে আজ বড় দরকার হচ্ছে তাদেরকে তাওহীদ ও ঈমানের মাধ্যমে শক্তিশালী করে তোলা। দাওয়াতের পথকে উন্মুক্ত রাখা; কারণ মূলত জিহাদের আসল উদ্দেশ্য দাওয়াত ও তাবলীগ তথা আল্লাহর দিকে আহ্বান ও প্রচার চালানো। যতক্ষণ সেটা যুদ্ধ ব্যতীত অর্জন করা যাবে ততক্ষণ যুদ্ধের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা যদি আল্লাহর পথে দাওয়াতকে ত্বরান্বিত করতে পারি, তাহলে হতে পারে আমরা যাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি, তারাই একদিন এ দীনে প্রবেশ করে দীনের সংরক্ষণের জন্য কাজ করবে।

والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع،

আর জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা ফরয; যেখানেই তার জন্য ডাকা হোক না কেন, যদি না কারও ওযর থাকে কিংবা কোনো বাঁধা থাকে।(৭৭৬) আর তারাওয়ীহ এর

সুতরাং আসুন আমরা দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদ করি, এটাকে বেগবান করি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

৭৭৬. আলেমগণের মাঝে ঐকমত্য রয়েছে যে, পুরুষ মানুষের জন্য মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা উত্তম। আর তা একা আদায় করার চেয়ে পঁচিশ বা সাতাশ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ। দেখুন, ইবন হুবাইরাহ, আল-ইফসাহ (১/৩২১); নাওয়াওয়ী, আল-মাজমূ' (৪/৮৫)।

তাছাড়া আলেমগণ আরও একমত যে, জুমু'আর সালাতের জন্য জামা'আত ফরয। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৬১৫)।

তবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার আবশ্যকতার বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণের মাঝে তিনটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: প্রত্যেক পুরুষ ব্যক্তির ওপর জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা ফরযে আইন। তবে সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। এটিই উপরে আমাদের গ্রন্থকার 'ইবন খাফীফ' বর্ণনা করেছেন। এ মতটি ইতোপূর্বে আরো পোষণ করতেন, আত্বা ইবন আবী রাবাহ, হাসান বসরী, আবু 'আমর আল-আওযা'য়ী, আবু সাওর, ইমাম আহমাদ তার মাযহাবের যাহের মতে, শাফে'য়ী তার কোনো এক মতে, ইবন খুযাইমাহ, ইবনুল মুনযির, ইবন হিব্বান, দাউদ আয-যাহেরী, ইবন হাযম, ইমাম বুখারী, আর হানাফীদের মধ্যে যফর আহমাদ উসমানী আত-থানাওয়ী রাহিমাহুমুল্লাহ। আর এ মতটিই প্রাধান্য দিয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যেম, ইবন হাজার, শাইখ ইবন বায ও শাইখ উসাইমীন।

দ্বিতীয় মত: পুরুষ ব্যক্তির ওপর জামাতের সাথে সলাত আদায় করা ফরযে কিফায়াহ। এ মতটি শাফে'য়ী মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত, কোনো কোনো মালেকী মাযহাবের আলেমের মত, ইমাম আহমাদ এর একটি মত, এ মতটির সপক্ষে বহু হানাফী আলেমের অবস্থান, আর ইমাম নাওয়াওয়ী এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তৃতীয় মত: প্রত্যেক পুরুষ ব্যক্তির ওপর জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ মতটি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র অনুসারীদের বিখ্যাত অভিমত। আর এর ওপরই অধিকাংশ মালেকী মাযহাবের আলেমগণ, অধিকাংশ শাফে'য়ী মাযহাবের আলেমগণ, আর তা ইমাম আহমাদ থেকে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়।

বরং ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, মূলত এটি হানাফী ও মালেকীদের মাযহাব। তাদের নিকট জামা'আতে সালাত আদায় ত্যাগ করা গুনাহের কাজ, তবে জামা'আত বাদে তা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। ইবনুল কাইয়্যেম আরও বলেন, তাদের মাঝে এবং যারা ফরযে আইন বলেন, তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শব্দগত। কারণ উভয়েই জামা'আতের সাথে সালাত আদায় না করলে গুনাহগার হবে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। কারণ হানাফীদের নিকট সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ ছেড়ে দিলে গুনাহ হয়।

এ বিষয়ে ফিকহের কিতাবে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- কাসানী, বাদায়েউ সানায়ে'উ (১/১৫৫)।
২- ইবন নুজাইম, বাহরুর রায়েক (১/৬০২)।
৩- যফর আহমদ আল-উসমানী আত-থানওয়ী, ই'লাউস সুনান (৪/১৬৪-১৬৫)।
৪- কারাফী, আয-যাখীরাহ (২/২৬৫)।
৫- দাসূকী, হাশিয়াতুদ দাসূকী (১/৩১৯)।
৬- নাওয়াওয়ী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব (৪/৭৬-৭৯, ৮৫)।
৭- শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ (১/৪৬৫)।
৮- ইবন মুফলিহ, ফুরু' (১/৫৭৭)।
৯- মারদাওয়ী, আল-ইনসাফ (৪/২৬৫)।
১০- ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী (৩/৫-৬)।
১১- ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা (৪/২৬৫-২৭৬)।
১২- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৩/২২২-২৪০, ২৫৩)।

সালাত আদায় করা সুন্নাহ।(৭৭৭)

১৩- বা'লী, ইখতিয়ারাতু শাইখিল ইসলাম, পৃ. ১২৫।
১৪- ইবনুল কাইয়্যেম, কিতাবুস সালাত ওয়া হুকমু তারেকেহা।
১৫- ইবনুল কাইয়্যেম, বাদায়ি'উল ফাওয়ায়িদ (৩/১৫৯-১৬১)।
১৬- ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (১/১২১-১২২)।
১৭- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৩/১২৫-১২৯)।

৭৭৭. তারাওয়ীহ এর সালাত মূলত সুন্নাত। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। গ্রন্থকার এখানে তারাওয়ীহ এর সালাতের কথা আনয়ন করার কারণ হচ্ছে শিয়া রাফেযীরা তা অস্বীকার করে থাকে। তারা সালাতুত তারাওয়ীহকে বিদ'আত বলে থাকে। তাদের মতে তা 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর আবিষ্কার। দেখুন, হিল্লী শি'য়ী, নাহজুল হক্ক ও কাশফুস সিদক্ব, পৃ. ২৮৮; বাকের আল-মাজলেসী শি'য়ী, বিহারুল আনওয়ার (৮/২৮৪)। আস-সালূস, ফিকহুস শিয়াতিল ইমামিয়্যাহ, পৃ. ২২১।

অথচ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন পড়ার পর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আর জামা'আতে পড়েননি। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম আলাদা আলাদা পড়েছেন। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে এবং তার সময় স্বল্প হওয়ার কারণে সেদিকে নজর দেননি। 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু পুনরায় সে সুন্নাতটিকে উবাই ইবন কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর ইমামতিতে মসজিদে জামা'আতের সাথে চালু করে দেন। সাহাবায়ে কিরামের কেউ 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজের বিরোধিতা করেননি। সুতরাং তাতে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা' বা ঐকমত্য অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তা ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। আরও বলেচেন, আবু বকর ও উমার এর সুন্নাত বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরতে। যার কারণে আজ সারা দুনিয়ায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মসজিদগুলো রমাদান মাসে আলোকিত হয়। কিন্তু শিয়া রাফেযীরা 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে ঘৃণা করার কারণে এত বড় মহৎ একটি সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে ও বিদ'আত বলার মতো দুঃসাহস দেখায়।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ রাফেযী শিয়াদের এসব সন্দেহের যথাযথ অপনোদন করেন। দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ ফী নাক্বদ্বি কালামিশ শী'আতিল ক্বাদারিয়্যাহ (৮/৩০৪-৩১২)।

আকীদাহ'র গ্রন্থে আরও যারা এ মাসআলাটির অবতারণা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ। দেখুন, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০৬; কিওয়ামুস সুন্নাহ আল-আসফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/৪০৯)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ব্যক্তি ইশার সালাতের আগে তারাওয়ীহ এর সালাত আদায় করেছেন, তখন তার জবাব ছিল, 'রাফেযীরা তারাওয়ীহ এর সালাত অপছন্দ করে, সুতরাং কেউ যদি ইশার সালাতের আগে তারাওয়ীহ পড়ে তবে সেটা তারাওয়ীহ এর সালাত বিবেচিত হবে না।.. সুতরাং যে কেউ ইশার আগে তা পড়বে তবে সুন্নাহ বিরোধী বিদ'আতপন্থীদের পথে চললো।' মাজমূ' ফাতাওয়া (২৩/১২০-১২১)। আরও দেখুন, মুখতাসার আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ, পৃ. ৮১।

যখন এটা স্থিরিকৃত হলো যে, তারাওয়ীহ এর সালাত সুন্নাত ও মোস্তাহাব, যা রাফেযীদের মতের বিরোধী, তখন এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হলো যে, এখানেও আহলুস সুন্নাহ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। কারণ রাফেযীরা ছাড়াছাড়ি করে তা পড়তে নিষেধ করে, আবার চরমপন্থী ইবাদতকারীরা কিয়ামুল লাইলকে ওয়াজিব মনে করে। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'চরমপন্থী আবেদরা তাদের অনুসারীদরে ওপর সালাতুদ দোহা, উইতর, কিয়ামুল্লাইল এগুলোকে ফরয করে দেয়, এভাবে তাদের নিকট ফরয সালাত সাতটিতে পরিণত হয়ে যায়, ... এর বিপরীতে রাফেযীরা এতই ছাড় দেয় যে, তারা তাদের নিজেদের দলের কারো পিছনে অথবা বাইরের কারো পিছনে জুমু'আহও পড়ে না, জামা'আতও প্রয়োজনীয় মনে করে না। তারা মনে করে সালাত কেবল মা'সূম ইমামের পিছনে হতে হবে। আর যেহেতু সে মা'সূম এখন নেই তাই আর সালাতেরও জামা'আত নেই।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/১৭৫)।

ونشهد أن من ترك الصلاة عمدًا فهو كافر،

আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেউ ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগ করলে সে কাফের হয়ে যাবে।(৭৭৮)

৭৭৮. সালাত পরিত্যাগকারীর দু' অবস্থার বাইরে নয়:

১- যদি এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তবে উম্মতের সর্বসম্মত মতে সে কাফির, যা তাকে দীন থেকে বের করে দিবে। অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার আগে তার অস্বীকার করার কারণ সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ এখানে দু'টি সূরত হতে পারে:

ক. সে হয়ত সেটা ফরয হওয়ার বিষয়টি না জানা থাকার কারণে অস্বীকার করেছে, এমন হলে তার ওপর কুফরীর বিধান দেয়ার আগে তাকে তা জানাতে হবে। কিন্তু এটা স্থায়ী উযর হবে না, জানার সুযোগ থাকলে না জানা কোনো উযর বিবেচিত হবে না।

খ. অথবা সে সালাত ফরয হওয়ার বিষয়টি জানার পরও তা অস্বীকার করেছে। এমতাবস্থায় তাকে কাফের বলার ব্যাপারে উম্মতের সকলে একমত। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে ইজমা' বর্ণনা করেছেন। মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৩০৮)।

২- যদি সালাত ফরয হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে, অস্বীকার করে না, কিন্তু সেটাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় দু'টি সূরত হতে পারে:

ক. কোনো উযরের কারণে সালাত পরিত্যাগ করছে। যেমন, ভুলে যাওয়া, ঘুম, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে। এমতাবস্থায় তাকে জানাতে হবে যে, এসব অবস্থায় সালাত পরিত্যাগ করা যায় না। তার ওপর কর্তব্য হচ্ছে যখন স্মরণ হবে, যখন জাগ্রত হবে, আর যেভাবে তার পক্ষে আদায় করা সম্ভব সেভাবে আদায় করা। দেখুন, আশ-শাফে'য়ী, আল-উম্ম (১/২৫৫)।

খ. যদি অলসতা ও অগুরুত্বপূর্ণ মনে করার কারণে সালাত ত্যাগ করে, তবে তার বিধান কী এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে দু'টি বিখ্যাত মত রয়েছে:

প্রথম মত: এভাবে সালাত পরিত্যাগকারীও কাফির। এ মতটি সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ, মু'আয ইবন জাবাল, ইবন মাসঊদ, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে সরাসরি স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে এসেছে। এমনকি কোনো কোনো তাবে'য়ী তাতে ইজমা'ও বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক আল-উকাইলী বলেন, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফর বলতেন না।' তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৬২২। অনুরূপভাবে ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহও এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা' বর্ণনা করেছেন। দেখুন,

- মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী, তা'যীমে কাদরিস সালাত, পৃ. ৯২৯।
- ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা (২/২৪২)।
- (ইমাম আহমদ), মাসায়িলে আবী দাউদ, পৃ. ২৭২।
- (ইমাম আহমদ), মাসায়িলে আব্দুল্লাহ (১/১৯০৯)।
- ইবন হুবাইরাহ, আল-ইফসাহ (১/১০১)।
- ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী (৩/৩৫৪)।
- ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৪/২২৫)।
- ইবন আব্দিল বার, আল-ইস্তিযকার (৫/৩৪২)।
- ইমাম নাওয়াওয়ী, আল-মাজমূ' (৩/১৪)।
- ত্বাহাওয়ী, শারহু মুশকিলুল আছার (৮/২০৫)।

মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযী বলেন, এই হচ্ছে হাদীস বিশারদদের মতাদর্শ। তা'যীমে কাদরিস সালাত, পৃ. ৯৩৬।

আর ইবন তাইমিয়্যাহ তা মাজমূ' ফাতাওয়ায় অধিকাংশ সালাফের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৩০৮)।

অনুরূপভাবে তা তাবে'য়ীদের অনেকের কাছ থেকেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন সা'ঈদ ইবন জুবাইর, ইবরাহীম নাখ'য়ী, ইবনুল মুবারক থেকে এসেছে। আর তা ইমাম আহমাদ এর এক মত, যে মতটি সম্পর্কে ইনসাফ গ্রন্থকার বলেছেন যে, এটাই হাম্বলীদের মাযহাব, আর এর ওপরই তার মাযহাবের আলেমগণ রয়েছেন। হাম্বলী ইমাম আবু বকর আল-খিরাক্বী এ মতটিই পছন্দ করেছেন। অনুরূপ এটিই ইবন শাকল্লা ও ইবন হামেদ এর মত। এ মতটি ইসহাক্ব ইবন রাহওয়িয়াহ, শা'বী, আওযা'ঈ,

আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানীরও।

আর এ মতের দিকেই গিয়েছেন মালেকী মাযহাবের ইমাম আব্দুল মালেক ইবন হাবীব, এ মতটিই শাফে'য়ী মাযহাবের একটি ওয়াজহ, যা ইমাম ত্বাহাওয়ী ইমাম শাফে'য়ী থেকে নিজে বর্ণনা করেছেন। আর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, অধিকাংশ সালাফে সালেহীন এ মতের অনুসারী ছিলেন।

বর্তমান সময়ের আলেমগণের মাঝে এমতটি পছন্দ করেছেন, সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে আশ-শাইখ, সম্মানিত শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন।

এসব আলেমগণের পক্ষে সেসব দলীল প্রদান করা যায়, যাতে স্পষ্টভাবে সালাত ত্যাগকারীকে কাফের বলা হয়েছে। এ মতের প্রবক্তাগণের মত এভাব অলসতা কিংবা অগুরুত্বপূর্ণ মনে করার কারণে তার দুনিয়াবী শাস্তি হবে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা। সুতরাং তার ওপর মুর্তাদের হুকুম বর্তাবে। সে মুসলিম না থাকায় তার স্ত্রী পৃথক হয়ে যাবে। মারা গেলে মুসলিমদের জানাযা পাবে না। মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না। সে কোনো মুসলিমের সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে না। সে কাউকে ওয়ারিশ করবে না। তার যবাই করা প্রাণী খাওয়া যাবে না ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মত: অলসতা কিংবা অগুরুত্বপূর্ণ মনে করলে কাফের হবে না। এটি অধিকাংশ ফকীহের মত। যেমন, আবু হানীফা, মালেক ও শাফে'য়ীর এক বর্ণনায়। আর এটি হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবন বাত্তাহ পছন্দ করেছেন, আর বলেছেন, মাযহাবে এর বিপরীতটি পাইনি। তাছাড়া এ মতটি মাজদুদ্দীন ইবন তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবন কুদামাহ প্রমুখের। ইমাম নাওয়াওয়ী বলেন, এটিই হচ্ছে শাফে'য়ী মাযহাবে বিখ্যাত। তাদের দলীল হচ্ছে সেসব ভাষ্য যাতে ঈমানদারের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির উত্তম ওয়াদা রয়েছে।

তবে এ মতের প্রবক্তাগণের মাঝে অলসতা কিংবা অগুরুত্বপূর্ণ মন করার কারণে সালাত ত্যাগকারীর দুনিয়াবী শাস্তি নিয়ে দু'টি মত রয়েছে:

এক. তাকে শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে, কাফের হিসেবে নয়। সে হিসেবে তার ওপর মুসলিমদের হুকুম বর্তাবে। তাকে মুসলিম হিসেবে কাফন, জানাযা, দাফন এসব করা হবে, আর সম্পদ বণ্টনে ওয়ারিস করবে ও ওয়ারিস হবে। এটি মালেকী ও শাফে'য়ী মাযহাবের মত। দেখুন, ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৪/২৪০); আল-ইস্তেযকার (২/২৮৬); শাফে'য়ী, আল-উম্ম (১/২৫৫); নাওয়াওয়ী, আল-মাজমূ' (৩/১৪); ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী (৩/৩৫৫); ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৯০)।

দুই. তাকে তা'যীরী শাস্তি প্রদান করা হবে, হয় তাকে কয়েদখানা বন্দী করা হবে অথবা তাকে প্রহার করা হবে। এটা হানাফী মাযহাবের আলেমগণের মত। দেখুন, ত্বাহাওয়ী, শারহু মুশকিলুল আছার (৮/২০৫); আইনী, উমদাতুল কারী (১/২০৭); নাওয়াওয়ী, আল-মাজমূ' (৩/১৪, ১৬); ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৪/২৪০); আল-ইস্তেযকার (২/২৮৬)।

এখানে উভয় দলের দলীল ও যুক্তি উল্লেখ করে প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই। বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে,

১- মারওয়াযী, তা'যীমু কাদরিস সালাত (২/৮৭৩)।
২- ইবনুল কাইয়্যেম, কিতাবুস সালাত।
৩- নাওয়াওয়ী, মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব (৩/১৫-১৯)।
৪- ইবনু রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৯৭-৯৯)।
৫- মারদাওয়ী, আল-ইনসাফ (১/৪০৩-৪০৫)।
৬- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২২/৪৭-৪৯), (২৮/৩০৮, ৩৫৯-৩৬০)।
৭- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ঈমান, পৃ. ২৮৭।
৮- সাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ, পৃ. ৭৪।
৯- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ১৩৩-১৩৬।
১০- খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান, (সুনানু আবি দাউদের মুখতাসারসহ) (৭/৪৫-৪৬)।
১১- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (২/২৭৫)।
১২- শাওকানী, নাইলুল আওত্বার (১/৩৩৬-৩৪৮)।
১৩- শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে আশ-শাইখ, নাসীহাতুন 'আম্মাতুন...ইলা জামী'য়িল

والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة،

ولا ننزل أحدًا جنة ولا نارًا حتى يكون الله ينزلهم،

আর (সাহাবীদের পরে কারও জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের) সাক্ষ্য প্রদান(৭৭৯) কিংবা কারও সাথে (নিছক ধারণার ওপর নির্ভর করে) সম্পর্কচ্যুতি ঘটানো বিদ'আত।(৭৮০) কিবলার অনুসরণ করে যে মারা গেছে তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করা সুন্নাহ।(৭৮১)

আমরা কাউকে জান্নাতে বা জাহান্নামে অবতরণ করাই না যতক্ষণ না আল্লাহ তাতে অবতরণ করান।(৭৮২)

মুসলিমীন, পৃ. ৮-৯।

১৪- মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন, হুকমু তারিকিস সালাত।

১৫- আলবানী, হুকমু তারিকিস সালাত।

১৬- ড. আব্দুল্লাহ আয-যাহেম, আল-খিলাফু ফী হুকমি তারিকিস সালাত।

৭৭৯. শাহাদত অর্থাৎ কারও মৃত্যু কিসের ওপর হয়েছে তা যতক্ষণ না জানা যাবে ততক্ষণ কাউকে জাহান্নামী কিংবা সে কাফের এভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা জায়েয নেই। সালাফদের আলোচনায় তিনটি জিনিসকে তারা একসাথে বলতেন, ('শাহাদাহ বিদ'আহ, বারাআহ বিদ'আহ, ওয়িলায়াহ বিদ'আহ') ইমাম আহমাদ এর জবাব দিয়েছেন, বারাআহ মানে সাহাবায়ে কিরামের কোনো একজনের সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘটানো, আর ওয়িলায়াহ মানে তাদের কারো সাথে সম্পর্ক রাখা আর কারো সাথে না রাখার বিষয়টি বিদ'আহ। আর শাহাদাহ হচ্ছে, কারো ব্যাপারে এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে সে জাহান্নামী। দেখুন, খাল্লাল, আস-সুন্নাহ (২/৪৭৯), (৪/৮৭); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৭১১)।

৭৮০. বারাআহ অর্থাৎ সম্পর্কচ্যুতি ঘটানো। যেমনটি করে থাকে শিয়া রাফেযীরা, তারা আবু বকর ও 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার সাথে সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা প্রদান করে থাকে। রাফেযীদের ওপর আল্লাহর লা'নত হোক।
এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৪৩৬-৪৩৯)। আরও দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১৬৯)।

৭৮১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত হচ্ছে, কিবলার অনুসরণ করে যারা মারা গেছে তাদের ওপর সালাত পড়া যাবে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে, শির্ক বা কুফরীর নিচের কবীরা গুনাহের কারণে তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করা পরিত্যাগ করা যাবে না।
যখন জানা গেল যে, যারা কিবলা অনুসরণ করে মারা গেছে তাদের উপর জানাযার সালাত পড়া হবে, তখন বুঝা গেল যে, খারেজী ও মু'তাযিলারা এ ব্যাপারে পতভ্রষ্ট, যারা মনে করে থাকে কবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী, তার ওপর জানাযার সালাত পড়া যাবে না। এর দ্বারা আরও জানা গেল যে, কিবলার অনুসারীদের ওপর ইসলামের প্রকাশ্য বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে, আল্লাহই তাদের গোপন অবস্থার হিসাব নিবেন।
এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- বারবাহারী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৩৬।

২- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১৬৪, ১৭০, ১৮৩)।

৩- আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২৯৬।

৪- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৫৩৫-৫৩৭)।

৭৮২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত হচ্ছে তারা আখেরাতে কোনো ব্যক্তির জন্য জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়ার অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করে না। তবে যাদের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট ভাষ্য এসেছে তাদের ব্যাপারটি আলাদা। যেমন জান্নাতের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে এসেছে, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন: উক্কাশাহ ইবন মুহসিন, সাবেত ইবন কায়েস ইবন শাম্মাছ, 'আম্মার, বিলাল, সুহাইব, আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ প্রমুখ। দেখুন, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৫৭৩)।

শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আস-সাবূনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বান্দাদের শেষ পরিণতি অস্পষ্ট, কেউ জানে না তার শেষ কাজ কিসের ওপর সম্পন্ন হয়, তাই নির্ধারণ করে কারো ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাক্ষ্য দেয় না যে সে জান্নাতী, অনুরূপ কারো ব্যাপারে সে এটাও সাক্ষ্য দেয় না যে, সে জাহান্নামী; কারণ এটি তাদের কাছে গায়েবী বিষয়, যার জ্ঞান তাদের নেই।' আকীদাতুস সালাফ আসহাবুল হাদীস, পৃ. ২৮৬। তবে এসবই আখেরাতের বিধানের বিষয়ে, কিন্তু দুনিয়ার বিধানের বিষয়ে যে কেউ কুফর বা শির্ক বা নিফাক প্রকাশ করবে তাকে সেটা অনুসারে বিধান প্রদান করা হবে, সে অনুসারে তাদের দুনিয়ার বিচার সংঘটিত হবে, সেটা অনুসারে তাদের শেষকৃত্যানুষ্ঠান করা হবে, তাদের সম্পদের মীমাংসা করা হবে, তাদের পরিবারের অন্যান্য বিধান নির্ধারিত হবে, তাদের ব্যাপারে কাফের বা ঈমানদার বলা যাবে।

ইমাম ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কারও ব্যাপারে নির্ধারণ করে জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে কি না এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে,

এক. নবীগণ ব্যতীত আর কারও জন্য এ সাক্ষ্য না দেয়া। এ মতটি মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ ও আওযা'ঈ থেকে বর্ণিত।

দুই. যাদের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'য় সরাসরি স্পষ্ট ভাষ্য এসেছে তাদের সবার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে। এ মতটি অধিকাংশ আলেম ও আহলুল হাদীসগণ গ্রহণ করেছেন।

তিন. যাদের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র সরাসরি স্পষ্ট ভাষ্য এসেছে এবং যাদের ব্যাপারে ঈমানদারগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাদের জন্যও জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে। এ মতটি অগ্রহণযোগ্য মত।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন,

১- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১৬৯)।
২- আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২৯৩-২৯৪।
৩- সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৮৩।
৪- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৫১৮), (১৮/৩১৩-৩১৪)।
৫- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৫৩৭-৫৩৮)।

আরেকটি বিষয় এখানে আলোচনায় আসতে পারে যে, কুরআনের কারীমে তো আল্লাহ তা'আলা কয়েক জায়গায় মুমিনদের জন্যও বিভিন্ন কারণে আগুনে প্রবেশের ব্যাপারে 'খুলুদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা দ্বারা কি জাহান্নামে স্থায়ী হওয়া বুঝায় না? যেমন:

মীরাসের বিষয় বর্ণনার পর যারা মীরাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে ও সীমালঙ্ঘন করবে, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾ [النساء: ١٤]

"আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [সূরা আন-নিসা: ১৪]

অনুরূপভাবে মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করার পর হত্যাকারীর জন্য জাহান্নামে 'খুলুদ' স্থায়ী হওয়ার কথা বলা হয়েছে,

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣﴾ [النساء: ٩٣]

"আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" [সূরা আন-নিসা: ৯৩]

অনুরূপ সুদখোরের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥﴾ [البقرة: ٢٧٥]

"যারা সুদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মতো'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। অতএব, যার নিকট তার রব্ব এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫]
অনুরূপ যিনা ব্যভিচারের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩]

"এবং তারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আর আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বর্ধিতভাবে প্রদান করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।" [সূরা আল-ফুরক্বান: ৬৮-৬৯]
তদ্রূপ গুনাহের পর গুনাহে যে ডুবে আছে তার জন্যও বলা হয়েছে,

﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ [البقرة: ٨١]

"হ্যাঁ, যে পাপ উপার্জন করেছে এবং তার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮১]
অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ [يونس : ٢٧]

"আর যারা মন্দ কাজ করে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ মন্দ এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; আল্লাহ থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ নেই; তাদের মুখমণ্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা ইউনুস: ২৭]
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ এর কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন,

১- জাহান্নামই এদের আসল শাস্তি, যদি আল্লাহ শাস্তি দিতে চান, কিন্তু তিনি ওয়াদা করেছেন যে, শির্ক ও সে পর্যায়ের গুনাহ ব্যতীত সকল গুনাহ তার ইচ্ছাধীন। তাই কোনো ঈমানদার জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (২/৩৮০); বাগাওয়ী, তাফসীর মা'আলিমুত তানযীল (২/২৬৭); ইবন আবী হাতেম, তাফসীরুল কুরআনিল হাকীম (৩/১০৩৮), নং ৫৮১৯; ওয়াহেদী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত্ব (২/৯৯); ইবন আতিয়্যাহ, আল-মুহাররারুল ওয়াজীয (২/৯৪); ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (১/৪৫০); নাসাফী, মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাক্বায়িকুত তা'ওয়ীল (১/৩৮৫); আবু হাইয়ান, আল-বাহরুল মুহীত্ব (৪/২৭); তারা সকলে এমতটিকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও অনেক সালাফ থেকে বর্ণনা করেছেন।

২- এখানে 'খুলুদ' শব্দ দ্বারা অনেক দিন থাকা বুঝানো হয়েছে, চিরস্থায়ী হওয়া বুঝানো হয়নি। এজন্য লক্ষ্য করবেন যে, এর পরে 'আবাদান' আসেনি। এ মতটি গ্রহণ করেছেন ইবন আতিয়্যাহ আল-আন্দালুসী, আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীয (১/১০৯-১১০); আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, আন-নাহরুল মাদ মিনাল বাহরিল মুহীত্ব (১/৮৮); আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী, আল-জামে'উ লি আহকামিল কুরআন (১/২৪১); নিযামুদ্দীন আল-কুম্মী আন-নাইসাপুরী, তাফসীর গারায়িবুল কুরআন ওয়া রাগায়িবুল ফুরক্বান (১/২০১); মুস্তাফা আল-মারাগী, তাফসীরুল মারাগী (১/৬৯); মুহাম্মাদ আব্দুহু, তাফসীরুল মানার (১/২৩৪)।

৩- কারও কারও মতে, এ 'খুলুদ' তখনই হবে যখন কেউ হালাল মনে করে তা করার কারণে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে। সাধারণ অবস্থায় নয়। দেখুন, আবুল মু'ঈন আন-নাসাফী, তাবসিরাতুল আদিল্যাহ (২/৭৭৪); ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী, আল-ইরশাদ, পৃ. ৩২৬।

৪- এগুলো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যাদের মধ্যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার মতো অপরাধ ছিল যেমন: কুফরী, শির্কী কিংবা নিফাক্বী। এ মতটি পছন্দ করেছেন, জামালুদ্দীন

আল-কাসেমী, তাফসীরুল কাসেমী (২/১১০)।

৫- যেসব পাপের কারণে 'খুলুদ' জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা ধমকি হিসেবে এসেছে। সুতরাং ব্যাখ্যা করে সেটাকে হালকা না করি, আর তাদেরকে কাফেরদের কাতারেও না ফেলি।

৭৮৩. দীনের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ লাগানো বিদ'আত। এখানে উদ্দেশ্য এমনসব ঝগড়া যা দীনের মধ্যে মানুষের সন্দেহের উদ্রেক করবে। যেমনটি আল্লাহ্ নিষেধ করে বলেছেন, "কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর' এবং কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর', গায়েবী বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বলুন, 'আমার রবই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন'; তাদের সংখ্যা কম সংখ্যক লোকই জানে। সুতরাং সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না এবং এদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন না।" [সূরা আল-কাহাফ: ২২]

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব।" [সূরা আল-হাজ্জ: ০৮] দেখুন, যামাখশারী, আল-কাশশাফ (২/৪৭৯); রাগেব আল-আসফাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ৪৬৭; ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীসে ওয়াল আছার (৪/৩২২); ইবন মানযূর, লিসানুল আরাব (১৫/২৭৮); শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (৩/৩৭৮)।

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন, "কুরআন নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরী"। হাদীসটি যারা তাখরীজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

- আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৬০৩;
- নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ৮০৯৩।
- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৭৯৮৯।
- ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৪৬৪।
- হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/২৪৩)।
- ত্বাবারানী, আল-আওসাত্ব, হাদীস নং ২৪৮৭, ৩৬৬৬, ৪২১২।
- ত্বাবারানী, আল-সাগীর, হাদীস নং ৪৯৬, ৫৭৪। হাদীসটি শাইখ আবু আব্দুর রহমান নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী সহীহ বলেছেন। দেখুন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (১/৩৩); সহীহুল জামে', হাদীস নং ৬৬৮৭, মিশকাতুল মাসাবীহ এর টীকা ২৩৬।

দীনের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ তৈরি নিষেধ হওয়ার ব্যাপারটি আলেমগণ যুগ যুগ ধরে নিষেধ করে এসেছেন। কারণ এর মাধ্যমে দীনের ক্ষতি বৈ উপকার আসে না।

তবে জানা থাকা উচিত কুরআন ও সুন্নাহ'য় যে ঝগড়া নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে,

ক) বাতিল প্রতিষ্ঠার জন্য ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া। যেমন তথাকথিত মুসলিম দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদরা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যকে নিজের মন মতো বা নিজের গুরুদের কথা মতো ব্যাখ্যা করার কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এটা তখন বুঝা যাবে যখন কেউ কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে এমন কোনো কথা বললো যা পূর্বেকার সালাফরা বলেননি অথবা তাদের এসব ব্যাখ্যা কুরআনের অন্য স্পষ্ট আয়াত ও অন্য হাদীসের ভাষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

খ) কুরআন ও হাদীসের আয়াতকে পরস্পর বিরোধী বানানোর প্রবণতা যাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। অনেকেই বর্তমানে সেটা করে থাকে।

গ) কুরআন ও হাদীসের আসা কোনো ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তব কোনো ঘটনা বা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য অযথা কুটতর্কের আশ্রয় নেয়া। যেমন কিয়ামতের আলামত নিয়ে এসে বাস্তব কোনো দৃশ্যপটের সাথে যোগ করে দেয়া।

ঘ) সন্দেহ তৈরি করার জন্য যে বিতর্ক করা হয় তাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন বর্তমান সময়ে

যারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি করার জন্য তর্ক করে, অনুরূপ যারা হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তর্ক করে, তদ্রূপ যারা হাদীসকে বিবেক দিয়ে বিচার করার জন্য তর্ক করে, আর যারা হাদীসকে মুতাওয়াতির ও আহাদ এ দু' নামে এজন্য ভাগ করে যে একটি মানবে আর অপরটি ছাড়বে। বিশেষ করে যারা খবরে ওয়াহিদ অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক মনে করে না। এসব কিছুই নিষিদ্ধ বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত।

দীনের মধ্যে এ জাতীয় কূটতর্ক নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন,

১- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১১৪-১৫০)।

২- ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪৮৩-৫৪৫)।

৩- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৫৪-৭১।

৪- সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ১০০।

৫- ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, লুম'আতুল ই'তিক্বাদ, পৃ. ৩৩।

৬- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩০৯-৩১২)।

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন দীনের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদের উদ্দেশ্য হয় অন্যায়ের ওপর গোঁ ধরে থাকা অথবা যে কোনোভাবে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা অথবা বাতিলকে জয়ী করার প্রবণতা তখনই সেটা নিষিদ্ধ ঝগড়া ও বিবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর শরী'আতে এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং সাবধান করা হয়েছে।

কিন্তু যদি আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় হক্ব প্রতিষ্ঠা করা ও বাতিল দমন করা, তাহলে তাতে নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং কখনো কখনো তা ফরযভাবে নির্দেশিত অথবা মোস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত হবে। দেখুন, ইবন উসাইমীন, শারহু লুম'আতুল ই'তিক্বাদ, পৃ. ১১২।

উল্লেখ্য শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন এখানে যে আলোচনার বৈধতার কথা বলেছেন সেটার প্রতি ইমামগণ ইঙ্গিত করেছেন। তারা বলেছেন, সবধরনের আলোচনাই নিষিদ্ধ ঝগড়ার আওতায় আসবে না। বরং কোনো কোনো ঝগড়া শরী'আত নির্দেশিত, মানদূব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আপনি মানুষকে দা'ওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব্ব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি বেশি জানেন এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।" [সূরা আন-নাহল: ১২৫]

এ বিতর্ক তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তাতে নিম্নলিখিত শর্তগুলোর খেয়াল রাখা হবে:

ক) পুরোপুরি নিজেকে প্রবৃত্তির তাড়না, বিবেকের যুক্তির অপব্যাবহার, গোঁ ধরা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখবে।

খ) অপর পক্ষের সাথে তর্ক করার সময় বিনয় ও নম্রতার ব্যবহার করতে হবে, অহংকার ও গর্ব করা ছেড়ে দিতে হবে, বরং উত্তম পদ্ধতিতেই কেবল তা করতে হবে। তবে যদি অপরপক্ষ অহংকার ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে চেষ্টা চালায় তখন উত্তম পদ্ধতিতে সেটা তুলে ধরা যাবে।

গ) বিতর্কের বিষয় ও বিতর্কের পয়েন্ট কি তা আগেই নির্ধারণ করতে হবে আর তাতে পূর্ণ জ্ঞান রাখতে হবে। সেটা না হলে তা কূটতর্কে পরিণত হয়ে যাবে।

ঘ) বিতর্কের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া, উপকৃত করা উদ্দেশ্য হতে হবে। অথবা দীনের মধ্যে ক্ষতিকর কিছুর অনুপ্রবেশ রোধ করা, দীনের লোকদের কল্যাণ সাধন হতে হবে এর মূল লক্ষ্য।

ঙ) বিতর্কের বিষয়টি মূল্যবান বিষয় হতে হবে, যার প্রভাব ও আমল রয়েছে। শুধু তর্কের জন্য তর্ক, যার কোনো বাস্তব উপকারিতা নেই তা নিয়ে তর্ক করা যাবে না। যেমন খ্রিস্টানরা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের প্রকৃতি, তার লাহূত ও নাসূত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে বহু দলে বিভক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মুসলিমদের মাঝে কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে মাছি বসতো কি না এমন কূটতর্ক শুরু করে।

চ) মৌলিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে, শাখা-প্রশাখার বিষয় নয়, তর্কের সময় নতুন করে বিতর্ককে মোড় ঘুড়িয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া থেকে সাবধান থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে আরও দেখুন, আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৬০-৬৪, ৭০-৭১; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৫৪৫-৫৪৯)।

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله،

আর আমরা বিশ্বাস করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মাঝে যা যা ঘটেছে তাদের বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা হবে।(৭৮৪)

---

৭৮৪. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে,

১- সকল সাহাবায়ে কিরামের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে হবে।

২- তাদের সকলকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৩- তাদেরকে ভালোবাসতে হবে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪- তাদের জন্য সন্তুষ্টির দোয়া করতে হবে।

৫- আর এটা বলতে হবে যে, তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ; কারণ আল্লাহ তাদেরকে নির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেছেন।

৬- তাদের মাঝে যা ঘটেছে এ ব্যাপারে আলোচনা করা বা কোনো মন্তব্য করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে।

৭- তবে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, সাহাবায়ে কিরাম মা'সূম নন। তাদের থেকে ভুল হতে পারে ও হয়েছে।

৮- তাদের মধ্যে যারা ইজতিহাদ করে কিছু করে থাকবেন, যদি তারা সঠিক মতটিতে পৌঁছুতে সক্ষম হয় তবে তাতে তাদের জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে। আর যদি ভুলও করে তাদের জন্য তাতে ইজতিহাদের একটি সাওয়াব রয়েছে।

৯- তাদের ভুলগুলো তাদের নেকের সাগরে একেবারেই হারিয়ে গেছে। সুতরাং সেগুলোর আলোচনা আলাদা করে তুলে ধরে যাবে না, যদি কুরআনের শানে নুযূল বা হাদীসের শানে ওরূদ এর মাঝে এসে যায় তবে সেটাকে নিয়ে বড় আলোচনার সূত্রপাত না করে যতটুকু না হলে আয়াত বা হাদীস বুঝতে অসুবিধা হবে ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

১০- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাদের ব্যাপারে নেক নিয়ত রাখে। তাদের কারো বিরুদ্ধে এতের অন্তরে বিদ্বেষ রাখে না।

১১- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এটাও বলে যে পরবর্তী সময়ে সিফফীন ও জামাল নামক যেসব যুদ্ধ হয়েছে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হকের অধিক নিকটবর্তী ছিলেন।

এর মাধ্যমে তারা শিয়া, খারেজী ও নাসেবীদের মতবাদকে বাতিল বলে বিশ্বাস করে। যারা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে।

শিয়া রাফেযী সম্প্রদায়ের লোকেরা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও আহলে বাইত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ও সীমালঙ্ঘন করে। অপর দিকে তারা হাতে গোনা কয়েকজন বাদে সকল সাহাবায়ে কিরামের সাথে শত্রুতা লালন করে, তাদের গালি গালাজ করে। তারা এ ব্যাপারে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এটাকে দীনের অংশ মনে করে বসেছে। বরং তারা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে মুরতাদ ও কাফের হওয়ার অপবাদ চাপায়। নাউযুবিল্লাহ।

ঠিক তাদের বিপরীতে নাসেবীরা, তারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও আলে বাইতের ব্যাপারে অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষণ করে। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও মু'আওয়িয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর মহব্বতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তাদেরকে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও আলে বাইতের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত করে। বিশেষ করে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বিরুদ্ধে তারা বিষোদগার করে।

আর খারেজী সম্প্রদায়, মতবাদ বর্ণনাকারী গ্রন্থকারগণ তাদের থেকে যা বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে, তারা উসমান, আলী, বিচারকদ্বয়, ত্বালহা, যুবাইর, আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম) এদের সকলকে কাফের বলার ব্যাপারে একমত পোষণ করে।

বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের ওপর যেকোনো প্রকার আক্রমণ করা হলে তা পর্যায়ক্রমে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের বর্ণনা, বুঝ, অনুসরণ ইত্যাদিকে ত্রুটি পূর্ণ করে দিতে পারে। বরং তার মাধ্যমে কুরআনের ব্যাপারেও সন্দেহ দেখা দিবে। এমনকি শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার আনীত দীনের ব্যাপারেও সংশয় তৈরি করবে। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/১০২, ১০৩, ১৫৫, ৪২৯; মিনহাজুস সুন্নাহ (৭/৯)। ইসলামের শত্রুরা এ জন্য এ অংশটুকুকে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে। আর মুসলিমদের মাঝে যারা এ অংশে অকারণে কথা বলেছে তারাই অন্যদের জন্য পথভ্রষ্টতার পথ রচনা করেছে।

এ জন্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, সালাফে সালেহীন এসব ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন, তারা সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর আলোচনা করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতেন। তিনি বলেন, সাহাবীগণের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে যেসব বর্ণনা এসেছে সেগুলোর অবস্থা হচ্ছে,

ক) কোনো কোনোটি একেবারেই মিথ্যা।

খ) কোনো কোনোটিতে বাড়তি কথা ও বক্তব্য সংযোজন করা হয়েছে।

গ) কোনো কোনোটিতে কিছু অংশ বাদ দিয়ে সমস্যাপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

ঘ) কোনো কোনোটিতে কথা তার স্থানচ্যুত করে অন্য রকম করে বর্ণনা দিয়ে দোষে পরিণত করা হয়েছে।

ঙ) আর সেসব বর্ণনার মধ্য হতে যা বিশুদ্ধ তাতে তাদের ওযর রয়েছে। কারণ হয় তারা তাতে

১- ইজতিহাদকারী ছিলেন, আর সে ইজতিহাদে তারা সঠিক মত ও পথটি গ্রহণ করেছেন অথবা

২- তারা ইজতিহাদকারী ছিলেন, কিন্তু ইজতিহাদে ভুল করেছেন। এ ইজতিহাদী ভুলের কারণে তাদের উপর দোষারোপ করা যায় না।

চ) আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, সাহাবায়ে কিরামের কাউকে সগীরা কিংবা কবীরা গুনাহ থেকে মা'সূম বা মুক্ত ও পবিত্র মনে করে না। বরং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, মোটের ওপর তাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হতে পারে (তবে এককভাবে কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে তার কিছু দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে তাকে সমালোচনার পাত্র বানায় না)। বরং তারা মনে করে যে, সাহাবায়ে কিরামের এমনসব পূর্ব সাওয়াব ও আমল রয়েছে, এমনসব ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের থেকে যদি এসব গুনাহের কোনো অনুষ্ঠিতও হয়ে থাকে, তবে তাদের সেসব পূর্ব সাওয়াব ও ফযীলত সেসব গুনাহকে পুরোপুরি ক্ষমা হয়ে যাওয়া আবশ্যক করে তোলে। এমনকি তাদের যেসব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যা পরবর্তীতে আসা অন্যদের বেলায় ক্ষমা করা হবে না। কারণ তাদের এমনসব নেক আমল রয়েছে যা পরবর্তীরা কখনো অর্জন করতে পারবে না। কারণ সাহাবায়ে কিরামের এমনসব নেক আমল জমা রয়েছে তা তাদের সেসব দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দিবে, পরবর্তীদের কাছে এমন কিছু নেই। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন, সাহাবীগণ সর্বোত্তম প্রজন্ম, [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৬৫০, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৫৩৩] (আরও এসেছে,) তাদের কারও এক মুদ্দ (দু' হাতের সমন্বিত অংশে যতটুকু জায়গা হয় সে পরিমাণ) সাদাকা হিসেবে ব্যয় করা পরবর্তীদের পক্ষ থেকে উহুদ পাহাড়ের মত ব্যয় করার চেয়েও উত্তম ও উৎকৃষ্ট। [আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৩৮৩৫]

তারপর তাদের যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়েও থাকে, তবে (তাদের প্রতি সুধারণা হচ্ছে),

১) তারা তা থেকে তারা তাওবা করেছেন।

২) তারা এমনসব নেক আমল করেছেন তা তাদের সেসব ভুল-ত্রুটি মিটিয়ে দিয়েছে।

৩) তাদের পূর্ব কৃত নেক আমলের বিনিময়ে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের কারণে তা ক্ষমা হয়ে যাবে, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হক্বদার।

৫) অথবা দুনিয়ার বুকে এমন কোনো বালা-মুসিবত তারা পেয়েছেন যা তাদের সবকিছুর কাফফারা হয়ে গেছে।

ছ) এ যদি হয়, তাদের থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া বাস্তবে অনুষ্ঠিত (ধরে নেয়া) গুনাহের অবস্থা, তাহলে যেসব ব্যাপারে তারা গুনাহ করেননি, বরং ইজতিহাদ করেছেন (আর তারা প্রকৃতপক্ষেই ইজতিহাদের যোগ্য), সেটার অবস্থা তো আরও স্বাভাবিক। কারণ,

১) তারা যদি সে ইজতিহাদে সঠিক মতে উপনীত হতে পারে তবে দু'টি সাওয়াব।

২) যদি সে ইজতিহাদে তারা ভুল করেন আর সঠিক মতটিতে যেতে না পারেন, তবে একটি সাওয়াব, ভুল-ত্রুটি ক্ষমার্হ্য।

৩) তাদের কারও পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত যে পরিমাণ কাজ দৃষ্টিকটু মনে হয় তা একেবারেই নগণ্য, তা তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান, আল্লাহর পথে জিহাদ, হিজরত, নুসরত (সাহায্য), উপকারী ইলম ও সৎ আমলের যেসব বিশাল ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে তার তুলনায় খুবই সামান্য...।" শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-আকীদাতুল ওয়াসেতিয়্যাহ, পৃ. ১২৯-১৩১।

ونترحم على عائشة ونترضى عليها.

আর আমরা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জন্য রহমতের দো'আ করব ও তার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলবো, রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা।[৭৮৫]

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,
১- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৪/১২৪১-১২৭০)।
২- আশ'আরী, আল-ইবানাহ, পৃ. ১৮, ১০৪-১০৫।
৩- সাবূনী, আকীদাতুল সালাফ, পৃ. ৯৩।
৪- বাইহাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ, পৃ. ১৫৯-১৬৬।
৫- ইবন কুদামাহ, লুম'আতুল ই'তিক্বাদ, পৃ. ৩২।
৬- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১৫২-১৫৬, ৩৭৫, ৪০৫-৪১৪, ৪/৪৩১।
৭- ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/৮১-৮৩)।
৮- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৬৮৯-৬৯৮)।
৯- বাগদাদী, উসুলুদ্দীন, পৃ. ২৮৬-২৯৩।
১০- বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব, পৃ. ৫৫।
১১- ইবন হাযম, আল-ফাসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল (৪/১৩৩)।
১২- আল-মাক্বদেসী, আর-রাদ্দু আলার রাফেদ্বাহ, পৃ. ৮৭-৮৯।
১৩- রাযী, ই'তিক্বাদাতু ফিরাকুল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৪৬।
১৪- দেহলাওয়ী, মুখতাসার আত-তুহফাতুল ইসনা আশারিয়্যাহ, পৃ. ২৩৭।
১৫- আহমাদ ফরীদ, আল-ফাওয়ায়িদিল বাদী'আহ ফী ফাদ্বায়িলিস সাহাবাতে ওয়া যাম্মিস শী'আহ।

৭৮৫. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর মত। এ ব্যাপারে বিরোধিতা করে শিয়া রাফেযী ও খারেজীরা, যারা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাকে গালি দেয়া জায়েয মনে করে বরং তারা এর চেয়েও বেশি মারাত্মক কথাও বলে, তারা তাকে কাফের ও তার প্রতি লা'নতও করে থাকে।
দেখুন, হিল্লী শী'য়ীর এর লেখা, নাহজুল হাক্ব ওয়া কাশফিস সিদক, পৃ. ৭১।
বস্তুত যারাই 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করবে তারা কাফের হয়ে যাবে; কারণ সে কুরআনের ওপর মিথ্যারোপ করেছে, কুরআন তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে আর সে মিথ্যাচার করছে, সে কুরআনের কথা মানতে অস্বীকার করছে। মিথ্যাবাদীরা আম্মাজান আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার ওপর যখন মিথ্যাচার করেছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সাত আসমানের উপর 'আরশের উপর থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং যে কেউ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে খারাপ কোনো কথায় পুনরাবৃত্তি করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না করো'।" [সূরা আন-নূর: ১৭]
ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে কেউ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাকে খারাপ বলবে তাকে হত্যা করা হবে। বলা হলো, কেন? তিনি বললেন, কারণ যে কেউ তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করবে সে কুরআনের বিরোধিতা করলো। কাযী ইয়াদ্ব, আশ-শিফা (২/১১০৯)।
ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্যের ওপর টীকা দিয়ে বলেন, 'মালেকের কথা এখানে বিশুদ্ধ; কারণ আম্মাজান আয়েশার ওপর খারাপ মন্তব্যকারী এর মাধ্যমে পূর্ণভাবে মুর্তাদ হয়ে যাবে, এর মাধ্যমে সে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপকারী হবে যিনি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার পবিত্রতার কথা অকাট্যভাবে ঘোষণা করেছেন।' ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা (১১/৪১৫)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একাধিক ব্যক্তি এ ব্যাপারে ইজমা' বর্ণনা করেছেন, যে কেউ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাকে সেসব অপবাদ দিবে যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, সে কাফের হয়ে যাবে; কারণ সে কুরআনে মিথ্যারোপকারী।' আর-রাদ্দু আলাল বিকরী ,পৃ. ৩৭০; আরও দেখুন, ফাতাওয়া আস-সুবুকী (২/৫৯২)।
যুগ যুগ ধরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ শিয়া-রাফেযী ও খারেজীদের বক্তব্যের খণ্ডন করেছেন। তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, শিয়া-রাফেযী ও খারেজীরা মিথ্যুক, তাদের দাবি

অসার, তাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ বাতিল।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৪/৩০১)।

২- বাগদাদী, উসূলুদ দীন, পৃ. ২৯০-২৯১।

৩- রাযী, ই'তিকাদাতু ফিরাক্বিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৪৬।

৪- মাক্বদেসী, আর-রাদ্দু আলার রাফেদ্বাহ, পৃ. ৯২-৯৫।

৫- দেহলাওয়ী, মুখতাসার আত-তুহফাতুল ইসনা আশারিয়্যাহ, পৃ. ২৬৮-২৭১।

৭৮৬. লাফয ও মালফূয তথা শব্দ ও শব্দের উচ্চারণকৃত আওয়ায, এর অর্থ হচ্ছে, কুরআন যখন কেউ উচ্চারণ করে তখন কিতা সৃষ্ট হয়? নাকি তা অসৃষ্ট? এ মাসআলাটির আরেক নাম 'মাসআলাতুল লাফয'। সর্বপ্রথম এ বিদ'আত চালু করেছে হুসাইন আল-কারাবীসী ও তার ছাত্র দাউদ আল-আসফাহানী। যারা ইমাম আহমাদের যুগের লোক ছিলেন। তারা দু'জন বলতো, কুরআন নিয়ে আমাদের তা উচ্চারণ করা সৃষ্ট। সালাফে সালেহীন তাদেরকে 'লাফযিয়্যাহ' বলতেন। এদের বিপরীতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীসের আরেক গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে যায়, যারা বলতে থাকে, কুরআন নিয়ে আমাদের তা উচ্চারণ অসৃষ্ট। বস্তুত উভয় গোষ্ঠীই এর মাধ্যমে নতুন বিদ'আত চালু করে। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আলেম এভাবে কথা বলাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন। তারা বলতেন, যে কেউ বলবে কুরআন নিয়ে আমাদের তা উচ্চারণ করা সৃষ্ট, সে তো জাহমী সম্প্রদায়ের লোক। আর যে কেউ বলবে কুরআন নিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে তা উচ্চারণ করা সৃষ্ট নয়, সে বিদ'আতী। তার কারণ হচ্ছে এভাবে নিঃশর্তভাবে বলা প্রত্যেকটি কথাতেই ভুলের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে ও বাতিল অনুপ্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে। আর সেজন্যই ইমাম আহমাদ থেকে বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি বলেছেন, যে কেউ বলবে কুরআন নিয়ে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট, সে জাহমী, আর যে কেউ বলবে কুরআন নিয়ে আমার দ্বারা তা উচ্চারণ সৃষ্ট নয়, সে বিদ'আতী।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ একগুচ্ছ আলেমের নাম উল্লেখ করেছেন যারা ইমাম আহমাদের মতো একই বক্তব্য দিতেন এবং এ ধরনের মাসআলার অবতারণা যারা করতেন তাদের খারাপ বলতেন।

যারা বলে 'নিশ্চয় কুরআন নিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে তা উচ্চারণ করা সৃষ্ট' শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাদের নাম উল্লেখ করার পর বলেন, তাদের প্রকৃত কথা জাহমিয়্যাদের কথাই। তিনি আরও বলেন, তাদের বিপরীতে আরেকদল লোক সুন্নাতকে মুল্যায়ন করতে গিয়ে আরেকটি বিদ'আতে পতিত হলেন, এক বাতিলকে আরেক বাতিল দ্বারা প্রতিহত করলেন, এক বিনষ্ট বিষয়কে আরেক বিনষ্ট বিষয় দিয়ে মুকাবিলা করলেন। তারা বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে কুরআন তিলাওয়াত করা সেটা সৃষ্ট কর্ম নয়। আমাদের পক্ষ থেকে কুরআন উচ্চারণ করা সৃষ্ট বিষয় নয়। কারণ এটাই তো সে কুরআন।... অবশেষে তিনি বলেন, তাই ইমাম আহমাদ তাদের কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, যারা বলে, বান্দা কর্তৃক কুরআনের তিলাওয়াত, পাঠ, উচ্চারণ ও আওয়াজ সবই অসৃষ্ট। ইমাম আহমাদ এসব লোকদের পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। যেমনিভাবে তিনি প্রথম পক্ষের (যারা উচ্চারণ ও শব্দকে মাখলূক বা সৃষ্ট বলেছে সেসব) লোকদেরকেও পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন আর এদেরকে (দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে) বিদ'আতী বলে আখ্যায়িত করলেন।' শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৩৫৯)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ 'লাফয' শব্দটি দ্বারা মতভেদের মূল কারণ বর্ণনা করে বলেন, 'লাফয' শব্দটির কখনও কখনও উদ্দেশ্য হয় 'উচ্চারণ করা' যা বান্দার কাজ, আর বান্দার কাজ অবশ্যই সৃষ্ট, সুতরাং যে কেউ মানুষের কাজ বা আওয়াজ ইত্যাদি মানুষের গুণাবলিকে সৃষ্ট নয় বলবে সে বিদ'আতী। আবার কখনও কখনও 'লাফয' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হয় 'মালফূয' বা উচ্চারণকৃত কোনো কিছু, যেমন তিলাওয়াত ও কিরাআত দ্বারা মূল বক্তব্যটিই উদ্দেশ্য হয়, তখন তা তো কুরআনই। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/১৭০)।

তিনি আরও বলেন, 'লফয' শব্দটি মূলত 'মাসদার' বা শব্দ মূল। (অর্থাৎ উচ্চারণ করা)। বলা হয়,

লাফাযা, ইয়ালফাযু, লাফযান। যেমন তিলাওয়াত ও কিরাআত উভয়টিই মাসদার। বলা হয়, তালা, ইয়াতলু, অনুরূপ কারাআ, ইয়াকরাউ।

আবার কখনো কখনো 'লাফয' 'তিলাওয়াত' ও 'কিরাআত' এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হয় সেই বক্তব্যটি যা উচ্চারণ করা হচ্ছে, যা তিলাওয়াত বা আবৃত্তি করা হচ্ছে, যা পড়া হচ্ছে। কেননা মানুষ যখন বলে, 'শব্দ তো অর্থের ওপর প্রমাণবহ' তখন তারা 'শব্দ' দ্বারা কখনো 'মাসদার' শব্দের উৎসমূল (উচ্চারণ করা) অর্থ নেয় না। বরং তাদের উদ্দেশ্য হয় উচ্চারণকৃত বিষয়। আর যখন কেউ অপর কাউকে কথা বলতে দেখে বলে, 'এ শব্দগুলো অনেক সুন্দর' তখন উদ্দেশ্য হয় 'সে যা উচ্চারণ করেছে' (উচ্চারণ করা)। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।" [সূরা ক্বাফ: ১৮] এখানে 'লাফয' দ্বারা উদ্দেশ্য (উচ্চারণের) সে কাজটি। তবে কখনও কখনও উচ্চারণকারী যে শব্দটি উচ্চারণ করেছে সে কথাটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।' মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/১৯৭-১৯৮)।

ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বান্দা কর্তৃক কুরআনের শব্দ উচ্চারণ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোনো আছার আছে বলে আমার জানা নেই, তাবে'য়ীদের থেকেও সেটার কোনো ফয়সালা নেই। কেবল তার কাছ থেকেই এ ব্যাপারে বক্তব্য এসেছে যার কথার দিকেই মানুষ মুখাপেক্ষী, যার কথার মাঝে রয়েছে (সন্দেহ-সংসয় রোগের) আরোগ্য, যার ওপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি, যার অনুসরণে রয়েছে সঠিক পথের দিশা ও হিদায়াত, আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল।' তারপর তিনি ইমাম আহমাদ থেকে উপরোক্ত বক্তব্য, 'যে বলবে, কুরআন নিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে তা উচ্চারণ করা সৃষ্ট জিনিস, সে অবশ্যই জাহমী।' দেখুন, ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী, সারীহুস সুন্নাহ, পৃ. ২৫-২৬; শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৮৭), (১২/৪২৩)।

এখানে একটি জিনিস অবশ্যই বুঝে নিতে হবে যে, কুরআন তিলাওয়াত ও মাতলু অর্থাৎ তিলাওয়াত করা ও তিলাওয়াতকৃত বিষয়, অনুরূপ কুরআনের কিরাআত ও মাকরূও অর্থাৎ পড়া ও পঠিত বিষয় এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। তিলাওয়াত করা ও পাঠ করা অবশ্যই বান্দার কাজ, যা সৃষ্ট। কিন্তু তিলাওয়াতকৃত বিষয় ও পঠিত বিষয় অবশ্যই আল্লাহর বাণী ও তাঁরই কথা; সুতরাং তা অসৃষ্ট বা সৃষ্ট হতে পারে না। কারণ তা আল্লাহর গুণ। সুতরাং যে কেউ বলবে 'কুরআন নিয়ে আমার দ্বারা তা উচ্চারণ করা সৃষ্ট বিষয়' সে যদি এর দ্বারা পঠিত বিষয় উদ্দেশ্য নেয়, তবে তা বাতিল কথা। আর যদি সে উদ্দেশ্য নেয় তার পক্ষ থেকে পাঠের ও তিলাওয়াতের কাজটি তবে তা সত্য কথা। অনুরূপ যে ব্যক্তি বলবে, 'কুরআন নিয়ে আমার পক্ষ থেকে তার উচ্চারণ অসৃষ্ট বা সৃষ্ট নয়' এর দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য হয় পঠিত বিষয় ও তিলাওয়াতকৃত জিনিস, তবে তার কথা সত্য। আর যদি উদ্দেশ্য হয় পাঠ করা ও তিলাওয়াত করা, যা বান্দার কাজ, তবে সেটা বাতিল কথা।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম সেজন্য তার নূনিয়্যাতে বলেন,

وتلاوة القرآن أفعـــال لنا ... وكذا الكتابة فهي خط بنان

لكنما المتلو والمكتوب والـ ... ـمحفوظ قول الواحد الرحمن

والعبد يقرؤه بصـــــوت طيب ... ويضده فهما له صـوتان

أصــواتنا ومدادنا وأداؤنـــا ... والرق ثم كتابـة القرآن

فعليك بالتفصيل والتمييز فالإ ... طلاق والإجمال دون بيان

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ ... ـأذهان والآراء كل زمان

"আর কুরআনের তিলাওয়াত সে তো আমাদের কাজ অনুরূপ তা লেখা সেটা তো আমাদের আঙ্গুলের মাথার কাজ

কিন্তু যা তিলাওয়াত করা হলো, যা লিখিত হলো এবং যা সংরক্ষিত হলো তা তো কেবল একক সত্তা রহমানের কথা

বান্দা সেটাকে সুমিষ্ট মধুর স্বরে পাঠ করে ও পড়ে আবার অসুন্দর স্বরে পড়ে, এসব তো বান্দারই দু'টো আওয়াজ

আমাদের স্বর, আমাদের কালি, আমাদের তা পাঠ অনুরূপ কাগজ তারপর কুরআন লেখা এসবই তো বান্দার কাজ

সুতরাং তোমার ওপর কর্তব্য হচ্ছে বিস্তারিত ও পার্থক্য করা; কারণ বর্ণনা ব্যতীত নিঃশর্ত বা সংক্ষিপ্ত বাক্য দিয়ে বলা

এ দু'টোই তা এ জগতের অনেক কিছু বিনষ্ট করেছে, বিবেককে বিনষ্ট করেছে মতকে বিপর্যস্ত করেছে প্রতিনিয়ত।"

ইবনুল কাইয়্যেম, আন-নূনিয়্যাহ, হাররাসের ব্যাখ্যাসহ (১/১৩৩-১৩৪)।

কিন্তু যেহেতু এখানে 'কুরআন নিয়ে তার উচ্চারণ করা সৃষ্ট নয় বা সৃষ্ট' এভাবে নিঃশর্তভাবে বলার মধ্যে হক ও বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে তাই ইমামগণ এ ধরনের সন্দেহপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখতে পারেন,

১- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১৬৩-১৬৬)।
২- আবু দাউদ, মাসায়িলি ইমাম আহমাদ, পৃ. ২৬৪-২৬৫।
৩- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/৩৪৯-৩৬২)।
৪- সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ৯-১৩।
৫- আজুররী, আশ-শারী'আহ, পৃ. ৮৯-৯৬।
৬- ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (১/২৫৭-২৭৮)।
৭- ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৭০, ৩০৭, ৩৫৯, ৩৬৩, ৩৭৩, ৪২১, ৪৩৩, ৫৪১, ৫৬৭, ৫৭১, ৫৭৪; ১৭/৩৫।
৮- ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/৩০৬-৩১৭)।
৯- ইবন হাযম, আদ-দুররাতু ফীমা ইয়াজিবু ই'তিকাদুহু, পৃ. ২৫৮।
১০- হাফেয হেকামী, মা'আরিজুল কবুল (১/২৫৩-২৫৪)।
১১- আব্দুল্লাহ জুদাই', আল-আকীদাতুস সালাফিয়্যা..., পৃ. ২০১-২৬০।
১২- বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ।
১৩- ইবন কুতাইবাহ, আল-ইখতিলাফু ফিল লাফযি ওয়ার রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়াল মুশাব্বিহা।

৭৮৭. 'আল-ইসম ওয়াল মুসাম্মা' এ মাসআলাটি নিয়ে অনেক মতভেদ হয়েছে, এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ ঘটেছে। তবে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে যে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীনে ইযামের যুগে এ বিষয়টির সূত্রপাত হয়নি। এটিও পরবর্তীকালের লোকদের আবিষ্কার। জাহমিয়্যারা বলতো, 'ইসম আর মুসাম্মা এক নয়'। যার অর্থ হচ্ছে নাম ও নামকৃত জিনিস এক নয়, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর নামসমূহকে আল্লাহ থেকে আলাদা কিছু সাব্যস্ত করা। আর যা আলাদা হবে তা তো মাখলূক হবে, সুতরাং আল্লাহর যাবতীয় নাম মাখলূক হবে। এভাবেই তারা সিদ্ধান্ত দেয় যে আল্লাহর বাণী মাখলূক বা সৃষ্ট আর তাঁর নামসমূহও মাখলূক বা সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো বাণী দিয়ে কথা বলেননি যা তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, আর তিনি নিজেকে এমন কোনো নামেও নামকরণ করেননি যা দ্বারা কথা বলা হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, জাহমিয়্যারা আল্লাহর নামসমূহকে আল্লাহর বাণীর একটি প্রকার হিসেবে ধরে নিয়েছে। আর যেহেতু আল্লাহর বাণী তাদের কাছে সৃষ্ট, আল্লাহর সত্তার সাথে তা সম্পৃক্ত নয়, সুতরাং আল্লাহর নামও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত নয়।

এ হচ্ছে জাহমিয়্যাদের বক্তব্য। আমাদের ইমামগণ জাহমিয়্যাদের এসব বক্তব্যের নিন্দা করেছেন। ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আসমা'ঈ থেকে বর্ণিত আছে, তারা বলেছেন, যখন তুমি দেখবে কোনো লোক বলছে, "নাম আর নাম রাখা বস্তু এক নয়" তখনি তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে যে, সে একজন যিন্দীক।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা বলে 'আল্লাহর নাম আল্লাহ থেকে ভিন্ন কিছু' তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেহেতু ভিন্ন কিছু সেহেতু তা সৃষ্ট। সালাফে সালেহীন তাদের নিন্দা করেছেন, তাদের ব্যাপারে কঠোরতা দেখিয়েছেন; কারণ আল্লাহর নামগুলো তাঁর বাণীরই অংশ; আল্লাহর বাণী অসৃষ্ট। বরং তিনি সেটা দিয়ে কথা বলেছেন, তিনি নিজেই নিজেকে এসব নাম দিয়ে নামকরণ করেছেন। আর যদি কেউ এটা বলে যে, নাম আর নামকৃত বিষয় ভিন্ন জিনিস, তখন যদি এর দ্বারা সে এটা উদ্দেশ্য নেয় যে, নামসমূহ যা 'কিছু কথা' (ক্রিয়া), এগুলো দ্বারা নামকৃত সত্তা উদ্দেশ্য নয়, তখন

কোনো বিবেকবান মানুষ এ কথার সত্যতা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় তাদের বক্তব্য 'নাম আর নামকৃত জিনিস এক নয়' এর মধ্যকার 'নাম' দ্বারা 'কিছু কথা' (ক্রিয়া) উদ্দেশ্য নেয় না। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আল্লাহর নামসমূহ' তো আল্লাহ নন। এর মাধ্যমে আল্লাহর নামগুলোকে ভিন্ন কিছু সাব্যস্ত করার পর সেগুলোর 'সিফাত' হওয়া অস্বীকার করা। কারণ সত্তা থেকে আলাদা হলে সেটা তো আর সিফাত হতে পারবে না। কারণ জগতের সকলেই বলে, গুণ কখনো সত্তা থেকে আলাদা হয় না।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে থাকে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব যেমন, আবু বকর আব্দুল আযীয, ইমাম লালেকাঈ, ইমাম বাগাওয়ী প্রমুখ, আর যা ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর একটি মতও বটে, তারা বলেন, 'ইসম ও মুসাম্মা' তথা নাম ও নামকৃত বস্তু একই। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য এটা বলা নয় যে, এসব বর্ণ যা দিয়ে নামটি তৈরি হয়েছে তাই নাম রাখা ব্যক্তি। কারণ এমন কথা কোনো বিবেকবান মানুষ বলবে না। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে এটা বলে তাদের ওপর দোষারোপ করা যায় না যে, যদি 'ইসম ও মুসাম্মা' তথা নাম ও নামকৃত বস্তু একই হতো তাহলে তো 'আগুন' বললেই জিহ্বা পুড়ে যেতো।

অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণের মত হচ্ছে এটা বলা যে, নাম মূলত নামকৃত বস্তু বা ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়, নাম ব্যক্তির জন্য প্রমাণ ও চিহ্নস্বরূপ। বস্তুত তাদের এ বক্তব্য কুরআন, হাদীস ও বিবেকের যুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮০] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "তোমরা যেভাবেই ডাক, তার জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ।" [সূরা আল-ইসরা: ১১০] অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর জন্য রয়েছে নিরানব্বইটি নাম' [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৭৩৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৬৭৭] আরও বলেছেন, "আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি 'মুহাম্মাদ', আমি 'আহমাদ', আমি 'আল-মাহী' আমার দ্বারা আল্লাহ কুফর ও শির্ককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি 'আল-হাশির' আমার চারপাশে মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আক্বিব (সর্বশেষে আগমনকারী)।" [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৫৩২; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৩৫৪] এসব স্থানে 'ব্যক্তির জন্য নাম' এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর জন্য... রাসূল বলেছেন, আমার জন্য...। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, নাম ব্যবহৃত হবে নামকৃত বস্তুর জন্য। এভাবেই বলতে হবে। তাই এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, নাম কি নাম রাখা বস্তুই নাকি অন্য কিছু? তাহলে তার জবাবে কেউ কেউ বলেছেন, নাম আর নামরাখা জিনিস একই। আবার কারও কারও মতে, নাম আর নাম রাখা জিনিস এক নয়।

এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, নাম মূলত নাম রাখা ব্যক্তি বা বস্তু বা বিষয়ের জন্য, এভাবে উত্তর প্রদান করা। নিঃশর্তভাবে নামকে নামকৃত বস্তু কিংবা নামকৃত বস্তু নয় এমনভাবে বলা যাবে না। বরং বিষয়টিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে বলতে হবে।

কেননা, কখনও কখনও নাম বলতে নামকৃত বস্তুকে বুঝানো হয়, আবার কখনো কখনো সে বস্তুর ওপর ব্যবহৃত শব্দটিকে বুঝানো হয়, সুতরাং যখন বলা হবে: (কুরআন হচ্ছে রহমানের বাণী), তখন সেখানে নাম বলে নামকৃত সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। আর যখন বলা হবে: (রহমান একটি আরবী নাম), তখন সেটা নামকৃত বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, (নামকৃত সত্তা বা বস্তু নয়)।

আর 'নাম' সম্পর্কে কখনও বলা হবে না যে, তা 'নামকৃত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু'; কারণ 'অন্যকিছু' শব্দটিতে অস্পষ্টতা রয়েছে। যদি 'অন্যকিছু' দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শব্দ ও অর্থ ভিন্ন দুটি পরিভাষা, তবে সেটা হক্ব। কিন্তু যদি 'অন্যকিছু' দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর নাম তাঁর থেকে আলাদা কোনো কিছু, আর মহান সত্তা তখনও ছিলেন যখন তাঁর নাম ছিল না, তারপর তিনি তাঁর নিজের জন্য কিছু নাম সৃষ্টি করেছেন, তবে সেটা বাতিল।

বস্তুত উত্তম হচ্ছে এ মাসআলার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়া; যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে, আর যেমনটি ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী বলেছেন; কারণ তা একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্য শব্দ, ব্যাখ্যা ব্যতীত বলা হলে বিদ'আতীরা বাতিল অর্থে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাছাড়া সালাফে সালেহীন এ জাতীয় বিদ'আত সংশ্লিষ্ট মাসআলায় কথা বলেননি।

আলেমগণের একটি বিরাট অংশ এ মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা অপছন্দ করেছেন; কারণ এতে সংক্ষিপ্ত ও সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদির অনুপ্রবেশের সুযোগ রয়েছে, তাতে হক ও বাতিল উভয় প্রকার

অনুরূপভাবে ঈমানকে সৃষ্ট কিংবা অসৃষ্ট বলা বিদ'আত।(৭৮৮)

ব্যাখ্যা করার অবস্থা তৈরি হয়।
ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী বলেন, "আর নামের ক্ষেত্রের এটা বলা যে, নাম সেটা কি নামকৃত বস্তু নাকি অন্য কিছু? এটি নব আবিষ্কৃত আহমক্বী কথা, যাতে পূর্বকালের লোকদের থেকে এমন কোনো আছার পাওয়া যায় না যার অনুসরণ করা যাবে, অনুরূপ এমন কোনো ইমামের বক্তব্যও পাওয়া যায় না যা শোনার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং এ ধরনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অপমানজনক, এ ব্যাপারে চুপ থাকা মর্যাদাপূর্ণ কাজ। একজন মানুষের ইলম ও আমলের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে মহান আল্লাহর বাণীর কাছে গিয়ে নিজেকে থামিয়ে দিবে, যিনি সত্যবাদী, আর তা হচ্ছে, "বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাক বা 'রাহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। আর আপনি সালাতে স্বর খুব উচ্চ করবেন না আবার খুব ক্ষীণও করবেন না; বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন।" [সূরা আল-ইসরা: ১১০] অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক; আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর; তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮০]"
এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,
১- তাবারী, সারীহুস সুন্নাহ, পৃ. ২৬-২৭।
২- উসমান আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলা বিশর আল-মিররীসী (১/১৫৮)।
৩- ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৮৫-২১২), (১২/৬৭-৬৯, ২৮০-২৮৩), (১৬/৩২৩)।
৪- ইবনুল কাইয়্যেম, বাদায়ি'উল ফাওয়ায়িদ (১/২৮-৩৩); শিফাউল 'আলীল, অধ্যায় নং ১৬।
৫- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১০২)।
৪- রাযী, শারহু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, পৃ. ২১-২৯।
৫- আল-গাযালী, আল-মাকসাদুল আসনা, পৃ. ২৪-৩৯।
৬- আল-জুওয়াইনী, আল-ইরশাদ, পৃ. ১৪১-১৪২।
৭- আল-বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ২৫৮-২৬১।
৮- আল-বাগদাদী-উসূলুদ্দীন- ১৪৪-১১৫।

৭৮৮. এ মাসআলাটিও আগের দু'টি মাসআলার মতোই। আমরা জেনেছি যে কেন 'লাফযী বিল কুরআনি মাখলূক বা গাইরি মাখলূক' এ মাসআলা এবং 'নাম কি নামকৃত বিষয় নাকি অন্য কিছু' এ মাসআলার উৎপত্তি কখন এবং কেন হয়েছিল। ঠিক একই পরিস্থিতিতে আরেকটি মাসআলার উদ্ভব ঘটে, আর তা হচ্ছ ঈমান কি সৃষ্ট নাকি অসৃষ্ট?
এ মাসআলাতেও সাধারণ নিয়মেই একদল এর পক্ষ নিয়ে বললো, ঈমান মাখলূক বা সৃষ্ট, যার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলা ঈমান সংক্রান্ত যা কিছু বলেছেন সেগুলো তার বাণী নয়। যেমন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এটি তার বাণী নয়। নাউযুবিল্লাহ। তাদের এ কথার দাবি হচ্ছে 'এ কালেমাটি সৃষ্ট', আল্লাহ এ কালেমাটি বলেননি বা উচ্চারণ করেননি। সেজন্য ইমাম আহমাদ যারা এ কথা বলে তাদেরকে বিদ'আতী বলেছেন।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ মাসআলাটির অবতারণার পর বলেন, "এসব বক্তব্য সবই বিদ'আতী ও নব আবিষ্কৃত বিষয়। সালাফে সালেহীন এ বিষয়ে কিছু বলেননি। এগুলো সবই শরী'আতের দিক থেকে ও বিবেকের যুক্তির দিক থেকে বাতিল।.. তারপর তিনি আলোচনার শেষাংশে বলেন, কেউ যদি বলে ঈমান কি সৃষ্ট নাকি অসৃষ্ট? তাহলে বলা হবে, বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সে এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছে আর ঈমান বলতে কী বুঝিয়েছে? যদি সে ঈমান বলতে আল্লাহর কোনো গুণাবলিকে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে যেমন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং আল্লাহর নাম 'আল-মুমিন' যে ঈমানকে বুঝাচ্ছে সেটা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে তবে সেটা অবশ্যই অসৃষ্ট বা সেটাকে সৃষ্ট বলা যাবে না। আর যদি উদ্দেশ্য নেয়া হয় বান্দাদের কোনো কর্ম ও তাদের গুণাবলি, তবে বান্দারা সবই সৃষ্ট, আর তাদের সকল কর্ম ও গুণাবলিই সৃষ্ট। বান্দা নতুন করে সৃষ্ট হওয়ায় তার কাছে আল্লাহর কোনো গুণাবলি যা অসৃষ্ট তা থাকা সম্ভব নয়।" দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৬৫৫-৬৬৫)।

واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملاً من غير استقصاء؛ إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر «عقود أصحابنا المتصوفة» فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرَّصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك.

[أقوال بعض أهل التصوف والرد عليهم] :

إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه «التبصير» كتب بذلك إلى أهل

আর জেনে রাখ, আমি সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীনে ইযামের কাছ থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের যে আকীদাহ্ এসেছে তা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করলাম, এখানে আমি সকল কিছু বিস্তারিত নিয়ে আসিনি। কারণ আগেই আমাদের বিখ্যাত শাইখগণের বক্তব্য এ ব্যাপারে চলে গেছে, যারা ছিলেন সঠিক মত প্রকাশকারী ও দীনদার ব্যক্তিত্ব। তবে আমি চেয়েছি 'আমাদের তাসাওউফের লোকদের আকীদাহ' উল্লেখ করতে, কারণ একদল ধারণাপূর্ণ কথার বশবর্তী হয়ে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করে এমন সব বিষয়াদি বলে বেড়াচ্ছে যা থেকে আল্লাহ এ মাযহাব[৭৮৯] ও তার লোকদেরকে পবিত্র করেছেন।

[কোনো কোনা তাসাওউফপন্থীদের কিছু মত ও খণ্ডন]

শেষে [ইবন খাফীফ] বলেন, আর আমি মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-ত্বাবারীর[৭৯০]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের মধ্য হতে যারা ঈমানকে সৃষ্ট বলেছেন, যেমন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন নসর আল-মারওয়াযী প্রমুখ, তারা কেউ এর দ্বারা আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি উদ্দেশ্য নেননি। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য বান্দার কর্মকাণ্ড। আর মুসলিমগণের সকল ইমাম একমত যে, বান্দার কর্ম সবই সৃষ্ট। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি সর্বদা আমাদের সাথী-সঙ্গীদের বলতে শুনেছি যে, বান্দার কর্মকাণ্ড সবই সৃষ্ট।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, 'কিছু মানুষ এ ব্যাপারে ভুল করে মনে করে থাকে যে, ইমাম বুখারী ও অন্যান্য কিছু ইমাম তারা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও সুন্নাতের ইমামদের বিরোধিতা করেছেন, তারা এটাও মনে করে থাকে যে এর জন্য ইমাম বুখারীকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে...।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/৬৮৫)।

এ ব্যাপারে আরও দেখুন, আবু ইয়া'লা, মাসায়িলুল ঈমান, পৃ. ৪৫৯-৪৬০; মাতুরিদী, আত-তাওহীদ, পৃ. ৩৮৫-৩৮৮।

৭৮৯. অর্থাৎ সূফী মতাদর্শের অনুসারী লোকদের। এখানে 'ইবন খাফীফ' নিজে সূফী মতাদর্শের হওয়া সত্ত্বেও সূফী মতাদর্শে যারা দর্শন, কালাম, বিদ'আত ও খারাপ বিশ্বাস প্রবেশ করিয়েছে তাদের তিনি নিন্দা করেছেন। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, সূফীদের মধ্যে ইবন খফীফ প্রচলিত সূফীদের বিবিধ বিদ'আত ও বিতর্কিত বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা থেকে নিরাপদ ছিলেন।

৭৯০. তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন জারীর ইবন ইয়াযীদ ইবন কাসীর, আবু জা'ফর আত-ত্বাবারী। ত্বাবারিস্তানের লোক। বড় ইমামদের একজন, তাফসীর ও তারীখে সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল। বিভিন্ন ইলমে যার রয়েছে সঠিক পদচারণা, হক্ব কথার প্রবক্তা, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারের তিরস্কারের পরোয়া করা থেকে মুক্ত। খত্বীবে বাগদাদী তার প্রশংসায় যা বলেছেন, তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর। তিনি বলেন, "তিনি ছিলেন, একজন ইমাম ও আলেম। তার কথা দিয়ে বিচার করা যায়, তার জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তার মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, তিনি এমন সব

একটি কিতাব পড়েছি, যা তিনি 'আত-তাবসীর'(৭৯১) নামকরণ করেছেন। সেটা তিনি

জ্ঞান একত্রিত করেছিলেন যাতে তার যুগের কেউ তার সাথে শরীক ছিল না। আল্লাহর কিতাবের হাফেয ছিলেন, কিরাআতশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন, কুরআন ও হাদীসের অর্থের ব্যাপারে সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী ছিলেন, কুরআনের বিধি-বিধানের গভীর জ্ঞানী ছিলেন, হাদীস ও তার সূত্রাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, জানতেন সেগুলোর মধ্যকার বিশুদ্ধ ও দুর্বল, নাসেখ ও মানসূখ। আরও জানতেন বিধি-বিধান ও হালাল-হারাম সংক্রান্ত মাসআলায় সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ী, তাদের পরবর্তী আলেমগণের মতামত। আরও জানতেন মানুষের জীবনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সংবাদ ও খবরসমূহ তথা ইতিহাস সম্পর্কে।"

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী রাহিমাহুল্লাহকে তাফসীর গ্রন্থকারদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মানিত ব্যক্তি মনে করতেন, যেমনটি তিনি তার মাজমু' ফাতাওয়া (১২/৫৯) পৃষ্ঠায় বলেছেন। তিনি অন্যত্র এ তাফসীরকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ তাফসীর বলেও আখ্যা দিয়েছেন। আর বলেছেন, এ তাফসীরে বিদ'আত নেই, তিনি এ তাফসীরে কোনো মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা করেননি। তিনি এটাকে 'আত-তাফসীর আল-কাবীর' বা বড় তাফসীর বলতেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/৩৬১, ৩৮৫); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৩৫)।

আর ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও গ্রন্থ প্রণয়নে তার যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানুষের চোখ তার মতো এমন লোক কমই দেখেছে।

তার সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, ইমাম ইবন জারীর ছিলেন পূর্ণ মানুষদের একজন। তার ওপর সামান্য শিয়াবাদের দোষ ধরা হয়, তবে আমরা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। কেউ কেউ বলেন, তিনি পায়ের ওপর মাসেহ করা জায়েয মনে করতেন, অবশ্য আমরা সেটা তার গ্রন্থে দেখিনি।

তার জন্ম ছিল হিজরী ২২৪। আর মৃত্যু ছিল হিজরী ৩১০ সালে।

তার লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে, জামে'উল বায়ান, যা ত্রিশ খণ্ডে ছাপা হয়েছে যার সম্পর্কে ইবন তাইমিয়াহ'র মত কিছু আগে আমরা তুলে ধরেছি। অনুরূপ তার গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাহযীবুল আসার, তার কিছু অংশ পাওয়া গেছে যা কয়েক খণ্ডে বের হয়েছে। তার তারীখ, যা তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক নামে প্রসিদ্ধ, যা ১১ খণ্ডে বের হয়েছে। তাছাড়া তার 'সরীহুস সুন্নাহ' গ্রন্থটি আকীদাহ'র ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (২/১৬২); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/১৯১); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৭১০); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/২৬৭); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/২৬০)।

৭৯১. গ্রন্থটি 'আত-তাবসীর ফী উসুলিদ দীন, যেমনটি সুবুকী নামকরণ করেছেন, বা আত-তাবসীর ফী মা'আলিমিদ দীন নামে বিখ্যাত। শেষোক্ত নামেই তা শাইখ আলী ইবন আব্দুল আযীয আশ-শিবল এর তাহক্বীকে ছাপা হয়েছে। দারুল আসেমাহ, ১৪১৬ হিজরী। কারও কারও মতে গ্রন্থটির নাম আত-তাবসীর ফিল উসূল। এ গ্রন্থটি আলেমগণের গুরুত্বের জায়গায় পরিণত হয়। ফলে এ গ্রন্থ থেকে অনেকেই উদ্ধৃতি এনেছেন, তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন,

১- আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৪৮)।
২- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৯৫।
৩- যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১২০৮), নং ৪৮৪; তাযকিরাতুল হুফফায (২/৭১৩); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/২৭৩)। এখানে তিনি বলেন, এটি ছিল ত্বাবারিস্তানের লোকদের কাছে পাঠানো তার একটি পুস্তিকা, যাতে তিনি উসূলুদদীন তথা আকীদার ক্ষেত্রে কী আকীদাহ পোষণ করেন তা ব্যাখ্যা করেছেন।
৪- তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৩/১২১)।
৫- আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত (২/২৮৪)।

طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى؛ فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة.

ত্বাবারিস্তানের(৭৯২) লোকদের জন্য লিখে পাঠিয়েছিলেন, যখন তাদের মাঝে এসব ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়, আর তারা তাঁর কাছে চেয়েছিল যেন তিনি এসব বিষয়ে কী আকীদাহ পোষণ করেন এবং কোন মতের পক্ষ অবলম্বন করেন সেসব নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তিনি সে কিতাবে 'আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে মানুষের মতভেদ তুলে ধরেছেন; সেখানে তিনি একদল থেকে উল্লেখ করেছেন যে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহকে দেখার পক্ষে মত দিয়েছেন(৭৯৩),

---

৭৯২. ত্বাবারিস্তান বর্তমানে ইরানের পূর্বদিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশের একটি অঞ্চল এবং রাই শহরের একটি অংশ। ফারসীতে 'ত্বর' শব্দের অর্থ কুড়াল, আর স্তান হচ্ছে স্থান। কারণ সেখানে প্রচুর গাছ ছিল, যা কাটার জন্য কুড়াল ব্যবহৃত হয়েছিল।

৭৯৩. দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার দাবি করে থাকে সূফীদের একটি গোষ্ঠী। বিশুদ্ধ আকীদাহ'র কেউ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে দেখার দাবি করে না।
এখানে ইবন জারীর আত-তাবারী রাহিমাহুল্লাহ যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে,
'একদল তাসাওউফপন্থী লোক, যাদের অন্যতম হচ্ছেন বকর ইবন উখতি আব্দিল ওয়াহেদ, তারা বলে থাকে যে, 'মহান আল্লাহকে দুনিয়া ও আখেরাতে দেখা যায়, তারা আরও মনে করেছে যে, তারা আল্লাহকে দেখেছে, আর তারা যখন ইচ্ছা তাঁকে দেখতে পায়, তবে তারা মনে করে এ দেখা কেবল আল্লাহর বন্ধুদের জন্য সীমাবদ্ধ, শত্রুরা তা অর্জন করতে পারে না।'
'তাদের মধ্যে আরেকদল বলে, তাঁকে বন্ধু ও শত্রু সকলেই দুনিয়া ও আখেরাতে দেখতে পায়, তবে ওলী বা বন্ধু তাঁকে দেখার পর সেটার ওপর স্থির থাকতে পারে, কারণ তিনি তাঁকে এমন সূরতে দেখেন যা দেখার পর তিনি তাঁকে চিনতে পারেন; কিন্তু শত্রু তাকে দেখার পর স্থির থাকে না।' দেখুন, আত-তাবসীর ফী মা'আলিমিদ দীন, পৃ. ২১৭-২১৯।
ইবন জারীর তাবারীর পক্ষ থেকে এ ভাষ্যে তিনি সকল সূফীকে এ বক্তব্যে অধীন করেননি। তিনি কেবল তাদের মধ্যকার একটি দলকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অবশ্য এর বিপরীতে অনেক সূফী তাদের মুহাক্কিকদের ইজমা' বা ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়াতে দেখা যাবে না। এতে ইবন জারীর আত-ত্বাবারীর কথার সাথে একাত্মতা রয়েছে। তাই উভয় মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; কারণ ইবন জারীর ত্বাবারী তো দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার এ মতটিকে কেবল তাদের একটি খারাপ গোষ্ঠীর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি তাদের নামও বলেননি। যদি তারা তাসাওউফের বড় কোনো নেতা বা মুহাক্কিক কেউ হতেন তবে তিনি তার নাম উল্লেখ করতেন। আল্লাহই ভালো জানেন।
আবু বকর আল-কালাবাযী (মৃত ৩৮০ হিজরী) বলেন, 'আর তাসাওউফের ইমামগণ একমত যে, আল্লাহকে দুনিয়াতে চর্মচোখে দেখা যাবে না। অনুরূপ কলব দিয়েও নয় তবে ইয়াকীন বা দৃঢ়তার দিক থেকে (তা সম্ভব); কারণ আল্লাহকে দেখার বিষয়টি কারামাত তথা সম্মানিত করার শেষ সীমা, নি'আমতের দিক থেকে উৎকৃষ্টটি। তাই সেটি কেবল সর্বোত্তম স্থানেই হওয়া সম্ভব, যদি দুনিয়াতেই সে শ্রেষ্ঠ নি'আমতটি দেয়া হয়ে যেত, তাহলে নশ্বর দুনিয়া ও জান্নাতের মধ্যে পার্থক্য থাকতো না। আর তিনি তা তাঁর নবী মূসা কালীমুল্লাহকে দুনিয়ায় তা দেয়া থেকে মানা করতেন না। সুতরাং তাঁর থেকে যারা নিম্ন পর্যায়ের রয়েছে তারা তাঁকে দুনিয়াতে দেখার প্রশ্নই আসে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, দুনিয়া হচ্ছে ধ্বংসশীল জগত, তাই অনন্ত সত্তাকে এ ধ্বংসশীলে দেখা যেতে পারে না। যদি তারা দুনিয়াতেই তাঁকে দেখতে পেতো তবে তো আবশ্যকীয়ভাবে সবাই ঈমান আনতো। মোটকথা: আল্লাহ তা'আলা জানেয়েছেন যে, তাঁকে আখেরাতে দেখা যাবে, তিনি জানাননি যে এ দেখা দুনিয়াতে হবে। সুতরাং আল্লাহ যা সংবাদ দিয়েছেন সেখানেই থেমে যাওয়া কর্তব্য।'... অবশেষে বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়াতে দেখা যাবে, বা সৃষ্টির কেউ তাঁকে দেখেছেন, এটা এ দলের বিখ্যাত কাউকে তথা মুহাক্কিকদের কোনো ব্যক্তিকে বলতে শুনিনি, না তাদের কোনো কিতাবে দেখেছি, না তাদের

ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول. بعد أن ادعى على الطائفة. ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين؛ فكيف بابن أخته.

তিনি এ মতটি সকল সূফীদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, তাদের একটি গোষ্ঠীর দিকে বিশেষিত করেননি। এর দ্বারা প্রকাশ পেল যে, এটা (তাসাওউফের) মুখলিস বা মুহাক্কিক (সত্যনিষ্ঠ) লোকদের মতামত সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কারণেই হয়েছে। আর তিনি উপরোক্ত বক্তব্যকে সূফীগোষ্ঠীর বক্তব্য বলে দাবির পর আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যায়েদ[৭৯৪] এর বোনের ছেলের[৭৯৫] দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ আল্লাহ ভালোই জানেন মুখলিস (অর্থাৎ সূফী)দের মাঝে এ (আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যায়েদ) লোকটির মর্যাদা কেমন[৭৯৬], তাহলে তার বোনের ছেলে কেমন হবে!

কোনো গ্রন্থে পেয়েছি, না তাদের কোনো পুস্তিকাতে লিখিত আছে বলে পড়েছি, না তাদের কাছ থেকে আসা বিশুদ্ধ কোনো কাহিনীতে জেনেছি, আর না তাদের মধ্য থেকে যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের কাছ থেকে শুনেছি। তবে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী এমন কথা দাবি করতে পারে, যাদের খুব পরিচিতি নেই। দেখুন, আত-তা'আররুফ লি মাযাহিবিত তাসাওউফ, পৃ. ৪৩-৪৪।

৭৯৪. আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যায়েদ, আবু উবাইদাহ আল-বসরী। আবেদ, যাহেদ ছিলেন। তবে তিনি মাতরূকুল হাদীস তথা তার বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান ও আত্বা ইবন আবী রাবাহ থেকে। সূফীদের বড় শাইখদের একজন। ওয়াজ করতেন, তবে তার ওপর কাদারিয়া হওয়ার দোষারোপ করা হয়। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীসকে মুহাদ্দিসরা ভিত্তিহীন হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। ১৫০ হিজরীর পরে মারা যান। ইবন হিব্বান বলেন, তার ওপর ইবাদত করা প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে হাদীস সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করতেন না, তাই তার হাদীসে বহু অগ্রহণযোগ্য জিনিস ঢুকে পড়ে। আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন, আব্দুল ওয়াহেদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তবে তিনি দো'আ করেছিলেন যেন ওযুর সময় সেটা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তাই যখন ওযুর সময় হতো তখন তিনি চলতে পারতেন, আবার যখন নিজ বিছানায় যেতেন তখন আবার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যেতেন। যাহাবী বলেন, তিনি আমর ইবন উবাইদকে তার মু'তাযিলিপনার কারণে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তিনি বান্দার কর্ম অর্জনকে বিশুদ্ধ বলতেন। তবে তিনি খুব বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। বরং তিনি কেবল তাসাওউফের মতামত প্রদান করতেন, একদল লোক তার অনুসরণ করতো।
দেখুন, আবু হাতেম, আল-মাজরূহীন (২/১৫৪); আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৬/১৫৫); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/২৮২); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/১৭৮); মীযানুল ই'তিদাল (২/৬৭২)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সূফীবাদের উৎপত্তি সর্বপ্রথম বসরায় হয়েছিল আর সর্বপ্রথম সূফীদের খানকা তৈরি করেছিল আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যাইদের কোনো কোনো সাথীরা। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৬)।

৭৯৫. আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যায়েদ এর বোনের ছেলে সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তার নাম 'বকর'। তার দিকে তাসাওউফের একটি গোষ্ঠী নিজেদের সম্পৃক্ত করে থাকে, যাদেরকে 'বিকরিয়্যাহ' বলা হয়। তার থেকে মারাত্মক সব আজেবাজে কথা বর্ণিত আছে। যেমন সে বলতো, কিবলার অনুসারীদের যত কবীরাগুনাহ সবই মুনাফেকী। আরও বলতো, কিবলার অনুসারী সালাত আদায়কারী কবীরা গুনাহকারী শয়তানের ইবাদত করে, আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, তাঁকে অস্বীকার করে, সে মুনাফিক হিসেবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে জায়গা হবে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে যদি কবীরা গুনাহ বারবার করে মারা যায়। আর তার অন্তরে মহান আল্লাহর জন্য কোনো সম্মান ও মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না, তারপরও সে মুমিন মুসলিম কথিত হবে ইত্যাদি যত বাজে বক্তব্য। দেখুন, আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২৮৬, ৪৫৭; ইবন হাযম, আল-ফাসলু... (৩/১২৮), (৪/১৮৬); বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব, পৃ. ২০০; ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (২/৬০)।

৭৯৬. ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী বলেন, আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যায়েদ এর সাথীরা বলতো, আল্লাহ

وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولاً في الفقه، أو لبّس فيها حديثًا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.

واعلم أن ألفاظ «الصوفية» وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم، ومرموزات وإشارات تجرى فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق، ونازل ما هم عليه، رجع عنهم خاسئًا وهو حسير.

ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون: رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف

বস্তুত কোনো পথহারা তার গোষ্ঠীর মাঝে নতুন কোনো কথা চালু করলেই তা তাদের সবার দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না। যেমনিভাবে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্য হতে কেউ ফিকহে কোনো কথা নতুন করে বললে, অথবা কোনো হাদীসে উল্টা পাল্টা করলে তা সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিসের দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না।

আর জেনে রাখ, 'সূফীদের' ব্যবহৃত শব্দাবলি ও তাদের জ্ঞানের সাথে অন্যদের কিছু ভিন্নতা রয়েছে। তারা তাদের কোনো কোনো শব্দ, তাদের বিশেষ কোনো চিহ্ন ও ইঙ্গিতপূর্ণ কথা[৭৯৭] যা কেবল তাদের মাঝেই শুধু ব্যবহৃত হয়, তা এমনসব বিষয়ের জন্য ব্যবহার করেন। যে প্রকৃত অর্থে তাদের মাঝে প্রবেশ করবে না, তারপরও তারা যে বিষয়ের ওপর আছে তা নিয়ে তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে সে তাদের দিক থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] তাদের মাঝে ব্যবহৃত আল্লাহকে 'দেখা' এ শব্দটি শর্তমুক্ত ব্যবহার করলে কীভাবে তা শর্তযুক্ত ব্যবহার বুঝায় তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তারা [সূফীরা] অনেক সময় বলে থাকেন যে, 'আমি আল্লাহকে দেখেছি'। তিনি বলেন, জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ[৭৯৮] থেকে বর্ণনা করা হয়, তাঁর বক্তব্য, যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

তা'আলাকে প্রত্যেকে তার আমল অনুযায়ী দেখতে পায়। সুতরাং যার আমল ভালো সে তাঁকে সুন্দর সূরতে দেখতে পায়। দেখুন, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২১৩-২১৪।

৭৯৭. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সূফীদের ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলো দু'ভাগে বিভক্ত: এক. ইশারা হালিয়্যাহ বা অবস্থাগত ইঙ্গিত যা তাদের অন্তরে প্রাপ্ত হয় বলে তারা মনে করে থাকে, তারা এ বিষয়টিকে নিজেদের বিশেষত্ব মনে করে থাকে। দুই. আরেক প্রকার হচ্ছে, ইশারা কাওলিয়্যাহ যা তাদের কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করে থাকে, যেমন তারা কুরআন বা অন্য কিছু থেকে গ্রহণ করে প্রচার করে থাকে। এসব ইশারা বা ইঙ্গিতকে কিয়াসের মতো গণ্য করতে হবে, যেমনটি ফকীহগণ ব্যবহার করে থাকে আহকামের ক্ষেত্রে, আর সূফীরা সেটাকে ব্যবহার করে থাকে তারগীব-তারহীবে, আশার সঞ্চার ও ভয় প্রদর্শনে, অনুরূপ আমলের ফযীলতে ও মানুষের স্তর নির্ণয় ইত্যাদিতে। যখন এসব ইশারা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত কিয়াসের মতো হবে তখন সেটি ভালো ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, আর যদি এসব ইশারা দুর্বল কিয়াসের মতো হয় তবে সেটার বিধান গ্রহণ করবে, আর যদি এসব ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা বাক্যকে তার অর্থ ও স্থান থেকে বিকৃত করা হয়, বাক্যকে তার আসল ব্যাখ্যা থেকে দূরবর্তী অপরিচিত ব্যাখ্যায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেটি কারামিতাহ, বাতেনী ও জাহমিয়্যাহদের কথার মত হিসেবে ধর্তব্য হবে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৭৬-৩৭৭); আরও দেখুন, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলুশ শাইখ (১/৩৬১)।

৭৯৮. তিনি হচ্ছেন জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসীর ইবন কাসেম, আবু মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী, আল-

رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان.

আপনি যখন আল্লাহর ইবাদত করেছেন তখন কি তাঁকে দেখেছেন? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহকে দেখেছি তারপর তাঁর ইবাদত করেছি। তারপর তাকে প্রশ্নকারী বলেছিল, তাঁকে কেমন দেখেছিলেন? তখন তিনি বলেছিলেন, চক্ষুর সীমা নির্ধারণ দ্বারা কোনো চোখ তাকে চাক্ষুষ দেখতে পায়নি, তবে অন্তরসমূহ তাকে দেখেছে যথার্থ দৃঢ়তার সাথে।(৭৯৯)

খুলদী, যিনি আল-খাওয়াস নামে বিখ্যাত। সূফীদের শাইখ। তিনি জুনাইদ ও জারীরীর শিষ্যত্ব বরণ করেন। তার থেকে আবু নু'আইম তার হিলইয়া গ্রন্থে প্রচুর বর্ণনা করেন। তাসাওউফের পথে অনেক সফর করেছেন, বড় বড় তাসাওউফের শাইখদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তার সম্পর্কে খতীব বাগদাদী ও ইবন কাসীর বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী ও উৎকৃষ্ট মানুষ ছিলেন। হিজরী ২৫২ সালে তার জন্ম, আর হিজরী ৩৪৮ সালে তার মৃত্যু হয়।

দেখুন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (১০/৩৮১); খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৭/২৩৬); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৫/৫৫৮); ইবনুল মুলাক্কিন, ত্বাবাকাতুল আওলিয়া, পৃ. ৭০; আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, ত্বাবাক্বাতুস সূফিয়্যাহ, পৃ. ৪৫৪; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১১/২৩৪)।

৭৯৯. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, অন্তর দিয়ে দেখার অর্থ হচ্ছে, জানা বিষয়ের একটি নমুনা অন্তরে উন্মোচিত হওয়া, তখন সেটা তার অন্তরের কাছে তেমনি ধরা পড়ে যেমন দেখা জিনিস চোখের কাছে ধরা পড়ে। আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে বানিয়েছেন এমন যে, তা কখনো কখনো দেখতে পায়, আবার কখনো কখনো অন্ধত্ব তাতে ভর করে। যেমনটি মানুষ চোখ দিয়ে কখনো দেখে, আবার কখনো কখনো তাতে অন্ধত্ব এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৪৬] সুতরাং অন্তর দেখে ও শুনে, অন্ধ হয় ও বধির হয়, আর তার অন্ধত্ব ও বধিরতা চোখের অন্ধত্ব ও বধিরতা থেকে বেশি মারাত্মক।

তাছাড়া মহান আল্লাহর বিভূতি, মর্যাদা, পূর্ণত্ব, ইয্যত, ক্ষমতা, সর্বসত্তার সংরক্ষকত্ব, তাঁর 'আরশের উপরে উঠা, তাঁর কিতাব দিয়ে কথা বলা,... তারপর তিনি আল্লাহর আরও কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলেন, যে কেউ এসব গুণাবলি অন্তর দিয়ে দেখতে পায় সে তাঁর জাগ্রত ও ঘুমন্ত, স্থির ও অস্থির, সিয়ামরত ও সিয়ামভঙ্গ সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর দিকে ভ্রমণ করতে থাকে। তাঁর যে বিশেষ অবস্থা থাকে সেটা অন্যান্য মানুষের অবস্থা থেকে ভিন্ন, সে এমন উপত্যকায় বিচরণ করতে পারে অন্য মানুষরা সে উপত্যকায় বিচরণ করতে পারে না।

তারপর ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর ইবাদতকারীরা, তাঁর ভালোবাসার লোকেরা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীরা তাঁকে দেখার কারণেই ইবাদত, ভালোবাসা, ভয় ও প্রত্যাবর্তন করার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন ৩/২৪৬-২৪৭, ২৫২-২৫৪।

উদ্দেশ্য এটা বলা যে, তাসাওউফে বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত বাক্য ও সন্দেহপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে, সেগুলোকে যতক্ষণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করা হয় ততক্ষণ সেগুলোর সমস্যা দূরীভূত হয় না। যেমন উপরের এ মাসআলায়। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'ঈমানের হাকীকত যারা বুঝেছে এমন লোকদের কাছে আল্লাহর মা'রিফাত, অন্তরসমূহের ইয়াকীন ও মুশাহাদা, বিভূতি যা কিছু ধরা পড়ে তা বিভিন্ন স্তরের। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিবরীলের প্রশ্নের উত্তরে ইহসানের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 'ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত তুমি করবে যেন তুমি তাকে দেখছ, অতঃপর যদি তুমি তাকে নাও দেখতে পাও তিনি তো তোমাকে দেখছেন।' [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৫০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৮] কখনও কখনও মুমিন তার রবকে দেখেন স্বপ্নের মাঝে বিভিন্ন সূরতে, তার ঈমান ও ইয়াকীন পরিমাণ।... আবার কোনো কোনো বান্দা তার অন্তর দিয়ে তাকে এমনভাবে অবলোকন করে যখন তার নিজের ইন্দ্রিয় অনুভূতি গায়েব হয়ে যায়, ফলে সে এটাকে চোখের দেখা মনে করতে থাকে। অথচ সেটা তার ভুল।'

দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ওসিয়্যাতুল কুবরা, পৃ. ২৬-২৭; আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া

ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا.

وإن مما نعتقد أن الله حرَّم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين. إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس. وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة.

তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, আর আল্লাহ্ তা'আলাকে আখেরাতে দেখা যাবে, যেমনটি আল্লাহ তাঁর কিতাবে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন। এটাই আমাদের বক্তব্য, আমাদের ইমামগণের বক্তব্য। আমাদের মধ্যকার বোকারা যা বলে সেগুলো আমাদেরও নয় আমাদের ইমামদেরও বক্তব্য নয়।

আর আমরা যা বিশ্বাস করি তার মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের ওপর তাদের মুমিন ভাইদের রক্ত ও সম্মান নষ্ট করা হারাম করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিদায় হজে ঘোষণা করেছিলেন।[৮০০] সুতরাং যে কেউ মনে করবে যে, সে এমন স্তরে পৌঁছতে পারবে যখন তার জন্য হক্ব আল্লাহ্ সুবহানাহু বৈধ করে দিবেন সেসব কিছু যা মুমিনদের ওপর হারাম করেছেন, (তবে যদি বাধ্য হয়ে জান বাঁচানোর অবস্থায় উপনীত হয় সেটা আলাদা কথা) এর বাইরে কোনো বান্দা যতই জ্ঞান ও ইবাদতের উঁচু পর্যায়ে পৌঁছে যাক না কেন, এমন কথা বললে সেটা হবে আল্লাহর সাথে কুফরী করা। এর প্রবক্তাকে মুলহিদ বা দীন অস্বীকারকারী বলা হবে, আর তারাই মূলত দীন বিচ্যুত গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হবে।[৮০১]

(২/৩৩৬)।

৮০০. হাদীসটি সংকলন করেছেন বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ১৭৩৯, ১৭৪২, ৪৪০২, ৬৭৮৫; অনুরূপ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১২১৮। আর এ হজকে 'হাজ্জাতুল ওদা' বা বিদায় হজ নামকরণের কারণ হাদীসেই এসেছে, ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হজ তিনি করেছেন সে হজের সময় 'ইয়াওমুন নাহর' বা কুরবানীর দিন (দশ তারিখ) জামরা (কঙ্কর মারার স্থান) গুলোর মাঝখানে অবস্থান নিলেন এবং বললেন, এ হচ্ছে হজ্জে আকবর এর দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুরু করলেন, 'হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন' আর তিনি মানুষদের বিদায় জানালেন। তখন লোকেরা বললো, এটি বিদায়ী হজ।' দেখুন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ১৭৪২।

৮০১. ইবন খাফীফের এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, তিনি শরী'আতের পাবন্দী করতেন। তার ব্যাপারে কেউ যদি এর বাইরে কিছু বলে তবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি এর মাধ্যমে তাদের মতবাদকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন যারা মনে করে থাকে যে সালেক কখনও কখনও এমন কামেল হয়ে যায় যে, তার থেকে ইবাদতের বাধ্য-বাধকতা উঠে যায়। নাউযুবিল্লাহ। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে কেউ মনে করবে পুরো শরী'আত মানার বাধ্যবাধকতা, অথবা তার আংশিক মানার অপরিহার্যতা আল্লাহর মারিফতপ্রাপ্ত কোনো পীরের বা কাশফ ও কারামতওয়ালাদের অথবা যারা বিসালের দরজায় পৌঁছে গেছে তাদের ওপর থেকে রহিত হয়ে যায়, অথবা আল্লাহর এমন কোনো বিশেষ লোক ও খাস বান্দা রয়েছে যাদের ওপর সালাতের ফরযিয়াত অবশিষ্ট থাকে না, বরং তাদের থেকে সেটি রহিত হয়ে গেছে; কারণ তারা 'হাদ্বরাতুল কুদস' বা স্রষ্টার সমীপে পৌঁছে গেছে, অথবা তারা এর

وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله؛ وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه، ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.

আর আমরা যা বিশ্বাস করি তন্মধ্যে রয়েছে, 'ইশক' শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা ত্যাগ করা। তারপর তিনি [ইবন খাফীফ] বর্ণনা করলেন যে, এটা ব্যবহার জায়েয হবে না, কারণ এটি শব্দমূল (এর অর্থ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা অসম্ভব হওয়া)[৮০২] আর তা শরী'আতে ব্যবহৃত না হওয়ার কারণে।[৮০৩] তিনি [ইবন খাফীফ] আরও বলেন, এটি ব্যবহারের সর্বনিম্ন অবস্থা হচ্ছে তা বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। আর আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় যে 'মহব্বত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাই যথেষ্ট।[৮০৪]

থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বা উত্তম জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তারা সালাতের মুখাপেক্ষী নয়, অথবা দাসত্বের আসল উদ্দেশ্য তো রবের সাথে অন্তর লেগে থাকা আর সালাত আদায় করলে তো তাতে ছেদ পড়ে যাবে, সুতরাং যদি সে সবকিছু নিয়ে আল্লাহর সাথে অবস্থান করতে থাকে, তখন আর তার সালাত লাগে না, বরং সালাতের অর্থ তো আল্লাহকে চেনা ও মা'রিফাত হাসিল করা, যখন সেটি হাসিল হবে তখন আর সালাত লাগবে না... (এসব কিছুই পথভ্রষ্টতা) অতঃপর যারা এসব লোকদেরকে আল্লাহর ওলী মনে করে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে, দীনে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে ইসলামের সকল ইমাম একমত। যদিও সে নিজে অনেক বড় দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতকারী ব্যক্তি হয়; কারণ খ্রিস্টান যাজকেরা আরও বেশি দুনিয়াবিমুখ, আরও বেশি ইবাদতগুজার, আর তারা রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার বেশিরভাগ কথার ওপরই ঈমান এনে থাকে, তাদের অধিকাংশই রাসূলদের সম্মান করে থাকে, রাসূলদের অনুসারীদের সমীহ করে, কিন্তু তারা রাসূল যা নিয়ে এসেছেন সবকিছু মেনে নেয়নি, বরং কিছুর ওপর ঈমান এনেছে আর কিছুর ওপর কুফরী করেছে, ফলে তারা এজন্য কাফের হয়ে গেছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৪৩৩-৪৩৪)।

৮০২. কারণ 'ইশক' শব্দটি আরবীতে ব্যবহৃত হয় প্রবৃত্তিগত তাড়নাসহ কারো সাথে মিলিত হওয়ার বাসনা জাগ্রত হওয়া। আল্লাহর জন্য এটা ব্যবহার বেয়াদবী ও হারাম। আল্লাহর ভালোবাসাকে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভালোবাসার মতো মনে করা অজ্ঞতা, কুফরী ও নষ্টামী। নাউযুবিল্লাহ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, আবু হিলাল আল-আসকারী, আল-ফুরূকুল লুগাওয়িয়্যাহ, পৃ. ১১৬; ইবন মানযূর, লিসানুল আরব (১০/২৫১-২৫২); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১৬৬)।

৮০৩. অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ'র কোথাও 'ইশক' শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। অনুরূপভাবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও ব্যবহৃত হয়নি। বস্তুত তা বিপরীত লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহকে নারী-পুরুষের প্রবৃত্তির তাড়নাগত করে ভালোবাসার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

৮০৪. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইশক' হচ্ছে এমন ভালোবাসা যা তার সীমা অতিক্রম করে যায়, যে সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। আর আল্লাহর ভালোবাসার এমন কোনো শেষ সীমানা নেই যা অতিক্রম করা যায়। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/১৩১)।

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ যখন ভালোবাসার স্তর বর্ণনা করেছেন তখন তার একটি স্তর হিসেবে 'ইশক' উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন এটি হচ্ছে সবচেয়ে তিক্ত নাম ও নিকৃষ্ট নাম। ব্যক্তিত্বশীল আরবরা খুব কমই এতে জড়িত হয়। এমনকি তারা যেন এ নামটির নিকৃষ্টতার কারণে উল্লেখ না করে অন্য নাম ব্যবহার করতো। এ শব্দটি কুরআনেও আসেনি, সুন্নাহতেও আসেনি, কেবল সুওয়াইদ ইবন সা'ঈদ এর হাদীস ব্যতীত, যা বাতিল বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। হাদীসের হাফেযরা সেটাকে অস্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, ইবনুল কাইয়্যম, রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন, পৃ. ২৮-৩০, ১৯৬; ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১৬৬)।

মোটকথা: 'ইশক' বা 'প্রেম' শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার হতে কয়েকটি কারণে নিষিদ্ধ:

১- আল্লাহর নাম ও গুণাবলি তাওক্বীফী বা কুরআন ও হাদীস নির্ভর। আর সেখানে আল্লাহর জন্য 'ইশক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।

২- 'ইশক' বা প্রেম হচ্ছে প্রবৃত্তির তাড়নাসহ কিছুর ভালোবাসা যা আল্লাহর জন্য কোনোভাবেই

وأن ما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات،

আর আমরা যা বিশ্বাস করি তার মধ্যে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা দৃশ্যমান (সৃষ্টির) কিছুর মাঝে প্রবেশ করেন না।(৮০৫)

ব্যবহৃত হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ।

৩- 'ইশক' বা প্রেম হচ্ছে ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘন, অর্থাৎ যে ভালোবাসায় ইচ্ছার বিচ্যুতি ঘটে, আল্লাহ তা'আলা যা থেকে মুক্ত।

৪- 'ইশক' বা প্রেম হচ্ছে ভালোবাসায় মারিফাত বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। আর আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন। কোনো কিছু তার থেকে বিনষ্ট হয় না, অগোচরে থাকে না।

অনুরূপভাবে এটাও বলা যাবে না যে, 'বান্দা আল্লাহকে 'ইশক' করে'। কারণ:

১- 'ইশক' এর সাথে প্রবৃত্তির তাড়না তথা মিলনের আশা জড়িত যা আল্লাহর জন্য কীভাবে ব্যবহৃত হবে! নাউযুবিল্লাহ

২- 'ইশক' হচ্ছে, ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘন। মানুষ যতই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করুক না কেন সে তাতে কসুরকারী।

৩- 'ইশক' শব্দটি সালাফে সালেহীন স্রষ্টার জন্য ব্যবহার করেননি।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মানুষ 'ইশক' শব্দটি নিয়ে মতভেদ করেছে। তাসাওউফের কিছু লোক আল্লাহর জন্য সেটা ব্যবহার করেছে, কিন্তু আলেমগণ সেটাকে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করাকে অস্বীকার করেছেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ শব্দটি সালাফে সালেহীন ইমামগণের কাছ থেকে ব্যবহার হয়ে আসেনি।

দেখুন, জামে'উর রাসায়েল (২/২৩৮-২৪৪), (মাহাব্বাতের বিষয়ে নীতি); আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (৩/২৯); রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন, পৃ. ৩২।

৮০৫. এর মাধ্যমে ইবন খাফীফ তাদের মতাদর্শ খণ্ডন করেছেন যারা মনে করে আল্লাহ কোনো সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রবেশ করেন। এ মারাত্মক বাতিল কুফরী ও শির্কী মতাদর্শে বিশ্বাস করে দু'টি সম্প্রদায়:

১- এক গোষ্ঠী বিশেষ কিছু বা ব্যক্তিতে হুলুল বা অবতরণবাদে বিশ্বাস করে, যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায় মনে করে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা মাসীহের মাঝে, অনুরূপভাবে চরমপন্থী শিয়ারা মনে করে থাকে আল্লাহ তা'আলা আলীর মাঝে, আবার কোনো কোনো তাসাওউফপন্থীরা আল্লাহ তা'আলাকে তাদের পীরের মাঝে (যেমন হাল্লাজপন্থীরা হাল্লাজের মাঝে), আবার কোনো কোনো গোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলাকে তাদের শাসকের মাঝে, আবার কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলাকে সুন্দর সূরতে, আবার কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলাকে নারীর মাঝে প্রবেশ করেছে মনে করে থাকে। নিঃসন্দেহে এসব কথা নাসারাদের কথার চেয়ে মারাত্মক। তাদের কেউ কেউ নারী কিংবা সুন্দর বালকের মাঝেও আল্লাহ প্রবেশ করেন বলে বিশ্বাস করে, আবার তাদের অনেকে বিশ্বাস করে আল্লাহ মানুষের কলবের ভেতরে প্রবেশ করে আছেন। নাউযুবিল্লাহ। এসবই বড় শির্ক ও বড় কুফর, যা বিশ্বাস করে মারা গেলে একজন মানুষকে তা জাহান্নামী করার জন্য যথেষ্ট।

২- আরেক গোষ্ঠী আছে যারা সবকিছুতেই আল্লাহ আছেন বলে, তারা বলে থাকে যে আল্লাহ সবকিছুতে প্রবেশ করেন, সবকিছুর সাথে মিশে আছেন, এমনকি কুকুর, শূকর, নাপাকী এসবের মধ্যেও বলে, যেমন চরমপন্থী জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়, যারা মনে করে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। অনুরূপ চরমপন্থী কিছু সূফীরাও তা বিশ্বাস করে থাকে, তারা মনে করে আল্লাহ সবকিছুর সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছেন, যেমন ইবন আরাবী ও তার অনুসারীরা, ইবন সাব'ঈন, ইবনুল ফারেদ্ব, তিলমিসানী, বুলাইয়ানী প্রমুখ সূফীরা। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২৯২-২৯৩); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/১৭০)। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এরা অবশ্য 'হুলুল বা অবতরণ করে প্রবেশ করেছে' এমনটি বলতে নারাজ; কারণ তখন তো প্রবেশকারী সত্তা ও প্রবেশকৃত সত্তা দু'টি সাব্যস্ত করতে হয়, যা তারা মোটেই বলতে নারায। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/২৪২)। হুলুল বিষয়ে আরও দেখা যেতে পারে, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/৪৬৫), (৫/৪২৪), (১০/৫৯), (২১/২৫৬), (২২/১২৫); ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/৩৩৫, ৬২৩); ইবন তাইমিয়্যাহ, ইস্তেকামাহ (২/১৯৬)।

সত্যিকারের ঈমানদার বিশ্বাস করে যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি আলাদা। স্রষ্টা সৃষ্টির বাইরে। স্রষ্টা কখনও সৃষ্টির

وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستوٍ على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما تلي وحفظ ودرس.

ونعتقد: أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم خليلاً وحبيبًا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة: أن الخلة الفقر والحاجة.

إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف،

আর তিনিই সকল পূর্ণতাবিশিষ্ট নাম ও গুণের দ্বারা এককভাবে গুণান্বিত, সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা[৮০৬], 'আরশের উপর সমুন্নত।

আর কুরআনে কারীম তাঁর কথা, যা সৃষ্ট নয়, যেখানেই তা তিলাওয়াত করা হোক, পাঠ করা হোক, মুখস্থ করা হোক।[৮০৭]

আর আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করেছেন যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন আর তাঁকে হাবীব (প্রিয়) হিসেবেও নিয়েছেন।[৮০৮] আর (ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ) উভয়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 'খুল্লাহ' অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। যা মু'তাযিলাদের কথার বিপরীত, যারা বলে থাকে, 'খুল্লাহ' বা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হলে তো (আল্লাহর) অভাব ও প্রয়োজন বুঝায়।

শেষে বলেন, 'খুল্লাহ' ও 'মাহাব্বাহ' আল্লাহর দু'টি গুণ। তিনি উভয় গুণে গুণান্বিত। আর আল্লাহর কোনো গুণ ধরণ ও সাদৃশ্য প্রদানের অধীনে প্রবেশ করবে না। তবে বান্দার গুণ 'খুল্লাহ' ও 'মাহাব্বাহ' যখন বান্দার গুণ হবে তখন তা ধরণ এর অধীন হবে।

ভিতরে নন। ঈমানদারগণ আরও বিশ্বাস করেন যে, স্রষ্টা 'আরশের উপরে উঠেছেন এবং তিনি 'আরশের উপর অবস্থান করছেন।

এর বিপরীতে বাতিলগোষ্ঠীর বক্তব্য দেখতে পারেন, ইবন আরাবী, ফুসূসুল হিকাম, পৃ. ৭০, ২৪৫-২৪৬, ৩৪২-৩৪৬; আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ (৪/৩৬৩)।

আর বাতিলপন্থীদের এসব আকীদাহ'র অসারতা প্রমাণে দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/১১১)- থেকে শেষ পর্যন্ত; আরও দেখুন, হাকীকাতু মাযহাবিল ইত্তিহাদিয়্যীন গ্রন্থটি।

৮০৬. শাইখ ইমাম নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী তার মুখতাসারুল উলু গ্রন্থে (পৃ. ১৮-১৯) বলেন, সালাফে সালেহীনের অনেক আলেম (বায়িনুন মিন খালকিহী) বা 'সৃষ্টি থেকে আলাদা' এ কথাটি বলেছেন। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামের যুগে 'সৃষ্টি থেকে আলাদা' এ কথাটি বলা বিখ্যাত ছিল না, কিন্তু যখন জাহমিয়্যাহ ও তার অনুসারীরা 'আল্লাহ তা'আলাকে সর্বত্র বিরাজমান' এ বিদ'আতী কথাটির প্রবর্তন করে তখন আহলুস সুন্নাতের বড় বড় ইমাম ও আলেমগণ এ কথাটুকু বাড়তি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর যখন তারা সেটা ব্যবহার করেছেন তখন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কেউ সেটার বিরোধিতা করেননি। সুতরাং তা ব্যবহার করার ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এখন বলা হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তাসহ 'আরশের উপরে অবস্থান করেছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।

৮০৭. এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮০৮. এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم، وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط.

ومما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب، فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.

وإن مما نعتقده: أن الله لا يأمر بأكل الحلال، ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن

কিন্তু আল্লাহর গুণ, সেগুলো জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়, সংজ্ঞা (অর্থ) হিসেবে অবস্থিত।[৮০৯] এ দু'টির ব্যাপারে (সৃষ্টির গুণের সাথে) সাদৃশ্য প্রদান করাকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তার ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব, আর ধরণ নির্ধারণটি তাঁর থেকে অপসৃত।

আর আমরা যা বিশ্বাস করি তার মধ্যে রয়েছে এই যে, আল্লাহ আয়-উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাদার শিল্প, কারিগরি কর্ম বৈধ করেছেন।[৮১০] আল্লাহ তো হারাম করেছেন প্রতারণা ও যুলুম। এসব আয়-উপার্জন যে হারাম বলে সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহকারী ও বিদ'আতী; কারণ বিশৃংখলা-দূর্নীতি, যুলুম ও প্রতারণা কোনো ব্যবসা বা পেশা কর্ম নয়। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হারাম করেছেন দূর্নীতি-বিশৃঙ্খলাকে, উপার্জন ও ব্যবসাকে নয়। এটি (উপার্জন ও ব্যবসা) কুরআন-সুন্নাহ'র মূলনীতি অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত জায়েয।

কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ হালাল খাওয়ার নির্দেশ দিবেন, অতঃপর সেটাতে পৌঁছানোর সকল পথ অনুপস্থিত রাখবেন এটা হতে পারে না। কেননা তিনি যা তাদের

---

৮০৯. সংজ্ঞা হিসেবে অবস্থিত অর্থাৎ সংজ্ঞা হিসেবে এগুলোর জ্ঞানগত অস্তিত্ব আমাদের মাঝে রয়েছে। আমরা এসব গুণের অর্থ জানি।

৮১০. এ বক্তব্যের মাধ্যমে ইবন খাফীফ রাহিমাহুল্লাহ সেসব সূফীদের মতাদর্শ খণ্ডন করেছেন যারা মনে করে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল এর অর্থ হচ্ছে রুযী রোজগার না করা, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়া। আবু বকর আল-কালাবাযী রাহিমাহুল্লাহ সম্পদ অর্জন করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সূফীদের ইজমা' বা ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আর তারা একমত হয়েছে যে বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি, যা ইসলামী শরী'আত হালাল করেছে, তার মাধ্যমে অর্জন করা জায়েয।' আত-তা'আররুফ লি মাযাহিবিত তাসাওউফ, পৃ. ৮৫।
কিন্তু কোনো কোনো আলেম তাদের থেকে এটা বর্ণনা করেন যে, সূফীরা হারামকে হালাল করে থাকে, হালাল রিযিক অর্জনকে পরিত্যাগ করার নির্দেশনা দিয়ে থাকে, আর এটিই তাদের মধ্যে প্রবল, যেমনটি ইবনুল জাওযী তার তালবীসে ইবলীসে বর্ণনা করেছেন। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'একদল লোক মনে করে থাকে তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা হচ্ছে হজ ও অন্যান্য সফরের সময়ে কোনো পাথেয় সাথে বহন না করা। এ মতটি পূর্ববর্তী বড়রা প্রত্যাখ্যান করেছেন... এসব চরমপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ উপার্জন করাকেও হারাম বলে...' মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৫৩০)।
দেখুন, কালাবাযী, আত-তা'আররুফ লি মাযহাবি আহলিত তাসাওউফ, পৃ. ৫৬-৫৭; নাকশাবান্দী, জামে'উল উসূল, পৃ. ২৯৭-২৯৮; জীলানী, আল-গুনইয়া পৃ. ৯০০-৯১০; ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাকান নাফীস মিন তালবীসে ইবলীস, (আলী হাসান আব্দুল হামীদ কর্তৃক সংক্ষেপিত), পৃ. ৭০-৭৯; আবু বকর আল খাল্লাল, আল-হাসসু আলাত তিজারাতি ওয়াস সানা'আতি ওয়াল 'আমালি, ওয়াল ইনকারু আলা মান ইয়াদ্দা'য়িত তাওয়াক্কুলা ফী তারকিল 'আমালি; মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শাইবানী, আল-ইকতেসাব ফির রিযকিল মুস্তাত্বাব।

ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال، والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال،

إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع؛ لا أنه مفقود من الأرض.

ومما نعتقده: أنّا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه، والمعاملة في تجارته،

থেকে চেয়েছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, পৃথিবী হালাল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আর মানুষ হারামেই চলতে বাধ্য হবে, সে তো বিদ'আতী-বিপথগামী।(৮১১)

তবে হ্যাঁ, সেটা কোনো স্থানে কম থাকবে আবার কোনো স্থানে বেশি থাকবে, এই নয় যে, সেটা যমীনে থাকবেই না।

আর আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিষয় এটিও যে, যখন আমরা কারো প্রকাশ্যে সুন্দর দেখব (সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়বে না) তখন তার উপার্জনে, সম্পদে, খাবারে আমরা তাকে অভিযুক্ত করতে করব না। সুতরাং তার খাবার খাওয়া জায়েয(৮১২), তার সাথে

---

৮১১. পৃথিবী হালাল থেকে মুক্ত হবে এমন ধরে নেয়ার চিন্তাটি ধারণা করেছিলেন সূফীদের একটি সম্প্রদায়। তাদের উত্তরসূরীদের অন্যতম হচ্ছেন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী, তার ছাত্র আবু হামেদ আল-গাযালী, ইয্য ইবন আব্দিস সালাম, যারকাশী ও জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী প্রমুখ।
ইমাম জুওয়াইনী বলেন, যদি যমীনের সকল হালাল কামাই-অর্জন নষ্ট হয়ে যায়, খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক, আর মানুষের হাতে যা থাকে তা সবাই হারামে পূর্ণ হয়ে যায়, আর আমাদের সময়ে এটা হওয়া অসম্ভব কিছু না'। দেখুন, গিয়াসুল উমাম ফিত তাইয়াসিস যুলাম, পৃ. ৩৫১।
ইমাম গাযালী বলেন, যদি ধরে নেয়া হয় যে জগতের মানুষের সকল সম্পদ বিনষ্ট লেনদেনের কারণে ও ছিনতাইকৃত সম্পদ অন্যকিছুর সাথে একাকার হয়ে হারাম হয়ে গেল, আর শুধু হালাল জিনিস পাওয়া দুষ্কর হয়ে গেল'..। দেখুন, আল-মানখূল মিন তা'লীকাতিল উসূল, পৃ. ৩৬৯।
ইমাম আল-ইয্য ইবন আব্দিস সালাম বলেন, 'যখন হারাম এমন ব্যাপক আকার হয়ে যাবে যে, সেখানে হালাল পাওয়া দুষ্কর হয়ে গেছে, তখন মানুষের জন্য সেটার বৈধতা নেয়ার জন্য যরুরত বা অত্যাবশ্যক অবস্থায় উপনীত হওয়া পর্যন্ত সবর করা জরুরী নয়; কারণ এটা করতে গেলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সূত্রপাত হবে।' দেখুন, কাওয়া'য়িদুল আহকাম (২/৩১৩)।
ইমাম যারকাশী বলেন, 'আর যখন হারাম কোনো অঞ্চলকে পুরো গ্রাস করে ফেলবে, যেখানে কদাচিত হালাল আহরণ করার সুযোগ থাকে, তখন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহার করা জায়েয হবে, সেখানে শুধু অত্যাবশ্যক অংশের ওপর যথেষ্ট করার প্রয়োজন নেই।' আল-মানসূর ফিল কাওয়া'য়িদ (২/৩১৭)।
ইমাম সুয়ূত্বী ইমাম যারকাশীর এ বক্তব্য সংকলন করে সেটাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দেখুন, আশবাহ্-ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ৮৪।
কিন্তু শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ এখানে আবুল মা'আলী ও তার অনুসারীদের এসব কথার সমালোচনা করে বলেন, এ হচ্ছে অসম্ভব জিনিস ধরে নিয়ে কথা বলা, যা কখনো হবে না।' দেখুন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২৮/৫৯৩)।
অন্যত্র শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হালাল খাওয়া অসম্ভব, হালালের অস্তিত্ব বর্তমান সময়ে অসম্ভব, যিনি এটা বলেছেন তিনি ভুল করেছেন, ভ্রমের মধ্যে আছেন এটাই ইসলামের ইমামগণের সর্বসম্মত মত। কারণ এমন কথা তো ইতোপূর্বে কেবল বলতেন কোনো কোনো বিদ'আতীরা, কোনো কোনো বিনষ্ট ফকীহরা, কোনো কোনো খারাপ আকীদাহ'র ইবাদতকারীরা, ইমামগণ এসব কথার বিরোধিতা করেছেন। এমনকি ইমাম আহমাদ তার পরহেযগারিতার বিষয়টি বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও এমন কথা যারা বলত তাদের কথা মানতে তিনি অস্বীকার করতেন।' দেখুন, মাজমূ'উ ফাতাওয়া (২৯/৩১১-৩১৩)।

৮১২. ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ (হাদীস নং ৫৪৬১) এর সাথে তা'লীক (বা নিচের দিকের সনদ বিহীন)

فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. ومن لا يزغ عن الظلم، وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسؤال والتوقي؛ كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا

ব্যবসায়ী লেনদেন জায়েয। সে যা বলেছে তার প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করা আমাদের দায়িত্ব নয়। তবে যদি কোনো প্রশ্নকারী তাকে সতর্কতামূলক জিজ্ঞাসা করে তাহলে তা জায়েয। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা যালেমদের (যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষদের ওপর অত্যাচার করে, আর কোনো ব্যক্তি সেসব যালেমদের মাঝে প্রবিষ্ট থাকে তাদের সাথে) চলাফেরা করে তার বিষয়টি ভিন্ন (অর্থাৎ তার খাবার-দাবার ও উপার্জন গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতে হবে)।

আর যে কেউ যুলুম ছাড়তে পারেনি এবং মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা থেকে মুক্ত হতে পারেনি, আর তার কাছে ঐ সম্পদ ব্যতীত অন্য কিছুও থাকবে এমন লোককে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তার দাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।[৮১৩] অতঃপর যদি এ ব্যক্তির কাছে

বর্ণনায় আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যখন তুমি কোনো মুসলিমের ঘরে প্রবেশ কর তখন তার ব্যাপারে অযথা সন্দেহ করো না। বরং তার খাবার থেকে খাও ও পানীয় থেকে পান করো।' দেখুন, ইবন হাজার, তাগলীকুত তা'লীক (৪/৪৯৪)। বর্ণনাটিকে ইবন আবী শাইবাহ মাওসূল তথা অকর্তিত সনদসহ বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং ২৪৯১৯; তবে তার শব্দ হচ্ছে, 'যখন তুমি কোনো লোকের কাছে প্রবেশ করো, তখন তার পেটের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করবে না, বরং তার খাবার থেকে খাও আর তার পানীয় থেকে পান কর।'

ইবন আবী শাইবাহ আরও বর্ণনা করেন, জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'মুসলিমের ঘরে যাই পাও (সে প্রদান করলে) তা খাও।' দেখুন ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ২৪৯২০।

তিনি আরও বর্ণন করেন আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে। তিনি বলেন, 'যখন তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে যাও আর তিনি তোমাকে কোনো খাবার প্রদান করেন, তাহলে তুমি সেটা খাও এ ব্যাপারে প্রশ্ন করো না। যদি তোমাকে কোনো পানীয় থেকে পান করায় তবে সেটা পান করো, কোনো প্রশ্ন করো না। যদি তার ব্যাপারে তোমার কাছে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করে তখন তুমি সেটাকে পানির সাথে মিশিয়ে নাও।' দেখুন ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ২৪৯১৮। এসব বর্ণনা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন এমন ব্যক্তির কাছে যাবে যিনি হারাম খাওয়ার দোষে দুষ্ট নন। যেমনটি হাফেয ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। তিনি আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বক্তব্যের ব্যাখ্যার সময় উক্ত কথা বলেছেন। দেখুন, ইবন হাজার, আল-ফাতহ (৯/৫৮৪)।

৮১৩. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর এক দাস ছিল, যে তাকে কিছু কর দিত। তিনি তার সে দেয়া জিনিস দিয়ে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতেন। একদিন সে কিছু জিনিস নিয়ে আসলে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তা থেকে খাওয়া দাওয়া করলেন। তখন দাসটি বললো, আপনি কি জানেন আপনি কী খেয়েছেন? আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, সেটা কী? তখন দাসটি বললো, জাহেলী যুগে আমি এক লোকের জন্য গণকবাজির কাজ করেছিলাম, তবে আমি গণকবাজি ভালো জানি না, আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম, সে আমাকে তার প্রতিদান দিল, আর সেটাই আপনি আজ ভক্ষণ করলেন। তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তার হাত গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে পেটে যা ছিল তার সবকিছু বমি করে দিলেন।' দেখুন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৮৪২।

হাফেয ইবন হাজার বলেন, ইসমা'ঈলীর বর্ণনায় অন্য সূত্রে এসেছে, যা ইসমা'ঈল ইবন আবী খালেদ, কায়েস ইবন আবী হাযেম থেকে বর্ণনা করেন, 'আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর এক দাস

يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام، إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ الدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان، قالا: «كُلْ منه وعليه التبعة» والناس طبقات، والدينُ: الحنيفيةُ السمحة.

উক্ত সম্পদ ব্যতীতও আরও সম্পদ থাকে যা উক্ত (হারাম) মাল থেকে আসেনি, কিন্তু দু'টি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে এমন হয়, তবে এসব সম্পদ পুরোটাকে হালাল বা হারাম কোনোটিই হুকুম লাগানো যাবে না। তবে সেটাকে বলতে সন্দেহপূর্ণ সম্পদ। সুতরাং যে কেউ (খাওয়ার সময় বা নেয়ার সময়) জিজ্ঞাসা করে নিবে সে তো নিজের দীনকে দায়মুক্ত করেছে, যেমনটি আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু করেছেন। অবশ্য আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ ও সালমান আল-ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা তারা এমন সম্পদ থেকে খাওয়া জায়েয বলে মত প্রদান করেছেন। তাদের মতে "তুমি তা থেকে খাও, কারণ সেটার গুনাহ তখন ঐ ব্যক্তির হবে, যারা তা গ্রহণ করেছে বা খেয়েছে তাদের হবে না।"(৮১৪) মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে অনেক স্তর রয়েছে। আর আল্লাহর দীন হচ্ছে সহজ সরল।(৮১৫)

ছিল, তিনি সবসময় তার জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। যতক্ষণ না তাকে হালাল কী না জিজ্ঞেস করতেন ততক্ষণ তা থেকে আহার করতেন না। এক রাত্রিতে সে খাবার নিয়ে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা না করেই তা থেকে খাবার গ্রহণ করলেন, তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন...' ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৭/১৫৪)। অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (১/৩১)। আরও দেখুন, ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া (১/২৫১-২৫২)।

ইবনুল জাওযী বলেন, 'আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হচ্ছেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি সমস্যা মনে করে বমি করে দিয়েছিলেন। দেখুন, কাশফুল মুশকিল (১/২৬)। অনুরূপ পরবর্তীতেও কোনো কোনো ইমাম করেছেন। যেমন ইমাম মা'মার ইবন রাশেদ আল-বসরী, তিনি একবার তার পরিবার থেকে একটি আপেল খেয়েছিলেন, তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোত্থেকে? তাকে জানানো হলো যে, অমুক বিলাপকারীনী মহিলার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে প্রদত্ত। তখন তিনি দাঁড়িয়ে সেটাকে বমি করে দিলেন। ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/১১)।

৮১৪. আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ ও সালমান আল-ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার এ দু'টি আছার আমরা দেখতে পাই ইমাম আব্দুর রাযযাক এর কাছে, যিনি তা তার আল-মুসান্নাফে সংকলন করেছেন। (৮/১৫০), নং ১৪৬৭৫ ও ১৪৬৭৭। আমীরদের খাবার সংক্রান্ত অধ্যায় ও সুদের খাবার।

ইমাম আব্দুর রাযযাক তার মুসান্নাফ গ্রন্থে সনদসহ যর ইবন আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তার কাছে এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো, আমার এক পড়শী রয়েছেন যিনি সুদ খান, তারপরও তিনি সবসময় তার বাসায় আমাকে দাওয়াত দেন, তখন ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, 'এ খাবারের আনন্দদায়ক অংশ তোমার জন্য আর গোনাহগুলো তার ওপর বর্তাবে'।

অনুরূপ আব্দুর রাযযাক তার মুসান্নাফে সনদসহ সালমান আল-ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি তোমার কোনো বন্ধু রাজ-কর্মচারী থাকে অথবা তোমার পড়শী রাজ-কর্মচারী থাকে অথবা তোমার আত্মীয় কেউ রাজ-কর্মচারী থাকে, তারা তোমাকে কোনো কিছু হাদিয়া দেয় অথবা তোমাকে তাদের খাওয়ার এর জন্য দাওয়াত করে, তবে তুমি তা কবুল কর। কেননা তার ভালো অংশ তোমার জন্য, তার গোনাহ ঐ ব্যক্তির ওপর বর্তাবে।

৮১৫. যাদের সম্পদে হালাল ও হারাম মিশ্রিত আছে তাদের সম্পদ অন্য কাউকে দেয়া হলে তা হালাল হবে নাকি হারাম হবে এ বাপারে মতভেদ রয়েছে।

প্রথম মত: যদি তার অধিকাংশ সম্পদ হারাম হয় তবে সেটা পরিহার করা উচিত, এ মতটি শাফে'য়ী, আহমাদ এর। এজন্য বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ নু'মান ইবন বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণিত হাদীসে আসা 'হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দু' এর মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়াদি' এ হাদীসের সন্দেহজনক বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন 'এমন সম্পদ যাতে হালাল ও হারাম মিশে গেছে'। দেখুন, ইবন রজাব, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ৭০। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কি হারাম নাকি মাকরূহ? হাম্বলীদের থেকে দু'টি মতই এসেছে। তবে যদি

وأن مما نعتقده: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، وبما أخبر به عنه نفسه ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾

আর আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে যে, বান্দার ওপর যতক্ষণ দুনিয়ার বিধান চালু থাকে (জীবিত থাকবে) ততক্ষণ তার থেকে ভয় ও আশা দূরীভূত হবে না। আর যে কেউ নিজের নিরাপত্তা লাভ হওয়ার দাবি করবে[৮১৬] সে তো আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খ, আর সে তা

তার অধিকাংশ সম্পদ হালাল হয় তাহলে তার সাথে লেনদেন করা যাবে।

দ্বিতীয় মত: যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট সম্পদ হারাম হওয়ার ব্যাপারটি জানা না যাবে, ততক্ষণ তা খেতে কোনো সমস্যা নেই (অর্থাৎ যেটা সরাসরি নির্দিষ্ট করে হারাম হওয়া জানা যাবে তা খাওয়া যাবে না)। যদি কারো সম্পদ সরাসরি নির্দিষ্টভাবে হারাম জানা না যাবে, কিন্তু জানতে পেরেছে যে, এতে সন্দেহ আছে, তা থেকে খাওয়াতেও কোনো দোষ নেই। এটি ইমাম যুহরী ও মাকহূল এর মত। ইমাম আহমাদও এক বর্ণনায় এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় মত: ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহ ও হাসান বসরী রাহিমাহুমাল্লাহ এখানে ইবন মাসঊদ ও সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার মত গ্রহণ করেছেন, তারা বলেন, এতে পূর্ণ ছাড় রয়েছে। যে অন্যায় করবে সে গুনাহ বহন করবে, যে দাওয়াত খাবে বা যাকে হাদিয়া দেয়া হবে তার কোনো সমস্যা হবে না। এ মতটি আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন গ্রহণ করেছেন।

ইমাম ইবন কুদামাহ ও কিছু আলেমের মত হচ্ছে, পরহেযগারীর কারণে এমন সম্পদ পরিত্যাগ করাতে দোষ নেই।

দেখুন, আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ (৮/১৫০-১৫২); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৯/২৪১-৩১৫); ইবন রাজাব, জামে'উল উলূমি ওয়াল হিকাম, পৃ. ৬১-৬২; ইবন কুদামাহ, মুখতাসারু মিনহাজুল কাসেদীন, পৃ. ৯০-৯২; ইবন মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ (১/৫৯৬)।

৮১৬. আল্লাহ তা'আলার কৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া, নিরাপত্তা প্রাপ্তির দাবি করা সকল আলেমগণের মতে কুফরী কাজ। এটি বড় কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বর্ণনা করেছেন তার মাদারিজুস সালেকীন গ্রন্থে (১/১১৩); যাহাবী, আল-কাবায়ের, পৃ. ১০৩; ইবন হাজার আল-হাইতামী, আয-যাওয়াজির 'আন ইক্‌তিরাফিল কাবায়ির (১/৫২, ১৮৫) প্রমুখ।

কখনো কখনো সেটি আরও মারাত্মক রূপ লাভ করে ব্যক্তিকে দীন থেকে বের করে দেয়, যেমন ইমাম ত্বাহাওয়ী তার আকীদায় বলেন, 'আর নিরাপদ হয়ে গেছে মনে করা, নিরাশ হয়ে যাওয়া এ দু'টি বিষয় কোনো ব্যক্তিকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়'।

সেজন্য ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ও আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জাহান্নামীদের কাজ। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৪২৩-৪২৪)।

এক আছারে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এসেছে, তিনি বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা; কেননা আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় যে তার সাথে শির্ক করবে তার ওপর তো আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।' [সূরা আল-মায়েদাহ: ৭২], অনুরূপ বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া; কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ তো কেবল কাফের গোষ্ঠীই হয়ে থাকে।' [সূরা ইউসুফ: ৭৮] তদ্রূপ বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে যাওয়া; কারণ আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপত্তা বোধ করে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীরাই।' [সূরা আল-আ'রাফ: ৯৯] বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, আছার নং ২৯১। এ বর্ণনাটি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে মারফূ' সূত্রে হাদীস হিসেবেও এসেছে, যেমনটি ইবন আবী হাতেম তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, হাদীস নং ৫২০১; বস্তুত এটি মাওকূফ বর্ণনা; যেমনটি ইবন কাসীর তার তাফসীরে ইঙ্গিত করেছেন। দেখুন, ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (২/২৭৯)।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন সূত্রে ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা, আল্লাহর দয়া থেকে বিমুখ হওয়া, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া আর আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে ভয়হীন হওয়া।' দেখুন, আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, নং ১৯৭০১; ইবন জারীর আত-তাবারী, আত-তাফসীর ৯১৯০-৯২০০;

[الأعراف:٩٩]، وقد أفردت كشف عوار من قال بذلك.

ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة، أو رأفة فصار معتوهًا، أو

থেকেও অজ্ঞ যা আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপারে জানিয়েছেন, "তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকেও নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর কৌশলকে নিরাপদ মনে করে না।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৯৯] যারা এমন কথা বলেছে আমি আলাদা গ্রন্থে তার গোপনীয়তা উন্মুক্ত করে তাদের প্রত্যেককে অপমানিত করেছি।[৮১৭]

আর আমরা বিশ্বাস করি যে, বান্দার যতক্ষণ জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর দাসত্বের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তারপর সে অবশিষ্ট থাকে তার ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বিধানে।[৮১৮] কারণ এটা (দাসত্ব করা) নবী, সিদ্দীক, শহীদ, সালেহীনদের থেকে দূরীভূত হয়নি। সুতরাং যে ধারণা করবে যে, সে উবুদিয়্যাত পরিত্যাগ করে, দাসত্বের বন্ধন থেকে বের হয়ে, স্বাধীনতার আকাশে বিচরণ করছে, দাসত্ব থেকে বের হয়ে (আল্লাহর সাথে) প্রাথমিক আহাদিয়্যাহ বা নিরন্তর এককত্বের দিকে চলে গিয়েছে[৮১৯], যাতে অন্য

ত্বাবারানী, আল-কাবীর (৯/১৫৬), নং ৮৭৮৩, ৮৭৮৪, ৮৭৮৫; বাইহাক্বী, শু'আবুল ঈমান, নং ১০৫০। ইবন কাসীর বলেন, এটি ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ। ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (২/২৭৯)।

৮১৭. ইবন খাফীফ রাহিমাহুল্লাহ এখানে সেসব সূফী তরীকাপন্থীদের মত খণ্ডন করেছেন, যারা মনে করে আল্লাহর ইবাদত হবে শুধু ভালোবাসার মাধ্যমে, যাতে ভয় ও আশার সংমিশ্রণ থাকবে না। এসব সূফীদের কারও কারও কাছ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে আশা ও ভয়কে সাধারণ মানুষের মাকাম বা অবস্থানস্থল বলত। অনুরূপ তাদের কারও কারও থেকে এসেছে সে বলতো, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তোমার জান্নাতের আগ্রহে কিংবা জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করি না। (নাউযুবিল্লাহ)।
এ সূফীদের কারও কারও পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা আরও মারাত্মক আকারও ধারণ করেছে, এমনকি তাদের কেউ কেউ বলে বেড়ায়, জগতের সবই আল্লাহর উদ্দেশ্য, তাহলে সেসবই তাঁর কাছে প্রিয় জিনিস হবে, এর ওপর ভিত্তি করে সে বলে থাকে, পূর্ণ ভালোবাসার প্রমাণ হবে একজন বান্দা সবকিছুকে ভালোবাসবে যদিও তা ফাসেকী হয় কিংবা অবাধ্যতা হয়। (নাউযুবিল্লাহ)।
এজন্যই কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, যে কেউ আল্লাহকে শুধু ভক্তি আর ভালোবাসা দিয়ে ইবাদত করবে সে তো যিন্দীক বা সরাসরি দীন বিনস্টকারী। আর যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করবে কেবল আশা দিয়ে সে তো মুরজিয়া, আর যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করবে কেবল ভয় দিয়ে সে তো হারূরী তথা খারেজী সম্প্রদায়ের লোক। আর যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করবে ভালোবাসা, ভয় ও আশা দিয়ে সে হচ্ছে প্রকৃত ঈমানদার ও তাওহীদবাদী।
দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৬১-৭৪, ৮১-৮৫, ২০৭-২১৩, ২৪০-২৪৩; ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (২/৭৬-৮৪)।

৮১৮. অর্থাৎ শরী'আত কর্তৃক সামর্থ্যে যে সীমা নির্ধারিত আছে তার মাঝে অবস্থান করে যতটুকু সম্ভব ততটুকু ইবাদত করে যেতে হবে। কোনো কারণে সামর্থ্যে ঘাটতি হলে যতটুকু আছে ততটুকুতে শরী'আত যা করতে বলেছে সেটা তাকে করে যেতেই হবে। কিন্তু একেবারে ইবাদত মুক্ত হওয়া যাবে না। আর যখন শরী'আতের দৃষ্টিতে সে সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে ধরা হবে তখন আর সামর্থ্যের বাইরের কোনো কিছুর জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না।

৮১৯. এককত্ব বা আহাদিয়্যাহ শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবন আরাবীর মত হচ্ছে, মানুষ ও অন্য কিছুর কমন

مجنونًا، أو مبرسمًا وقد اختلط في عقله، أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل، وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.

কারও সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, (অর্থাৎ স্রষ্টার সাথে মিশে গেছে) সে তো নিশ্চিত কাফির।(৮২০) তবে যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা রোগগ্রস্ত হয়, ফলে পাগল অথবা মাতাল

অস্তিত্বকে বলা হবে আহাদিয়্যাত, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদ। দেখুন, ইবন আরাবী, কিতাবুল আহাদিয়্যাহ, পৃ. ৩। ইবন আরাবী রাসায়িল সমগ্র।
নাকশাবান্দীর মত হচ্ছে, আহাদিয়্যাহ হচ্ছে, গুণের দিক থেকে নামের সাথে মিল হয়ে যাওয়া, যাতে অপরাপর সকল গুণ, নাম, সম্পর্ক বিলীন হয়ে যায়। দেখুন, নাকশাবান্দী, জামে'উল উসূল, পৃ. ৯১। তাদের আহাদিয়্যাত এর সংজ্ঞা থেকে বুঝা গেল যে, তারা আহাদিয়্যাত বলতে ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদ বুঝে থাকে। যেমনটি তাদের কোনো কোনো মাশাইখদের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। যেমন সূফীদের কারও কারও বক্তব্য,
"হাকীকত যখন সঠিক রূপ লাভ করবে তার শর্ত অনুসারে এমনভাবে যে সেটার সাথে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, সেটাকেই বলা হয়, আহাদিয়্যাহ স্তর, যাতে সকল নাম ও গুণ লোপ পেয়ে যায়। আর এটাকে জাম'উল জাম'উ ও বলা হয়, আবার হাকীকাতুল হাকায়িকও বলা হয়, আবার 'আমা' ও বলা হয়।" (নাউযুবিল্লাহ)।
"যখন মানুষ তার জাম'উ (একত্রিভূত) অবস্থায় আল্লাহর দিকে সফর করে, তখন সে সবকিছুতে আল্লাহকে দেখতে পায়, তখন সে ওয়াহদানিয়্যাত এর মাক্কামে অবস্থান করে, তারপর যখন জাম'উ সম্পন্ন হয়, তখন হক্ব (আল্লাহ) তাকে নিয়ে সফর করেন, সে তখন যাই দেখে তাই অস্বীকার করে, এ অস্বীকার তখন তার চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, আর অস্তিত্ব তখন হক্বেরই থাকে, আর এটিই হচ্ছে আহাদিয়্যাত এর মাকাম।... দেখুন, আল-কাশফু আন হাকীকাতিস সূফিয়্যাতি লি আওয়ালা মাররাহ, পৃ. ১৯৯-২০০; এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/১৬৫-১৬৬)।

৮২০. কিছু মানুষের এমন স্তরে পৌঁছে যাওয়ার দাবি করা, যেখানে গেলে তার ওপর থেকে শরী'আতের বন্ধন অবশিষ্ট থাকবে না, এটি মূলত চরমপন্থী কিছু সূফীদের কথা। তারা বলে থাকে যখন তুমি ইয়াক্বীন বা দৃঢ়তার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন তোমার থেকে ইবাদতের দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। আর তারা এর জন্য কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে থাকে, আয়াতটি হচ্ছে, "আর আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদত করুন।" [সূরা আল-হিজর: ৯৯]
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, সূফীদের মধ্যে একদল আছে যারা হাকীকত ও মারেফতের দাবি করে, তারা মনে করে থাকে, নির্দেশ ও নিষেধ তো কেবল তার জন্য আবশ্যক যে নিজের জন্য কাজ দেখে, নিজের জন্য কিছু করা সাব্যস্ত করে, কিন্তু যে ব্যক্তি দেখে তার কর্ম তো সৃষ্ট অথবা সে তা করতে বাধ্য, আর আল্লাহ স্বয়ং সেটা নিয়ন্ত্রণ করছেন, যেমন যাবতীয় নড়াচড়া করার জিনিস তিনি নড়াচড়া করেন, (এ পর্যায়ে পৌঁছে গেলে) সে ব্যক্তির উপর থেকে আদেশ-নিষেধ, ওয়াদা ও ও'য়ীদ সব রহিত হয়ে যায়। আর তারা বলে থাকে, যে কেউ 'ইরাদাহ' অর্থাৎ ইচ্ছা কেবল তাঁরই দেখতে পবে, তিনি আল্লাহই সবকিছুর ইচ্ছা করেন এটাই দেখবে তখন তার আর ইবাদতের বাধ্যবাধকতা থাকে না...। [নাউযুবিল্লাহ]
শেষে তিনি বলেন, আবার কখনও কখনও তারা আল্লাহর বাণী "আর তুমি ইয়াকীন না আসা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত কর" এর অপব্যাখ্যা করে, তারা এখানে ইয়াকীন অর্থ করে 'হাকীকাত চিনতে পারা'। তাদের এসব কথা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট কুফরী।" মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/১৬৫-১৬৬)।
বরং শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, যারা এদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করবে সে যে কাফের হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে একই হুকুম হবে যে তাদেরকে আল্লাহর ওলী মনে করবে। আর ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ তরীকতের ইমামদের মধ্যে যারা বিশুদ্ধ পথে রয়েছে তাদের ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, এ রকম আকীদাহ-বিশ্বাস কুফরী ও দীন থেকে বের হয়ে যাওয়া।
দেখুন, সাহরাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ (এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন এর পার্শ্বে) (৫/৭১-৭২); শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১৬৫-১৭১; ৪৩৩, ৪৪৫-৪৪৬; ১১/৪০১-৪২০;

অথবা অনবরত বাজে কথা বলে, অথবা বুদ্ধি তালগোল পাকানো ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, অথবা এমন বেহুঁশ হয়ে যায়, যার থেকে বিবেকের বিধান রহিত হয়, যার ভালো মন্দের পার্থক্য করার জ্ঞান লোপ পায়, কোনো কিছু চেনার অবস্থায় না থাকে[৮২১], তাহলে সে তো দীন ও মিল্লাতের বন্ধনের বাইরে, শরী'আতের নির্দেশনা আপতিত হওয়ার বিপরীতে তার অবস্থান।[৮২২]

ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (৩/১১৮-১১৯); শাওকানী, কুতরুল ওলী আলা হাদীসিল ওলী, পৃ. ৪৬৮-৪৭০; ইহসান ইলাহী যহীর, আত-তাসাওউফ, পৃ. ২৬২-; রাযী, ই'তিকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৭৪; আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২৮৯।

উপরের ইবন খাফীফ এর বক্তব্য, 'দাসত্ব থেকে বের হয়ে (আল্লাহর সাথে) প্রাথমিক আহাদিয়্যাহ বা নিরন্তর একককত্বের দিকে চলে গিয়েছে...' অর্থাৎ কেউ যদি ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়, যদি মনে করে অস্তিত্ব কেবল একটিই, আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কারও অস্তিত্বই নেই, সকল সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব ধারণা ও অনুমান মাত্র, সেখানে কোনো স্রষ্টা ও সৃষ্টি নেই, ইবাদতকারী ও ইবাদতকৃত সত্তা নেই, বরং সকল কিছু একই জিনিস, স্রষ্টার অস্তিত্ব সেটা কেবল সৃষ্টির অস্তিত্বই। (নাউযুবিল্লাহ)

এ ব্যাপারে বিস্তারিত খণ্ডনের জন্য দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন ৩/১৫১-১৫২, ৩৮৩।

৮২১. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ 'তাকলীফ' এর মাসআলাটি আলোচনা করেছেন, সেটি কি 'ফানা' বা বিলীন হয়ে যাওয়ার দাবি করার মাধ্যমে কারও ওপর থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে? এ ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তা হচ্ছে,

কোনো মানুষের যদি এমন কোনো কারণ সংঘটিত হয়, যাতে তাকে মা'যুর (উযর বা সঙ্গত কারণ রয়েছে) মনে করা হবে, যার ফলে সে এমন বিবেকশূন্য হয়ে যায় যার দ্বারা সে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে অসমর্থ হয়ে যায় তখন সে হয়ে যায় ঘুমন্ত ব্যক্তির পর্যায়ে, বেহুঁশ হওয়া ব্যক্তির অবস্থায়, এমন মাতালের হুকুমে যার মাতলামিতে গুনাহ লেখা হয় না, যেমন মদ হারাম হওয়ার আগে কেউ সেটার দ্বারা মাতাল হলো অথবা তার মুখে মদ ঢেলে দেয়া হলো অথবা তাকে মদ খেতে বাধ্য করা হলো (যা অধিকাংশ ফকীহের মত)।

কিন্তু যদি কোনো মানুষ এমন কোনো কারণে মাতাল হয় যাতে তার কোনো উযর নেই, হারাম কারণে সেটা সংঘটিত হয়, তবে এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি শরী'আত মানার বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত বলার ব্যাপারে আলেমগণের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে...।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৩১২)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, 'কখনও কখনও কারও কারও ওপর এমন হাল বা অবস্থা প্রবল হয়ে যায় যা তাকে এক প্রকার 'হুলুল' (অবতরণ) অবস্থায় নিপতিত করে অথবা 'ইত্তেহাদ' (আরোহন) অবস্থায় উপনীত করে। বস্তুত এ ধরনের (ইত্তেহাদ) তথা আরোহন এর দাবিতে হক্ব ও বাতিল দুটি দিক রয়েছে। যখন তার ওপর এমন অবস্থা এসে পড়ে যা তার বিবেককে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত করে দেয়, অথবা তার প্রিয়জন ছাড়া আর সবকিছু থেকে নিজে বিমুক্ত হয়ে পড়ে, আর সে অবস্থায় যাওয়ার বিষয়টি কোনো গুনাহের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না হয়, তাহলে তাকে সেখানে মা'যুর মনে করা হবে, যার কারণে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না, যতক্ষণ সে অপ্রকৃতিস্থ থাকবে। কারণ পাগলের থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তার হুঁশ আসছে, আর যদি তার এ অবস্থায় কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে সে আল্লাহর সে বাণীর অধীন হবে, যাতে আল্লাহ আমাদেরকে বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন, 'হে আমাদের রব আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি।' [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬] তিনি আরও বলেন, 'আর তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই যাতে তোমরা ভুল করে থাক।' [সূরা আল-আহযাব: ০৫] কিন্তু যদি উক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়ার কারণটি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে সে মাতলামীর কারণে মা'যুর বলে বিবেচিত হবে না।

আর 'হুলুলী' সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে কারও কারও ওপর তার কলবের দর্শন কলবের তাজাল্লী প্রবল হয়ে পড়ে, ফলে সে মনে করে বসে যে সে আল্লাহকে তার মাথার দু' চোখ দিয়ে দেখেছে...নিঃসন্দেহে এগুলো ভুল...। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/২৯৬-২৯৭); আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৪৩৫)...।

৮২২. অর্থাৎ যে কেউ মনে করবে ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদে থাকার কারণে তার ওপর থেকে

ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم، وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم، بغير الوحي من قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.

و «الفراسة» حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء.

আর যে কেউ দাবি করবে যে, সে বান্দাদের প্রকৃত অবস্থা দেখতে পাচ্ছে, সে আল্লাহর কাছে তাদের অবস্থান ও মর্যাদাসমূহ জেনে গেছে, আর এ জানার দাবির ভিত্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া কোনো ওহীর ওপর করা হয়নি, তাহলে সে দীন ও মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে। আর যে কেউ দাবি করবে যে, সে সৃষ্টির পরিণাম ও তাদের গন্তব্যস্থল জানে, আর তারা কিসের ওপর মারা যাবে, কিসের ওপর তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি হবে, আর এ দাবির ভিত্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর ওপর ভিত্তি করে করা হয়নি, সে আল্লাহর গযবে নিপতিত[৮২৩]।

আর 'ফারাসাত'[৮২৪] (লক্ষণ দেখে নির্ধারণ) সত্য, তবে সেটা অবশ্যই আমাদের বর্ণিত

শরী'আত মানার বাধকতা রহিত হয়ে গেছে সে তো কাফের বলে বিবেচিত হবে।

৮২৩. কারণ এগুলো গায়েবী বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। যে কেউ গায়েবী বিষয়ের দাবি করবে সে আল্লাহর সাথে তাঁর রুবুবিয়াতে শির্ক করলো। মহান আল্লাহর বলেন, "বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না এবং তারা উপলব্ধিও করেনা কখন উত্থিত হবে।" [সূরা আন-নামল: ৬৫]
দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৪/৩৬৫); শাওকানী, কুতরুল ওলী, পৃ. ৫০৪-৫১৭। গায়েবী বিষয়েল দাবিদারদের প্রকার-প্রকরণ, তাদের শির্ক ও তা খণ্ডনের জন্য আমার 'আশ-শির্ক ফিল ক্বাদীম ওয়াল হাদীস' গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

৮২৪. 'ফারাসাত' এর সাধারণ অর্থ ইংরেজিতে ফ্রাকাস, physiognamy বাংলায়: পর্যবেক্ষণ অথবা মুখাবয়ব দেখে চারিত্রিক গুণাবলি নির্দেশপদ্ধতি অথবা লক্ষণ দেখে প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ।
এ শব্দটির বেশ কয়েকটি সংজ্ঞা ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নিজেও একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হচ্ছে, 'সেটা একটি ভাব যা অন্তরের ওপর আঘাত করে, অন্য কিছু হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে, সে ভাবটি অন্তরে এমনভাবে এসে আছড়ে পড়ে যেমন কোনো সিংহ তার শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথবা তা এমন একটি নূর বা আলো যা আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরে নিক্ষেপ করেন, তখন তার অন্তরে কোনো কিছুর উদয় হয়, পরবর্তীতে তার অন্তরে যে রকম উদিত হয়েছে সেটাই বাস্তব হয়ে যায়, আর সে আলো তার চোখে ধরা পড়ে যাতে সে এমন কিছু দেখতে পায় যা অন্য কেউ দেখতে পায় না।
তিনি আরও বলেন, এই 'ফারাসাত' ঈমানের শক্তি অনুসারে হয়ে থাকে। সুতরাং যার ঈমান যত শক্তিশালী তার ফারাসাত তত বেশি তীক্ষ্ম হয়ে থাকে।
ইমাম আবদুল কারীম আল-কুশাইরী তার 'রিসালা' গ্রন্থে প্রথম সংজ্ঞাটির মতো সংজ্ঞাই প্রদান করেছেন।
'ফারাসাত' প্রকৃত পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। তার পক্ষে কুরআন থেকে দলীল দেয়া হয় নিম্নের এ আয়াত দিয়ে, আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।" [সূরা আল-হিজর: ৭৫] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ সহ একদল আলেম বলেন, অর্থাৎ ফারাসাত শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্য। এ মতটিকেই ইমাম ইবন জারীর ও ইমাম আবু 'ঈসা আত-তিরমিযী পছন্দ করেছেন। আর ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এ মতটিকে ইবন আব্বাস এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

কারও কারও মতে এখানে 'মুতাওয়াসসিমীন' দ্বারা 'শিক্ষা গ্রহণকারী' বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে, এর অর্থ 'চিন্তাশীল'। অপর কারও মতে, এর অর্থ, 'দৃষ্টিপ্রদানকারী'। ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, এসব বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। দেখুন, মাদারিজুস সালেকীন (২/৪৮৩)।

তবে 'ফারাসা' শুদ্ধ প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে বিখ্যাত যে দলীলটি বেশি ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে, ইবন 'উমার, আবু সা'ঈদ ও আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, "তোমরা মুমিনের ফারাসাত থেকে বেঁচে থাক; কারণ সে আল্লাহ কর্তৃক প্রাপ্ত নূরের মাধ্যমে তাকায়।"

এ হাদীসটি যারা সংকলন করেছেন তারা হচ্ছেন,

১- তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৩১২৭।
২- ত্বাবারী, আত-তাফসীর (১৪/৪৬)।
৩- ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর (৮/১২১)।
৪- আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৪/৯৪)।
৫- উক্বাইলী, আদ-দু'আফা (৪/১২৯)।
৬- হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ (১০/২৬৮)। আর তিনি এর সনদকে হাসান বলেছেন।
৭- 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আররাক্ব আল-কিনানী, তানযীহুশ শরী'আতিল মারফূ'আহ 'আনিল আহাদীসিস শানী'আতিল মাওযূ'আহ (২/৩০৫-৩০৬)। আর তিনিও এর সনদকে হাসান বলেছেন।
৮- আল-আজলূনী, কাশফুল খাফা ও মুযীলিল আলবাস (১/৪২-৪৩)। আর তিনি এটার সনদকে হাসান বলেছেন।
৯- শাওকানী, আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃ. ২৪৩-২৪৪। তারপর তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী, তবে সহীহ বলা যাবে না। তারপর তিনি হাদীসটির অনেক শাহেদ বা সাক্ষ্য বর্ণনা নিয়ে আসেন।
১০- ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১২/৩৮৮)। আর তিনি তা বর্ণনা করার পর কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। দেখুন, তাখরীজ হাদীস ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৫৬২।

এ বিখ্যাত হাদীসের ব্যাপারে এ হচ্ছে আলেমগণের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এ হাদীসের ওপর টীকা দিয়ে বলেন, 'এ 'ফারাসাত' কারও জন্য অর্জিত হয় একমাত্র আল্লাহর নৈকট্যের কারণে; কারণ অন্তর যখন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, তখন হক্ব জানতে ও অর্জন করতে যেসব খারাপ বিষয়াদি বাঁধা হিসেবে থাকে সেসব প্রবণতা তার থেকে দূরীভূত হয়ে যায়, আর সে হক্বকে নৈকট্য অনুযায়ী যথাযথ তাক থেকে গ্রহণ করতে পারে, আর নৈকট্য অনুযায়ী তার কাছে হক্বের আলো প্রজ্বলিত হতে থাকে, তখন সে উক্ত আলোতে এমনসব কিছু দেখতে পায় যা দূরে অবস্থানকারী ও পর্দার অন্তরালে থাকা ব্যক্তির পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না।' দেখুন, আর-রূহ (২/৬৬৮-৬৬৯)।

অন্যত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম 'ফারাসাত'কে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন:

এক. 'ঈমানী ফারাসাত', আর এর দিকেই উপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দুই. 'সাধনা, ক্ষুধা ও একাকিত্ব অবলম্বনের মাধ্যমে অর্জিত ফারাসাত। তিনি বলেন, কারণ যখন আত্মা অন্য সব বাধা থেকে মুক্ত হয় তখন তার এক ধরনের 'ফারাসাত' অর্জিত হয়, আত্মা যতটুকু অন্যকিছু থেকে মুক্ত হবে ততটুকু কাশফ বা কোনো কিছু প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি অর্জিত হবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, এ 'ফারাসাত' কর্মে কাফের ও মুমিন উভয়েই সমভাবে অংশীদার। এ জাতীয় কিছু হওয়া ঈমান ও ওলী হওয়ার প্রমাণ নয়।

তিন. 'সৃষ্টিগত ফারাসত' আর তা হচ্ছে সৃষ্টির বিবিধ অবস্থার মাধ্যমে চারিত্রিক বিষয়ে 'ফারাসাত' লাভ করা। যেমন লোকেরা বলে থাকে, যার দো চোয়ালে গোশ্ত বেশি হবে সে শক্ত প্রকৃতির লোক হবে। যার ঘাঁড় বেশি খাট হবে সে বেশি ধূর্ত হবে, ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন,

১- ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (২/৪৮২-৪৯৫)।

ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته. ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية.
وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.

মূলনীতির ওপর নির্ভর করে হতে হবে। আর তা আমরা যা উপরে লিখেছি সেটার (অর্থাৎ গায়েবী বিদ্যার) অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮২৫]

আর যে কেউ মনে করবে মহান আল্লাহর গুণাবলি তার গুণাবলির মত, আর এর দ্বারা সে (আল্লাহ কর্তৃক তাকে প্রদত্ত) ক্ষমতা, নিরাপত্তা, তাওফীক ও হিদায়াত ব্যতীত আল্লাহর প্রাচীন গুণাবলির দিকে ইঙ্গিত করে, তাহলে তো সে হুলুল[৮২৬] বা অবতারবাদ এর

২- ইবনুল কাইয়্যেম, আর-রূহ, পৃ. ৩২১-৩২৪।
৩- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৭৫৩-৭৫৪)।
৪- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৩১৩)।
৫- আব্দুল কারীম আল-কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, পৃ. ২৩১।
৬- নাকশাবান্দী, জামে'উল উসূল, পৃ. ২৯৫, ৩৫৩-৩৫৪।
৭- তাবারী, আত-তাফসীর (১৪/৪৫-৪৭)।
৮- ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (৪/৪৬১)।
৯- ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস (৩/৪২৮)।
১০- ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব (৬/১৬০)।
১১- রাযী, আল-ফারাসাত, পৃ. ১০৬, ১০৯।

৮২৫. দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, কিতাবুর রূহ (২/৬৭০)।

৮২৬. 'হুলুল' শব্দটি হাল্লা ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে। যার অর্থ প্রবিষ্ট করানো। সেটা তিন প্রকার:
এক. সত্তার ভেতরে সত্তাকে প্রবিষ্ট করানো। অর্থাৎ কোনো কিছুর মাঝে অপর কিছু প্রবিষ্ট হয়ে এক সত্তায় পরিণত হওয়া, যা হিন্দুদের অবতারবাদের মত। তারা মনে করে স্রষ্টা কখনও কখনও তার কোনো কোনো সৃষ্টিতে নিজেকে প্রবিষ্ট করে থাকেন বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে। যেমন পানি আর লবন একসাথ হয়ে মিশে গিয়ে আরেকটি সত্তায় পরিণত হওয়া। এরকম মিলে মিশে যাওয়া আল্লাহর জন্য অসম্ভব; কারণ আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পূর্ণরূপে অন্য কিছুতে মিশে গেলে আল্লাহর আলাদা অস্তিত্ব থাকে না, যা কল্পনা করাও গুনাহের কাজ। এটার অপর নাম, 'আল-ইত্তেহাদ আল-আইনি আয-যাতী' যা একটি সত্তা স্বয়ং অপর সত্তাতে প্রবেশ করে একাকার হওয়া।
দুই. কোনো সত্তার গুণাবলি অপর সত্তাতে প্রবেশ করানো। এটি সৃষ্টির ব্যাপারে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যারা মনে করবে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণাবলি কোনো সৃষ্টির গুণাবলির মাঝে প্রবিষ্ট করিয়ে থাকেন তারা কাফের। এখানে সম্ভবত ইবন খাফীফ এ গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যারা মনে করে থাকে যে, স্রষ্টার গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলির ভিতরে প্রবেশ করে থাকে।
তিন. আর যদি কেউ 'হুলুল' দ্বারা আল্লাহর গুণাবলি সৃষ্টির কারও গুণাবলিতে থাকা সম্ভব এ অর্থে বলা হয় যে, আল্লাহর তাওফীক, তাঁর সাহায্য, তাঁর হিদায়াত বান্দার মাঝে পাওয়া যাবে, যা 'আল-ইত্তেহাদ আল-হুকমি আন-নুও'য়ী' বা 'এক ধরনের বিধানগত ঐক্য হওয়া'কে বুঝায়, যেমন ওলীর হাদীসে এসেছে, 'বান্দা আমার নফল ইবাদত করার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি, যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে....' আল-হাদীস, তাহলে এ অর্থটি বিশুদ্ধ। কারণ এখানে আল্লাহর সত্তা অপর সত্তাতে প্রবেশ করেনি, আল্লাহর গুণও অপরের গুণে প্রবেশ করেনি। বরং প্রবেশ করেছে তার মা'রেফাত যা পরিচয়-জ্ঞান, ভালোবাসা, আর সে যা ভালোবাসে, যা অপছন্দ করে তাতে রয়েছে তার রবের সাথে একাত্মতা।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৩৮১-৩৯৭; ৪৬১-৪৬৩; আল-জাওয়াবুস সাহীহ (২/১৭৯-১৮২), (৩/১১৬-১১৭)। ইবন খাফীফ রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য, 'সে (আল্লাহ কর্তৃক তাকে প্রদত্ত) ক্ষমতা, নিরাপত্তা, তাওফীক ও হিদায়াত' এটা বলে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, এ অর্থটি ব্যতীত অন্য যেকোনো অর্থেই 'হুলুল' বুঝানো হোক সেটা কুফরী।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কোথাও কোথাও এটা এসেছে

প্রবক্তা, এর মাধ্যমে সে লাহুতী[৮২৭] হওয়ার দাবী করেছে অর্থাৎ নিজেকে ইলাহ হওয়ার দাবি করেছে এবং আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার কথা বলেছে, আর এটা অবশ্যম্ভাবীভাবে কুফরী।

যে, 'আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদীদের কলবে প্রবেশ করেন' সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে: আল্লাহর মা'রেফাত, তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করা... অনুরূপভাবে যদি বলা হয়, আল্লাহর নূর ও আল্লাহর হিদায়াত (কারও ভেতরে প্রবেশ করে) সেটাও এ অর্থেই নিতে হবে। আর এটাকে কখনও রূহও বলা হয়েছে যা ঈমানদারের কলবে প্রবেশ করে। সেটাকেও উক্ত অর্থেই নিতে হবে।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ (২/১৭৯), (৩/১১৬-১১৭); দারউত তা'আরুদ্ব (৪/১২০)।

আর 'হুলুলী' এমন সম্প্রদায়কে বলা হয় যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো কোনো বান্দার মাঝে প্রবেশ করেন। অথবা যারা নাসারাদের মত বলে 'লাহূত প্রবেশ করেছে নাসূতের মাঝে'। এটি মূলত কুফরী ও শির্কী আকীদাহ, যা মূর্তি পূজারীদের মূল বিশ্বাস, তারা মনে করে থাকে জগতের বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুতে স্রষ্টা প্রবেশ করে থাকেন। তাদের এসব আকীদাহ-বিশ্বাস 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর হাওয়ারীদের মৃত্যুর পর গ্রীকদর্শন ও ধর্ম থেকে নাসারাদের মধ্যে প্রথমে প্রবেশ করে। তারপর সেটার কারণে নাসারারা শতধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে তা চরমপন্থী শিয়াদের মধ্যে প্রবেশ করে, যারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মাঝে সেটার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলত। তারপর সেটা চরমপন্থী সূফীদের মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, হুসাইন ইবন মানসূর আল-হাল্লাজ। তার থেকে বর্ণিত আছে, সে বলত: যে কেউ নিজের আত্মাকে আনুগত্যের মাধ্যমে পরিপাটি করতে পারবে, প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার স্বাদের বস্তু গ্রহণ না করার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারবে, আর এভাবে সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাকামে চড়তে পারবে, তারপর সে অনবরত নিজেকে পবিত্র করতে থাকবে আর পরিচ্ছন্ন করার যাবতীয় স্তর অতিক্রম করতে থাকবে, অবশেষে সে মানবীয় প্রকৃতি থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং তার মাঝে মানবীয় সামান্য কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকবে না তখন তার মাঝে 'ইলাহ' এর রূহ প্রবিষ্ট হবে, যে রূহ 'ঈসা ইবন মারইয়ামের মাঝে প্রবিষ্ট হয়েছিল। আর তখন সে যা চাইবে সবই তার চাওয়ার মত হয়ে যাবে, তখন তার সকল কাজ আল্লাহর কাজ হয়ে যাবে।' (নাউযুবিল্লাহ) অনুরূপ সে বলেছিল, আনাল হাক্ক বা "আমিই হক্ব বা সত্য" আরও বলেছিল, সুবহানী বা "আমার কত পবিত্রতা।" (নাউযুবিল্লাহ)

বস্তুত হাল্লাজ এ চিন্তাধারা দু'টি ধর্ম ও দর্শন থেকে নিয়েছে। এক. ভারতীয় দর্শন, যাকে বলা হয় 'সনৈ ব্রহ্মস্পতি' আমিই সেই। ফারসীতে এটাকে বলা হয়, 'হুমা উসত'। দুই. খ্রিস্টান নাসতূরী দর্শন। যার আলোচনা আমরা আগেই করেছি।

এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- ল. মাসিনিওন দব ক্রাউস, আখবারুল হাল্লাজ, পৃ. ৭৩, ৯৩, ১০৮।
২- শা'রানী, আত-তাবাবাকাতুল কুবরা (১/২০১)।
৩- জামীল সালীবা, আল-মু'জামুল ফালসাফী, পৃ. ৭৫।
৪- রাযী, ই'তিক্বাদাতু ফিরাকিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ১১৬-১১৭।
৫- আসফারায়ীনী, আত-তাবসীর ফিদ-দীন, পৃ. ৭৭-৮৭।
৬- বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব, পৃ. ২৪৬-২৪৮।
৭- আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২৮৮।
৮- ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১৭১-১৭২, ২৯৬-২৯৯, ৪৮০, ৪৮৮।

৮২৭. 'লাহূত' শব্দটির অর্থ (খ্রিস্টান) নাসারাদের নিকট এমন বিদ্যা যাতে আল্লাহর অস্তিত্ব, তার সত্তা ও গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। দেখুন, জামীল সালীবা, আল-মু'জামুল ফালসাফী, পৃ. ১৬০।
কিন্তু ইবন খাফীফ রাহিমাহুল্লাহ'র উদ্দেশ্য এটা নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন যারা বলবে আল্লাহর গুণাবলি তার গুণাবলির মাধ্যমে স্থিতি লাভ করেছে, সে নাসারাদের নাসতূরিয়্যাহ ফির্কাদের মতের অনুরূপ মত প্রদান করেছে, যারা বলে থাকে: নিশ্চয় 'লাহূত' (আল্লাহ) তিনি 'নাসূত' (মানব) সত্তায় প্রবেশ করেছে এমনভাবে যেমন পানি কোনো গ্লাসে প্রবেশ করে। তখন 'লাহূত' এর অর্থ ইলাহ বা মা'বূদ, আর 'নাসূত' বলতে মানব তথা 'ঈসাকে বুঝানো হয়। সুতরাং যারা আল্লাহর গুণাবলিকে বান্দার গুণাবলির সাথে সংযুক্ত হয়ে অবস্থান করছে মনে করবে তারা তো খ্রিস্টান নাসতূরিয়্যাদের আকীদাহ'য় বিশ্বাসী হয়ে গেল।

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول النصارى.

আর আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আত্মা সৃষ্ট।[৮২৮] যে ব্যক্তি বলবে যে, সেটা সৃষ্ট নয় তার কথা নাসতুরিয়া[৮২৯] খ্রিস্টানদের কথাসদৃশ। এটা মহান আল্লাহর সাথে কুফরী।

---

৮২৮. এর মাধ্যমে ইবন খাফীফ কয়েকটি ফির্কা ও গোষ্ঠীর বক্তব্য খণ্ডন করছেন, যারা এ মারাত্মক আকীদাহ পোষণ করার মাধ্যমে দীন ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে, যারা বিশ্বাস করে যে, রূহ বা আত্মা ক্বাদীম বা সর্বপ্রাচীন। রূহ সৃষ্ট ও নতুন করে আগত নয়। আর সেসব সম্প্রদায় হচ্ছে,
১- কিছু কিছু শিয়া-রাফেযী সম্প্রদায়ের লোক।
২- অধিকাংশ সেসব দার্শনিক যারা আত্মায় বিশ্বাস করে তারা সেটাকে ক্বাদীম বা সর্বপ্রাচীন বলে বিশ্বাস করে।
৩- অধিকাংশ যিন্দীক বা দীনবিধ্বংসী আকীদাহ পোষণকারী তাসাওউফপন্থী সম্প্রদায়। দেখুন, আবু হাইয়ান, আল-বাহরুল মুহীত্ব (৬/৫৫)।
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, এ মাসআলায় জগতের কেউ পদস্খলিত হয়েছে, বনী আদমের কয়েকটি গোষ্ঠী পথভ্রষ্ট হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সাহাবায়ে কিরামের যুগ গত হয়েছে তারা সবাই এটিকে সৃষ্ট ও নতুন বলার ক্ষেত্রে মতভেদ করেননি। তারা সবাই তাই বিশ্বাস করতেন। অবশেষে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটলো কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা ও জানার ক্ষেত্রে যাদের ত্রুটি সুস্পষ্ট, তারা মনে করতে লাগলো যে, রূহ বা আত্মা বুঝি ক্বাদীম (প্রাচীন) অনিত্য, অসৃষ্ট। দেখুন, আর-রূহ ২১০--। আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/২১৭)।
বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহ'র দলীল-প্রমাণাদি সাব্যস্ত করছে যে, রূহ সৃষ্ট। দেখুন, ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৫৯৬); আর-রূহ ২১১—; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪৪৪)।
বরং ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর ওপর মুসলিমদের ইজমা' বর্ণনা করেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/২১৬-২১৭); আর তার থেকে ইবনুল কাইয়্যেমও তা উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন, আর-রূহ ২১৫।
অনুরূপভাবে রূহ সৃষ্ট হওয়ার ওপর আরও যারা ইজমা' বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী, আল-বাহরুল মুহীত্ব (৬/৫৫); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৮/৪০৪); সুয়ূত্বী, শারহুস সুদূর বি শারহি হালিল মাওতা ওয়াল কুবূর, পৃ. ৪১৯; আবুল ফাদ্বল মাহমূদ আলূসী, রূহুল মা'আনী (১৫/১৫৬)।
এমনকি কালামশাস্ত্রবিদরাও রূহকে মাখলূক বা সৃষ্ট বলে থাকেন। দেখুন, তাফতাযানী, শারহুল মাকাসিদ (৩/৩২০); আবু হামেদ আল-গাযালী, মা'আরিজুল কুদস পৃ. ১০৫; ফখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর (২১/৩২)। বরং কালামশাস্ত্রবিদদের মাঝে কেউ কেউ রূহের আলোচনা করলেও সেখানে এ বিষয়টির অবতারণা করেননি, যেমন বাইজুরী তার জাওহারাতুত তাওহীদ, পৃ. ৩৫০-৩৬০।
তবে মু'তাযিলাদের কেউ কেউ রূহকে আপেক্ষিকভাবে ক্বাদীম 'অনিত্য' বলেছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নাযযাম, আহমাদ ইবন খাবেত্ব। দেখুন, শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/৫৬); বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব, পৃ. ২৭৪।
এ ব্যাপারে জানার জন্য দেখুন,
১- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/২২০-২৩১)।
২- ইবনুল কাইয়্যেম, আর-রূহ ২০২-২১৮।
৩- ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৫৬২-৫৬৪)।

৮২৯. নাসতূরিয়্যাহ সম্প্রদায় নাসারাদের একটি ধর্মীয় উপদল যারা সাধু নাসতূর এর দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। যিনি খলীফা মামুনের সময় তার মতবাদ প্রকাশ করেন। যিনি ইঞ্জীলের মধ্যে ব্যাখ্যা করে তার নিজের বক্তব্য প্রবেশ করিয়েছিলেন। বস্তুত নাসারাদের মধ্যে তার সম্পৃক্ততা মু'তাযিলাদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার মতো। যিনি মনে করেছেন, 'আল-কালেমা' বা বাণী 'ঈসার শরীরের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল যেমনিভাবে সূর্যের আলো কোনো ক্রিস্টালের উপর পড়ে থাকে। তিনি মালকানিয়্যাদের মতবাদের বিরুদ্ধে গিয়েছেন যারা মনে করতো যে 'আল-কালেমা' বা বাণী 'ঈসার সাথে একত্র হওয়া কেবল সংমিশ্রিত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে তিনি

النسطورية- في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.

ومن قال: إن شيئًا من صفات الله عز وجل حالٌّ في العبد، وقال بالتبعيض على الله فقد كفر؛ والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حالٌّ في مخلوق، وأنه كيف ما تُلي وقُرئ وحُفظ، فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس، ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل

আর যে বলবে, আল্লাহর কোনো সিফাত বা গুণ বান্দার মধ্যে প্রবিষ্ট অথবা আল্লাহকে অংশ বা অঙ্গ বলবে, সে কাফির।[৮৩০]

আর কুরআন আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়[৮৩১], সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্টও নয়।[৮৩২] সেটা যেভাবেই পড়া, তিলাওয়াত করা বা মুখস্থ করা হোক— সেটা মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণ। পাঠ করা হলে সেটার পঠিত অংশ (ও পাঠ করা), অনুরূপ তিলাওয়াত করা হলে সেটার তিলাওয়াতকৃত অংশ (ও তিলাওয়াত করা) কখনো একই জিনিস নয়;[৮৩৩] কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল গুণাবলি ও নামসহ অসৃষ্ট। যে কেউ এটি ভিন্ন অন্য কিছু বলবে সে

ইয়া'কূবিয়্যাদেরও বিরোধিতা করেছেন, যারা মনে করতো যে, 'আল-কালেমা' বা বাণী 'ঈসার সাথে একত্র হওয়া কেবল প্রকাশ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

এ উপদলটি মনে করে থাকে, ছেলে সর্বদা পিতা থেকে জন্ম নিতেই থাকে, তবে সে সন্তান শরীর ধারণ করেছে ও এক হয়েছে মাসীহ এর শরীরে যখন তিনি জন্ম নেন। তাই হুদুস বা নতুনত্ব কেবল শরীর ও নাসূত এর জন্য প্রযোজ্য। এভাবে তিনি ইলাহ ও মানব একাত্ম হয়েছেন। তারা বলে, 'ঈসার মাঝে দু'টি জাওহার বা মৌলিক জিনিস, দু'টি প্রকৃতি। একটি প্রাচীন জাওহার, অপরটি নতুন জাওহার। পূর্ণ ইলাহ ও পূর্ণ মানুষ। এভাবে একত্রিত হওয়ার কারণে ক্বাদীম বা প্রাচীন তার ক্বাদীমত্ব হারায়নি, যেমনি মুহদাস বা নতুন তার নতুনত্ব হারায়নি। তারা আরও বলে, হত্যা (নাঊযুবিল্লাহ) কাণ্ড নাসূত (মানুষ) হিসেবে মাসীহ এর ওপর সংঘটিত হয়েছে, লাহূত হিসেবে নয়। কারণ ইলাহ এর মাঝে তো কষ্ট প্রবিষ্ট হতে পারে না।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন,

১- শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/২৬৮-২৬৯)।

২- রাযী, ই'তিক্বাদাতু ফিরাকিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ১৩২।

৩- ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ (২/১৭-১৮)।

৮৩০. মনে হয় যেন এ বক্তব্যের শেষাংশ দ্বারা 'ইবনু খাফীফ' রাহিমাহুল্লাহ'র উদ্দেশ্য হচ্ছে সেসব কথা অস্বীকার করা যা কোনো কোনো সম্প্রদায় করে থাকে, তারা আল্লাহকে খণ্ড, বিভক্ত, ভাগ ইত্যাদি গুণাবলি প্রদান করে থাকে, যা দ্বারা সাধারণত কোনো সৃষ্টিকুলকে গুণান্বিত করা হয়। তার উদ্দেশ্য ভালো হলেও যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ'য় এ জাতীয় শব্দ সাব্যস্তও করা হয়নি, অস্বীকারও করা হয়নি তাই এসব শব্দ স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটিই নিঃশর্তভাবে করা যাবে না। কারণ সমস্যা হচ্ছে, যারা আল্লাহর গুণ অস্বীকার করে তারা এ শব্দগুলো ব্যবহার করে আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলিকে অস্বীকার করে থাকে। যেমনটি কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদরা বলে থাকে। তারা এগুলোর দোহাই দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক সাব্যস্ত করা আল্লাহর চেহারা, দু' হাত ইত্যাদি গুণাবলিকে অস্বীকার করে থাকে। দেখুন, আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (৩/৭৮০); আস-সাফাদিয়্যাহ (২/২২৯); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৩/১৩০); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৭/৪৪৯)।

৮৩১. যেমনটি মু'তাযিলারা বলে থাকে।

৮৩২. যেমনটি কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদ বলে থাকে।

৮৩৩. সুতরাং পাঠ করা ও তিলাওয়াত করা বান্দার কাজ, তাই তা মাখলূক। কিন্তু পাঠকৃত ও তিলাওয়াতকৃত বিষয় হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী, যা খাইরে মাখলূক বা অসৃষ্ট। যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.

ونعتقد: أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.

কাফের হয়ে যাবে।[৮৩৪]

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, বিভিন্ন প্রকার স্বরলিপি দিয়ে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা।[৮৩৫]

---

৮৩৪. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

৮৩৫. সুর করে স্বরলিপি দিয়ে কুরআন পাঠ করা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে:
* একদল আলেম বলেন, এভাবে কুরআন পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী। এ মতটি বর্ণিত হয়েছে, আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, অনুরূপ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, সা'ঈদ ইবন জুবাইর, কাসেম ইবন মুহাম্মাদ, হাসান আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, ইবরাহীম আন-নাখা'য়ী প্রমুখ থেকে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ থেকে স্পষ্টভাবে তা অপছন্দ করার বিষয়টি এসেছে। ইমাম আহমাদ বলেন, এটি আমার কাছে পছন্দ হয় না, এটি তো নতুব আবিষ্কার। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন, এটি বিদ'আত, শোনা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-'উকবারী বলেন, আমি এক ব্যক্তি কর্তৃক ইমাম আহমাদকে প্রশ্ন করতে শুনেছি, আপন স্বরলিপি দিয়ে বা সুর দিয়ে কুরআন পাঠ করার বিষয়ে কী বলেন? তখন ইমাম আহমাদ বললেন, তোমার নাম কী? লোকটি বললো, মুহাম্মাদ। ইমাম আহমাদ বললেন, তুমি কি খুশী হবে যখন কেউ তোমাকে ডাকবে হে মুওহামদ (এভাবে টেনে ডাকা)? কাযী আবু ইয়া'লা বলেন, বুঝা গেল যে, এটি মারাত্মক অপছন্দীয় কাজ।
* অপর একদল আলেম বলেন, এটি জায়েয। যেমনটি ইমাম ত্বাহাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানীফা ও তার ছাত্রদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা সুর করে কুরআন পাঠ শুনতেন। মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল হাকাম বলেন, আমি আমার পিতাকে, ইমাম শাফে'য়ীকে ও ইউসুফ ইবন 'উমারকে সুর করে স্বরলিপির মাধ্যমে পাঠ করা কুরআন শুনতে দেখেছি। আর এ মতটি ইবন জারীর আত-তাবারী পছন্দ করেছেন।
* বস্তুত এ মাসআলার সমাধান হচ্ছে এটা বলা যে, সুর দিয়ে পড়া দু' প্রকার:
এক. যা স্বাভাবিকতার চাহিদা মোতাবেক হবে, তাতে থাকবে না কোনো কৃত্রিমতা, কোনো সুরের প্রশিক্ষণ, কোনো বিশেষ নীতির অনুসরণ যা সাধারণত গানের জন্য অবলম্বন করা হয়, বরং একজন মানুষকে স্বাভাবিকভাবে পড়তে বলা হয়, সে পড়ার সময় তাতে অনেক সুন্দর ও সুর করে পড়ে, সেটা অবশ্যই জায়েয। যদিও তার প্রকৃতি তাকে সেটা সুন্দর করে পড়ার জন্য সহযোগিতা করে এবং তিনি সেটাকে আরও অতিরিক্ত সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করতে পারেন। যেমনটি আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, 'যদি আমি জানতাম যে আপনি শুনছেন তবে সেটাকে আমি আরও বেশি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করে তুলতাম।' [বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৫০৪৮; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৭৯৩] বুঝা গেল যে, এভাবে পড়া হলে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং যেসব প্রমাণাদি দিয়ে যারা সুর দিয়ে পড়া জায়েয বলে থাকেন তাদের সেসব দলীলের উদ্দেশ্য হচ্ছে এভাবে পড়া।
দুই. যে সুর একটি শিল্প হিসেবে কাজ করে। সাধারণ প্রকৃতিতে তা আসে না, বরং সেটা করতে হলে কিছুটা কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়, প্রশিক্ষণ নিতে হয়, যেমনভাবে গানের প্রশিক্ষণ নিতে হয় বিভিন্ন রকমের সুরের মাধ্যমে, যাতে বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখা, আবার টানা, বিভিন্ন ওযন মেপে করা, যা শিক্ষা গ্রহণ ও কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়া ছাড়া হয় না, এগুলোই সালাফে সালেহীন অপছন্দ করেছেন, নিন্দা করেছেন, দোষারোপ করেছেন, এভাবে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন, যারা এভাবে পড়ে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এভাবে যারা কুরআন পড়ে তারা সেভাবে পড়ার বৈধতা দেয়ার জন্য যেসব প্রমাণাদি পেশ করে সেগুলো তাদের সেসব কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়া সুরের পক্ষে দলীল নয়। এভাবে উভয় অবস্থার মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব। দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা'আদ (১/৪৬৬-৪৭৪); আরও দেখুন, ড. স'উদ আল-ফুনাইসান, ফাতহুল মাজীদ ফী হুকমিল কিরা'আহ ওয়াত তাগান্নী ওয়াত তাজওয়ীদ, পৃ. ৭১-৯০।
এ মাসআলাটি আরও বিস্তারিত দেখুন,
১- আবু ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ ১/৫৭, ৬৭, ৭৪-৭৫, ১৮৩, ১৯৭, ২০৮, ২২৫, ৩৯৬।

وأن القصائد بدعة، ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه، وإظهار

আর (আবেগ দিয়ে রচিত) কাসীদাসমূহ বিদ'আত।[৮৩৬] বস্তুত এ গুলো দু' প্রকার, এর

২- ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৪/১৩০২)।
৩- ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান (১/১৬০-১৬২)।
৪- ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন, পৃ. ২৬৮-২৬৯।
৫- ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা'আদ (১/৪৮৩-৪৯৩)।
৬- ইবন হাজার হাইতামী, কাফফুর রি'আ', পৃ. ৫২-৫৩।
৭- হামূদ আত-তুওয়াইজরী, ইতহাফুল জামা'আহ (১/৪৩৪-৪৪০)।

৮৩৬. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন উৎকৃষ্ট যুগসমূহ অতিক্রান্ত হলো, তখন বৈধ 'সামা' অর্থাৎ কুরআন শোনা থেকে মানুষের মাঝে এক প্রকার ছেদ পড়ে। অথচ এ কুরআন শোনার মাধ্যমেই কলবসমূহ সংশোধিত হতো, দীনের পূর্ণতা বিকশিত হতো। আর তখন মানুষ দু' শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, একদল বৈধ 'সামা' (কুরআন শোনা) ও অবৈধ সামা (গান-গজল-কবিতা) সবকিছু থেকেই বিমুখ থাকতো। আরেকদল লোক এসব গান-গযল ও কবিতা শোনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন কিছু মানুষ এসব গান-গজল ও কবিতা শোনার ব্যবস্থাপনা করে, সেসব মজলিসে বড় বড় যেসব প্রখ্যাত ব্যক্তিরা হাজির হতো তাদের হয়তো কোনো ব্যাখ্যা তারা প্রদান করতো, কিন্তু উম্মতের মধ্য হতে আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদেরকে এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলেন যারা এগুলোর বিরুদ্ধে কথা বললেন। যেমন সৎকাজের আদেশ দানকারী ও অসৎকাজে বাঁধা প্রদানকারী এ উম্মতের মাঝে এটিই আল্লাহর সুন্নাত বা রীতি। দেখুন, আল-ইস্তেকামাহ (১/৩০৪); মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৫৩১-৫৩২, ৫৩৪); মুখতাসার আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ, পৃ. ৫৯২।

অনুরূপভাবে অন্যত্রও শাইখুল ইসলাম বলেন, সূফীদের মধ্যে যারা বিভ্রান্ত তারাই এসব গান-গজল ও কবিতা শোনাতে অভ্যস্ত; তারা কুরআন ও যিকর শোনার বদলে এগুলো শোনাকে তার স্থলাভিষিক্ত করে নিয়েছে। বস্তুত এগুলো তাদের অন্তরে এক প্রকার ভালোবাসা, ভক্তি বা আবেগ ইত্যাদির উদ্রেক ঘটায়, কিন্তু এগুলো কখনই কোনো জ্ঞান বা বিশ্বাসের অনুসারী করে না। ফলে যারা এগুলো শুনে তারা সেগুলোকে কুরআন শোনার ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এর কারণ হিসেবে তারা বলে, কুরআন তো হক, আর তা হকের কাছ থেকে এসেছে, অন্যদিকে আত্মা তো বাতিল বস্তু পছন্দ করে (সুতরাং নাফসের জন্য উপযোগী বস্তু আমরা তৈরি করে নিয়েছি)। মূলত তাদের এসব বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ সত্য কথা ও হক মানুষের কলবে সর্বদা জ্ঞান ও বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, অপরদিকে বাতিল আত্মা হক পছন্দ করে না, আর সেজন্য তার প্রভাবটি বাতিল যা খারাপ আত্মার তাবেদারী করে, এ এমন এক শাখা যার কোনো ভিত্তি নেই তবে আত্মার ওপর সেটার এমন এক প্রভাব পড়ে যা তাকে আন্দোলিত করে, ডিস্টার্ব করে, প্রভাব ফেলে। কিন্তু তা কখনই কোনো প্রকার জ্ঞান, মা'রেফাত ও বিশ্বাস বর্ধিত করে না। এজন্য এসব গান-গজল ও কবিতাকে (حادي) 'হাদি' বলা হয়, কারণ তা আত্মাসমূহকে সুরের মূর্চনায় তাড়িয়ে নিয়ে যায় যেমন ছাগল-পালকে রাখাল এসব সুর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

এর বিপরীতে 'হিকমত, উত্তম উপদেশ, সুন্দর বিতর্ক তা প্রদান করে কলবে বিশ্বাসের বাড়তি অনুসঙ্গ ও আমলে বাড়তি প্রেরণা, যা বড়ই উপকারী হিসেবে পরীক্ষিত। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/৪৩-৪৪)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, এসব বিদ'আতী সামা' কলবে যে ভালোবাসা, আন্দোলিত অবস্থা তৈরি করে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক পছন্দনীয় জিনিস নয়। বরং তাতে যতটুকু আল্লাহর ভালোবাসা প্রাপ্তি ও আল্লাহর ঘৃণা থেকে মুক্তি তথা আল্লাহর পথ থেকে দূরে না সরে যাওয়ার যে দাবি করা হয়, তারচেয়ে বেশি এমনসব কিছুর সংমিশ্রণ রয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন না, তাতে রয়েছে এমনসব উপাদান যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঘৃণা করেন। বরং এগুলোর মাধ্যমে অর্জিত তথাকথিত আল্লাহর ভালোবাসা লাভের দাবির চেয়ে এগুলো থেকে নিষেধ করা অনেক বড় কাজ। যদিও তার মাধ্যমে একপ্রকার ভালোবাসা ও জাগরণ সৃষ্টি হয় আর মনে করা হয় যে আল্লাহ এগুলো ভালোবাসেন, আসলে তা ধারণার বশবর্তী হওয়া ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যতীত কিছুই নয়। দেখুন, আল-ইস্তেকামাহ (১/২৬১)। বান্দা কর্তৃক বৈধ ও অবৈধ বিভিন্ন প্রকার 'সামা' সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, আল-ইস্তেকামাহ (১/৩৭৭-৩৭৮)।

نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات، ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق،

মধ্যে তা ভালো, যাতে আল্লাহর নি'আমত ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়, নেককার বান্দাদের গুণাবলি প্রকাশ করা হয়, মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়। এটা জায়েয। তবে এগুলো ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, ইলম চর্চা করা উত্তম। আর যা দৃশ্যমান কিছুর ওপর নির্ভর করে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা, সৃষ্টির গুণ বর্ণনার মাধ্যমে রচিত হয় তা আল্লাহর ব্যাপারে দাঁড় করিয়ে শুনানো কুফরী।[৮৩৭] অনুরূপ গান শোনা, চতুর্পদী[৮৩৮] রচনা করে তা আল্লাহর ওপর চালিয়ে দেয়া কুফরী।[৮৩৯] গানের সাথে লাফিয়ে উঠা বা লম্ফ-জম্ফ করা[৮৪০], অনুরূপ নাচ-গানকারীদের প্রশংসা করা দীনের বিধান

---

৮৩৭. এর কুফরীর কারণ হচ্ছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে দৃশ্যমান আল্লাহর সৃষ্টির কোনো গুণে গুণান্বিত করা হয়। আর তা অবশ্যই কুফরী। কারণ এর মাধ্যমে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়, অথচ আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য ও উদাহরণ নেই।

৮৩৮. এক ধরনের কবিতা-গান বিশেষ যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পঙক্তি থাকে। এ ব্যাপারে দেখুন, আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, ত্বাবাকাতুস সূফিয়্যাহ, পৃ. ১৯১; আদাবুস সুহবাহ, পৃ. ৭৫; ইবন আসাকির, তারীখে দিমাশক (২৬/২৫৩); মুহেব্বী, খুলাসাতুল আসার (১/৪৭, ৩৩৯), (২/১১৩), (৩/৩৭৯)।

৮৩৯. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সবচেয়ে বড় যে জিনিস মানুষের মাঝে শয়তানী অবস্থা ও কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে দেয় তা হচ্ছে গান শোনা ও খেলাধুলায় মত্ত থাকা। আর এটিই ছিল মুশরিকদের 'সামা' বা শোনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর কা'বা ঘরের কাছে শুধু শিস ও হাততালি দেয়াই তাদের সালাত, কাজেই তোমরা শাস্তি ভোগ কর, কারণ তোমরা কুফরী করতে।" [সূরা আল-আনফাল: ৩৫] ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা, ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা ও অনেক সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'তাসদিয়া' হচ্ছে হাততালি দেয়া, 'মুকা' হচ্ছে শিস দেয়া। মুশরিকরা এগুলোকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করতো।

এর বিপরীতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীরা, তাদের কাছে আল্লাহর ইবাদত ছিল আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক সালাত, কিরাআত, যিকির ইত্যাদি। অনুরূপ তারা শর'য়ী বিষয়ে একসাথ হতো (হারামের জন্য নয়)। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো কোনো হারাম শোনার জন্য একত্রিত হননি, হাত তালির অনুষ্ঠানে নয়, ঢোল বাজানোর অনুষ্ঠানে নয়, আবেগে লম্প-ঝম্প অনুষ্ঠানেও নয়, রাসূলের চাদরও কখন শরীর থেকে পড়ে যায়নি। বরং এসবই হচ্ছে মিথ্যা, যা হাদীস বিশারদ আলেমগণ ঐকমত্যে বলে গেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যদি কোথাও একত্রিত হতেন তখন তাদের একজনকে বলা হতো কুরআন পড়তে, অন্যরা তা শুনতো। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/২৯৫-২৯৬); আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান (১/৩৬৩)।

৮৪০. নাচ বা নৃত্য করা কখনও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক অনুমোদিত বিষয় হয়, আর না কোনো ইমাম সেটাকে জায়েয বলেছেন। বরং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন, 'আর তুমি তোমার চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো' [সূরা লুকমান: ১৯] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "আর 'রাহমান' -এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।" [সূরা আল-ফুরক্বান: ৬৩] অর্থাৎ প্রশান্তি ও আত্মসম্মানের সাথে। মুসলিমদের ইবাদত তো হবে রুকু ও সাজদার মাধ্যমে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৫৯৯)।

অন্যত্র ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা গান, কবিতা, ঢোল ইত্যাদি শুনে নাচে, তাদের সামনে যদি কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, কিংবা তাদের মজলিসে যদি সেটা পাঠ করা হয় তারা সেটাকে দীর্ঘ কাজ মনে করে, তাদের কাছে সেটা ভারী মনে হয়। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া

وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب.

وحرام على كل من سمع القصائد والربعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد، ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله

অনুযায়ী ফাসেকী[৮৪১], আর তা দীনী ওয়াজদ[৮৪২] তথা সুখ কিংবা দুঃখের আবেগে পড়ে অবস্থা পরিবর্তন করা, গানের মাঝে লিপ্ত হওয়া বেহুদা কাজ ও খেলা-ধুলার শামিল। আর যে কেউ এমন কাসীদাহ ও স্বরলিপি দেয়া রুবাইয়াত (চতুর্পদী) শুনবে, যা এসব বিশেষ

(১৬/৫২৭)।

৮৪১. সম্ভবত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নাচকে ইবাদতের অনুষঙ্গ মনে করা ফাসেকী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া, আল্লাহর দীনের মাঝে বিদ'আত প্রবর্তনের নামান্তর। বিদ'আত অবশ্যই ফাসেকী। সেজন্যই আমরা দেখি, উম্মতের প্রাথমিক সালাফগণ খারেজীদেরকে ফাসেক বলতেন। ইমাম ইবনুস সালাহ বলেন, 'প্রতিটি বিদ'আতীই ফাসেকী, তবে সকল ফাসেকই বিদ'আতী নয়।' দেখুন, ফাতাওয়া ইবনুস সালাহ, পৃ. ২৮; মাজমূ'আহ আর-রাসায়িলুল মুনিরিয়্যাহ এর ৪র্থ খণ্ড।

৮৪২. ওয়াজদ ও তাওয়াজুদ দু'টি শব্দ। তাওয়াজুদ এর অর্থ হচ্ছে যিকির ও চিন্তার মধ্য দিয়ে ওয়াজদ হাসিল করার চেষ্টা করা। আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, পৃ. ৬১।
আর 'ওয়াজদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে ভালোবাসা কিংবা ভয়ে, অনুরাগে কিংবা বিরাগের আতিশয্যে আবেগাপ্লুত হয়ে কিছু করা। এ শব্দটি একটি নতুন পরিভাষা যা রাসূল বা সাহাবায়ে কিরামের ব্যবহৃত শব্দ নয়। আর পরিভাষার ব্যাপারে নীতি হচ্ছে, যদি তা ব্যবহারে শরী'আতের কোনো সমস্যা না হয় তবে তা ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। কিন্তু আমরা যদি সূফীদের 'ওয়াজদ' এর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, তাদের এ পরিভাষার সাথে কিছু অবৈধ জিনিস জড়িত হয়ে পড়েছে। কারণ তাতে রয়েছে বিদ'আত, নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি, তার সাথে জড়িত হয় আন্দোলিত হওয়া, অস্বস্তি প্রকাশ করা, নর্তন-কুর্দন, চিৎকার প্রদান করা। অথচ ঈমানী 'ওয়াজদ' বা ঈমানদারগণ যার মাধ্যমে আবেগাপ্লুত হয়ে থাকেন, তাতে এসব সমস্যা নেই। তারা তাতে বিনীত হয়ে পড়েন, প্রশান্ত হন, নিজেকে অপ্রকাশিত রাখেন, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে বলেছেন, "তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে....।" অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে। আর তারা তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।" [সূরা আল-আনফাল: ০২] আরও বলেন, "যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৩৫] আরও বলেন, "আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যখন তারা শুনে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য আপনি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবেন। তারা বলে, 'হে আমাদের রব্ব! আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত করুন'।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৮৩] আরও বলেন, "যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার জন্য বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? আর তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল--অতঃপর বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।" [সূরা আল-হাদীদ: ১৬] আরও বলেন, "যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ: ২৮] আরও বলেন, "আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর হিদায়াত, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন হিদায়াতকারী নেই।" [সূরা আয-যুমার: ২৩] এসবই প্রমাণ করে যে সূফীদের 'ওয়াজদ' এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ الآية [الزمر: ١٨].

وكل من جهل ذلك، وقصد استماعه على الله على غير تفصيله، فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله، فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه، وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك

প্রকৃতির লোকদের মাঝে চালু হয়ে রয়েছে, যিকির এর হুকুম অনুযায়ী তা হারাম ও নিষিদ্ধ। তবে যদি কারও কাছে পূর্বাহ্নে তাওহীদের বিধান জানা থাকে, আল্লাহর নাম ও গুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি অর্জিত হয়ে থাকে, আর আল্লাহর দিকে কী কী বিষয় সম্পৃক্ত করা যাবে, আর কি কি বিষয় তাঁর শানের সাথে উপযোগী নয়, যা থেকে তিনি পবিত্র, সেটার যথার্থ জ্ঞান থাকে, তাহলে সেটা শোনার বিধান আল্লাহর বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে যাতে তিনি বলেন, "তারা কথা শুনে তবে উত্তমটির অনুসরণ করে।" [সূরা আয-যুমার: ১৮][৮৪৩]

আর যে কেউ এসব বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে, আর সে উক্ত কাসীদাহ শুনে তা আল্লাহর ওপর প্রয়োগ করবে, কোনো প্রকার বিস্তারিত জ্ঞান ব্যতীতই, তবে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে কুফরী হয়ে যাবে। তাই যে কেউ এসব কথা একত্রিত করবে এবং এগুলো কান লাগিয়ে শ্রবণ করবে, আল্লাহর দিকে এগুলো সম্পৃক্ত করবে, সেটা কখনো তার জন্য জায়েয হবে না।[৮৪৪] তবে যেমনটি আমরা আগে বর্ণনা করেছি, কেউ যদি সেটা জেনে আল্লাহর যিকির,

---

৮৪৩. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, চরমপন্থী সূফীদের বেশ কিছু কাসীদাহ রয়েছে যাতে রয়েছে কুফরী, পথভ্রষ্টতা ও দীনবিরোধিতা, যেমন সেখানে রাসূলকে গালি দেয়া হয়েছে, কুরআনকে গালি দেয়া হয়েছে, ইসলামকে অবমাননা করা হয়েছে। এমনকি এমনসব কথা রয়েছে যা কোনো ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ও কখনও বলে না। যেমন কুওজন্দি ও অন্যান্যদের কবিতা, ইউনুস আল-কুনাইয়ী যিনি ইউনুসিয়্যাহ সম্প্রদায়ের প্রধান, তার দিকে এমনসব কথা ও কাসীদাহ সম্পৃক্ত করা হয় তাতে কুফরী রয়েছে। তারপর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তাদের বেশ কিছু এ জাতীয় কুফরী কবিতা তুলে ধরেছেন, যাতে তারা নিজেদের জন্য রুবুবিয়াত দাবি করে বসেছে, 'আরশের উপর বসার দাবি করেছে, জগত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দাবি করে বসেছে। তারপর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'আরও অনেক অনেক কিছু যা আরও অনেক মারাত্মক, যা উল্লেখ করা বড় গুনাহের কারণ হবে; কারণ তাতে কুফরী এমন পর্যায়ে গেছে যা সেসব লোকদের কথার চেয়ে ভয়াবহ যারা বলে থাকে 'আল্লাহর সন্তান রয়েছে'। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/১০৭-১০৮)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, আর সূফীরা তাদের বিদ'আতে আরও সংযোগ করেছে যে, তারা কাসীদাহ রচনা করে চলেছে। তারা যেসব কবিতা আবৃত্তি করে তার অধিকাংশের রচয়িতা হচ্ছে ফাসেক-ফাজের পাপিষ্ঠ শ্রেণির লোকেরা। তাদের মধ্যে এমনও কতক রয়েছে যারা কাফেরদের কবিতাও আবৃত্তি করে। বরং এমনসব কবিতা আবৃত্তি করে যা কোনো মিথ্যাবাদীও কোনোদিন বলেনি। কেবল তারাই বলে যারা রাব্বুল আলামীনের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের থেকে দূরে অবস্থান করে। আল-ইস্তেকামাহ (১/৩০৭)।

অন্যত্র শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'এসব নব আবিষ্কৃত 'সামা'গুলো কুফরী, ফাসেকী অথবা গুনাহের কাজ এ তিনটির একটির মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এসব 'সামা' এর কুফরী মারাত্মক পর্যায়ের, আর এসবের গুনাহ বড় আকারের।' ইস্তেকামাহ (১/৩০৯)।

৮৪৪. সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের সেসব কাসীদাহ বা কবিতা যাতে তারা আল্লাহর ভালোবাসাকে বান্দার ভালোবাসার সাথে সাদৃশ্য করে পেশ করে থাকে, সৃষ্টির ভালোবাসার মধ্যে যেভাবে

أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة بها غير مأمونة،

إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك، والثوري، ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل، وإسحق

তাঁর নি'আমত, আর যাতে কেবল মহান আল্লাহ গুণান্বিত হতে পারে এমন কিছু বলে, যাতে সৃষ্টির কারও গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই, তাহলে সেটা ভিন্ন হতে পারে। তারপরও তা পরিত্যাগ করা উত্তম ও সাবধানতাপূর্ণ কাজ। কারণ এ কাজের আসল হচ্ছে তা বিদ'আত হওয়া। এসব 'সামা' দ্বারা গান শোনার ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায় না।(৮৪৫)

শেষে তিনি [ইবন খাফীফ] বলেন, সামা' শোনা, গান শোনা এবং রুবাইয়াত তথা চতুষ্পদী কবিতা শুনে আবেগে নাচানাচি করার জন্য মজলিস বসানো বিদ'আত। আর এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন আল-মুত্তালেবী (ইমাম শাফে'য়ী)(৮৪৬), মালেক, সাওরী, ইয়াযীদ ইবন

প্রেমাস্পদের ওপর অভিমান করে ত্যাগ করা, তিরস্কার করা, বাঁধা প্রদান করা ইত্যাদি থাকে, তারা সেগুলোকে আল্লাহর জন্য প্রয়োগ করে থাকে। এ তো নিশ্চিতরূপে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা যা নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ, তাঁর অবমাননা আর যালিম মূর্খ সৃষ্টির অহংকারের দাবির বহিঃপ্রকাশ। দেখুন, আল-ইস্তেকামাহ (২/৫১-৫২); আত-তুহফাতুল ইরাকিয়্যাহ, পৃ. ৯৪-৯৫; ইক্বতিদ্বাউস সিরাতিল মুস্তাকীম (২/৬৯৫)।

৮৪৫. 'সামা' বা গান-গজল কবিতা শোনার মাধ্যমে দু' দিক থেকেই ফিতনার উদ্ভব হয়:
এক. দীনের মাঝে বিদ'আত প্রবর্তনের কারণে সংঘটিত ফিতনা। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে বাতিল আকীদাহ-বিশ্বাসের সূত্রপাত হয়, ইচ্ছা ও ইরাদা বিনষ্ট হয়, ইবাদত বাতিল হয়; কারণ সেগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের জন্য করা কখনো জায়েয নয়। তাছাড়া তা সহীহ আকীদাহ, বিশুদ্ধ ইবাদত থেকেও বাঁধা হয়ে যায়। কখনো কখনো সরাসরি তার বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার কারণে, কখনও কখনও ভুল কর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে, কারণ মানুষের আত্মা এগুলোর মধ্যে রত থাকলে বিশুদ্ধ আকীদাহ ও আমল গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়ে যায়।
দুই. দুনিয়ার বুকে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে সংঘটিত ফিতনা। কারণ এসব গান, গজল, কবিতা ব্যভিচার, অশ্লীলতা, গুনাহ, মানুষের ওপর অত্যাচারের দিকে ধাবিত করে। দেখুন, আল-ইস্তেকামাহ (১/৪০৯-৪১০)।

৮৪৬. তিনি হচ্ছেন ইমাম শাফে'য়ী। তিনি বলেছিলেন, আমি বাগদাদে যিন্দীক (দীনবিরোধী) কিছু লোকের কর্মকাণ্ড রেখে এসেছি, যারা সেটাকে 'তাগবীর' বলে, তারা এর মাধ্যমে কুরআন থেকে মানুষদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছে। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইস্তেকামাহ ১/২৩৮, ২৭৩-২৭৪, ২৭৯, ২৯৭, ৩৮৫। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, এটি ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ থেকে মুতাওয়াতিরভাবে সাব্যস্ত হয়েছে। দেখুন, ইগাসাতুল লাহফান (১/৩৫১)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বস্তুত এটি হচ্ছে দীন সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ'র পূর্ণ জ্ঞান ও মারিফাতের প্রমাণ। কারণ যখন কোনো অন্তর গান-কবিতা, গজল ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, সেগুলো মজা পেয়ে যাবে তখন তার মাঝে কুরআন শোনার ব্যাপারে এক প্রকার অনীহা কাজ করবে, এভাবে সে শয়তানী 'সামা'র কারণে রহমানী 'সামা' থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৫৩২)।
ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম শাফে'য়ী, তার প্রাক্তন ছাত্ররা, আর যারা তার মাযহাব সম্পর্কে সম্যক অবগত তারা সকলে এ বিষয়ে অনেক কঠোর নীতিতে ছিলেন....
যদি 'তাগবীর' ও তার কারণের ব্যাপারে তাদের এ অবস্থান থাকে যে, এটি আল্লাহর কুরআন থেকে বাঁধা হয়, অথচ তা কেবল কিছু কবিতা, যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া বিমুখ হয়, যা হয়ত কোনো গায়ক গেয়েছে, উপস্থিত কেউ হাতের লাঠি দিয়ে কোনো বিছানা বা বালিশে গানের তালের সাথে মিলিয়ে আঘাত করলো, তাহলে সেখানে তারা কী বলবেন যার তুলনায় 'তাগবীর' হচ্ছে সমুদ্রে থুতু ফেলার মতো? যাতে রয়েছে সব রকমের ফ্যাসাদ, যাতে সব রকমের হারামের অনুযোগ রয়েছে। আল্লাহকেই

والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين، ولا لهم قدم عند المخلصين.

وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئًا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال مثل قوله:

اصبري يا نفس حتى ... تسكني دار الجليل

فقال: حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟

قال: قلت: ببغداد. فقال: كذبوا والذي لا إله غيره، لا يسكن ببغداد من يسمع ذلك.

হারূন[৮৪৭], আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক্ব। তাদের অনুসরণ করা উত্তম ঐ সব লোকদের অনুসরণের চেয়ে, দীনের মধ্যে যাদের অবস্থান জানা নেই আর মুখলিস (সূফী)দের মাঝে যাদের কোনো মান-মর্যাদা নেই।

আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, বিশর ইবনুল হারেস (আল-হাফী)কে বলা হয়েছিল, আপনার সাথীরা তো নতুন এক বিষয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছে যার নাম দিয়েছে তারা 'কাসায়িদ'। তিনি বলেন, কেমন সেটি?

প্রশ্নকারী বলেন, যেমন তাদের কথা (কবিতা)

হে আত্মা, ধৈর্যধারণ করো যতক্ষণ না তুমি মহান সত্তার ঘরে বাসের সুযোগ পাচ্ছ

তখন তিনি উত্তরে বললেন, এটা তো ভালো কথা।

তারপর তিনি বললেন, এরা কোথায় যারা এগুলো শুনে?

তিনি বলেন, আমি বললাম, বাগদাদে।

তিনি তখন বলেন, এরা মিথ্যা কথা বলেছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, যে এগুলো শুনে[৮৪৮] তার তো বাগদাদে বসবাস করার কথা

শুধু রাখতে চাই ব্যক্তির দীন ও ফিতনাবাজ লোকদের মাঝে, এসব মূর্খ ইবাদতকারীদের মাঝে। তিনিই এর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন।' ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান (১/৩৫০-৩৫১)।

৮৪৭. তিনি হচ্ছেন আবু খালেদ ইয়াযীদ ইবন হারূন আস-সুলামী। ইমাম যাহাবী বলেন, ইয়াযীদ সুন্নাতের মাথাস্বরূপ, যিনি জাহমিয়্যাদের বিরোধিতাকারী ব্যক্তি ছিলেন। জাহমিয়্যাদের দ্বারা আল্লাহর গুণ 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপর উঠা' এ গুণটির তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করার কারণে কঠিনভাবে তাদের নিন্দা করতেন। তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ১১৮ সালে আর মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ২০৬ সালে। দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (৭/৩১৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/৩৫৮)।

৮৪৮. 'সামা' শব্দের অর্থ শোনা। কিন্তু এখানে বিশেষ ধরনের কবিতা, গান, আবৃত্তি ও গজল শোনার কথা বুঝানো হয়েছে যা সূফীবাদে বিশেষভাবে প্রচলিত। যা তাদের মৌলিক নীতির একটি। বরং তারা এটাকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, 'সামা' হচ্ছে: যা কিছু শোনা হয় তার অর্থের দিকে খেয়াল করে অন্তরকে সজাগ করা, অন্তরকে আন্দোলিত করা, যাতে কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহী হয়, কোনো কিছু থেকে পালাতে হয়, কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়, কোনো কিছুর প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। বস্তুত এ 'সামা'র মাধ্যমে প্রত্যেকে তার অভিষ্ট জায়গা, চেনা ভুবনের দিকে ধাবিত হয়। [মাদারিজুস সালেকীন (১/৪৮২)]
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, কল্যাণকর উৎকৃষ্ট তিন প্রজন্ম চলে যাওয়ার পরে বিদ'আতী এসব 'সামা' এর উদ্ভব হয়েছিল হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে। দেখুন, মুখতাসার আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ, পৃ. ৫৯২; আল-ইস্তেকামাহ (১/২৯৭)।
তিনি আরও বলেন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, দীনের ইমামগণ প্রমুখ দীনের বড় বড় ব্যক্তিত্ব,

তাদের কারও কাছ থেকেই জানা যায়নি যে, তারা এসব 'সামা'র বৈঠকে হাজির হতেন। হিজাযেও নয়, মিসরেও নয়, শামেও নয়, ইরাকেও নয়, খোরাসানেও নয়। সাহাবীগণের যুগেও নয়, তাবে'য়ীগণের যুগেও নয়, তাবে-তাবে'য়ীগণের যুগেও নয়। বরং এর পরে সেটার উদ্ভব হয়েছিল। তখন একদল লোক এর উপর একত্রিত হতো, তারা তখন কোনো কাঠি দিয়ে আওয়াজ হয় এমন কিছুতে আঘাত করে আওয়াজ করতো, যা 'তাগবীর' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৫৩১-৫৩২); আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৫৭-৫৮)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ 'সামা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও বলেন, 'বরং এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি পন্থা গ্রহণ করা, যার দ্বারা সকল ধর্মের লোকদেরকে একত্রিত করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা যাবে, প্রিয়তমের দিকে আগ্রহী করে তোলা যাবে, ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে সাবধান করা যাবে, উদ্দিষ্ট বস্তু হারানোর আশংকায় পেরেশানী প্রকাশ করা হবে, আর এর মাধ্যমে রহমত নাযিল করা যায়, নে'আমত হাসিল করা যায় আর ঈমানদারদের অন্তরের 'ওয়াজদ' বা ভাবাবেগ নড়াচাড়া করা যায়,... এমনকি তাদের কেউ কেউ বলে, এটি কিছু মানুষের জন্য অথবা বিশেষ লোকদের জন্য কুরআন শোনা থেকেও বিভিন্নভাবে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। আবার কেউ এটাকেই তাদের অন্তরের খাবার, রূহের আহার, নাফসের বিহার ধরে নিয়েছে যারা গানের মাঝে আল্লাহর দিকে পথ চলতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে, আর যারা এ গান শোনাকেই আল্লাহর দিকে মনোযোগী করার কারণ বানিয়ে নিয়েছে।...' শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৫৬৭-৫৬৮)।

এ হচ্ছে 'সামা' এর হাকীকত বা প্রকৃত অবস্থা। সালাফে সালেহীন সূফীবাদীদের 'সামা'র নিন্দা করেছেন। কারণ তারা ঈমানী 'সামা' কুরআন বাদ দিয়ে গান, গজল, সংগীত, আবৃত্তির জন্য একসাথ হয়, আবার কেউ কেউ এর সাথে বাদ্য, ঢোল, হাত-তালি, অসংলগ্ন স্বর, চিৎকার, চেঁচামেচি, কাপড় ছিড়ে ফেলা, গাছে উঠে যাওয়া, প্যাণ্ডেল বেয়ে বেড়ানো, ডিগবাজি খাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে একপ্রকার নেশায় মত্ত হয়। এগুলোকে তারা 'ওয়াজদ' বা মতোয়ারা হয়েছে নাম দিয়ে থাকে। মূলত এসবই হারাম কাজ। যা আমাদের চোখের সামনেই অনেক সূফীদের করতে দেখি।

আলেমগণ তাদের এসব ফালতু ও বিদআতি কর্মকাণ্ডের খণ্ডন অনেকভাবে করেছেন। সেসব এখানে লেখার সময় ও সুযোগ নেই। এখানে এমন কিছু গ্রন্থের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যাতে এর বিস্তারিত রদ্দ রয়েছে:

১- সাহওরাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ (৫/১০৮-১২১)।
২- আলী হাসান আলী আব্দুল হামীদ কর্তৃক সংক্ষেপিত ইবনুল জাওযীর গ্রন্থ, আল-মুন্তাকা আন-নাফীস মিন তালবীসে ইবলীস, পৃ. ২৮৮-৩২৭।
৩- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৩৫৯-৩৬২), (১১/২৯৭-৩০২, ৫৫৭-৬৩৭)।
৪- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'আতুর রাসায়িল আল-মুনিরিয়্যাহ (২/১৬৬-১৯০)।
৫- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইস্তেকামাহ (১/২৬২)—।
৬- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ওয়াসিয়্যাতুল কুবরা, পৃ. ৫৬-৫৭।
৭- ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (১/৪৮১-৫০৫)।
৮- ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান (১/২২৪)—।
৯- মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, কুতরুল ওলী, পৃ. ১৫২-২৫৬।
১০- ইবন হাজার আল-হাইতামী, কাফফুর রি'আ', পৃ. ৪৫-৫২, ৫৩, ৫৪।

আরও দেখুন,

১১- ইবন রাজাব, নুযহাতুল আসমা' ফী মাসআলাতিস সামা'।
১২- ইবন কুদামাহ আল-মাক্কদেসী, যাম্মু মা 'আলাইহি মুদ্দা'উত তাসাওউফ মিনা গিনা, ওয়ার রাক্বসি ওয়াত তাওয়াজুদি ওয়াদ দাফফি...।
১৩- নাকশাবান্দী, জামে'উল উসূল, পৃ. ৩২৮-৩৩০।
১৪- সাফীউদ্দীন আল-হানাফী, আস-সা'য়িক্বাতুল মুহরিকাহ 'আলাল মুতাসাওয়িফাতির রাক্বাসাতিল মুতাযান্দিকাহ।

৮৪৯. কোনো কোনো নেককার বান্দা ও আল্লাহর সত্যিকার আবেদরা বাগদাদে বসবাস করাকে অপছন্দ করতেন। কারণ বাগদাদের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচুর্যময় জীবন ও ফাসেকী অবস্থা বিরাজমান

قال أبو عبد الله: ومما نقول. وهو قول أئمتنا. أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم: «لأن يأخذ أحدكم حَبْلَه ... » الحديث.

আবু আব্দুল্লাহ [ইবন খাফীফ] বলেন, আমরা যা বলি, যেটা আমাদের ইমামদের বক্তব্য, তা হলো: ফকীর[৮৫০] যখন মুখাপেক্ষী হয়েও ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে সচ্ছলতা দান করা পর্যন্ত মানুষের কাছে হাত না পাতে, তাহলে তা উঁচু পর্যায়ের কাজ।[৮৫১] আর যে ধৈর্যধারণ করতে না পারে, তার জন্য ভিক্ষা করা উত্তম[৮৫২]; যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ... » الحديث. "কোনো ব্যক্তি তার রশি দিয়ে লাকড়ীর বোঝা বেঁধে পিঠে নিয়ে বিক্রি করবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তার চেহারার জৌলুসকে বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাবেন, তার এ কাজটি মানুষের কাছে ভিক্ষা করা অপেক্ষা

থাকত। তবে সেটা ছিল এক বিশেষ সময়ে। বিস্তারিত দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১/২১)। কিন্তু বর্তমান সময়ে যত নেককার দাবিদার তথাকথিত ওলীরা প্রাচুর্যময় জীবন ও ফাসেকী অবস্থার মাঝেই তাদের বসবাস। দুনিয়ার বিনিময়ে দীনকে তারা বহু আগেই বিক্রি করে দিয়েছে।

৮৫০. এখানে সূফীবাদের একটি স্তরকে 'ফকর' বলা হয়েছে। যাতে সে আল্লাহর পথে বিচরণ করে তবে দুনিয়ার চাকচিক্যময় অবস্থা পরিত্যাগ করে। তারা এর বিভিন্ন অর্থ করে থাকে:
সাহাল ইবন আব্দুল্লাহ আত-তুসতারীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সত্যিকারের 'ফকীর' কে? উত্তরে তিনি বলেন, 'যে কারো কাছে কিছু চায় না, কাউকে খালি হাতে ফেরত দেয় না, কোনো কিছুর জন্য নিজেকে বন্দী করে না।'
ইবনুল জালা বলেন, 'ফকর' হচ্ছে তোমার মালিকানায় কিছু না থাকা, আর যদি মালিকানায় কিছু আসেও তবে তা যেন তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার না করার মত হয়ে পড়ে।'
ইবরাহীম আল-খাওয়াস বলেন, 'ফকর' হচ্ছে মর্যাদার চাদর, নবী-রাসূলদের ভূষণ, নেককারদের পূর্ণ আবরণ।'
ইয়াহইয়া ইবন মু'আয বলেন, 'সত্যিকারের 'ফকর' হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত আরও কাছে মুখাপেক্ষিতা না থাকা, আর তার নীতি হচ্ছে যাবতীয় সম্পর্ক ও মাধ্যম বিনাশ করা।' দেখুন, সাহরাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ (৫/২৩৫)।
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, সূফীদের নিকট 'ফকর' স্তরটি হচ্ছে, সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়ার স্তর, তার অন্তর ও আল্লাহর মাঝে বাধা হতে পারে এমন সবকিছুর সাথে সম্পর্ক কর্তন করা।
তারপর তিনি উল্লেখ করেন যে, এ স্তরটি হচ্ছে সূফীদের নিকট এ পথের সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানস্থল, সবচেয়ে উঁচুটি ও সবচেয়ে উন্নতটি। বরং সকল মানযিলের এটি হচ্ছে রূহ, গোপন রহস্য, মূল সার ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। দেখুন, মাদারিজুস সালেকীন (২/৩৬৯, ৪৩৮)।
আর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, ফকীর হচ্ছে সূফীদের একটি পরিভাষা যার দ্বারা তারা আল্লাহর পথের পথিকদের বুঝিয়ে থাকেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/৭০, ১৯৫)।

৮৫১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন,
১- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২০-২২, ৬৮-৭০, ১২৫-১২৮।
২- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'আতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল (১/৩০-৩১)।
৩- ইবনুল জাওযী, তালবীসে ইবলিসের সংক্ষেপরূপ, আলী হাসান আলী হালাবী, আল-মুন্তাকা আন-নাফীস, পৃ. ২৩৫-২৪২।
৪- ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (২/৪৪১-৪৪৯)।
৫- সাহরাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ (৫/২৩৫-২৩৬)।

৮৫২. এ কথার সাথে আগত হাদীসের দলীল মানানসই নয়। তাই যদি এখানে কথাটি এমন হতো যে, 'যে তা করতে অপারগ হবে, তার জন্য সবর করা, মানুষের কাছে কিছু না চাওয়া উত্তম হবে।' তাহলে তার কথার সাথে হাদীসের দাবির মিল হতো অথবা এখানে পূর্বে বর্ণিত বক্তব্যের প্রথম অংশের দলীল প্রদান করা হয়েছে।

ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح، فهو مذموم في الحقيقة خارج.

ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن ذلك كما قال عليه السلام: «الغناء ينبت النفاق في القلب»، وإن لم يكفر، فهو فسق لا محالة.

উত্তম, মানুষ তাকে প্রদান করবে বা নিষেধ করবে।"(৮৫৩)

আমরা আরও বলি, উপার্জন ত্যাগ করা জায়েয নেই, তবে কিছু নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে, যদি কেউ (উপার্জন না করার পরও) মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকা ও তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে।(৮৫৪) আর যে ব্যক্তি সুস্থ থেকেও ভিক্ষাকে পেশা বানায় সে নিন্দিত, নেককারদের তরীকার বাইরে।(৮৫৫)

আমরা আরও বলি, যে গান-বাদ্য শুনে সে কাফের না হলেও অবশ্যই ফাসেক; কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «الغناء ينبت النفاق في القلب» "গান অন্তরের মধ্যে নিফাক সৃষ্টি করে।"(৮৫৬) সুতরাং তা দ্বারা কাফের না হলেও তাকে অবশ্যই ফাসেক

---

৮৫৩. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ১৪৭০, ২০৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০৪২।

৮৫৪. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৮৫৫. অর্থাৎ সে তাসাওউফের প্রাথমিক যুগের শাইখদের দেখানো পদ্ধতির বাইরে তার অবস্থান। ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমের জন্য উত্তম হচ্ছে অভাব দূর করার চেষ্টা করা, অর্জনের ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো; যদিও এটা করতে গিয়ে ইলম অর্জনের বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়ে যায়; কারণ সে এর মাধ্যমে তার আত্মমর্যাদার যথাযথ হিফাযত করতে পারবে, যেমন সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব তেলের ব্যবসা করতেন, তিনি অনেক সম্পদ ওয়ারিস করে গেছেন। সুফইয়ান আস-সাওরী অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। তিনি বলতেন, যদি আমার সম্পদ না থাকতো তবে তারা (ক্ষমতাশীনরা) আমাকে টিস্যুর মতো ব্যবহার করত। দেখুন, সাইদুল খাওয়াত্বির, পৃ. ২২২।
এর বিপরীতে টাকা অর্জন না করে মানুষের কাছে হাত পাতা শরী'আতে নিন্দনীয় কাজ। যারা এটা করবে শরী'আতে তাদের ব্যাপারে সাবধানবাণী এসেছে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'একজন লোক সর্বদা মানুষের কাছে হাত পাততে থাকবে, অবশেষে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় এক টুকরো গোস্ত অবশিষ্ট নেই।' বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ১৪৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০৪০। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আরও দেখুন, ইবন হাজার এর ফাতহুল বারী (৩/৩৩৯)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের কাছে কিছু চাওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে তা হারাম হওয়া। সেটি শুধু অত্যবশ্যকীয় প্রয়োজনে জায়েয করা হয়েছে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেটা না করা অবশ্যই উত্তম। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১/১৮১)।
অন্যত্র বলেন, মূলনীতি হচ্ছে মানুষের কাছে চাওয়া হারাম। কেবল অত্যাবশ্যক প্রয়োজনেই তা জায়েয রাখা হয়েছে। এ কাজ থেকে নিষেধ করে সহীহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে বহু হাদীস এসেছে। মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/১৮২)।
অন্যত্র বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম করে মুতাওয়াতিরভাবে হাদীসসমূহ এসেছে। তবে যদি অত্যাবশ্যক প্রয়োজন দেখা দেয় সেটা ভিন্ন কথা। মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৫৩৮)।

৮৫৬. এখানে এটাকে হাদীস বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস (মারফূ') হিসাবে তা কাছাকাছি শব্দে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে তা আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আছার হিসেবে বেশি বর্ণিত হয়েছে। আর সম্ভবত এটি মাওকুফ তথা আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আছার হিসেবেই বেশি বিশুদ্ধ।

বানিয়ে দিবে।(৮৫৭)

মারফূ' হিসেবে যেভাবে তা সংকলিত হয়েছে তা হচ্ছে, ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'গান কলবের মাঝে মুনাফেকীর জন্ম দেয়'। এভাবে যারা তা সংকলন করেছেন তারা হচ্ছেন,

১- আবু দাঊদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৯২৭।
২- বাইহাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা (১০/২২৩)। তবে সেখানে উপরোক্ত কথার সাথে বাড়তি এসেছে, 'যেমন পানি তরি-তরকারী উৎপন্ন করে।
৩- ইবন আবিদ দুনইয়া, যাম্মুল মালাহী, পৃ. ৩৮, নং ১৩।
হাফেয মুনাওয়ী তাঁর ফায়দ্বুল কাদীর গ্রন্থে হাফেয ইরাকী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এটিকে মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা শুদ্ধ নয়। কারণ এর সনদে এমন লোক রয়েছে যার নাম জানা যায়নি। দেখুন, ফায়দ্বুল কাদীর (৪/৪১৩)।
ইবন হাজার আল-হাইতামী তার কাফফুর রি'আ' আন মুহাররামাতিল লাহওয়ি ওয়াস সামা'য়ি গ্রন্থে বলেন, এটি ইবন সাসারী তার আমালী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, কাফফুর রি'আ', পৃ. ২৫।
৪- অনুরূপভাবে এ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, তার শব্দ হচ্ছে, 'গান ও খেলা-ধুলা অন্তরে মুনাফেকীর জন্ম দেয় যেমন পানি দ্বারা ঘাস উৎপন্ন হয়'। আল-হাদীস, যা দাইলামী তার ফিরদাউস কিতাবে বর্ণনা করেছেন। দেখুন (৩/১৪১), হাদীস নং ৪২০৪।
৫- অনুরূপভাবে এ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে আরও বর্ণিত হয়েছে সাহাবী জাবের ইবন আব্দুল্লাহ, আয়েশা ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমের মাধ্যমে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে এসব হাদীসের কোনো সনদ সমালোচনার বাইরে নয়।

আর এ হাদীসটি আছার হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি সংকলন করেছেন,

১- মারওয়াযী, তা'যীমু কাদরিস সালাত (২/৬২৯), নং ৬৮০।
২- ইবন আবী যামানীন, উসূল আস-সুন্নাহ, পৃ. ২৪৬, নং ১৬৯;
৩- বাইহাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা (১০/২২৩); শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৫০৯৮।
৪- ইবন আবিদ দুনইয়া, যাম্মুল মালাহী, পৃ. ৩৮, নং ১২।
৫- আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ।

হাফেয আবুল ফাদ্বল আল-ইরাক্বী রাহিমাহুল্লাহ এ আছারটির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, এটি মারফূ' হিসেবে অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তবে সবই দুর্বল। বাইহাক্বী বলেন, বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে তা ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে প্রমাণিত। দেখুন, ইরাক্বী, তাখরীজে এহইয়ায়ে উলুমিদ্দীন (৩/১৩৩৩-১৩৩৪), নং ২০১১; ইবন হাজার, আত-তালখীসুল হাবীর (৪/৪৮২); খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর (২/৪৪০); ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান (১/২৪৮); আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্ব'য়ীফাহ, নং ২৪৩০; তাহরীমু আলাতিত ত্বারব, পৃ. ১০।

আর এটিকে ইবরাহীম আন-নাখা'য়ীর আছার হিসেবে বর্ণনা করেন ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, আছার নং ২১৫৪৫; আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, আছার নং ১৯৭৩৭।

আর মারওয়াযী এটিকে শা'বীর কথা হিসেবে বর্ণনা করেন। দেখুন, তা'যীমু কাদরিস সালাত (২/৬৩৬), নং ৬৯১।

এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত দেখুন,

১- সাখাওয়ী, আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ. ২৯৬।
২- মুনাওয়ী, ফায়দ্বুল ক্বাদীর (৪/৪১৩)।
৩- আজলূনী, কাশফুর খাফা (২/১০৩-১০৪)।
৪- মুহাম্মাদ দারওয়িশ আল-হূত, আসনাল মাত্বালিব ফী আহাদীসি মুখতালাফাতিল মারাতিব, পৃ. ২১১; নং ৯৫০।
৫- শাওকানী, আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃ. ২৫৪, নং ৭৫৭।
৬- শাওকানী, নাইলুল আওত্বার (৮/১১৩)।

৮৫৭. যুগ যুগ ধরে আলেমগণ গান শোনাকে ফাসেকী বা শরী'আত কর্তৃক নির্দেশিত সীমালঙ্ঘন বলে

والذي نختار: قول أئمتنا: ترك المراء في الدين، والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي، وأن المرسل إليهم أفضل، فهو كافر بالله،

আর আমরা আরও যা পছন্দ করি, যা আমাদের ইমামদের বক্তব্য, তা হচ্ছে: দীনের মধ্যে বিতর্ক করা, ঈমান মাখলুক না গায়রে মাখলুক নিয়ে কথা বলা ত্যাগ করা।[৮৫৮]

আর যে ধারণা করে যে রাসূল নিছক মাধ্যম, তাঁর দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেয়া, আর যাদের কাছে তিনি পৌঁছিয়েছেন তারা উত্তম, সে আল্লাহর সাথে কাফের বলে বিবেচিত হবে[৮৫৯]।

অভিহিত করতেন। তাদের কাছ থেকে এটি মুতাওয়াতির অর্থে সাব্যস্ত। যেমন,

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহকে মদীনাবাসীদের মধ্যে যারা গানের ব্যাপারে ছাড় দেয় তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি উত্তরে বলেন, এটা আমাদের নিকট যারা ফাসিক তারাই করে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র মাযহাবের অভিমত এ ব্যাপারে অনেক কঠোর; তার ছাত্ররা স্পষ্টভাবে এসব গান ও খেল-তামাশা হারাম ঘোষণা করেছেন।

ইমাম শাফে'য়ী বলেন, এসব কাঠি, তানপুরা ও এর মত যাবতীয় অযথা খেলাধুলার সামগ্রী সবই হারাম, যারা এগুলো শুনবে তারা সকলেই ফাসিক।

আর ইমাম আহমাদ, তার ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে গান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তিনি উত্তরে বলেন, গান অন্তরে মুনাফেকীর জন্ম দেয়, আমি তা পছন্দ করি না, তারপর ইমাম আহমাদ স্বয়ং ইমাম মালেকের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, 'এটা তো আমাদের নিকট যারা ফাসিক তারাই করে থাকে।'

বরং ইমাম ইবনুস সালাহ এ ব্যাপারে ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, মুসলিম আলেমগণ এটা হারাম হওয়ার বিষয়ে একমত। তারপর বলেন, 'আর যাদের ঐকমত্য ও মতভেদ গ্রহণযোগ্য তাদের কেউই কখনো এটা শোনাকে জায়েয বলেননি।'

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

১- আবু বকর আত-তারতূশী, তাহরীমুল গিনা ওয়াস সামা', পৃ. ১৫৯-১৬২।
২- মাসায়িলে আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, নং ১৬৩২।
৩- খাল্লাল, আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহইয়ু আনিল মুনকার, পৃ. ১৬৮, ১৭১।
৪- ফাতাওয়া ইবনুস সালাহ (২/৫০০)।
৫- ইবন তাইমিয়্যাহ, ইস্তেকামাহ (১/২৭২)।
৬- ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান (১/৩৪৭)।

৮৫৮. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

৮৫৯. আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণকে ওহী দ্বারা বিশেষিত করেছেন। তাদের পছন্দ করেছেন, তাদেরকে সকল মানুষের থেকে তাঁর বাণী ও রিসালাতের দায়িত্ব বহনের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং যে কেউ তাদের ওপর অন্যদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে সে অবশ্যই রাব্বুল আলামীন ও তার হিকমতের ওপর আঘাত করলো। যদি নবুওয়াতের দাবিদাররা বড় কাফেরদের চেয়ে বড় কাফের হয় তাহলে যারা অন্যান্য মানুষদেরকে নবী-রাসূলদের ওপর প্রাধান্য দিবে তাদের অবস্থা কী হতে পারে? দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ (১/৩০), (৪/২৭২)।

এ ধরনের কথা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী সূফীদের একটি গোষ্ঠী বলে থাকে, যাদের প্রধান হচ্ছে ইবন আরাবী আত-ত্বায়ী, ইবনুল ফারেদ্ব প্রমুখ, তারা বিশ্বাস করে যে ওলীরা নবীদের থেকে উঁচু মর্যাদায়। [নাউযুবিল্লাহ]

তাদের কোনো এক লোক কবিতা আকারে বলেছে,

مقام النبوة في برزخ .... فويق الرسول ودون الولي

"নবুওয়াতের মর্যাদা মাঝখানে, যা রাসূলদের একটু উপরে তবে ওলীর মর্যাদার নিচে।"

ইবন আরাবী থেকে বর্ণনা করা হয়, তার কথা হচ্ছে, 'রিসালাতের প্রকৃত রূপ হচ্ছে কোনো বক্তা

ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر». اهـ].

অনুরূপ যে কেউ বলবে যে (দীন প্রচারের মাধ্যম) হিসাবে রাসূল (প্রেরণ) এর কোনো দরকার নেই সে তো কাফের।[৮৬০]

থেকে কোনো শ্রোতার কাছে কথা পৌঁছে দেয়া। এটি একটি হাল বা অবস্থা, কোনো মর্যাদাপূর্ণ মাক্বাম বা অবস্থান নয়। আর পৌঁছানোর পর সেটার কোনো অস্তিত্ব থাকে না....।

ইবন আরাবী থেকে আরও বর্ণনা করা হয়, তার কথা হচ্ছে, 'ওলী দু'টি ইলম শিক্ষা দেয়, ইলমুশ শরী'আহ ও ইলমুল হাকীকাহ। অর্থাৎ যাহের ও বাতেন, তানযীল ও তা'ওয়ীল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল হিসেবে তার কাছে শুধু যাহের, তানযীল ও শরী'আর জ্ঞানই রয়েছে....

তাদের অপর একজনকে বলা হলো যে, সকল সৃষ্টি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডার নিচে থাকবে, তখন সে বললো, আল্লাহর শপথ, আমার ঝাণ্ডা মুহাম্মাদ এর ঝাণ্ডার চেয়েও অনেক বড়... আমার ঝাণ্ডা নূরের তৈরি, তার নিচে জিন্ন ও মানব উভয়ে থাকবে... [নাউযুবিল্লাহ]

এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে কেউ নবীদের মর্যাদা দাবি করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তাহলে যারা নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি করে তাদের কুফরী কতগুণ বেশি?

আবার তাদের মাঝে কেউ কেউ দাবি করে সে নবীদের স্তরে অথবা তার কাছাকাছি পর্যায়ে। [নাউযুবিল্লাহ]

দেখুন, তাদের এসব বাগড়ম্বর, মিথ্যা দাবি ও কুফরী বাণী:

১- ইবন 'আরাবী, ফুসূসুল হিকাম, পৃ. ৬৪, ১৩৫।
২- হাকীম আত-তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উসূল, পৃ. ১৫৭-১৫৮।
৩- আন-নূর মিন কালিমাতি ত্বাইফূর (বায়েযীদ), শাত্বহাতুস সূফিয়্যাহ গ্রন্থসমগ্রে (১/১১১)।

এর রদ্দ ও খণ্ডন দেখুন,

১- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, হাকীকাতু মাযহাবুল ইত্তিহাদিয়্যীন, (মাজমূ'আতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল এর মধ্যে) (৪/৬৩-৬৪)।
২- বিক্বা'য়ী, তানবীহুল গাবী ইলা তাকফীরে ইবন আরাবী, পৃ. ২১৯।
৩- ইহসান ইলাহী যহীর, আত-তাসাওউফ, পৃ. ১৮৮-১৯৬।

৮৬০. ইবন খাফীফ রাহিমাহুল্লাহ'র উদ্দেশ্য সেসব চরমপন্থী তাসাওউফ নেতারা, যারা মনে করে থাকে তারা আল্লাহ থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি গ্রহণ করে থাকে। তারা মনে করে থাকে যে, তারা আল্লাহ থেকে সরাসরি শুনে। তাদের মধ্যে বড়টি হচ্ছে ইবন আরাবী আত-ত্বায়ী। তার থেকে বর্ণিত আছে সে বলেছিল, 'ওলী তো তার জ্ঞান সেখান থেকে গ্রহণ করে যেখান থেকে ফিরিশতা গ্রহণ করে, যে ফিরিশতা তা গ্রহণ করে নবী ও রাসূলদের কাছে পৌঁছায়। [নাউযুবিল্লাহ] দেখুন, তার এ দাবি ও বাগড়ম্বর, তারই গ্রন্থ আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ (৪/২৭১-২৭৩)।

বস্তুত, যারাই আল্লাহ ও বান্দার মাঝে রাসূলদেরকে আল্লাহর দীন ও শরী'আত প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে না তারা সকল মিল্লাতের লোকদের ঐকমত্যে কাফির। এভাবে তারা মূলত শরী'আতক বাতিল করে দেয়, আদেশ-নিষেধকে রহিত করে দেয়। এ হচ্ছে সে মাধ্যম যার অনুসরণ করা হবে, আনুগত্য করা হবে, তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের দেখানো মত ও পথ মোতাবেক চলা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেবল আনুগত্য করার জন্যই আমরা রাসূলদের প্রেরণ করেছি। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা আপনার কাছে আসলে ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।" [সূরা আন-নিসা: ৬৪] আরও বলেন, "কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনাকে তো আমরা তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি।" [সূরা আন-নিসা: ৮০] আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/১২৩।

অন্যত্র ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'রাসূল 'আলাইহিমুস সালাত ওয়াস সালামগণ আমাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে তাঁর নির্দেশের ব্যাপারে, নিষেধের ব্যাপারে, ওয়াদার ব্যাপারে, ও'য়ীদের ব্যাপারে মাধ্যম। সুতরাং হালাল হচ্ছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করবেন, হারাম হচ্ছে তা যা আল্লাহ ও

[قول عبد القادر الجيلاني]:

ومن متأخريهم: الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب «الغنية» : «أما

[ইমাম আব্দুল কাদের আল-জীলানী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য]

সূফীগণের পরবর্তী ইমাম শাইখ আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদির ইবন আবি সালিহ আল-জীলানী[৮৬১] স্বীয়

তাঁর রাসূল হারাম করবেন, আর দীন হচ্ছে তা, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রবর্তন করেছেন।' মাজমূ' ফাতাওয়া (১/৩০৬); আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১১৯), (১০/৩৯৮-৩৯৯), (১২/৫০, ২৪৯, ২৬০, ২৬৫, ৩৯৭); আস-সাফাদিয়্যাহ (১/১৭৫)।

আর এ দাবীর খণ্ডনে দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/২২৮-২২৯, ২৩৫); ইহসান ইলাহী যহীর, আত-তাসাওউফ, পৃ. ১৮৯।

৮৬১. তিনি হচ্ছেন মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের ইবন আবী সালেহ আব্দুল্লাহ আল-জীলী বা জীলানী, আল-হাম্বলী। তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ৪৭১ সালে জীলান নগরীতে। যুহদ, তাকওয়া, ইবাদতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করে খাবার সংগ্রহ করতেন। তার প্রচার ও প্রসার সারা দুনিয়া জুড়ে। সূফীদের বড় একজন। তার দিকে সম্পর্কিত করে বলা হয় কাদেরিয়্যাহ ত্বরীকা যা বর্তমান কালেও বিখ্যাত একটি সূফী ত্বরীকা।

তিনি হাদীস শুনেন আবু গালেব আল বাকেল্লানী, জা'ফর ইবন আহমাদ আস-সাররাজ প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেন আস-সাম'আনী, হাফেয আব্দুল গনী, শাইখ মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামাহ প্রমুখ।

তাঁর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, 'আশ-শাইখ, আল-ইমাম, আল-আলেম, আয-যাহেদ, আল-'আরেফ, আল-কুদওয়াহ, শাইখুল ইসলাম, আলামুল আওলিয়া...'। আর তার জীবনী বর্ণনা করার শেষে বলেন, মোটকথা: শাইখ আব্দুল কাদের ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি, তার ওপর তার কিছু কথা ও দাবির বিষয়ে দোষ ধরা যায়, আল্লাহর কাছেই সেগুলোর জন্য ওয়াদা, তবে অনেক কিছুই তার ওপর মিথ্যারোপ করে ছড়ানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বড় শাইখদের মধ্য হতে কারও এত হাল ও কারামাত ছিল না যা ছিল শাইখ আব্দুল কাদের জিলানীর। তবে সেগুলোর অনেক কিছুই বিশুদ্ধ নয়, তন্মধ্যে কোনো কোনোটি আছে অসম্ভব পর্যায়ের।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ শাইখ আব্দুল কাদের থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোনো মানুষের পক্ষে কি ইমাম আহমাদের আকীদাহ'র বাইরে গিয়ে ওলী হওয়া সম্ভব? তিনি বলেছিলেন, না। কখনো তা হয়নি, আর তা কখনও হওয়ার নয়।

ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন, 'লোকেরা তার দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। তার অনুসারী ও তার ছাত্রদের এ ব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে। আর লোকেরা ইমাম আব্দুল কাদের জীলানী থেকে বেশ কিছু কথা, কাজ ও কাশফ বর্ণনা করে থাকে, যার অধিকাংশই বাড়াবাড়ি পর্যায়ের। তবে তিনি ছিলেন নেককার ও পরহেযগার। অবশেষে ইবন কাসীর বলেন, মোটকথা: তিনি সূফী শাইখদের একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন।

তার সম্পর্কে ইমাম ইবন রাজাব রাহিমাহুল্লাহ, তার বেশ কিছু অসমর্থিত ও অসাব্যস্ত বিষয় উল্লেখ করার পর বলেন, তবে শাইখ আব্দুল কাদের রাহিমাহুল্লাহ'র বেশ কিছু উত্তম বাণী রয়েছে তাওহীদ, আল্লাহর গুণাবলি ও তাকদীরের ব্যাপারে। অনুরূপ কিছু মা'রিফাত বিষয়ক ইলম রয়েছে যা সুন্নাহ'র সাথে সামঞ্জস্যশীল। দেখুন, যাইলু ত্বাবাকাতিল হানাবিলাহ (২/১৯৮)।

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন জিবরীন বলেন, এসব সূফীদের থেকে অধিকাংশ যা বর্ণিত হয় যেগুলো এমনসব কাজ ও কর্মকাণ্ড যার সাথে শরী'আতের মিল হয় না, সেগুলো তারা বলেননি, তারা সেগুলো করেননি। এগুলো তাদের ছাত্র কিংবা অনুসারীদের দ্বারা তৈরি করা।

তিনি হিজরী ৫৬১ সালে মারা যান। দেখুন ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২০/৪৩৯); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১২/২৫২)।

তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে,

معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد

'আল-গুনইয়াহ'[৮৬২] গ্রন্থে বলেন, সংক্ষিপ্তভাবে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে

১- আল-গুনইয়াতু লি ত্বালিবী ত্বারীকিল হাক্ব।
২- আল-ফাতহুর রাব্বানী।
৩- ফুতূহুল গাইব।
৪- আল-ফুয়ূদ্বাতুর রাব্বানিয়্যাহ।

দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২০/৪৩৯); আল-কাতবী, ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত ওয়ায যাইলু আলাইহা (২/৩৭৩); ইবন রাজাব, যাইলু ত্বাবাকাতিল হানাবিলাহ (৩/২৯০); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (৫/৫); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১২/২৫২); যিরিকলী, আল-আ'লাম (৪/৪৭)।

আব্দুল কাদের জীলানীর ওপর সবচেয়ে বেশি কঠোর ছিলেন ইবনুল জাওযী। ইমাম ইবন রজব বলেন, ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আব্দুল কাদের জীলানী রাহিমাহুল্লাহ'র ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে তিনি আব্দুল কাদের জীলানীর বহু ভুল ধরেছেন। তবে ইবন রজব বলেন, ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ পরবর্তী সূফী শাইখদের ওযর গ্রহণ করতেন না যারা তাদের তরীকার পূর্ববর্তীদের বিরোধিতা করে কোনো পন্থা রচনা করেছেন। তিনি তাদের ওপর কঠোর ছিলেন। দেখুন, ইবন রজব, যাইলু ত্বাবাকাতিল হানাবিলাহ (২/১৯৮)।

অবশ্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আব্দুল কাদের আল-জীলানীর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, আব্দুল কাদের জীলানী ইসলামের এমন শাইখদের একজন, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য উম্মতের মাঝে সত্য রসনার ব্যবস্থা করেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/৪৭৪)।

তিনি আরও বলেন, তিনি হক্ব ও ইস্তেকামাতের ওপর ছিলেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৫১৬)। অন্যত্র বলেন, 'তিনি শরী'আতের আদেশ ও নিষেধের সবচেয়ে বেশি মান্যকারী ছিলেন। তিনি তাকদীরের সাথে চলা ও তাকদীর দিয়ে দলীল দেয়ার মত (বিভ্রান্তিকর) মতবাদ থেকে সাবধান করেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৩০৬, ৩৬৯)।

আরও বলেন, নবুওয়াত ও বেলায়েত সম্পর্কে সূফীদের যে মতবাদ তা থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি মুক্ত ও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বেশি দূরে অবস্থানকারী একজন শাইখ ছিলেন। আর যারা নবুওয়াত ও বেলায়েত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তিনি তাদের সবচেয়ে বড় অস্বীকারকারী ছিলেন। তিনি সেসব বিখ্যাত সূফী মাশায়েখগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলি সাব্যস্ত করতেন, জাহমিয়্যাহ ও হুলূলিয়্যাহ সম্প্রদায়দ্বয়ের নিন্দা করতেন। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (৫/৪)।

আরও বলেন, তিনি কেবল শর'য়ী 'সামা'তে বিশ্বাসী ছিলেন, যার ওপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী উম্মতের সালাফগণ চলেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৪২৬-৪২৭)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ইমাম আব্দুল কাদের জীলানীর 'ফুতুহুল গাইব' গ্রন্থের একটি অংশের ব্যাখ্যা করেছেন। যে অংশ শাইখ মুহাম্মাদ রাশাদ সালেম তার জামে'উর রাসায়িল গ্রন্থে তাহকীক করেছেন, দেখুন, (২/৭৩-১৮৯); আর ফুতুহূল গায়েব কিতাবটিও ছাপা হয়েছে, যাতে তার ৭৮টি প্রবন্ধ রয়েছে।

৮৬২. কিতাবটির নাম, 'আল-গুনইয়াতু লি ত্বালিবী তারীকিল হাক্ব আয্যা ওয়া জাল্লা'। এর অপর নাম, আল-গুনইয়াতু। বঙ্গদেশে অনুবাদের সময় গুনিয়াতুত ত্বালেবীন এ নামে খুব প্রসিদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটি প্রথম আরবীতে ছাপা হয়েছিল ফুতুহূল গাইব এর সাথে একত্রে, লাহোরস্থ ইসলামী প্রেস থেকে, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২৭; যার পাশে ছিল ফুতুহুল গাইব। তখন তার প্রতিটি ছত্রের উর্দু অনুবাদ হয়েছিল। এ গ্রন্থের শুরুতে ইমাম আব্দুল কাদের জীলানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, পৃ. ৪, তিনি এ গ্রন্থটি কিছু সঙ্গী-সাথীর অনুরোধে রচনা করেছেন। এ কিতাবটিতে আকীদাহ ও আমল উভয় প্রকার মাসআলাই রয়েছে। তিনি বলেন, পৃ. ৪, যখন আমি দেখলাম যে, সে সত্যি সত্যিই শরী'আতের আদাব, ফরয, সুন্নাত ও পদ্ধতি জানতে আগ্রহী, আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নিদর্শন ও আলামতের মাধ্যমে জানতে উদগ্রীব, তারপর কুরআন দিয়ে নসীহত করা, নাবাওয়ী হাদীসের শব্দাবলি যা আমরা আমাদের মজলিসে বর্ণনা করি তা জানতে উৎসুক, আর সে সালেহীন তথা নেককারদের জীবনী ও চরিত্র অবগত হতে চায়, যা আমাদের এ কিতাবের মাঝে অতিক্রম করবে, তাই আমি সেটা লিখতে মনস্থ

إلى أن قال: وهو بجهة العلو، مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة:٥]، ولا يجوز وصفه بأنه في مكل مكان؛ بل يقال: إنه في السماء على العرش، كما قال: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه:٥]. وذكر آيات وأحاديث، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء

সৃষ্টিকর্তাকে চেনা ও জানা, আর তো হচ্ছে: এটা জানা ও দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক ও একজনই।...

শেষে বলেন, তিনি উপরের দিকে, 'আরশের উপরে অবস্থানকারী, রাজত্বকে আয়ত্বাধীনকারী, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী।

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠]

"তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায় এবং সৎকাজ, তিনি তা উপরে উঠান।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০]

﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝﴾ [السجدة: ٥]

"তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সব কিছুই তাঁর সমীপে উঠে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর।" [সূরা আস-সাজদাহ: ০৫]

আর তাঁকে এ গুণ দিয়ে বলা জায়েয নয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান।(৮৬৩) বরং বলা হবে, তিনি আকাশের উপরে, 'আরশের উপরে। যেমন তিনি বলেছেন:

﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝﴾ [طه: ٥]

"রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

তিনি আরও আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে শেষে বলেন: "কোনো তা'ওয়ীল বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া ইসতিওয়া (আরোহন করা, উপরে উঠা) গুণ প্রয়োগ করা উচিত। আর তা

করেছি, যাতে তা তার জন্য আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে।... আর তিনি তার কিতাবকে পর্ব, অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে তা লিপিবদ্ধ করেন।

যুগে যুগে আলেমগণ এ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি এনেছেন। যেমন ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/২১৪); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২২২, ২৬৪); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৭৭; ইবন রাজাব, যাইলু ত্বাবাকাতিল হানাবিলাহ (২/১৯৯); যাহাবী, কিতাবুল 'আরশ, পৃ. ২৮৪; আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১৩৭০), নং ৫৪৮; সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ (১/১৯৬)। অনুরূপভাবে হাম্বলী মাযহাবের পরবর্তী আলেমগণের অনেকেই এ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন, আলাউদ্দীন আল-মারদাওয়ী, আল-ইনসাফ (২/১২৩, ১৩১, ১৩৫); বাহূতী, কাশশাফুল কানা' (৫/১৭৬)।

৮৬৩. যেমনটি সর্বেশ্বরবাদী, অহংবাদী ও সোহংবাদীরা বিশ্বাস করে থাকে, তারা মনে করে আল্লাহ সবকিছুতে বিদ্যমান। সবকিছুতে প্রবেশ করতে পারেন, সবকিছু আল্লাহতে বিদ্যমান। নাউযুবিল্লাহ। অনেক সূফীরাও এ ধরনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

الذات على العرش.

হলো তাঁর যাত(৮৬৪) বা সত্তা 'আরশের উপরে হওয়া।

৮৬৪. আরবী ভাষাভাষী একদল লোক 'যাত' শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করতেন। কারণ 'যাত' শব্দটি কোনো কিছুর দিকে 'মুযাফ' বা সম্বন্ধ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো 'মুযাফ ইলাহহি' নয়, বা 'ইসম' নয়। সুতরাং 'যাত' শব্দটি ব্যবহার করা হলে তাতে 'আলিফ লাম' প্রবেশ করানো যায় না। 'আয-যাত' বলা যাবে না। এ হচ্ছে আরবী ভাষী অনেকের মত।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবন বারহান, জাওয়ালীক্বী প্রমুখ লোকেরা আল্লাহর জন্য 'যাত' শব্দটি ব্যবহার করাকে অস্বীকার করেছেন। তারা আরও বলেছেন, শব্দটি স্ত্রীবাচক। আর আল্লাহর জন্য স্ত্রী বাচক শব্দ ব্যবহার চলতে পারে না। কিন্তু যারা নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করেছে তারা এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছে নাম ওয়ালা সত্তাকে অথবা নাম ওয়ালা কোনো বাস্তব কিছুর জন্য।' ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (১০/১৫৭)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'আর 'যাত' শব্দটি একটি নব উদ্ভাবিত শব্দ, যা 'যু' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ। আর 'যাত' শব্দের অর্থ: 'ওয়ালা' যেমন, যাতু ইলম বা ইলম ওয়ালা, যাতু কুদরাত বা ক্ষমতা ওয়ালা, যাতু হায়াত বা জীবন ওয়ালা। সুতরাং 'যাত' শব্দটিকে কোনো গুণের সাথে সম্পৃক্ত করা না হলে তা দ্বারা ধরে নিতে হবে এখানে এটি 'মুদ্বাফ' বা সম্বন্ধ রয়েছে যাতে সম্বন্ধপদ আসেনি।' ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (১০/১৫৭)।
তিনি আরও বলেন, বেশ কিছু আলেম এটাকে ব্যবহার করা অস্বীকার করেছেন। যেমন আবুল ফাতহ ইবন বারহান, ইবনুদ দাহহান প্রমুখ। তারা বলেন, এ শব্দটি আরবী নয়। কিন্তু অন্য আলেগমণ তাদের এ মতের বিরোধিতা করেছেন, যেমন, কাযী ও ইবন আকীল প্রমুখ। এ ব্যাপারে ফয়সালাকারী কথা হচ্ছে, এ শব্দটি প্রসিদ্ধ খাঁটি আরবী শব্দ নয়। বরং এটি নতুনভাবে ব্যবহৃত উদ্ভূত শব্দ। যেমন 'মাওজুদ' শব্দটি, 'মাহিয়্যাত' শব্দটি, 'কাইফিয়্যাত' শব্দ ও অনুরূপ শব্দাবলি। এ শব্দটি দাবি করে কিছু গুণ থাকা যার দিকে সত্তাকে সম্পৃক্ত করা হবে। ফলে বলা হবে, যাতু ইলম বা ইলম ওয়ালা, যাতু কুদরাত বা কুদরত ওয়ালা, যাতু কালাম বা কথাওয়ালা...।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৯৯)। আরও দেখুন, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১৩৮৪)।
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ শাইখ আব্দুল কাদের আল-জীলানীর বক্তব্যের অর্থ করেছেন এভাবে যে, 'অর্থাৎ সত্যিকারের উপরে উঠা।' বহু বিখ্যাত আলেম ও প্রখ্যাত বড় আলেমগণ 'যাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কেউ কেউ তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তারা প্রত্যেকেই কল্যাণের ওপর রয়েছে।
যারা বলেছেন 'আরশের উপরে উঠার উঠার অর্থ, 'আরশের উপর আল্লাহর 'যাত' বা সত্তা উঠা, তারা যাবতীয় তা'ওয়ীল নামীয় তা'ত্বীল থেকে আল্লাহর সিফাতকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। কারণ কেউ কেউ 'আরশের উপরে উঠেছেন' এটা বলে তবে তারা তা'ওয়ীল না করেও বলে থাকে যে, এর দ্বারা 'আল্লাহর সত্তা 'আরশের উপরে উঠা' বুঝানো হয়নি। তাই যাতে কেউ আল্লাহ তা'আলার সত্তা 'আরশের উপরে উঠাকে অস্বীকার করতে না পারে সেজন্য তারা স্পষ্টভাবে 'আল্লাহ তা'আলার সত্তা শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
আর যারা 'যাত' বা সত্তা শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের বিষয়টি 'তাওক্বীফী' বা কুরআন ও সুন্নাহ'র জানানোর ওপর নির্ভরশীল। আর কুরআন ও সুন্নাহ'র কোথাও 'আরশের উপরে উঠেছেন' এর সাথে 'যাত' কথাটি আসেনি। বস্তুত তাদেরও উদ্দেশ্য হক্ব ও সত্য। যারা 'যাত' শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করেছেন তাদেরও উদ্দেশ্য মহৎ। এরা আকীদাহ'র অধ্যায়ে একটি ফায়েদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, বান্দাদের হিদায়াতের কারণ হয়েছেন, যথাযথভাবে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। আর অন্যরা যারা 'যাত' শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তারা শুধু কুরআন ও সুন্নাহ'য় যা এসেছে তাই ব্যবহার করছে, তারা চায়নি কোনো শব্দ বাড়াতে। কিন্তু এ অধ্যায়ে যখন কোনো শব্দ বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, আর তার মাধ্যমে কোনো পথভ্রষ্টতা কিংবা বিদ'আত প্রতিহত করা উদ্দেশ্য তখন তা আনয়ন করা যাবে, এতে কোনো নিষেধ নেই। তিনি কি তাঁর সত্তা ব্যতীতই 'আরশের উপর উঠেছেন? সুতরাং যে কেউ এ 'যাত' শব্দ ব্যবহার করেননি তিনিও সঠিক পথে আছেন, তবে শর্ত হচ্ছে তাদের কাছে... (আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করার বিষয়টি স্পষ্ট থাকতে হবে)। দেখুন, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলুশ শাইখ, ফাতাওয়া ও রাসায়িল (১/২০৯-২১০)।

এ তো গেল, 'আরশের উপর উঠার ক্ষেত্রে 'যাত' বা সত্তাসহ শব্দটি ব্যবহার নিয়ে আলোচনা। যাতে প্রত্যেক গোষ্ঠীর কথার পিছনেই যুক্তি রয়েছে। কিন্তু তারা কেউই তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠাকে অস্বীকার করে কিংবা অপব্যাখ্যা করে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। এভাবে আল্লাহর আরেকটি সিফাত বা গুণ হচ্ছে 'মহান আল্লাহর নেমে আসা'। এই গুণটির ব্যাপারেও অনুরূপ মতভেদ হয়েছে, সেখানে কি এটা বলা হবে যে, তিনি 'যাতসহ অবতরণ করেন'? এখানে আলেমগণের মধ্যে তিনটি মত দেখা যায়।

এক. যারা বলেন যে, তা বলা যাবে, তাদের কথা হচ্ছে এ ব্যাপারে একটি হাদীস এসেছে, কিন্তু বাস্তবে হাদীসটি দুর্বল। তারা আরও বলেন, এখানে 'সত্তা' বলে 'স্বয়ং' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কোনো নির্দেশ বা রহমত বা তার কোনো ফিরিশতা নাযিল হওয়া নয়, বরং তিনি স্বয়ং নাযিল হন। তাই এটি বললে সেসব মু'আত্তিলাদের অপব্যাখ্যার মূলোৎপাটন করা হয়, সুতরাং তা ব্যবহার করা যাবে। এ মতের পক্ষে রয়েছেন আহলুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ'র কিছু ইমাম, সূফীদের কিছু শাইখ আর কিছু কালামশাস্ত্রবিদ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে যারা তা বলেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন, নু'আইম ইবন হাম্মাদ আল-মারওয়াযী, আবুল কাসেম আত-তাইমী, (কিওয়ামুস সুন্নাহ), প্রখ্যাত আলেম 'কুহতাহ', আবু আব্দুল্লাহ ইবন হামেদ, আব্দুর রহমান ইবন আবু আব্দুল্লাহ ইবন মানদাহ।

দুই. যারা বলেন যে 'আল্লাহ তা'আলা সত্তাসহ বা স্বয়ং অবতরণ করেন' একথা বলা যাবে না, তাদের কথা হচ্ছে, এটি কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসেনি, তাই আমরা তা বলা থেকে বিরত থাকব। এটি মূলত বিদ'আতী কালামশাস্ত্রবিদ অপব্যাখ্যাকারীদের মত। কিন্তু কোনো কোনো আহলুস সুন্নাতের ইমাম এখানে 'সত্তাগতভাবে' বা 'স্বয়ং' বলা যাবে না বলে মত প্রকাশ করে কালামশাস্ত্রবিদদের অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম ইবন কুতাইবাহ, ইবন আব্দিল বার, খাত্তাবী। সম্ভবত ইবন কুতাইবাহ এখানে অবতরণ ও 'আরশের উপর থাকার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে কালামশাস্ত্রবিদদের সাথে এই একটি মাসআলায় 'স্বয়ং' শব্দটি বলতে নিষেধ করেছেন।

তিন. যারা বলেন, আমরা শুধু 'মহান আল্লাহ অবতরণ করেন' এতটুকু বলবো, তার থেকে বেশি বাড়িয়ে বলবো না। তবে তারা আল্লাহ কর্তৃক অবতরণ করার গুণটি সাব্যস্ত করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম আবু মূসা আল-মাদীনী, ইমাম আবুল কাসেম আত-তামীমী ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২০/৩৩১)। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, গামেদী, সিফাতিন নুযূলিল ইলাহী ওয়া রাদ্দুশ শুবুহাত হাওলাহা, পৃ. ২১৫-২২১।

বস্তুত ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ'র এমতটিও একদিক থেকে ঠিক আছে, আর তা হচ্ছে, এমন প্রতিটি কথা যার শব্দ বা অর্থ কুরআন ও সুন্নাহয় আসেনি, আর সালাফগণও তা বলেননি, তা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ তা তখন শর'য়ী দলীলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর এটির বিরোধিতা করা কিংবা এর সাথে একাত্ম হওয়ার সাথে সুন্নাত বা বিদ'আত সম্পৃক্ত হয় না। সুন্নাত তো তাই যা শর'য়ী দলীল অনুযায়ী হবে, আর বিদ'আত তাই যা শর'য়ী দলীলের বিরোধী হবে। আবার কখনও কখনও যা শরী'আতের অনুযায়ী কিনা তা জানা যায় না এমন কিছুকেও বিদ'আত বলা হয়ে থাকে; কারণ এখানে মূলনীতি হচ্ছে, যা শরী'আত বলে জানা যাবে না তা শরী'আত ও দীন হিসেবে নেয়া যাবে না। সুতরাং যদি কেউ এমন কোনো কাজ করে যা শরী'আত অনুমোদিত বলে জানা যায়নি তাহলে সে বিদআতের প্রচলন করলো; যদিও পরবর্তীতে তার কাছে সেটা জানা হয় যে তা শরী'আত অনুমোদিত। অনুরূপভাবে যে কেউ দীনের মধ্যে এমন কোনো কথা বলবে যার সপক্ষে শর'য়ী কোনো দলীল নেই সেও বিদ'আতে নিপতিত হলো, যদিও পরবর্তীতে তার সে কাজ সুন্নাত অনুসারে হয়েছে জানা হয়। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (১/২৪৪)।

তবে নিঃসন্দেহে এটা বলতেই হবে যে, সালাফগণের মধ্য হতে যারা মুহাক্কিক বা সত্যনিষ্ঠ বলে খ্যাতি লাভ করেছেন, যেমন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী প্রমুখ তারা এসব শব্দের সাথে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন সেটাই অনুসরণ করা উচিত। সুতরাং যখন আল্লাহ তা'আলার অবতরণ' সাব্যস্ত করা হবে তখন শরী'আতের ভাষ্যে যা এসেছে তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু যখন বিদ'আতীরা এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করবে যা শর'য়ী ভাষ্যে আসেনি, তখন সেটা দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করতে হবে। যাতে করে যা হক্ক অর্থ

قال: وكونه على العرش مذكورٌ في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلامًا طويلاً لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا». ولو ذكرت ما قال العلماء في هذا لطال [الكتاب] جدًا.

[قول الإمام ابن عبد البر]

وقال أبو عمر بن عبد البر: «روينا عن مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمِرُّوها كما جاءت.

তিনি বলেন, তাঁর 'আরশের উপরে হওয়া প্রত্যেক নাযিল হওয়া কিতাবে ও প্রত্যেক প্রেরিত নবী থেকে উল্লেখ রয়েছে, কোনো ধরণ-পদ্ধতি নির্ধারণ ছাড়া। আর তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যা এ স্থানে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। আর তিনি আল্লাহর সকল সিফাতের ব্যাপারেও একই কথা বলেছেন।(৮৬৫) এ প্রসঙ্গে সকল ইমামের কথা উল্লেখ করলে কিতাব অনেক লম্বা হয়ে যাবে।(৮৬৬)

[ইমাম ইবন আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য]

আবু 'উমার ইবন আবদুল বার বলেন, "মালিক, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, আওযা'য়ী, মা'মার ইবন রাশেদ(৮৬৭) থেকে সিফাতের হাদীসের ব্যাপারে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে যে, তারা সকলেই বলেছেন: "এসব সিফাতকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও।"(৮৬৮)

তা সাব্যস্ত করা যায়, আর যা বাতিল অর্থ হবে তা না করা যায়।

কিন্তু সবসময় যদি এটি ব্যবহার করতে মানা করা হয়, তখন তার একটি অসুবিধা হলো, যারা এসব শব্দ ব্যবহার করতে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে তারা বিরোধীদের কথার জাওয়াবের সময় নিজেরা অপারগ হয়ে যাবে ও রনে ভঙ্গ দেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না। অর্থাৎ তখন লোকেরা বলবে সে জানে না, তার উত্তর দেয়ার জ্ঞান নেই। আর বাতিল এমনসব শব্দ ব্যবহার করেই সবসময় জিতে যেতে চায়।

দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (১/২২৯), (৯/৩৩৫); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫৮)।

৮৬৫. দেখুন, আল-গুনইয়া, পৃ. ১২১-১২৮; আরও দেখুন, ইবন রাজাব, যাইলু ত্বাবাকাতিল হানাবিলাহ (৩/২৯৬); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৭৭; যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, পৃ. ১৯৩; মুখতাসার, পৃ. ২৮৪।

৮৬৬. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে পড়তে পারেন আমার অপর গ্রন্থ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"।

৮৬৭. তিনি হচ্ছেন ইমাম আবু উরওয়া মা'মার ইবন রাশেদ ইবন আবী উরওয়া আল-আযদী, তাদের বসরী মাওলা বা আযাদকৃত দাস। তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ৯৫ বা ৯৬ সালে। মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ১৫৩ সালে।

তার সম্পর্কে ইবন জুরাইজ বলেন, 'তোমরা মা'মারকে আঁকড়ে থাকো; কারণ তার সময়ে তার মতো জ্ঞানী আর নেই।'

ইবন সা'দ বলেন, মা'মার ছিলেন, সহিষ্ণু, মানবিক ও নিজে ব্যক্তিগতভাবে শরীফ ও ভদ্র-নম্র মানুষ। দেখুন, ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (৫/৫৪৬); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/১৯০); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/৫); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (১/২৩৫)।

৮৬৮. এ কিতাবের শুরুতেই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

قال أبو عمر: «ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات، أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو علم يُدَان به؛ وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم، فهو بدعة وضلالة».

وقال في «شرح الموطأ»: لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل،

আবু 'উমার বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ থেকে বিশ্বস্তভাবে যা এসেছে সেটিই ইলম, তার আনুগত্য করতে হবে। আর যা পরবর্তীতে উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেগুলোর কোনো মূল ভিত্তি নেই সেগুলো বিদ'আত ও গোমরাহী।"(৮৬৯)

আর "মুওয়াত্তার" ব্যাখ্যায়(৮৭০) যখন নুযুল (অবতরণ করা) এর

---

৮৬৯. ইবন আব্দিল বার, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী (২/১১৮); তবে সেখানে বাড়তি আছে, 'যেমন আল্লাহর নিকটতম আসমানে অবতরণের হাদীস, অনুরূপ হাদীস: আল্লাহ তা'আলা আদমকে তার সূরতে সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ: তিনি তাঁর পা জাহান্নামে রাখবেন, আর যা এসব হাদীসের মত রয়েছে সেসব'। তবে সেখানে 'যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে... এটুকু নেই।

অবশ্য সেটা অন্যত্র এসেছে এভাবে,

قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقْلِ الثِّقَاتِ وَجَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَصَحَّ عَنْهُمْ فَهُوَ عِلْمٌ يُدَانُ بِهِ، وَمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِيمَا جَاءَ عَنْهُمْ فَبِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَمَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ أَوْ صِفَاتِهِ عَنْهُمْ سَلِمَ لَهُ، وَلَمْ يُنَاظَرْ فِيهِ كَمَا لَمْ يُنَاظِرُوا.

"আবু 'উমার বলেন, যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্যদের মাধ্যমে হয়ে বর্ণিত হয়ে এসেছে আর যা সাহাবায়ে কিরামের কাছ থেকে এসেছে তা হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান, যার আনগত্য করতে হবে। আর যা তাদের পরে নব উত্থাপিত হয়েছে, যার সপক্ষে পূর্বোক্তদের পক্ষ থেকে কোনো মূলনীতি নেই, সেটি বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। আর আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে যা এসেছে সেগুলো মেনে নেয়া হবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। সেগুলোতে কোনো প্রকার বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম বিবাদে জড়াননি" [জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়াফাদ্বলিহী (২/৯৪৫); প্যারা নং ১৮০৬]

এরপর ইবন আব্দুল বার বলেন, সালাফগণ এসব হাদীস বর্ণনা করে সেগুলোর ব্যাপারে অপব্যাখ্যা না করে চুপ ছিলেন, অথচ তারা ইলম বা জ্ঞানের দিক থেকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, বুঝের দিক থেকে প্রশস্ত বুঝের অধিকারী, লৌকিকতা তাদের মাঝে ছিল শূন্যের কোঠায়, তারা এসব হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে চুপ থাকা কোনোভাবেই অজ্ঞতা বা অপারঙ্গমতা থেকে নয়, সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরাম যা দিয়ে যথেষ্ট হয়েছে তা দিয়ে নিজেকে যথেষ্ট না করবে সে তো ব্যর্থ হয়েছে ও ক্ষতিগ্রস্ততায় লিপ্ত হয়েছে। [২/৯৪৫]

৮৭০. মুওয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলে বুঝানো হয়েছে, ইমাম আব্দুল বার এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ'। এটি একটি অতীব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। বর্তমানে এটি ২৩ খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

ইবন আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ এ গ্রন্থটি ৩০ বছরে লেখেছেন। যুগ যুগ ধরে ইমামগণ এ কিতাবের প্রশংসা করেছেন। আবু মুহাম্মাদ ইবন হাযম বলেন, আমাদের সঙ্গী আবু 'উমার এর 'আত-তামহীদ', হাদীসের ফিকহে যে কিতাবের মতো আর কোনো গ্রন্থ আছে কিনা আমার জানা নেই, এর থেকে উত্তম তো দূরের কথা। দেখুন রাসায়িলি ইবন হাযম (২/১৭৯)। আবু আলী আল-গাসসানী বলেন, 'কিতাবুত তামহীদ' এর মতো কিতাব তার আগে কেউ লিখেনি।' ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/১৫৭)। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এ বিষয়ে একটি সবচেয়ে মানসম্মত গ্রন্থ। মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২২০); কখনও কখনও বলেছেন, এটি এ বিষয়ে লেখা সবচেয়ে সম্মানিত গ্রন্থ। মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২৬৩)। ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম ইয্যুদ্দীন ইবন আব্দিস সালামের বক্তব্য,

صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه، من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله. وذكر بعض الآيات. إلى أن قال: وهذا

হাদীসের[৮৭১] প্রসঙ্গে আলোচনা করেন[৮৭২] তখন তিনি বলেন: এটি ভাষ্যের দিক থেকে প্রমাণিত, বিশুদ্ধসূত্রে সংকলিত হাদীস। হাদীসবেত্তাগণ এটার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতবিরোধ করেননি। এ সূত্র ব্যতীত তা আরও অনেক সূত্রে ন্যায়পরায়ণদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে। এ হাদীস এটার ওপর দলীল যে, আল্লাহ আসমানে 'আরশের উপরে আছেন, সাত আসমানের উপরে। যেমনটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলেছেন। তাদের একথা মু'তাযিলাদের কথার বিপক্ষে দলীল, তারা বলে: আল্লাহ তাঁর পবিত্রসত্তা সহ সর্বত্র বিরাজমান।[৮৭৩]

তিনি আরও বলেন, হকপন্থীরা যা বলেছে তার বিশুদ্ধতার পক্ষে রয়েছে আল্লাহর বাণী। অতঃপর তিনি [ইবন আব্দিল বার] বেশকিছু আয়াত উল্লেখ করে[৮৭৪] বলেন: এটা বিশেষ

'আমি ইসলামের কিতাবের মধ্যে ইলমের দিক থেকে ইবন হাযমের মুহাল্লা, ইবন কুদামার মুগনীর মত কিতাব দেখিনি' এটুকু উদ্ধৃত করার পর ইমাম যাহাবী বলেন, শাইখ ইয্যুদ্দীন সত্য বলেছেন, তৃতীয়টি হচ্ছে বাইহাকীর আস-সুনানুল কাবীর, আর চতুর্থটি হচ্ছে, ইবন আব্দিল বার এর আত-তামহীদ। যে কেউ এ চারটি দিওয়ান (বড় গ্রন্থ) তার কাছে একত্রিত করতে পারবে, সে যদি বুদ্ধিমান মুফতি হয়, আর তাতে নিয়মিত নজর বুলাতে থাকে তবে সে ব্যক্তি সত্যিকারের আলেম হয়ে যাবে।' ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/১৯৩)।

৮৭১. নুযূল এর হাদীস বলতে, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিকটতম আসমানে নেমে আসার বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি বুঝানো হয়েছে যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমাদের রব, তিনি বরকতময় ও সুউচ্চ, প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন..."। হাদীসটির তাখরীজ আগে চলে গেছে।

৮৭২. ইবন আব্দুল বার এ হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, যা বর্তমান তামহীদ কিতাবের ৭ম খণ্ডে ১২৮ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত।

৮৭৩. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন যে, যারা বলে 'আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান' এ কথাটি মূলত জাহমিয়্যাদের মধ্যে যারা ইবাদত কর্মে লিপ্ত তারা বলে, অর্থাৎ মু'তাযিলাদের মধ্যকার ইবাদত ও তাসাওউফে প্রসিদ্ধ তারাই বলে থাকে। আর তাদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ আরেকটি কথা, 'তিনি আল্লাহ জগতের ভিতরেও নন, জগতের বাইরেও নন,' এ বক্তব্য তাদের মধ্যকার যারা তর্কবাগীশ ও তাদের মধ্যকার কালামশাস্ত্রবিদদের। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, জাহমীদের মধ্যকার কালাম শাস্ত্রবিদরা কিছুরই ইবাদত করে না, আর জাহমিয়্যাদের মধ্যকার সূফীরা সবকিছুর ইবাদত করে থাকে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/২৯৮)।
বরং শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র বলেন, তাদের অনেকের মধ্যে এ দু'টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের সমাহার ঘটেছে। তারা যখন গবেষণা করতে নামে তখন আল্লাহকে বিপরীতমুখী দু'টি গুণ প্রদান করে, অর্থাৎ তখন তারা বলে, 'তিনি জগতের বাইরেও নন, জগতের ভিতরেও নন।' আর যখন ইবাদত করার চিন্তা করে তখন বলে, 'তিনি সব জায়গায়, তার থেকে কোনো কিছু বিমুক্ত নয়।' এমনকি তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ স্পষ্ট করে বলে, তিনি সকল অস্তিত্বশীল বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। জীব-জন্তু ও অন্যান্য সবকিছুতে। বরং তারা বলে সবকিছুতে তিনি একাকার হয়ে আছেন। বরং আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, সত্তা তো একটিই, অর্থাৎ স্রষ্টা তো অস্তিত্বশীল বস্তুই। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৭); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৭২)।

৮৭৪. যেমন, আল্লাহর বাণী, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫], অনুরূপ তাঁর বাণী,

أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا أنكره [عليهم] مسلم.

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضًا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة:٧] هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله.

ও সাধারণ সকল শ্রেণির লোকদের নিকট প্রসিদ্ধ ও জানা, যা উল্লেখ করার পর আর বেশি বর্ণনার প্রয়োজনমুক্ত। এটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়[৮৭৫], এ ব্যাপারটি স্বীকার করার বিষয়টি কাউকে জানাতে হয়নি। [অর্থাৎ ফিত্বরী বিষয়, যা সকলের অন্তর অবশ্যম্ভাবীরূপে স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে][৮৭৬]

আবু 'উমার ইবন আব্দিল বার আরও বলেন, "যাদের থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে সেসব সাহাবী ও তাবে'য়ী আলেমগণ একমত যে, এই আয়াত ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] এর ব্যাখ্যা হলো: তিনি 'আরশের উপরে, তাঁর জ্ঞান সর্বত্র। এ ব্যাপারে যাদের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে এমন কেউ তাদের বিরোধিতা করেনি।[৮৭৭]

"আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" [সূরা আস-সাজদাহ: ০৪], অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "তারপর তিনি আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি ওটাকে (আসমান) ও যমীনকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে'।" [সূরা ফুসসিলাত: ১১]

৮৭৫. এ অবশ্যম্ভাব্যতার কথা যা তিনি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, আরব হোক আজম হোক যারাই তাওহীদের অনুসারী, তাদের যখনই কোনো সমস্যা হয় বা বিপদ হয়, তখনই তারা তাদের হাতসমূহ আসমানের দিকে তুলে ধরে, এর মাধ্যমে তারা তাদের রবের সাহায্য কামনা করে। আত-তামহীদ (৭/১৩৪)।

৮৭৬. ইবন আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ'র পূর্ণ বক্তব্য নিয়ে আসা হলে তা বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে থাকা, সাত আসমানে উপরে হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, আরব হোক, অনারব হোক, তাওহীদবাদীদের যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয় অথবা তাদের কোনো বিপদ আসে, তারা তাদের চেহারাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে তাদের রবের কাছে উদ্ধার কামনা করতে থাকে, এটি সাধারণ ও বিশেষ লোকদের মাঝে এতই প্রসিদ্ধ যে, এটি বর্ণনা করার অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন হয় না। কারণ এটি এমন এক অবশ্যম্ভাবী কাজ যা করতে কেউ তাদেরকে ধমক দেয়নি, আর কোনো মুসলিমও তা কোনো দিন মানতে অস্বীকার করেনি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যাকে তার মনিব মুক্ত করতে চেয়েছিলেন যদি সে ঈমানদার হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরীক্ষা করে বলেন, 'আল্লাহ কোথায়'? তখন সে দাসী উপরের দিকে ইঙ্গিত করলো। তারপর তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বললো, আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূল বললেন, তুমি তাকে স্বাধীন করে দাও, সে তো ঈমানদার।' এখানে দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিছক আকাশের দিকে মাথা তোলাকেই যথেষ্ট হিসেবে নিয়েছেন; তিনি এটাকেই অন্য সবকিছু জিজ্ঞাসা করা থেকে যথেষ্ট মনে করেছেন।' আত-তামহীদ (৭/১৩৪)।

৮৭৭. 'আল্লাহর ইলম সব জায়গায়' এ বক্তব্যটি সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী সুন্দর উত্তরসূরীদের

وقال أبوعمر أيضًا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يحُدُّون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع - الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبِّه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون: بما نطق به كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه

আবু 'উমার আরও বলেন, আহলুস সুন্নাহগণের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, কুরআনে বর্ণিত ও হাদীসে উল্লিখিত সকল সিফাত স্বীকার করা হবে, ঈমান আনতে হবে, সেগুলোকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করতে হবে, রূপক অর্থে নয়। তবে তারা এগুলোর কোনোটির ধরণ বর্ণনা করেননি এবং কোনো সীমায় সীমিতও করেননি।[৮৭৮]

অপরদিকে বিদ'আতপন্থীরা যেমন জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, খারেজী, তারা এগুলোকে অস্বীকার করে। একটিকেও প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করে না। বরং তারা মনে করে, যে ব্যক্তি এগুলো স্বীকার করবে সে মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যদানকারী।

যারা এ গুণগুলোকে যথাযথভাবে স্বীকার করে তাদের নিকট এ (জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, খারেজী) লোকগুলো মূলত: মা'বুদকেই অস্বীকারকারী।[৮৭৯] সত্য হচ্ছে তাদের কথায়, যারা

কাছ থেকে এসেছে। যেমন,

১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/১১৪), নং ৬৩।

২) অনুরূপভাবে তা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও এসেছে।

৩) দ্বাহহাক ইবন মুযাহিম থেকেও এসেছে। দেখুন, ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৯); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৪৮।

৪) তদ্রূপ তা ইমাম মালেক ইবন আনাস থেকেও এসেছে। দেখুন, আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ ১১, ৫৩২; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৬৭৩; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৫৩), নং ১১০; ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল উলু, পৃ. ১১৫।

৫) তাছাড়া তা ইমাম আবু যুর'আহ থেকেও এসেছে, দেখুন, যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১১৫৩); নং ৪৬৫; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৩৪।

আর ইমাম ইবন আব্দিল বার এর এ বক্তব্য আরও যারা উদ্ধৃত করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারুউত তা'আরুদ্ব (৬/২৫৪-২৫৬); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৩৯); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২২১); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৪৮; আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৮৮); যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১৩২৫), নং ৫৩১।

৮৭৮. অর্থাৎ কোনো প্রকার আয়ত্ত্ব করার কথা বলেননি। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তাঁকে কোনো চোখ আয়ত্ব করতে সক্ষম নয়।" [সূরা আল-আন'আম: ১০৩] দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৩/৭০৮)।

৮৭৯. ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ ইবন আব্দিল বার থেকে এতটুকু উদ্ধৃত করার পর বলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি সত্য বলেছেন; কারণ যে কেউ গুণাবলির অপব্যাখ্যা করে সেগুলো থেকে যা কিছু কুরআন ও হাদীসে এসেছে তা রূপকের ওপর ফেলে দেয়, তখন এভাবে সেগুলোকে না করার মাধ্যমে সে মূলত আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে বসে, তাঁকে অস্তিত্বহীনের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করে। যেমন হাম্মাদ ইবন যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'জাহমিয়্যাদের উদাহরণ হচ্ছে এমন লোকদের মত, যারা বলেছে যে আমাদের বাড়ীতে খেজুর গাছ আছে। বলা

وسلم وهم ائمة الجماعة».

[قول الإمام البيهقي] :

وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري،

কুরআন-সুন্নাহ যা বলে তাই বলে, তারা তো আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ। এ হলো মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলের ইমাম ইবন আব্দিল বার এর বক্তব্য।(৮৮০)

[ইমাম বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য]

তার যুগে ছিলেন হাফেয আবু বকর আল-বাইহাকী। যদিও তিনি আবুল হাসান আশ'আরী(৮৮১)র কালামপন্থী ছাত্রদেরকেই অভিভাবক হিসেবে নিয়েছেন আর তিনি তাদের

হলো, সে গাছের কি ডালপালা আছে? বললো, না। প্রশ্ন করা হলো, সে গাছের কি ডালের গোড়া আছে? সে বলল, না। তারপর বলা হলো, সে গাছের কি কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুর আছে? সে বলল, না। তারপর বলা হলো, আচ্ছা সে গাছের কি কাণ্ড আছে? সে বলল, না। তখন তাকে বলা হলো, আসলে তোমাদের বাড়ীতে খেজুর গাছই নেই।' ইমাম যাহাবী বলেন, আমি বলি, আল্লাহ তা'আলার সিফাত অস্বীকারকারীদের অবস্থা এমনই। তারা বলে যে আমাদের উপাস্য হচ্ছেন আল্লাহ। তবে তিনি কোনো কালে নন, জায়গায় নন, দেখা যায় না, শুনেন না, তিনি দেখেন না, তিনি কথা বলেন না, তিনি সন্তুষ্ট হন না, তিনি রাগ করেন না, তিনি ইচ্ছা করেন না, তিনি ... না, তিনি...না, আর বলে, তিনি তো সকল গুণ থেকে পবিত্র।

বরং আমরা বলি, মহান পবিত্র আল্লাহ, তিনি সর্বোচ্চ সত্তা, মহান সত্তা, শ্রোতা, দর্শক, ইচ্ছাকারী, যিনি মূসার সাথে কথা বলেছেন, ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আখেরাতে দেখা যাবে, সেসব গুণে গুণান্বিত যা দিয়ে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা তা দিয়ে তাঁকে তার রাসূল গুণান্বিত করেছেন, তিনি সৃষ্টিকুলের মতো হওয়া থেকে পবিত্র, অস্বীকারকারীদের অস্বীকার থেকে মুক্ত, তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১৩২৬-১৩২৭)।

৮৮০. দেখুন, আত-তামহীদ (৭/১২৮)...। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এখানে সংক্ষেপে তা এনেছেন।

৮৮১. তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আলী ইবন ইসমা'ঈল ইবন আবি বিশর ইবন সালেম আল-আশ'আরী। তার কুনিয়াত আবুল হাসান নামেই প্রসিদ্ধ। তার বংশলতিকা আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে গিয়ে শেষ হয়। তার পিতা ইসমা'ঈল হাদীস ও সুন্নাহ'র অনুসারী ও হাদীসবেত্তা ছিলেন। কারণ তিনি তার মৃত্যুর সময় তার ছেলেকে দেখার জন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস যাকারিয়্যাহ ইবন ইয়াহইয়া আস-সাজীর দায়িত্বে প্রদান করেন। তবে আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। সামান্য কিছু বর্ণনা দেখা যায় যা তিনি তার তাফসীরে কোনো কোনো শাইখ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আশ'আরী প্রচুর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; বলা হয়ে থাকে, যার পরিমাণ পঞ্চান্নটির মতো। যেমনটি ইমাম ইবন হাযম উল্লেখ করেছেন। আবার কারও কারও মতে তার গ্রন্থের সংখ্যা তিনশত আশিটির মত। দেখুন, তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৩/৩৫৯)।

তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, আবুল হাসান এর ছিল অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, ইলমের ক্ষেত্রে তার ছিল সামুদ্রিক গভীরতা। তার অনেক ভালো কাজ ও উত্তম গ্রন্থ রয়েছে, যা তার ইলমের প্রশস্ততার প্রমাণ দেয়।

তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপারে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইমাম আশ'আরী প্রথম জীবনে মু'তাযিলাদের মতের ওপর বড় হয়ে উঠেন। জীবনের একটি বিরাট সময় তাদের মাঝেই কাটান। সেখানে তিনি তার মায়ের স্বামী আবু আলী আল-জুব্বাঈ এর শিষ্যত্ব বরণ করেন, যিনি তৎকালীন সমাজের বড় মু'তাযিলী ছিলেন। ইবন 'আসাকির প্রমুখ লিখেছেন যে, তিনি মু'তাযিলাদের মতবাদের ওপর চল্লিশ বছর বা তার কাছাকাছি সময় কাটিয়েছিলেন। তখন তিনি তাদের মতবাদের জ্ঞানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে, তিনি তাতে গ্রন্থও রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেখুন, ইবন

আসাকির, তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১৩১।

তারপর তিনি সবার সামনে মু'তাযিলাদের মতবাদ থেকে ফিরে আসার ঘোষণা প্রদান করেন। আরও জানিয়ে দেন যে, তিনি তার পূর্ববর্তী সকল মতামত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

আবু বকর আস-সাইরাফী বলেন, মু'তাযিলারা তাদের মাথা উঁচু করেছিল, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আবুল হাসান আল-আশ'আরীর প্রাদুর্ভাব ঘটালেন ফলে তিনি তাদেরকে পরাস্ত করলেন।

মু'তাযিলা মতবাদ পরিত্যাগের পর তার জীবনের বাঁক নির্ধারণে আলেমগণ মতভেদ করেছেন, সেটি কি একটি নাকি দু'টি।

কারও কারও মতে, মু'তাযিলা মতবাদ ত্যাগের পর তিনি দু'টি স্তর অতিক্রম করেছেন। তারা আবার দু' মতে বিভক্ত:

ক. আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ মু'তাযিলা মতবাদ ত্যাগ করার পর ইবন কুল্লাবের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তারপর সালাফে সালেহীনের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, যা ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ'র একটি বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত।

খ. আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ মু'তাযিলা মতবাদ ত্যাগ করার পর সালাফে সালেহীনের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর তিনি সালাফ ও মুতাকাল্লিমদের মতামতের মাঝামাঝিতে অবস্থান করেন। এটি আশ'আরী মতবাদের লোকদের দাবি, বিশেষ করে যাহিদ কাউসারী ও তার মতো সীমালঙ্ঘনকারীদের বক্তব্য।

তবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "আর আবুল হাসান আল-আশ'আরী যখন তিনি মু'তাযিলাদের মতবাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তিনি ইবন কুল্যাবের মত গ্রহণ করলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীসের মতের দিকে ঝুঁকলেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন, যেমনটি তিনি তার সকল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেমন: আল-ইবানাহ, আল-মুওজায ও মাকালাত প্রভৃতি..সে সময় তিনি আহলুস সুন্নাহ ও হাদীসের সাথে যেমন চলেছেন তেমনি তার মাঝে কালামশাস্ত্রবিদদের বেশ কিছু মতামতও তেমনি অবশিষ্ট ছিল...।"

অন্যত্র তিনি বলেন, 'আর আশ'আরী ও তার মত অন্যান্যরা তারা সালাফে সালেহীন ও জাহমিয়্যাহদের মাঝখানে বারযাখে তথা ব্যবধানে অবস্থান করতে থাকলেন, তারা এদের থেকে বিশুদ্ধ কথা যেমন গ্রহণ করতেন, তেমনি আবার ওদের থেকে আকলী মূলনীতিও গ্রহণ করতেন, যা তারা বিশুদ্ধ মনে করতেন, অথচ তা ছিল বিনষ্ট। তাই মানুষের মাঝে অনেককেই দেখা যায় তার মাঝে থাকা সালাফী নীতির কারণে তাঁর দিকে ঝুঁকে যেতে, আবার আরেক গোষ্ঠীকে দেখা যায় তার কাছে থাকা বিদ'আতী ও জাহমী নীতির কারণে তার দিকে ঝুঁকে যেতে, যেমন আবুল মা'আলী ও তার অনুসারীরা।

ড. আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিস্তারিত স্টাডি করেছেন, যা ১৬২ পৃষ্ঠা ব্যাপী। যাতে তিনি এ সিদ্ধান্তের উপনীত হয়েছেন যে, তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতামতের অনেক নিকটবর্তী হয়েছিলেন। তবে তাঁর কাছে শেষ পর্যন্তও ইবন কুল্লাবের মতবাদের বেশ কিছু নীতি অবশিষ্ট ছিল।

ইমাম যাহাবী বলেন, আমি আকীদাহ'র বিষয়ে আবুল হাসানের চারটি গ্রন্থ দেখেছি, যাতে তিনি আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের নীতি বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি যা বলেছেন তন্মধ্যে রয়েছে, "এ গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নেয়া হবে।" তারপর তিনি বলেন, আর আমিও তা বলি, এটাকে দীন হিসেবে গ্রহণ করি, কোনো প্রকার তা'ওয়ীল এর আশ্রয় গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম আশ'আরীর জন্ম হয়েছিল হিজরী ২৬০ সালে, আর মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ৩২০ সালে অথবা ৩২৪ সালে।

তার অনেক গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন', আল-লুমা' ফির রাদ্দি আলা আহলিয যাইগে ওয়াল বিদা', রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার, আল-ইবানাহ 'আন উসূলিদ দিয়ানাহ, আর-রুইয়াতু বিল আবসার, আন-নাকদু আলাল জুব্বাঈ ইত্যাদি।

দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (১১/৩৪৬); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৩/২৮৪); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৫/৮৫); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৩০৩); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (২/১৬); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪৭১); আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ, মাওকাফু ইবন তাইমিয়্যাহ মিনাল আশায়েরাহ

পক্ষে কথা বলে তাদের প্রতিরোধ করেছেন। তিনি স্বীয় "আল-আসমা ওয়াস সিফাত"[৮৮২]

(১/৩৬৩); আরও দেখুন, ইবন আসাকির, তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী।

৮৮২. ইমাম বাইহাক্বী রাহিমাহুল্লাহ এর 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' গ্রন্থটি অনেকবার মুদ্রিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি এক খণ্ডে প্রকাশিত, যা মুহাম্মাদ যাহেদ আল-কাউসারীর টীকা ও তত্ত্বাবধানে বের হয়েছে, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী থেকে যা ইবারত বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, সালাফী আলেমদের প্রতি কটাক্ষ ও গালি-গালাজে ভর্তি।

আবার কোনো কোনোটি দু' খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যা ইমাদুদ্দীন আহমাদ হায়দার এর তাহক্কীকে, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী, দারুল কিতাবিল আরাবী থেকে। তবে এটাতে মুহাম্মাদ যাহেদ আল-কাউসারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়েছে।

উপরের দু'টি ছাপাতেই ইচ্ছাকৃতভাবে সালাফদের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। যেমন, ইমাম মালেকের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। প্রচুর পরিমাণ ফাসিদ তা'ওয়ীলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সালাফে সালেহীন ইমামদের গালি-গালাজ করা হয়েছে। আর কাউসারীর অধিকাংশ টীকা ছিল অনেক মাসআলায় ইমাম বাইহাক্বীর উদ্দেশ্যের বিপরীত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, গবেষক আলী আল-ফুহাইদ কর্তৃক রচিত যাহেদ কাউসারী ওয়া আরাউহুল ই'তিক্বাদিয়্যাহ, পৃ. ৭৯।

সর্বশেষ তাহক্কীক বের হয়েছে আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-হাশেদী এর মাধ্যমে, দু' খণ্ডে যা মাকতাবাতুস সাওয়াদী বি জিদ্দাহ থেকে ছাপা হয়েছে। এটিই উত্তম তাহক্কীক।

ইমাম বাইহাক্বীর এ গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন অনেকে আলেমই। যেমন ইমাম যাহাবী যখন বাইহাক্বীর জীবনী আলোচনা করেন তখন তিনি এ কিতাবটির ব্যাপারে বলেন, "তিনি এমন সব কিতাব রচনা করেছেন যার মতো কেউ রচনা করেনি, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, যা দু'টি খণ্ডে রচিত।" ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (৩/১১৩২)।

তাছাড়া ইমাম বাইহাক্বীর এর গ্রন্থটি পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের কাছেও মর্যাদাপূর্ণ ও জনপ্রিয়। যেমন তাদের গ্রন্থকার তাজুদ্দীন আস-সুবুকী বলেন, 'আর তার কিতাব 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' আমি সেটার কোনো নযীর দেখতে পাই না।' তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৪/৯)। তাদেরই আরেকজন বদরুদ্দীন ইবন জামা'আহ বলেন, 'এ কিতাবটি জামে' ও মানে' অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্য কিছুর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।' ঈদ্বাহুদ দলীল ফী কাত'য়ি হুজাজি আহলিত তা'ত্বীল, পৃ. ৭১।

এ গ্রন্থে বাইহাক্বীর নিয়ম হচ্ছে, তিনি সনদসহ হাদীস ও আছার সংকলন করে নিয়ে আসেন। সেগুলোকে তার বক্তাদের পর্যন্ত সনদসহ পৌঁছে দিতেন। সাথে কিছু আয়াতও আনয়ন করেন যা দিয়ে তিনি যা এনেছেন তার সপক্ষে দলীল পেশ করেন। তারপর এসব ভাষ্যের ফিকহ, অর্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আলেমগণের অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করতেন। বিশেষ করে আশ'আরী আলেমদের বক্তব্য। এ কিতাবটি যারাই পড়বে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিবে যে তিনি তার উস্তাদ ইবন ফুওরাক দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত। কারণ তিনি কিতাবটি রচনাই করেছেন তার উস্তাদ আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-উসূলীর নির্দেশে। যাতে তা দ্বারা আশ'আরী মতবাদের খেদমত করা যায়, যেমনটি বাইহাক্বী স্বয়ং বর্ণনা করেছেন তার এ কিতাবের ভূমিকায় (২/৬০)।

তিনি কিতাবটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস করেন। যার শুরুটি ছিল, 'ইসবাতু আসমায়িল্লাহি তা'আলা যিকরুহু বিদালালাতিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়া ইজমা'য়িল উম্মাতি' আর সর্বশেষটি ছিল, বাবু ই'আদাতুল খালকি।

তার নিয়ম হচ্ছে, তিনি কোনো অধ্যায়ে আয়াত ও হাদীস আনার পরে তার কোনো কোনোটির ব্যাপারে ব্যাপক কথা বলতেন, এর মাধ্যমে তিনি হাদীসের খেদমত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে হাদীসের তা'ওয়ীল করার মাধ্যমে আকীদাহ'র অধ্যায়সমূহে মুহাদ্দিসগণের ধারার বিপরীতে তা'ওয়ীলী ধারার প্রচলন ঘটালেন। বরং শুধু নিজের আকীদাহ-বিশ্বাসের কারণে বহু হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছেন। যেমন দেখুন, ২/২৯, ৫৭, ১৬৮, ১৯৪-১৯৫।

ইমাম বাইহাক্বী এ কিতাবটিতে প্রচুর পরিমাণে তার উস্তাদ আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইবন আল-হাসান আল-হালীমী আল-জুরজানী থেকে উদ্ধৃতি এনেছেন, যিনি মা ওয়ারা আন নাহর এর একজন

لا من حيث الجارحة لورود [خبر] الصادق به» قال الله تعالى: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥] ، وقال: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة:٦٤]. وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث، في حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشر، خلقك [الله] بيده، ونفخ فيك من روحه» ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه،

কিতাবে বলেন, "অধ্যায়: দু'হাত সিফাত হিসেবে সাব্যস্ত করা, অঙ্গ(৮৮৩) হিসেবে নয়।" যেহেতু এ ব্যাপারে সত্যবাদী সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ﴾ [ص: ٧٥] "হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সাজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?" [সূরা স্বদ: ৭৫] তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] "বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৪]

এবং এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য, যা শাফা'আত সংক্রান্ত একাধিক হাদীসে এসেছে, «يا آدم أنت أبو البشر، خلقك [الله] بيده» "হে আদম! আপনি মানুষের পিতা, আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।"(৮৮৪)

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যা বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، وخطّ لك الألواح بيده» "আপনি হচ্ছেন সেই মূসা, যাকে আল্লাহ

বড় কালামশাস্ত্রবিদ আশ'আরী আলেম ছিলেন। এমনকি এসব উদ্ধৃতি শত স্থানের উপরে হবে। তাছাড়া তিনি আরও অনেক আশ'আরী মতবাদের আলেমগণ থেকে উদ্ধৃতি এনেছেন যেমন, আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনী (১/২৯৩), আবু বকর ইবনুস সিবগী (১/৩২২), আবুল হাসান আত-তাবারী (২/১৭২, ২৮১, ৩০৮, ৪১২, ৪২১) প্রমুখ।

তবে ইমাম বাইহাক্বী সব জায়গায় তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করেছেন তা নয়। অনেক জায়গায় তিনি পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের মতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যেমন তিনি বেশ কিছু সিফাত কোনো প্রকার তা'ওয়ীল ছাড়াই সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, চেহারা, চোখ। (২/৮১, ১১৪, ১১৮)। আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আমার লেখা গ্রন্থ, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"। শিরোনাম: বাইহাকীর বক্তব্য। আরও দেখুন, আমার উস্তাদজী ড. আহমাদ আতিয়্যাহ আল-গামেদী রাহিমাহুল্লাহ'র লেখা গ্রন্থ 'বাইহাকী ওয়া মাওকিফুহু মিনাল ইলাহিয়াত', আর ড. আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ এর 'মাওকিফু ইবন তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়িরাহ' গ্রন্থটি।

৮৮৩. আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলিকে 'জারেহাহ' বা অঙ্গ বলা যাবে কি না এ ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর এটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, শব্দটি মুজমাল বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ্য শব্দ। কখনও কখনও বাইহাক্বী এটা ব্যবহার করে হককে অস্বীকার করেছেন। যেমন তিনি আঙ্গুল, পিণ্ডলী ও পায়ের ব্যাপারে 'জারেহা' বা অঙ্গের দোহাই দিয়ে তা অস্বীকার করার জন্য খাত্তাবী ও অন্যান্যদের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন। তবে কখনও কখনও তিনি 'জারেহা' বা অঙ্গ না বলে আল্লাহর অনুরূপ সত্তাগত গুণাবলি কোনো প্রকার তা'ওয়ীল ব্যতীতই সাব্যস্ত করেছেন। যেমন দু'হাত, চেহারা ও চোখ। বস্তুত তার সমস্যা ছিল তার উস্তাদ ইবন ফুওরাক দ্বারা প্রভাবিত হওয়া; না হয় তিনি অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতই সকল সিফাত সাব্যস্ত করতেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

৮৮৪. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৩৩৪০, ৪৭১২; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৯৪, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে। আর বুখারী অন্যত্রও তা সংকলন করেছেন, আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, হাদীস নং ৭৫১৬।

وخطّ لك الألواح بيده» وفي لفظ: «وكتب لك التوراة بيده»، ومثل ما في صحيح مسلم: «وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده»، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «تكون الأرض يوم القيامة خُبْزَةً واحدة يتكفاها الجبار بيده، كما يتكفى أحدكم خُبْزَته في السفر، نُزُلًا لأهل الجنة». وذكر أحاديث مثل قوله: «بيدي الأمر»، «والخير بيديك»

স্বীয় কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন, আপনার জন্য নিজ হাতে তখতাসমূহ লিখেছেন।"

অন্য বর্ণনায়: «وكتب لك التوراة بيده» "আপনার জন্য তিনি নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন।"[৮৮৫]

অনুরূপ যা সহীহ মুসলিমে এসেছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده "স্বীয় হাতে জান্নাতে আদনে তার বন্ধুদের সম্মান গেঁথে দিয়েছেন"[৮৮৬]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, «تكون الأرض يوم القيامة خُبْزَةً واحدة يتكفاها الجبار بيده، كما يتكفى أحدكم خُبْزَته في السفر، نُزُلًا لأهل الجنة» "কিয়ামতের দিন সমগ্র যমীন[৮৮৭] একটি রুটি হবে, মহা শক্তিধর আল্লাহ তাকে ঘুরাবেন, যেমন তোমাদের কেউ স্বীয় দস্তরখানে অথবা সফরে রুটি হাতে ঘুরিয়ে বানিয়ে নেয়, জান্নাতীদের মেহমানদারীর জন্য।"[৮৮৮]

তিনি আরও কিছু হাদীসে উল্লেখ করেন, যেমন: «بيدي الأمر» "আমার হাতে সমস্ত কিছু"।[৮৮৯]

এবং «والخير بيديك» "সকল কল্যাণ আপনার দু' হাতে"[৮৯০],

---

৮৮৫. এর তাখরীজ পূর্বে চলে গেছে।

৮৮৬. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৯।

৮৮৭. অর্থাৎ দুনিয়ার যমীন।

৮৮৮. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৬৫২০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৭৯২। যমীন রুটি হওয়ার বিষয়ে বেশ কিছু আছারও আমরা দেখতে পাই। যেমন,

১- ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী তার তাফসীরে (১৭/৪৯), সা'ঈদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর বাণী "যেদিন এ যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমানসমূহও; আর মানুষ উন্মুক্তভাবে উপস্থিত হবে এক, একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর সামনে।" [সূরা ইবরাহীম: ৪৮] এর তাফসীরে বলেন, 'যমীনকে সাদা-শুভ্র একটি রুটিতে পরিণত করা হবে। ঈমানদার তার পায়ের নিচ থেকে তা খাবে।'

২- অনুরূপ ইমাম তাবারী আরও সংকলন করেন মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাযী অথবা মুহাম্মাদ ইবন ক্বাইস থেকে, তিনি উপরোক্ত সূরা ইবরাহীম এর ৪৮ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'একটি রুটি হবে, মুমিনগণ যা তাদের পায়ের নিচ থেকে খাবে'।

৩- তাদের মত বক্তব্য আরও বর্ণিত হয়েছে আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন বাক্বের থেকেও। দেখুন, আস-সাম'আনী, আত-তাফসীর (৩/১২৫); বাগাওয়ী, আত-তাফসীর (৪/৩৬২); ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (৪/৫২১); কুরতুবী, আল-জামে'উ লি আহকামিল কুরআন (৯/৩৮৪)।

৪- অনুরূপ বর্ণনা ইমাম বাইহাক্বীর কাছে ইকরিমাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকেও এসেছে। তবে তার সনদ দুর্বল। দেখুন, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১১/৩৭৩)।

৮৮৯. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৪৮২৬, ৭৪৯১। তার শব্দ হচ্ছে, 'বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়, সে কালকে গালি দেয়, অথচ আমি কাল, আমার কাছেই সকল কিছুর চাবিকাঠি, আমিই রাত-দিন পরিবর্তন করি।'

৮৯০. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৩৪৫, ৩৩৪৮, ৬৫৩০, ৭৫১৮; মুসলিম, আস-সহীহ,

«والذي نفس محمد بيده»، و «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» وقوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن

অনুরূপ «والذي نفس محمد بيده» "এবং যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ।"[৮৯১]

তদ্রূপ «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» "নিশ্চয় আল্লাহ স্বীয় হাত রাতের বেলায় প্রসারিত করে দেন যাতে দিনের অপরাধীরা তাওবা করতে পারে।"[৮৯২]

তেমনি, «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» "ন্যায়-বিচারকারীরা রহমানের ডানপাশে নূরের মিম্বারের উপর থাকবে, আর তার উভয় হাতই ডান[৮৯৩]।"[৮৯৪]

হাদীস নং ২২২। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বর্ণনায়, অনুরূপ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৭৭১।

৮৯১. বস্তুত তা অনেক হাদীসেই এসেছে, উদাহরণত:
ইমাম বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৬৬৪, ১৯০৪; ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১১৫১, যা আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।
অনুরূপ বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ২৬১৫; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৪৬৯। যা আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস।

৮৯২. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৭৫৯, যা আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস।

৮৯৩. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮২৭, যা আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস।

৮৯৪. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ তা'আলার দু'টি হাত রয়েছে। আর তাঁর এক হাতকে 'ইয়ামীন' বা ডান বা বরকতময় বলা হবে। যেমন,
কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আসমানসমূহ তার ডান হাতে পেঁছানো থাকবে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৭]
অনুরূপ একাধিক হাদীসে 'ইয়ামীন' এসেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যা ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ ফতোয়ায় বর্ণনা করেছেন।
তাঁর অপর হাতকে কোনো কোনো হাদীসে 'শামাল' নামকরণ করা হয়েছে। যেমন মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৭৮৮, ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত।
আবার কোনো কোনো বর্ণনায় 'ইয়াসার' এসেছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ১০৫৯; বাযযার, কাশফুল আসতার, হাদীস নং ২১৪৪, আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস।
আবার মুসনাদে আহমাদের এর বর্ণনায় এসেছে, 'কাতিফাহুল ইউসরা' এসেছে। হাদীস নং ২৭৪৮৮। হাদীসটিকে শাইখ আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন। আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৪৯।
এখানে হাদীসের ভাষ্য, 'আর তাঁর উভয় হাতই ডান' এর অর্থ সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে:
এক. অপর হাতটি অবশ্যই বাম হাত বলা হবে, তবে হাদীসে অপর হাদীসে ইয়ামীন বলার অর্থ,

১- বরকতময় বুঝানো। কারণ আল্লাহর প্রতিটি হাতেই কল্যাণ ও বরকত রয়েছে, যাতে করে কেউ ডানের বিপরীতে অন্য হাতে বরকত নেই মনে না করে। দেখুন, ইবন কুতাইবাহ, তা'ওয়ীলু মুখতালাফুল হাদীস, পৃ. ১৪২; ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস (২/৩৪৫-৩৪৬); ইবন মানযূর, লিসানুল 'আরাব (১৩/৪৫৯)।

২- কারও কারও মতে, এটি আদব রক্ষার্থে বলা হয়েছে। কারণ আমাদের মাঝে বাম হাত দুর্বল থাকে বা অমর্যাদাপূর্ণ বুঝায়। তাই সেটা থেকে মুক্ত রাখার জন্য বলা হয়েছে, উভয় হাতই ইয়ামীন। এ মতটিই গ্রহণ করেছেন, উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী রাহিমাহুল্লাহ। দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল বিশর আল-মিররীসী (২/৬৯৮); কাযী আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত, পৃ. ১৭৬।

দুই. কোনো কোনো আলেম প্রাধান্য দেয়ার নীতি অবলম্বন করে অপর হাতটিকে শামাল বা ইউসরা

وكلتا يديه يمي»، وقوله: «يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟».

وقوله: «يمين الله ملأى، لا يَغِيضُها نفقة، سَحَّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع».

অনুরূপ রাসূলের বাণী,

«يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟».

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আসমানসমূহকে ভাঁজ করে ডান হাতে ধরে রাখবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই রাজাধিরাজ, কোথাও জবরদস্তিকারীরা? কোথায় অহংকারীরা। তারপর তিনি যমীনগুলোকে ভাঁজ করে বাম হাতে রেখে বলবেন, আমিই রাজাধিরাজ, কোথায় জবরদস্তকারীরা? কোথায় অহংকারীরা?[৮৯৫]

আর তাঁর বাণী,

«يمين الله ملأى، لا يَغِيضُها نفقة، سَحَّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع»

"আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ, খরচের কারণে কমতি হয় না, রাত-দিন অনবরত ঢেলে খরচকারী, তোমরা কি দেখনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর থেকে তিনি যা খরচ করে আসছেন তা তার ডান হাতে যা আছে তা থেকে একটুও কমায়নি এবং তার 'আরশ পানির উপরে। আর তার অপর হাতে পাল্লা[৮৯৬], যা নিচু করেন এবং উঁচু

বলতে রাযী হননি। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম আবু বকর ইবন খুযাইমাহ, কিতাবুত তাওহীদ (১/১০২, ১২৭); আবু বকর আল-বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৩৯); কুরত্বুবী, আল-মুফহিম (৭/৩৯২-৩৯৩)।

তবে প্রথম মতটি আমার কাছে বেশি প্রিয়। আমার প্রিয় শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান এ মতের পক্ষেই বলতেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল-গামেদী, আল-বাইহাকী ও মাওকিফুহু মিনাল ইলাহিয়াত, পৃ. ২৫৬; সুলাইমান আদ-দুবাইখী, আহাদীসুল আকীদাহ আল্লাতী ইউহিমু যাহেরুহাত তা'আরুদ্ব ফিস সাহীহাইন, পৃ. ২৮০।

৮৯৫. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৭৮৮, যা আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বর্ণিত হাদীস।

৮৯৬. এখানে উপরে শব্দটি এসেছে, 'আল-ক্বাসত্ব'। কিন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় তার শব্দ হচ্ছে 'আল-ক্বাবদ্বু'। আবার সহীহ বুখারীর এক স্থানে এসেছে, 'আল-ফাইদ্বু' আও আল-ক্বাবদ্বু' এভাবে সন্দেহের সাথে। যদি 'আল-ক্বাবদ্বু' হয় তখন অর্থ হবে রূহ হরণ করা। আর যদি 'আল-ফায়দ্বু' হয় তখন অর্থ হবে প্রশস্ত রিযিক। তবে 'আল-ফায়দ্বু' শব্দের চেয়ে 'আল-ক্বাবদ্বু' শব্দটি বেশি বিখ্যাত। দেখুন, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৩৯৫)।

وكل هذه الأحاديث في الصحيح.

وذكر أيضًا قوله: «إن الله لما خلق آدم، قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة»،

وحديث: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره» إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع.

ثم قال «البيهقي»: أما المتقدمون من هذه الأمة، فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار

করেন[৮৯৭]।”[৮৯৮] এসব হাদীসের সবই সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত।

এরপর তিনি [বাইহাক্বী] আরও উল্লেখ করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

«إن الله لما خلق آدم، قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة»

“আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে বললেন, যখন আল্লাহর দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল, যেটি ইচ্ছে বাছাই কর। আদম বললেন, আমি প্রভুর ডান হাত বাছাই করলাম। আর আমার প্রভুর উভয় হাত ডান, বরকতময়।”[৮৯৯]

অনুরূপ অপর হাদীস,

«إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده»

“আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে তার পিঠে নিজের হাত দিয়ে মুছে নেন।”[৯০০]

তাছাড়া এ প্রকারের আরও অনেক হাদীস তিনি উল্লেখ করেন।

অতঃপর বাইহাক্বী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “তবে উম্মতের পূর্ববর্তী আলেমগণ উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস যা আমরা লিখেছি তার কোনো ব্যাখ্যা করেননি। আর তিনি 'আরশের

৮৯৭. সহীহ বুখারীর আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'তার হাতে মীযান বা ওজনের পাল্লা, তিনি সেটাকে নিচু করেন ও উপরে উঠান। দেখুন, হাদীস নং ৪৬৮৪। আবার অপর বর্ণনায় এসেছে, 'আর তার অপর হাতে মীযান বা ওজনের পাল্লা, তিনি নিচু করেন ও উপরে উঠান। দেখুন, হাদীস নং ৭৪১১। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়, রিযিক নির্ধারণ করা, যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক সংকুচিত করেন, আর যার জন্য ইচ্ছা তা প্রশস্ত করেন। কখনও কখনও এ দু'টি দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে যাবতীয় তাক্বদীর নিয়ন্ত্রণ, সৃষ্টি, সম্মান, মর্যাদা, অসম্মান ইত্যাদি। দেখুন, নাওয়াওয়ী, শারহু মুসলিম (৭/৮১)।

৮৯৮. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৭৪১১, ৭৪১৯; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৯৯৩।

৮৯৯. তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩৩৬৮; ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৬১৬৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/১৩২); বাইহাক্বী, আল-কুবরা (১০/১৪৭), যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি উক্ত দিক দিয়ে হাসানুন গারীব। তবে তা একাধিক সূত্রে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে। হাদীসটিকে শাইখ আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ নাসেরউদ্দীন আলবানী সহীহ বলেছেন। দেখুন, সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫২০৯; মিশকাত, হাদীস নং ৪৬৬২।

৯০০. মালেক, মুওয়াত্তা (২/৯৮); আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৩১১; আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৭০৩; তিরমিযী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩০৭৫; নাসায়ী, আল-কুবরা, হাদীস নং ১১১৯০; ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৬১৬৬; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (১/৮০), (২/৩৫৪, ৫৯৩)। তবে এর সনদ দুর্বল। ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৬/৩); আলবানী, আস-সিলসিলাহ আদ-দ্ব'য়ীফাহ, নং ৩০৭১।

في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش، وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.

[قول القاضي أبي يعلى]:

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: «لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل

উপর উঠা ও অন্যান্য সিফাতে খাবারিয়্যাহ বা কুরআন ও হাদীসের সংবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিফাতসমূহের ব্যাপারেও অনুরূপ কথাই বলেছেন।[৯০১] অথচ তিনি পরবর্তী কোনো কোনো আলেমের কথাও বর্ণনা করেছেন।[৯০২]

[কাযী আবু ইয়া'লা রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য]

কাযী আবু ইয়া'লা[৯০৩] স্বীয় "ইবত্বালুত

---

৯০১. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২/৪৩-৬২, ১৫০।

৯০২. অর্থাৎ বাইহাক্বী অনেক জায়গাতেই কালামশাস্ত্রবিদদের নীতি পাশ কাটিয়ে আল্লাহর বেশ কিছু গুণাবলি কোনো প্রকার তা'ওয়ীল ব্যতীতই সাব্যস্ত নন্দিত কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি কোথাও কোথাও নিন্দিত তা'ওয়ীল নীতিটি অবলম্বন করেছেন। আবার কখন কখনও এসব সিফাতের অর্থ তাফওয়ীদ্ব বা অর্থ না করার নিন্দিত নীতিও অবলম্বন করেছেন। সর্বদা নন্দিত সঠিক পথটিতে থাকতে সমর্থ হননি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আমার উস্তাদজী ড. আহমাদ আতিয়্যাহ আল-গামেদী রাহিমাহুল্লাহর এর আল-বাইহাকী ও মাওকাফুহু মিনাল ইলাহিয়াত গ্রন্থটি। আরও দেখুন, ড. আহমাদ আল-কাযী এর মাযহাবু আহলিত তাফওয়ীদ্ব গ্রন্থটির পৃ. ২১১-২১৬।
আরও দেখা যেতে পারে, আমার গ্রন্থ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এর বাইহাকীর বক্তব্য।

৯০৩. তিনি হচ্ছেন কাযী আবু ইয়া'লা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী আল-হাম্বলী, যাকে সবাই কাযী আবু ইয়া'লা নামেই চিনে। হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের একজন। হাম্বলী মাযহাবের বড় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবন হামেদ এর হাতে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর খলীফা আল-কায়েম বি আমরিল্লাহ এর অধীন বিচারক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। হাম্বলী মাযহাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন ফলে সে সময় তাকে মাযহাবের প্রধান ইমাম বলা হতো।
ইমাম যাহাবী তার প্রশংসা করে বলেন, তিনি ফাতওয়া দিয়েছেন, পড়িয়েছেন, তার কাছেই ফিকহের নেতৃত্ব গিয়ে ঠেকেছে। তার সময়ে তিনি ইরাকের বড় আলেম ছিলেন, তাছাড়া তিনি কুরআনের ইলম, তাফসীর, মুনাযারা উসূল ইত্যাদিতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।
আর আকীদাহ ও উসূলের ক্ষেত্রে তার মাযহাবের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "...আর তৃতীয় প্রকার লোক, যারা হাদীস ও আছার শুনেছে, তাদের কাছে সালাফদের মাযহাব অনেক মহৎ মনে হয়েছে, কিন্তু তারা কালামশাস্ত্রবিদ জাহমিয়্যাহদের সাথে অবশিষ্ট কিছু মূলনীতিতে একমত থেকে গিয়েছিল, কারণ তাদের কাছে কুরআন, হাদীস ও আছার এর ক্ষেত্রে তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না যেমন অভিজ্ঞতা ছিল সুন্নাহ ও হাদীসের ইমামগণের। সহীহ ও দুর্বলের মাঝে পার্থক্য করা ও জানার ব্যাপারেও নয়, সেগুলোর অর্থ বুঝার ক্ষেত্রেও নয়। তাই তারা জাহমিয়্যাদের কোনো কোনো বিবেকের যুক্তি প্রসূত মূলনীতিকে বিশুদ্ধ মনে করে নিয়েছিল, আর মনে করতো সিফাত সংক্রান্ত এসব ভাষ্যের মাঝে স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। এ হচ্ছে আবু বকর ইবন ফুওরাক, কাযী আবু ইয়া'লা ও কাযী ইবন আকীল অনুরূপ আলেমগণের অবস্থা।..... এরপর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, তারা মাঝে মাঝে তাফওয়ীদ্ব তথা আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত ভাষ্যসমূহের অর্থ না করার নীতি অবলম্বন করেছে, আবার বলেছে: এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে নিয়ে যেতে হবে, এসব ব্যাপারে যেমনটি করেছে কাযী আবু ইয়া'লা ও তার মতো কিছু লোক।" শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব বাইনাল আকলি ওয়ান নাকলি (৭/৩৫)।
তার জন্ম হয়েছিল হিজরী ৩৮০ সালে। মৃত্যু হয়েছিল হিজরী ৪৫৮ সালে। তার রয়েছে অনেক গ্রন্থ। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মাসায়িলুল ঈমান, আহকামুল কুরআন, আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিকহ,

بتأويلها،

والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله، لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة.

وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك، والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد

তা'ওয়ীল"[৯০৪] গ্রন্থে বলেন, এসব খবর বা হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যান করা[৯০৫] বা সেগুলোর তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যায় রত হওয়া[৯০৬] জায়েয নেই।

ওয়াজিব হচ্ছে- এগুলোকে যাহের তথা প্রকাশ্য অর্থের ওপর প্রয়োগ করা। এগুলো আল্লাহর সিফাত, সৃষ্টির কারো গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, আর আমরাও এগুলোতে সাদৃশ্যের বিশ্বাস করি না। তবে ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমামদের থেকে এ ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে সেই ভিত্তিতে বিশ্বাস করি।[৯০৭]

আর তিনি [কাযী আবু ইয়া'লা] ইমাম যুহরী[৯০৮],

আল-আহকামুস সুলত্বানিয়্যাহ ইত্যাদি।
দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (২/২৫৬); আবু ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (২/১৩৯); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৮৯); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/৩০৬)।

৯০৪. গ্রন্থটির নাম এখানে এসেছে, ইবত্বালুত তা'ওয়ীল। এটি কাযী আবু ইয়া'লা কর্তৃক রচিত। তার প্রথম অংশ 'ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত লি আখবারিস সিফাত' নামে ছাপা হয়েছে, যা তাহক্বীক করেছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল হামূদ আন-নাজদী, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরী। তারপর তা পুরোপুরি ছাপা হয়েছে।
এ কিতাবটি কাযী আবু ইয়া'লা লিখেছেন ইবন ফুওরাক এর 'মুশকিলুল হাদীস ওয়া বায়ানুহু' গ্রন্থে আসা কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা জনিত মতামত খণ্ডন করার জন্য। আবু ইয়া'লার উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় পৃ. ৪১-৪২ তা বিধৃত হয়েছে। আলেমগণ এ কিতাবের দোষ হিসেবে বলেছেন, এতে তিনি প্রচুর বানোয়াট ও অসমর্থিত হাদীস নিয়ে এসেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'আর কাযী ইয়া'লা তাঁর 'ইবত্বালুত তা'ওয়ীল গ্রন্থে ইবন ফুওরাক এর কিতাবকে রদ্দ করেছেন, যদিও তিনি হাদীসগুলোর সনদ বর্ণনা করেছেন এবং কারা কারা তা সংকলন করেছেন তবুও বেশ কিছু বানোয়াট হাদীস রয়েছে। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাক্বলি (৫/২৩৭)।
ইমাম যাহাবী বলেন, 'আর তিনি 'ইবতালু তা'ওয়ীলিস সিফাত' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন, তখন লোকেরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল; কারণ তাতে প্রচুর পরিমাণে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস স্থান পেয়েছে।' ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৯০)।

৯০৫. যে পথে চলেছে একদল মু'তাযিলা। দেখুন, আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৪৩)।

৯০৬. যে পথে চলেছে আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়্যাহ সম্প্রদায়। দেখুন, প্রাগুক্ত।

৯০৭. ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত গ্রন্থে এরপর এসেছে, আমাদের শাইখ ও আমাদের ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বল ও অন্যান্য আসহাবুল হাদীস ইমামগণ থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে। তারা সবাই এসব আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে বলতেন, তোমরা এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চলতে দাও। এভাবে তারা সেগুলোকে তাদের 'যাহের' বা প্রকাশ্য অর্থের ওপর বহন করতেন যে, এগুলো সবই মহান আল্লাহর গুণাবলি, যা অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যশীল নয়।

৯০৮. তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন শিহাব, বনী যাহরাহ আল-ক্বুরাশী। হাদীস বর্ণনাকারীদের বড় একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রায় দু' হাজার হাদীস বর্ণনা করেন। তার সম্পর্কে 'উমার ইবন আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমাদের ওপর ফরয হচ্ছে এ ইবন শিহাবকে আকঁড়ে ধরা; কারণ তোমরা বিগত আদর্শের ব্যাপারে তার থেকে বেশি জ্ঞানী কোথাও পাবে না।

وحماد بن سلمة وابن عيينة، والفضيل بن عياض، ووَكِيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وأسود بن سالم، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول.

إلى أن قال: «ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغًا لكانوا إليه

মাকহূল[৯০৯], মালেক, সাওরী, আওযা'ঈ, লাইস, হাম্মাদ ইবন যায়েদ, হাম্মাদ ইবন সালামাহ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব, ওকী', আব্দুর রহমান ইবন মাহদী, আল-আসওয়াদ ইবন সালেম[৯১০], ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ, আবু উবাইদ, মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-ত্বাবারী প্রমুখদের এ অধ্যায়ে যেসব বক্তব্য রয়েছে তার কিছু অংশ উল্লেখ করেন। তাদের সকলের কথার শব্দ বর্ণনা করাতে দীর্ঘতার সম্ভাবনা রয়েছে।[৯১১]

শেষে তিনি [কাযী ইয়া'লা] বলেন, "এগুলোর তা'ওয়ীল (বা অপব্যাখ্যা) করা বাতিল হওয়ার বিষয়টি একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবীগণ এবং তাদের পরে তাবে'য়ীগণ সেগুলোকে প্রকাশ্য অর্থের ওপর প্রয়োগ করেছিলেন। কোনো তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অর্থের দিকে যাননি।[৯১২] আবার সেগুলোকে তারা প্রকাশ্য থেকেও অন্য দিকে সরিয়ে নেননি।

হিজরী ৫১ সালে তার জন্ম, আর ১২৪ বা ১২৩ তার মৃত্যু হয়।
দেখুন, আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৩/৩৬০); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/১৪৪); ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (১/১০৮); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/৩২৬); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (১/১৬২)।

৯০৯. তিনি হচ্ছেন মাকহূল ইবন আবি মুসলিম শোহরাব ইবন শাযিল। তার জীবনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৯১০. তিনি হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ আসওয়াদ ইবন সালেম আল-আবেদ। হাদীস শুনেছেন হাম্মাদ ইবন যায়েদ, ইবন উয়াইনাহ, ইসমা'ঈল ইবন উলাইয়্যাহ, মু'তামির ইবন সুলাইমান প্রমুখ থেকে। আর তার থেকে হাদীস শুনেছেন, হাতেম ইবনুল লাইস আল-জাওহারী, আব্দুল ওয়াহহাব ইবন আব্দুল হাকাম আল-ওয়াররাক্ব, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-মুখাররামী প্রমুখ। তিনি কল্যাণকর কাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাকে মা'রূফ কারখীর সাথে উল্লেখ করা হয়। কারণ তাদের দু'জনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, মিল ও মহব্বত ছিল। ইবাদত ও পরহেযগারীতে প্রসিদ্ধ। বিদ'আতীদের থেকে দূরে থাকতেন, তাদের ঘৃণা করতেন। সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-ত্বাবারী বলেন, আসওয়াদ ইবন সালেম সিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য, পরহেযগার ও উৎকৃষ্ট মানুষ ছিলেন। হিজরী ২১৩ বা ২১৪ তে তার মৃত্যু হয়। দেখুন, খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৭/৩৫); ইবন আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (২/২৯৪)।

৯১১. আমাদের শাইখ ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তিনি স্বয়ং এদের থেকে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এখানে আবু ইয়া'লা রাহিমাহুল্লাহ সেসব মনীষী থেকে তা তার গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। দেখুন, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত (১/৪৪-৫৮)।

৯১২. মোটকথা: কাযী আবু ইয়া'লা রাহিমাহুল্লাহ কালামশাস্ত্রবিদদের পদ্ধতি, যারা এসব ভাষ্যের তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে থাকে, তাদের নীতির বিরোধিতা করেছেন। তিনি ইবন ফুওরাক এর তা'ওয়ীলকে বাতিল ও অসার সাব্যস্ত করেছেন। সিফাত সংক্রান্ত সকল ভাষ্যকে যাহের অর্থে নিয়েছেন। তবে তিনি তাঁর কিতাবে এমন কিছু হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন যা আসলে সাব্যস্ত নয়। আবার তিনি এ কিতাবে একাধিক স্থানে আহলুত তাজহীল ও আহলুত তাফওয়ীদ্ব এর নীতিও অনুসরণ করেছেন। তিনি অর্থও না জানা থাকার কথা বলে তার কিতাব ও নিজেকে বিতর্কিত করেছেন। এ ব্যাপারে জানার জন্য দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৫/২৩৭), (৭/৩৪); আহমাদ আল-ক্বাদী, মাযহাবু আহলিত তাফওয়ীদ্ব, পৃ. ২০৬-২১১।

أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة» .

[قول أبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات] :

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم، صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، في كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين، ومقالات الإسلاميين» وذكر فرق الروافض،

সুতরাং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জায়েয হলে তারাই আগে করতেন; কারণ তাতে (তথাকথিত) সাদৃশ্য তিরোহিত হতো আর সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হতো।[৯১৩]

[ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য, তার মাকালাত গ্রন্থে]

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী, কালামশাস্ত্রবিদ, কালামশাস্ত্রের বিশেষ পদ্ধতির প্রধান, যা তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়[৯১৪], তিনি তাঁর 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল

---

৯১৩. কাযী আবু ইয়া'লা এখানে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন, বরং তাদের থেকে এমনসব বর্ণনা এসেছে যা তা'ওয়ীল বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তারপর সাহাবায়ে কিরাম থেকে বহু আসার বর্ণনা করেছেন যা তাওয়ীল না করার ওপর প্রমাণবহ। যেমন, উম্মে সালামাহ, আয়েশাহ, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম, আনাস ইবন মালিক, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম। তারপর তিনি তা'ওয়ীল বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য প্রধান কিছু দলীল নিয়ে এসেছেন। সে আলোচনার অধীন অনেক শাখা-প্রশাখা, উদাহরণ ইত্যাদি প্রদান করেন। সেগুলোকে সংক্ষেপ করলে সংক্ষেপে তিনটি প্রমাণের অধীন করা যায়।

এক. কুরআনের আয়াত দু' প্রকার:

১- মুহকাম, যেসব আয়াত অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় অর্থ প্রদান করে; যার অর্থ প্রকাশিত। তাতে তা'ওয়ীল করার কিছু নেই।

২- মুতাশাবিহ, যার প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাহলে তা'ওয়ীলের জায়গা কোথায়?

দুই. আবুল হাসান আল-আশ'আরী ও তার সঙ্গী ও ছাত্ররা যেমন কাযী আবু বকর আল-বাকেল্লানী, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন হাসান ইবন ফুওরাক, আবু আলী ইবন শাযান, তারা এমনসব সিফাত সাব্যস্ত করেছেন যার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য নয়, তারা সেটাকে ভাষার বিভিন্ন চাহিদার দিকে নিয়ে যাননি, যেমন, চেহারা, দু হাত, চোখ (সিফাতে খাবারিয়্যাহ)। তারা তো সেগুলোকে তা'ওয়ীল করেননি। তাদের পরে কিছু লোক এসে এগুলোকে তা'ওয়ীল করেছে।

তিন. শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থে নেয়ার অর্থই হচ্ছে সেটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা। যে কেউ সেটা থেকে তা'ওয়ীল করে অন্য অর্থে নিয়ে যাবে তিনি তো সেটাকে হাকীকত থেকে মাজায বা রূপক অর্থে নিয়ে গেলেন। আর আল্লাহর সিফাতকে মাজায বা রূপক করে নেয়া জায়েয নয়।

এ হচ্ছে কাযী আবু ইয়া'লার যুক্তিগুলোর সার কথা। দেখুন, ইবত্বালুত তাওয়ীলাত (১/৫৯-৭৬)।

৯১৪. কালামশাস্ত্রের যে অংশের নেতৃত্ব তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয় সে অংশের নাম হচ্ছে আশ'আরী মতবাদ।

আমরা আগেই জেনেছি যে, আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে আশ'আরী মতবাদের অধিকাংশ লোকের অভিমত হচ্ছে, সেসব গুণাবলিকে সাব্যস্ত করা যেগুলোকে তারা আক্বলী সিফাত তথা বিবেকের যুক্তিনির্ভর গুণ বলে থাকেন। আর তারা সেসব গুণাবলিকে অস্বীকার করে থাকে যেগুলোকে বলা হয় খবরী সিফাত তথা কুরআন ও সুন্নাহ নির্ভর আল্লাহর গুণাবলি।

আর যেসব আক্বলী সিফাত তারা সাব্যস্ত করে থাকে তাও সব নয়, বরং সেটি সাতটি মাত্র, ১. হায়াত বা জীবন, ২. ইলম বা জ্ঞান, ৩. ইরাদাহ বা ইচ্ছা, ৪. কুদরাত বা ক্ষমতা, ৫. সাম' বা শোনা, ৬. বাছার বা দেখা, ৭. কালামে নাফসী বা আত্মিক কথা।

এ মতবাদটি সারা মুসলিম জাহানে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। বরং কখনও কখনও এটিকেই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হিসেবে ধরা হতে থাকে। এভাবে ভুল

আকীদাকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ নামে প্রচার-প্রসার করার কিছু কারণ রয়েছে,

১- এ মতবাদটি মুসলিম খিলাফতের কেন্দ্রভূমি, তৎকালীন সভ্যতার লালনক্ষেত্র বাগদাদে সেটার উৎপত্তি হয়ে সেখান থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া।

২- বহু আমীর ও ওযীর কর্তৃক এ আশ'আরী মতবাদটিকে বিশুদ্ধ আকীদাহ হিসেবে গ্রহণ ও প্রচার করণ। মোটকথা: রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এর একটি বড় কারণ। এর বিপরীতে সহীহ আকীদাহ'র প্রচার-প্রসারে খুব বেশি আমীর ও ওযীররা সম্পৃক্ত হয়নি।

৩- বহু আমীর কর্তৃক এসব আকীদাহ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য বড় ছোট সর্বপ্রকার বিদ্যায়তনগুলো প্রতিষ্ঠা। যেমন বাগদাদের নিযামিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও অনেক বিশ্বিবিদ্যালয় শুধু এসব আকীদাহই প্রচার-প্রসার করতো।

৪- অনেক বিখ্যাত আলেম কর্তৃক এ মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার-প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা পরিচালনা। যেমন, আল-বাকেল্লানী, ইবন ফুওরাক, আসফারায়ীনী, জুওয়াইনী, বাইহাকী, বাগদাদী, রাযী প্রমুখ।

৫- উপরোক্ত আলেমগণ কর্তৃক মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ও তাদের সন্দেহের অপনোদন, শিয়াদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান ও তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাতকরণে ব্যাপক ভূমিকা পেশকরণ। ফলে তারা মানুষের বিশ্বস্ততার জায়গায় চলে গেলেন, তারা তাদের ভালো-মন্দ সবই বিনা বিচারে গ্রহণ করে নিলেন।

৬- তৎকালীন বড় বড় মাদ্‌রাসা ও মসজিদগুলোর শিক্ষক ও খত্বীব হওয়ার জন্য মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের দ্বারা পূর্বশর্ত হিসেবে এটা লিপিবদ্ধ থাকা যে, তাকে অবশ্যই আশ'আরী মতবাদের অনুসারী হতে হবে। যেমন ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ এমন সমস্যায় পতিত হয়েছিলেন।

৭- আশ'আরী মতবাদের লোকদের দ্বারা তাদের আকীদাহ'র ওপর অনেক গ্রন্থ এমনভাবে রচিত হওয়া যাতে এটাকেই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একমাত্র সঠিক মুখপাত্র হিসেবে তাদের নিজেদের তুলে ধরা। কুরআন ও সুন্নাহ'র ব্যাখ্যাকারীদের দ্বারা এসব নুসূসের অপব্যাখ্যা কিংবা বিকৃতি জনগণের মধ্যে প্রচার করা।

৮- কালামশাস্ত্রের কিছু নীতি অলঙ্ঘনীয় সত্য হিসাবে জনগণের কাছে প্রচার ও প্রসার লাভ করা। যেমনটি রাযী কিংবা গাযালীর গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ব্যাপক আকারে ঢুকে পড়েছিল।

৯- কুরআন ও সুন্নাহ'র সঠিক ইলম এর প্রচার প্রসারে সংকীর্ণতা আরোপ। সালাফে সালেহীনের আকীদার অনুসারীদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন করে বিশুদ্ধ আকীদার প্রচার-প্রসারকে স্তব্দ করে দেয়া।

১০- সহীহ আকীদাহ'র লোকদেরকে বিভিন্ন খারাপ নামে অভিহিত করা, যেমন তাদেরকে মুজাসসিমা, দেহবাদী, হাশাওয়িয়্যাহ, সাধারণ মানুষ, মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যবাদী ইত্যাদি নাম দিয়ে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন।

৯১৫. মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন, এ গ্রন্থটি প্রথম বের করে প্রাচ্যবিদ হেলমুত রীতার। তারপর মুহাম্মাদ মুহীউদ্দীন আব্দুল হামীদ তা বের করেন। তিনি মূলত 'রীতার' এর তাহকীকের ওপর নির্ভর করেছেন। বিভিন্ন হস্তলেখার মধ্যকার পার্থক্যের দিকে কোনো ইঙ্গিত করেননি।

এ কিতাবটি 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন' এ নামেই ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে, যেমন,

- ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩৯৭), (২/২৭)।
- ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১০৪), (২/২১৭), (২/৫৫২)।

কখনও কখনও ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ শুধু 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন' বলতেন, যেমন,

- ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩৮০)।
- ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (১/৯৩)।
- ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৮৬)।
- ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত (২/৬৩১)।

কখনও কখনও তিনি এর নাম শুধু 'আল-মাকালাত' বলতেন। যেমন,

والخوارج، والمرجئة، والمعتزلة، وغيرهم.

রাফেযী[৯১৬], খারেজী, মুরজিয়াহ[৯১৭], মু'তাযিলা এবং অন্যান্য দলের কথা তুলে ধরেন।

- ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৩৯৪)।
- ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৭/২৪৬)।
কখনও কখনও তিনি এর নাম দিয়েছেন, 'আল-মাক্বালাতুস সগীর'। যেমন,
- ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/২২৪)।
ইমাম আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ'র আরেকটি গ্রন্থ ছিল, যার নাম 'মাকালাতু গাইরিল ইসলামিয়্যীন'। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, সেটি মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন থেকে বড়। আর তাতে দার্শনিকদের অনেক মতবাদ তিনি নিয়ে এসেছেন যা সাধারণত সেসব লোকেরা নিয়ে আসে না যারা ইবন সীনা থেকে দর্শন শিখেছে। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/২৮২-২৮৩)। আর এ কিতাবটিকে অন্যান্য বেশ কিছু গ্রন্থে নাম দেয়া হয়েছে 'মাকালাতুল মুলহিদীন'। দেখুন, ইবন আসাকির, তাবয়ীনি কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১৩১; ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৫/৮৭); তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৩/৩৬১); যিরিকলী, আল-আ'লাম (৪/২৬২)।

৯১৬. রাফেযী: শব্দটির অর্থ অস্বীকারকারী। যারা আবু বকর ও 'উমার এর খিলাফতকে অস্বীকার করে তারাই রাফেদ্বী বা রাফেযী। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অধিকাংশ ব্যবহারের ভিত্তিতে বর্তমান শিয়াদের ওপর রাফেযী শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও রাফেযীরা শিয়াদের একটি ফিরকা বা উপদল। ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী তার মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন গ্রন্থে শিয়াদেরকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন: এক. আল-গালিয়াহ বা চরমপন্থী, সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়, দুই. আর- রাওয়াফিদ্ব বা রাফেদ্বী গোষ্ঠী, তিন. যায়েদী শিয়া গোষ্ঠী।

বলা হয়ে থাকে, প্রথমে এ ফির্কার সকলকে শিয়া বলা হতো, শিয়া শব্দের অর্থ দল। শিয়া আলী বা আলীর দল। তারপর প্রথম তাদের মধ্য থেকে রাফেদ্বী বা রাফেযীরা বের হয়, যখন তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী আবু বকর ও 'উমার এর খিলাফতকে অস্বীকার করতে শুরু করে। কারও কারও মতে, তাদেরকে রাফেদ্বী বা রাফেযী তখন বলা হয়েছিল যখন তারা যায়েদ ইবন আলী ইবনুল হুসাইনের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, যখন তিনি আবু বকর ও 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ঘোষণা প্রদান করলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'রাফাদ্বতুমূনী' তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে? আর তাই তখন থেকে সেসব (আবু বকর ও 'উমারকে) অস্বীকারকারী গোষ্ঠী রাফেদ্বী নামে খ্যাত হলো। বস্তুত এ রাফেদ্বী (রাফেযী)রা শিয়াদের মধ্যকার চরমপন্থী একটি গোষ্ঠী। এদেরও আবার অনেকগুলো ফির্কা বা উপদল রয়েছে, আল-জারুদিয়্যাহ, আল-ইমামিয়্যাহ, (আল-ইসনা আশারিয়্যাহ) আল-কাইসানিয়্যাহ, আল-হাশেমিয়্যাহ, আল-গুরাবিয়্যাহ।

তারা মনে করে থাকে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিলাফতের ব্যাপারে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর নাম স্পষ্ট কর বলে গেছেন। তারা আবু বকর ও 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে সম্পর্কচ্যুতি ঘোষণা করে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে আলীকে খেলাফত না দেয়ায় অধিকাংশ সাহাবী পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এটাও বিশ্বাস করে থাকে। আরও বিশ্বাস করে যে, আলীকে খেলাফত না দেয়ায় উম্মত মুরতাদ হয়ে গেছে। তাদের অনেকেই তাদের ইমামদের মা'সূম বা নিরপরাধ হওয়ার দাবি করে, ইত্যাদি তাদের যাবতীয় কুফরী ও শির্কী আকীদাহ বিশ্বাস।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ১৬; আল-আসফারায়ীনী, আত-তাবসীর ফিদ-দীন, পৃ. ১৬; মালাত্বী, আত-তাম্বীহ ওয়ার রাদ্দ, পৃ. ১৫৬; রাযী, ই'তিক্বাদু ফিরাকিল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৭৭; সাকসাকী, আল-বুরহান ফী মা'রিফাতি আক্বায়িদি আহলিল আদইয়ান, পৃ. ৬৫।

৯১৭. মুরজিয়া: শব্দটি ইরজা থেকে। ইরজা শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে।

১- ইরজা অর্থ দেরী করা, দূরে রাখা, পিছিয়ে দেয়া। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফির'আউন বলেছিল, 'আরিজহু ওয়া আখাহু' [সূরা আল-আ'রাফ: ১১১] অর্থাৎ "মূসা ও তার ভাইকে একটু বিলম্ব করাও"। আর সে হিসেবে এদেরকে মুরজিয়া বলার কারণ তারা আমলকে ঈমানের সংজ্ঞায় প্রবেশ করায় না। তারা বলে, ঈমান হচ্ছে শুধু অন্তরে বিশ্বাসের নাম। আবার তাদের মাঝে কেউ কেউ বলে ঈমান হচ্ছে মুখের স্বীকৃতির নাম। তাদের আরেক দল মনে করে ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতির নাম। এ শেষোক্তদেরকে বলা হয় 'মুরজিয়া আল ফুকাহা'।

ثم قال: «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة: قول أصحاب الحديث وأهل السنة:
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبما جاء عن الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى

তারপর বলেন,(৯১৮) সংক্ষিপ্তভাবে(৯১৯) আহলুস সুন্নাহ ও আসহাবুল হাদীসের মতাদর্শ: "আহলুস সুন্নাহ ও আসহাবুল হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে: স্বীকৃতি দেয়া আল্লাহকে, তাঁর

২- ইরজা অর্থ আশাবাদী থাকা, কাউকে আশা প্রদান করা। যেমন কুরআনে এসেছে, 'ইন্নাল্লাযীনা লা ইরজূনা লিকাআনা' [সূরা ইউনুস: ০৭] "নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না"। অনুরূপ সূরা হূদ: ৬২। আর সে হিসেবে তাদেরকে মুরজিয়া বলার কারণ তারা শুধু আশা প্রদান করে যায়। তারা মনে করে ঈমান আনার পরে যত গুনাহই করা হোক না কেন তা ঈমানের কোনো ক্ষতি করবে না। যেমনিভাবে কুফরীর সাথে কোনো আনুগত্য কাজে লাগে না। সে হিসেবে তারা এসব গুনাহগারের ঈমান কোনো ক্ষতি না হওয়ার আশা করে থাকে। তাদের কোনো কোনো গোষ্ঠী আবার এতই আশাবাদী যে, তাদের নিকট ঈমানদার যতই গুনাহগার হোক তাকে জান্নাত দেয়া আল্লাহর কর্তব্য। এগুলো অবশ্যই ভুল আকীদাহ।

এ ফির্কার লোকেরা অনেকভাবে বিভক্ত; যেমন, জাহমিয়্যাহ, ইউনুসিয়্যাহ, গাসসানিয়্যাহ, তুওমনিয়্যাহ, সাওবানিয়্যাহ, মারিসিয়্যাহ প্রমুখ।

দেখুন, আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ১৩২; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/১৬১); আল-আসফারায়ীনী, আত-তাবসীর ফিদ-দীন, পৃ. ৫৯; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ১৯০; রাযী, ই'তিকাদু ফিরাকিল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ১০৭; সাকসাকী, আল-বুরহান ফী মা'রিফাতি আকায়িদি আহলিল আদইয়ান, পৃ. ৩৩; ইয়াফে'ঈ, যিকরু মাযাহিবিল ফিরাকিস সিনতাইনি ওয়াস সাব'ঈন, পৃ. ১৩২।

৯১৮. মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ও ইখতিলাফুল মুসাল্লীন, পৃ. ৩৪৫-৩৪৮।

৯১৯. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বিভিন্ন গ্রন্থে আবুল হাসান আল-আশ'আরী কর্তৃক সালাফে সালেহীনের মতাদর্শ জানার পরিধি তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আবুল হাসান আশ'আরী সালাফে সালেহীনে যে মতাদর্শ জানতেন তা তার এ 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন' তুলে ধরেছেন, আর তিনি এটাকে পছন্দও করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'আল-মাকালাত' গ্রন্থে যা তিনি উল্লেখ করেছেন তা সুন্নাহ ও হাদীসের নিকটবর্তী। তবে সেখানে এমন কিছু কথা তিনি এনেছেন যা আহলুস সুন্নাহ ও হাদীসের কেউ বলেননি। বস্তুত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীসের আকীদাহ বিষয়ক মতাদর্শ তিনি জানতেনও না; তিনি সেগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞও ছিলেন না।' দেখুন, আন-নবুওয়াত (২/৬৩১)।

তাছাড়া তিনি অন্যত্র বলেন, 'আশআরী তার এ কিতাবে (মাকালাত গ্রন্থে) আহলুল হাদীস ওয়াস সুন্নাহ এর যে মতাদর্শ তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে তাই যা তিনি তাদের থেকে বুঝেছেন। মাকালাত লেখকদের সমগোত্রীয়দের মাঝে তার চেয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল হাদীসের নিকটতম ব্যক্তি আর নেই। তা সত্ত্বেও কুরআনে কারীম, আল্লাহর দীদার, আল্লাহর সিফাত, তাকদীর ইত্যাদি উসূলুদ্দীনের মাসআলাসমূহের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল হাদীসের আসল যে বক্তব্য, যা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের কথা ও তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীনে 'ইযামের ভাষ্যে এসেছে, তা তার কিতাবে দেখা যায় না।'

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, তিনি সিফাতের ক্ষেত্রে ইবন কুল্লাবের নীতির সাহায্য করেছেন, কারণ তা মু'তাযিলাদের কথার চেয়ে হক্ব ও সুন্নাত এর দিক থেকে অধিক নিকটে। তিনি এর বাইরে অন্য (সালাফী) মতাদর্শ জানতেন না। কারণ তিনি সুন্নাহ, হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য, তাবে'য়ীনে 'ইযামরে ভাষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে বেশি খবর রাখতেন না। অথচ কুরআনে সালাফী তাফসীর ও নিরেট সুন্নাত জানার বিষয়টি কেবল উপরোক্ত উৎসসমূহ থেকেই উপকৃত হয়ে জানা যায়। তাই দেখা গেছে যখনই তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীসের মতাদর্শ বর্ণনা করতে গেছেন তখনি তিনি মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত বাখ্যাসাপেক্ষ্য কথা বলেছেন, যার অধিকাংশই তিনি যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আস-সাজী থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তার কিছু অংশ তিনি নিয়েছেন বাগদাদের হাম্বলীদের ও অনুরূপ লোকদের থেকে। মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত এসব জ্ঞান কি কখনো বিস্তারিত জ্ঞানের মত হতে পারে? দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৫/২৭৫-২৭৯)।

الله عليه وسلم، لا يردون شيئًا من ذلك،

ফিরিশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, রাসূলগণকে এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে।

এগুলোর কোনোটিকেই তারা প্রত্যাখ্যান করে না।[৯২০]

---

৯২০. যারাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ ও সাব্যস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের বিরুদ্ধে সালাফে সালেহীন সর্বদা কঠোর অবস্থানে ছিলেন। এমনকি মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে মিথ্যারোপ করা কুফরী'। দেখুন, আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/৫৩১)।

আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী বলেন, 'যখন তুমি কোনো লোককে সুন্নাত ও হাদীস শুনাবে তারপর যদি সে বলে, এটা এখন ছাড়, আমাদেরকে কুরআন থেকে শোনাও, তখন জেনে নিবে যে এ লোকটি নিজে পথভ্রষ্ট ও অন্যকে পথভ্রষ্টকারী।' দেখুন, হারওয়ী, যাম্মুল কালামি ওয়া আহলিহী, পৃ, ২০৮।

ইমাম আওযা'ঈ বলেন, 'যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস পৌঁছার পর সে তাতে মিথ্যারোপ করবে তাহলে তো সে তিনজনের ওপর মিথ্যারোপ করলো, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে তাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছে তার ওপর।' দেখুন, আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/৫৩১)।

ইমাম শাফে'য়ী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাবের পাশাপাশি সুন্নাতকেও প্রবর্তন করেছেন। আবার সেসব জায়গাতেও সুন্নাত প্রবর্তন করেছেন যেখানে সরাসরি আল্লাহর কিতাবে কোনো ভাষ্য নেই। আর যা কিছু রাসূল প্রবর্তন করেছেন সেসবের আনুগত্য করা তো আল্লাহ আমাদের ওপর বাধ্য করে দিয়েছেন। কারণ তিনি রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যের বিষয়টি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেসব সুন্নাত মানতে অস্বীকৃতি হচ্ছে এমন অপরাধ যার জন্য আল্লাহ কাউকে ছাড় বা ওযর পেশ করার সুযোগ দেননি। আর তার জন্য আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতসমূহ অনুসরণ করা থেকে বাইরে যাওয়ার কোনো পথ রাখেননি।' আর-রিসালাহ, পৃ. ৮৮-৮৯।

ইমাম আহমাদ বলেন, 'যে কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস প্রত্যাখ্যান করবে সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।' দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৭৩৩।

সুন্নাত প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি কেবল বিদ'আতী মু'তাযিলাদের কাছ থেকেই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তারা তা করত তাদের বাতিল মতাদর্শকে সাহায্য করতে, আর এজন্য যে তাদের কলব ফিতনা ও হিদায়াত থেকে বক্রতায় ছেয়ে গেছে। যেমন তারা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিল কবীরা গুনাহকারীদের ব্যাপারে শাফা'আত এর হাদীস, অনুরূপভাবে আল্লাহর দীদার সংক্রান্ত হাদীস, তদ্রূপ কবরের আযাবের হাদীস, ইত্যাদি। বিষয়টি দেখা যায় মু'তাযিলাদের গ্রন্থসমূহে, যেমন, কাযী আব্দুল জব্বার এর লেখা, শারহু উসূলিল খামসাহ, পৃ. ২৬৮; ৬৯০; রাসায়িলিল আদলি ওয়াত তাওহীদ, পৃ. ২৮৪; আল-কাসেম আর-রাস্সী, আল-আদলু ওয়াত তাওহীদ, কাযী আব্দু জাব্বার, আল-মুখতাসার ফী উসূলিদ দীন, পৃ. ২৪৫।

বস্তুত সুন্নাত এর ব্যাপারে যারাই অস্বীকার কিংবা বক্রনীতি অবলম্বন করেছে তারাই অবশেষে ফির্কায় পরিণত হয়েছে। বিদ'আতে নিপতিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই খারেজীরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। মু'তাযিলারা পথ হারিয়েছে। শিয়ারাও একই পথের পথিক হয়েছে। মুরজিয়ারাও আহলুস সুন্নাহ থেকে বের হয়ে গেছে। বর্তমান সময়েও একইভাবে সেসব লোকদেরকে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে দেখছি যারা রাসূলের সুন্নাহ এর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের অবলম্বনকৃত নীতির বাইরে কোনো ধরনের বক্রপথে চলতে চেয়েছে।

وأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النارحق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه، كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥] ، وكما قال تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة:٦٤] ، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر:١٤]

আর আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, ফারদ[৯২১] বা অনন্য, অন্যের প্রয়োজন মুক্ত। তিনি ভিন্ন কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি কোনো সঙ্গিনী ও সন্তান গ্রহণ করেননি। মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সংঘটিত হবে নিঃসন্দেহে, কবরস্থদেরকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন।

নিশ্চয় আল্লাহ 'আরশের উপরে, যেমন তিনি বলেন: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ "রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

আর তাঁর রয়েছে দুটি হাত কোনো ধরণ নির্ধারণ ছাড়া। তিনি বলেন, ﴿خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ﴾ "আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি" [সূরা স্বদ: ৭৫] তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾ "বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৪]

আর তাঁর রয়েছে দুটি চোখ[৯২২] কোনো ধরণ নির্ধারণ ছাড়া। যেমন তিনি বলেন: ﴿تَجۡرِي

৯২১. আল্লাহ তা'আলার জন্য 'ফারদ' নাম বা গুণ হিসেবে সহীহ হাদীসে তা আসেনি। এ ব্যাপারে বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ'র আল-আসমা ওয়াস সিফাতে আসা হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। দেখুন, বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (১/২২৭), নং ১৬০। যদিও হালীমী এটাকে আল্লাহর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেহেতু হাদীসটি সাব্যস্ত নয় তাই এটি আল্লাহর নাম বা গুণ হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। তবে যদি কেউ এটা দিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ দেয়, তবে সেটাতে সমস্যা নেই; কারণ আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া বা কিছু জানানো জায়েয, তবে শর্ত হচ্ছে আল্লাহর নাম ও গুণের মৌলিক নীতিমালার সাথে বিরোধী না হওয়া। কারণ এ অধ্যায়টি নাম ও গুণের চেয়ে আরও প্রশস্ত। এজন্য এভাবে বলা যাবে যে, সালাফে সালেহীনের ইজমা' বা ঐকমত্য রয়েছে যে মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, অনন্য, অমুখাপেক্ষী।' দেখুন, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৭৫।

৯২২. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ যখনই আল্লাহ তা'আলার চোখ গুণটির কথা বর্ণনা করেন, তখন সেখানেই তিনি আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ'র বর্ণনা করা ইজমা'র উদ্ধৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'দু' চোখ, এটি কুরআনে উল্লেখ নেই, তবে তা হাদীসে এসেছে। আর আশ'আরী আহলুস সুন্নাত ওয়াল হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে তারা বলে: নিশ্চয় আল্লাহর দু'টি চোখ রয়েছে। তবে যা কুরআনে এসেছে তা হচ্ছে, "তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়, ফলে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে। আর আমি আমার কাছ থেকে আপনার ওপর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হন।" [সূরা ত্বা-হা: ৩৯], "আর আপনি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করুন এবং যারা যুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কোনো আবেদন করবেন না; তারা তো নিমজ্জিত হবে।" [সূরা হূদ: ৩৭] "আর নূহকে আমরা আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেগ নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমাদের চোখের সামনে; এটা পুরস্কার তার জন্য, যার সাথে কুফরী করা হয়েছিল।" [সূরা আল-ক্বামার: ১৩-১৪]

অনুরূপ যখন ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ যারা আল্লাহর 'চোখ' গুণটির তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা) বা তাফওয়ীদ্ব (অর্থ না করার) নীতি অবলম্বন করে, যেমন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনীর দু'টি মতের একটিতে, যখন শাইখুল ইসলাম তাদের এ নীতির সাথে বিতর্ক করেছেন তখন বলেছেন, তাদের

وأن له وجهًا كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن:٢٧].

وأن أسماء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج وأقروا أن لله علمًا، كما قال تعالى: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء:١٦٦]، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ [فاطر:١١]، وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة،

وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت:١٥] وذكر مذهبهم في القدر. إلى أن قال: ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق،

﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ "যা চলত আমার চোখের সামনে।" [সূরা আল-ক্বামার: ১৪]

আবার তাঁর রয়েছে চেহারা, যেমন তিনি বলেন: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَٰلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা (সত্তাসহ), যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর-রহমান: ২৭]

আর আল্লাহর নামকে বলা যাবে না যে, এগুলো আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু। যেমন মু'তাযিলা, খারিজীরা বলে থাকে।[৯২৩]

আর তারা (আসহাবুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ) স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, আল্লাহর রয়েছে ইলম বা জ্ঞান। যেমন তিনি বলেন: ﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾ "তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে।" [সূরা আন-নিসা: ১৬৬] অনুরূপ তিনি বলেন, ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ﴾ "আল্লাহর অজ্ঞাতে কোনো নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না।" [সূরা ফাতির: ১১]

আর তারা (আসহাবুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ) আল্লাহর জন্য শ্রবণ করা, দর্শন করার গুণ সাব্যস্ত করেছেন। তার থেকে সেগুলো নাকচ করেননি যেমনটি নাকচ করে মু'তাযিলারা।

আর তারা (আসহাবুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ) আল্লাহর জন্য শক্তি সাব্যস্ত করেন, যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ "তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর?" [সূরা ফুসসিলাত: ১৫]

আর তিনি তাক্বদীরের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতামত বর্ণনা করেন।

শেষে তিনি [ইমাম আশ'আরী] বলেন, আর তারা [আহলুস সুন্নাত] বলেন: কুরআন

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী থেকে এসব গুণাবলি (চেহারা, হাত ও 'আরশের উপর উঠা) ও সেগুলোর ভাষ্যের ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে দু'টি মত নেই। বরং এ ব্যাপারে মতভেদ নেই যে, ইমাম আশ'আরী সেগুলোকে সাব্যস্ত করতেন, সেগুলোর অর্থ নাই বলে থেমে যেতেন না, বরং যারা এসব সিফাতের তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা দাঁড় করায় তিনি তাদের কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করতেন।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৩/৩৮১); আর আশ'আরীর বক্তব্য দেখুন, আল-ইবানাহ 'আন উসূলিদ দিয়ানাহ, পৃ. ৪৪০।

৯২৩. নাম ও নামকৃত বস্তু বা বিষয় বা ব্যক্তি সংক্রান্ত আলোচনা ইতোপূর্বে চলে গেছে।

আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়। আর কুরআনের 'লাফয' এর ব্যাপারে কথা বলা ও 'কুরআন আল্লাহর বাণী' বলার পর বিরত থাকা(৯২৪), এ বিষয়ে (বক্তব্য হচ্ছে): যে কেউ বলবে: কুরআন নিয়ে আমার 'লাফয' সৃষ্ট, আর যে কেউ কুরআন নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে চুপ থাকে(৯২৫), এরা সবাই আহলুস সুন্নাত এর নিকট বিদ'আতী। বলা যাবে না, কুরআন

৯২৪. অর্থাৎ কেউ যদি বলে 'কুরআন আল্লাহর বাণী' তারপর চুপ করে থাকবে, 'সৃষ্ট নয়' বলা থেকে বিরত থককে সে অবশ্যই বিদ'আতী। কেননা যখন মানুষ এটা নিয়ে খারাপ আকীদাহ রচনা করছে তখন চুপ থাকার মাধ্যমে প্রকারান্তরে খারাপ আকীদাকেই সাপোর্ট করলো।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও অন্যান্য সুন্নাহ'র ইমামগণ বলতেন, 'যে বলবে, কুরআন নিয়ে আমার উচ্চারণ বা কুরআন নিয়ে আমার শব্দ সৃষ্ট হিসেবে ধরা হবে, সে জাহমী। আর যে বলবে, কুরআনে আমার উচ্চারণ করা বা শব্দ করা সৃষ্ট নয় সে বিদ'আতী। কারণ শব্দ এর দু'টি অর্থ হয়, এক. বান্দার কাজ, আর বান্দার কাজ তো সৃষ্ট। দুই. আবার শব্দ দ্বারা বুঝানো হয় শব্দকৃত বাণী। অর্থাৎ সে কথাটি যা উচ্চারণকারী আওড়াচ্ছে। আর সেটা তো আল্লাহর বাণী, উচ্চারণকারীর কথা নয়। সুতরাং কেউ যদি বলে, সেটা সৃষ্ট, তাহলে তো সে বললো: আল্লাহ তা'আলা এ কুরআন দিয়ে কথা বলেননি। আর তখন সেটা জাহমিয়্যাদের বক্তব্য হয়ে গেল, সে কারণে ইমাম আহমদ তাকে জাহমি বলতেন। কিন্তু কুরআন নিয়ে বান্দার আওয়াজ করা সেটা অবশ্যই সৃষ্ট। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যগণ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বান্দার কাছ থেকে যে শব্দ শুনা যায় সেটি বান্দার শব্দ। ইমাম আহমাদ কখনো বলেননি, যে কেউ বলবে কুরআন নিয়ে আমার আওয়াজ করা সৃষ্ট সে জাহমী। তিনি তো বলেছেন, যে কেউ বলবে কুরআন নিয়ে আমার শব্দ সৃষ্ট (বললে সে জাহমী)। শব্দ ও (আওয়াজ) করা এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ কেউ যদি অন্য কারও কথা তার শব্দে পৌঁছে দেয় তাহলে সেটা তো অন্যের শব্দ পৌঁছানো হয় নিজের শব্দ নয়। হ্যাঁ সে উক্ত শব্দ তার নিজের আওয়াজে পৌঁছিয়েছে অন্যের আওয়াজে পৌঁছায়নি।

ইমাম আহমাদ বলেন, আমরা বলবো: কুরআন আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়, যেভাবেই সেটাকে ব্যবহার করা হোক না কেন। যেভাবেই তিলাওয়াত করা হোক, লেখা হোক পড়া হোক। যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বাণী। সেটা তাঁরই বাণী, আর তাঁর বাণী সৃষ্ট নয়। আর যা বান্দার গুণাবলি ও তাদের কর্ম রয়েছে, যা দিয়ে তারা পড়ে ও কথা লিখে, যেমন তাদের আওয়াজ করা তাদের কালি তা তো সৃষ্ট। যে কেউ এ পার্থক্য করতে সক্ষম হবে না সে এখানে বিস্মিত ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৭৪-৭৫)। আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২০৬-২১১; ১২/৩২৫, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯২, ৪২১, ৫৭৩।

৯২৫. এখানে 'বিরত থাকা' বলে বুঝানো হয়েছে, কুরআনের ব্যাপারে বর্ণনা দেয়ার সময় থেমে যাওয়া, বর্ণনা পূর্ণ না করা। কুরআনকে সৃষ্ট বা অসৃষ্ট কিছুই না বলা। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যারা এ রকম থেমে যায়, বিরত থাকে, তাদেরকে 'আল-ওয়াকিফাহ' বলে থাকেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ এ ধরনের থেমে যাওয়ার নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাদের জন্য কি এ ছাড় রয়েছে যে, কোনো লোক বলবে, "কুরআন আল্লাহ বাণী" তারপর চুপ থাকবে? তিনি বলেন, কেন চুপ থাকবে? যদি মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে কিছু না ঘটতো তবে তাদের জন্য চুপ থাকার সুযোগ থাকতো, কিন্তু মানুষ যখন এর পরে অন্য কথাও বলেছে সুতরাং আর কারো জন্যই এর পরে চুপ করে থাকার বিষয়টি অনুমোদিত নয়।'

ইমাম আজুররী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমাদ এর উপরোক্ত কথার ওপর টীকা দিয়ে বলেন, "ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের কথার অর্থ হচ্ছে, তিনি বলছেন, ঈমানের অধিকারীরা কোনোদিনই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি যে, কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। তারপর যখন তাদের মাঝে জাহম ইবন সাফওয়ানের আগমন ঘটলো এবং 'কুরআন সৃষ্ট' এ কথার মাধ্যমে কুফরী মতবাদের প্রচার-প্রসার ঘটালো, তখন আলেমগণের ওপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এটার খণ্ডন করা। আর সে খণ্ডন করার জন্যই তারা বলতে বাধ্য হলো, 'কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়', কোনো সন্দেহ করে

بالقرآن مخلوق، ولا يقال: غير مخلوق.

ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون، ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون، قال عز وجل ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين:١٥].

নিয়ে 'লাফয' বা উচ্চারণ সৃষ্ট বা কুরআন নিয়ে 'লাফয' বা উচ্চারণ অসৃষ্ট।

আর তারা [আহলুস সুন্নাহ] স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহকে কিয়ামতের দিন চক্ষু দ্বারা দেখা যাবে, যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখা যায়। মুমিনগণ তাকে দেখতে পাবে, কাফিরগণ দেখতে পাবে না; কেননা তাদেরকে আল্লাহর থেকে আড়াল করে রাখা হবে। আল্লাহ্ বলেন:

﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝﴾ [المطففين: ١٥]

"কক্ষনো না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক (দর্শন) থেকে পর্দাবৃত থাকবে।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১৫]

নয়, নিঃসন্দেহে তা বলতে হবে, তাতে কোনো চুপ থাকা যাবে না। সুতরাং যে কেউ 'সৃষ্ট নয়' বলবে না, সে 'ওয়াক্বিফা' ও তার দীনের মধ্যে সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ইমাম আহমাদের ছাত্র আবু তালেব বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি বিরত থেকে বলেছে, আমি বলবো না, 'তা মাখলূক নয়'। যখন সে আমাকে রাস্তায় পাবে আর আমাকে সালাম দিবে, তখন কি আমি তার সালামের জবাব দিব? তিনি বললেন, তুমি তার সাথে সালাম বিনিময় করবে না, তার সাথে কথা বলবে না। না হলে লোকেরা কীভাবে বুঝবে যে, সে কত খারাপ লোক? কীভাবে লোকেরা বুঝবে যে তুমি তার মতামত খণ্ডন করছ? যখন তুমি তাকে সালাম দিবে না তখন লোকেরা সেটাকে এ লোকের জন্য অপমান বুঝবে, আরও বুঝবে যে তুমি তার কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছ, আর মানুষ তখন তাকে চিনতে পারবে।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ঐ ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা সম্পর্কে আপনি কী বলেন? যে কুরআন সম্পর্কে বলে: 'আল্লাহর বাণী' আর (অন্য কিছু বলা হতে) বিরত থাকে? তখন তিনি বলেন, আমার কাছে আনন্দদায়ক হবে তাকে নাজেহাল করা।

বরং আলেমগণ এমন লোকদেরকে জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেছেন, 'জাহমিয়্যারা তিনভাবে বিভক্ত: একভাগ বলে, কুরআন সৃষ্ট। অপরভাগ বলে, কুরআন আল্লাহর বাণী তারপর চুপ থেকেছে। আরেকভাগ বলে, 'কুরআন নিয়ে আমাদের 'লাফয' বা উচ্চারণ সৃষ্ট'।

ইবন আবী যামানাহ বলেন, 'যে কেউ বলবে, কুরআন সৃষ্ট অথবা কুরআন আল্লাহর বাণী বলে চুপ করে যাবে, আর যে বলবে কুরআন নিয়ে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট অথবা এর মতো কিছু বলবে, সে অবশ্যই মহান আল্লাহর দীনের বাইরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের বাইরে, যতক্ষণ না তাওবা করে ফিরে আসবে।

বস্তুত আলেমগণ এ ধরনের 'ওয়াক্বিফা' বা বিরত থাকার নীতি অবলম্বনকারীদের মত খণ্ডন করেছেন আর তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিলেন, বিশেষ করে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ।

বিস্তারিত দেখুন, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১৭৯); আবু দাউদ, মাসায়িলি ইমাম আহমাদ, পৃ. ২৬৩, ২৭০, ২৭১; দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ১৬৮-১৭০; আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৮৭-৮৮; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/৩২৩); আল-আসফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/৩৯০)।

وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات

আর তিনি [ইমাম আশ'আরী] ইসলাম, ঈমান, হাউয, শাফা'আত, অনুরূপ আরও কিছু বিষয় প্রসঙ্গে তাদের [আহলুস সুন্নাতের] মতামত উল্লেখ করেন।

অতঃপর [ইমাম আশ'আরী] বলেন: "আর তারা [আহলুস সুন্নাহ] স্বীকৃতি দেন যে, ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের নাম। আবার তা বাড়ে ও কমে। তারা বলেন না যে, তা মাখলুক বা সৃষ্ট। আর তারা [আহলুস সুন্নাহ] কবীরা গুনাহে লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দেন না।

শেষে তিনি বলেন, আর তারা দীনের মধ্যে ঝগড়া-বিতর্ক অনুমোদন দেন না। যেসব ব্যাপারে বিতর্ককারী সম্প্রদায় পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও মুনযারা করে সেগুলো নিয়ে বিবাদ-বিতর্কও মেনে নেন না।[৯২৬] তাঁরা বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ মেনে নেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে

---

৯২৬. সালাফে সালেহীন থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে দীনের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি থেকে সাবধান করা হয়েছে। এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে কোনো মানুষের ওপর এসব বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে তার মনে সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। যার ফলে একজন মানুষের দীন ও আকীদাহ বরবাদ হয়ে যায়। 'উমার ইবন আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে কেউ তার দীনকে বিবাদ-বিসম্বাদের জায়গা বানাবে সে অনবরত অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকবে।' দেখুন, আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ, নং ১০৩; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ২১৬।

ইমাম আওযা'ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যখন কোনো জাতির অকল্যাণ চান তখন তাদেরকে (দীনের মধ্যে) ঝগড়া-বিবাদে লাগিয়ে রাখেন, আর তাদেরকে আমল করা থেকে বিরত রাখেন।' দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ২৯৬; হারওয়ী, যাম্মুল কালাম, নং ৯১৭।

ইমাম মালেক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যখনই কোনো ঝগড়ায় পটু লোক যে অন্যের তুলনায় বেশি ঝগড়াটে, সে আমাদের কাছে ঝগড়া করতে আসবে, তার ঝগড়ার কারণে আমরা তা কি ছেড়ে দিব যা জিবরীল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন?' দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ২৯৩।

সালাফে সালেহীন রাহিমাহুমুল্লাহ এসব ঝগড়া-বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে সর্বদা সাবধান করতেন সেজন্য তারা যেসব পথ দিয়ে এসব ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হতে পারে তা রুদ্ধ করতেন, যেমন তারা বিদ'আতীদেরকে পরিত্যাগ করে চলতেন, ইলম ও আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে রত থাকতেন। ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-কাদী বলেন, আওযা'ঈ ও সাওর ইবন ইয়াযীদ 'জিসর' এর কাছে একত্রিত হলেন। তখন আওযা'ঈ বলেন, হে সাওর, যদি (বিদ'আতী) পরিত্যাগ করা দীনের মূলনীতি না হতো তবে আমি তোমাকে সালাম দিতাম। তিনি আরও বলেন, 'সাওর' কাদারিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেখুন, হারওয়ী, যাম্মুল কালাম, নং ৯২০।

শু'বাহ বলেন, সুফইয়ান আস-সাওরী প্রবৃত্তির অনুসারীদের ঘৃণা করতেন, তাদের সাথে বসা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, 'তোমার ওপর কর্তব্য হচ্ছে 'আছার' বা সালাফদের কথার ওপর থাকা, তোমরা আল্লাহর সত্তার ওপর কথা বলা থেকে বেঁচে থাক।' দেখুন, হারওয়ী, যাম্মুল কালাম, নং ৯৩৬।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামাহ আল-কা'নাবী বলেন, 'মালেক ইবন আনাস বলেন, যত কিছু নিয়েই তুমি

الصحيحة، ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون: كيف ولا لم؟ لأن ذلك بدعة.

إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢] ، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء؛ كما قال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦].

إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن، وكتابة الآثار، والنظر في الفقه، مع الاستكانة والتواضع، وحسن الخلق، مع بذل المعروف، وكف الأذى، وترك الغيبة والنميمة والسعاية، وتفقد المآكل والمشارب.

ন্যায়পরায়ণ থেকে ন্যায়পরায়ণের মাধ্যম হয়ে সর্বশেষ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হওয়া সকল বিশুদ্ধ হাদীস ও আছারসমূহ মেনে নেন। তারা বলেন না যে, কীভাবে[৯২৭] ও কী জন্য[৯২৮]? কারণ সেটা তাদের নিকট বিদ'আত।

তারপর তিনি বলেন, তারা স্বীকৃতি দেন যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন আসবেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ۝﴾ [الفجر: ٢٢] "এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও (আসবেন)।" [সূরা আল ফাজর: ২২]

আর আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা বান্দার নিকটবর্তী হন।[৯২৯] যেমন তিনি বলেন, ﴿وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] "আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" [সূরা কাফ: ১৬]

শেষে তিনি [আশ'আরী] বলেন যে, তারা মনে করেন যে, প্রত্যেক বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী থেকে দূরে থাকতে হবে। আর কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস ও আছার লেখা, ফিকহ শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে মশগুল থাকতে হবে। বিনয়-নম্রতা, উত্তম আচরণ, ভালো কাজ করা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। গীবত ও চোগলখোরী ও অযথা অভিযোগ প্রদান, খাবার পানীয়ের ব্যাপারে অযাচিত খোজ-খবর নেয়া ছেড়ে দিতে হবে।

খেল-তামাশা কর, তুমি তোমার দীনের বিষয় নিয়ে খেল-তামাশা করো না।' দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ২৯৫। এ অধ্যায়ে সালাফদের থেকে আসা আছারসমূহ অনেক বেশি।

৯২৭. অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তারা এ প্রশ্ন করতো না; কারণ তারা ভালো করেই জানে যে, এর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নেই।

৯২৮. অর্থাৎ আল্লাহর কর্মের ক্ষেত্রে। কারণ তাঁর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তিনি কী করবেন সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যাবে না, তাদেরকেই তো প্রশ্ন করা হবে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৩]

৯২৯. আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর 'কুরব' বা নৈকট্যকে তাঁর ব্যাপক গুণ সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন। বস্তুত তা সঠিক নয়। সঠিক হচ্ছে আল্লাহর 'কুরব' বা 'নৈকট্য' কেবল তাঁর বিশেষ গুণ যা দো'আ কবুল বা সাওয়াব প্রদানের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। 'মা'য়িয়্যাত' বা সঙ্গে থাকার মত সবার জন্য 'কুরব' বা 'নৈকট্য' সাব্যস্ত করার গুণ আল্লাহর জন্য কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসেনি। বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা চলে গেছে।

قال: فهذه جملة ما يأمرون به، ويستسلمون إليه، ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان».

وقال الأشعري أيضًا في «اختلاف أهل القبلة في العرش»: «قال أهل السنة وأصحاب

তিনি [ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী] বলেন, এ হলো সেসবের বর্ণনা যা তারা নির্দেশ দিতেন, মেনে নিতেন, মতামত দিতেন; তারা যা যা বলতেন আমরা সেসকল কথা বলি এবং সেই মত পোষণ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীকদাতা এবং আর তিনিই সাহায্যকারী।

অনুরূপভাবে আবুল হাসান আশ'আরী 'আরশের ব্যাপারে কিবলাপন্থীদের মতানৈক্য'(৯৩০) প্রসঙ্গে বলেন, "আহলুস সুন্নাহ ও আসহাবুল হাদীসগণ বলেন, তিনি জিসিম নন(৯৩১) এবং

---

৯৩০. এটি তার 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন' গ্রন্থের একটি শিরোনাম, যা তিনি আহলুস সুন্নাহ ও আসহাবুল হাদীসের আকীদাহ বর্ণনা করার আগেই 'মুজাসসিমাহ'দের আকীদাহ বর্ণনা করার মাঝে বর্ণনা করেছেন। সেটার অধ্যায় শিরোনাম হচ্ছে, বাবু ইখতিলাফুহুম ফিল বারী, হাল হুয়া ফী মাকানিন....। তারপর তিনি সেখানে আল্লাহর 'আরশের উপরে থাকা নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ও আসহাবুল হাদীসগণের মত আলোচনা করেন। দেখুন, পৃ. ২৮৫। অনেকে এটিকে আলাদা গ্রন্থ মনে করে থাকবেন, তাই বিষয়টির ব্যাপারে সাবধান করা হলো।

৯৩১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত জিসিম শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করেন না। 'জিসিম' শব্দের প্রচলিত অর্থ দেহ, বদন, শরীর ইত্যাদি। এখানে আশ'আরী জিসিম অস্বীকার করেছেন সম্ভবত এ অর্থেই। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (১/১১৯); ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৫৫০)।

তবে 'জিসিম' শব্দটি মানতিক বা কালামশাস্ত্রবিদদের নিকট ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। তাদের নিকট কয়েকটি 'জাওহার' মিলে একটি 'জিসিম' হয়। আর জাওহার হচ্ছে এমন কিছু যা সম্পূর্ণ একক বা মৌলিক। যা নিজেই নিজের অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট। যাতে কোনো (আরদ্ব) বা গুণ এর সমাহার নেই বা সমাহার হতে পারে না। আর যখনই এটা বলা হবে যে, কয়েকটি জাওহার নিয়ে জিসিম হয়; তখনই তাদের নিকট জিসিম এর সংজ্ঞা দাঁড়ায়, যার ডান-বাম, উপ-নিচ আছে। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, 'জিসিম' শব্দটি একটি মুজমাল শব্দ। এটাকে স্বীকার কিংবা অস্বীকার করার জন্য বিস্তারিত প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে, এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য কী? কোনো প্রকার বাচ-বিচার না করে জিসিম অস্বীকার করাও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মানহাজ নয়। যারা বলে সালাফে সালেহীনের মতাদর্শ হচ্ছে তাওহীদ সাব্যস্ত করা, আল্লাহকে পবিত্র করা, তাজসীম (শরীর) ও তাশবীহ (সাদৃশ্য) প্রদান করা নয়, এভাবে পাইকারী কথা বলার ব্যাপারে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, তাজসীম বা তাশবীহ এ শব্দদ্বয় সালাফে সালেহীনের কোনো ভাষ্যে আসেনি। তারা সেটা সাব্যস্ত করা বা না করার কোনোটিই তারা করেননি (কুরআন ও সুন্নাতেও তা আল্লাহর জন্য হা বা না কোনোভাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসেনি)। তাহলে কীভাবে এটা বলা সম্ভব যে 'তাজসীম' বা জিসিম শব্দটি সাব্যস্ত করা বা নিষেধ করা সালাফদের মতাদর্শ? অথচ শব্দটি তারা উল্লেখও করেননি, আর শব্দটি দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেয়া হচ্ছে সেটাও তাদের থেকে বর্ণনা করা হয়নি।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১৫২)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ একাধিক জায়গায় এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, জিসিম শব্দটি একটি মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যের শব্দ। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে উদ্দেশ্য বর্ণনা ব্যতীত সেটা সাব্যস্ত করা কিংবা না করা কোনোটাই বিশুদ্ধ হবে না। তিনি বলেন, 'আর 'জিসিম' শব্দটি এটি একটি মুজমাল শব্দ, শরী'আতে এর কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই। সেটাকে না করতে বা সেটাকে হ্যাঁ বলতেও দলীল বা বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন হবে।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩০৭)। আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১৯৮); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (২/১১)।

الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ

কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নন।(৯৩২) আর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন; যেমন আল্লাহ

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন যে, 'জিসিম' এর ব্যাপারে কথা বলা, অনুরূপ মুজমাল শব্দ ব্যবহার করা কেবল জাহমিয়্যাহ, কালামশাস্ত্রবিদ প্রমুখ বিদ'আতীদের থেকেই এসেছে। সালাফে সালেহীন তাদের বক্তব্যে জাহমিয়্যাদের দ্বারা 'জিসিম' অস্বীকার করার ব্যাপারে কঠোর নিন্দা করেছেন। তারা এটাও বলেছেন যারা এ শব্দটি সাব্যস্ত করে তাদের থেকে এরা যারা এটাকে না করে তারা বেশি পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতী। তিনি বলেন, 'এটা বলা যে, আল্লাহ জিসিম নন, জাওহার নন, মুতাহায়্যিয নন, জগতের ভিতরেও নন, বাইরেও নন ইত্যাদি বক্তব্যগুলো কখনও উম্মতের কোনো সালাফে সালেহীনের বক্তব্য নয়, অনুরূপ কোনো ইমামও তা বলেননি, আর না তার ভিত্তি আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের কোনোটিতে আছে, না নবী-রাসূলগণ থেকে আসা কোনো ভাষ্যে সেটা এসেছে। বরং উম্মতের সালাফে সালেহীন ও ইমামগণ থেকে মুতাওয়াতির বা নিরবিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ বহু লোকের বর্ণনায় এসেছে যে, যারা উপরোক্ত কথা বলতো তাদের এসব কথাকে সালাফ ও ইমামগণ অস্বীকার করতেন এবং এসব বক্তার বিদ'আতী হওয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করতেন।...

তারপর বলেন, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণ আল্লাহর জন্য এসব নাম সাব্যস্তও করতেন না, অস্বীকারও করতে না। কারণ সাব্যস্ত করা কিংবা অস্বীকার করা উভয়টির মধ্যেই দীনের মধ্যে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়, কেননা তাতে রয়েছে ইজমাল বা সংক্ষিপ্ততা ও ইশতিরাক বা বহুমুখী অর্থের সংশ্লিষ্টতা। তা দ্বারা বাতিল সাব্যস্ত করা হয়ে যেতে পারে আবার হককেও বাতিল করা হয়ে যেতে পারে।... বস্তুত জিসিম শব্দটির ব্যাপারে সালাফগণের কারও কাছ থেকে সেটার নিন্দা কিংবা অস্বীকার করার ব্যাপারে কিছু সংরক্ষিত হয়ে আসেনি। যেমনিভাবে তাদের কাছ থেকে সেটার প্রশংসা কিংবা স্বীকারোক্তিও আসেনি।' ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৪৯৮-৪৯৯)।

তারপর ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি 'জিসিম' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, এমন কিছু যা নিজ সত্তায় অস্তিত্বশীল, নিজেই নিজের ওপর অবস্থান করে অস্তিত্বশীল হয়ে আছে, অথবা এমন এক সত্তা যার গুণাবলি রয়েছে, অথবা যাকে আখেরাতে দেখা যাবে, অথবা যাকে দেখা সম্ভব, অথবা যিনি জগতের বিপরীতে তার উপরে ইত্যাদি অর্থসমূহ, যেসব অর্থ শরী'আত ও বিবেকের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে (এগুলো উদ্দেশ্য হিসেবে বললে), তবে তাকে বলা হবে, এ অর্থগুলো তো বিশুদ্ধ; কিন্তু এ অর্থগুলোর জন্য তোমার এ 'জিসিম' শব্দটির ব্যবহার শরী'আতের দৃষ্টিতে বিদ'আত, ভাষার নিয়মের বিপরীত। কারণ কোনো শব্দে যখন হক ও বাতিল উভয় অর্থ করার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন সেটি নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করা যাবে না। বরং এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা হককে প্রতিষ্ঠিত করে আর বাতিলকে দূর করে।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/২১১-২১৪)।

৯৩২. এ বক্তব্যটিও সালাফে সালেহীনের বক্তব্য নয়। এ বক্তব্যকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না। আহলুস সুন্নাহ ও আসহাবুল হাদীস কখনো এটিকে ব্যবহার করতেন না। কারণ 'তাশবীহ' শব্দটি একটি মুজমাল তথা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যেয় শব্দ যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ একাধিক স্থানে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, 'তাশবীহ' শব্দটি মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাখ্যার দাবি রাখে এমন শব্দ।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১০৯, ৩৮৯); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৬৪)।

আর যেহেতু এ শব্দটিতে ইজমাল (সংক্ষিপ্ততা) ও ইশতিরাক (বহুমুখী অর্থের সমাহার) রয়েছে, ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ যখন 'আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ' রচনা করেছিলেন তখন এ শব্দটিকে পরিহার করেন। তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের ভাষ্যে আসা শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন 'তামসীল' ও 'তাকয়ীফ' ব্যতীত। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৯৫), হিকায়াতু মুনাযারাতিল ওয়াসিত্বিয়্যাহ।

তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে যা তাঁর থেকে না করতে হবে সেটা বর্ণনার সময় 'তামসীল' শব্দটি ব্যবহার করেছি, 'তাশবীহ' শব্দটি ব্যবহার করিনি; কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের সরাসরি শব্দ দিয়ে 'তামসীল'কেই না করেছেন, যখন তিনি বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই।" [সূরা আশ-শূরা: ১১] আরও বলেছেন, ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴾ "তুমি

কি তার সমনামের কাউকে জান?" [সূরা মারইয়াম: ৬৫] আর এটি আমার নিকট সেসব শব্দ থেকে বেশি প্রিয় যা আল্লাহর কিতাবে নেই, আর যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামে সুন্নাতে নেই, যদিও কখনও কখনও সে শব্দ (তাশবীহ) দ্বারা 'না' করা দ্বারা বিশুদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা বাতিল অর্থও উদ্দেশ্য নেয়া যায়।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৬৬)।

সালাফে সালেহীনের অনেকেই সেসব মুশাব্বিহাদের নিন্দা করেছেন যারা আল্লাহর গুণাবলিকে বান্দার গুণাবলির মতো মনে করতো। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবন মাহদী, ইয়াযীদ ইবন হারূন আল-ওয়াসেত্বী, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক্ব ইবন রাহওয়িয়াহ প্রমুখ। [ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১৮৭)]

যারা 'তাশবীহ' শব্দটি নিঃশর্তভাবে সাব্যস্ত কিংবা অসাব্যস্ত করেছেন তাদের ব্যাপারে বিশুদ্ধ ও তাহকীকী কথা হচ্ছে, যদি এ 'তাশবীহ' শব্দটি দিয়ে যা কুরআন নিষেধ করেছে, আর বিবেক যার ওপর প্রমাণবহ এমন কিছু উদ্দেশ্য হয় তবে তা হক্ব ও যথাযথ; কারণ মহান রবের বৈশিষ্ট্যের কোনো কিছু দিয়ে সৃষ্টির কাউকে গুণান্বিত করা যাবে না, আর মহান আল্লাহর কোনো গুণাবলিতে তাঁর সৃষ্টির সামান্যতম সাদৃশ্য থাকতে পারে না।

আর যদি 'তাশবীহ' দ্বারা উদ্দেশ্য এটা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো সিফাত সাব্যস্ত করা যাবে না। যেমন বলা হবে না যে, তাঁর ইলম রয়েছে, তাঁর কুদরত রয়েছে, তাঁর জীবন রয়েছে; কারণ বান্দা তো এসব গুণে গুণান্বিত, এরকম বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে তো আল্লাহকে জীবিত, জ্ঞানী ও ক্ষমতাবানও বলা যাবে না; কারণ বান্দাকেও কখনও কখনও এ সব নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তাঁর কথা, শোনা, দেখা ও তাঁকে দেখা ইত্যাদির ব্যাপারেও একই কথা বলা যাবে। তারা (কালামশাস্ত্রবিদ আশায়েরা ও মাতুরিদীরা) আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে একমত হয়ে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা (মাওজূদ) অস্তিত্ববান, তিনি (হাইয়্যুন) জীবিত, তিনি (আলীমুন) জ্ঞানী, তিনি (কাদেরুন) সক্ষম। অপর দিকে সৃষ্টিকেও বলা হয় অস্তিত্বশীল, জীবিত, জ্ঞানী, সক্ষম। অথচ বলা হয় না যে এটা তো 'তাশবীহ', যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হবে না, বা এগুলো আল্লাহর থেকে না করা ফরয। আর এটি এমন এক বিষয় যার ওপর কুরআন, সুন্নাহ ও স্পষ্ট বিবেকের যুক্তি সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোনো বিবেকবান মানুষের পক্ষে সেটার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়; কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে এমনসব নাম দিয়ে নামকরণ করেছেন, যার অনুরূপ নাম দিয়ে তিনি তাঁর কোনো কোনো বান্দারও নামকরণ করেছেন। তেমনিভাবে তিনি তাঁর গুণাবলির জন্য এমনসব বিশেষ্য ব্যবহার করেছেন যেগুলোর কোনো কোনোটি দিয়ে তাঁর সৃষ্টির কারও গুণ বর্ণনা করেছেন। এ নামকৃত সত্তা কখনও সে নামকৃত সত্তার মতো নয়।' [মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১১২)]

এখানে ইমাম আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ যে কথাটি বলেছেন যে, 'তিনি কোনো কিছুর সাথে তাশবীহ রাখেন না'। এর মাধ্যমে ভিন্ন একটি নিষিদ্ধ অর্থ নেয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সেটি বলা যাবে না যার মাধ্যমে আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি অস্বীকার করার সম্ভাবনা আসতে পারে। যেমনটি ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ জাহমিয়্যাদের সাথে মুনাযারার সময় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা তাদেরকে বললাম, তিনি (আল্লাহ) কি শাই' (কিছু)? তখন তারা বললো, তিনি (শাইয়ুন লা কাল আশইয়ায়ি) শাই' তবে অন্য সব শাই' এর মত নয় (কিছু তবে অন্যকিছুর মত নয়)। তখন আমরা বললাম, যে শাই' কোনো শাই' এর মত নয় বিবেকবানরা জানে যে সেটা আসলে কিছুই না। তখন মানুষের কাছে স্পষ্ট হয় গেল যে, জাহমিয়্যারা আসলে কোনো কিছুর ওপরই ঈমান আনে না। তবে তারা প্রকাশ্যে সেটা ঘোষণা না দেয়ার মাধ্যমে নিজেদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করে।' আর-রাদ্দু আলায যানাদিকাহ ওয়াল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২০৯।

এখানে লক্ষ্ণীয় যে, ইমাম আহমাদ বলেছেন, যে শাই' কোনো শাই' এর মত নয় বিবেকবানরা জানে যে সেটা আসলে কিছুই না।' অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য শাই' দিয়ে সংবাদ দেয়া সাব্যস্ত করেছেন। [যেমন, সূরা আল-আন'আম: ১৯] সেখানেও মু'আত্তিলা সম্প্রদায় আল্লাহকে শাই' বলতে রাযী নয়। আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়্যাহ সম্প্রদায় যদি আল্লাহকে 'লা ইয়ুশবিহুল আশইয়া' বলে, (যা শরী'আতে কখনও সাব্যস্ত কিংবা নিষেধ করা হয়নি) তাহলে তো তারা এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করার অশুভ পাঁয়তারা করেই তা ব্যবহার করলো।

তবে সম্ভবত ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ সে উদ্দেশ্যে 'তাশবীহ' (সাদৃশ্য) কথাটি ব্যবহার করেননি, কারণ তিনি সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তার অনুসারী কেউ এ শব্দ

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] ، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول؛ [بل] نقول: استوى بلا كيف، وأن له وجهًا، كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن:٢٧] ، وأن له يدين كما قال تعالى: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥] ، وأن له عينين كما قال: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر:١٤] ، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢] ، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئًا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى: استولى وذكر مقالات أخرى.

তা'আলা বলেছেন: [طه: ٥] ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝﴾ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫] আমরা আল্লাহর সামনে আগ-বাড়িয়ে কথা না বলি, বরং বলি যে, তিনি ইস্তেওয়া বা উপরে উঠেছেন, তবে কোনো ধরণ নির্ধারণ ছাড়া।

আর তার রয়েছে চেহারা, যেমন তিনি বলেছেন: ﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ۝﴾ [الرحمن: ٢٧] "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের (সত্তাসহ) চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর-রহমান: ২৭]

তাঁর রয়েছে দুই হাত, যেমন তিনি বলেছেন: ﴿خَلَقۡتُ بِيَدَيَّ﴾ "আমার নিজ দু' হাতে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা স্বদ: ৭৫]

তাঁর রয়েছে দুটি চোখ, যেমন তিনি বলেছেন: ﴿تَجۡرِي بِأَعۡيُنِنَا﴾ "সে জাহাজটি চলত আমাদের চোখের সামনে।" [সূরা আল-ক্বামার: ১৪]

আর কিয়ামত দিবসে তিনি এবং ফিরিশতাগণ আসবেন, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আর আপনার রব ও ফিরিশতারা আসবেন কাতারে কাতারে।" [সূরা আল-ফাজর: ২২] আর তিনি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন যেমনটি হাদীসে এসেছে। আর তারা আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়ে এসেছে তা ছাড়া কিছুই বলেন না।

আর মু'তাযিলারা বলে, إن الله استوى على العرش এর অর্থ, নিশ্চয় আল্লাহ আরশকে استولى বা দখল করেছেন বা 'আরশে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন।[৯৩৩] তারপর তিনি অন্যান্য মতবাদ

নিয়ে অযথা তর্ক করতে পারে তাই 'তাশবীহ' শব্দটির ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের অবস্থান জানিয়ে দেয়া হলো।

৯৩৩. এভাবে 'ইস্তিওয়া' শব্দটিকে অপব্যাখ্যা করে 'ইস্তাওলা' বা 'কাহারা' এ অর্থে নিয়েছে কোনো কোনো মু'তাযিলা। সর্বপ্রথম জাহমিয়্যারা এ অর্থ নেয়, তারপর জাহমিয়্যাদের দ্বারা প্রভাবিত পরবর্তী কালাম -শাস্ত্রবিদদের অনেকেই এ অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। [দেখুন, আবুল হাসান আল-আশ'আরী, আল-মাকালাত ও আল-ইবানাহ] আর অধিকাংশ ভাষাবিদরা মু'তাযিলীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তারাও সেটা অনায়াসে গ্রহণ করে নেয়। যেমন,

১- আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াহইয়া ইবনুল মুবারক মৃত্যু, ২৩৭ হিজরী, গারীবুল কুরআন ওয়া তাফসীরুহু।

২- আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবনুস সারী আয-যাজ্জাজ মৃত্যু ৩১১ হিজরী, মা'আনিল কুরআন।

৩- আবু মানসূর আল-মাতুরিদী আল-হানাফী, মৃত্যু ৩৩৩ হিজরী, তা'ওয়ীলাতু আহলিস সুন্নাহ।

[قول الأشعري في كتابه الإبانة]:

وقال أيضًا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه «الإبانة في أصول الديانة» وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال:

বর্ণনা করেছেন।

[ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর বক্তব্য তার 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে]

আবুল হাসান আশ'আরী তার রচিত গ্রন্থ, যার নাম তিনি দিয়েছেন, 'আল-ইবানাহ ফী উসূলিদ দিয়ানাহ'(৯৩৪), যেটি সম্পর্কে তার ছাত্ররা বলেছেন যে, এটি তাঁর সর্বশেষ কিতাব,

৪- আবুল কাসেম আয-যাজ্জাজী, মৃত্যু ৩৪০ হিজরী, ইশতিক্বাকি আসমায়িল্লাহি।
৫- আবু বকর আহমাদ আর-রাযী আল-জাসসাস, মৃত্যু ৩৭০ হিজরী, আহকামুল কুরআন।
৬- কাযী আব্দুল জাব্বার, মৃত্যু ৪১৫ হিজরী, তার শারহুল উসূলিল খামসাহ গ্রন্থে পৃ. ১৫১।
৭- আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, মৃত্যু ৪৫০ হিজরী, তাফসীর আন-নুকাতু ওয়াল 'উয়ুন।
৮- হাফেয বাইহাক্বী, মৃত্যু ৪৫৮ হিজরী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত।
৯- আবুল হাসান আল-ওয়াহেদী, মৃত্যু ৪৭৮ হিজরী, আল-ওয়াজীয।
১০- হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আদ-দামেগানী আল-হানাফী, ৪৭৮ হিজরী, ইসলাহুল ওজূহ।
১১- ইমামুল হারামাইন, আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল্লাহ আল-জুওয়াইনী, মৃত্যু ৪৭৮ হিজরী, আল-ইরশাদ।
১২- আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাফে'ঈ, আল-মুতাওয়াল্লী, মৃত্যু ৪৭৮ হিজরী, আল-গুনইয়া।
১৩- আবুল কাসেম হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আর-রাগেব আল-আসফাহানী, মৃত্যু ৫০২ হিজরী, আল-মুফারাদাত।
১৪- আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-গাযালী, মৃত্যু ৫০৫ হিজরী, এহইয়াউ উলূমিদদীন।
১৫- আব্দুর রহীম ইবন আব্দুল কারীম আল-কুশাইরী, মৃত্যু ৫১৪ হিজরী, আত-তাযকিরাতুশ শারকিয়্যাহ।
১৬- আবুল ওয়ালীদ ইবন রুশদ আল-জাদ্দ, মৃত্যু ৫২০ হিজরী, আল-মাদখাল লি ইবনিল হাজ্জ।
১৭- আবুস সানা আল-লামুশী আল-হানাফী আল-মাতুরিদী, মৃত্যু ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে।
১৮- আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী, দাফ'উ শুবাহিত তাশবীহ।
১৯- ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মৃত্যু ৬০৬ হিজরী, তাফসীর মাফাতীহুল গাইব, আসাসুত তাকদীস পৃ. ১১৬।
২০- সাইফুদ্দীন আল-আমেদী, মৃত্যু ৬৩১ হিজরী, আবকারুল আফকার।

এরপর সেটা পরবর্তী আশআরী আর মাতুরিদীদের মধ্যে ব্যাপক হয়ে যায়।

একটু চিন্তা ও গবেষণা করলে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে যে,

১- 'ইস্তেওয়া'কে 'ইস্তাওলা' এ অর্থ কোনো সাহাবী, তাবে'য়ী, গ্রহণযোগ্য ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসেনি।
২- প্রথম তিন যুগ, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন তাদের কেউ এ অর্থ করেছেন দেখা যায় না।
৩- সর্বপ্রথম এ অপব্যাখ্যা বা বিকৃতিটির সূত্রপাত হয়েছে জাহমিয়্যাহ ও কোনো কোনো মু'তাযিলাদের থেকে।
৪- তারপর এ অপব্যাখ্যাটি মু'তাযিলাদের ছাত্র আরবী ভাষাবিদদের মধ্যে পরবর্তীতে সেটা ব্যাপক হয়ে পড়ে।
৫- পরবর্তী যারাই তাফসীর করেছেন তারা এসব ভাষাবিদদের বক্তব্য নিয়ে আসায় এখানে ভুলে নিপতিত হয়েছেন।
৬- বস্তুত ইস্তিওয়াকে 'ইস্তাওলা' বলার পক্ষে আরবী ভাষার কোনো নযীর নেই। বরং খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ (ইবনুল আ'রাবী), আবুল আব্বাস সা'লাব, আবু আব্দুল্লাহ নিফতাওয়াইহ, তারা সবাই ইস্তিওয়াকে ইস্তাওলা অর্থ করা আরবী ভাষায় নেই বলেছেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এ গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

৯৩৪. উপরে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র ভাষ্য অনুযায়ী কিতাবটির নাম দেখানো হয়েছে, আল-

ইবানাহ ফী উসূলিদ দিয়ানাহ। কিন্তু এ কিতাবটি কয়েকটি মুদ্রণে 'আল-ইবানাহ 'আন উসূলিদ দিয়ানাহ' এভাবে ছাপা হয়েছে। যার কোনো কোনোটি তাহক্বীককৃত, আবার কোনো কোনোটি তাহক্বীক ছাড়াই। তন্মধ্যে বর্তমানে যেগুলো প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে,

১- আল-ইবানাহ আন উসূলিদ দিয়ানাহ, তাহকীক ড. ফাওকীয়াহ বিনতে হুসাইন মাহমূদ, প্রথম ছাপা, ১৩৯৭ হিজরী, দারুল আনসার। এ ছাপার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাতে একাধিক পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করা হয়েছে। আর তাতে ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরীর ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে। যদিও এ ছাপায় কিছু দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিষয় আছে, আর তার বড়টি হচ্ছে, এমন একক নুসখাকে মূল ধরা হয়েছে যাতে বাড়তি অনেক কথা স্থান পেয়েছে যা অন্যান্য কপিগুলোতে নেই। আরেক সমস্যা হচ্ছে এ বাড়তি অংশ মূল কিতাবের অংশ হিসেবে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এসব বাড়তি কথার কোনো কোনো অংশ সালাফে সালেহীনের মানহাজ বিরোধী, যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তা কিতাবের মানহাজ পরিপন্থী। ড. আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ এ মুদ্রিত কপিটির দোষগুলো বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। দেখুন, মাওকাফু ইবন তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়িরাহ (১/৩৫২-৩৫৫)।

২- ড. সালেহ আল-উসাইমী, তিনি এ কিতাবটির সুন্দর তাহকীক করেছেন। এটি সবচেয়ে চমৎকার। এতে তিনি ড. ফাওকীয়ার তাহকীকের ভুলগুলো তুলে ধরেছেন। দেখুন, পৃ. ১২২-১৩৩।

৩- আরেকটি ছাপা যা ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ আল-ইসলামিয়্যাহ কর্তৃক ১৪০০ হিজরী সালে সম্পন্ন হয়েছে, যাতে কোনো তাহকীক বা টীকা নেই।

৪- আরেকটি ছাপা যা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মদীনার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারীর ভূমিকাসহ বের হয়েছে, এতেও কোনো তাহকীক বা টীকা নেই।

বস্তুত এ কিতাবটির ব্যাপারে মানুষের বিতর্ক চরমে। কারণ এ কিতাবের বক্তব্য পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের আকীদাহ-বিশ্বাস পরিপন্থী। বিশেষ সিফাতে খাবরিয়্যাহ তথা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীসে আসা সিফাতের ব্যাপারে ইমাম আশ'আরীর এ কিতাবের বক্তব্য পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের নীতির সরাসরি বিরোধী। কারণ এ কিতাবে তাদের নীতির বাইরে আল্লাহর জন্য সত্তাগত সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া এবং 'আরশের উপরে উঠা সাব্যস্ত করার পাশাপাশি প্রায় সকল সিফাতে যাতিয়্যাহ ও সিফাতে ফি'লিয়্যাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল-ইবানাহ ও ইমাম আশ'আরী:

এ কিতাবটি যে ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর রচনা এ ব্যাপারে প্রাচীনকালের আশ'আরী মতবাদের কারও দ্বিমত ছিল না। যারা যারা এ কিতাবটি ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর বলে উল্লেখ করেছেন, তারা হচ্ছেন,

১- ইমাম বাইহাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ, পৃ. ১০৮।

২- আবু 'উসমান আস-সাবুনী, যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইবন আসাকির, তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ৩৭৮; আরও দেখুন, ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (৫/১০২)।

৩- ইবন আসাকির, তাবঈনি কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯।

৪- আল-বাকেল্লানী, শারহুল ইবানাহ। এটি মূলত ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা।

৫- ইবন ফারহূন, আদ-দীবাজুল মুযাহহাব, পৃ. ১৯৩।

৬- ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (২/৩০৩)। আর বলেছেন এটি তার সর্বশেষ কিতাব।

৭- আবুল কাসেম আব্দুল মালেক ইবন 'ঈসা ইবন দারবাস আশ-শাফে'য়ী, আয-যাব্বু আন আবিল হাসান আশ'আরী।

৮- আবু আলী আল-হাসান ইবন আলী ইবন ইবরাহীম আল-ফারেসী।

৯- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, তিনি এ কিতাবের ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিতেন। এজন্য এ কিতাব থেকে তিনি বহু অধ্যায় নিজের অনেক কিতাবে নিয়ে এসেছেন। যেমন,

- দারউত তা'আরুদ্ব (২/১৬), (৫/৬), (৭/১০৩), (১০/২৬২)।
- বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৪২০), (২/১৫, ২৭, ৩৩৪, ৩৪৮, ৩৯৭)।
- মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১২, ২০৫), (৫/১৪৪, ১৮৬, ১৮৮), (৬/৫২), (১২/২০৩, ৩৬৩),

(১৩/১৭৪), (১৬/৯১)।
১০- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ পৃ. ২৮৬; আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৪৩)।
১১- ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৫/৯০); আল-'আরশ ১৯২, ১৯৫, ১৯৭; যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১২৪৫), নং ৪৯৮। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম নাওয়াওয়ী স্বহস্তে তার পাণ্ডুলিপি লিখেছেন।
১২- ইবন কাসীর, ত্বাবাকাতুল ফুকাহা আশাফে'ইয়্যাহ (১/২০৫), জীবনী নং ৯৩। সেখানে তিনি এটাও বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর জীবনের তিনটি স্তর ছিল। সর্বশেষ স্তরে এসে তিনি এ গ্রন্থটি লিখেছেন।
১৩- ইবন আব্দুল হাদী আল-মাকদেসী, আল-কালামু আলা মাসআলাতিল ইস্তিওয়া আলাল 'আরশি, পৃ. ৭৩।
১৪- সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত (১২/৯১), (১৯/১১৭)।
১৫- তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (১/১৩৩)।
১৬- ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (৫/১০২)।
১৭- ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান (৪/৪৮৭)।
১৮- মার'ঈ ইবন ইউসুফ আল-কারামী, আক্বাওয়ীলুস সিক্বাত, পৃ. ১৪৫।
১৯- সাফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ ১/২২, ৬৭, ১৯৭, ২৪০।
২০- আস-সাইয়্যেদ মুরতাদ্বা আয- যাবীদী, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন (২/৩-৪) (দারুল ফিকর)।
২১- খাইরুদ্দীন আল-আলুসী, জালাউল 'আইনাইন, পৃ. ২৪৭, ২৫২।

সর্বোপরি এ কিতাবের রয়েছে অনেক পাণ্ডুলিপি। সকলেই কিতাবটিকে ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর বলে দাবি করেছেন। আর যারা সেসব কিতাবের পাণ্ডুলিপি লিখেছেন তারা বিখ্যাত আলেমে দীন ও মুসান্নিফীনে কুতুবে দীন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম নাওয়াওয়ী। যা এর সত্যতার একটি বড় প্রমাণ।

বরং ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্রদের এ ব্যাপারে ঐক্য বর্ণনা করেছেন যে, আল-ইবানাহ ইমাম আশ'আরীর রচিত গ্রন্থ। দেখুন, আহকামু আহলিয যিম্মাহ (২/১১৩৮)।

এত দলীল-প্রমাণের পরও বর্তমান সময়ের কোনো কোনো লেখককে দেখা যায় প্রাচ্যবিদ কারও কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ কিতাবকে ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর দিকে সম্পৃক্ত করতে সন্দেহ প্রকাশ করতে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, মাযাহিবুল ইসলামিয়্যীন (১/৫১৭-৫১৮)। অনুরূপ প্রাচ্যবিদদের মধ্যে প্রাচ্যবিদ মুকার্থী, আল্লার। আর যাহেদ কাউসারী তথা পরবর্তী আশ'আরীদের মত হচ্ছে ইমাম আশ'আরী এ গ্রন্থটি হাম্বলীদের খুশি করার জন্য লিখেছেন। কারণ তিনি বাগদাদে প্রবেশ করে ইমাম বারবাহারীর মজলিসে বসার পর যখন বললেন যে, তিনি জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা প্রমুখদের বিরুদ্ধে রদ্দ করেছেন, তখন বারবাহারী বললেন, আমি তো এসব কিছুকে কোনো কাজই মনে করছি না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এগুলো বড় কাজ নয়। বিশুদ্ধ আকীদাহ ও সুন্নাহ'র প্রসারে কাজ যা হবে সেটাই কাজ। তখন নাকি ইমাম আশ'আরী সেখানকার হাম্বলীদের খুশি করার জন্য এটা লিখেছিলেন।

না'উযুবিল্লাহ, 'তা'আসসুব' বা গোঁড়ামী মানুষকে কত অন্ধ করে দেখুন, তারা তাদের ইমামকে মুনাফিক বানিয়ে ছাড়লো। তারপরও ইমামের কাছে থাকা হক্ক গ্রহণ করতে রাযী হলো না। এভাবেই শয়তান তার অনুসারীদের নিয়ে খেলা করে থাকে। আমরা বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় ইমাম আশ'আরী হক্ক বুঝেই এ কিতাব রচনা করেছেন, কোনো কপটতা করার জন্য নয়। আল্লাহ এসব গোঁড়াদেরকে হিদায়াত দিন।

এর বিপরীতে এ কিতাবের প্রশংসা যারা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- ইমাম বাইহাক্বী রাহিমাহুল্লাহ্
২- ইমাম ইবন আসাকির রাহিমাহুল্লাহ।
৩- অনুরূপ ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ।
তিনি যখন আশ'আরী মতবাদের লোকদের আলোচনা করছিলেন তখন বলেন, "আর আশ'আরীদের মধ্যে যারা বলে যে, 'আল-ইবানাহ' কিতাবটি ইমাম আশ'আরী জীবনের শেষাংশে লিখেছেন, আর তার কাছ থেকে এর বিপরীত কিছু এর পর প্রকাশ পায়নি, তাকে

«فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة» .

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية، والجهمية، والحرورية، والرافضة، والمرجئة؛ فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون.

আর তাঁর প্রতি দোষারোপকারীদের প্রতিবাদে যে গ্রন্থের ওপর নির্ভর করা হয় সে কিতাবে তিনি বলেন:

পরিচ্ছেদ: আহলে হক ও আহলুস সুন্নাহ'র বক্তব্য স্পষ্টকরণ:

যদি কেউ বলে যে, তোমরা মু'তাযিলা, ক্বাদারিয়া[৯৩৫], জাহমিয়্যাহ, হারুরিয়া, রাফেযী, মুরজিয়াদের কথা অস্বীকার করে থাক তাহলে তোমরা যা বলো এবং তোমরা যে দীন অনুসরণ করো তা আমাদের জানিয়ে দাও।

আহলুস সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে।" মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৫৯)।

৪- তদ্রূপ ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ।
তিনি ইমাম আশ'আরীর কিছু বাণী উদ্ধৃত করার পর বলেন, "এ হচ্ছে তার ভাষ্য, যা তার সবচেয়ে সম্মানিত কিতাবে ও বড় কিতাবে এসেছে, যা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়, আর তা তার থেকে প্রসিদ্ধ, যা 'আল-ইবানাহ' নামে প্রসিদ্ধ। যার ওপর নির্ভর করেছেন তার ব্যাপারে বেশি জ্ঞানী, তার থেকে প্রতিরোধকারী আহলুল হাদীস আলেম ইমাম আবুল কাসেম ইবন আসাকির। কারণ ইবন আসাকির তার 'তাবয়ীনি কাযিবিল মুফতারী' গ্রন্থে এ কিতাবের ওপর নির্ভর করেছেন এবং এ কিতাবকে ইমাম আশ'আরীর বড় মর্যাদার বিষয় বলে বর্ণনা করেছেন।" ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৮১-১২৮২)।

৫- ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ।
তিনি বলেন, "যদি আমাদের মুতাকাল্লিম ভাইয়েরা (আশ'আরীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন) তারা যদি আবুল হাসান এর এ মতগুলোই সর্বশেষ মত হিসেবে গ্রহণ করতো আর সেগুলোকে আবশ্যকভাবে গ্রহণ করতো, তবে তারা তো অবশ্যই ভালো কাজটিই করতো।" যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১২৫৫)।

৬- অনুরূপ ইমাম ইবন রাজাব রাহিমাহুল্লাহ।
তিনি বলেন, "...আর তার কিতাব, যার নাম আল-ইবানাহ, এটি তার মর্যাদাপূর্ণ কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তার ওপরই আলেমগণ তার মতামত বর্ণনার ব্যাপারে নির্ভর করে থাকে এবং তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। যেমন বাইহাকী, আবু উসমান আস-সাবূনী, আবুল ক্বাসেম ইবন আসাকির প্রমুখ। আর এ কিতাবটির ব্যাখ্যাই করেছেন কাযী আবু বকর ইবনুল বাকেল্লানী।" ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (৫/১০২)।

তাছাড়া প্রখ্যাত আলেমগণের অনেকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন যে, এ 'আল-ইবানাহ' কিতাবটি ইমাম আশ'আরী তার শেষ জীবনে সর্বশেষ কাজ হিসেবে করেছেন, যেমন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১৩৬); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৪/১৩১); ইবন কাসীর, তাবাক্বাতুল ফুক্বাহাউশ শাফে'য়িয়্যীন (১/২০৫); নু'আন খাইরুদ্দীন আল-আলুসী, জালাউল 'আইনাইন, পৃ. ৪৬২ প্রমুখ।

৯৩৫. কাদারিয়্যাহ বলতে সাধারণত তাদেরকে বুঝায়, যারা বিশ্বাস করে যে, বান্দা নিজের কর্ম নিজে সৃষ্টি করে থাকে। আর তারা মূলত মু'তাযিলা নামে খ্যাত। তাদেরকে কখনও কখনও কাদারিয়্যাহ-মু'তাযিলা নামে একসাথেও বলা হয়। কিন্তু যখন কেউ বলে মু'তাযিলা ও কাদারিয়্যাহ তখন সেখানে কাদারিয়্যাহ শব্দ দিয়ে জাবরিয়াদের বুঝানো হয়। যারা বান্দার কোনো কাজের ক্ষমতা স্বীকার করে না।

[تصريح الأشعري الالتزام بمذهب الإمام أحمد]:

قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا، وما رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل. نضَّر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته. قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل؛ الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلالة، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكِّين؛ فرحمة الله عليه من [إمام مقدَّم]، [وجليل معظَّم، وكبير مفهَّم].

وجملة قولنا: أنَّا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبما جاؤوا به من عند الله، وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئًا؛ وأن الله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق؛ وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأن الله مستوٍ على عرشه كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه:٥]، وأن له

[ইমাম আশ'আরী কর্তৃক ইমাম আহমাদ এর আকীদাহ ধারণ করার স্পষ্ট ঘোষণা]

তাহলে তাকে বলা হবে, আমরা যে কথা বলি এবং আমরা যে দীন অনুসরণ করি তা হলো আমরা ধারণ করি যা আমাদের প্রভুর বাণী, নবীর সুন্নত, আর যা সাহাবী, তাবে'য়ী ও হাদীসের ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে, আমরা তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরি। আর যা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (আল্লাহ তার চেহারা উজ্জ্বল করুন, মর্যাদা উন্নত করুন) বলেছেন আমরাও তাই বলি। তার কথার বিপরীত যাদের কথা হবে আমরা তাদের বিরোধিতা করি। কেননা তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ইমাম, পরিপূর্ণ নেতা, যার মাধ্যমে আল্লাহ সত্যকে প্রস্ফুটিত করেছেন এবং ভ্রষ্টতাকে তুলে দিয়েছেন, মানহাজ তথা পথ-পন্থাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে বিদ'আতীদের বিদ'আত, বক্রপথ অবলম্বনকারীদের বক্রতা, সংশয়ীদের সংশয় উপড়ে ফেলেছেন। তাই আল্লাহর রহমত সেই অগ্র নেতা মহা সম্মানিত, মহান ব্যক্তি, বড় সমঝদার ব্যক্তির ওপর আপতিত হোক।

মোটকথা, আমরা স্বীকার করি আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাদেরকে, তার কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে, আর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে। তার কোনোটাই আমরা প্রত্যাখ্যান করি না। নিশ্চয় আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী। গ্রহণ করেননি স্ত্রী ও সন্তান। নিশ্চয় মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাকে তিনি হিদায়াত ও দীন সহ প্রেরণ করেছেন সকল দীনের ওপর বিজয়ী করার জন্য। নিশ্চয় জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত ঘটবে, কবরস্থকে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন।

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে সমুন্নত হয়ে আছেন। যেমনটি তিনি বলেন, ﴿الرَّحْمَٰنُ

وجهًا كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن:٢٧]، وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥]، وكما قال تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة:٦٤]، وأن له عينين بلا كيف، كما قال: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر:١٤].

وأن مَنْ زعم [أن] أسماء الله غيره كان ضالًا، وذكر نحوًا مما ذكر في الفرق، إلى أن قال: ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانًا، وندين بأن الله يقلب

﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

তাঁর রয়েছে চেহারা, যেমন তিনি বলেন, ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾ "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের (সত্তাসহ) চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর-রহমান: ২৭]

তাঁর রয়েছে ধরণ অজানা দুটি হাত। যেমনটি তিনি বলেছেন, ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ "বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৪]

আর তাঁর রয়েছে দুটি চোখ, যেগুলোর ধরণ অজানা। যেমন তিনি বলেন, ﴿تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا﴾ "সে জাহাজ চলত আমাদের চোখের সামনে।" [সূরা আল-ক্বামার: ১৪]

আর আমরা আরও স্বীকার করি যে, 'যে ধারণা করবে যে, আল্লাহর নাম তিনি ভিন্ন অন্য কিছু, সে তো পথভ্রষ্ট।" আর তিনি [আশ'আরী] ফিরাকের বর্ণনায় যা বলেছেন, (মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন গ্রন্থে) সেটার মতো এখানেও উল্লেখ করেন।

তারপর বলেন, নিশ্চয় ইসলাম ঈমান থেকে প্রশস্ত।(৯৩৬) কাজেই প্রত্যেক ইসলাম ঈমান

৯৩৬. ইসলাম ও ঈমান বিষয়ক মাসআলা, আর এ দু'টি কি একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে?
আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-বাকের রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ হচ্ছে ইসলাম, তারপর তিনি একটি বড় বৃত্ত আঁকলেন। তারপর তিনি সে বড় বৃত্তের মাঝখানে ছোট্ট একটি বৃত্ত এঁকে বললেন, এ হচ্ছে ঈমান।
বস্তুত ইসলাম ও ঈমান এ দু'টির মাঝে ব্যাপকতা ও বিশেষতার সম্পর্ক। বলা হয়ে থাকে, যখন এ দু'টি একসাথ হয় তখনই তা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দিতে আরম্ভ করে, আর যখন আলাদা থাকে তখন একটি অপরটির সমার্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যখন কোথাও ইসলামের সাথে ঈমান ব্যবহৃত হয় তখন ঈমান বলতে বুঝাবে কেবল সেসব আমল যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত হয় যেমন আল্লাহর ওপর ঈমান, ফিরিশিতাদের ওপর ঈমান, কিতাবের ওপর ঈমান, রাসূলগণের ওপর ঈমান, আখেরাতের ওপর ঈমান, শেষ দিবসের ওপর ঈমান, তাক্বদীরের ওপর ঈমান। আর তখন ইসলাম বলতে বুঝাবে প্রকাশ্য আমলসমূহ, কালেমা তাইয়্যেবার শাহাদাত, কালেমায়ে রিসালাতের শাহাদাত, সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি।
এ বিস্তারিত অবস্থানটিই আমরা হাদীসে জিবরীল নামে খ্যাত রাসূলের মুখ নিঃসৃত বাণীতে পার্থক্য হিসেবে দেখতে পাই। যখন জিবরীল 'আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। হাদীসটি দেখুন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং (১/১১৪), নং ৫০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৮।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলের হাদীসে ইসলাম কাকে বলা হবে, ঈমান কাকে বলা হবে আর ইহসান কাকে বলা হবে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছেন,

القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أن قال: والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة [عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] التي رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن

নয়।[৯৩৭] আর আমরা দীন হিসাবে বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্বলবসমূহকে উলটপালট করেন, যা মহান আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দু' আঙুলের মাঝে রয়েছে।

আরও বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ, তিনি এক আঙ্গুলের উপর আসমানকে রাখবেন আর যমীনসমূহকে অপর আঙ্গুলের উপর রাখবেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ বর্ণনায় এসেছে।

শেষে [আশ'আরী] বলেন, নিশ্চয় ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের নাম। তা বাড়ে ও কমে। আর নির্ভরযোগ্য সূত্রে ন্যায়পরায়ণ থেকে ন্যায়পরায়ণের মাধ্যম হয়ে সর্বশেষ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হওয়া সকল বিশুদ্ধ হাদীস ও আছারসমূহ আমরা মেনে নিই।

শেষে বলেন, আর আমরা হাদীস বর্ণনাকারীদের দ্বারা সুসাব্যস্ত করা যাবতীয় বর্ণনাসমূহকে সত্য বলে মেনে নিই, যাতে আল্লাহ কর্তৃক দুনিয়ার আসমানে নেমে আসাকে সাব্যস্ত করা

সর্বোচ্চ স্তর ইহসান, মধ্যম স্তর ঈমান, আর তার পরে হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং প্রত্যেক মুহসিন অবশ্যই মুমিন, আর প্রত্যেক মুমিন অবশ্যই মুসলিম, কিন্তু প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি মুহসিন নয়, অনুরূপ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি মুমিন নাও হতে পারে। তবে এ পার্থক্য দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তার একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবে।

তারপর ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, ইহসান স্বয়ং ব্যাপক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হলেও ব্যক্তিদের দিক থেকে ঈমানের চেয়ে বিশেষায়িত। অনুরূপ ঈমান স্বয়ং ব্যাপক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হলেও ব্যক্তিদের দিক থেকে ইসলামের চেয়ে বিশেষায়িত। সুতরাং ইহসানের অভ্যন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে, আর ঈমানের অভ্যন্তরে ইসলাম প্রবেশ করবে। কিন্তু মুহসিনগণ মুমিনগণের তুলনায় বিশেষায়িত, আর মুমিনগণ মুসলিমগণের তুলনায় বিশেষায়িত। দেখুন, ঈমান, পৃ. ১-৭; ২৪৩, ৩০২, ৩৫০।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ঈমান, পৃ. ১-১০, ১৫৩-১৬৩, ২৪৬ ও তৎপরবর্তী, ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৪৮৮-৪৯৪)।

৯৩৭. 'প্রতিটি ইসলাম ঈমান নয়' এ কথাটির অর্থ ইসলাম বিভিন্ন কারণে কোনো মানুষের জন্য ব্যবহার করা যায়, যা ঈমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন এক প্রকার ইসলাম হচ্ছে তা যার ওপর সাওয়াব হয়, যার কারণে কুফরী ও নিফাকী থেকে বের হয়ে যায়, যেমন বেদুঈনদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনলাম'। বলুন, 'তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করেছি', কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তবে তিনি তোমাদের আমলসমূহের সাওয়াব সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" [সূরা আল-হুজুরাত: ১৪] আরেক প্রকার ইসলাম আছে যাতে কেউ মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়, যেমন মুনাফিকদের ইসলামের পরিচয়। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ঈমান, পৃ. ৩৩২, ৩৪২, ৩৯৭।

الرب عز وجل يقول: «هل من سائل؟ هل من مستغفر؟» وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافًا لما قال أهل الزيغ والتضليل.

ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا، وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢]. وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦]، وكما قال: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم:٨، ٩].

হয়েছে। আর মহান রব্ব বলতে থাকেন, 'কোনো যাচ্ঞাকারী আছে কী? কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে কী?' অনুরূপ যাবতীয় বিষয় যা তারা বর্ণনা দ্বারা নিয়ে এসেছেন এবং সাব্যস্ত করেছেন, যা বক্রপথ অবলম্বনকারী ও ভ্রষ্টপথের অনুসারীদের পদ্ধতির বিপরীত।

আর আমাদের নিজেদের মাঝে মতানৈক্য হলে আমাদের রবের কিতাব কুরআন, আমাদের নবীর সুন্নাহ, মুসলিমদের ইজমা', আর যা এর মত রয়েছে সেগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। দীনের মধ্যে কোনো বিদ'আতের প্রচলন করি না, যা করার জন্য তিনি আমাদের অনুমতি দেননি। আর আমরা যা জানি না তা আল্লাহর ব্যাপারে বলি না।

আর আমরা বলি যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন আল্লাহ (হাশরের মাঠে) আসবেন। যেমনটি তিনি বলেছেন, ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝﴾ [الفجر: ٢٢] "এবং যখন আপনার রব্ব আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও (উপস্থিত হবে)।" [সূরা আল-ফাজর: ২২] আর আল্লাহ যেমন চান তেমনিভাবে তিনি তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী হন।[৯৩৮]

যেমনটি তিনি বলেছেন, ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] "আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" [সূরা, ক্বাফ: ১৬][৯৩৯] আরও যেমন বলেছেন, ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝﴾ [النجم: ٨، ٩] "তারপর তিনি তার কাছাকাছি হলেন, অতঃপর খুব কাছাকাছি, ফলে তাদের মধ্যে দু' ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।" [সূরা আন-নাজম: ৮-৯][৯৪০]

---

৯৩৮. ইমাম আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ এখানে আল্লাহ কর্তৃক বান্দার নৈকট্য লাভের বিষয়টিকে ব্যাপক হিসেবে নিয়েছেন। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য বিশেষ গুণ। সেটা 'সাথে থাকা'র মত ব্যাপক গুণ নয়। এ মাসআলাটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৯৩৯. আমরা পূর্বে এ আয়াতের আলোচনায় জানিয়েছি যে, প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতে এখানে 'ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে। এখানে আল্লাহকে বুঝানো হয়নি। এ বিষয়ে আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৩০)।

৯৪০. সম্ভবত ইমাম আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ এখানে 'দনুও' বা নিকটে হওয়া দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হওয়া বুঝেছেন, যা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ও মুকাতিল ইবন সুলাইমান থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে। দেখুন, ইবন জারীর আত-তাবারী, জামেউল বায়ান 'আন তা'ওয়ীলে আয়িল কুরআন (২২/৫০২); ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৮/৬৫-৬৬); কুরতুবী, আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন (১৭/৮৯); সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (৭/৬৪৫)।

إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابًا بابًا. ثم تكلم على أن الله يُرى، واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق، واستدل على ذلك، ثم تكلم

অতঃপর তিনি বলেন, আমরা আমাদের যে কথা উল্লেখ করেছি, আর যা উল্লেখ করিনি, অবশিষ্ট রয়েছে, সে সবের একটি একটি করে দলীলসহ উল্লেখ করব।

অতঃপর তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন যে, আল্লাহকে দেখা যাবে, সেটার ওপর প্রমাণও পেশ করেছেন।

তারপর তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন যে, কুরআন সৃষ্ট নয়, সেটার ওপর দলীলও পেশ

কিন্তু এ আয়াতের তাফসীরে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এখানে জিবরীল 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর এটিই অধিকাংশ সাহাবী, তাবে'য়ী যেমন কাতাদাহ, হাসান আল-বসরী, রবী ইবন আনাস প্রমুখের মত। ইবন আতিয়্যাহ আল-আন্দালুসী বলেন, এটিই অধিকাংশের মত। দেখুন, আল-মুহাররার আল-ওয়াজীয (১৪/৮৯-৯০)।
ইবন কাসীর বলেন, 'এখানে নিকটে হওয়া দ্বারা জিবরীলকে বুঝানো হয়েছে। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে সাব্যস্ত হয়েছে। [বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩২৩৫, ৪৮৫৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৪, ১৭৭] আর তা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, থেকে বর্ণিত। তাছাড়া তা সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৫] আর সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে এ আয়াতকে এ হাদীস দ্বারা তাফসীর করার ব্যাপারে কোনো বিরোধিতা পাওয়া যায়নি, তাই সেটাই প্রাধান্য পাবে।' ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (৫/৮)।
অন্যত্র ইবন কাসীর বলেন, মুফাসসিরগণের মতামত থেকে বিশুদ্ধটি হচ্ছে, বরং প্রকাশ্যভাবে এটাই বলা হবে যে, এ আয়াতে যাকে নিকটে আসা বুঝানো হয়েছে তিনি জিবরীল 'আলাইহিস সালাম। যেমনটি বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এ হচ্ছে জিবরীল।' সুতরাং এ হাদীস সকল বাদানুবাদের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, আর সংশয় দূর করে দিয়েছে।' ইবন কাসীর, আল-ফুসূল ফী সীরাতির রাসূল, পৃ. ২৬১। আর এখানে ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা ইমাম মুসলিমের বর্ণিত শব্দ। দেখুন, মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৭। এজন্য আমাদের উস্তাদগণের উস্তাদ শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী বলেন, 'তিনি হচ্ছেন জিবরীল এটাই তাহকীকী কথা, মহান আল্লাহ নন।' দেখুন, আশ-শানকীতী, আদ্বওয়াউল বায়ান (৩/১০)।
এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করা দরকার, তা হচ্ছে, সূরা আন-নাজম এর এ আয়াতে বর্ণিত 'দুনুও' ও 'তাদাল্লী' বা 'নিকটে আসা ও কাছে আসা' এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইসরা ও মি'রাজের রাত্রির ব্যাপারে বর্ণিত 'দুনুও' ও 'তাদাল্লী' এক নয়। কারণ সূরা আন-নাজম এর আয়াতে জিবরীল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসা ও কাছে থাকা বুঝানো হয়েছে, যেমনটি আয়েশা ও ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহুম 'আনহুম বলেছেন, আর আয়াতের পূর্বাপর বিশ্লেষণ তার ওপরই প্রমাণবহ। কারণ আল্লাহ বলেন, "তাকে শিক্ষা দান করেছেন প্রচণ্ড শক্তিশালী।" [সূরা আন-নাজম: ০৫] এটা অবশ্যই জিবরীল, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই, তারপর বলা হয়েছে "সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন, আর তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বদিগন্তে, তারপর তিনি তার কাছাকাছি হলেন, অতঃপর খুব কাছাকাছি।" [সূরা আন-নাজম: ৬-৮] এটাও জিবরীলই হবেন; যাতে করে সর্বনামগুলো এক দিকে প্রত্যাবর্তন করানো যায়। আর তা হচ্ছে শক্তিশালী শিক্ষক, যিনি অত্যন্ত সুন্দর জিবরীল 'আলাইহিস সালাম।
কিন্তু ইসরা ও মি'রাজের হাদীসে আসা 'দুনুও' ও 'তাদাল্লী' বা নিকটে আসা ও কাছে হওয়ার বিষয়টিতে এটাই সুস্পষ্ট যে, সেখানে মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসা বুঝানো হয়েছে। সূরা আন-নাজমে মোটেই সেটার দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি।' দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা'আদ (৩/৩৮)।

على من وقف في القرآن وقال: لا أقول: إنه مخلوق، ولا غير مخلوق ورد عليه.

[قول الأشعري في الاستواء على العرش]:

ثم قال: «باب في ذكر الاستواء على العرش». فقال: إن قال قائل: ماتقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستوٍ على عرشه كما قال: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه:٥]، وقد قال الله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، وقال: ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء:١٥٨]، وقال: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة:٥]، وقال تعالى حكاية عن فرعون: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ

করেন। তারপর যে কেউ কুরআন নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকে এবং বলে আমি সেটাকে মাখলুক বা সৃষ্টও বলি না, অসৃষ্টও বলি না, সে ব্যক্তির বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন এবং তার বক্তব্য খণ্ডন করেন।

[আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার ব্যাপারে আশ'আরীর অভিমত]

অতঃপর তিনি [আশ'আরী] বলেন, "অধ্যায়: 'আরশের উপর উঠার বর্ণনা।"

তিনি বলেন, যদি কেউ বলে: ইসতিওয়া (استواء) এর ব্যাপারে তোমাদের কী বক্তব্য?

তাকে বলা হবে: আমরা বলি: নিশ্চয় আল্লাহ 'আরশের উপর সমুন্নত হয়ে আছেন; যেমন আল্লাহ বলেন: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝﴾ [طه: ٥] "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠] "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায় এবং সৎকাজ, তিনি তা উপরে তুলেন।" [সূরা আল-ফাতির: ১০]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ﴾ [النساء: ١٥٨] "বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট উপরে তুলে নিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৫৮]

আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ﴾ [السجدة: ٥] "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর তা তাঁর সমীপে উঠে যায়।" [সূরা আস-সাজদাহ: ০৫]

আর আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের কাহিনী বর্ণনায়[৯৪১] বলেন, ﴿يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ

---

৯৪১. এখানে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করার আগে অন্যের 'কাহিনী বর্ণনা' এ শব্দটি ইমাম আশ'আরী বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টি কারও কারও কাছে সমস্যাগ্রস্ত মনে হতে পারে। কারণ পরবর্তী আশ'আরী ও মাতুরিদিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত আল্লাহর কুরআনকে সরাসরি আল্লাহর বাণী বলার চেয়ে আল্লাহর বাণীর বর্ণনা বলতে পছন্দ করেন। কারণ তারা মনে করে যে, আল্লাহর বাণী তো তাঁর অন্তরে, বাইরে যা বর্ণ ও ভাষায় এসেছে তা সে বাণীর কাহিনী রূপ। সে জন্য আল্লাহর বাণীকে কখনও আল্লাহর বাণীর কাহিনী বলা জায়েয হবে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৪৪, ১৭৫, ১৯৯), (১২/২৭২, ৩৭৫)।

﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] كذّب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات، وقال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ [الملك: ١٦]، فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات قال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات، ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات

﴿أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ ۝ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] "হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই, আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" [সূরা গাফির: ৩৬, ৩৭] তিনি মূসাকে মিথ্যাবাদী বললেন তার (মূসার) এ কথায়: যে নিশ্চয় আল্লাহ আসমানের উপরে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ﴾ [الملك: ١٦] "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন।" [সূরা আল-মুলক: ১৬] সুতরাং সকল আসমানের উপরে রয়েছে 'আরশ। আর যেহেতু 'আরশ আসমানসমূহের উপরে, তাই তিনি বলেন, "যিনি আসমানে আছেন তাঁর থেকে কী তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ?" কেননা তিনি সে 'আরশের উপরে রয়েছেন যা আসমানসমূহের উপরে। আর প্রত্যেক যা উপরে তাই আসমান। তাই 'আরশ সকল আসমানসমূহ থেকে উঁচুতে বা ঊর্ধ্বে। আর যখন তিনি বললেন: "যিনি আসমানে আছেন..." তখন তিনি সকল আসমান বুঝাননি, বরং শুধু তিনি 'আরশকে বুঝিয়েছেন যেটা

কিন্তু ইমাম আশ'আরী এখানে সে উদ্দেশ্যে বলেননি। কারণ ইমাম আশ'আরী অন্য সব জায়গায় আল্লাহর বাণী বলেছেন, যা দ্বারা বুঝা যায় তিনি উক্ত বিদ'আতী বক্তব্য দেননি। বরং তিনি কুরআনকে সরাসরি আল্লাহর বাণীই সাব্যস্ত করেন। এজন্য উত্তম অর্থে সেটাকে নিতে হবে, আর তা হচ্ছে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন উক্ত বক্তব্যটি প্রথমে ফির'আউন তার সহচর হামানকে বলেছিল, কিন্তু কীভাবে কোন ভাষায় ছিল সেটা আমরা জানি না, অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত বক্তব্য বর্ণনা করেছেন আল্লাহর নিজস্ব শব্দে।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ যদি বলে কুরআন হচ্ছে 'কাহিনী বর্ণনা' অর্থাৎ কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন বলা হয়, 'তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচার করেছেন', 'তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদায় করেছেন', তাহলে সে অবশ্যই বিশুদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/২৮০); বকর আবু যাইদ, মু'জামুল মানাহিল লাফযিয়্যাহ, পৃ. ৪২৫ ও তার পরের বর্ণনা।

বস্তুত এভাবে বলার বিষয়টি যুগ যুগ ধরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের মাঝে প্রচলিত হয়ে এসেছে। বিষয়টির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আরও দেখা যায়, আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/৩৪৩), (২/১৭৭); আবুল কাসেম আল-বাগাওয়ী, তাফসীর মা'আলিমুত তানযীল (১/৭৩); ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১৭৪); জামে'উর রাসায়িল (১/২১৪), (২/১৩৬); মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৫০৭), (৩০/৩৬৭); যাহাবী, আল-'আরশ, পৃ. ১৯২-১৯৩; আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (১/১৯৯, ৪১৮), (৩/১২৩), (৯/২৬৬, ২৭০); আশ-শানকীত্বী, আদ্বওয়াউল বায়ান (৭/২৮২)।

বস্তুত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ যখন 'কাহিনী বর্ণনা' বাক্য ব্যবহার করেন, আর যখন আশ'আরী ও কুল্লাবিয়া সম্প্রদায় ব্যবহার করে উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৪৪, ১৭৫, ১৯৯), (১২/২৭২, ৩৭৫)।

فقال: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح:١٦] فلم يرد أن القمر يملؤهن، وأنه فيهن جميعًا. ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق

সকল আসমানের উঁচুতে। তুমি কি দেখ না যে, তিনি উল্লেখ করেছেন: "সকল আসমান" যেমন তিনি বলেন, ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ "আর সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে।" [সূরা আন-নূহ: ১৬] এখানে তিনি বুঝাননি যে, চাঁদ সকল আসমানকে পূর্ণ করে আছে, আর তা সকল আসমানে আছে।[৯৪২]

আর আমরা সকল মুসলিমকে দেখি দো'আয় আসমানের দিকে হাত উঠায়[৯৪৩]; কেননা তিনি আসমানের উপরে 'আরশে আছেন। যদি আল্লাহ 'আরশের উপর না হতেন তবে

---

৯৪২. এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, চাঁদ কি সকল আসমানকে আলোকিত করে? এর জবাব হচ্ছে, (১) এখানে সকল আসমান বলা হলেও উদ্দেশ্য কেবল উর্ধ্বজগতের কিছু অংশ। এটাকে বলা হয় 'যিকরুল কুল্ল ওয়া ইরাদাতুল জুয' অর্থাৎ ব্যাপক উল্লেখ করে অংশবিশেষ উদ্দেশ্য নেয়া। (২) আরবী ভাষায় 'ফী' শব্দটি ছাড়া কোনো কিছুর পূর্ণ অংশ বুঝানো আবশ্যক করে না। কিছু বুঝাতেও 'ফী' ব্যবহার করা যায়।

৯৪৩. এটি হচ্ছে ফিত্বরী দলীল। মানবীয় মনের স্বভাবজাত প্রমাণ। যার মাধ্যমে বান্দা তার উপাস্য মা'বুদ আল্লাহকে সবকিছুর উপরে বিশ্বাস করে। এ ব্যাপারে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে, তা হচ্ছে একবার আশ'আরী আলেম আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী মিম্বরের উপর উঠে বললেন, "আল্লাহ ছিলেন তখন 'আরশও ছিল না।" তখন আবু জা'ফর আল-হামাদানী বলেন, ওহে উস্তায, আমাদেরকে 'আরশের বর্ণনা ছেড়ে দিন, অর্থাৎ এটি তো কেবল কুরআন-সুন্নাহ'য় এসেছে, আমাদেরকে সে অত্যাবশ্যক বিষয়টির ব্যাপারে জানান যা আমরা আমাদের অন্তরে পাই, কারণ যখনই কোনো আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহ', তখনই তার হৃদয়ে এমন অত্যাবশ্যকতা পায়, যা তার মনকে উপরের দিকে নিবদ্ধ করতে বাধ্য করে, সেটা ডানেও যায় না, বামেও যায় না। তাহলে কীভাবে এ অত্যাবশ্যকতাকে আমাদের হৃদয় থেকে প্রতিরোধ করব? তিনি বলেন, তখন আবুল মা'আলী তার মাথায় আঘাত করে বলতে আরম্ভ করলেন, হামাদানী আমাকে হয়রান করে দিলো, হামাদানী আমাকে হয়রান করে দিলো, আর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৪৪, ৬১); ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৪৪৬, ৪৬৮)। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের যে কেউ নিজের সত্তায় একবার পরীক্ষা করে দেখবে, সে নিজের সত্তায় সুদৃঢ়ভাবে অত্যাবশ্যক জ্ঞান হিসেবে তার অন্তরে পাবে যে, যখনই সে তার অন্তর দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে, তাকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে, তাঁর দিকে নিজেকে নিবদ্ধ করার ব্যাপারে সত্য হবে, তখনই তাকে কোনো একটি দিকে সেটার উদ্দেশ্য করা জরুরী হয়ে পড়বে। অতঃপর যদি সে তার ফিত্বরাতের ওপর থাকে যার ওপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অথবা যদি সেটার সাথে সে রাসূলরা যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর ঈমানদার হয় তিনি অবশ্যই উপরের দিকে নিজেকে সর্বদা নিবদ্ধ করবে, কিন্তু যদি তার ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত বিশ্বাসের পরিবর্তন এসে থাকে তবে সে সকল দিকেই নিবদ্ধ করবে এবং সকল অস্তিত্বশীল বস্তুর দিকই উদ্দেশ্য করবে।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৪৬৮)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, মহান আল্লাহ তিনি সকল সৃষ্টিকুলের উপর হওয়া, তাদের থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়টি, অত্যাবশ্যক ফিতরাতের মাধ্যমে জানা যায়, যাতে সকল বনী আদম সমানভাবে অংশীদার। যে যত বেশি আল্লাহকে চিনবে, যত বেশি তাঁর ইবাদত করবে, যত বেশি তাঁর কাছে যাচঞা করবে, যার হৃদয়ে যত বেশি তাঁকে স্মরণ করবে, তার কাছে এ অত্যাবশ্যকতা তত বেশি শক্তিশালী ও পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়বে। কারণ ফিতরাত বা স্বভাবজাত জ্ঞান, অবতীর্ণ করা ফিতরাতকে পূর্ণতা দেয়। কারণ স্বভাবজাত জ্ঞানে যে কোনো জিনিস মুজমাল বা সংক্ষিপ্তভাবে জানতে পারে, শরী'আত সেটাকে বিস্তারিত বর্ণনা করে, প্রকাশ করে ও এমন কিছুর সাক্ষ্য দেয় যা ফিতরাত একাকী বুঝতে পারে না। মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৪৫); আরও দেখুন, জামে'উল মাসায়িল (৪/৭৯-৮৫)।

السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.

[رد أبي الحسن على من فسر الاستواء بالاستيلاء]:

ثم قال: فصلٌ: وقد قال قائلون من المعتزلة، والجهمية، والحرورية: إن معنى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه:٥] أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة،

তারা তাদের হাত 'আরশের দিকে উঠাতো না; যেমনটি তারা যখন দো'আ করে তখন যমীনের দিকে নামায় না।(৯৪৪)

[আবুল হাসান আল-আশ'আরী কর্তৃক ইস্তেওয়া অর্থ ইসতীলা করার খণ্ডন]

অতঃপর তিনি [আশ'আরী] বলেন, পরিচ্ছেদ:

মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ, হারুরিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে থাকে যে, আল্লাহর বাণী: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫] এর অর্থ আধিপত্য বিস্তার করেছেন, জবরদখল করেছেন, কর্তৃত্ব লাভ করেছেন।(৯৪৫) তারা আরও বলে যে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে এটা তারা অস্বীকার করে।

আবার তারা 'ইস্তিওয়া'কে কুদরত বা ক্ষমতা অর্থে নেয়।(৯৪৬) তারা যা বলে তাই যদি

---

৯৪৪. অর্থাৎ এটিই প্রমাণ করে যে, তিনি উপরে আছেন, যত উপরে একজন মানুষ জানতে পারে তারও উপরে। তিনি আসমানসমূহের উপরে, 'আরশের উপরে।

৯৪৫. এসব যে জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও হারুরিয়্যাদের বক্তব্য তার প্রমাণ হিসেবে দেখুন, কাযী আব্দুল জাব্বার আল-মু'তাযিলীর, শারহুল উসূলিল খামসাহ, পৃ. ২২৬; তাছাড়া আরও যারা এ বক্তব্যকে জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলাদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আশ'আরী তার মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন গ্রন্থে, পৃ. ১৫৭, ২১১; আরও দেখুন, আব্দুল কাহের আল-বাগদাদীর উসূলুদ্দীন, পৃ. ১১২।

৯৪৬. এখানে সম্ভবত আরেক দলের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা 'আরশের উপর আল্লাহর 'ইস্তেওয়া' করাকে কুদরত বা ক্ষমতার অর্থে নেয়। তখন সেটি আর আল্লাহর কর্মগত গুণ থাকে না। তখন সেটি সত্তাগত গুণ হয়ে যায়। বস্তুতই যারা আল্লাহর কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করে না তারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, তারা সকল প্রকার কর্মগত গুণকে হয় কুদরত ও ইচ্ছার দিকে নিয়ে যায়, নতুবা সেগুলোকে 'তাকওয়ীন' নামক তথাকথিত সৃষ্টি কর্মের দিকে নিয়ে যায়।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদল লোক 'ইস্তেওয়া'কে সত্তাগত গুণ হিসেবে বর্ণনা করে, অপর দল সেটাকে কর্মগত গুণ হিসেবে বলে। তারপর তিনি বলেন, যারা বলে এটি সত্তাগত গুণ তারা আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে তা'ওয়ীল করে বলে, 'তিনি 'আরশের উপর ক্ষমতাবান হলেন'। তারপর তিনি এ মতটিকে কয়েক দিক থেকে দুর্বল সাব্যস্ত করলেন:
১- আল্লাহ বলেন, [الاعراف: ٥٤] ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ "তারপর তিনি 'আরশের উপর..."। [সূরা আ'রাফ: ৫৪] এখানে আল্লাহ তা'আলা সে কাজটিকে 'তারপর' বলে জানিয়েছেন। যদি ক্ষমতা অর্থ করা হয় তবে কি তিনি আল্লাহ তা'আলা আগে 'আরশের উপর ক্ষমতাবান ছিলেন না?
২- এখানে একটি ক্রিয়া আরেকটি ক্রিয়ার ওপর 'আতফ' তথা নির্ভর করে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ক্রিয়াটি 'খালাকা' তারপরেরটি 'ইস্তেওয়া'। অর্থাৎ সৃষ্টি করেছেন তারপর ইস্তেওয়া বা

فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء. والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويًا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستوٍ على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى: الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها وذكر

হতো তাহলে 'আরশ আর সপ্তম যমীনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। কেননা আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। যমীনের উপরে, বাথরুমের উপরে, জগতের সবকিছুর ওপরই তিনি ক্ষমতাবান। তাই যদি আল্লাহর 'আরশের উপরে মুস্তাওয়ী (مستوٍ) হওয়ার বিষয়টি ক্ষমতাবান অর্থে হতো অথচ তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তাহলে অবশ্যই তিনি 'আরশের উপরে, যমীনের উপরে, আসমানের উপরে, বাথরুমের উপরে, ময়লার উপরে (مستوٍ) ক্ষমতাবান বলতে হয়; কেননা তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, সবকিছুর ওপর কর্তৃত্বকারী। আর যখন তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান বলবেন, আর কোনো মুসলিমের মতেই জায়েয না এটা বলা যে, আল্লাহ ময়লার ওপর, পায়খানার ওপর (مستوٍ) মুস্তাওয়ী বা কর্তৃত্বকারী। তাহলে বুঝা গেল যে, এভাবে 'আরশের উপরে 'ইস্তিওয়া' এর অর্থ استيلاء (ইসতীলা) করা কোনোভাবেই জায়েয হয় না; কেননা তা সবকিছুকেই শামিল করে। বরং আবশ্যক হলো استواء 'ইস্তিওয়া' এর এমন অর্থ করা যা 'আরশের সাথে সুনির্দিষ্ট হবে; অন্য

উপরে উঠেছেন। এখন যদি পরেরটি 'কুদরত' অর্থ করা হয়, তখন আর ক্রিয়ার উপর ক্রিয়ার 'আত্বফ' হয় না, ক্রিয়ার ওপর বিশেষ্যকে 'আতফ' করতে হয় যা আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে দৃষ্টিকটু।

৩- তারা যা বলে অর্থাৎ 'ক্ষমতাবান হওয়া' অর্থ করা হলে 'আরশ ও অন্য কিছুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান। এখন যদি বলা হয়, 'আরশ উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, 'আরশ সবচেয়ে বড় সৃষ্টি, তাই সেটাকে আলাদা করে বর্ণনা করা হয়েছে, (বলা হবে যে,) বড় সৃষ্টি হওয়ার কারণেই সেটা বিশেষায়িত হয়ে যায় না, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মহা 'আরশের রব্ব"। [সূরা আত-তাওবাহ: ১২৯] এখানেও 'আরশের রবকে উল্লেখ করা হয়েছে, আর রব্ব হওয়া ব্যাপক বিষয়কে শামিল করে, তাই এটা বলা বৈধ হয় যে, তিনি আসমানসমূহের রব্ব, যমীনসমূহের রব্ব ও মহা 'আরশের রব্ব। আরও বলা হয়, 'রাব্বুল আলামীন', আরও বলা হয়, 'রাব্বি মূসা ওয়া হারূন' (তাহলে বুঝা গেল যে, ইস্তিওয়া আলাল 'আরশ এর অর্থ যদি 'আরশের উপর 'ক্ষমতাবান হওয়া' বলা হয়, তাহলে সেটার বিশেষত্ব থাকে না, যেমনিভাবে রব্বুল 'আরশ বলা হলেও সেটার বিশেষত্ব থাকে না)।

অথচ 'ইস্তেওয়া' ক্রিয়াটি মুসলিমদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী 'আরশের সাথে একান্তভাবে বিশেষায়িত। যদিও তিনি আসমান-যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী ক্ষমতাধর সত্তা।

এখন যদি তাঁর 'আরশের উপর ইস্তেওয়া'কে 'আরশের ওপর ক্ষমতাবান' এ অর্থ করা হয়, তাহলে এটা বলাও শুদ্ধ হবে যে, তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তার ওপরও ক্ষমতাধর। (তখন আর শুধু 'আরশের উপর 'ইস্তেওয়া' এর বিশেষত্ব থাকে না)। এটি দিয়ে বেশ কিছু আলেম ('ইস্তেওয়া' অর্থ 'ক্ষমতাবান হওয়া' বিশুদ্ধ না হওয়ার) দলীল পেশ করেছেন, তাদের মধ্যে ইমাম আশ'আরী একজন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৩৯৫-৩৯৭)।

دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل.

[مذهب أبي الحسن في الصفات الخبرية]:

ثم قال: «باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين».

وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته: مثل قوله: فإن سئلنا: أتقولون لله يدان؟.

قيل: نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله

কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হবে না। এরপর তিনি এর ওপর কুরআন, হাদীস, ইজমা' ও আক্বল থেকে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেন।[৯৪৭]

[সিফাতে খাবারিয়্যা তথা কুরআন ও হাদীসে আসা আল্লাহর গুণগুলোর ব্যাপারে আবুল হাসান আল-আশ'আরীর মত]

অতঃপর তিনি বলেন,

"অধ্যায়: চেহারা, দু' চোখ, দর্শনেন্দ্রিয় এবং দু'হাত[৯৪৮]"

আর তিনি এগুলোর ওপর প্রমাণবহ আয়াতসমূহ উল্লেখ করেন। আর যারা এগুলোর তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে তাদের মত খণ্ডন করেন দীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে, যার বর্ণনা এখানে সঙ্কুলান হবে না। যেমন তিনি বলেন, আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমরা কী বলো যে, আল্লাহর দু'টি হাত আছে?

তাহলে বলা হবে: হ্যাঁ, আমরা সেটা বলি। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ "আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।" [সূরা আল-ফাতহ: ১০] এবং তাঁর বাণী: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ "যা আমি আমার দুহাতে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা স্বদ: ৭৫] আর রাসূল

---

৯৪৭. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ এ বাতিল তা'ওয়ীলকে ৪২টি উপায়ে খণ্ডন করেন, যা যেকোনো মানুষের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। দেখুন, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক্ব (২/১৩৭-১৫২)।

৯৪৮. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর 'হাত' গুণটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন, আর তিনি যারা এ গুণটির অপব্যাখ্যা করেছেন সেসব জাহমিয়্যাহ ও তাদের অনুসারীদের বক্তব্য দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। সেখানে তিনি সেসব জাহমিয়্যাহ ও তাদের অনুসারীদের বক্তব্য খণ্ডনের বহু দিক তুলে ধরেছেন, কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের অনেক আছার নিয়ে এসেছেন, তারপর বলেন, 'যদি আমরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সব বক্তব্য নিয়ে আসি তবে সেটা শতাধিক হয়ে যাবে।' দেখুন, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (৩/৯৪৬-৩৮৪)।

তিনি আরও বলেন, 'ইয়াদ' শব্দটি কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের ভাষ্য, তাবে'য়ীনে 'ইযামের বক্তব্যে একশ' এর বেশি স্থানে এসেছে। আর তার আসার ধরণও বিচিত্র, আর তা এমনসব দলীল-প্রমাণাদি সমৃদ্ধ যা প্রমাণ করে যে, এটা দ্বারা প্রকৃত হাতই বুঝানো হয়েছে। যেমন এসেছে ধারণ করা, ভাঁজ করা, মুষ্ঠিবদ্ধ করা, প্রশস্ত করে দেয়া, মুসাফাহা করা, আঁজলা, হাত দিয়ে পানির ঝাপটা দেয়া, দু' হাতে সৃষ্টি করা, দু' হাত সরাসরি ব্যবহার করা...' দেখুন, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (৩/৯৮৪)..।

مسح ظهر آدم بيده، فاستخرج منه ذريته» وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده».

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, «إن الله مسح ظهر آدم بيده، فاستخرج منه ذريته» "নিশ্চয় আল্লাহ স্বীয় হাত দ্বারা আদমের পিঠে মাসেহ করলেন"।(৯৪৯) আরও বলেন, وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده 'আর তিনি নিজ হাতে জান্নাতু 'আদন সৃষ্টি করেছেন, আর তাওরাত নিজ হাতে লিখেছেন।'(৯৫০)

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে,

«إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده»

"আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজ হাতে জান্নাতে আদন সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন, তিনি নিজ হাতে তূবা বৃক্ষ রোপণ করেছেন।"(৯৫১)

---

৯৪৯. হাদীসটির তাখরীজ ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৯৫০. হাদীসটির তাখরীজ ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৯৫১. এ হাদীসটি এ শব্দে কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে কাছাকাছি শব্দে তা বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে, যেমন:
- ১- দারাকুতনী, আস-সিফাত, হাদীস নং ২৮।
- ২- আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ, হাদীস নং ১০১৭।
- ৩- বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১২৫), হাদীস নং ৬৯২; আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস, তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তিনটি বস্তু নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাওরাত নিজ হাতে লিখেছেন, ফিরদাউস নিজ হাতে স্থাপন করেছেন....." হাদীসের শেষ পর্যন্ত। এরপর বাইহাকী বলেন, হাদীসটির সনদ মুরসাল। তার সনদে আবু মি'শার নাজীহ ইবন আব্দুর রহমান রয়েছেন। তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।
- ৪- ইমাম আবু নু'আইম তার 'সিফাতুল জান্নাত' (১/৪৮-৪৯) নং ২৩ এ রকম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।
- ৫- অনুরূপ হাদীস ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও মাওকূফ সূত্রে হাকেম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন (২/৩৪৯), তার শব্দ হচ্ছে, "আল্লাহ তা'আলা চারটি জিনিস নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, 'আরশ, জান্নাতু 'আদন, আদম ও কালাম।" তারপর হাকেম বলেন, এ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ তবে বুখারী ও মুসলিম তারা কেউই তা সংকলন করেননি, আর তার সাথে যাহাবী একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।
- ৬- আরও সংকলন করেছেন উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী। দেখুন, আর-রাদ্দু আলা বিশর আল-মিররীসী (১/৪৭২)।
- ৭- অনুরূপ বর্ণনা জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মাওকূফ সূত্রে এসেছে। তার শব্দ হচ্ছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ হাতে তিনটি জিনিস ব্যতীত কিছু স্পর্শ করেননি, জান্নাত নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন.. আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাওরাতকে মূসার জন্য নিজ হাতে লিখেছেন।" ইবন আবী শাইবাহ তা তার আল-মুসান্নাফে (১৩/১৯৬) সংকলন করেন।
- ৮- আরও সংকলন করেছেন আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ আস-সুন্নাহ (১/২৯৫), নং ৫৭০ ইবন আব্বাস থেকে। তবে তার সনদ দুর্বল। কারণ তাতে আলী ইবন যায়েদ ইবন জুদ'আন রয়েছেন।
- ৯- তাছাড়া এ রকম আরও কিছু বর্ণনা মাওকূফ সূত্রে কা'ব আল-আহবার থেকে এসেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস ব্যতীত কোনো কিছু নিজ হাতে করেননি, আদম, তাওরাত;

وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيديّ، ويريد بها النعمة، وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها، وما يجري مفهومًا من كلامها، ومعقولاً في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيديّ، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿بِيَدَيَّ﴾ النعمة. وذكر كلامًا طويلاً في تقرير هذا ونحوه» .

আর আরবি ভাষায় বা বাক্যালাপকারীদের অভ্যাসে এটা জায়েয নয় যে, কেউ বলবে "আমি নিজের দু'হাতে এমনটি করেছি" আর তা দ্বারা সে নি'আমত উদ্দেশ্য করবে। আর আল্লাহ যখন আরবদেরকে তাদের নিজেদের ভাষায় সম্বোধন করেছেন এবং তা দ্বারা সম্বোধন করেছেন যা তাদের কথায় বুঝে নিতে হয় এবং যা তাদের বক্তৃতায় মাধ্যমে বোধগম্য হয় আর আরবী ভাষাভাষীদেরকে এটা বলা জায়েয নয় যে, "আমি স্বীয় দু'হাতে করেছি" বলে উদ্দেশ্য হবে নি'আমত, তাহলে আল্লাহর বাণী: بِيدَيِ বা "আমার দু'হাতে" এর অর্থ নি'আমত হওয়া বাতিল সাব্যস্ত হলো।(৯৫২) এ প্রসঙ্গে তিনি এটা ও অনুরূপ কিছু সাব্যস্ত

কারণ তা তিনি মূসার জন্য লিখেছেন, তূবা যা জান্নাতের এক প্রকার গাছ, আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে তা লাগিয়েছেন।' দেখুন, আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৩০৩।

তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে হাদীসটি ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ওপর মাওকুফ। দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, হাদীউল আরওয়াহ (১/২১৫)।

৯৫২. আবুল হাসান আল-আশ'আরী, তিনি কালামশাস্ত্রবিদ হওয়া সত্ত্বেও সেসব কালামশাস্ত্রবিদদের মতবাদকে চূর্ণ করলেন, যারা আল্লাহর দু' হাত থাকার গুণটি অস্বীকার করে, তিনি সেটা সাব্যস্ত করার জন্য কুরআন থেকে দলীল নিলেন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, "যা আমার দু' হাত সৃষ্টি করেছে"। [সূরা স্বদ: ৭৫] বস্তুত আল্লাহর দু'হাত সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এটি সবচেয়ে স্পষ্ট আয়াত। কারণ দ্বি-বচন দিয়ে যা বলা হয় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, সুনির্দিষ্ট সংখ্যাকেই বুঝায়। দেখুন, আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ২২১; ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৪৭৮-৪৮৫)।

আর যখনই কোথাও 'ইয়াদ' (হাত) দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তখন সেটা প্রকৃত হাত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, এর বাইরে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/১৫৫)। আর যখন তা 'বা' অব্যয় দিয়ে সমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে 'ইয়াদ' বা হাতের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন সেটা দ্বারা কেবল নিজ হাতে সম্পন্ন করাই বুঝায়। দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২৭০)।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইয়াদাইন' শব্দটি দ্বি-বচনে নি'আমত অর্থেও ব্যবহৃত হয়নি, ক্ষমতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়নি। আর যা বলা হয় যে, একের জন্য দুই আর দু'য়ের জন্য এক ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম রয়েছে, সে কথার কোনো ভিত্তি নেই। কারণ এগুলো সংখ্যা, আর সংখ্যা তার অর্থ অতিক্রম করে না, নির্দিষ্ট করে শুধু তাই বুঝায়।

সুতরাং [ص : ٧٥] ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ "যা আমার দু' হাত সৃষ্টি করেছে" [সূরা স্বদ: ৭৫] এর দ্বারা কোনোভাবেই কুদরত বা ক্ষমতা অর্থ করা যাবে না, কারণ কুদরত একটি গুণ, আর একটি গুণকে দুই সংখ্যা বাচক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা কখনো বৈধ হয় না।

অনুরূপভাবে এর দ্বারা 'নি'আমত' অর্থও করা যায় না, কারণ আল্লাহর নি'আমত অগণিত অসংখ্য। সুতরাং অগণিত অসংখ্য নি'আমতকে দুই সংখ্যা বাচক শব্দ দিয়ে বুঝানো কখনো বৈধ হয় না। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আর-রিসালাতুল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৬০-৬১।

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ এখানে بِيَدَيَّ দ্বি-বচন সূরা ইয়াসীনে আসা ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ এর বহু বচনের মতই, তাহলে তো মু'আত্তিলা তথা নিষ্ক্রীয়কারীদের দ্বারা সূরা ইয়াসীনের আয়াত দ্বারা 'হাত' অস্বীকার করে সেটাকে আমল দ্বারা ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে না। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সূরা ইয়াসীনের এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে কাজ সম্পাদনকারীর গুণে গুণান্বিত করেছেন। কিন্তু এ রীতি অথবা এমন ব্যবহার কেবল তার জন্যই হতে পারে যার হাত রয়েছে।

[قول الباقلاني في كتابه الإبانة]:

وقال القاضي أبو بكر «محمد بن الطيب [الباقلاني] المتكلم». وهو أفضل المتكلمين المنتسبين

করতে আরও দীর্ঘ কথা বলেন।[৯৫৩]

[কাযী আল-বাকেল্লানীর বক্তব্য তাঁর আল-ইবানাহ্ গ্রন্থে]

কাযী আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুত তাইয়্যেব আল-বাকেল্লানী[৯৫৪], যিনি আশ'আরী মতবাদের

'কারণ যখন কেউ বলে بيده الملك 'তার হাতে যাবতীয় রাজত্ব' অথবা عملته يداك 'যা তোমার দু'হাত করেছে' তখন এর দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝানো হয়:

এক. হাত সাব্যস্ত করা।

দুই. কাজ তার দিকে সম্পৃক্ত করা। হ্যাঁ, দ্বিতীয়টিতে রূপক অর্থ অনেক সময় হয়, কিন্তু প্রথমটি কেবল তখনই ব্যবহৃত হয় যখন প্রকৃত অর্থেই তার হাত রয়েছে। তারা বলে না, বাতাসের হাত বা পানির হাত।

আচ্ছা ধরে নিলাম যে, ﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ 'যার হাতে আছে যাবতীয় রাজত্ব' [সূরা আল-মুলক: ০১] এখানে 'ইয়াদ' দ্বারা কুদরত বা ক্ষমতা বুঝানো হয়েছে, কিন্তু সেটা কেবল তার জন্যই হতে পারে যার প্রকৃত হাত রয়েছে।' ইবন তাইমিয়্যাহ, আর-রিসালাতুল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৬০-৬১; আরও দেখুন, আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৭৩-৭৬।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আরও দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৬৩-৩৭৩); ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/১৫৩-১৭৪)।

৯৫৩. দেখুন, আবুল হাসান আল-আশ'আরী, আল-ইবানাহ 'আন উসূলিদ দিয়ানাহ, পৃ. ১৫-৫৪।

৯৫৪. তিনি হচ্ছেন, কাযী আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুত তাইয়্যেব ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন কাসেম আল-বসরী আল-বাগদাদী। তিনি আবু বকর আল-বাকেল্লানী বলে প্রসিদ্ধ। আবু বকর আল-ক্বাতি'ঈ, যিনি মুসনাদে ইমাম আহমাদ এর বর্ণনাকারী, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, অনুরূপ তার উস্তাদগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন, আবু বকর আল-আবহুরী, আবু আব্দুল্লাহ ইবন মুজাহিদ, আবুল হাসান আল-বাহেলী (আশ'আরীর ছাত্র), আবু আব্দুল্লাহ ইবন খাফীফ, ইবন আবী যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানী (রিসালাতু ইবন আবু যাইদের লেখক) প্রমুখ। আর তার ছাত্রত্ব বরণ করেন কাযী আব্দুল ওয়াহাব আল-মালেকী আল-বাগদাদী, আবু যর আল-হারাওয়ী, আবু জা'ফর আস-সিমনানী, আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষেই তিনি সে যুগের লোকদের শিক্ষক ছিলেন।

তিনি অনেক বড় সম্মানিত ইমাম ও আলেম ছিলেন। বুদ্ধিমত্তা ও সাবধানতার দিক থেকে শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তিত্ব, তিনি সর্বদা দলীল-প্রমাণাদি দ্রুত উপস্থাপনে পারদর্শী ছিলেন, উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বলা হয়ে তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন রোমকদের রাজার কাছে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি এমন এক প্রাসাদে অবস্থান করছেন যেখানে ঢুকতে হলে রুকুর মতো হয়ে প্রবেশ করতে হয়। বাকেল্লানী তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারলেন। তিনি দরজার দিকে নিজের পিঠের দিক দিয়ে ঢুকলেন এবং পিছনের দিকে চলতে চলতে প্রবেশ করলেন। তারপর যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন সোজা হলেন এবং রোম সম্রাটের সাথে কথা বললেন। সেখানে যেসব কথা ও আলোচনা হয়েছে তাতে ইমাম বাকেল্লানীর বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বুঝের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

তিনি রাফেযী, মু'তাযিলা, খারেজী, জাহমিয়্যাহ ও কাররামিয়্যাহদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তার মাঝে ও মু'তাযিলাদের মধ্যে খলীফার মজলিসে সর্বদা মুনাযারা ও বহস লেগেই থাকতো।

আকীদাহ'র দিক থেকে তিনি আশ'আরী মতবাদের বিশেষ ব্যক্তি বিবেচিত হতেন। বরং তাদের প্রধান আলেমগণের একজন, যাকে আশ'আরী মতবাদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়।

আর ফিকহের দিক থেকে তিনি ইমাম মালেক এর মত অনুসরণ করতেন।

তার সম্পর্কে কাযী ইয়াদ্ব বলেন, 'আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুত তাইয়্যেব, তিনি শাইখুস সুন্নাহ ও লিসানুল উম্মাহ উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। আহলুল হাদীস ও সিফাত সাব্যস্তকারীদের নীতির কালামশাস্ত্রবিদ ছিলেন। আর তিনি ছিলেন আবুল হাসান আল-আশ'আরীর পদ্ধতি অনুসরণকারী।

إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب «الإبانة» تصنيفه:

সাথে সম্পর্কযুক্ত উত্তম কালামশাস্ত্রবিদ ছিলেন, তাদের মাঝে তার পূর্বে এবং পরে তার মতো কেউ ছিলেন না। তিনি তাঁর রচিত "ইবানাহ"[৯৫৫] গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন:

তার সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম অনেক বড় ধারণা করতেন ও তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন আর বলতেন, আশ'আরীর গ্রন্থ 'ইবানা'র পরে তিনি সবচেয়ে বেশি (সিফাত) সাব্যস্তকারী ছিলেন। ইবন ফুওরাক এর স্থান তার পরে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫২)।
শাইখুল ইসলাম আরও বলেন, বাতেনীদের গোপন রহস্যভেদ করা, তাদের রদ্দ করার ক্ষেত্রে তার অনেক অবদান ছিল। অনুরূপভাবে নাস্তিক ও বিদ'আতীদের বিরুদ্ধেও তার ছিল ব্যাপক প্রচেষ্টা। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৫৫৮); শারহুল আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ২৪৪।
শাইখুল ইসলাম আরও বলেন, কাযী আবু বকর আল-বাকেল্লানী ও তার মতো লোকেরা আকীদাহ ও সুন্নাহ'র ব্যাপারে আবুল মা'আলী ও তার মত লোকদের চেয়ে বেশি জানতেন। দেখুন, শারহুল আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ৬৩২, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/২০৩)।
তিনি আরও বলেন, কাযী আবু বকর ইবন আল-বাকেল্লানী ও তার মতো লোকেরা সুন্নাহ'র অধিক নিকটবর্তী ও ইমাম আহমাদ ও তার মতো ইমামদের অধিক অনুসারী ছিলেন, খোরাসানের সেসব লোকদের থেকে, যারা ইবন কুল্লাব এর প্রবর্তিত নীতির দিকে বেশি ঝুঁকে গিয়েছিলেন। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (১/২৭০)।
তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, 'তিনি ইমাম, আল্লামাহ, একক কালামশাস্ত্রবিদ, আকীদাহ'র ইমামদের একজন, আবুল হাসান আল-আশ'আরীর পদ্ধতির জন্য মুনাযারা করেছেন। তবে কোথাও কোথাও তার বিরোধিতাও করেছেন। কারণ তিনি তার মতোই আলেম। তিনি আশ'আরীর ছাত্রদের থেকে এ বিদ্যা গ্রহণ করেছেন। তিনি মু'তাযিলী, রাফেদ্বী ও মুশাব্বিহা গোষ্ঠীর ওপর উন্মুক্ত অসি ছিলেন। তার অধিকাংশ নীতিই ছিল সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'
ইমাম যাহাবী আরও বলেন, 'আবু বকর আল-বাকেল্লানী রাফেদ্বী, মু'তাযিলা, খারেজী, জাহমিয়্যাহ, কাররামিয়্যাহ এদের সবার বিরুদ্ধে কলম ধরেন, আবুল হাসান আল-আশ'আরীর পক্ষ অবলম্বন করেন। আবার সংকীর্ণতা দেখা দিলে আশ'আরীর বিরোধিতাও করেছেন। কারণ তিনি আশ'আরীর সমপর্যায়ের লোক, তিনি আশ'আরীর ছাত্রদের থেকে ইলমুন নযর গ্রহণ করেন।' ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/১৯০)।
ইমাম যাহাবী অন্যত্র বলেন, 'কালামশাস্ত্রবিদ আশ'আরীদের মধ্যে তার মতো উত্তম আর কেউ নেই, তার আগেও নয়, পরেও নয়। দেখুন, আল-আরশ, পৃ. ২৪৬; অনুরূপই বলেছেন, আল-উলু গ্রন্থে, পৃ. ২/১২৯৮। দেখুন, আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ, মাওকিফু ইবন তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়িরাহ (২/৫২৬-৫৫৪)।
তিনি হিজরী ৪০৩ সালে মারা যান। তার রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা ৫৫ এর মতো। যার অধিকাংশের নাম কাযী ইয়াদ্ব তার তারতীবুল মাদারিক গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। সেসব গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ই'জাযুল কুরআন, তামহীদুল আওয়ায়েল ওয়া তালখীসুদ দালায়েল, আল-ইনসাফ ফীমা ইয়াজিবু ই'তিক্বাদুহু ইত্যাদি।
দেখুন, কাযী ইয়াদ্ব, তারতীবুল মাদারিক (২/৫৮৫০; ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৪/২৬৯); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/১৯০); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১১/৩৫০); আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ, মাওকিফু ইবন তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়েরা (২/৫৫৪)।

৯৫৫. কিতাবটির পূর্ণ নাম হচ্ছে, 'আল-ইবানাহ 'আন ইবত্বালি মাযহাবি আহলিল কুফরি ওয়াদ দ্বালালাহ'। এটি ইমাম বাকেল্লানীর বিখ্যাত গ্রন্থ। তবে এটি বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। এ কিতাবটি তার রচিত বলে যারা বলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন কাযী ইয়াদ্ব, তারতীবুল মাদারিক (২/৬০১); ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (৩/৩৮২), (৩/২০৬); নাকদ্বুত তা'সীস (২/৩৪); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ৩০৩; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১১/৩৫০); তবে তিনি সেটার নাম দিয়েছেন, 'শারহুল ইবানাহ'; যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ১৭৩; সিযকীন এ কিতাবটিকে বাকেল্লানীর রচিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দেখুন, তারীখুত তুরাস (৪/১৫); তবে তিনি এর কোনো পাণ্ডুলিপি কোথাও আছে কিনা তার হদীস

«فإن قال: فما الدليل على أن لله وجهًا ويدًا؟ قيل له: قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن:٢٧] ، وقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥] فأثبت لنفسه وجهًا ويدًا.

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجهًا ويدًا إلا جارحة؟.

قلنا: لا يجب هذا كما لا يجب إذ لم نعقل حيًا عالمًا قادرًا إلا جسمًا أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائمًا بذاته أن يكون جوهرًا، لأنا لا نجد قائمًا

"যদি সে বলে: আল্লাহর চেহারা ও হাত আছে তার দলিল কী? তাহলে তাকে বলা হবে: দলিল তাঁর বাণী: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর-রহমান: ২৭] এবং তাঁর বাণী: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] "আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সাজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?" [সূরা স্বদ: ৭৫] সুতরাং তিনি নিজের জন্য চেহারা ও হাত সাব্যস্ত করেছেন।(৯৫৬)

অতঃপর যদি সে(৯৫৭) বলে: তাহলে তোমরা তার চেহারা ও হাতকে 'অঙ্গ' বলতে অস্বীকার কর কেন? যদি তোমার হাত ও চেহারাকে অঙ্গ ছাড়া না বুঝো?

তাহলে আমরা বলব: এটা আবশ্যক নয়; যেমন আবশ্যক হয় না যখন জীবিত, জ্ঞানী, ক্ষমতাবান দ্বারা জিসম ব্যতীত আর কিছু না বুঝেও আমরা এবং তোমরা আল্লাহর জন্য এগুলো সাব্যস্ত করি।(৯৫৮) অনুরূপভাবে আবশ্যক হয় না যেগুলো 'স্বয়ং বিদ্যমান' সেগুলোর

দেননি।

৯৫৬. অনুরূপ বক্তব্য দেখা যায় তার আত-তামহীদ গ্রন্থে, পৃ. ২৯৫-২৯৬। সেখানে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তিনি তার নিজের জন্য চেহারা এবং দু' হাত সাব্যস্ত করেছেন।

৯৫৭. অর্থাৎ মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের লোক, যারা বলে আমরা নাম সাব্যস্ত করি কিন্তু গুণ সাব্যস্ত করি না। মু'তাযিলী সে লোকের উদ্দেশ্য আল্লাহর চেহারা ও হাত অস্বীকার করা; এ অজুহাতে যে চেহারা ও হাত বলতে তো কেবল আমি অঙ্গই বুঝি।

৯৫৮. লক্ষণীয় যে বাকেল্লানী এখানে মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে যে মূলনীতিটি ব্যবহার করেছেন সেটিই অনেক আলেম পরবর্তীতে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। তারা বলেন, القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 'কিছু গুণের ব্যাপারে যা বলা হবে, অপর গুণাবলির ব্যাপারেও সে নীতি অবলম্বন করা হবে।' এ মূলনীতিটির দিকে ইতোপূর্বেও যারা ইঙ্গিত করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আবুল হাসান আল-আশ'আরী তার ইবানা গ্রন্থে পৃ. ৮৯; ইমাম বাকেল্লানীর পরবর্তীতে অনেকেই এ মূলনীতিটি বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইবনুয যাগুনী, আল-'ঈদ্বাহ ফী উসূলিদ দীন, পৃ. ২৮৪। ইবন কুদামাহ আল-মাক্বদেসী, তাহরীমুন নাযার ফী কুতুবিল কালাম, পৃ. ৫৭, ৬৪। কিছু দ্বিমুখীতা সহ এ মূলনীতিটি ব্যবহার করেছেন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী, কারণ তিনি কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রকাশ্য ভাষ্যের কারণে যারা আল্লাহর জন্য হাত, চেহারা ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছে তাদেরকে সে একই পদ্ধতিতে আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠা ও হাশরের মাঠে আগমন করা সাব্যস্ত করতে বাধ্য করেছেন। আর এগুলোকেও সেগুলোর মতো সিফাত হিসেবে গণ্য করতে বলেছেন। অনুরূপভাবে যারা 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপর উঠার গুণটির তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে থাকে তাদেরকে একই নীতিতে তিনি চেহারা ও দু' হাতের তা'ওয়ীল করতে বলেন। কারণই উভয়টিই আল্লাহর সিফাত। দেখুন, আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী, আশ-শামেল, পৃ. ১৫৭-১৫৮। আরও দখুন, ড. আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ, মাওক্বিফু ইবন তাইমিয়্যাহ

بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب لهم، إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضًا واعتلوا بالوجود.

قال: فإن قال: تقولون: إنه في كل مكان؟

قيل له: معاذ الله؛ بل هو مستوٍ على العرش كما أخبر في كتابه فقال: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه:٥] ، وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، وقال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [الملك:١٦].

قال: ولو كان في كل مكان، لكان في بطن الإنسان وفمه، والحشوش، والمواضع التي يرغب

সবকিছুই 'জাওহার' (মৌলিক পদার্থ) হওয়া; কেননা আমরা এবং তোমরা যাবতীয় 'স্বয়ং বিদ্যমান' জিনিসকে জাওহার হিসেবেই দেখতে পাই (কারণ আল্লাহকে তারা 'জাওহার' বলে না অথচ তিনি 'স্বয়ং বিদ্যমান')। অনুরূপ[৯৫৯] উত্তর তাদেরকেও দেয়া যাবে যারা বলে: জ্ঞান, জীবন, দর্শন, শ্রবণ এবং সকল সিফাত 'আরদ্ব' (পদার্থের গুণ) হওয়া আবশ্যক করে, কারণ অস্তিত্বশীল সবকিছুর মাঝে এ গুণগুলোকে 'আরদ্ব'ই বলা হয়।[৯৬০]

তিনি আরও বলেন, যদি সে বলে: তাহলে তোমরা কি বল যে, তিনি সর্বত্র আছেন?

তাহলে তাকে বলা হবে: আল্লাহর আশ্রয় চাই, বরং তিনি 'আরশের উপর সমুন্নত; যেমন তিনি স্বীয় কিতাবে জানিয়েছেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥] "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ০৫] অন্যত্র তিনি বলেছেন: [فاطر: ١٠] ﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ﴾ "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায় এবং সৎকাজ, তিনি তা উপরে উঠান।" [সূরা ফাতির: ১০] তিনি আরও বলেন, [الملك: ١٦] ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ﴾ "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন?" [সূরা আল-মুলক: ১৬]

তিনি বলেন, যদি আল্লাহ সর্বস্থানে থাকতেন তাহলে তিনি মানুষের পেটে, মুখে, ময়লার মধ্যে, এমনকি এমন স্থানে থাকতেন যা উল্লেখযোগ্য নয়[৯৬১] এবং তাহলে আবশ্যক হতো

মিনাল আশা'য়েরা (৩/১১৮৬)। আর এ মূলনীতিটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আশ'আরী ও মাতুরিদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন, দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/২৯৮); আল-ইকলিল ফিল মুতাশাবাহ ওয়াত তা'ওয়ীল (৬/৪০-৪১, ৭৫); দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (১/৯৯-১০০); আর রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৩১; শারহুল আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ৩৬।

৯৫৯. অর্থাৎ যদি মু'তাযিলী আল্লাহর জ্ঞান, জীবন ইত্যাদি গুণাবলি এ অজুহাতে অস্বীকার করে যে, দৃশ্যমান কোনো কিছু বা কাউকে এ গুণে গুণান্বিত হওয়ার অর্থ আমরা যা পাই তা হচ্ছে তাকে 'জিসিম' বা দেহ বলা। তখন তাকে বলা হবে, অনুরূপ আমরাও তো জ্ঞানী, জীবিত এমন কাউকেই দেখতে পাই যিনি 'জিসিম' বা দেহ। কারণ মু'তাযিলারা আলীম ও হাই বা আল্লাহকে জ্ঞানী ও জীবিত এ নামকরণে রাজি হয় কিন্তু তার সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ অস্বীকার করে। দেখুন, আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ১২৫; আরও দেখুন, হামাওয়িয়্যাহ এর ওপর ড. তুয়াইজরীর টীকা, পৃ. ৫০৯।

৯৬০. তখন পূর্বের উত্তরটি এখানে বলা যাবে যে, জ্ঞানী, জীবিত, শ্রোতা ইত্যাদিতেও আমরা দেখতে পাই যে, কেবল দেহেরই হতে পারে, অথচ তোমরা আল্লাহকে দেহ বলো না, তাতে তোমাদের যে জবাব সিফাতের বেলায় একই জবাব আমরা তোমাদেরকে দিই।

৯৬১. এসব দলীল-প্রমাণাদি ইতোপূর্বে ইমাম আহমাদ তার 'আর-রাদ্দু আলায যানাদিকাতি ওয়াল

عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله.

وقال أيضًا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفًا بها، وهي الحياة، والعلم والقدرة، والسمع والبصر، والكلام، والإرادة والبقاء، والوجه، والعينان، واليدان، والغضب، والرضا» .

স্থান বৃদ্ধির ফলে তিনিও বৃদ্ধি পান, যখন তাতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা পূর্বে ছিল না। আর স্থান সংকুচিত হলে তিনিও সংকুচিত হয়ে হ্রাস পেয়ে যাবেন, যখন তাতে যা ছিল তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপ তাহলে তো আল্লাহর দিকে অনুরাগী হওয়ার জন্য যমীনের দিকে আমাদের পিছনের দিকে, আমাদের ডানে, আমাদের বামে মনোনিবেশ করা শুদ্ধ হতে হয়। অথচ সকল মুসলিমের ঐকমত্য রয়েছে এর বিপরীত কথার ওপর এবং যারা এমনটি বলবে তাদের বক্তব্য ভুল বলার ওপর।[৯৬২]

আবু বকর আল-বাকেল্লানী এই কিতাবে আরও বলেন, "তার সত্তাগত গুণ[৯৬৩] যা সর্বদা ছিল, থাকবে। আর সেটা হলো জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা, দেখা-শোনা, কথা বলা, ইচ্ছা করা, অবশিষ্ট থাকা, চেহারা, দু' চোখ, দু'হাত, রাগ, সন্তুষ্টি।"[৯৬৪]

জাহমিয়্যাহ' গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। দেখুন, পৃ. ২৮৯; অনুরূপ আরও নিয়ে এসেছেন ইমাম আব্দুল আযীয আল-কিনানী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৭২)।

৯৬২. আবু বকর আল-বাকেল্লানীর এ বক্তব্যের ওপর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দেখুন, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ ৯৫/৭২)।

৯৬৩. সত্তাগত গুণ বলতে সেসব গুণকে বুঝায় যা কর্মগত গুণের বিপরীত। সত্তাগত গুণ কখনো আল্লাহ থেকে আলাদা হয় না। সর্বদা তিনি এসব গুণে গুণান্বিত। যেমন জীবন, জ্ঞান, কুদরত বা ক্ষমতা, দেখা, শোনা, কথা, ইচ্ছা।
আর কর্মগত গুণ বলতে সেসব গুণকে বুঝায় যা আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। যেমন তিনি কাউকে রিযিক দিবেন, কাউকে সৃষ্টি করবেন, কোথাও আগমন করবেন, 'আরশের উপর উঠবেন, কাউকে সাওয়াব দিবেন, কাউকে শাস্তি দিবেন, কারও উপর রাগ করবেন, কারও ওপর সন্তুষ্ট হবেন।
কিন্তু আশ্চর্যের সাথে অচিরেই দেখব যে, ইমাম আল-বাকেল্লানী সন্তুষ্ট হওয়া ও রাগ করাকে সত্তাগত গুণ বলছেন যা কোনোভাবেই বিশুদ্ধ নয়। বরং এ দু'টি গুণ আল্লাহর পছন্দ করা কর্মগত গুণ, যা তিনি যখন ইচ্ছা তখন করেন। তাঁর ইচ্ছা ও চাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

৯৬৪. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তার নাক্বদুত তা'সীস (২/৪৩৪-৪৩৫) গ্রন্থে এখানকার কিছু ভাষ্য নিয়ে এসেছেন। আরও দেখুন, যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, পৃ. ১৭৩-১৭৪; মুখতাসার উলূ ২৫৮; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ৩০৩; আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৫২); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/১৬৯-১৭০)।
সর্বশেষ প্যারাটি আমরা দেখতে পাই বাকিল্লানীর আত-তামহীদ গ্রন্থে, পৃ. ২৯৮-২৯৯।
লক্ষণীয় যে, বাকেল্লানী সিফাতে খাবারিয়্যাহ বা কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা গুণগুলো বিনা তা'ওয়ীল বা কোনোরূপ অপব্যাখ্যা ছাড়াই সাব্যস্ত করেছেন, তিনি আল্লাহর জন্য চেহারা ও দু' হাত সাব্যস্ত করেছেন। এ নীতিটিকে পরবর্তী কালাম শাস্ত্রবিদ তথা পরবর্তী আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়া সম্প্রদায় গ্রহণ করেননি। তারা এগুলোর তা'ওয়ীল নামের অপব্যাখ্যা করে থাকে।

[الكتاب والسنة فيها الغنية عن كلام كل أحد] :

وقال في كتاب «التمهيد» كلامًا أكثر من هذا، -لكن ليست النسخة حاضرة عندي- وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام .

[কুরআন ও সুন্নাহ এ দু'টিই যথেষ্ট, মানুষের বক্তব্য বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না]

কাযী আবু বকর আল-বাকেল্লানী, তিনি স্বীয় 'আত-তামহীদ'(৯৬৫) গ্রন্থে এর চেয়েও অনেক বেশি আলোচনা করেছেন।(৯৬৬) কিন্তু কিতাবটির কপি আমার কাছে এখন নেই।(৯৬৭) বস্তুত এ ব্যাপারে কালামপন্থীদের বক্তব্য খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে, যদিও আমরা কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনদের বক্তব্যের পর অন্য কারো বক্তব্যের প্রয়োজন মুক্ত হয়ে যাই।

তবে সমস্যা হচ্ছে বাকিল্লানী কালাম বা 'আল্লাহর বাণী' এ গুণকে সত্তাগত গুণ বলেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা সত্তাগত ও কর্মগত উভয় প্রকার গুণ। আর তিনি আল্লাহর দু'টি গুণ, 'রাগ করা ও সন্তুষ্ট হওয়া' এগুলোকে সত্তাগত গুণ বলেছেন যা কখনও সঠিক নয়, কারণ তা নিঃসন্দেহে কর্মগত পছন্দ করা গুণ, যখন ইচ্ছা তখন আল্লাহ তা'আলা তা করেন। সম্ভবত তিনি এ দু'টি গুণকে 'ইরাদা' বা ইচ্ছা দ্বারা অপব্যাখ্যাও করেছেন। দেখুন, আত-তামহীদ, পৃ. ৪৭-৪৮, ২৯৯। বস্তুত এ পদ্ধতিই পরবর্তী অনেক আশ'আরী অনুসরণ করেছে। তারা সরাসরি আল্লাহর রাগ হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া বলে ভিন্ন কর্মবাচক গুণ সাব্যস্ত করতে নারাজ।

৯৬৫. এ কিতাবটির নাম, 'তামহীদুল আওয়ায়েল ফী তালখীসিদ দালায়িল'। ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, (যা সাফারীনী লাওয়ামি'উল আনওয়ারের ১/১৭৮, ৪২০ পৃষ্ঠায় তার থেকে বর্ণনা করেছেন যে), "এটি কাযী আল-বাকেল্লানীর বিখ্যাত গ্রন্থ"। গ্রন্থটি তিনি আদ্দুদ দৌলাহ এর সন্তানের অনুরোধে লিখেছিলেন বলে গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। কিতাবটি বেশ কয়েকবার ছাপা হয়েছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত ছাপাটি হচ্ছে যা 'ইমাদুদ্দীন আহমাদ হাইদার' এর তাহকীকে মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাক্কাফিয়্যাহ, ১৪০৭ সালে প্রথমবার ছাপা হয়েছিল, তখন সেটি ৫৬৭ পৃষ্ঠায় বের হয়েছিল। সাথে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযুক্ত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত এটি সবচেয়ে মারাত্মক খেয়ানতপূর্ণ ছাপা। কারণ তাহকীক করার নাম দিয়ে তিনি বিরাট অংশ বাদ দিয়ে বের করেছেন। কারণ সেখানে আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করা হয়েছে।
আলহামদুলিল্লাহ, তার সে খেয়ানত প্রকাশ হয়ে পড়ে, যখন প্রাচ্যবিদ পাদ্রী রিচার্ড যোসেফ মুকার্থী আল-ইয়াসূ'য়ী তা পূর্ণরূপে বের করেছেন। এভাবেই আল্লাহ হককে প্রকাশ করে দেন।

৯৬৬. দেখুন, আত-তামহীদ, পৃ. ২৯৫-২৯৯।

৯৬৭. তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝা যায়, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ কতবড় আমানতদার ছিলেন। তার কাছে যা নেই তা অনায়াসে বলে দিয়েছেন। সেজন্য সেটা তিনি নিয়ে আসেননি। আলহামদুলিল্লাহ এ গ্রন্থ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" গ্রন্থে নিয়ে এসেছি।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার আমানতদারীর আরও কিছু নমুনা দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১০৫); ইকতিদ্বা'উস সিরাত্বিল মুস্তাকীম (১/৭২, ৪২৪); আর-রাদ্দু আলাল বিকরী (২/৫৭০); আস-সাব'ঈনিয়্যাহ, বুগইয়াতুল মুরতাদ, পৃ. ৩৪৯; ইস্তেকামাহ (১/৭২); জাওয়াবুল ই'তিরাদ্বাতুল মিসরিয়্যাহ আলাল 'ফুতইয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ১৭২; আল-ফাতাওয়াল কুবরা (১/১৬৬), (৬/৮৬); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৬৩), (৪/২৩৪), (৬/৪০৬, ৪২০), (১০/৭২৭), (২২/৪৫৭), (২৭/৪৫৫), (২৯/৩২৯), (৩৫/২২১)। তাছাড়াও আরও অনেক জায়গা।
তাছাড়া আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এসবের অধিকাংশই তিনি নিজের হিফয থেকে মানুষদের কাছে বলেছেন তারা লিখে নিয়েছে। অনেক কিছু তিনি জেলখানায় লিখেছেন, সেখানে তার কাছে কোনো গ্রন্থও ছিল না, তারপরও আপনি প্রায় হুবহু কথা তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে দেখে আশ্চর্য হবেন। যেমনটি বলেছেন তারই ছাত্র ইবন আব্দুল হাদী, আল-উকূদুদ দুররিয়্যাহ, পৃ. ৩৭।

وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانًا بحيث يكون له عقل ودين، حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء؛ ولكن كثير من الناس قد صار منتسبًا إلى بعض

মোদ্দাকথা, বড় প্রাপ্তি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে এমন হিকমত ও ঈমান দান করা যাতে সে তার বিবেককে কাজে লাগাতে পারে ও দীনকে বুঝতে সক্ষম হবে। তারপর (এমন নেয়ামত প্রাপ্তির পর) কুরআন-সুন্নাহ'র আলো তাকে সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।[৯৬৮] কিন্তু অনেক মানুষ কালামপন্থী কোনো না কোনো দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে

৯৬৮. ইবন তাইমিয়্যাহ সর্বদা মানুষদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকেই নিজের অভাব ও নিঃস্ব অবস্থা তুলে ধরার অত্যাবশ্যকতা বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, 'বান্দা তার রব্ব আল্লাহর মুখাপেক্ষী হবে যাতে তিনি তাকে সঠিক পথের দিশা দেন, ভালো কাজগুলোর দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'হতে পারে কোনো মানুষ অনেক বেশি বুদ্ধিমান, প্রখর মেধার অধিকারী, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে সবচেয়ে প্রকাশিত জিনিস থেকে অন্ধ করে রাখেন। আবার হতে পারে একজন মানুষ অনেক বোকা, দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁরই অনুমতিক্রমে মানুষের মাঝে যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তাকে সে হকের সহজ দিশা প্রদান করেন। সুতরাং লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপায় নেই, তিনি ব্যতীত কোনো ক্ষমতা নেই। তাই এটা স্পষ্টভাবে বলা যায়, যে কেউ নিজের দৃষ্টির ওপর নির্ভর করবে অথবা নিজের বিবেকের ওপর ভরসা করবে সে অবশ্যই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং হিদায়াত থেকে মাহরূম হয়ে যাবে।' ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৯/৩৪)।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'সুতরাং আল্লাহ যার অন্তরকে আলোকিত করবেন তাকে এমন হিদায়াত দিবেন যা তাকে মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছে দিবে। অন্যদিকে যাকে বা যার অন্তরকে অন্ধ করে দিবেন, অনেক গ্রন্থ তার হয়রানী ও পথভ্রষ্টতাই শুধু বাড়িয়ে দিবে।' মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৬৬৫) (আল-ওয়াসিয়্যাতুস সুগরা)।

ইবন তাইমিয়্যাহ আরো বলেন, 'দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হক্ব কেউ বিশ্বাস করতে সমর্থ হলে সেটা তার মাঝে ধারণ করার ক্ষমতা, আয়ত্ব করার যোগ্যতা শক্তিশালী করে ও পরিশুদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد : ١٧]

"আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে তিনি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিবেন।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৭]

আরও বলেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۝ وَإِذًا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ۝ [النساء : ٦٦- ٦٨]

"যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। আর অবশ্যই তখন আমরা তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করতাম এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।" [সূরা আন-নিসা: ৬৬-৬৮]' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১০)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, 'যে কেউ যা জেনেছে তার ওপর আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যা জানেনি সে জ্ঞানের ওয়ারিস বানাবেন। সৎ উদ্দেশ্য ইলম অর্জন ও তা ধারণ করার ক্ষেত্রে বড় সহযোগী হিসেবে প্রমাণিত। শরী'আতের জ্ঞান অর্জন করা সৎ উদ্দেশ্য ও সৎ আমলের জন্য বড় সহযোগী হিসেবে পরীক্ষিত। কারণ ইলম হচ্ছে কায়েদ (সম্মুখ পরিচালক) আর আমল হচ্ছে সায়েক (পিছনের দিক থেকে হাঁকিয়ে নেয়ার চালক)। আত্মা হচ্ছে একগুঁয়ে, সুতরাং যখন কায়েদ (সম্মুখ পরিচালক) কাজ করতে অলসতা করবে তখন সায়েক (পিছনের দিক থেকে হাঁকানো) ব্যক্তির পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় না, আর যখন সায়েক অলসতা করবে তখন কায়েদ সামনে এগুতে সক্ষম হবে না। যখন ইলম দুর্বল হবে পথচারী তখন বিভ্রাটে পড়বে, জানতে পারবে না কোন পথে চলবে, সর্বশেষ অবস্থা হবে তাকদীরের ওপর নিজের ডোর ছেড়ে দেয়া। আর যখন কেউ আমল ছেড়ে দেয় তখন পথচারী পথ হারিয়ে ভুল পথে পরিচালিত হবে, যদিও সে জানছে যে সে পথ হারিয়ে বসেছে। এভাবে ইলমে দুর্বল ব্যক্তি হতভম্ব ও হয়রান, জানে না কোন পথে চলবে,

طوائف المتكلمين، ومحسنًا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهمًا أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أُتي بكل آية ما تبعها حتى يُؤتى بشيء من كلامهم.

[مخالفة المتكلمين لأسلافهم]:

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى، الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرُجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى،

[مشابهة من تعصب لطائفة معينة ثم لم يقبل ما معها من الحق لليهود]:

ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة، ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق، ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:٩١].

গেছে এবং অন্য (সালাফ ও ইমাম)দের বাদ দিয়ে এসব কালামপন্থীদের প্রতিই তাদের সুধারণা পোষণ করে, আর এ অবাঞ্ছিত চিন্তা করে যে, এ বিষয়ে তারা যতটুকু সত্যে উপনীত হয়েছেন অন্যদের তা হয়নি। সুতরাং যদি কেউ সকল আয়াত বা নিদর্শন নিয়ে আসে তাহলেও তারা তা মানবে না, যতক্ষণ না কালামশাস্ত্রবিদদের থেকে কিছু আনা হয়।

[পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদ কর্তৃক তাদের পূর্ববর্তীদের বিরোধিতা]

তদুপরি দেখা যায় যে, এরা তাদের পূর্বসূরীদের নীতির বিরোধিতাকারী তাদের সঠিক অনুসরণকারী নয়। যদি তারা তাদের পূর্বসূরীদের বক্তব্যে পাওয়া যে হিদায়াতটুকু রয়েছে তার অনুসরণ করতো আর তার সাথে হক্ব তালাশের মানসিকতা থাকতো, তাহলে আশা করা যেত যে, তাদের হিদায়াত আরও বেড়ে যেত।

[যারা কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে অন্ধ গোঁড়ামী করে, কিন্তু তাদের কাছে যে হকটুকু পাওয়া যায় তা গ্রহণ করে না, তারা ইয়াহূদীদের সাথে তুলনীয়]

বস্তুত যে কেউ সুনির্দিষ্ট দল ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে সত্য গ্রহণ করে না, অতঃপর সে দলে সত্যের কোনো অংশ থাকলে তাও গ্রহণ করে না, তার মধ্যে তো ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্যতা রয়েছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝٩١﴾ [البقرة: ٩١]

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো', তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি'। অথচ এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট

যদিও তার সামনে চলার পথ অনেক। আর আমল পরিত্যাগকারী ব্যক্তিও হতভম্ব ও হয়রান, পথ থেকে বিচ্যুত, তবে সে জানে যে সে পথ হারিয়ে বসেছে।' মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৫৪৪)। আরও দেখুন, জামে'উর রাসায়িল (২/১৮০); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/২৪৫-২৪৬), (১৮/১৭৬)।

فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، [ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون]. ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يتبع الحق، لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان.

যা আছে তার সত্যায়নকারী। বলুন, 'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছিলে?" [সূরা আল-বাকারাহ: ৯১]

কারণ ইয়াহূদীরা বলেছিল, আমাদের কাছে যা নাযিল হয়েছে কেবল তার ওপরই ঈমান আনব, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেন, ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩١] "বলুন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছিলে?" [সূরা আল-বাকারাহ: ৯১] অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত বিধানের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক (তবে কেন তোমাদের নবীদের হত্যা করেছ?)। বরং তোমরা তোমাদের নবীগণ যা নিয়ে এসেছেন তারও অনুসরণ করো না, আর না তোমরা অন্য নবীগণ যা নিয়ে এসেছেন সেটার অনুসরণ কর। তোমরা কেবল তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাক। মূলত এটাই হচ্ছে তার অবস্থা যে সত্যকে অনুসরণ করে না, নিজের দলের থেকেও না, অন্যের থেকেও না। অথচ সে নিজের দলের পক্ষে গোঁড়ামী করে, যে গোঁড়ামীর পিছনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণও নেই, বর্ণনাও নেই।[৯৬৯]

---

৯৬৯. মনে হচ্ছে শাইখুল ইসলাম পরবর্তী কোনো কোনো আশ'আরী ও মাতুরিদীদের দিকে ইঙ্গিত করছেন, যারা তাদের মতাদর্শের জন্য প্রচণ্ড রকমের গোঁড়ামী করে। তারা তাদের মত থেকে এক বিন্দুও নড়তে নারাজ। যদিও তাদের সেসব মতাদর্শের অনেকগুলো তাদেরই পূর্বতন আলেমগণের আদর্শ বিরোধী প্রমাণিত হয়। যেমনটি আমরা দেখতে পাই, পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের নিকট তারা তাদের পূর্ববর্তী বড় ইমামগণ যেমন ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী ও ইমাম আবু বকর আল-বাকেল্লানীর কথারও বিরোধিত করে থাকে। কারণ ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী ও ইমাম আল-বাকেল্লানী আল্লাহর জন্য সিফাতে খবারিয়্যাহ সাব্যস্ত করতেন। যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনায় দেখেছি তারা আল্লাহর সত্তাগত গুণ চেহারা হাত, পা, চোখ সাব্যস্ত করতেন। আর তারা আল্লাহর 'আরশের উপর উঠাকেও সাব্যস্ত করেছেন এবং সেটার পক্ষে দলীল প্রদান করেছেন।
ইবন তাইময়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আর এ রকম সমস্যায় অনেক ইলম ও দীনের দিকে সম্পর্কিত বিশেষ কিছু গোষ্ঠীকেও নিপতিত হতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে রয়েছেন অনেক ফকীহ, বহু সূফী ও অন্যান্য লোকেরা। অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত বিশেষ কোনো দীনের সম্মানিত নেতার অনুসারীদের মাঝেও এমনটি দেখা যায়, তারা দীনের ফিকহের জ্ঞান কিংবা হাদীসের জ্ঞানের কিছুই গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তা তাদের তথাকথিত দীনী নেতা ও তার গোষ্ঠীর অনুসারীদের মাধ্যম হয়ে না আসে। অথচ দীনে ইসলাম তাদের ওপর আবশ্যক করে দিয়েছে হক্কের অনুসরণ করতে নিঃশর্তভাবে।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, ইক্তিদ্বাউস সিরাতিল মুস্তাকীম (১/৭৩)। তারপর ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ কখনও কখনও কেন তিনি কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্য নিয়ে এসে সেখান থেকে হক্কের কথা ব্যক্ত করেন তার কারণ বর্ণনা করে বলেন, 'আমি সেসব বিবেকের যুক্তির প্রধান্যদানকারী গোষ্ঠীর নেতাদের সেসব বক্তব্য পেশ করি, যা হক্ককে প্রকাশ করবে। এটা এজন্য নয় যে হক্ক বুঝা ও জানার জন্য আমরা তাদের মুখাপেক্ষী, কিন্তু এজন্য যে, (১) বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারাও এসব বিষয় যে বাতিল ও নষ্ট তার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। যেসব বিষয়কে সেসব নেতাদের অনুসারীরা অকাট্য বলে ধরে নিয়েছে অথচ তা শরী'আত বিরোধী। আর এ জন্য যে, (২)

[قول أبي المعالي في رد التأويل]:

وكذلك قال «أبو المعالي الجويني» في كتاب «الرسالة النظامية»: اختلفت مسالك العلماء في هذه

[আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী কর্তৃক তা'ওয়ীল নীতির খণ্ডন]

অনুরূপভাবে আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী[৯৭০] তার 'আর-রিসালাতুন

যখন মানুষের মন এটা জানতে পারে যে এ কথাটি বিরোধী দলের ইমামগণও বলেছেন তখন সেটা তার অন্তরে রেখাপাত করে, সে তা গ্রহণ করার জন্য প্রশান্তি পায় ও ঘনিষ্ঠতা অনুভব করে। আর এ এজন্য যে, (৩) এর মাধ্যমে প্রকাশ পাবে যে, এ মাসআলাটিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে মতভেদ রয়েছে, তখন অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণের গ্রন্থি খুলে যাবে ও বাড়াবাড়ি করে ভুলের ওপর অবস্থান করা পরিত্যাগ করবে।' ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (১/৩৭৭)।

৯৭০. আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী, তিনি হচ্ছেন আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ, আল-জুওয়াইনী, আশ-শাফে'য়ী। তিনি ইমামুল হারামাইন নামে প্রসিদ্ধ। হিজরী ৪১৯ সালে তার জন্ম। তার পিতার কোলে বেড়ে উঠেন আর তার হাতেই শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তাছাড়া তার উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন আবুল কাসেম আল-আসফারায়ীনী যিনি 'আল-ইসকাফ' নামে খ্যাত। তার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আবু হামেদ আল-গাযালী, ইলকিয়া আল-হাররাসী, আবুল কাসেম আল-আনসারী প্রমুখ।

প্রথম জীবনে তিনি মু'তাযিলাদের কিতাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে আবু হাশেম ইবন আবু আলী আল-জুব্বায়ীর গ্রন্থ দ্বারা। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবুল মা'আলী অধিক পরিমাণে আবু হাশেম ইবন আবু আলী আল-জুব্বায়ীর গ্রন্থ পড়তেন। আর তিনি নিজে ছিলেন জগতের বুদ্ধিমানদের একজন।' ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৮৭)।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'আবুল মা'আলী প্রচুর পরিমাণে আবু হাশেম (মু'তাযিলী) এর গ্রন্থ পড়তেন, তবে তিনি সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম ও সালাফে সালেহীন ইমামগণের 'আছার' এর ব্যাপারে খুব কম জানতেন। ফলে দু'টি বিষয় তার মাঝে প্রচুর প্রভাব ফেলে।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫২)।

অন্যত্র বলেন, 'তিনি তো কেবল অধিক পরিমাণে মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারীদের গ্রন্থ পড়তেন, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের 'আছার' সম্পর্কে কম জানতেন ও কম খেয়াল রাখতেন। তাছাড়া তিনি ইসলামের বিভিন্ন গোষ্ঠী, যেমন ফকীহ, মুহাদ্দিস, সূফীদের বক্তব্য সম্পর্কে স্বল্পই ওয়াকিফহাল ছিলেন। এমনকি কালামশাস্ত্রবিদদের মতাদর্শও কম জানতেন।' ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩৪৭)।

অন্যত্র বলেন, আবুল মা'আলীর অধিকাংশ কালামশাস্ত্রের বিষয়াদি কাযী আবু বকর প্রমুখ থেকে নেয়া, আর তিনি আবু হাশেম আল-জুব্বায়ীর কালাম কথা থেকে বিভিন্ন অংশ পছন্দ করে নিয়েছেন। তিনি কালামশাস্ত্র শিখেছিলেন আবুল কাসেম আল-ইসকাফ হতে, যা তিনি শিখেছিলেন আবু ইসহাক আসফারায়ীনী হতে। কিন্তু তাদের মাঝে কাযীই বেশি উত্তম। তিনি কাযীর পথ থেকে বেশ কিছু স্থানে মু'তাযিলাদের মতের দিকে চলে গিয়েছিলেন। আর তিনি আবুল হাসান আশ'আরীর কালাম থেকে তেমন কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি কেবল তার কথা বর্ণনা করতেন যেভাবে অন্য মানুষেরা বর্ণনা করে।' আস-সাব'ঈনিয়্যাহ, 'বুগইয়াতুল মুরতাদ', পৃ. ৪৫০।

তার ব্যাপারে যেটা প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে, তিনি আবুল হাসান আল আশ'আরীর মতবাদকে টেনে নিয়ে মু'তাযিলাদের নিকটবর্তী করে দিয়েছেন। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'আবুল মা'আলী অনেক জায়গায় আবুল হাসান আশ'আরীর মূলনীতির পরিবর্তন সাধন করেন, সেগুলোতে তিনি মু'তাযিলাদের মতবাদের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিলেন।' ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৫০৭)।

ইমাম যাহাবীর মতে আবুল মা'আলী হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন, অর্থাৎ কম জানতেন। তিনি বলেন, 'এ ইমাম তার অসাধারণ ধীশক্তি, মাযহাবের মূল ও শাখা-প্রশাখার জ্ঞানে ইমাম হওয়া, মুনাযারা বা বিতর্কে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও হাদীসকে যথাযথভাবে জানতেন না। মতনের দিক থেকেও নয়, সনদের দিক থেকেও নয়।' ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৪৭১)। বরং ইবন তাইমিয়্যাহ এটা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, 'হাদীসের ব্যাপারে তিনি এতই কম জানতেন যে এ ময়দানের সাধারণদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতাও তার ছিল না, বিশেষ লোক হওয়া তো দূরের কথা।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৭১)।

নিযামিয়্যাহ'(৯৭১) গ্রন্থে বলেন,

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ প্রায়ই তাকে বুদ্ধিমান, সাবধানী, উৎকৃষ্ট তর্কবাগীশ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করতেন। দেখুন, আস-সাফাদিয়্যাহ (১/২৯৪); দারউত তা'আরুদ্ব (১/১৫৮), (৩/৪৪৪), (৮/৩২১); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৯৪)।

আবু বকর ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ৫৪৩ হিজরী) তিনি আবুল মা'আলীর 'আশ-শামেল' গ্রন্থ দিয়ে খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন যখন তিনি মুসলিম বিশ্বের পূর্ব অঞ্চলে সফর করেছিলেন। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (২/১০২)।

ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, 'ফখরুদ্দীন আর-রাযীর আশ'আরী মতবাদ সংক্রান্ত যত কালামশাস্ত্রের জ্ঞান তা অর্জিত হয়েছিল আবুল মা'আলীর গ্রন্থ যেমন আল-ইরশাদ ও অনুরূপ গ্রন্থ থেকেই।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (২/১৫৯)।

বরং ইবন তাইমিয়্যাহ এটাও বলেছেন যে, 'আবুল মা'আলীর 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থটি পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের যাবুর গ্রন্থ নামে খ্যাত।' দেখুন, আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৬৪৫)।

'এই আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী, যারা কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহর 'সিফাতে খবরিয়াহ' যাবতীয় গুণাবলি সাব্যস্ত করতো (অর্থাৎ সালাফীদেরকে), তিনি তাদেরকে 'হাশাওয়িয়্যাহ' বলে খারাপ উপাধীতে অভিহিত করবেন।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/১২৮-১২৯); মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৮৮)।

মোটকথা: সে সময়ে চতুর্দিকে তার নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ফিকহের দিক থেকে শাফে'য়ী মাযহাবের লোক ছিলেন। কিন্তু উসূল তথা আকীদাহ'র মূলনীতির দিক থেকে আশ'আরীদের ইমাম বিবেচিত হতেন। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন যে, তিনি শেষ জীবনে সালাফে সালেহীনের মতাদর্শে ফিরে এসেছিলেন। তার থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছিলেন, "আমি যে কাজ করে এসেছি তা যদি আবার নতুন করে করার ক্ষমতা আমার থাকতো তবে আমি কখনো কালামশাস্ত্র চর্চা করতাম না।" তার থেকে আরও এসেছে, তিনি মৃত্যু শয্যায় বলেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি, আমি সুন্নাহ বিরোধী আমার যাবতীয় বক্তব্য থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম, আর আমি মারা যাচ্ছি নাইসাপুরের বুড়িদের আকীদাহ'র ওপর।" এ কিতাবের শুরুতে এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা চলে গেছে। তিনি জীবনের শেষ সময়ে মক্কার হারামের দিকে হিজরত করে যান। আর সেখানেই অবস্থান করেন, অবশেষে হিজরী ৪৭৮ সালে মারা যান। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে 'আল-ইরশাদ ফী উসূলিদ দীন, আশ-শামেল ফী উসূলিদ দীন, আল-বুরহান ফী উসূলিল ফিকহ, লুমা'উল আদিল্লাহ, আল-আক্বীদাতুন নিযামিয়্যাহ ইত্যাদি।

দেখুন, ইবন আসাকির, তাবয়ীনু কিযবিল মুফতারী, পৃ. ২৭৮; তারীখে বাগদাদের সংযুক্তি (১/৮৫); ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান (৩/১৬৭); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৪৬৮); ইবনুল 'ইমাদ, শাযরাতুয যাহাব (৩/৩৫৮)।

৯৭১. এটি তাঁর জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থ। এটি 'আর-রিসালাহ অথবা আল-আকীদাতুন নিযামিয়্যাহ ফিল আরকানিল ইসলামিয়্যাহ' এর একটি অংশ। এ কিতাবে শাফে'য়ী মাযহাবের ফিকহের বহু অধ্যায় স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের বর্ণনাকারীরা এ অংশকে আলাদা করে নিয়ে এ নাম দিয়েছে। যেমনটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনুল আরাবী ইমাম আবু হামেদ আল-গাযালী থেকে, আর তিনি জুওয়াইনী থেকে। দেখুন, আর-রিসালাতুন নিযামিয়্যাহ, পৃ. ৯৭; আল-ইমাম আল-জুওয়াইনী, ড. মুহাম্মাদ আয-যুহাইলী, পৃ. ১০৭।

পরবর্তীতে তা 'আল-আকীদাতুন নিযামিয়্যাহ' নামে মুহাম্মাদ যাহেদ কাউসারীর তাহক্বীকে ১৩৬৭ সালে মিসরের মাতবা'আতুল আনওয়ার থেকে ছাপা হয়েছে। তারপর আবার ড. আহমাদ আস-সাক্কা এর তাহক্বীকে ১৩৯৮ সালে মিসরের দারুস শাবাব ছাপা হয়েছে। তাতে যাহেদ কাউসারীর তাহক্বীক অবশিষ্ট রয়েছে।

গ্রন্থটির নাম 'আন-নিযামিয়্যাহ' রাখা হয়েছে বিখ্যাত মন্ত্রী নিযামুল মুলকের দিকে সম্পৃক্ত করে। তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন। লেখক সেটা গ্রন্থের শুরুতে বর্ণনা করেছেন। যার ফলে নিযামুল মুলক তাকে মাদরাসা নিযামিয়্যাতে নিযুক্ত করেন, আর তিনি সেখান থেকে আশ'আরী মতবাদ প্রচার প্রসারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। যাবীদী তার ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন গ্রন্থে (২/১১১) বলেছেন এ গ্রন্থটি জুওয়াইনী রচিত সর্বশেষ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

আবুল মা'আলীর এ গ্রন্থ থেকে বহু আলেম পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের কথা নিয়ে এসেছেন।

الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في آي الكتاب، وما يصح من السنن وذهب أئمة

এসব[৯৭২] যাহির (প্রকাশ্য অর্থজ্ঞাপক) শব্দগুলোর ব্যাপারে আলেমদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন, এগুলোর তা'ওয়ীল করা হবে[৯৭৩], ফলে সে যা কুরআন ও

যেমন,

১- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (২/১৮), (৩/৩৫৬, ৩৮১), (৫/২৪৯); আল-ইস্তেকামাহ (১/৪৪), (২/৯৭), মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৩৪৫), (১০/৬৯৫), (১২/২০৩), (১৬/৪০৮); আল-মুস্তাদরাক আলাল ফাতাওয়া (১/৮৫)।

২- ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (৪/২৪৬); ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৮৬; আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১৪৫৩); মাদারেজুস সালেকীন (২/৮৭); শিফাউল 'আলীল (২/৭৬৩, ৮৩৯)।

৩- ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৪৭৩); আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১৩৪০), নং ৫৩৬; আল-'আরশ, পৃ. ২৭৭; তাজউদ্দীন আস-সুবুকী, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ আল-কুবরা (৫/১৭২, ১৯১)।

এ গ্রন্থে জুওয়াইনীর মানহাজ ছিল, তিনি কুরআন ও সুন্নায় আসা আল্লাহর গুণাবলি তথা 'সিফাতে খবরিয়্যাহ'র ক্ষেত্রে তা'ওয়ীল করা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন। আর তা তার আর-রিসালাতুন নিযামিয়্যাহ, পৃ. ৩২-৩৩ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে তিনি 'আল-কুদরাতুল হাদেসাহ' নামক (সৃষ্টির কুদরত নতুন হওয়া সংক্রান্ত) মাসআলা থেকেও ফেরত এসেছিলেন এবং কর্ম হওয়ার ক্ষেত্রে তার প্রভাবের কথাও স্বীকার করেছিলেন, অথচ ইতোপূর্বে তিনি বলতেন যে, এর কোনো প্রভাব নেই।

তবে তিনি বেশ কিছু মাসআলায় আশ'আরী মতবাদের ওপরই আমরণ ছিলেন, যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে 'হুদূসুল আজসাম' এর মাসআলা, পৃ. ১৬; আল্লাহর বাণী এর মাসআলা, পৃ. ২৭-৩০; আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে সামনের বিপরীত ব্যতীত দেখার মাসআলা, পৃ. ৩৯। আর তিনি বেশ কিছু সিফাতের তা'ওয়ীলও করেছেন, যেমন ভালোবাসাকে ইচ্ছা করা দ্বারা অপব্যাখ্যা করা, পৃ. ৬১; আর তিনি ঈমানের দু'টি সংজ্ঞা দিয়েছেন, বিশ্বাস করা, পৃ. ৮৫, আর সালাফদের কথাও এনেছেন, পৃ. ৯০; তবে তিনি উভয় মতের মধ্য থেকে কোনোটিকেই প্রাধান্য দেননি। দেখুন, ড. আব্দুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ, মাওকিফু ইবন তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়িরাহ (২/৬২০-৬২১); ড. আহমাদ আলে আব্দুল লাতীফ, মানহাজু ইমামিল হারামাইন ফী দিরাসাতিল আকীদাহ, পৃ. ৩১৪; ড. আহমাদ আল-কাযী, মাযহাবু আহলিত তাফওয়ীদ্ব ফী নুসূসিস সিফাত, পৃ. ২১৮।

৯৭২. অর্থাৎ আল্লাহর সিফাত বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের শব্দসমূহ।

৯৭৩. এটি ছিল আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনীর প্রথম জীবনের মতাদর্শ। যেমনটি বুঝা যায় তার 'আশ-শামিল' গ্রন্থ থেকে, পৃ. ৫৪৩। এ কিতাবে তিনি তা'ওয়ীল এর জন্য দু'টি কাজ করার ওপর জোর দেন:

১- প্রকাশ্য অর্থ দূর করা।

২- উদ্দেশ্য নির্ধারণ।

এজন্য যে কেউ আল্লাহর জন্য 'জিহাত' বা 'দিক' হওয়া না করবে, সে তা'ওয়ীলের দু' অঙ্গের বড় অঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত করলো, আর তা হচ্ছে প্রকাশ্য অর্থ তিরোহিত করা। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর জন্য 'জিহাত' বা 'দিক' অস্বীকার করলো সে তো স্পষ্টভাবে 'ইস্তেওয়া' এর প্রকাশ্য অর্থ দূর করলো।

জুওয়াইনী বলেন, 'আর যদি তারা স্পষ্টভাবে আল্লাহর জন্য 'জিহাত' বা দিক সাব্যস্ত করা না করলো, তবে তো তারা আমাদের মতবাদের সাথে একাত্ম হলো আর তা'ওয়ীলের বড় অঙ্গটি স্বীকার করে নিল। কারণ যারা তা'ওয়ীল অস্বীকার করে তারা যে জিনিসটি থেকে সাবধান করে তা হচ্ছে প্রকাশ্য অর্থ বাদ দেয়া, আর যে ব্যক্তি দিক অস্বীকার করলো সে তো 'ইস্তেওয়া' এর প্রকাশ্য অর্থ দূর করলো, কিন্তু সে 'ইস্তেওয়া' শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে মুক্ত করার পর কোনো অর্থ নির্ধারণ করলো না, আর যারা তা'ওয়ীল করে তারা একটি অর্থ নির্ধারণ করে নেয়, সুতরাং যখন ব্যাপারটি এখানে এসে থামলো তখন উদ্দেশ্য সাধন অতি সহজ।' দেখুন, আশ-শামিল, পৃ. ৫১২।

যেসব কারণে আবুল মা'আলীর কাছে তা'ওয়ীল বা আল্লাহর গুণাবলির অপব্যাখ্যা করতে হবে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেছেন তা দু'টি:

السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب.

সহীহ সুন্নাহ'তে বর্ণিত হয়েছে তাতে উক্ত তাওয়ীল নীতিই অবলম্বন করেছে। তবে সালাফ ইমামগণ এগুলোর তা'ওয়ীল করা থেকে বিরত থাকার পক্ষে মত দিয়ে এর যাহিরগুলোকে যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দেয়ার কথা বলেছেন, আর তার উদ্দেশ্য আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।[৯৭৪]

১- এ দাবি তোলা যে, এসব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ আক্বলী বা বিবেকের যুক্তির সাথে বিরোধ করছে। সেজন্যই তিনি আল্লাহর বাণী, "তিনি বললেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সাজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন'?" [সূরা স্বদ: ৭৫] এখানে আসা 'ইয়াদ' শব্দটির তা'ওয়ীল করেছেন। তিনি সেটাকে তা'ওয়ীল করে কুদরত তথা 'ক্ষমতা' এর অর্থে নিয়ে গেছেন। এ দাবি করে যে বিবেক প্রমাণ করেছে, সৃষ্টি করতে হলে ক্ষমতার প্রয়োজন পড়ে। দেখুন, আল-ইরশাদ, পৃ. ১৫৬।

২- এ দাবি করা যে, এ আয়াতসমূহ ও কুরআন হাদীসের অন্যান্য দলীলের মাঝে বিরোধ আছে। যেমন আল্লাহর বাণী "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।" [সূরা আল-আন'আম: ১০৩] আয়াতকে তা'ওয়ীল করা হয়েছে এ কারণে যে, অন্য আয়াত এর বিরোধী হয়েছে, আর সেটা হচ্ছে, "সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২-২৩] দেখুন, আল-ইরশাদ, পৃ. ১৮২।

আবুল মা'আলীর পক্ষ থেকে তা'ওয়ীল করার কারণ হিসেবে যে দু'টি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে তা একেবারেই ঠুনকো। প্রথম কারণটি সবচেয়ে বেশি হাস্যকর। কারণ ক্ষমতা লাগলেই সেখানে 'হাত' থাকতে পারবে না এমনটি কোনো যুক্তিই নয়। ক্ষমতাও আছে তার অতিরিক্ত হাতও আল্লাহ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং সমস্যা কোথায়?

আর দ্বিতীয় কারণটি মূল সমস্যা না বুঝার কারণে হয়েছে। আমাদের নিকট কখনও কুরআন ও হাদীসের বাণীর মধ্যে স্ব-বিরোধিতা নেই। বুঝের অভাবে অনেক সময় তা মনে হয়। এখানে সূরা আল-আন'আম এর আয়াতে আয়ত্ব করতে পারবে না বলা হয়েছে, দেখাকে নিষেধ করার হয়নি। কিন্তু সূরা আল-কিয়ামাহ এর আয়াতদ্বয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং কোনো বিরোধ নেই। আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী কীভাবে প্রকাশ্য অর্থের তা'ওয়ীল করতো তা জানতে দেখুন, ড. আহমাদ আলে আব্দুল লতীফ, মানহাজু ইমামিল হারামাইন ফী দিরাসাতিল আকীদাহ, পৃ. ২৬৫-৩০৫।

৯৭৪. বস্তুত এটি সালাফদের মত নয়। কোনো সালাফ এ মতের ওপর ছিলেন না। এটি মুফাওয়িদ্বাহ বা 'আল্লাহর কিছু গুণের ক্ষেত্রে অর্থ না জানা' নীতি অবলম্বনকারীদের নীতি। ইমামুল হারামাইন সর্বশেষ এ মতে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। যেমনটি তার 'আর-রিসালাতুন নিযামিয়্যাহ' গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট। তিনি তার অন্যান্য গ্রন্থে তা'ওয়ীলের প্রতি জোর দিলেও এ গ্রন্থ, যা তার জীবনের শেষাংশে লিখেছেন, এখানে এসে তিনি তাফওয়ীদ্ব নীতির দিকে চলে যান। তিনি মনে করেছিলেন এটাই সালাফদের মতাদর্শ। তার ওপর ভিত্তি করে তিনি এ গ্রন্থে আল্লাহর যাবতীয় সিফাতে খবরিয়্যাহ বা কুরআন ও হাদীসে আসা গুণাবলির কোনোরূপ তা'ওয়ীল করতে মানা করেন। এ পর্যায়ে এসে তিনি তা'ওয়ীলকে বিদ'আত মনে করতেন, যা সালাফগণ করেননি। কিন্তু সাথে সাথে তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে, সালাফে সালেহীন তথা হক্বপন্থীরা এর অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝাও নিষেধ মনে করতেন। সেজন্য তিনি মত দেন যে, এসব আয়াতে যেসব গুণাবলির কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ বুঝার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করতে হবে। এ ধারণা করে যে, সাহাবায়ে কিরাম এগুলোর অর্থ না বুঝে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে দিতেন, এ বিশ্বাসে যে, সালাফগণ এগুলোর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর এ কথার ওপর দলীল হিসাবে এ তাফওয়ীদ্ব নীতির ওপর তথাকথিত সালাফের ইজমা' হয়েছে দাবি করেন। আরও বলেন যে, সিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ 'মুতাশাবিহ' এর অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু তার নিকট মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ জানা যায়না তাই সূরা আলে ইমরানে আসা ﴿وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ﴾ [آل عمران: ٧] "অথচ আল্লাহ ছাড়া

قال: والذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقدًا: اتّباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة.

وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودَرْك ما فيها

তিনি বলেন, আমরা যে মতে সন্তুষ্ট আর আকীদাহ হিসেবে আল্লাহর দীনের প্রতি আনুগত্য পোষণ করি, তা হলো উম্মতের সালাফদের অনুসরণ করা। এ ব্যাপারে অকাট্য শ্রুত দলীল হচ্ছে উম্মতের ইজমা', যেটা অনুসরণকৃত প্রমাণ, আর তা অধিকাংশ শর'য়ী বিষেয়ের ভিত্তিও।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তার প্রকৃত অর্থ[৯৭৫] ও

অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।" [সূরা আলে ইমরান: ০৭] তাঁর নিকট আয়াতে 'ইল্লাল্লাহ' কথার ওপর থামতে হবে, এখানে থামা বাধ্যতামূলক। তারপর ﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ﴾ থেকে নতুন করে পড়া শুরু করতে হবে। তাছাড়া তিনি ইমাম মালেক থেকে আসা 'ইস্তেওয়া' জানা, তার ধরণ অজানা' সে বিখ্যাত আছার দিয়েও দলীল গ্রহণ করেছেন। দেখুন, আর-রিসালাতুন নিযামিয়্যাহ, পৃ. ৩২; ড. আহমাদ আলে আব্দুল লতীফ, মানহাজু ইমামিল হারামাইন ফী দিরাসাতিল আকীদাহ, পৃ. ৩১৮।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমামুল হারামাইন তাফওয়ীদ্ব এর পক্ষে তিনটি দলীল দিয়েছেন। অথচ তার কোনোটিই সঠিকভাবে তিনি পেশ করতে পারেননি। কারণ,

এক. সাহাবায়ে কিরাম এগুলোর অর্থ বুঝতেন। এগুলোর অর্থ না বুঝলে সববে নুযূল কীভাবে সার্থক হবে?

দুই. কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াত দিয়ে দলীল নেয়া যাবে না; কেননা

ক. সিফাতের আয়াতসমূহকে সালাফদের কেউ কোনো দিন মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত বলেননি। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইকলীল ফিল মুতাশাবাহ ওয়াত তা'ওয়ীল, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/২৯৪-২৯৫)।

খ. এ আয়াতে অর্থ ভেদে উভয় জায়গাতেই থামা যাবে, 'ইল্লাল্লাহ' এর পরে ও 'আল-ইলম' এর পরে। উভয় প্রকার ওয়াক্বফই শুদ্ধ; তা'ওয়ীল যদি তাফসীর অর্থে হয় তবে 'ওয়ার রাসিখূনা ফিল ইলমে' এর পরে থামবে। আর যদি তাওয়ীল অর্থ প্রকৃত অবস্থা হয় তবে 'ইল্লাল্লাহ' এর পরে থামতে হবে।

তিন. আর ইমাম মালেকের এ 'আছার' মোটেই তার দাবির পক্ষে দলীল নয়, বরং তার বিপক্ষে, কারণ 'ইস্তেওয়া' তো অজানা নয়, ধরণ বিবেক ধারণ করতে পারে না।' এর দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, এগুলোর অর্থ সালাফগণ জানতেন ও করতেন। সুতরাং আবুল মা'আলীর সকল দাবি অসার প্রমাণিত হলো।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবুল মা'আলী ও তার অনুসারীরা এসব সিফাতে খবরিয়্যাহ সাব্যস্ত করা না করে দিয়েছে মু'তাযিলা ও জাহমিয়্যাদের সাথে একাত্ম হয়ে। তারপর এতে তাদের দু'টি বক্তব্য রয়েছে, এক. এসব ভাষ্যকে তা'ওয়ীল করতে হবে। যা ছিল আবুল মা'আলীর প্রথম মত, যেমনটি আল-ইরশাদ গ্রন্থে এসেছে। দুই. তাফওয়ীদ্ব বা অর্থ না করে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করা। এটি আবুল মা'আলীর সর্বশেষ মত। যেমনটি তিনি তার আর-রিসালাতুন নিযামিয়্যাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তাও উল্লেখ করেছেন যা প্রমাণ করবে যে সালাফে সালেহীন একমত ছিলেন যে, তাও'য়ীল অগ্রহণযোগ্য আর তা আবশ্যকও নয়।' ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাক্বলি (৫/২৪৯)।

সম্ভবত প্রথম যারা সালাফে সালেহীনের দিকে আল্লাহ তা'আলার সিফাতের আয়াতসমূহে তাফওয়ীদ্ব নীতিকে সম্পৃক্ত করেছে তাদের মধ্যে আবুল মা'আলী অন্যতম। দেখুন, ড. আহমাদ আল-কাযী, মাযহাবু আহলিত তাফওয়ীদ্ব ফী নুসূসিস সিফাত, পৃ. ২২৬।

৯৭৫. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম সিফাত সংক্রান্ত এসব ভাষ্যের 'ধরণ' উদ্ঘাটনে লিপ্ত হননি। এটা নয় যে, তারা এসব ভাষ্য শুধু এমনভাবে শুনতেন ও পড়তেন যেন তারা কোনো অনারব ভাষার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কখনো তা নয়। তারা অবশ্যই তা বুঝতেন ও

وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة، والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر

উদ্দেশ্যের পিছনে লাগা পরিত্যাগ করেছিলেন, তারাই তো ইসলামের উৎকৃষ্ট প্রজন্ম, আর তারাই তো শরী'আতের ভারবাহী গোষ্ঠী, তারা উম্মতের আদর্শগত মূলনীতি নির্ধারণে ও তা সংরক্ষণের ব্যাপারে পরস্পর অসিয়তকরণে এবং মানুষদেরকে তা থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদানে কোনো ত্রুটি করেননি। কাজেই যদি এসব যাহিরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বৈধ হতো

অনুধাবণ করতেন আল্লাহ তা'আলা সাম' (শোনা) বা 'বাসার' (দেখা) বলতে কী বুঝিয়েছেন। তারা অবশ্যই বুঝতেন মাজী' (আগমন) এর অর্থ কী? তারা অবশ্যই বুঝতেন নুযুল (অবতরণ) এর অর্থ কী? বস্তুত এগুলো যে কোনো সাধারণ আরবও বুঝতে পারে, তাই তা সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই বুঝতে পারতেন। আর তারা বুঝতে পারতেন যে, একটি শব্দ আরেকটি শব্দের অর্থে নয়। তারা সবগুলোকে একই জিনিস মনে করতেন না। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, আবু রাযীন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন 'আমাদের রব তাঁর বান্দার নিরাশ হওয়া.... দেখে হাসেন। এটা শুনে আবু রাযীন বললেন, আমাদের রব্ব কী হাসেন? তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তখন আবু রাযীন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, যে রব্ব হাসেন তাঁর কোনো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবো না।' [ইবন মাজাহ ১৮১]

চিন্তা করে দেখুন, সাহাবী তার ফিত্বরত তথা স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়েই 'দ্বাহেক' অর্থ হাসা বুঝলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ বুঝের নিন্দা করেননি। ঠিক কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে আসা সিফাত সংক্রান্ত নসসমূহের ব্যাপারে সকল সাহাবী তেমনি বুঝতেন।

তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম তাবে'য়ীদের কাছে কুরআনের তাফসীর করেছেন। যেমন,

মুজাহিদ বলেন, 'আমি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার কাছে কুরআনে কারীমকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা পেশ করেছি, এর প্রতিটি আয়াতের কাছে তাকে দাঁড় করাতাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করতাম।' এজন্য সুফইয়ান আস-সাওরী বলতেন, যদি তোমার কাছে মুজাহিদ থেকে কোনো তাফসীর আসে তবে সেটা তোমার জন্য যথেষ্ট।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন, 'যদি আমি জানতাম যে কেউ আমার থেকেও আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে বেশি জানে আর সেখানে উটে চড়ে যাওয়া সম্ভব তবে আমি অবশ্যই তার কাছে যেতাম।'

আর আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমের ছাত্রদের প্রতিজন থেকে এত বেশি পরিমাণ লোক তাফসীর গ্রহণ করেছেন যে যার সংখ্যা কেবল আল্লাহই জানেন। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীনে 'ইযাম থেকে এত বেশি বর্ণনা সাব্যস্ত হয়েছে যা আলেমগণ সকলেই জানেন।' দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-কা'য়িদাতুল মারাকেশিয়্যাহ, পৃ. ৩৬-৩৭।

ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র বলেন, 'সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীগণ পুরো কুরআনের তাফসীর করেছেন। আর তারা বলতেন, আলেমগণ কুরআনের তাফসীর জানে আর তারা তাও জানে যা এর দ্বারা উদ্দেশ্য। যদিও তারা জানে না আল্লাহ তা'আলা যা তার নিজের সম্পর্কে জানিয়েছেন সেটার ধরণ। যেমনিভাবে তারা গায়েবী বিষয়সমূহের ধরণ জানেন না।

কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের জন্য এমনসব নি'আমত প্রস্তুত করে রেখেছেন যা কোনো চোখ দেখেনি, যা কোনো কান শুনেনি, আর না কোনো মানুষের অন্তরে তা উদিত হয়েছে। সুতরাং এই যে বিষয়গুলোর কথা বলা হলো তা কেবল আল্লাহই জানেন। সুতরাং সালাফদের মধ্যে যদি কেউ বলে থাকে যে মুতাশাবিহাত এর ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহই জানেন তবে তা এ অর্থে সঠিক।

কিন্তু যে কেউ বলবে, কুরআনের আয়াতসমূহের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা, আয়াত দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, এমন কথা তো সকল সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ীনে ইযামের কর্মকাণ্ডের বিরোধী কথা, সে এ কথার মাধ্যমে তাদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেছে; কেননা তারা পুরো কুরআনের তাফসীর করেছেন। এজন্য তারা কুরআনকে দীনের জন্য প্রয়োজন সকল জ্ঞানসমৃদ্ধ বলে মনে করতেন।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (১/২০৭-২০৮)।

مسوغًا أو محتومًا: لأوشكَ أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المُحدَثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويَكِلُ معناه إلى الرب؛ فليجر آية الاستواء والمجيء وقوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥]، ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن:٢٧]، وقوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر:١٤]، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا».

[ليس كل من حكى الشيخ قوله هنا يقول بجميع ما يقول به أهل السنة]:

قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب

বা আবশ্যক হতো তাহলে শরী'আতের শাখা বিষয়ের গুরুত্বের ওপর এগুলোকে তারা বেশি গুরুত্ব দিতেন।(৯৭৬) সুতরাং সাহাবী ও তাবে'য়ীদের যুগ যখন এগুলোর তা'ওয়ীল পরিত্যাগ অবস্থায় কেটে গেল, তখন ওটাই অনুসৃত পদ্ধতি। তাই যার কাছে দীনদারী আছে তার দায়িত্ব হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তাকে 'মুহদাস' অপ্রাচীনত্বের গুণাবলি থেকে মুক্ত রাখা। মুশকিল বা সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের তা'ওয়ীল বা ব্যাখ্যায় লিপ্ত না হওয়া, বরং তার মর্ম ও উদ্দেশ্য আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া।(৯৭৭) তাই ইস্তেওয়া এর আয়াত, তাঁর আগমন এর আয়াত, ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ "যা আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি" এই বাণী, ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা- যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।" এই বাণী, ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ﴾ "আমাদের চোখের সামনে তা চলছে" এই বাণী, এবং সহীহ সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত; যেমন অবতীর্ণ হওয়ার হাদীস ইত্যাদিকে যেভাবে আমরা বর্ণনা করেছি সেভাবে চালিয়ে দেয়া হবে।(৯৭৮)

[ইমামুল হারামাইন যা যা এখানে বলেছে সেসব আহলুস সুন্নাতের কথা নয়]

আমি [ইবন তাইমিয়্যাহ] বলি: প্রশ্নকারীর জানা উচিত যে, [ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী ও তার মতো লোকদের থেকে উদ্ধৃত] এই জবাব(৯৭৯) [এখানে উল্লেখ করা দ্বারা] উদ্দেশ্য ঐসব আলেমদের কতিপয় বক্তব্য উল্লেখ করা, যারা এ

---

৯৭৬. সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই কুরআনের প্রকাশ্য অর্থই বুঝতেন। তারা এগুলো গুরুত্বসহকারে তাবে'য়ীগণকে শিখিয়েছেন। কুরআনের এমন কোনো আয়াত নেই যার তাফসীর হয়নি। সুতরাং আবুল মা'আলীর কথা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

৯৭৭. অবশ্যই এ কথাটি প্রকাশ্য ভুল। কারণ আল্লাহর যাবতীয় সিফাতের অর্থ জানা রয়েছে। শুধু ধরণ জানা নেই। এর দ্বারা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আবুল মা'আলী 'আহলুত তাজহীল' বা তাফওয়ীদ্ব নীতির অনুসারীদের একজন। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৫/২৪৮)।

৯৭৮. আল-জুওয়াইনী, আর-রিসালাতুন নিযামিয়্যাহ, পৃ. ৩২-৩৪; তাহকীক, আহমাদ আস-সাক্কা। বস্তুত এ নীতিটি ভুল। ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তী আশ'আরীরা এ ভুলকেই আঁকড়ে ধরে আছে।

৯৭৯. অর্থাৎ এ পুস্তিকার শুরুতে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তরে উদ্ধৃত এ জবাব। বস্তুত পুরো গ্রন্থটিই উক্ত প্রশ্নের উত্তর।

السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئًا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره؛ ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به؛ وكان معاذ بن جبل يقول في

অধ্যায়ে সালাফে সালেহীনের মত সংকলন করেছেন।[৯৮০] আর আমরা কালামপন্থী ও অন্যান্যদের যে কথাগুলো এখানে উদ্ধৃত করেছি, এ অধ্যায় ও অন্যান্য অধ্যায়ে আমরা যা যা বলি তারা সেসব বলেনি।[৯৮১] তবে সত্য যেই বলুক তার থেকে গ্রহণ করা

---

৯৮০. এখানে দু'টি বিষয় বলা আবশ্যক তা হচ্ছে,

এক. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক একদল সূফী ও কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্য উল্লেখ করার অর্থ এটা নয় যে, সালাফে সালেহীনের ইমামগণ তথা সাহাবা, তাবে'য়ীন ও তাদের পরে যারা তাদের মত হক্কের ওপর ছিল তাদের এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য নেই। বরং হক হচ্ছে সেটাই যার ওপর সালাফগণ অবস্থান করেছিলেন। ইবন তাইমিয়্যাহ এখানে যে মাসআলার অবতারণাই করেছেন তাতে সালাফে সালেহীনের নিকট থেকে বহুগুণ বেশি প্রকাশ্য বর্ণনা ও দলীল রয়েছে। কিন্তু ইবন তাইমিয়্যাহ'র উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনুসারীদেরকে তাদের ইমামরা হক্কের যে অংশের ওপর ছিল তা জানিয়ে দিয়ে সেটা মানতে বাধ্য করা।

দুই. এসব তর্কবাগীশ, শাইখ, উস্তাদ প্রমুখ লোকদের থেকে এখানে যেসব বক্তব্যের মাধ্যমে দলীল-প্রমাণাদি নিয়ে আসা হয়েছে, কুরআন ও সুন্নাহ'য় সেসবের আরও অনেক এমনসব দলীল ও প্রমাণ রয়েছে যা তাদের বক্তব্য থেকে বড় ও সুন্দর। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়টির তাগিদ দিয়ে বলেন, 'কুরআনে কারীমে দীনের এমনসব মূলনীতির বর্ণনা রয়েছে যার ভূমিকাসমূহ স্পষ্ট বিবেকের যুক্তির মাধ্যমে জানা যায়, যা কোনো মানুষের কথায় পাওয়া যায় না। বরং অত্যন্ত দক্ষ তর্কবাগীশরা যেসব বিবেকের যুক্তির দলীল নিয়ে আসে কুরআন সেগুলোর সারাংশ সমৃদ্ধ বরং সেগুলো থেকে আরও সুন্দর। দলীল প্রমাণে ঋদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, "আর তারা আপনার কাছে যে বিষয়ই উপস্থিত করে না কেন, আমরা সেটার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনার কাছে নিয়ে আসি।" [সূরা আল-ফুরকান ৩৩] আরও বলেন, "আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। আর আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে যারা কুফরী করেছে তারা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো বাতিলপন্থী'।" [সূরা আর-রূম: ৫৮] আরও বলেন, "যদি আমরা এ কুরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে আপনি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত বিদীর্ণ দেখতেন। আর আমরা এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।" [সূরা আল-হাশর: ২১] মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/৮১); আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৯/১৬৯)।

তিনি অন্যত্র বলেন, বিবেকের যুক্তিবিদ দাবিদারদের কাছে আল্লাহর বিষয়ে যেসব দৃঢ় প্রমাণাদি ও জ্ঞান রয়েছে তার সারাংশ অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ'য় রয়েছে। এর বাইরে কুরআন ও সুন্নাহ'য় এ ব্যাপারে বাড়তি ও পূর্ণতা প্রদানকারী বহু প্রমাণাদি রয়েছে যার দিশা সেসব লোকেরা পায়নি, কেবল তারাই পেয়েছে যাদেরকে তিনি তাঁর সম্বোধন গ্রহণ করার মাধ্যমে হিদায়াত প্রদান করে ধন্য করেছেন। ফলে রাসূল যেসব যুক্তিগত দলীল ও দৃঢ় জ্ঞান নিয়ে এসেছেন তা আগের ও পরের সকল বুদ্ধিজীবীদের সকল বুদ্ধির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল।' ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১১০)।

৯৮১. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলুশ শাইখ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, ইবনে তাইমিয়্যাহ তাদের থেকে তাদের কিছু আকীদাহ বর্ণনা করেছেন মাত্র, এর অর্থ এটা নয় যে, তাদের প্রত্যেকেই এসব অধ্যায়ে পুরোপুরি সঠিক পথে ছিলেন।" [ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (১/২১১)] বস্তুত এ ফতোয়ার মাধ্যমে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা প্রকাশ পেয়েছে, যার কারণে তার গ্রন্থসমূহ সবচেয়ে বেশি উপকারী ও মর্যাদাপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'যদি কারও ইলম থাকে আর তার সাথে উত্তম বিতর্ক যুক্ত হয় তবে সেটার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে উঁচু স্তরে উড্ডীন করেন।' ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৪৯২)।

এখানেও শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর জন্য উলু ও ইস্তেওয়া তথা সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া ও তাঁর 'আরশের উপর উঠা এ গুণ দু'টির ব্যাপারে এবং সিফাতে খাবারিয়্যাহ (কুরআন

كلامه المشهور عنه، الذي رواه أبو داود في سننه: «اقبلوا الحق من كل مَنْ جاء به؛ وإن كان كافرًا. أو قال فاجرًا. واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورًا» أو قال كلامًا هذا معناه.

যাবে।(৯৮২) মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তার সে বিখ্যাত বক্তব্যে বলতেন, যেটি আবু দাউদে তার সুনানে নিয়ে এসেছেন,

«اقبلوا الحق من كل مَنْ جاء به؛ وإن كان كافرًا - أو قال فاجرًا - واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورًا»

"সত্য যেই নিয়ে আসুক তা গ্রহণ করো। যদিও সে কাফের হয়" বা তিনি বলেছেন "পাপি হয়" আর বিজ্ঞের পদস্খলন থেকে সতর্ক থাকো। তারা বলল: আমরা কীভাবে জানবো যে, কাফের সত্য বলেছে? তিনি বললেন: নিশ্চয় সত্যের ওপর নূর আছে।"(৯৮৩) অথবা এ

ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহর যাবতীয় গুণ) এর ব্যাপারে কালামশাস্ত্রবিদদের পূর্ববর্তী ও তাদের মতো লোকদের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন আর এগুলো দিয়ে তাদের পরবর্তীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তা মানতো, তোমাদেরও তা মানা উচিত। তবে তিনি সে সব পূর্ববর্তীদের বক্তব্যের বিস্তারিত অংশের সমালোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু একেবারে পুরোপুরি চুপ থাকেননি। বরং বলেছেন, 'কালামশাস্ত্রবিদরা যা যা বলেছে সেগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করলেও আমাদের সব কথা তারা বলেনি'। কারণ পুরোপুরি তাদের সব কথার সমালোচনা করতে নামলে তাদের কথা দিয়ে দলীল নিয়ে তাদেরই আরেক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পেশ করার কাজটি ব্যাহত হতো; প্রমাণটি দুর্বল হয়ে যেতো। এর বিপরীতে ইবন তাইময়্যাহ তার একাধিক কিতাবে পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদ যেমন, রাযী, আমেদী প্রমুখের বক্তব্য তুলে ধরেছেন যাতে তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কথার সমালোচনা করেছেন; যার মাধ্যমে পরবর্তীরা আল্লাহর সিফাতে ইখতিয়ারিয়্যাহ বা যখন যা ইচ্ছা করার গুণগুলো অস্বীকার করেছিল। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/২৪); দারউত তা'আরুদ্ব (২/২১০); আব্দুররহমান আলে মাহমূদ, মাওকিফু ইবন তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়িরাহ (৩/১২১১)।

৯৮২. কিছু আগেই আমরা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র বক্তব্য এনেছি, যাতে তিনি পরবর্তী আশ'আরী মতবাদের লোকদের ওপর দোষারোপ করেছেন যে, তারা তাদের ইমামদের থেকে হক্ক কথা হলেও তা গ্রহণ করে না, অন্য কারও কাছ থেকে হক্ক তাদের জানানো হলে তা তো গ্রহণ করেই না। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে তাদের এ কাজকে ইয়াহূদীর কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন; কারণ ইয়াহূদীরাও তাদের কিতাব থেকে হক্ক গ্রহণ করে না, অন্যদের কিতাব থেকে তো গ্রহণই করে না।

৯৮৩. এ আছারটি সুনান আবী দাউদে এসেছে (৫/১৭-১৮), হাদীস নং ৪৬১১। কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু লুযূমিস সুন্নাহ। হাদীসটিকে শাইখ আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী মাওকুফ সহীহ বলেছেন।
এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, ইবন শিহাব আয-যুহরী বলেন, আবু ইদরীস 'আয়েয উল্লাহ আল-খাওলানী বলেন, ইয়াযীদ ইবন উমাইরাহ, যিনি মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু যখনই কোনো ইলমী মজলিসে বসতেন তখনই বসার সময় বলতেন, আল্লাহ, তিনি মহান বিচারক, ইনসাফকারী, সন্দেহকারীদের ধ্বংস হোক। অতঃপর একদিন মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, 'তোমাদের সামনের দিনগুলোতে ফিতনার অভ্যুদয় হবে, আর তাতে সম্পদ অনেক বেশি হবে। আর কুরআনও সর্বত্র প্রচারিত ও প্রসারিত হবে, তখন তা মুমিন-মুনাফিক, পুরুষ-মহিলা, ছোট-বড়, দাস-স্বাধীন সবাই গ্রহণ করবে। তখন কোনো বক্তা অচিরেই বলে বসবে, মানুষের কী হলো, মানুষ তো আমার অনুসরণ করছে না, অথচ আমি কুরআন পাঠ করেছি? মানুষ তো আমার অনুসরণ করবে বলে মনে হচ্ছে না, যতক্ষণ না আমি তাদের জন্য এর বাইরে কিছু বিদ'আতের প্রচলন না ঘটাব। তখন তোমরা সাবধান থাকবে সে

[الفتوى لا تتسع لعرض الشبه والآراء والرد عليها]:

فأما تقرير ذلك بالدليل، وإماطة ما يعرض من الشبه، وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامِهِ، فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئًا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما

জাতীয় কথা বলেছেন।"

[এ সংক্ষিপ্ত ফতোয়ায় সব রকমের সন্দেহ, মতামত ও সেগুলোর খণ্ডন করার স্থান সংকুলান হবে না]

অনন্তর তা দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করা এবং সংশয় মিটিয়ে দেয়া এবং বিষয়টি মনোপুতভাবে বিশ্লেষণ করা, যাতে ইয়াকিন সৃষ্টি হয় এবং এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত স্থির হয়, এ ফাতওয়ায় তার স্থান সংকুলান হবে না। তবে ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আমি লিখেছি, আমাদের মজলিসে বক্তৃতা করেছি। ইনশা-আল্লাহ হয়তো আমি এ ব্যাপারে উদ্দেশ্য হাসিল

যেসব বিদ'আত চালু করবে তা সম্পর্কে। কারণ সে যে বিদ'আত চালু করবে তা হবে পথভ্রষ্টতা। আর আমি তোমাদেরকে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞজনের বক্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার ব্যাপারে সাবধান করছি; কারণ শয়তান কখনো কখনো বিজ্ঞজনের মুখ থেকে পথভ্রষ্টতার বাক্য বের করে, আবার কখনো কখনো মুনাফিকও হক্ক কথা বলে। ইয়াযীদ ইবন উমাইরাহ বলেন, আমি তখন মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত করুন, আমাকে কিসে জানাবে যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি পথভ্রষ্টতার কথা বলেছে আর মুনাফিকটি হক্ক কথা বলেছে? তখন তিনি বললেন, অবশ্যই জানতে পারবে, প্রাজ্ঞজনের বিখ্যাত সেসব কথা পরিত্যাগ কর যেগুলো সম্পর্কে বলা হয়, এটা তিনি কী বললেন, তবে তার থেকে এ কারণে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিও না; কারণ হতে পারে তিনি ফিরে আসবেন। আর যখন হক্ক কথা শুনবে তখন সেটা গ্রহণ করে নিবে; কারণ হক্কের উপর নূর বা আলো রয়েছে।

আছারটি আরও যারা যারা সংকলন করেছেন,

১- হাকেম তার মুস্তাদরাকে সংকলন করেছেন (৪/৪৬৬); আর বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে, যদিও তারা এটিকে সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবী এ বিষয়ে হাকেম এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।
২- ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (১১/৩৬৩-৩৬৪), নং ২০৭৫০।
৩- আজুররী, আশ-শরী'আহ, পৃ. ৪৭-৪৮।
৪- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/৮৮-৮৯), নং ১১৬।
৫- আবু নু'আইম আল-হিলইয়া (১/২৩২-২৩৩)।
৬- ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (১/৩০৭-৩০৮)।
৭- আল-ফাসাওয়ী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত-তারীখ (২/৩২১-৩২২)।
৮- বাইহাক্বী, আল-মাদখালু ইলাস সুনানিল কুবরা, পৃ. ৪৪৪, নং ৮৩৪।
৯- ফিরইয়াবী, সিফাতুন নিফাক্ব ও যাম্মুল মুনাফিক্বীন, পৃ. ৮১-৮২, নং ৩৯।
১০- মা'মার ইবন রাশেদ, আল-জামে'উ (১১/৩৬৩), নং ২০৭৫০।
১১- ইবন মান্দাহ, আত-তাওহীদ (২/১১০)।
১২- আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (১/২৩৩)।
১৩- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (১/২০০), নং ১৩৫।
১৪- বাইহাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা (১০/৩৫৫), নং ২০৯১৬।
১৫- বাইহাক্বী, শু'আবুল ঈমান (১১/৩১২), নং ৮৫৮১।
১৬- ইবন আব্দিল বার, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়াফাদ্বলিহী (২/৯৮১), নং ১৮৭১।
১৭- ইমাম ত্বাহাওয়ী, শারহু মুশকিলুল আছার (১০/৩৮), নং ৩৮৯৫।

أكتب. إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به.

[الكتاب والسنة فيهما النور والهدى]:

وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في أسماء الله وآياته.

হয় তেমন লেখা লিখব।[৯৮৪]

[কুরআন ও সুন্নাহ এ দু'টিতেই রয়েছে নূর ও হিদায়াত]

এ ব্যাপারে মোটকথা হচ্ছে, নিশ্চয় কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা পূর্ণ হিদায়াত ও নূর অর্জিত হয় তার জন্য যে কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে, সত্য অনুসরণের সংকল্প করে, কথাকে তার স্থান থেকে বিকৃত করা থেকে ফিরে থাকে[৯৮৫], আল্লাহর নাম ও তাঁর আয়াতে ইলহাদ বা বা অস্বীকার করার ধর্মহীনতার মাধ্যমে পরিবর্তন করা থেকে দূরে থাকে[৯৮৬]।

---

৯৮৪. আল্লাহ তা'আলা ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর এ আশা বাস্তবায়ন করেছেন, এ ব্যাপারে তিনি একাধিক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, যেমন,
১- জাওয়াবুল ই'তিরাদ্বাতিল মিসরিয়্যাহ আলাল ফুতইয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ।
২- বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ। ইত্যাদি।
দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৬-৭)।

৯৮৫. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য থেকে উপকৃত হতে হলে, তা দ্বারা হিদায়াত ও আলোতে উদ্ভাসিত হতে হলে তাকে অবশ্যই দু'টি জিনিস রাখতে হবে:
১- ফিকহ, গভীর চিন্তা, ইলম।
২- সৎ নিয়্যত, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য, বিকৃতি করা থেকে বিমুখ থাকা, আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহে ইলহাদমুক্ত থাকা।
বস্তুত এ দু'টির মাধ্যমেই 'আহলুত তাজহীল' বা যারা আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসকে অর্থশূন্য করে তাদের নীতি, অনুরূপ আহলুত তাখয়ীল বা যারা আল্লাহর সিফাতগুলোকে শুধু ধারণা করা বিষয় মনে করে তাদের নীতি, তদ্রূপ আহলুত তা'ওয়ীল আল-মাযমূম, যারা আল্লাহর সিফাতগুলোর অপব্যাখ্যা করে, তাদের খপ্পর থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে।
অন্যত্র ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,'উসূলুদ্দীন বা আকীদাহ'র যাবতীয় অধ্যায়ে কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর বাণী, রাসূলের বাণী ও উম্মতের ইজমা' দ্বারা যা সাব্যস্ত হবে সেটাকে সুদৃঢ় ভাষ্য হিসেবে গ্রহণ করা।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/২৯৪)।
তিনি আরও বলেন, 'দীনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় দলীল প্রদান ও মাসআলা উদ্ঘাটনে কুরআনের বাতলানো পদ্ধতি সর্বোত্তম পদ্ধতি।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২/৮)।
তিনি আরও বলেন, 'দীনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় কুরআনকে ইমাম বা নেতা হিসেবে গ্রহণ করে অনুসরণ করাই হচ্ছে দীনে ইসলাম। এটিই হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম, তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীনে 'ইযাম ও মুসলিমগণের প্রখ্যাত ইমামগণের পদ্ধতি। তারা কখনো কারও কাছ থেকে কোনো বিবেকের যুক্তি কিংবা স্বাধীন মতকে কুরআনের বিপরীতে দাঁড় করাতেন না। হ্যাঁ, কোনো মানুষের কাছে সংশয় দেখা দিলে তিনি প্রশ্ন করে জেনে নিবেন, যাতে তার সন্দেহ তিরোহিত হয়। আর এজন্যই চার ইমাম ও অন্যান্যগণ তাওহীদ ও সিফাতের ক্ষেত্রে কুরআন ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন, কারও মত কিংবা বিবেকের যুক্তি কিংবা কিয়াসের দিকে যেতেন না।' মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪৭১)।

৯৮৬. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'পথভ্রষ্টতার সবচেয়ে বড় নীতি হচ্ছে, আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে দলীল-প্রমাণাদি, আয়াত-নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। কারণ যারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে তারা হয় তারা কোনো প্রকার দলীল প্রমাণ ও জ্ঞান ব্যতীতই রাসূল কে সত্য বলে বিশ্বাস করবে ও তাঁর কথাকে গ্রহণ করবে।

[لا تعارض بين نصوص المعية وبين نصوص العلو]:

ولا يحسب [الحاسب أن شيئًا من ذلك] يناقض بعضه بعضًا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد:٤]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قِبَل وجهه» ونحو ذلك، فإن هذا غلط.

[উপরে থাকা ও সাথে থাকা সংক্রান্ত ভাষ্যসমূহের মাঝে কোনো বিরোধ নেই]

কোনো ধারণাকারী যেন কখনো এ ধারণা না করে যে, এগুলো (কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যের) কোনো কোনোটি অন্যটির বিপরীত[৯৮৭]; যেমন কেউ বলল: কুরআনে যে আছে আল্লাহ 'আরশের উপরে— এটা প্রকাশ্যভাবে ঐ কথার বিপরীত যাতে আল্লাহ বলেন, ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ "তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন" [সূরা আল-হাদীদ: ৪] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قِبَل وجهه "তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তার চেহারার সামনে থাকেন" ইত্যাদি ভাষ্যসমূহের বিপরীত।[৯৮৮] (তার এ সন্দেহের উত্তরে আমরা বলব) নিশ্চয় তার এ বুঝ ও এ বক্তব্যটি মারাত্মক মারাত্মক ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৯৮৯]

তার ওপর ঈমান আনবে অথবা এর ওপর রাসূলের দেয়া দলীল প্রমাণাদী ব্যতীত অন্য কোনো দলীল প্রদান করবে...

যদি এগুলোর ওপর রাসূল যেসব আয়াত-নিদর্শন ও প্রমাণাদি দিয়ে মানুষদের ডেকেছে সেগুলো ব্যতীত অন্য কোনো দলীল প্রদান করে তবে সে বিদ'আতী হওয়ার সাথে সাথে ভুলও করবে আর পথভ্রষ্টও হবে।

আর যদি কেউ মনে করে সে রাসূল যেসব প্রমাণ ও দলীল নিয়ে এসেছেন তার বাইরে গিয়ে রাসূলের নিয়ে আসা বিষয়ের ওপর প্রমাণবহ আরও দলীল নিয়ে আসবে তবে সে কাজটি হবে সে ইবাদতের মতো যা রাসূল প্রবর্তন করেননি, কিন্তু সে মনে করছে এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সাধিত হবে।' দেখুন, আন-নুবুওয়াত (১/২৪৫-২৪৬)।

আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, শাইখুল ইসলাম এখানে দলীল নেয়ার ক্ষেত্রে যে ভূমিকাটি উল্লেখ করেছেন এ বিষয়ে অনেক কালামশাস্ত্রবিদরাই বিরোধিতা করে থাকে, তারা বলে থাকে যে, কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা দলীল-প্রমাণসমূহ 'যন্নী' বা ধারণার উদ্রেক করে, আরও বলবে যে, খবরে ওয়াহিদ ইলম বা দৃঢ় জ্ঞানের উপকারিতা দেয় না, বরং তা তো কেবল ধারণামূলক জ্ঞান প্রদান করে, আর ধারণা হকের পৌঁছার ব্যাপারে সামান্যও কাজে লাগে না (নাউযুবিল্লাহ)। এ জন্যই শাইখুল ইসলাম কালামশাস্ত্রবিদদের উপরোক্ত দু'টি ভূমিকার নাম দিয়েছেন 'যিন্দীকদের দু'টি ভূমিকা'। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১০৪)।

৯৮৭. অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ কখনো একটি অপরটির বিপরীত নয়, অনুরূপ কুরআন-সুন্নাহ ও বিবেকের যুক্তি একটি অপরটির বিপরীতও নয়। বস্তুত সালাফে সালেহীনের মতাদর্শ সম্পূর্ণরূপে সরল সোজা, সুদৃঢ়, বিশুদ্ধ, সর্বত্র প্রবর্তনযোগ্য, আর তা সুস্পষ্ট বিবেক ও বিশুদ্ধ নকল (কুরআন ও সুন্নাহ) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২১৩)।

৯৮৮. হাদীসটি নিয়ে এসেছেন, বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ (২/২৩৫), নং ৭৫৩; অনুরূপ মুসলিম, আস-সহীহ (১/৩৮৮), হাদীস নং ৫৪৭।

৯৮৯. অর্থাৎ এভাবে তারা কুরআনের 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত আয়াতের বিপরীতে সূরা আল-হাদীদে বর্ণিত 'সাথে থাকা' ও রাসূলের হাদীসে বর্ণিত 'সামনে থাকা'র বর্ণনা দিয়ে স্ববিরোধিতা প্রমাণের চেষ্টা চালায়, তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, তাদের এ কাজটি মারাত্মক ভুল।

[الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة] :

وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة كما جمع بينهما في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤]. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: «والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه».

[আল্লাহ প্রকৃতই আমাদের সাথে আছেন, আবার প্রকৃতই তিনি 'আরশের উপরে আছেন]

তিনি আল্লাহ প্রকৃতই আমাদের সাথে আছেন, আবার প্রকৃতই তিনি 'আরশের উপরে আছেন।[৯৯০] যেমন উভয়টিকে তিনি একত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন,

﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤﴾ [الحديد: ٤]

"তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন—তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-হাদীদ: ০৪] এতে তিনি জানালেন যে, তিনি 'আরশের উপরে আছেন, তিনি সবকিছু জানেন। তিনি আমাদের সাথে আছেন, আমরা যেখানেই থাকি। তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আও'আল'[৯৯১] এর হাদীসে বলেছেন: «والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه» "আল্লা'হ আরশের উপরে রয়েছেন, তিনি তোমাদের অবস্থা জানেন।"[৯৯২]

কারণ কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যকে সন্দেহ-সংশয় নিয়ে এসে গ্রহণ না করার প্রবণতা অন্তরের বক্রতার ওপর প্রমাণ। সাচ্ছা ঈমানদার দলীলসমূহে সমন্বয় করে। অপর দিকে বিদ'আতী লোকেরা দলীল-প্রমাণাদীতে স্ববিরোধীতা খুঁজে।

৯৯০. যেসব গুণাবলি আল্লাহর জন্যও রয়েছে আবার সম নামের গুণাবলি বান্দার জন্যও রয়েছে সেসব গুণাবলির ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে স্রষ্টার ক্ষেত্রেও তা প্রকৃতরূপে, আর সৃষ্টির জন্যও তা প্রকৃতরূপে। যেভাবে যেটা যার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে তা সেভাবেই তার জন্য প্রকৃতরূপে বলতে হবে। এ মতটিই হচ্ছে অধিকাংশ গবেষক আলেমগণের। একদল কালামশাস্ত্রবিদের মতে, এসব গুণাবলি বান্দার সাথেই প্রকৃত অর্থে, আর আল্লাহর জন্য তা রূপকভাবে, এ মতটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট মত। আর আবুল আব্বাস আন-নাশী', যিনি মু'তাযিলাদের একজন আলেম, তিনি বলেন, এসব গুণাবলি আল্লাহর জন্যই প্রকৃতপক্ষে, বান্দার জন্য রূপকভাবে। এটিও সঠিক বক্তব্য নয়। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৯৬); দারউত তা'আরুদ্ব (৫/১৮৪); আর-রাদ্দু আলাল মানতিক্বিয়্যীন, পৃ. ১৫৬; বাদায়ে'উল ফাওয়ায়িদ (১/২৯০); মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক্ব (২/৩৭); আল-জাওয়াবুস সহীহ (২/২৩২), (৩/১৪৯)।

৯৯১. হাদীসটির তাখরীজ ইতোপূর্বে চলে গেছে।

৯৯২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহের উপর, তাঁর

[كلمة مع في اللغة لا تقتضي المماسة أو المحاذاة]:

وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت، فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على

[ভাষায় مع 'সাথে থাকা' স্পর্শ করা কিংবা সমপর্যায়ে থাকা বুঝায় না]

আর তা হচ্ছে এই যে, مع (সঙ্গে থাকা) শব্দটি যখন ভাষায় উন্মুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়[৯৯৩] তখন সেটা প্রকাশ্যভাবে কেবল 'সাধারণ মিল থাকা' বুঝায়, মিশে যাওয়া বা ডানে বামে বরাবর থাকা দাবী করে না। আর যখন অন্য কোনো অর্থে শর্তযুক্ত করা হয়, তখন

'আরশের উপরে অবস্থান করে আছেন, তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক। তা সত্ত্বেও তিনি ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে বান্দাদের সাথে আছেন আর তাঁর বন্ধুদের সাথে আছেন সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে। তিনি অনেক নিকটে, তিনি দো'আ কবুলকারী। এর ওপর দলীল-প্রমাণাদি অগণিত অসংখ্য। এমনকি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফে'য়ীর একজন বড় ছাত্র থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, 'কুরআনে কারীমে এক হাজার বা তার চেয়েও বেশি দলীল এটা প্রমাণ করছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে, আর তিনি তাঁর সকল বান্দাদের ওপর।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১২১)।

আর এ মাসআলাটিতে মূলত ইজমা ঐকমত্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। যারা ইজমা' বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম আওযা'ঈ, সা'ঈদ ইবন 'আমের আদ-দুবা'ঈ, ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহ, কুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ আল-বাগলানী, উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, ইবন বাত্তাহ প্রমুখ। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (৬/২৬০); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২৬; যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১১২৮), নং ৪৫১, (২/১১০৩), নং ৪৩৪; উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল মিররীসী (১/২২৮); ইবন বাত্তাহ, আল-ইবনাহ (৩/১৩৬)।

এ বিষয়ে জানার জন্য আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৪২-১৪৩), (৫/৪৯৫-৪৯৯), (১১/২৪৯-২৫১); ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২৬৫-২৬৯)। আর ভাষার রেফারেন্স হিসেবে দেখুন, আর-রাগেব আল-আসফাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ৪৭০; যাবীদী, তাজুল 'আরূস (২২/২১০-২১১)। প্রয়োজনে দেখতে পারেন, আমার লেখা গ্রন্থ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"।

৯৯৩. অর্থাৎ যখন সম্বন্ধপদ ও বিশেষায়িত করার কিছু না থাকে তখন এর অর্থ কেবল নিঃশর্ত কম্পেয়ার করা উদ্দেশ্য হয়। কোনোভাবেই তা দ্বারা মিশে যাওয়া বা মিশ্রিত হওয়া উদ্দেশ্য হয় না। যেমন আল্লাহর বাণী, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর তার সাথে যারা আছে...।" [সূরা আল-ফাতহ: ২৯] অনুরূপ তাঁর বাণী, "তাহলে তারা ঈমানদারদের সাথে গণ্য হবে।" [সূরা আন-নিসা: ১৪৬] আরও তাঁর বাণী, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১১৯] সুতরাং আল্লাহর বাণী "তিনি তোমাদের সাথেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন।" [সূরা আল-হাদীদ: ০৪] এখানে সাথে থাকার অর্থ তাঁর সত্তা সৃষ্টির সত্তার সাথে মিশে আছে এমনটি অর্থ করা নিষিদ্ধ। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, হাদীসি শারহুন নুযূল, পৃ. ৩৬০।

অনুরূপভাবে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এটাও বলেছেন যে, ভাষাবিদদের কেউই একথা বলেননি যে, মা'য়িয়্যাহ বা 'সাথে' থাকার অর্থ মিশে থাকা কিংবা লেগে থাকা দাবি করে, যেমনিভাবে কেউ এটাও বলেননি তা ডানে থাকা কিংবা বামে থাকা বা অনুরূপ থাকা দাবি করে, যেসব অর্থে সৃষ্টির সাথে রাব্বুল আলামীনের থাকা নিষিদ্ধ। বরং মা'য়িয়্যাহ বা 'সাথে' থাকার দাবি হচ্ছে 'আল-মুকারানাতুল মুত্বলাকাহ' বা শুধু মিল থাকা (কথায় হোক কিংবা মতে কিংবা সাহায্যে কিংবা দেখা-শোনায়)। দেখুন, জামে'উর রাসায়িল (৩/১৬১)।

তিনি আরও বলেন, যে কেউ এটা দাবি করবে যে, মা'য়িয়্যাহ বা 'সাথে' থাকার দাবি হচ্ছে লেগে থাকা বা মিশে যাওয়া, আর এটাই কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ সে অবশ্যই সাধারণভাবে ভাষার ওপর মিথ্যাচার করলো, আর বিশেষভাবে কুরআনের ওপর অপবাদ আরোপ করলো। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/২০-২৫); আরও দেখুন, জামে'উর রাসায়িল (৩/১৬২)।

المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة.

[معنى قول السلف: معهم بعلمه]:

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا

ঐ অর্থে সঙ্গে থাকা অর্থ বুঝায়। যেমন বলা হয়, ما زلنا نسير والقمر معنا "আমরা সফর করছিলাম এমতাবস্থায় যে চাঁদ আমাদের সাথেই ছিল" অথবা বলা হয়, هذا المتاع معي "এই পণ্যটি আমার সাথে", কারণ সে পণ্যটি তোমার কাছে আছে, যদিও তা তোমার মাথার উপরে থাকে। কাজেই আল্লাহ সৃষ্টির সাথে থাকা প্রকৃত অর্থেই আবার 'আরশের উপরে থাকাও প্রকৃত অর্থেই।

[সালাফে সালেহীনের বক্তব্য: তিনি 'জ্ঞানে তাদের সাথে আছেন' এর অর্থ]

বস্তুত এ معية (সঙ্গে থাকা) বিষয়টি উপস্থাপনা ও ব্যবহারের ভিন্নতা অনুযায়ী তার বিধান ভিন্ন হয়।(৯৯৪) তাই যখন তিনি বললেন: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

৯৯৪. অর্থাৎ 'মা'আ' (مع) শব্দটির সম্বন্ধ ও সম্পর্ক কিসের সঙ্গে করা হয়েছে তা অনুযায়ী তার অর্থ ভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষের অন্তর তার সাথে থাকা এক ধরণের, মানুষের জ্ঞানের, ক্ষমতার, শক্তির সাথে থাকা আরেক ধরণের, মানুষের স্ত্রী তার সাথে থাকা আরেক ধরণের,... এসব কিছুর ভিন্নতা ও বিভিন্ন প্রকার হওয়া সত্ত্বেও 'সাথে' বলা সাব্যস্ত। তাই তো বলা যায় তার সাথে তার স্ত্রী রয়েছে অথচ হয়ত তাদের দু'জনের মাঝে বিস্তর ফারাক, এভাবেই। তাহলে বুঝা গেল যে, 'সাথে থাকা' এর সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে সঙ্গী-সাথী হওয়া, একমত হওয়া, কোনো কাজে মিল থাকা। আর এ মিল হওয়া অবস্থা ও ব্যবহার অনুসারে ভিন্ন হতে বাধ্য। দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (৩/১২৪৫-১২৪৬)।

আবু মুহাম্মাদ ইবন কুতাইবাহ বলেন, 'আর আমরা আল্লাহ তা'আলার বাণী "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] এর ব্যাপারে বলি যে, আল্লাহ তা'আলা তারা কী করছে এ ব্যাপারে তাদের সাথে জ্ঞানের মাধ্যমে রয়েছেন। যেমন, তুমি কোনো লোককে দূর কোনো দেশে পাঠাও, তাকে তোমার কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান কর তখন তাকে বল: সাবধান, তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছি এ ব্যাপারে কোনো ত্রুটি বরদাশত করা হবে না; কারণ আমি তোমার সাথে আছি। এখানে এ সাথে থাকার অর্থ, তোমার কাছে তার ত্রুটি গোপন থাকবে না, অথবা তুমি তার প্রতিটি কাজে যথাযথ খেয়াল রাখছ, তোমার কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর রাখছ, সেটার ব্যাপারে কতটুকু সিরিয়াস সেটা জানিয়ে দেয়া। যদি সেটা একজন সৃষ্টির ব্যাপার বৈধ হয় যিনি গায়েব জানেন না, তাহলে স্রষ্টার ব্যাপারে আরও উত্তমরূপে বৈধ, যিনি গায়েব জানেন।' দেখুন, তা'ওয়ীলু মুখতালাফিল হাদীস, পৃ. ৭০৯-৭১০। আর ইবন তাইমিয়্যাহ তা তার ফাতাওয়াতে নিয়ে এসেছেন, দেখুন (৫/৩০৪); (শারহু হাদীসিন নুযুল)।

ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, [الحديد: ٤] ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ 'আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন' [সূরা আল-হাদীদ: ০৪] এ আয়াতের যাহের বা প্রকাশ্য অর্থ কখনও এটা বুঝায় না যে, তিনি আল্লাহ সৃষ্টির মাঝে আছেন। আর এটাও বুঝায় না যে, তিনি সৃষ্টির সাথে মিশে বা লেগে আছেন ইত্যাদি যেসব বাতিল অর্থ মানুষ করে থাকে। বস্তুত (مع) কখনও এ অর্থের ওপর কোনো দিক থেকেই প্রমাণবহ নয়। এটা প্রকাশ্য অর্থ হওয়া তো আরও দূরের কথা। এর কারণ হচ্ছে (مع) শব্দটি কুরআনের বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি তা আরবী ভাষাতেও এসেছে, সেসব জায়গার

يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد:٤] دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: «إنه معهم بعلمه» ، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.

ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] "তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন—তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন" [সূরা আল-হাদীদ: ০৪] প্রকাশ্য অর্থে তখন বুঝান হলো যে, এই সঙ্গে থাকার চাহিদা হচ্ছে: তিনি তোমাদের দেখছেন, খোঁজ রাখছেন, তোমাদের উপরে সাক্ষী, তোমাদের সংরক্ষক, তোমাদের সম্পর্কে জানেন, এটাই সালাফে সালেহীনের বক্তব্যের অর্থ যে, তিনি স্বীয় ইলম দ্বারা তাদের সাথে আছেন। এটা প্রকাশ্য সম্বোধন এবং হাকীকত, রূপক নয়।

কোথাও এটা আবশ্যক করে না তার একটি অপরটির মধ্যে থাকবে, কিংবা মিশে যাবে। বস্তুত কোনো শব্দের অর্থ ও প্রকাশ্য অর্থ কেবল তার ব্যবহার বিধি থেকেই নেয়া হয়ে থাকে।

তারপর ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, (مع) শব্দটি (ظرف مكان) বা স্থান নির্দেশক, তার অর্থ হচ্ছে সাথিত্ব, সংযোগ ও মিল হওয়া। যদি বলা হয়, এটি এটির সাথে, তখন এটা ধরে নেয়া হয় যে, সেটি স্থান বা অবস্থানে দ্বিতীয়টির সাথে কোনো সংযোগে রয়েছে। যাতে করে উভয়টি সাথিত্বে থাকবে বা একমত হবে। আর এটাই সে অর্থ, যা কোনো কোনো নাহুবিদ বলে থাকেন: 'নিশ্চয় (مع) শব্দটি (مصاحبة) বা সাথিত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে সে সংযোগ আরও কিছু বিষয়ের ওপর প্রমাণবহ থাকে যা সংযোগ থাকা দাবি করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন বললেন, তিনি তার সৃষ্টির সাথে, তখন সেটার দাবি হচ্ছে, তিনি তাদের ব্যাপারে জানেন, তাদের সবকিছু পরিচালনা করেন, তাদের ওপর ক্ষমতাবান। তারপর যদি কারও ব্যাপারে বিশেষত্ব বুঝানোর দরকার হবে তখন বাক্যের আগে-পরে এমন কোনো কিছু থাকতে হবে যা বর্ণনা করবে যে তিনি তাদের সাহায্য করবেন ও সহযোগিতা করবেন।

তারপর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, যে কেউ কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে সে অবশ্যম্ভাবীরূপে জানতে সক্ষম হবে যে, তিনি বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ তার সত্তা তাদের মাঝে থাকা নয়, তাদের সাথে মিশে থাকাও নয়, যেমনিভাবে যত জায়গায় (مع) শব্দটি ব্যবহার হয় সেখানেও তা হওয়া দাবি করে না। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/২০-২৫)। আরও দেখুন, জামে'উর রাসায়িল (৩/১৬২)।

তিনি আরও বলেন, 'যদি মা'য়িয়্যাত (معية) দ্বারা লেগে থাকা ও মিশে যাওয়া বুঝানো হতো, আর তিনি সব জায়গায় সাধারণভাবে সত্তাসহ থাকতেন তাহলে (معية) বিশেষভাবে হতে পারতো না। সুতরাং যে কেউ মনে করবে যে, মা'য়িয়্যাত এর অর্থ হচ্ছে লেগে থাকা ও মিশে থাকা আর এর প্রকাশ্য অর্থ সব জায়গায় হওয়াকে বুঝায়, তাহলে সে লোক অবশ্যই ভুলে পতিত হলো, বরং মা'য়িয়্যাত যদিও 'মুসাহাবাত' বা সাথিত্ব ও মিল হওয়া অর্থে হয় তবুও সেটি প্রত্যেক স্থানে তার পূর্বাপর অবস্থা ও অবস্থান যা নির্দেশ করবে সেটাই ধরা হবে।' জামে'উর রাসায়িল (৩/১৬৪)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, আয়াতে যে মা'য়িয়্যাত (معية) এসেছে তার শব্দ বা প্রকাশ্য অর্থ কোনোটিই এটা বুঝায় না যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টির সাথে মিশে আছেন। আর (مع) শব্দটি এ অর্থে কোনোভাবেই আসে না, সেটা শব্দের প্রকৃত অর্থ বা বিষয়বস্তু হওয়া তো দূরের কথা। কারণ আরবদের ভাষায় (مع) বলতে বুঝায় 'যথোপযুক্ত সাথিত্ব'। মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (৩/১২৪৫)।

وكذلك في قوله ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة:٧]،

তেমনি তাঁর বাণী:

﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟﴾ [المجادلة: ٧]

"তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।"(৯৯৫) [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭]

---

৯৯৫. এ আয়াতে কথার শুরু করা হয়েছে 'ইলম' বা জ্ঞান শব্দ দিয়ে, আবার শেষও করা হয়েছে সেই 'ইলম' বা জ্ঞান দিয়ে। এজন্যই ইবন আব্বাস, দাহহাক, সুফইয়ান আস-সাওরী ও আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, 'তিনি ইলম বা জ্ঞানে তাদের সাথে আছেন।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/২৫০)।

এ আয়াত থেকে একদল যিন্দীক (ইসলাম বিরোধী গোপন গোষ্ঠী) দলীল দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সব জায়গায়, এমনকি ময়লার জায়গাতেও, মানুষের পেটেও, জীব জন্তুর অভ্যন্তরেও, ঘরের কোণে ও কক্ষের ভিতরে।... তারা যা বলেছে তা থেকে আল্লাহ কতই না পবিত্র ও উপরে। তখন ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করলেন যে, আয়াতের শুরু ও শেষের দিকে তাকিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন, তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর রাখেন।

এটা নয় যে, তিনি সব জায়গায় তাদের সাথে আছেন। দেখুন, মহান আল্লাহর কথা, "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭]

তারপর তিনি বলেন, 'আমরা বললাম, তিনি তাদের সাথে ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে আছেন যা দিয়ে আয়াত শুরু করা হয়েছে আর যা দিয়ে আয়াত শেষ করা হয়েছে। কারণ তিনি অনেক আয়াতে এমন কথা বলেছেন যা দৃঢ়করে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, তিনি তাঁর 'আরশের উপরে, সকল আসমানের উপরে। সুতরাং তিনি সেখানেই এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যখন তিনি বলেছেন তিনি প্রত্যেক শলা-পরামর্শকারীর সাথে, আমরা বললাম, তাঁর জ্ঞান ও দেখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে, যদিও তিনি স্বয়ং তাঁর যাবতীয় পূর্ণতাসহ তাঁর 'আরশের উপর, যেমনটি তিনি তাঁর গুণ বর্ণনা করেছেন। কারণ তার থেকে কোনো কিছু আড়াল হয় না। উপরন্তু সাত আসমানের কোনো কিছু তাঁর জ্ঞান ও দেখা থেকে ছুটে যেতে পারে না, অনুরূপ সাত যমীনের নিচের কিছুও নয়। আর সেটা তেমনি যেমনটি তিনি মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস সালামকে বলেছিলেন, "তিনি বললেন, 'আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি'।" [সূরা ত্বা-হা: ৪৬] অর্থাৎ 'আরশের উপর থেকে।' দেখুন, উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৪৩-৪৪।

তারও আগে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল যখন দেখলেন যে, জাহমিয়্যারা এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলছে যে, আল্লাহ আমাদের মাঝে ও আমাদের মধ্যে। তখন ইমাম আহমাদ বললেন, 'আমরা বললাম, তোমরা আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে দেয়া সংবাদের প্রথম অংশ কেন কর্তন করেছ? আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, "আপনি কি দেখেননি নিশ্চয় আল্লাহ জানেন তা যা আসমানসমূহ ও যা যমীনে আছে।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] তারপর বলেছেন, "তিনজনের শলা-পরামর্শ

ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة:٤٠] كان هذا أيضًا حقًا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا. مع الاطلاع. والنصر والتأييد. وكذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾ [النحل:١٢٨]، وكذلك قوله لموسى وهارون: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ [طه:٤٦]. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد.

অনুরূপ যখন গুহায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর সাথীকে বলেন: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠] "তুমি ভয় পেও না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৪০] এটিও প্রকাশ্য অর্থের উপরে হাকীকত হিসেবে ধর্তব্য হবে (রূপক নয়)। আর অবস্থার দ্বারা বুঝা গেল —এখানে সঙ্গে থাকার অর্থ দেখার সাথে সাহায্য-সহযোগিতাও করা।

তেমনি তাঁর বাণী: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ۝﴾ [النحل: ١٢٨] "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।" [সূরা আন-নাহল: ১২৮]

অনুরূপ মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস সালামের জন্য তাঁর কথা: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ [طه: ٤٦] "আমি তো আপনাদের সংগেই আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।" [সূরা ত্বা-হা: ৪৬] এখানেও মা'য়িয়্যাহ (معية) তার প্রকাশ্য অর্থেই। আর এখানে সে প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে

হলে সেখানে তিনি চতুর্থজন হন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] অর্থাৎ তিনি তাঁর জ্ঞান ও ইলমে তাদের চতুর্থজন। "আর নয় চতুর্থ জন যেখানে তিনি পঞ্চম জন না হন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর ইলমের মাধ্যমে তাদের সাথে আছেন। "আর না তাদের ষষ্ঠজন, বা তার থেকে কম বা তার থেকে বেশি, তিনি তাদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] অর্থাৎ তিনি তাদের সাথে ইলমের মাধ্যমে রয়েছেন। "যেখানেই তারা থাকুক না কেন, তারপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেটা যা তারা করেছে, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ০৭] এভাবে সংবাদ শুরু করেছেন ইলমের মাধ্যমে আর সংবাদ শেষ করেছেন ইলমের মাধ্যমে।' আর-রাদ্দু আলায যানাদিক্বাতি ওয়াল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২৯৬-২৯৭।

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এভাবে আল্লাহ আয়াতটি শুরু করেছেন 'ইলম' দিয়ে, আর শেষ করেছেন 'ইলম' দিয়ে। তাহলে জানা গেল যে, তিনি এ আয়াতে সাথে থাকার দ্বারা ইচ্ছা করেছেন তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন, তাঁর কাছে কোনো কিছু গোপন নেই, আর এরকম তাফসীরই করেছেন ইমাম আহমাদ আর তার পূর্বেকার আলেমগণ যেমন ইবন আব্বাস, দাহহাক, সুফইয়ান আস-সাওরী।' ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৮/৩৭৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন, এ আয়াতের শুরু ও শেষ প্রমাণ করছে যে, এখানে 'ইলম' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, আর তিনি তাঁর 'আরশে উপর রয়েছেন। এ হচ্ছে সকল মুসলিমদের কথা। জামে'উর রাসায়িল (৩/১৫৯)।

আর এ আয়াত ইলম দ্বারা শুরু ও ইলম দ্বারা শেষ করা প্রমাণ করে যে এখানে সাথে থাকার অর্থ 'ইলমের মাধ্যমে সাথে থাকা'। এ বিষয়টি বহু আলেম যুগ যুগ ধরে বলেছেন। যেমন, ইবন বাত্তাহ আল-উকবারী, আল-ইবানাহ (৩/১৪৪); আজুররী, আশ-শরী'আহ (৩/১০৭৫-১০৭৬); ইয়াহইয়া ইবন আবিল খাইর আল-'ইমরানী, আল-ইন্তেসার ফির রাদ্দি আলাল মু'তাযিলাতিল কাদারিয়্যাতিল আশরার (২/৬১৭); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/২৪৯); জামে'উর রাসায়িল (৩/১৬৪); ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (৮/৪১)। ইবন কাসীর সেখানে ইমাম আহমাদের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন।

وقد يدخل على صبي من يخيفه، فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف، أنا معك، أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، ففَرْقٌ بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فيختلف باختلاف المواضع.

[استعمال لفظ المعية في الكتاب والسنة في مواضع مختلفة]:

فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب

সাহায্য সহযোগিতা করা।(৯৯৬)

আবার যেমন- কোনো বাচ্চাকে কেউ ভয় দেখাচ্ছে তখন সে কাঁদছে, আর তার পিতা ছাদের থেকে তাকিয়ে বলছে: ভয় করো না আমি তোমার সাথে আছি অথবা আমি এখানে আছি অথবা আমি উপস্থিত আছি ইত্যাদি। এভাবে তিনি তার সন্তানকে এমন সাথে থাকার কথা বলছেন যা সে অবস্থার জন্য উপযোগী, যাতে সন্তান থেকে তিনি অপছন্দনীয় কোনো বিষয় দূর করতে পারেন। সুতরাং সঙ্গে থাকার অর্থ ও তার চাহিদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।(৯৯৭) তাইতো কখনও কখনও সেটার চাহিদাই অর্থ হিসেবে নির্ধারিত হয়, তাই অবস্থাভেদে সেটার অর্থে ভিন্নতা আসে।

[কুরআন ও সুন্নাহ'য় معية (সঙ্গে থাকা) শব্দের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার]

বস্তুত معية মা'য়িয়্যাত শব্দটি কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন স্থানে অবস্থা ও অবস্থানের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক স্থানে যে অর্থের চাহিদা এসেছে অন্যস্থানে সে অর্থের চাহিদা আসেনি। তাই হয় معية মা'য়িয়্যাত এর অর্থকে স্থান হিসেবে ভিন্ন হয় বলে নির্ধারণ করা হবে বলতে হবে, নতুবা বলতে হবে যে সকল স্থানে যেভাবে এ শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে একটি (قدر مشترك) কমন অর্থ রয়েছে।(৯৯৮) যদিও প্রত্যেক স্থানে ব্যবহারের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং (স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন হওয়া অথবা কমন অর্থে মিল হওয়া) উভয় অবস্থাতেই معية মা'য়িয়্যাত (সঙ্গে থাকা) মহান

---

৯৯৬. আর এটাই হচ্ছে, বিশেষ অর্থে সাথে থাকা, দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১১/২৪৯-২৫০)।

৯৯৭. সুতরাং মা'য়িয়্যাত (معية) এর অর্থ হচ্ছে সাথিত্ব ও মিল থাকা যার চাহিদা হচ্ছে জ্ঞান ও ক্ষমতা। আবার কখনও কখনও সেটার চাহিদা থাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, '(مع) এর অর্থ হচ্ছে সাথীত্ব ও মিল হওয়া... তারপর এ মিল অন্যান্য বিষয়ের ওপর প্রমাণবহ যা মিল থাকলে তা হওয়া দাবি করে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা যখন বলেছেন, তিনি বান্দার সাথে আছেন তখন সেটার দাবি হচ্ছে তিনি তাদের সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তাদের পরিচালনা করেন, তাদের ওপর ক্ষমতাবান। আর যদি তিনি তাদের কারও সাথে বিশেষভাবে থাকেন তবে বক্তব্যের পূর্বাপরে এমন কিছু থাকবে যা বর্ণনা করবে যে, তিনি তাদের সাহায্য করবেন, সহযোগিতা করবেন।' ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/২৩-২৪)।

৯৯৮. আর তা হচ্ছে, সাধারণভাবে মিল থাকা ও সাধারণভাবে সাথীত্বে থাকা।

مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها.

[لفظ الربوبية والعبودية واشتراك الخلق فيهما]:

ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال: ﴿بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف:١٢١،١٢٢] كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره: فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره.

রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির সাথে মিলে-মিশে একাকার হওয়া দাবি করে না। তাই একথা বলা কখনো সঠিক হবে না যে, معية মা'য়িয়্যাত এর অর্থ জ্ঞান, দেখা, শোনা, সাহায্য করা ইত্যাদি করা হলে এর দ্বারা শব্দটিকে তার প্রকাশ্য চাহিদা থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে।

[রুবুবিয়্যাহ ও উবুদিয়্যাহ শব্দদ্বয় আর সকল সৃষ্টি উভয়ের মধ্যে কমনভাবে অংশীদার থাকা]

কিছু দিক থেকে (মা'য়িয়্যাহ) এর উদাহরণ হচ্ছে, রবুবিয়্যাহ ও উবুদিয়্যাহ তথা রব্ব হওয়া ও দাস হওয়া এর মত;(৯৯৯) কেননা উভয়টি 'আসল রুবুবিয়্যাত' ও 'আসল উলুহিয়াত' হিসেবে (قدر مشترك) কমন একটি অর্থে মিল থাকলেও, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার অর্থ ভিন্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও মূল অর্থ সব স্থানে একই।

সুতরাং [রুবুবিয়াত শব্দটি] যখন আল্লাহ বললেন: ﴿رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۝﴾ [الاعراف: ١٢١، ١٢٢] "বিশ্ব-জাহানের রব্ব, মূসা ও হারুনের রব্ব।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১২১, ১২২] এখানে মূসা এবং হারুনের জন্য রব্ব হওয়া বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যা বিশ্বজাহানের অপর সৃষ্টি রব্ব হওয়া থেকে একটু বেশি। কারণ কাউকে যদি আল্লাহ তা'আলা পূর্ণতা বেশি প্রদান করেন তবে তা দ্বারা তিনি অন্যদের থাকে তাকে বেশি লালন-পালন করেছেন, বিশেষভাবে তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তার তারবিয়াত অন্যদের চেয়ে বেশি।

অনুরূপভাবে [উবুদিয়াত শব্দটিও সাধারণভাবে ও বিশেষ অর্থে হয়, যদিও শব্দের মূল অর্থ দাসত্বের একটি জায়গায় কমন মিল থাকে, তারপরও তা সাধারণভাবে সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার বিশেষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়েছে] তাঁর

---

৯৯৯. অর্থাৎ মা'য়িয়্যাহ এর অর্থ কী হবে, তা বুঝতে হলে এটিকে রুবুবিয়্যাহ ও উবুদিয়্যাহ'র মতো করে বুঝতে হবে। রুবুবিয়্যাহ যেমন সাধারণভাবে সকলের জন্য রয়েছে, তেমনি বিশেষ করে বিশেষ লোকদের জন্যও রয়েছে। অনুরূপভাবে উবুদিয়্যাহ বা আল্লাহর দাসত্ব সাধারণভাবে সবাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তা মানতে বাধ্য, আবার বিশেষভাবে কিছু লোকদের জন্য তা নির্ধারিত হয়, যারা তাঁকে ইচ্ছাকৃত রব্ব মেনে নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিনিয়ত ইবাদত করে চলেছে। তাই মা'য়িয়্যাহ শব্দটিকেও আমরা উভয়ভাবে দেখতে পারি, তা যেমন মায়িয়্যাহ 'আম্মাহ (সকলের সাথে) হয়, তেমনি তা মা'য়িয়্যাহ খাসসাহ (বিশেষ লোকদের সাথে) হয়, এভাবে আমরা এগুলোকে দু'ভাগে করা যায় দেখতে পাই।

وكذلك قوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان:٦] و ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء:١]. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾ [مريم:٩٣]، وتارة يعنى به العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علماً وحالاً، كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في

বাণীতে যেখানে আল্লাহ বলেন, ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝٦﴾ [الانسان: ٦] "এমন একটি প্রস্রবণ যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথেচ্ছা প্রবাহিত করবে।" [সূরা আল-ইনসান: ০৬] এবং ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا﴾ [الاسراء:١] "পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের মাধ্যমে ভ্রমণ করালেন।" [সূরা আল-ইসরা: ০১][১০০০]

কারণ এই 'আব্দ' শব্দটি দ্বারা কখনো উদ্দেশ্য হয়, 'মু'আব্বাদ' বা যা অধীনতায় আবদ্ধ বা দাসত্বের নীতির অধীন, (ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়) এ অর্থ সমগ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য, এটার উদাহরণ আল্লাহর বাণী, ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۝٩٣﴾ [مريم: ٩٣] "আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।" [সূরা মারইয়াম: ৯৩] আবার কখনো 'আব্দ' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হয় 'আবেদ' বা ইবাদতকারী, দাসত্বকারী। (যা কেবল ইচ্ছাকৃত ইবাদতকারীকে বুঝায়) আর তখন সেটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তারপর তাতে বিভিন্ন স্তর হয়, (আবদ) যদি কেউ জ্ঞান ও অবস্থা অনুযায়ী বেশি ইবাদত করে, তার ইবাদত হবে বেশি পরিপূর্ণ; তখন তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হওয়া পূর্ণতাজ্ঞাপক; যদিও সকল অবস্থাতেই এটি তার আসল বা

১০০০. 'আবদ' শব্দটি কুরআনে কারীমে কেবল তার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে যে দাসত্ব করেছে। তাই যে দাসত্ব করে না তার জন্য বলা হয় না যে তিনি ইবাদত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, "বিভ্রান্তদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে সে ছাড়া আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।" [সূরা আল-হিজর: ৪২] তবে এ আয়াতের শেষে যে ব্যতিক্রম থাকার কথা এসেছে, "বিভ্রান্তদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে সে ছাড়া" তা বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম, যা আগের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমনটি অধিকাংশ মুফাসসির ও আলেমগণ বলেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১/৪৩)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল-'আবদ' দুটি অর্থকে গ্রহণ করে:
এক. যে অনিচ্ছায় দাসত্ব করে। যেমন আল্লাহ বলেন, "আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।" [সূরা মারইয়াম: ৯৩] আরও বলেন, "তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে! আর তাঁর দিকেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।" [সূরা আলে ইমরান: ৮৩] এ দাসত্ব থেকে কেউ মুক্ত থাকতে পারে না।
দুই. যে ইচ্ছায় ইবাদত করে, তাঁর কাছে সাহায্য চায়। বস্তুত এটিই কুরআনে কারীমে বেশি এসেছে। যেমন, "আর 'রহমান' -এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।" [সূরা আল-ফুরকান: ৬৩] আরও বলেন, "এমন একটি প্রস্রবণ যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথেচ্ছা প্রবাহিত করবে।" [সূরা আল-ইনসান: ০৬]
এ দাসত্ব থেকে কখনও কখনও মানুষ মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু প্রথম প্রকার দাসত্ব সেটা যে কোনো সৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন বাধ্য গুণ। কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ওপর তাকদীরের সকল কিছু যথাযথভাবে সংঘটিত হবে আর স্রষ্টা তার ওপর সবকিছু পরিচালনা করেন।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৪/২৯-৩০), (১০/১৫৪-১৫৮, ১৮০)। রিসালাতুল উবুদিয়্যাহ।

حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع.

[لفظ المعية هل هو من قبيل المتواطئة أو من قبيل المشترك؟] :

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس «مشككة» لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة، أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعًا مختصًا من المتواطئة، فلا بأس بتخصيصها بلفظ.

হাকীকী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (অর্থাৎ কাফেরও দাস, ঈমানদারও দাস, অথচ উভয়ের দাসত্বের অবস্থা সমান নয়, কিন্তু তাই বলে কারও দাস হাকীকী বা প্রকৃত, আর কারও দাস মাজাযী বা রূপক নয়। উভয়ের দাসত্বই প্রকৃত দাসত্ব।)

[উপরোক্ত শব্দগুলো মূলত মুশাক্কিকাহ, যা মূলত মুতাওয়াত্বিয়াহ এরই অংশ]

এরূপ শব্দগুলোকে কেউ কেউ মুশাক্কিকাহ[১০০১] (مشككة) বলে, কারণ এগুলো শ্রোতাকে এ সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয় যে, এগুলোকে 'আল-আসমাউল মুতাওয়াত্বিয়াহ' (الأسماء المتواطئة) বলা হবে, নাকি এগুলো নিছক 'আল-মুশতারাকুল লাফযী' (المشترك اللفظي) এর অন্তর্ভুক্ত হবে?

মুহাক্কিক আলেমগণ জানেন যে, এগুলো মুতাওয়াত্বিয়াহ শ্রেণির বাইরে নয়। কারণ ভাষা নির্মাতা সেটাকে 'কাদরে মুশতারাক' তথা অর্থের তুল্য অংশটুকুর জন্য রেখেছেন। আর মুশাক্কিকাহ যদিও 'মুতাওয়াত্বিয়াহ' এর একটি প্রকার, তবুও এটার জন্য ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা নেই।[১০০২]

১০০১. একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলে তার মাঝে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক হতে পারে, যেমন,

১- মুশতারিক, একই শব্দ, তবে আলাদা আলাদা অর্থ, অর্থগুলোর মাঝে কোনো কমন (সাধারণ) অর্থ নেই। যেমন, আরবী ভাষায় 'আইন'। তা চোখের জন্যও ব্যবহৃত হয়, পানির ঝর্ণার জন্যও ব্যবহৃত হয়, গোয়েন্দার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

২- মুতাওয়াত্বি', একই শব্দ, তবে আলাদা আলাদা অর্থ, কিন্তু অর্থগুলোর মাঝে সাধারণ একটি মিল পাওয়া যায়।

ক. যদি সাধারণ অর্থটুকু সমানভাবে প্রতিটি অর্থেই পাওয়া যায় তবে সেটাকে মুতাওয়াত্বি' (মুতাসাওয়ী) বলা হয়। যেমন, ওজুদ, ইনসান ইত্যাদি। আর মুতাওয়াত্বি' বলতে সাধারণত এটাকেই বুঝায়।

খ. যদি সাধারণ অর্থটুকু প্রতিটি অর্থেই সমানভাবে না বুঝিয়ে ভিন্ন অনুপাতে পাওয়া যায় তবে সেটাকে মুশাক্কিক বলা হবে। যেমন, নূর, তা সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, বাতির আলো সবকিছুর অর্থ দেয়, তবে মাত্রায় ভিন্নতা আছে। অনুরূপ 'আবয়াদ্ব' বা সাদা শব্দটি, তা হাতির দাঁতের শুভ্রতাকেও বুঝায় আবার বরফের শুভ্রতাকেও বুঝায়।

ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, একই শব্দকে কখনও মুশতারাক বলা যায়, আবার কখনো মুতাওয়াত্বি'ও বলা যায়। তা নির্ভর করবে অর্থের কোন অংশটুকু উদ্দেশ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে সেটার ওপর। যেমন, 'দাব্বাহ'। যমীনের উপর হাল্কা যারাই চলে এমন সবকিছুকে শামিল করে, সে হিসেবে ঘোড়ার ক্ষেত্রে, গাধার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা মুতাওয়াত্বি'। কিন্তু দাব্বাহ এর বিশেষ অর্থ হচ্ছে ঘোড়া। তখন 'দাব্বাহ' শব্দটি ঘোড়া ও অন্যান্য প্রাণীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'মুশতারাক' হয়ে যাবে।

১০০২. এখানকার অধিকাংশ কথার সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য এটা বলা যে, আল্লাহর নাম, তাঁর গুণ আর আল্লাহর

ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات. كإضافة الربوبية مثلاً. وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازًا: علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.

[معنى أن الله في السماء]:

ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذبٌ. إن نقله عن غيره، وضالٌّ. إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدًا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله «أن الله في السماء؟ أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.

আর যে জানবে যে, যেমনিভাবে (আল্লাহর) 'রুবুবিয়্যাত' (প্রভুত্ব) সকল মাখলুকের ওপর হতে পারে তেমনিভাবে معية মা'য়িয়াত বা (সঙ্গে থাকা) সকল মাখলুকের দিকেই সম্পৃক্ত হতে পারে; কিন্তু 'ইসতিওয়া' বিষয়টা শুধু 'আরশের জন্য, আর আল্লাহ প্রকৃতভাবে উর্ধ্বে, উঁচুতে, নিম্নে বা নিচুতে নন, হাকীকী-মাজাযী বা প্রকৃত-রূপক[১০০৩] কোনোভাবেই না, সে অবিকৃত অবস্থায় কুরআনকে জানতে সক্ষম হলো।

[আল্লাহ আসমানে থাকার অর্থ]

অতঃপর যে ধারণা করবে যে, 'আল্লাহ আসমানে' অর্থ আসমান তাকে বেষ্টন করে রেখেছে, তাহলে সে অবশ্যই হয় মিথ্যাবাদী যদি অন্যের কথা সংকলন করে[১০০৪], আর না হয় পথভ্রষ্ট যদি সে তার রবের ব্যাপারে এমনটি বিশ্বাস করে। এ শব্দ থেকে কেউ এমন বুঝেছে এমনটি আমরা শুনিনি। আর কাউকে একজন থেকেও এমনটি বর্ণনা করতে আমরা দেখিনি। যদি সকল মুসলিমকে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ আসমানে কথা দ্বারা কি তোমরা এটা বুঝেছ যে, আসমান তাকে ঘিরে রেখেছে, বেষ্টন করে রেখেছে?, তাহলে সবাই অতি দ্রুত বলত: এটা আমাদের কল্পনাতেও আসেনি।[১০০৫]

সৃষ্টির নাম ও তাদের গুণাবলির মাঝে কিছু অংশে মিল থাকতেই পারে, আর এটুকু মিলের অস্তিত্ব না থাকলে মানুষে কখনো আল্লাহর সম্বোধনই বুঝতে সক্ষম হতো না।

দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৭৬-৭৭, ১৮৮-১৯১), (৫/২০৪-২১২, ৩২৮-৩৩১), (৯/১৪৫-১৪৭), (২০/৪২৩-৪৩১); নাক্বদুত তা'সীস (২/৩৭৮-৩৮২)।

১০০৩. ঊর্ধ্ব দিক একটি পূর্ণাঙ্গ গুণ ও প্রশংসার গুণ। চাই সেটাকে সত্তাগতভাবে উপরে বলা হোক কিংবা সম্মানের দিক থেকে উপরে ধরা হোক। তার বিপরীতে নিচে থাকা সাধারণত নিন্দিত। তাই আল্লাহ তা'আলাকে নিচে থাকার গুণ প্রদান করা হলে মানুষ তার স্বাভাবিক ফিত্বরাতের মাধ্যমেই বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। নিচে থাকা মানুষের জন্যও নিন্দিত, তাহলে স্রষ্টার জন্য সেটা তো নিন্দিত হবেই। যেমনটি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, 'আমি যত নিচের জিনিস পেয়েছি সবই নিন্দিত...'। দেখুন, আর-রাদ্দু 'আলায যানাদিক্বাতি ওয়াল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২৮৭; ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৫/৭৩, ৯৯)।

১০০৪. বিশেষ করে যদি কেউ সালাফদের থেকে এমন কথা বর্ণনা করে। কারণ সালাফরা কেউই এমন কথা বলেননি।

১০০৫. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র এ অংশের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'তুমি যদি সেসব লোকদের

وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا محالًا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة [له] إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه، وقد قال سبحانه: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١]، وقال تعالى: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران:١٣٧] بمعنى «على» ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة

সুতরাং যখন প্রকৃত অবস্থা এমন হলো তখন প্রকাশ্য বিষয়কে অসম্ভব অবোধগম্য বানানো, যাতে মানুষ না বুঝে, ফলে তাকে তা'ওয়ীল করতে চাইবে, এটাই হচ্ছে 'তাকাল্লুফ' বা অযাচিত আচরণ করা; বরং মুসলিমদের নিকট এটাই নির্ধারিত যে, তিনি আসমানে, তিনি 'আরশের উপরে দু'টো একই কথা। যেহেতু আসমান দ্বারা উদ্দেশ্য উঁচু, তাই এটার অর্থ তিনি উঁচুতে, নিচুতে নয়। আবার মুসলিমগণ জানে যে, আল্লাহর কুরসীতে আসমান-যমীনের জায়গা হয়, আর কুরসী 'আরশের তুলনায় শূন্য ভূখণ্ডে ফেলে রাখা আংটির ন্যায়। আর 'আরশ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের একটি, আল্লাহর ক্ষমতা ও বড়ত্ব-মহত্বের সাথে সেটার কোনো তুলনা নেই। এর পরেও কীভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে, একটা মাখলুক তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: (ফির'আউন বলেছিল) ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] 'আর আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই।" [সূরা ত্বা-হা: ৭১] তিনি আরও বলেন, ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٣٧] "সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর।" [সূরা আলে ইমরান: ১৩৭] এখানে في টি على অর্থে।[১০০৬] অনুরূপ আরও আছে। এটা তো

জিজ্ঞাসা কর যারা তাদের রবকে ডাকে, তুমি কি তোমার রব আল্লাহ তা'আলাকে তোমার অন্তরে তোমার দেখা কোনো জীবিত সক্ষম ও জ্ঞানী মানুষের মত বিশ্বাস কর? তবে তুমি যাকে প্রশ্ন করেছ সে অবশ্যই বলবে, এ বিষয়টি কখনও আমার অন্তরে উদিত হয়নি, বরং যে এ রকম বলেছে, অথবা যে এমন বিশ্বাস করবে তাকে এত ঘৃণা করবে সে রকম ঘৃণার চেয়েও বেশি যে ফিরিশতাদেরকে মাছি বা চড়ুই পাখির মতো মনে করবে। মোটকথা; বনী আদম এটা নিজেদের ব্যাপারে ভালো করেই জানে যে, তাদেরকে এ বিশ্বাসের দিকে কোনো কিছুই ঠেলে দেয় না যে তারা আল্লাহকে মানুষের মতো মনে করবে বা মনুষ্য প্রজাতির মনে করবে। সুতরাং বনী আদমের ওপর এমন দাবি করা তাদের ওপর মিথ্যা রটনা।' ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৬১০-৬১১)।

১০০৬. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়টি তার আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ গ্রন্থের চতুর্থ নীতিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিষয়টির সারসংক্ষেপ হচ্ছে:

ক) যে কেউ মনে করবে আল্লাহ তা'আলাকে আসমানে বা 'আরশের উপর সাব্যস্ত করা দ্বারা প্রকাশ্য অর্থে সৃষ্টির মত করে ফেলা হয়, তাহলে সে সর্বসম্মতিতে মূর্খ ও পথভ্রষ্ট।

খ) ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'ফী' অব্যয়টি, যাকে আরবী ব্যাকরণের নাহুবিদরা 'যরফ' বা স্থান বলে, তা মূলত প্রতি জায়গায় তার ব্যবহারবিধি উপযোগী অর্থ প্রদান করে। যখন বলা হবে, ফলের মাঝে স্বাদ, রং ও গন্ধ ঢুকানো আছে অথবা বলা হবে, জ্ঞান, ক্ষমতা ও কথা এগুলো বক্তার মাঝে প্রবিষ্ট আছে, তাহলে সে অর্থটি (যরফ) বা স্থান বুঝানো অবশ্যই বিবেকের যুক্তির দাবি। কিন্তু যখন বলা হবে, এ লোকটি তার ঘরে প্রবিষ্ট অথবা পানি তার ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট তখন সেটার

لا مجازًا وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه» الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه

হাকীকী আরবী কথা, রূপক নয়। এটা সেই জানে যে (হুরুফুল মা'আনী) আরবী অর্থপূর্ণ হরফসমূহের হাকীকী অর্থ জানে। বস্তুত এ (হুরুফুল মা'আনী)গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুতাওয়াত্বিয়াহ (প্রতিটি অর্থের মাঝে একক কোনো জায়গায় মিল থাকবে), মুশতারিকা (প্রতিটি অর্থ পরস্পর বিরোধপূর্ণ, এমন) নয়।[১০০৭]

অনুরূপ রাসূলের বাণী: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه» "তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ তার চেহারার সম্মুখে থাকেন, কাজেই সে যেন সামনে থুথু না পেলে।"[১০০৮] এ হাদীসটিও হক্ক ও যথার্থভাবে তার যাহেরী বা প্রকাশ্য

অর্থ ভিন্ন। কারণ আগের উদাহরণ দু'টিতে সিফাত তার মাওসূফে প্রবিষ্ট ছিল, কিন্তু পরবর্তী উদাহরণ দু'টিতে পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট সত্তা যা জিসিম বা জাওহার বলা হয় তা তার প্রবিষ্ট হওয়ার স্থানে প্রবেশ করেছে। সেজন্যই লোকদের বাসস্থানের জায়গাকে মহল্লা বলা হয়। আর বলা হয়, অমুক প্রবেশ করেছে অমুক জায়গাতে। আর যখন বলা হয়, সূর্য ও চন্দ্র পানির মাঝে, অথবা আয়নার মাঝে, অথবা অমুকের চেহারা আয়নার মাঝে অথবা অমুকের কথা কাগজের মধ্যে, তখন সেটার ভিন্ন আরেক অর্থ রয়েছে যা মানুষ মাত্রই বুঝতে পারে। তারা জানতে পারে যে, সূর্য, চাঁদ ও চেহারা আয়নায় প্রকাশিত হয়েছে ও তাতে দেখা গেছে, সেগুলোর সত্তা কখনও তাতে প্রবেশ করেনি। তাতে তো প্রবেশ করেছে কেবল প্রতিবিম্বের মত কিছু, যারা এটা বলে থাকে। অনুরূপভাবে কোনো কথা যখন কাগজে লেখা হয়, তখন মানুষ ভালো করেই জানে যে, এ কথা তাতে লেখা হয়েছে, তাতে পঠিত হবে, তার দিকে তাকিয়ে থাকা হবে। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ (৩/৯১-৯২)।

তিনি আরও বলেন, 'নিঃসন্দেহে 'ফী' অব্যয়টি তার আগের ও পরের কথার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং সেটি কিসের দিকে সম্বন্ধিত হলো তা দেখতে হবে, সেটা অনুসারেই তার অর্থ নির্ধারিত হবে। আর সে জন্যই কোনো কিছু কোনো স্থানে থাকা আর কোনো জিসিম অপর (হাইয়্যেয) অবস্থানে থাকা এবং কোনো 'আরাদ্ব' (গুণ) জিসিমের (শরীরের) মাঝে থাকা, কোনো চেহারা আয়নায় থাকা, কোনো কথা কাগজে থাকা এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা জরুরী। কারণ এর প্রতিটি প্রকারের রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দেয়, যদিও সেসব জায়গার সব স্থানেই 'ফী' ব্যবহার করা হয়েছে।

তাই যদি কেউ বলে, 'আরশ কি আসমানে নাকি যমীনে? তাকে বলা হবে, আসমানে। আর যদি বলা হয়, জান্নাত কি আসমানে নাকি যমীনে? তাকে বলা হবে, জান্নাত আসমানে। এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, আরশ আসমানসমূহের ভিতরে, বরং অনুরূপভাবে জান্নাতও নয়।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৫২); আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৮৫-৮৬।

গ) আল্লাহ আসমানে বা 'আরশে উভয় কথার উদ্দেশ্য একই। আর তা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা উপরে, আর উপরে থাকা এ কথাটি সকল সৃষ্টিকুলের উপরে থাকাকেই বুঝায়। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৭/১৬)।

ঘ) যদি ধরে নেয়া হয় যে, আসমান দ্বারা উপরস্থিত গোলকসমূহকে বুঝানো হয়েছে। তবে অবশ্যই অর্থ করতে হবে, তিনি সেটারও উপরে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, (فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ) 'অতঃপর তোমরা যমীনের মাঝে বিচরণ করো' [সূরা আত-তাওবাহ: ০২] অর্থাৎ যমীনের উপরে।

১০০৭. বিষয়টি বুঝার জন্য দেখুন, ইবন তাইমিয়্যা, নাকদুত তা'সীস (১/৫৫৭)...; মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৫২), (৫/২৫৬-২৫৮)।

১০০৮. হাদীসটির তাখরীজ আগে চলে গেছে।

المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي

অর্থেই গ্রহণ করা হবে। কারণ মহান আল্লাহ 'আরশের উপরে, আবার তিনি মুসল্লির সম্মুখেও।[১০০৯] তাছাড়া এ গুণটি তো মাখলুক বা সৃষ্টির জন্যও সাব্যস্ত হতে পারে; কেননা

১০০৯. এটা স্থিরিকৃত বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমানসমূহের উপরে তাঁর 'আরশের উপরে, সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক, তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে তাঁর সত্তার কোনো কিছু নেই, আর না সত্তায় তাঁর সৃষ্টিকুলের কোনো কিছু আছে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন, সকল সৃষ্টিকুলের কারো প্রতিই তিনি মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনিই তাঁর ক্ষমতায় 'আরশ ও 'আরশ বহনকারীদের বহন করে আছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১/৩৬৭), কায়েদাহ জালীলাহ ফিত তাওয়াসসুলে ওয়াল ওসীলাহ, পৃ. ৩৩৫।

বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের মুখোমুখি হয় আর আল্লাহও তার দিকে তাঁর চেহারা নিয়ে অগ্রসর হন, যখন না বান্দা তার চেহারাকে অন্য দিকে না ঘুরায়। বস্তুত এটার ওপর বহু সহীহ হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 'যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন তো সে তার রবের মুখোমুখি হয়', যদি তাই হয়ে থাকে, তবে বান্দা যেদিকেই মুখ করুক না কেন সে তো আল্লাহর চেহারার মুখোমুখি হয়। আর আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, তাঁর আসমানসমূহের উপর, অথচ তিনি পুরো জগতকে ঘিরে আছেন, সুতরাং বান্দা যদিকেই মুখ ফিরাক না কেন আল্লাহ তা'আলা তো তার সামনে হবেই।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৭৬); মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৭)।

এ হাদীসটিকে একদল হাদীস ব্যাখ্যাতা তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন হাফেয ইবন হাজার, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তিনি এ হাদীসে আসা ভাষ্য 'অথবা তাঁর রব্ব অবশ্যই তার ও কিবলার মাঝে থাকেন।' এর ব্যাখ্যায় ইবন হাজার বলেন, 'অনুরূপ এর পরের হাদীসে এসেছে, 'কারণ আল্লাহ তা'আলা তার চেহারার বিপরীতে', তাই খাত্তাবী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কিবলার দিকে তার মুখ করে দাঁড়ানোই তাকে তার রবের ইচ্ছার দিকে নিয়ে যাবে।' তাই সূক্ষ্ম অর্থ হবে, 'তখন তার উদ্দেশ্য তো তার ও তার কেবলার মাঝখানে। আবার কারও কারও মতে, সেখানে একটি মুযাফ বা সম্বন্ধ পদ উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর মহত্ব অথবা আল্লাহর সাওয়াব। ইবন আব্দিল বার বলেন, এটি একটি বাক্য যা কিবলার মর্যাদার মহত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো মু'তাযিলা দলীল নিয়েছে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, নিঃসন্দেহে এটি প্রকাশ্য মূর্খতা। কারণ হাদীসে এসেছে সে যেন তার পায়ের নিচে থুতু ফেলে, এর মাঝে তাদের মূলনীতি ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। আর এর মাঝে তাদের কথারও খণ্ডন রয়েছে যারা বলে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর, আর এটাকে যেভাবে তা'ওয়ীল করা হবে ঐটাকেও অনুরূপ তা'ওয়ীল করে বলা যাবে।' ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১/৫০৮)। আর খাত্তাবীর কথা শুনুন তারই গ্রন্থ আ'লামুস সুনান (১/৩৮৬)।

ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহর এ বক্তব্যের যথাযথ সমালোচনা করেছেন দু'জন প্রখ্যাত আলেম। একজন হচ্ছেন শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায, আরেকজন হচ্ছেন শাইখ আব্দুর রহমান ইবন সালেহ আল-বাররাক। শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ যখন ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ'র এ কথাটি ভুল হওয়া তুলে ধরলেন যেখানে তিনি বলেছেন, 'এ হাদীসে তাদের বক্তব্যের খণ্ডন রয়েছে যারা বলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং 'আরশের উপরে'... তখন তিনি বললেন, 'এসব ভাষ্য ও অনুরূপ ভাষ্যকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার ভাষ্যসমূহের বিপরীতে দাঁড় করানো জায়েয হবে না; কারণ তাঁর 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত ভাষ্যগুলো অকাট্য, সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট।' দেখুন, ফাতহুল বারীর ওপর শাইখ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ'র টীকা (১/৫০৮)।

শাইখ আব্দুর রহমান সালেহ আল-বাররাক বলেন, '... অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া, 'আরশের উপরে উঠা সংক্রান্ত যা কিছু এসেছে তা এ হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে যে, 'নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সালাত আদায়কারীর চেহারার সম্মুখে থাকেন' অথবা 'তিনি সালাত আদায়কারী ও কিবলার মাঝখানে থাকেন' এ হাদীসের বিপরীত বা বিরোধী নয়; কারণ এখানে সেটাই বলা হবে যা আল্লাহর নৈকট্য ও সাথে থাকার ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে। এসব কিছুর কোনোটিই তাঁর সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া বিরোধী নয়। এসবের কোনো কিছুই মহান আল্লাহ সুবহানাহু

الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه.

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك. ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليًا به». فقال له أبو رُزين العقيلي: كيف يا رسول الله، وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليًا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر» أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»

মানুষ যদি আকাশের সাথে আলাপ করে বা চন্দ্র-সূর্যের সাথে চুপে চুপে আলাপ করে তাহলে আসমান, চন্দ্র-সূর্য তার উপরে থাকে এবং তার সম্মুখেও থাকে।

বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা উপমা পেশ করেছেন। আর আল্লাহর জন্য তো রয়েছে সর্বোচ্চ উপমা। তবে উপমা দ্বারা উদ্দেশ্য এটা জায়েয ও সম্ভব বর্ণনা করা, স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়া নয়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليًا به». فقال له أبو رُزين العقيلي: كيف يا رسول الله، وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليًا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر» أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»

"তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় রবকে তার সাথে একান্তভাবে দেখবে। তখন আবু রাযীন আল-উকাইলী তাঁকে বললেন: কীভাবে হে আল্লাহর রাসূল, অথচ তিনি একজন, আর আমরা অনেক? নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাকে আমি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এর উদাহরণ জানিয়ে দিচ্ছি। চাঁদ, তোমরা সকলে সেটাকে একান্তভাবে দেখ, আর সেটি আল্লাহর নিদর্শনাবলি থেকে একটি নিদর্শন। আর আল্লাহ তো আরও অনেক বড়"[১০১০] অথবা নবীজি যেমনটি বলেছেন তেমন।

তিনি আরও বলেছেন: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» "তোমরা তোমাদের রবকে

ওয়া তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক করে না। দেখুন, ফাতহুল বারীর ওপর শাইখ আল-বাররাক এর টীকা (২/১৩২)।

১০১০ হাদীসটি কাছাকাছি শব্দে যারা বর্ণনা করেছেন,

১- আবু দাউদ, আস-সুনান (৫/৯৯-১০০), নং ৪৭৩১।
২- ইবন মাজাহ, আস-সুনান (১/৬৪), নং ১৮০।
৩- আহমাদ, আল-মুসনাদ (৪/১১-১৪), নং ১৬১৮৬, ১৬১৯২, ১৬১৯৮।
৪- ত্বায়ালিসী, পৃ. ১৪৭, নং ১০৯৪;
৫- হাকিম, আলমুস্তাদরাক (৪/৬০৫)। হাদীসটি হাসান।
৬- ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, পৃ. ৪০, নং ৩৯।
৭- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২০০), নং ৪৫৯, ৪৬০।
৮- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/৪৩৮-৪৩৯), নং ২৫৩-২৫৪।
৯- আজুররী, 'আত-তাসদীক বিন-নাযরি ইলাল্লাহ বিল আখিরাহ, পৃ. ৫৩-৫৪।
১০- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৪৮৩)।

فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابهًا للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلاً.

[هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد] :

ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.

واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد،

অবশ্যই দেখতে পাবে যেমন তোমরা চন্দ্র-সূর্য দেখে থাক।"(১০১১) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখাকে দেখার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন, যদিও দৃষ্টটি অপর দৃষ্টের সদৃশ নয়।(১০১২) তাই মুমিনগণ যখন তাদের রবকে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে এবং তাঁর সাথে কথা বলবে প্রত্যেকেই তাঁকে উপরে সম্মুখে দেখবে, যেমন চন্দ্র-সূর্যকে দেখে। কোনো বৈপরীত্য নেই।

[কুরআন ও সুন্নাহ'র যাহের বা প্রকাশ্য ভাষ্যের অর্থ উদ্দেশ্য কী না?]

আর যার আল্লাহ সম্পর্কে কিছু অবগতি আছে, আল্লাহ সম্পর্কে মজবুত জ্ঞান আছে, কুরআন ও সুন্নাহ'কে যেভাবে তা আছে সেভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা তার কাছে ততোটা সুদৃঢ়।

জেনে রাখ! পরবর্তীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: সালাফে সালেহীনের মত হচ্ছে যা এসেছে, যেভাবে এসেছে, সেভাবে মেনে নেয়া। সাথে সাথে এই বিশ্বাস থাকা যে, এগুলোর যাহির (প্রকাশ্য অর্থ) উদ্দেশ্য নয়(১০১৩)।

১০১১. এর তাখরীজ আগে চলে গেছে।

১০১২. দেখাকে দেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে, দৃষ্টকে দৃষ্টের সাথে তুলনা করা হয়নি। এ বিষয়টি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বহু জায়গায় তুলে ধরেছেন। যেমন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৪৭), (৫/১৭৫), (১১/৪৮১), (১৭/৩১৯), (১৮/২০০)।
আর আল্লাহর দেখাকে সূর্য ও চন্দ্র দেখার সাথে তুলনার কারণ:
১- প্রকাশিত ও স্পষ্ট হওয়ার দিক থেকে।
২- উপরে ও উর্ধ্বে হওয়ার দিক থেকে।
৩- দেখার মাধ্যমে পূর্ণ আয়ত্ব বা পরিবেষ্টন করা সম্ভব না হওয়ার দিক থেকে।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখাকে দেখার সাথে তুলনা করলেন, কিন্তু দেখা জিনিসকে দেখা জিনিসের সাথে তুলনা করেননি; কেননা 'কাফ' হচ্ছে তাশবীহ বা 'তুলনা' প্রদানকারী অব্যয় যা 'রুইয়াহ' বা দেখার ওপর ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অনুরূপ ইমাম বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, 'তারা তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে'। আর জানা কথা যে, আমরা সূর্য ও চাঁদকে চাক্ষুষ সামনাসামনি দেখতে পাই, তাই হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা আল্লাহকে সেভাবে দেখা আবশ্যক। কিন্তু যে জিনিস চাক্ষুষ হয় না, বা যে জিনিসের মুখোমুখি হওয়া যায় না, তা দেখার বিষয়টি বিবেক কখনো কল্পনাও করতে পারে না, তাহলে সেটা সূর্য বা চাঁদ দেখার সাথে তুলনীয় কীভাবে হতে পারে? মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৮৪-৮৫)। (সুতরাং চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করার উপকারিতা জানা গেল যে, তাঁকে উপরের দিকে দেখা যাবে।)

১০১৩. উসূলে ফিকহের আলেমগণ 'যাহির' ও 'নস' দু'টি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন।

وهذا لفظ مجمل، فإن قوله: ظاهرها غير مراد، يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله «قِبَل وجه المصلي» أنه مستقر في الحائط الذي

এ কথাটি 'মুজমাল' অস্পষ্ট বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ্য বিষয়(১০১৪); কেননা তার কথা "যাহের উদ্দেশ্য নয়" এটা সম্ভাবনা রাখে যে, তিনি 'যাহির' দ্বারা সৃষ্টির না'ত ও অপ্রাচীনের সিফাত(১০১৫) উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমন উপরোক্ত হাদীসের অর্থ কেউ এটা গ্রহণ করলো যে,

---

তন্মধ্যে নস হচ্ছে যাতে অন্য অর্থ করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন: তিন, চার অথবা যায়েদ, 'আমর ইত্যাদি।

আর যাহির হচ্ছে, যার একটি প্রকাশ্য অর্থ বুঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইচ্ছা করলে দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ নেয়া যায়।

যত অপব্যাখ্যা, বিকৃতি, নিষ্ক্রীয়করণ, সাদৃশ্য প্রদান, দূরবর্তী কোনো অর্থ গ্রহণ কিংবা তৈরি করা ইত্যাদি এসবই বাতিলপন্থীদের প্রধান অস্ত্র। তারা এ সুযোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে দীনের আকীদাহ ও শরী'আহকে বিনষ্ট করেছে। এজন্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে আমরা দেখি তিনি এ মাসআলাতে অত্যন্ত সোচ্চার। বিষয়টি নিয়ে তিনি ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং তাদের মতামত বিস্তারিত বর্ণনা করে খণ্ডন করেছেন যারা বলে, যাহির বা প্রকাশ্য অর্থটিই গ্রহণ করা হবে না, বরং দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করতে হবে। দেখুন, আত-তাদমুরিয়্যাহ, তৃতীয় নীতি, পৃ. ৬৯; মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২০৭), (৬/৩৫৫-৩৫৮), (২০/২১৮), (২৩/১৭৭-১৮৬)।

১০১৪. 'যাহেরুন নুসূস' অথবা 'যাহের' এ শব্দটিকে কালামশাস্ত্রবিদরা এতো বেশি অপব্যবহার করেছে যে তাতে ইজমাল (সংক্ষিপ্ত, ব্যাখ্যাসাপেক্ষ) ও ইশতিরাক (একাধিক অর্থে ব্যবহৃত) শব্দ হিসেবে গণ্য হয়ে গিয়েছে। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বিষয়টি একাধিক কিতাবে আলোচনা করে স্পষ্ট করেছেন। যেমন, দারউত তা'আরুদ্ব (৭/৪৫, ১০৭); মিনহাজুস সুন্নাহ (৪/১৭৯); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৫৫৭); মাজমূ' ফাতাওয়া (২০/১৬৬)।

তিনি বলেন, 'যাহির' শব্দটিতে ইজমাল ও ইশতিরাক রয়েছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৪৩); আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৬৯।

অন্যত্র বলেন, 'যাহির' শব্দটি মুশতারাক'। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২০৭)।

অন্যত্র বলেন, 'যাহির' শব্দটি, পরবর্তীদের পরিভাষায় তাতে 'ইশতিরাক' এসে পড়েছে। মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/৩৭৯); আরও দেখুন, (৩৩/১৭৫); জামে'উর রাসায়িল (৮/১৮৯)।

অন্যত্র তিনি এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, 'যাহিরুল কালাম' বা কথার প্রকাশ্য রূপ বলতে বুঝায়, কোনো ভাষার লোকেরা যারা ভাষা বুঝে তাদের নিরোগ বিবেকের কাছে যা প্রথমেই যে অর্থটি প্রতিভাত হয়। দেখুন, আর-রিসালাতুল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৩১।

তিনি আরও বর্ণনা করেন, 'যাহির' শব্দটি দ্বারা কখনও কখনও উদ্দেশ্য হয়, যা মানুষের কাছে প্রকাশ পায়। আবার কখনও কখনও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শব্দ যার ওপর প্রমাণবহ। তারপর তিনি বলেন, প্রথম উদ্দেশ্যটি মানুষের বুঝ অনুসারে হয়ে থাকে, কুরআনে কারীমে অশুদ্ধ বুঝের বিপরীত অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি, আর তা হচ্ছে, শব্দ যার ওপর প্রমাণবহ সেখানেই যত কথা ও যত মতভেদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (৪/১৭৯); মাজমূ' ফাতাওয়া (২০/১৬৬)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ যখন 'কুরআন কি তার প্রকাশ্য অর্থের ওপর নেয়া হবে? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্তব্য দিলেন তখন বলেছিলেন, 'আর 'যাহির' অর্থের ওপর পরিচালিত করা বলতে যদি সে যাহির উদ্দেশ্য হয়, যে যাহির ছিল উম্মতের সালাফগণের পরিভাষা, আর তা দ্বারা কোনো শব্দকে তার স্থান বা অবস্থা বিকৃত না করে পরিচালিত করা হয়, অনুরূপ আল্লাহর নামসমূহে কোনো রূপ ইলহাদ বা বিকৃতি না করে গ্রহণ করা হয়, কুরআন ও হাদীসকে আহলুস সুন্নাহ ও উম্মতের সালাফদের ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে ব্যাখ্যা না করা হয়, বরং সেগুলোকে ভাষ্যের চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত করা হয়, কুরআন ও সুন্নাহ'র দলীলসমূহের সাথে সামঞ্জস্য করা হয়, সালাফে সালেহীন যেসব বিষয়ের ওপর ইজমা' করেছে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে প্রকাশ করা হয়, তবে সে অবশ্যই তাতে সঠিক পথে আছে। আর সেটাই হক্ব বা যথাযথ।' আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৫৪৬)।

১০১৫. ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ না'ত এবং সিফাত এর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন তিনভাবে:

يصلي إليه، وأن «الله معنا» ظاهره أنه إلى جانبنا، ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.

ومن قال: إن مذهب السلف: أن هذا غير مراد، فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في

আল্লাহ তা'আলা মুসল্লির সম্মুখে অর্থাৎ মুসল্লির সম্মুখস্থ দেওয়ালের মধ্যে স্থির হয়ে আছেন যেদিকে ফিরে সে সালাত আদায় করছে; তেমনি (কুরআনের আয়াতে) "আল্লাহ আমাদের সাথে" মানে আল্লাহ আমাদের পাশে ইত্যাদি, তাহলে সন্দেহ নেই যে, এটা উদ্দেশ্য নয়। আর যে বলবে, সালাফদের মতেও "এটা (উপরোক্ত অর্থ) উদ্দেশ্য নয়"(১০১৬) তবে অর্থের

---

১) না'ত শুধু সেসব গুণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা কর্মজাতীয় আর যা নতুন করে হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় তোমাদের রব্ব আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ কত বরকতময়!" [সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪] অনুরূপ আল্লাহর বাণী "যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বানিয়েছেন শয্যা এবং তাতে বানিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার; আর যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। অতঃপর তা দ্বারা আমরা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে। আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু যাতে তোমরা আরোহন কর।" [সূরা আয-যুখরুফ: ১০-১২] ও অনুরূপ আয়াতসমূহ।

অপরদিকে সিফাত কেবল স্থায়ী সত্তাগত গুণাবলির জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন আল্লাহর বাণী "তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, মহাপবিত্র, শান্তি-ক্রটিমুক্ত, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।" [সূরা আল-হাশর: ২২-২৩] ও অনুরূপ আয়াতসমূহ।

২) সত্তাগত গুণাবলির জন্য না'ত ব্যবহৃত হয় না; যেমন চেহারা, দু' হাত, পা, আঙ্গুল। এগুলোকে 'সিফাত' বলতে হয়। সালাফরা এগুলোকে এ নামই দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে যারা আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করে তারাও এ নাম দিয়েছেন। যদিও কেউ কেউ এ নাম অপছন্দ করেছেন যেমন আবুল ওফা ইবন আকীল ও আরও কয়েকজন। তিনি বলতেন, এগুলোকে সিফাতের ভাষ্য বলা যাবে না, বলতে হবে সম্বন্ধীয় আয়াত। কারণ জীবন্ত সত্তাকে তার হাত বা চেহারা দিয়ে গুণান্বিত করা হয় না। জীবন্ত সত্তার পুরোটাই তো মাওসুফ, সেটা আবার সিফাত হয় কী করে?! তাছাড়া সিফাত এমন এক অর্থকে শামিল করে তা আবার মাওসুফ হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে সিফাত কীভাবে বলা হবে?

বস্তুত আবুল ওফা ও তার মত যারা আছে তাদের এ মতভেদ শাব্দিক। নামকরণ নিয়ে মতভেদ। তারাও এসব সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে করেন, তারাও বলেন, এগুলো দিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ দিতে হবে কোনো প্রকার তামসীল (কারো মত) বা তা'তীল (নিষ্ক্রীয়করণ) না করে। সেটাকে সিফাত নামকরণ হোক বা না হোক।

৩) না'ত সেসব গুণাবলির জন্য ব্যবহৃত হয় যা প্রকাশিত ও বিখ্যাত, আর যা সাধারণ ও বিশেষ সকলেই জানতে পারে, কিন্তু সিফাত তা অনেক ব্যাপক, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকল কিছুকেই শামিল করে।

তাহলে বুঝা গেল যে, না'ত ও সিফাত এর পার্থক্য খাস ও আম এর পার্থক্যের মতো। এ জন্যই কোনো কিছুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়, তার না'ত হচ্ছে এটা ও এটা যা সেখানে প্রকাশ পায়। কারও কারও মতে, বস্তুত না'ত ও সিফাত একই জিনিসের দু'টি নাম। এজন্যই বসরার নাহুবিদরা বলে: বাবুস সিফাত। আর কূফার নাহুবিদরা বলে: বাবুন না'ত। একই উদ্দেশ্য। আসলে বিষয়টি কাছাকাছি। দেখুন, মাদারিজুস সালেকীন (৩/৩৪৫-৩৪৭)।

১০১৬. অর্থাৎ কেউ যদি বলে সিফাতের ভাষ্যসমূহের প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে 'তামসীল' বা কারো মতো হওয়া,

إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا [المعنى] الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبار، معذورًا في هذا الإطلاق. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر: أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون

দিক থেকে তার কথাটি ঠিকই আছে। কিন্তু তার ভুল হচ্ছে, মুতলাক তথা নিঃশর্তভাবে এ কথা বলা যে, এটাই আয়াতের ও হাদীসের যাহির (প্রকাশ্য) অর্থ; কেননা (এগুলোর যাহির অর্থ হিসেবে যখন 'সাদৃশ্য প্রদান' নির্ধারণ করা হবে) তখন এটা নিশ্চিতভাবেই বলতে হবে যে, এটি অগ্রহণযোগ্য ও অসম্ভব অর্থ। আর জানা কথা যে এ অসম্ভব অর্থটি[১০১৭] কখনও যাহির (প্রকাশ্য) অর্থ নয়, যেমনটি আমরা অন্যত্র বর্ণনা করেছি। হ্যাঁ, হয়ত কিছু মানুষের কাছে এই নিষিদ্ধ অর্থটি যাহির অর্থ হিসেবে মনে হতে পারে। তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ বক্তার কথা সঠিক হতে পারে, তখন তার জন্য এভাবে (সাদৃশ্য)কে যাহির অর্থ বলার জন্য ওযর পেশ করতে পারে।[১০১৮]

কেননা যাহির-বাতিন (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) মানুষের অবস্থার ভিন্নতায় ভিন্ন হয়, এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়।[১০১৯] তবে উত্তম ছিল— যে বিশ্বাস করে যে, এটাই যাহির— তার

তবে তাকে বলা হবে এটা অবশ্যই সালাফদের কেউ বলেননি, তাই এটা যদি কেউ বলে যে এ প্রকাশ্য অর্থ সালাফদের উদ্দেশ্য নয়, তবে তার বলা ঠিক আছে। কিন্তু এভাবে বিনা ব্যাখ্যায় বলা ঠিক নয়।

১০১৭. অর্থাৎ কারও কারও এটা বুঝা যে, এসব আয়াত ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ সাদৃশ্য প্রদান করে, আর এ সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছু বুঝা যাচ্ছে না। কারণ সালাফগণ কখনো এ রকম সাদৃশ্য অর্থকে 'যাহির' বলতেন না। তারা কেউই কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থকে কুফরী ও বাতিল বানাতে রাযী নন। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ (তৃতীয় নীতি), পৃ. ৬৯।

১০১৮. অর্থাৎ সবার ক্ষেত্রে এ সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ বুঝাকে 'যাহির' অর্থ বলার কোনো সুযোগ নেই, তারা এগুলোকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করে বুঝে না, কেবল মুষ্টিমেয় লোক এগুলোর অর্থ সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করে বুঝলে এটা তাদের বুঝের দোষ, এটা কখনও কুরআন ও হাদীসের 'যাহির' অর্থ নয়।

১০১৯. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ বিষয়টি একাধিক জায়গায় তুলে ধরেছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হওয়া ও গোপন থাকা এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়' ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৩/৯৭)।
আবার তিনি যখন ইলম ও ই'তিক্বাদ এর আলোচনা করেছেন আর সেখানে কাত'ঈ ও যন্নী বিষয়টির অবতারণা হলো, তখন তিনি বলেন, 'কোনো জ্ঞান অত্যাবশ্যকভাবে প্রমাণিত হওয়া আর চিন্তা গবেষণা লব্ধ অর্জিত জ্ঞান হওয়া অথবা অকাট্য হওয়া বা প্রবল ধারণার মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক বিষয়। কারণ কোনো কোনো বিষয় এক ব্যক্তির নিকট এক অবস্থায় অকাট্য হয়, সে একই জ্ঞান অপর ব্যক্তির কাছে অন্য অবস্থায় অজানা বিষয়ই থেকে যায়। সেখানে ধারণা নির্ভর হওয়ার মতো জ্ঞানও তার অর্জিত হয় না। আবার কোনো কোনো বস্তু কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো অবস্থায় অত্যাবশ্যকভাবে প্রমাণিত হয়, আবার অপর ব্যক্তির নিকট অন্য অবস্থায় চিন্তা-গবেষণালব্ধ জ্ঞান হিসেবে ধরা দেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তা স্বয়ং হক্ব, সত্য ও যথাযথ, মানুষের বিশ্বাস বা অবস্থার ভিন্নতায় তাতে কোনো হেরফের হতে পারে না। তাই সেটা সত্যই যার বিপরীতটি কখনোও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ জন্যই যা কিছু এর বিপরীত হবে তা

أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظًا ومعنى.

وإن كان الناقل عن السلف أراد. بقوله الظاهر غير مراد عندهم. أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله، أو جائزة عليه جوازًا ذهنيًا، أوجوازًا خارجيًا: غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف، أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل. لا نصًا ولا ظاهرًا. أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة.

জন্য এ বর্ণনা দেয়া যে, এটা যাহির নয়, যাতে সে কুরআনের ও হাদীসের শব্দ ও অর্থের যথার্থ হক্ক প্রদান করতে পারে।

আর সালাফদের কথা বর্ণনাকারী যদি, 'যাহির উদ্দেশ্য নয়' একথা দ্বারা, এটা উদ্দেশ্য নেয় যে, এসব আয়াত ও হাদীসের থেকে যে অর্থ প্রকাশ্যে বুঝা যায়, যা আল্লাহর বড়ত্ব-মহত্বের সাথে উপযুক্ত, মাখলুকের গুণের সাথে খাস নয়, বরং সেটা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব বা জায়েয, (মনে ধরে নেয়া জায়েয, বা বাইরে অস্তিত্বশীল জায়েয) কিন্তু সেটা উদ্দেশ্য নয়, তাহলে এমন কথা কেউ সালাফদের থেকে বর্ণনা করলে তার ব্যাপারে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে হবে যে, এই সংকলনকারী সালাফদের কথা সংকলনে ভুল করেছে অথবা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেছে। কেননা এটা কখনো কারো জন্য সম্ভব নয় যে, সে সালাফদের থেকে সংকলন করতে পারবে এমন কথা যে, তারা বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ 'আরশের উপরে নন, আর আল্লাহর জন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো শ্রবণ নেই, নেই কোনো চোখ, নেই কোনো হাত।

সর্বোতভাবে বাতিল হিসেবে ধর্তব্য হবে।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাক্বলি (৩/৩০৪)।

অন্যত্র শাইখুল ইসলাম বলেন, 'বাদীহী (চিন্তা করে বের করা লাগে না) ও নাযরী (চিন্তা গবেষণা করে যা বের করতে হয়) এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিও ব্যক্তি সম্পর্কিত ও আপেক্ষিক বিষয়। কখনও কখনও কারও কাছে কোনো জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে পড়ে, তার অন্তরে সেটা জায়গা করে নেয় ফলে সেটা বাদীহী বিবেচিত হয়, কিন্তু সে একই জ্ঞান অপরের নিকট নাযরী তথা স্বল্প কিংবা দীর্ঘ চিন্তার ফসল হয়ে দাঁড়ায়। বরং এমনও হতে পারে যে অন্যের কাছে তা অর্জন করা অনেক কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল মানত্বিকিয়্যীন, পৃ. ৮৮-৮৯, ৩৬৩।

বরং শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ সাদৃশ্যের ব্যাপারটিও আপেক্ষিক হওয়ার বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি যখন আল্লাহর বাণী, ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞ﴾ [آل عمران: ٧] "তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহকাম', এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ্'।" [সূরা আলে ইমরান: ০৭] এর মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ বা 'মুতাশাবিহাত' এর ওপর আলোচনা করছিলেন তখন বলেন, বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, 'তাশাবুহ' বা সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার বিষয়টিও আপেক্ষিক। কখনও কখনও এর কাছে যা সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হবে অন্যের কাছে তা সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হবে না। বরং এসব সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অর্থ জানা গেলে তখন সেটি আর সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকে না।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/১৪৪)।

[مخالفة طريقة السلف لطريقة المتكلمين]:

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، ويقول: إن طريقة أهل التأويل هي. في الحقيقة. طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها، لمسيس الحاجة إلى ذلك ويقول: الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.

[تصريح السلف بعلو الله على عرشه]:

أما في كثير من الصفات فقطعًا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم

[সালাফগণের নীতি কালামশাস্ত্রবিদদের নীতির বিপরীত]

আমি দেখেছি, সালাফদের মতামত বর্ণনাকারী কেউ কেউ সালাফদের কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে উপরোক্ত এ অর্থ ও উদ্দেশ্য (অর্থাৎ অর্থটি আল্লাহর মর্যাদার সাথে উপযুক্ত, বান্দার গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়ার পরও এই প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এমনটি কোনো সালাফ থেকে কেউ যদি বর্ণনা করে তবে সে সালাফদের নামে মিথ্যা বলেছে) তাদের দিকে সম্পৃক্ত করে থাকে। তারা বলে, তা'ওয়ীলকারীদের তরীকা মূলত সালাফদের তরীকা। অর্থাৎ উভয় পক্ষ[১০২০] এ ব্যাপারে একমত হয়ে গেল যে, এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা আল্লাহর কোনো সিফাত বুঝানো হয়নি।[১০২১] বরং সালাফ বা পূর্বসূরীগণ এগুলোর তা'ওয়ীল করা থেকে নীরব ছিলেন, কিন্তু খালাফ বা পরবর্তীরা এগুলোর তা'ওয়ীল করাকে স্বার্থকর মনে করেছে; কারণ এভাবে তা'ওয়ীল করার প্রয়োজন রয়েছে[১০২২]। তারা আরও বলে: পার্থক্য হচ্ছে- পরবর্তী খালাফরা তা'ওয়ীলের মাধ্যমে এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে, অপরদিকে পূরবর্তী সালাফরা এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে না— এই কারণে যে, অন্য কিছুও উদ্দেশ্য হতে পারে।

বস্তুত নিঃসন্দেহে এ কথাটি সালাফদের ওপর স্পষ্ট মিথ্যাচার।

[সালাফে সালেহীন স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর]

অধিকাংশ সিফাতের ক্ষেত্রে তো সে মিথ্যাচার করার বিষয়টি নিশ্চিত। যেমন- আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপরে। কেননা সালাফদের থেকে সংকলিত, যার দশভাগের

১০২০. অর্থাৎ আহলুত তাজহীল বা তাফওয়ীদ্ব (যারা বলে এগুলোর অর্থ করা জানা যায় না) আর আহলুত তা'ওয়ীল (যারা বলে এগুলোর অর্থ আমরা আমাদের বিবেক দিয়ে নির্ধারণ করব)।

১০২১. উভয় গোষ্ঠীই এ (মিথ্যা) কথার অংশীদার যে, তারা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিফাত সংক্রান্ত ভাষ্যসমূহের বর্ণনা প্রদান করেননি। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (১/১৬)।

১০২২. এটিই তাদের সে প্রবচনের অর্থ, যেখানে তারা বলেছিল যে, 'সালাফদের পদ্ধতি নিরাপদ আর খালাফ বা পরবর্তীদের পদ্ধতি বেশি জ্ঞান প্রকাশক ও বেশি প্রজ্ঞার পরিচায়ক'। আর আমরা দেখেছি যে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ গ্রন্থের শুরুতে কীভাবে এ মিথ্যা প্রবচণটিকে খণ্ডন করেছেন।

.الذي لم يحك هنا عشره.علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.

[إجماع السلف على إثبات الصفات الخبرية] :

والله يعلم أني بعد البحث التام، ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، ما رأيت كلام أحد منهم يدل. لا نصًا ولا ظاهرًا، ولا بالقرائن. على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيرًا من كلامهم يدل. إما نصًا، وإما ظاهرًا. على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة؛ وما رأيت أحدًا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه، وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات؛ كقول نعيم بن حماد الخزاعي. شيخ البخاري .:

একভাগও এখানে আলোচনায় আসেনি, সালাফদের সেসব কথা নিয়ে যে কেউ চিন্তা গবেষণা করবে সে অবশ্যই জানতে পারবে যে, তারা স্পষ্টভাবেই বলেছেন, আল্লাহ্ প্রকৃতই 'আরশের উপরে এবং এর বিপরীত কখনো কোনো কিছু তারা বিশ্বাস করেননি। আর তাদের অনেকেই বহু সিফাতের ক্ষেত্রে এরূপটি স্পষ্ট করে বলেছেন।

[আল্লাহর সিফাতে খবরিয়্যাহ (কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে প্রাপ্ত) গুণাবলি সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের ইজমা' বা ঐকমত্য]

আল্লাহ জানেন যে, আমি পূর্ণ গবেষণার পর এবং সালাফদের কথা যথাসম্ভব অধ্যয়ন করার পর তাদের কারও কথাই এমন পাইনি যে, তা প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে সিফাতে খবরিয়্যাহ (কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে প্রাপ্ত সিফাত)কে নাকচ করা বুঝায়। বরং যেটা আমি পেয়েছি তা হচ্ছে, তাদের বহু কথা, হয় নস (অকাট্য)ভাবে না হয় যাহের (প্রকাশ্য অর্থ)ভাবে, এ জাতীয় সিফাত সাব্যস্ত করার ওপর প্রমাণ বহন করছে।[১০২৩] আমি প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেক সিফাত সাব্যস্ত করার বিষয়টি বর্ণনা করছি না, তবে আমি যা দেখেছি তা হচ্ছে, তারা সামগ্রিকভাবে এ জাতীয় সিফাতগুলোকে সাব্যস্ত করেছেন। আবার এটাও পাইনি যে, তারা সিফাতগুলো নাকচ করেছেন। তারা কেবল নাকচ করেছেন সাদৃশ্য দেয়া। আর যারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয় এমন মুশাব্বিহাদের বক্তব্য তারা

১০২৩. যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তার বিরোধীদেরকে, যখন তাদের সাথে আকীদায়ে ওয়াসেত্বিয়্যাহ নিয়ে বিতর্ক করছিলেন তখন চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেছিলেন, 'যারা এর (আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত ওয়াসেত্বিয়্যাহ গ্রন্থে যা এসেছে তার) কোনো কিছুর বিরোধিতা করবে তাদের সকলকে তিন বছর সময় দিলাম, তারা যদি আমি যা বর্ণনা করেছি তার কোনো কানাকড়ির বিরুদ্ধে প্রথম তিন প্রজন্মের কাছ থেকে এর বিপরীত কিছু আনতে পারে তাহলে আমি তা থেকে প্রত্যাবর্তন করব, আর আমার ওপর দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে প্রথম তিন প্রজন্মের সকল গোষ্ঠী থেকে উদ্ধৃতি আনার, যা দিয়ে আমি যা বলেছি, তার পক্ষে প্রমাণ পেশ করবো।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৬৯), (৬/১৫)।

কেউ যদি এসব সিদ্ধান্তের দিকে তাকায় তবে তার কাছে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র প্রশস্ত জ্ঞান, শক্তিশালী অনুসরণ, পূর্ণ পর্যবেক্ষণ, সালাফরা যার ওপর ছিলেন তার প্রতি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও তাঁর সর্বোচ্চ সূক্ষ্ম কর্মকাণ্ডের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারবে না।

«من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا».

অস্বীকার করেছেন। সাথে সাথে আমি তাদেরকে দেখেছি যারা সিফাত অস্বীকার করে তাদের কথাও অস্বীকার করেছেন।(১০২৪) যেমন, ইমাম বুখারীর শাইখ নু'আইম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'য়ী বলেছেন:

«من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً»

"যে আল্লাহকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দিল সে কাফের হয়ে গেলো, আবার আল্লাহ যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন সেটা যে অস্বীকার করলো সেও কাফের হয়ে গেল। আর আল্লাহ নিজের ব্যাপারে যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন তাঁর সম্পর্কে তা বর্ণনা করা সাদৃশ্য দেয়া নয়।"(১০২৫)

১০২৪. জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় তাওহীদের বিপরীতে নিয়ে এসেছে 'তাশবীহ'কে। আর 'তাশবীহ' বলতে তারা বুঝে সিফাত সাব্যস্ত করাকে। ইবন তাইমিয়্যাহ সেটার অসারতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক, আর তাকে তার সৃষ্টির মত মনে করা। এটা (আল্লাহকে সৃষ্টির মত মনে করা) যদিও তাওহীদের বিপরীত, কিন্তু তারা যেটাকে তাশবীহ বা সাদৃশ্য মনে করে তাওহীদের বিপরীতে নিয়ে এসেছে সেটা উদ্দেশ্য নয়, কারণ তারা সিফাসতমূহের অর্থকে এমনসব নাম দিয়েছে (যেমন তাশবীহ) যার সপক্ষে আল্লাহ কখনো কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৪২৮-৪২৯)।

১০২৫. দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৫৩২), নং ৯৩৬; ইবন আসাকির, তারীখে দামেশক (১৭/৬১২); যাহাবী, আল-'আরশ, পৃ. ১২০, নং ২০৯; আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম (২/১০৯৩), নং ৪২৯; মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৮৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৯৯)।
শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী এ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি আরও বলেন, এ বর্ণনার সনদের লোকগুলো নির্ভরযোগ্য। দেখুন, মুখতাসারুল উলু, পৃ. ১৮৪; তাছাড়া এ বর্ণনাটি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ নিয়ে এসেছেন, তাঁর ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২২১; শাইখুল ইসলাম তার মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৬৩)।
ইমাম যাহাবী বলেন, আর আমাদের কাছে এটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়ে এসেছে। কতই না সুন্দর এ উক্তি। ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৯৯)।
তিনি অন্যত্র বলেন, 'এ কথাটি হক, সত্য ও যথাযথ। 'তাশবীহ' থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, অনুরূপ সিফাত সংক্রান্ত হাদীস অস্বীকার করা হতেও। যে দীনের বুঝ অর্জন করেছে সে কখনও এসব সিফাতের সাব্যস্ত ভাষ্যগুলো অস্বীকার করে না। এ জায়গায় দু'টি নিন্দিত অবস্থান রয়েছে,

(১) সেগুলোকে তা'ওয়ীল করা ও তার অর্থকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। সালাফরা কখনোও এগুলোর তা'ওয়ীল করেননি, আর তারা এগুলোর শব্দসমূহকে বক্র করে স্থানচ্যুতও করেননি, বরং এগুলোর অর্থের ওপর ঈমান এনেছেন এবং (ধরণ নির্ধারণে প্রবৃত্ত না হয়ে) এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে পার করে দিয়েছেন।

(২) দ্বিতীয় নিন্দিত অবস্থান হচ্ছে, এগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা, এগুলোকে মানুষের গুণের মত ধারণা করা, অন্তরে এগুলোর আকার নির্ধারণ করা, এটি নিঃসন্দেহে বড় ধরনের মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা। এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, গুণ সব সময় মাওসূফ তথা যার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে তার অবস্থা ও অবস্থান অনুসারে হয়ে থাকে। তাহলে যেহেতু আমরা মাওসূফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দেখিনি, আর আমাদের কাছে কেউ সংবাদ দেয়নি যে, তিনি তাঁকে দেখেছেন, সাথে সাথে আমাদের সামনে রয়েছে আল্লাহর বাণী, (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي مُعَطِّل؛ وهذا كثير جدًا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا. كذبًا منهم وافتراء. حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه

তারা (সালাফগণ) যখন কোনো লোককে দেখতেন যে, সে সাদৃশ্য নাকচ করতে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেছে, কিন্তু সিফাত সাব্যস্তের কথা আলোচনা করেনি, তখন তারা বলতেন: লোকটি মু'আত্ত্বিল (আল্লাহর গুণ অস্বীকারকারী) জাহমী। তাদের কথায় এরূপ অনেক রয়েছে; কেননা আজ পর্যন্ত জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলারা যখনই কাউকে সিফাত সাব্যস্ত করতে দেখেছে, তখনই তারা তাদের মিথ্যা ও অপবাদের আশ্রয় নিয়ে বলেছে, সে তো মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যদানকারী)।[১০২৬] এমনকি তাদের অনেক উগ্রবাদী লোক নবীদেরকে পর্যন্ত

"তাঁর মতো কোনো কিছু নেই।" [সূরা আশ-শূরা: ১১] তাহলে কীভাবে আমাদের ব্রেনে মহান আল্লাহর ধরণ নির্ধারণের বিষয়টি অবশিষ্ট থাকতে পারে? আল্লাহ তা থেকে কতই না ঊর্ধ্বে। অনুরূপভাবে তাঁর পবিত্র সিফাতসমূহের ব্যাপারেও একই কথা কার্যকর, আমরা সেগুলোকে স্বীকার করি, আর বিশ্বাস করি যে, তা হক্ক, সত্য ও যথাযথ। কিন্তু আমরা এগুলোকে কোনো প্রকার তামসীল বা কারো মত মনে করি না, কোনো আকার নির্ধারণ করি না।' ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৬১০-৬১১)।

১০২৬. তাশবীহ বা সাদৃশ্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়, আল্লাহ তা'আলার জন্য যারাই কোনো নাম বা গুণ সাব্যস্ত করে তাদেরকেই 'মুশাব্বিহা' নামে অভিহিত করে। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, জাহম ইবন সাফওয়ান মনে করেছে, যে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে সেসব গুণে গুণান্বিত করে যা দিয়ে তিনি নিজেকে তার কিতাবে গুণান্বিত করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলো দিয়ে হাদীসে তাকে গুণান্বিত করেছেন, সে কাফের হয়ে যাবে, আর সে মুশাব্বিহা হয়ে যাবে। দেখুন, ইমাম আহমাদ, আর-রাদ্দু আলায যানাদিকাতি ওয়াল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২০৬।

অনুরূপভাবে 'জাহম' ইবন সাফওয়ানের পরে যত সিফাত অস্বীকারকারী এসেছে সকলেই এ কাজটি করেছে। যারাই আল্লাহ তা'আলার সিফাত সাব্যস্ত করেছে তাদেরকেই তারা 'মুশাব্বিহা' বা দেহবাদী বলেছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত সিফাত অস্বীকারকারীদের একটি চিহ্নে পরিণত হয়েছে তারা এর মাধ্যমে পরিচিতি পেতে থাকে। এজন্য ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়িয়াহ বলেন, 'জাহম ও তার অনুসারীদের আলামত হচ্ছে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ওপর মিথ্যাচার করে বলে, এরা মুশাব্বিহা।

যারা এভাবে আহলুস সুন্নাহকে মুশাব্বিহা বলত, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী। তিনি বলেন, 'জেনে রাখ, হক্ক মতবাদ হচ্ছে, মহান রব্ব সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেকোনো হাইয়্যেয বা স্থানে হওয়া থেকে পবিত্র, অনুরূপ কোনো দিক দ্বারা বিশেষিত হওয়া থেকে পবিত্র। আর যারা মুশাব্বিহা তারা বলে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ উপরের দিক দ্বারা বিশেষিত।' আশ-শামিল, পৃ. ৫১১। উল্লেখ্য, এখানে তিনি হক্ক মতবাদ বলে আশ'আরীদের বুঝিয়েছেন।

অনুরূপ কাজটি শাহরাস্তানীও করেছে। তিনি বলেন, 'পরবর্তী একটি গোষ্ঠী সালাফে সালেহীন যা বলেছে তার ওপর বাড়তি করেছে, তারা বলেছে, এসব আয়াত ও হাদীসকে তার প্রকাশ্য অর্থে নিতে হবে, এভাবে তারা কেবল তাশবীহ বা সাদৃশ্য প্রদানেই নিপতিত হয়েছে, যা সালাফদের বিশ্বাসের বিপরীত।' আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/১৪৬০।

বরং কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদ হাম্বলীদের দিকে তাশবীহ এর দোষ যুক্ত করতো; কারণ ফিকহী মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে তারাই অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার সিফাত সাব্যস্তকরণে বিখ্যাত ছিল। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে যারা বিতর্ক করে বলেছিল, 'আহমাদ এর দিকে বেশ কিছু হাশাওয়িয়্যাহ (অক্ষরবাদী) ও মুশাব্বিহা গোষ্ঠী নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে', একথার জবাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তিনি তাদের দাবি খণ্ডন করে বলেছিলেন, ইমাম আহমাদের সাথীদের ছাড়া অন্যদের মধ্যে মুশাব্বিহা ও মুজাসসিমাদের সংখ্যা অনেক বেশি।

عليهم بذلك، حتى قال ثُمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: «ثلاثة من الأنبياء مشبهة،

মুশাব্বিহা বলে অপবাদ দিয়েছে। এমনকি জাহমিয়্যাহ(১০২৭) নেতা সুমামাহ ইবনুল আশরাস(১০২৮) বলেছে: তিনজন নবী মুশাব্বিহা(১০২৯) ছিলেন।

এই যে কুর্দীরা তারা সবাই শাফে'য়ী মাযহাবভুক্ত, তাদের মধ্যে যত তাশবীহ আর তাজসীম পাওয়া যায় তা অন্য কোনো প্রজাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। জীলানের অধিবাসীরা তাদের মধ্যে শাফে'য়ী ও হাম্বলী। একান্ত হাম্বলী যারা তাদের মাঝে এসব কিছু নেই যা অন্যদের মধ্যে আছে। এই যে কাররামিয়্যাহ মুজাসসিমাহ, এরা সবাই হানাফী'। মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৯৭); হিকায়াতু মুনাযারাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ।

ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহ'র পূর্বোক্ত বক্তব্য বর্ণনার পরে বলেন, 'অনুরূপভাবে সালাফগণের অনেক ইমাম বলেছেন, জাহমিয়্যাদের আলামত হচ্ছে তারা আহলুস সুন্নাহকে মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী) বলে; কারণ আল্লাহর নাম ও গুণ অস্বীকারকারী প্রতিটি সম্প্রদায় যারা নাম ও গুণ সাব্যস্ত করে তাদেরকে মুশাব্বিহা বলতো। এজন্য সিফাত অস্বীকারকারী জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, রাফেযী প্রমুখ লোকদের কিতাবসমূহ, যারা আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করে তাদেরকে, মুশাব্বিহা ও মুজাসসিমা নামক অপবাদে ভরপুর।' ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১৭৯)।

১০২৭. 'জাহমিয়্যাহ' শব্দটি কখনও কখনও তাদের জন্য প্রয়োগ করা হয়, যারা আল্লাহর গুণাবলি নিষ্ক্রীয় করে অথবা সেগুলোর কিছু কিছুকে নিষ্ক্রীয় করে। সে হিসেবে মু'তাযিলাদেরকে জাহমিয়্যাহ বলা হয়, কারণ তারা আল্লাহর প্রায় সকল গুণকেই অস্বীকার করে। অনুরূপভাবে তা দ্বারা আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়্যাদেরকেও বুঝানো হয়; কারণ সামান্য কিছু সিফাত বাদে সকল সিফাতকে অস্বীকার করে থাকে। তবে সাধারণভাবে যখন 'জাহমিয়্যাহ' ফির্কা হিসেবে বর্ণনা করা হয় তখন যারা আল্লাহর সকল নাম ও গুণ অস্বীকার করে তাদেরকে বুঝানো হয়। বিশেষ করে যখন জাহমিয়্যাহ বলার পরে ভিন্ন করে মু'তাযিলা, আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়্যাহ বলা হয় তখন প্রত্যেক গোষ্ঠীকে আলাদা বুঝানো হবে। যেমন কেউ বললো, জাহমিয়্যাহ, আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়্যাহ সম্প্রদায় আহলুস সুন্নাত এর আকীদাহ বিরোধী।

দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/৯৯), (৬/৫৫, ৩৫৮); আর রিসালাতুল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৩৬।

১০২৮. তিনি হচ্ছেন আবু মা'ন সুমামাহ ইবন আশরাস আন-নুমাইরী আল-মু'তাযিলী। বিশর ইবনুল মু'তামির আল-মু'তাযিলির ছাত্র। তাছাড়া সে জাহেয এর ছাত্রত্বও গ্রহণ করে। খলীফা হারূন-অর-রশীদ ও তার ছেলে মামুনের সাথে যোগাযোগ রাখত। মামুনের বিশেষ লোক ছিল। তার মুনাযারায় সে আজে বাজে ফালতু কথা নিয়ে আসত। মামুন তাকে ওযীর বানাতে চেয়েছিল কিন্তু সে অপারগতা প্রকাশ করে। হিজরী ২১৩ সালে সে মারা যায়। মাকরীযী তাকে ধ্বংসাত্মক এক ফির্কার প্রধান হিসেবে গণ্য করেছেন। তার অনুসারীরা 'সুমামিয়্যাহ' নামে প্রসিদ্ধ। মু'তাযিলাদের থেকে তার কিছু মাসআলা আলাদা ছিল। তার মতামতের মধ্যে ছিল, সে বলতো, জগত আল্লাহর প্রকৃতির কর্ম। আহলুল কিতাব, মূর্তিপুজকদের মধ্যে যারা মুকাল্লিদ তারা জাহান্নামে যাবে না, বরং তারা মাটি হয়ে যাবে। যারা কবীরা করতে করতে মারা যাবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। ঈমানদারদের বাচ্চারা মাটি হয়ে যাবে।

তার সম্পর্কে ইবন কুতাইবাহ বলেন, দীনের স্বল্পতা, ইসলামের বিনষ্টতা, ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, যাচ্ছে তাই মুখ চালানোর ব্যাপারে তার মতো এমন কোনো মানুষ দেখা যায়নি, যারা আল্লাহকে জানে ও তার ওপর ঈমান রাখে।

ইমাম যাহাবী বলেন, বড় মু'তাযিলাদের একজন, পথভ্রষ্টদের শিরোমনি।

সাফাদী বলেন, দীনদারীতে অধঃপতিত ও বাজে কথা জমাকারী এক ব্যক্তি ছিল।

দেখুন, ইবনুল মুরতাদ্বা, ত্বাবাক্বাতুল মু'তাযিলাহ, পৃ. ৬২-৬৭; খত্বীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ (৭/১৪৫); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/২০৩); মীযানুল ই'তিদাল (১/৩৭১); ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (২/৩৯৮); সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত (১১/১৬); যিরিকলী, আল-আ'লাম (২/১০০)।

১০২৯. নবী-রাসূলগণকে কারা মুশাব্বিহা বলতে পারে? কতবড় ধৃষ্টতা! তারা দীন কি তাহলে কাফেরদের

موسى حيث قال: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، وعيسى حيث قال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦]، ومحمد حيث قال: «ينزل ربنا». وحتى أن جُلَّ المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل: مالك وأصحابه والثوري وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد وغيرهم، في قسم المشبهة.

---

(১) মূসা 'আলাইহিস সালাম, যখন তিনি বলেছিলেন: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ [الاعراف: ١٥٥] "এটা তোমার পরীক্ষা বৈ কিছুই নয়।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৫]

(২) 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম, যখন তিনি বলেছিলেন: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] "আমার অন্তরের কথাতো আপনি জানেন, কিন্তু আপনার নিকট যা আছে তা আমি জানি না" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১১৬]

(৩) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যখন তিনি বলেছেন: "আমাদের রব্ব অবতরণ করেন।"(১০৩০) [নাউযুবিল্লাহ]

এমনকি মু'তাযিলাদের অধিকাংশ গোষ্ঠী, বিশুদ্ধ আকীদাহ'র অধিকাংশ ইমাম ও তাদের ছাত্রগণ যেমন, ইমাম মালেক ও তার ছাত্রগণ, সাওরী ও ছাত্রগণ, আওযা'ঈ ও তার ছাত্রগণ, শাফে'য়ী ও তার ছাত্রগণ, আহমদ ও তার ছাত্রগণ, ইসহাক ইবন রাহওয়াই, আবু উবাইদ প্রমুখকে তারা মুশাব্বিহা শ্রেণিভুক্ত গণ্য করত।(১০৩১)

থেকে পেয়েছে? এমন কথা কোনো ঈমানদার বলতে পারে? অথচ এমন সময়ও হয়ত আসবে কেউ এই সুমামার মতাদর্শ কেউ কেউ প্রচার করবে। কারণ প্রতিটি গোষ্ঠীর পরবর্তীতে ওয়ারিশ রয়েছে। মতের প্রবক্তা মরলেও মত মরে যায় না। নাউযুবিল্লাহ।

১০৩০. সুমামাহ এর এ বক্তব্যটি অন্য কোনো সূত্রে পাওয়া যায়নি। তবে এমন বক্তব্য দিয়েছিলেন ইবন আবী দুআদ। দেখুন, যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, পৃ. ১৪০; অনুরূপ ইবন আবী হাতেম, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহতেও তা এসেছে, যা যাহাবী বর্ণনা করেছেন তার থেকে।

১০৩১. অন্যত্র শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'মু'তাযিলাহ, জাহমিয়্যাহ ও তাদের মত যারা আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলি অস্বীকারকারী আছে, যারা যারা আল্লাহ তা'আলার সিফাত সাব্যস্ত করে তারা তাদের প্রত্যেককে মুজাসসিমা (দেহবাদী) মুশাব্বিহা (সাদৃশ্য প্রদানকারী) বলে। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত ইমাম যেমন মালেক, শাফে'য়ী, আহমাদ ও তার সাথীদেরকে মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা হিসেবে গণ্য করে। যেমনটি 'আয-যীনাহ' গ্রন্থের লেখক আবু হাতেম ও তার মতো অন্যান্যরা উল্লেখ করেছে। সে যখন মুশাব্বিহাদের বিভিন্ন উপদলের বর্ণনা দিচ্ছিল তখন বলে, 'আর তাদের মধ্যে আরেক গোষ্ঠী রয়েছে, যাদেরকে বলা হয় মালেকী, তারা এক লোকের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে যাকে বলা হয় মালেক ইবন আনাস। আবার তাদের মধ্যে আরেক গোষ্ঠী রয়েছে, যাদেরকে বলা হয় শাফে'য়ী, তারা এক লোকের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে, যাকে বলা হয় শাফে'য়ী....।' ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১০৫)।

ইবন তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, 'বস্তুত 'মুশাব্বিহা' নামটির কোনো নিন্দাসূচক কিছু কুরআনেও আসেনি, হাদীসেও আসেনি, এমনকি কোনো সাহাবী, তাবে'য়ীদের কথাতেও আসেনি। তবে সালাফে সালেহীনের একটি গোষ্ঠী যেমন, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী, ইয়াযীদ ইবন হারূন, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহ, নু'আইম ইবন হাম্মাদ প্রমুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে 'তাশবীহ' বা সাদৃশ্য প্রদানের নিন্দা সংক্রান্ত ভাষ্য এসেছে। তারা তাদের দ্বারা যেসব মুশাব্বিহাদের নিন্দা করেছেন সেটা বলেও দিয়েছেন যে, তারা হচ্ছে ঐসব লোক যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে

[إطلاق أهل البدع الألقاب الشنيعة على أهل السنة]:

وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءًا أسماه: «تنزيه الشريعة

[বিদ'আতীরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ওপর নিকৃষ্ট উপাধী প্রয়োগ করে থাকে]

আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন উসমান ইবন দারবাস আশ-শাফে'য়ী[১০৩২] একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন "তানযীহুস শরী'আহ 'আনিল আলক্বাবিশ শানী'আহ"[১০৩৩]

সৃষ্টির গুণাবলির মতো মনে করে। এর মাধ্যমে তারা সেসব লোকদের নিন্দা করেছে যারা কুরআন ও সুন্নাহ'র বিরোধিতা করেছে, কারণ তারা তামসীল অর্থাৎ স্রষ্টার গুণকে সৃষ্টির গুণের মতো করে সাব্যস্ত করেছে। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩৮৭)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বর্ণনা করেছেন যে, 'এসব নাম অর্থাৎ হাশাওয়িয়্যাহ, মুশাব্বিহা.. এ নামগুলোর সপক্ষে আল্লাহ কখনও কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। বস্তুত যার প্রশংসা সম্মানের আর যার নিন্দা অসম্মানের তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। দীনের মধ্যে যেসব নামের ব্যাপারে প্রশংসা ও নিন্দা জড়িত তা তো কেবল সেসব নামের যার সপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, আর যার ওপর কুরআন ও সুন্নাহ অথবা ইজমা' প্রমাণবহ। যেমন মুমিন ও কাফের, আলেম ও জাহিল, মুকতাসেদ বা মধ্যপন্থা অনুসরণকারী ও মুলহিদ বা বিশ্বাস ধ্বংসকারী। কিন্তু এসব নাম (হাশাওয়িয়্যাহ, মুশাব্বিহা ইত্যাদি) তা আল্লাহর কিতাবে নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও নেই, উম্মতের সালাফে সালেহীনের ইমামগণের কেউ সেটার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলেননি। সর্বপ্রথম যারা এসব দিয়ে নিন্দা জ্ঞাপনের সংস্কৃতি আবিষ্কার করে তারা হচ্ছে মু'তাযিলা গোষ্ঠী, যারা মুসলিমদের দল থেকে নিজেরা আলাদা দল গঠন করেছিল।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১৪৬)।
তিনি আরও সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন যে, মু'তাযিলারা 'তাশবীহ' এর বিরাট অংশ গ্রহণ করেছে। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মু'তাযিলারা কাদারিয়্যা, যারা আল্লাহর কর্মকাণ্ডে তাশবীহ দিয়েছে, তাই তাদেরকে বলা হয়, 'মুশাব্বিহা ফিল আফ'আল'; কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার কর্মে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয় আর সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তাশবীহ দেয়। (কেননা নিজেরা নিজেদের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা দাবি করে থাকে, অথচ আল্লাহ বান্দা ও বান্দার কর্ম সবই সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে স্রষ্টার সাথে তাশবীহ দিল।) দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৮/৪৩১)।
তাছাড়া তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলি অস্বীকার করার আগে সেটাকে তামসীল ও তাশবীহ দিয়ে নিয়েছে। কারণ তারা প্রথমেই মনে করেছে আল্লাহ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহকে সৃষ্টির মত মনে করা, তারপর সেটাকে প্রতিরোধ করতে নেমেছে না করা ও নিষ্ক্রীয় করার মাধ্যমে। কেননা একটি বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, সকল (মু'আত্তিল) নিষ্ক্রীয়কারী (তামসীল) সমতা বিধানকারী। যেমনটি অনেকবার বর্ণিত হয়েছে।

১০৩২. তিনি হচ্ছেন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন উসমান ইবন 'ঈসা ইবন দারবাস, জালালুদ্দীন আল-মারানী, আল-কুর্দী আল-মিসরী। হাদীস সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ সফরকারী ব্যক্তি তিনি যেসব দেশ সফর করেছেন তন্মধ্যে রয়েছে, মিসর, ইরাক, দামেশক, খুরাসান, আসফাহান ইত্যাদি। অনেক লিখেছেন। তার থেকে হাদীস নিয়েছেন আব্দুল আযীম আল-মুনযেরী প্রমুখ। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, 'তিনি শাফে'য়ী মাযহাব সম্পর্কে ভালো জানতেন। তার পিতার কাছেই ফিকহ অর্জন করেন। তিনি নেককার ও কল্যাণকামী ছিলেন। যুহদ ও স্বল্পে তুষ্টিতা, দুনিয়া বিমুখ, আখেরাতের কাজে অগ্রণী মানুষ ছিলেন। হিন্দুস্তান ও ইয়ামানের মাঝখানে হিজরী ৬২২ সালে তার মৃত্যু হয়। দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২২/২৯০); আসনাওয়ী, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ (১/১২৮)।

১০৩৩. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ কিতাবটির কথা অন্যান্য গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'তিনি এ গ্রন্থে এ অধ্যায়ে সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের বহু বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।' ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৩৮০)।

عن الألقاب الشنيعة» وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة،

যাতে তিনি এসব ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বিদ'আতীদের প্রত্যেক গোষ্ঠীই সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে' মারাত্মক দোষণীয় উপাধী প্রদান করে থাকে, তারা তাদের নষ্ট মত অনুযায়ী এটাকেই বিশুদ্ধ মনে করে। যেমন, মুশরিকরা আল্লাহর নবীকে এমনসব উপাধী প্রদান করতো যা মূলত তারা মিথ্যা ও অপবাদ হিসেবে রটনা করেছিল।[১০৩৪]

তাই দেখা যায়, রাফেযীরা[১০৩৫] আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে বলে "নাওয়াসিব"[১০৩৬] বা নাসেবী। কাদারিয়্যাহরা[১০৩৭] আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের

১০৩৪. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র বলেছেন, "তুমি দেখ এমনভাবে কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবি বলতো, জাদুকর বলতো, গণক বলতো। অনুরূপভাবে বিদ'আতীরা আহলুস সুন্নাহকে নাসেবী বলে, মুজবিরাহ বলে, মুশাব্বিহা বলে।"... দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৩/৬৪৩)।

১০৩৫. রাফেদ্বী হচ্ছে সেসব সম্প্রদায় যারা আবু বকর ও 'উমারের ওপর আলীকে স্থান দেয়। এদের বিস্তারিত পরিচয় আগে চলে গেছে।

১০৩৬. 'নাওয়াসেব' শব্দটি বহুবচন। যার একবচন হচ্ছে নাসেবী, যা নাসব শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ শত্রুতা। সাধারণত যারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার সাথীদের ঘৃণা করে তাদেরকে নাসেবী বলা হয়। তাদের মধ্যে খারেজীদের সকল গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। কারো কারো মতে, যারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও আলে বাইত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাদেরকে 'নাসেবী' বলা হবে। দেখুন, ইবন হাজার, হাদইউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী ৯১/৪৫৯); ফাতহুল বারী (১০/৪২০)। কারও কারও মতে, নাসেবী হচ্ছে তারা যারা 'আলে বাইত' বা রাসূলের পরিবারকে কথা বা কাজে কষ্ট দেয়। এটি ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৫৪)। বস্তুত এটিই সঠিক সংজ্ঞা।

মনে হয় এ পরিভাষাটি রাফেদ্বীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ব্যবহার করেছে সে হচ্ছে কবি ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আল-হিমইয়ারী, যাকে 'আস-সাইয়্যেদ' উপাধী প্রদান করা হয়, হিজরী ১৭৩-১৭৯ সালের মধ্যে যার মৃত্যু হয়।

আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের মধ্যে এ 'নাসেবী' পরিভাষাটি যে প্রাচীন ভাষ্যে পাওয়া যায় তা হচ্ছে 'আলী ইবনুল মাদীনী'র বক্তব্যে। (মৃত্যু ২৩৪ হিজরী)। যখন তিনি বলেছিলেন, যে কেউ বলবে, 'অমুক মুশাব্বিহ' আমরা জানব যে, লোকটি জাহমী। আর যে কেউ বলবে, 'অমুক মুজবির' আমরা বুঝবো যে লোকটি কাদারিয়্যাহ, আর যে কেউ বলবে যে, 'অমুক নাসেবী' আমরা জেনে নেব যে, লোকটি 'রাফেদ্বী'। লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৩০৬।

কিন্তু রাফেদ্বী সম্প্রদায়, তারা এ নামটি প্রদান করে এমন সকলকেই যারা আবু বকর ও 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে ভালোবাসে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। বস্তুত এটা তাদের সে নীতি অনুযায়ী, যাতে তারা বলে থাকে, যারাই আবু বকর ও 'উমারকে ভালোবাসবে তারাই আলীকে ঘৃণা করেছে। আর সেজন্য তারা আহলুস সুন্নাহকে নাওয়াসিব বলে থাকে।" দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (২৫/৩০১); আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ১২২-১২৩।

১০৩৭. কাদারিয়্যাহ বলতে তাদেরকেই বলা হয় যারা তাক্বদীর অস্বীকার করে। কিন্তু এখানে তা দ্বারা মু'তাযিলাদের বুঝানো হয়েছে।

লোকদেরকে বলে "মুজবিরাহ" বা জাবরিয়্যাহ।(১০৩৮)

মুরজিয়ারা(১০৩৯) আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতকে বলে "শুককাক"(১০৪০)।

১০৩৮. মুজবিরাহ বা জাবরিয়্যাহ বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা তাক্বদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। তারা মানুষদের থেকে সকল কর্ম ও তাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে। তারা বান্দার সকল কাজ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে। আল্লাহই সব করেছেন বান্দা কিছুই করেনি। তারা দু' ভাগে বিভক্ত: এক. খাঁটি জাবরিয়্যাহ, যারা আল্লাহর জন্য কোনো কাজই সাব্যস্ত করে না, তাদের মতে বান্দার কাজ করার ক্ষমতাই নেই। দুই. মাঝামাঝি ধরনের জাবরিয়্যাহ, যারা বান্দার জন্য প্রভাবহীন কুদরত বা ক্ষমতা সাব্যস্ত করে (জাবরে মা'নাওয়ী)। দেখুন, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২৭৯-২৮৭। তবে কাদারিয়্যাহ ফির্কার লোকেরা জাবরিয়া বা মুজবিরাহ বলে আহলুস সুন্নাহকে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। কারণ আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে যে, সবকিছু আল্লাহর নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, তবে বান্দার কাজ করার ক্ষমতা আছে।

কাদারিয়া গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে জাবরিয়া বা 'মুজবিরাহ' বলে বদনামী করার বিষয়টি ইমাম ইবন আবী হাতেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন তিনি বিদ'আতীদের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন বলেন, 'আমার পিতাকে বলতে শুনেছি তুমি বিদ'আতীর পরিচয় পাবে যখন তুমি দেখবে যে তারা সেসব লোকের বিরুদ্ধে লেগে যায় যারা 'আছার' (সালাফদের মত) অনুসরণ করে।... আর কাদারিয়্যাদের আলামত হচ্ছে তারা সেসব লোককে মুজবিরাহ বলে যারা 'আছার' (সালাফদের মত) অনুসরণ করে।' দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১৭৯)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ কাদারিয়্যাদের দ্বারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে এ মিথ্যা ভিত্তিহীন নামের প্রতিবাদ করেছেন এবং তা বাতিল হওয়া প্রমাণ করেছেন; কারণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এটাই বিশ্বাস করে যে, বান্দা প্রকৃত অর্থেই কাজ করে, তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা রয়েছে। তিনি বলেন, 'বিদ'আতীরা সেসব লোকদেরকে বাতিল নাম প্রদান করে যারা আল্লাহ তা'আলার পথের অনুসরণ করে, যে পথের বিষয়টি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, "বলুন, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮] যেমন কাদারিয়্যারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে মুজবিরা নাম দেয় অথচ আহলুস সুন্নাহ এটা বিশ্বাস করে যে, বান্দা সত্যিই কর্মসম্পাদনকারী, তার রয়েছে ইচ্ছা ও ক্ষমতা; মূলথ কাদারিয়্যাহরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে তাদের সাথে তুলনা করে যারা বান্দার কর্ম নেই বলে, আর বান্দাকে যারা জড় পদার্থের মতো মনে করে যাদের কোনো ইচ্ছা নেই। কাদারিয়্যারা আহলুস সুন্নাহকে জাবরিয়া বলার কারণ হচ্ছে, আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি বান্দার স্রষ্টা, বান্দার গুণের স্রষ্টা আর বান্দার কর্মেরও স্রষ্টা।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৬/৬৪৩-৬৪৪)।

১০৩৯. মুরজিয়া; এদের পরিচিতি ইতোপূর্বে চলে গেছে।

১০৪০. শুককাক; অর্থ সন্দেহকারী। মুরজিয়া সম্প্রদায় আহলুস সুন্নাহকে এ নামে অভিহিত করে; কারণ আহলুস সুন্নাহ ঈমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে 'ইনশা-আল্লাহ' বলে। কেউ যদি অপর কাউকে বলে, আপনি কি ঈমানদার? তখন আহলুস সুন্নাহ এর জাওয়াব হচ্ছে, ইনশা-আল্লাহ। অথচ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ এভাবে নিঃশর্তভাবে তা বলে না, তারা বিশেষ অর্থে তা বলে, যখন কেউ বুঝাতে চায় সে সকল আমল করতে সক্ষম হয়েছে কী না? অনুরূপভাবে যখন কেউ মুমিন বলে জান্নাতী হওয়ার দাবি করবে বসবে। তদ্রূপ যখন কেউ আমলকে ঈমানের অংশ মনে না করার জন্য চালাকি করে প্রশ্ন করবে। তেমনিভাবে যখন কেউ 'তাযকিয়াতুন নাফস' করে বলার চেষ্টা করবে, তা থেকে বাঁচার জন্য তারা ইনশা-আল্লাহ বলে থাকে।

মুরজিয়ারা আহলুস সুন্নাহ'র ব্যাপারে বলে, তারা তাদের ঈমানে সন্দেহে থাকার কারণে ইনশা-আল্লাহ বলে। আমরা যেমনটি জানিয়েছি, তা আহলুস সুন্নাহ'র ওপর মিথ্যাচার। আমরা কখনও সন্দেহের কারণে তা বলি না। বরং আমরা মনে করি দৃঢ় বিষয়েও ইনশা-আল্লাহ বলার নযীর কুরআন ও

والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت، وغثاء، وغثرًا، إلى أمثال ذلك،

জাহমিয়্যারা(১০৪১) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বলে "মুশাব্বিহা"(১০৪২)।

কালামপন্থীরা(১০৪৩) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বলে "হাশাওয়িয়্যাহ"(১০৪৪)

হাদীসে আছে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৪২৯, ৪৫০, ৬৬৬; শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৪৯৭)। ইমাম আব্দুর রহমান ইবন মাহদী বলেন, 'ইরজা' বা 'মুরজিয়া' হওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে 'ইস্তেসনা' বা ইনশা-আল্লাহ বলা ত্যাগ করা।' অর্থাৎ যখন তাদেরকে ঈমানদার কী না এ প্রশ্ন করা হবে তখন আমলকে ঈমানের অধীন না করার জন্য তারা দৃঢ়ভাবে বলে আমি ঈমানদার। অথচ বলার দরকার ছিল, আমি ইনশা-আল্লাহ ঈমানদার। দেখুন, আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ (৩/৫৯৮)। মুরজিয়ারা মনে করে ঈমানের পরিচয় দিতে দিয়ে ইনশা-আল্লাহ বলে ঈমানে সন্দেহ করা হয়। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ফুরকান বাইনাল হাক্কি ওয়াল বুত্বলান, পৃ. ২৭৬।

১০৪১. জাহমিয়্যাহ, তাদের পরিচয় আগেই চলে গেছে।

১০৪২. জাহমিয়্যারা আহলুস সুন্নাহকে 'মুশাব্বিহা' বলে, কারণ আহলুস সুন্নাহ আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করে। সেগুলোর কোনো তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা) করে না, তা'ত্বীল (নিষ্ক্রীয়করণ) করে না। যেমনটি জাহমিয়্যারা করে থাকে। সুতরাং যারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে মুশাব্বিহা সাদৃশ্যদানকারী বলবে, তারাই জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়। কম বেশি তারা জাহমিয়্যাদের দ্বারা প্রভাবিত।

১০৪৩. সম্ভবত শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এখানে কালামপন্থী বলে আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। কারণ তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে 'হাশাওয়িয়্যাহ' বলে। তাদের গ্রন্থ এসব বদনামীতে ভর্তি। আর এও সম্ভব যে এখানে মু'তাযিলাদেরকেও বুঝানো হয়েছে। কারণ নীতির দিক থেকে মু'তাযিলা, আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়া এ তিন সম্প্রদায় বিবেকের যুক্তিকে কুরআন ও সুন্নাহ'র ওপর প্রাধান্য দেয়ার নীতি মেনে নিয়েছে, যা কালামশাস্ত্রের প্রথম পাঠ। সুতরাং তারা সকলেই এ দিক থেকে একই পর্যায়ের। যদিও কিছু সিফাত সাব্যস্ত করার কারণে আশ'আরী ও মাতুরিদীদেরকে সিফাতিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

১০৪৪. হাশওয়িয়্যাহ, শব্দটি 'হাশও' শব্দ থেকে বের হয়েছে। 'হাশও' শব্দের অর্থ কথার মাঝে এমন বাড়তি কথা বলা যার ওপর নির্ভর করা যায় না, মানুষের মাঝে যারা নিম্নশ্রেণি, তাদের জন্য উপহাসমূলক অহংকারীরা এটি ব্যবহার করে থাকে। দেখুন, ইবন মাঞ্জুর, লিসানুল আরাব (১৪/১৮০)।
এখানে 'হাশওয়িয়্যাহ' শব্দ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষ, যারা কোনো দর্শনবিদ্যার ধার ধারে না অথবা সাধারণ কথা, যারা খুব সিম্পল কথা বলে। এর মাধ্যমে তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে বুঝাতো; এর বিপরীতে তারা নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী বলে প্রচার করতো। বস্তুত 'হাশাওয়িয়্যাহ' শব্দটি একটি বিদ'আতী শব্দ যা মু'তাযিলারা আহলুস সুন্নাহ'র ইমামদের জন্য ব্যবহার করতো। 'আমর ইবন উবাইদ আল-মু'তাযেলী সর্বপ্রথম তা ব্যবহার করে। সে বলেছিল, আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার তো হাশাওয়ী ছিল। [নাউযুবিল্লাহ] আর তারা সাধারণ মানুষদের 'হাশউ' বলতো। ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাকলি (৭/৩৫১)। আরও দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/২৩, ১৪৪-১৪৮), (১২/১৭৬); মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৫২০-৫২২)।
অন্যত্র তিনি বলেন, "এ 'হাশওয়িয়্যাহ' শব্দটি সর্বপ্রথম মু'তাযিলারা আবিষ্কার করে, তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও বিরাট জনগোষ্ঠীকে 'হাশও' বলত। যেমনিভাবে রাফেদ্বীরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও সাধারণ মানুষদের 'জমহুর' বলে। বস্তুত 'হাশউন নাস' এর অর্থ সাধারণ মানুষ ও অধিকাংশ লোক। তারা সেসব লোকের বাইরে যারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। যেমন বলা হয়, এ তো সাধারণ মানুষ, যেমন বলা হয়, এরা অধিকাংশ লোকের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম এটি ব্যবহার করেছে 'আমর ইবন উবাইদ, সে বলেছিল, আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার তো হাশাওয়ী ছিলেন। এভাবে মু'তাযিলারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে হাশাওয়ী বলতে আরম্ভ করে, যেমন রাফেদ্বীরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে 'জমহুর' সর্বসাধারণ নামে অভিহিত করে।" মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৮৫-১৮৬)।
এভাবে তারা হাশাওয়িয়্যাহ বলে অপমান করতে চায় এটা বলে যে, এরা মানুষের মাঝে অর্বাচীন,

"নাওয়াবিত[১০৪৫], গুছা[১০৪৬] (খড়কুটো), গাছারা[১০৪৭] (গণ্ডমূর্খ) ইত্যাদি ইত্যাদি।[১০৪৮]

এদের কোনো যোগ্যতা নেই। মু'তাযিলারা তাদেরকে হাশাওয়ী বলে যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাক্বদীর নির্ধারণ সাব্যস্ত করে। জাহমিয়্যারা তাদেরকে হাশাওয়িয়্যাহ বলে যারা আল্লাহর জন্য তাঁর সিফাতসমূহ সাব্যস্ত করে। ক্বারামিত্বারা (হাকেম লি আমরিল্লাহর মিশরের উবাইদী শাসকের অনুসারী, যাদেরকে অন্যায়ভাবে ফাতেমী শাসক বলা হয়), যারা সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ ফরয বলে তাদেরকে হাশাওয়ী বলে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১২/১৭৬), (২২/৩৬৬)।
ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "'হাশাও' শব্দটি যে ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সেখানে এটা এমন কোনো গোষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃত হয় না যাদের একজন নেতা রয়েছে তিনি কোনো কথা বললেন আর তারা তার অনুসরণ করলো। যেমন জাহমিয়্যাহ, কুল্লাবিয়্যাহ, আশ'আরিয়্যাহ (কারণ তারাই একজনের কথা অনুসরণ করে চলে)। অনুরূপ এ শব্দটি এমন কোনো বক্তব্যের নামও নয় যে, যারা এমন বক্তব্য অনুসরণ করবে তারাও সেটা হয়ে যাবে। বস্তুত কোনো গোষ্ঠী বা দল তো তাদের কোনো বক্তব্য দ্বারা অথবা তাদের নেতা দ্বারাই পরিচিতি লাভ করে থাকে।" দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/২৪২); আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৫২০-৫২১)।

১০৪৫. নাওয়াবিত শব্দটি নাবেত এর বহুবচন। নবীন বয়স বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হলেও এখানো পিচ্চি বলা উদ্দেশ্য। এ শব্দটিও অপমানজনকভাবে তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জন্য ব্যবহার করে থাকে। দেখুন, ইবন মাঞ্জূর, লিসানুল আরাব (২/৯৬)।

১০৪৬. গুছা শব্দটির অর্থ খড়কুটো যা বানে ভেসে আসে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক নিকৃষ্ট মানুষ ও বস্তুকে বুঝানো হয়। কুরআনে কারীমে এ অর্থেই শব্দটি এসেছে। দেখুন, ইবন মাঞ্জূর, লিসানুল আরাব (১৫/১১৬)।

১০৪৭. গাছরা শব্দটির অর্থ মূর্খ শ্রেণির মানুষ। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে হত্যা করতে যারা ঢুকেছিল, তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "ইন্না হা-উলায়ে রি'আউন গাছারাহ", অর্থাৎ তারা ছিল রাখাল বর্বর টাইপের লোক। দেখুন, ইবন মাঞ্জূর, লিসানুল আরব (৫/৭)।

১০৪৮. আহলুস সুন্নাহ এর অনেক ইমাম যেমন, ইমাম আহমাদ, ইবন আবী হাতেম, ইবন কুতাইবাহ, আবুল ক্বাসেম আল-আসফাহানী প্রমুখ, তাদের কাছ থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে, তারা বলেছেন, বিদ'আতীদের চিহ্ন হচ্ছে তারা এসব খারাপ খারাপ নাম ও গুণসমূহ দিয়ে আহলুস সুন্নাহকে অভিহিত করবে। কেউ বলবে নাওয়াসিব, কেউ বলবে মুশাব্বিহা, কেউ বলবে হাশাওয়িয়্যাহ...। এগুলো বলে তারা আহলুস সুন্নাহকে কলঙ্কিত করতে চায়, তাদের বদনামী করতে চায়, তাদের মানহানী করতে চায়। অথচ প্রকৃত অর্থে ঐসব লোকেরাই এসব খারাপ গুণের বেশি উপযুক্ত, এসব নিকৃষ্ট গুণের অধিক হক্বদার। কবি বলেন,

لا يضر البحر أمسى زاخراً ... ان رمى فيه غلام بحجر

"সমুদ্র টুইটম্বুর হলে সেখানে যদি কোনো বালক তাতে পাথর নিক্ষেপ করে তবে তার কিছু যায় আসে না।"
অন্য কবি বলেন,

تقول هذا جنى النحل تمدحه... وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير

مدحاً وذماً ومـا جاوزت ... والحق قد يعتريه سوء تعبير

"তুমি বলছ যে, অমুক তো মধু আহরণ করেছে, আর যদি তুমি চাও বলতে পার যে, বোলতা তাতে বমি করে দিয়েছে
তাতে যা ইচ্ছা প্রশংসা যোগ করতে পার, যা ইচ্ছা নিন্দা যুক্ত করে দিতে পার, কারণ হক্ব কখনো কখনো খারাপ বিবৃতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।"
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম আল্লাহর বেশ কিছু গুণাবলি উল্লেখ করার পর বলেন, এসব গুণ আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত; তিনি এগুলো দ্বারা গুণান্বিত। আমরা এগুলো কখনও অস্বীকার করবো না, যতই তোমরা এগুলো গুণান্বিত সত্তাকে 'জিসিম' বল। যেমনিভাবে আমরা সাহাবায়ে কিরামকে গালি দিই না, রাফেদ্বীদের দ্বারা তাদেরকে নাসেবী বলার কারণে, যারা সাহাবায়ে কিরামকে ভালোবাসে। অনুরূপভাবে আমরা রব্বুল আলামীনের তাক্বদীর নির্ধারণকে অস্বীকার করি না, ক্বাদরিয়াদের দ্বারা তাদেরকে জাবরিয়া বলার কারণে, যারা তাক্বদীর সাব্যস্ত করে। তদ্রূপ আমরা সত্যবাদী নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান করি

كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونًا،وتارة شاعرًا، وتارة كاهنًا، وتارة مفتريًا.

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادًا واقتصادًا وقولًا وعملاً؛ فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة. وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة. فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات، باطنًا وظاهرًا.

যেমনি ইতোপূর্বে কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার বলত পাগল, আরেকবার কবি, আরেকবার গণক, আরেকবার স্বরচয়িতা।

এজন্য সালাফগণ বলেন: এটা হচ্ছে সত্যিকারের উত্তরসূরীর এবং পূর্ণ অনুগামীর আলামত। তারা আরও বলেন, সুন্নাত হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ যে বিশ্বাস, মধ্যমপন্থা, কথা, কাজের ওপর ছিলেন সেটা। সুতরাং রাসূলের আদর্শচ্যুতরা যেমন তাঁকে বিভিন্ন নিন্দিত নামে অভিহিত করত, যদিও তারা তাদের নষ্ট আকীদাহ'র ভিত্তিতে এর (তাদের এসব কথার) সত্যতায় বিশ্বাস করত, অনুরূপভাবে রাসূলের যথাযথ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অনুসারীগণ, যারা সকলের মধ্যে রাসূলের জীবনে, মরনে, ভেতর, বাহির সর্বাবস্থায় বেশি নিকটতম, তাদের ওপর এমন মিথ্যা উপাধী আপতিত হবেই।

না, হাদীসের শত্রুদের দ্বারা আমাদেরকে হাশওয়িয়্যাহ বলার আশঙ্কায়। তেমনিভাবে আমরা আমাদের স্রষ্টার গুণাবলিকে অস্বীকার করবো না, তাঁর সৃষ্টির উপরে থাকা, 'আরশের উপরে উঠা সাব্যস্ত করা পরিত্যাগ করবো না, ফির'আউনী মু'আত্তিলাদের দ্বারা, যারা তা সাব্যস্ত করে তাদেরকে মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা বলার কারণে।

فإن كان تجسيم ثبوت استوائه ... على عرشه إني إذا لمجسم

وإن كان تشبيها ثبوت صفاته .... فمن ذلك التشبيه لا أتكتم

"যদি আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করার কারণে আমাকে মুজাসসিমা বা দেহবাদী বলা হয়, তবে আমি মুজাসসিম।"

"আর যদি তাঁর সিফাত সাব্যস্ত করার কারণে আমাকে মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যবাদী বলা হয়, তবে এ তাশবীহ দেয়াকে আমি গোপন করি না।"

এরপর তিনি বলেন, আর আল্লাহ আমাদের শাইখ অর্থাৎ ইবন তাইমিয়্যাহ' এর ওপর সন্তুষ্ট হোন, যখন তিনি বলেছিলেন,

فإن كان نصباً ولاء الصحاب *** فإني كما زعموا ناصبي
وإن كان رفضاً ولاء آله *** فلا برح الرفض من جانبي

"যদি সাহাবায়ে কিরামের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে নাসেবী বলা হয়, তবে তারা যা মনে করেছে আমি নাসেবী। আর যদি রাসূলের পরিবার পরিজনের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে আমাকে রাফেযী বলা হয়, তাহলে এ রাফেযী হওয়া আমার দিক থেকে আমি দূর করবো না।" ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৩/৯৪০-৯৪১)।

আরও দেখুন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/১৭৯-১৮২); আবু ইয়া'লা, ইবত্বালুত তা'ওয়ীলাত, পৃ. ৪৫-৪৬; ইবন কুতাইবাহ, তা'ওয়ীলু মুখতালাফুল হাদীস, পৃ. ৫৫; সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, পৃ. ১০৫; আবু ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (১/৩৫-৩৬); যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, পৃ. ১৩৯; ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্ব আল-আকলি ওয়ান নাক্বলি (৪/১৪৮); মাজমু' ফাতাওয়া (৩৩/১৭১); আক্বীদাতুর রাযীয়াইন, পৃ. ৬৯।

وأما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرًا وباطنًا بحسب الإمكان: لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصًا [يذمونهم به]، ويسمونهم بأسماء مكذوبة. وإن اعتقدوا صدقها .كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر، فقد أبغض عليًا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيًا، بناءً على هذه الملازمة الباطلة، التي اعتقدوها صحيحة، أو عاندوا فيها وهو الغالب.

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد، فقد سلب العباد

এর বিপরীতে যারা অভ্যন্তরীন দিকে রাসূলের সাথে একমত কিন্তু প্রকাশ্য দিক প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হয়েছে, আবার যারা প্রকাশ্য দিক দিয়ে রাসূলের সাথে একমত কিন্তু অভ্যন্তরীন দিককে বাস্তবায়ন করতে অক্ষম হয়েছে অথবা যারা ভেতর-বাহির যতটুকু সম্ভব দু'টি ক্ষেত্রেই তার সাথে একমত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই সুন্নাত থেকে বিচ্যুতরা এমন কোনো ত্রুটির কথা বিশ্বাস করবে[১০৪৯], যার মাধ্যমে তারা তাদের ওপর দোষারোপ করবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন মিথ্যা নামেও অভিহিত করবে, যদিও তারা (সুন্নাহ বিচ্যুতরা) এসব কিছু সত্য বিশ্বাসেই বলে থাকে। যেমন,

রাফেযীদের বক্তব্য: যে ব্যক্তি আবু বকর ও 'উমারকে ঘৃণা করে না সে আলীকে ঘৃণা করল; কেননা আলীর বন্ধুত্ব ঐ দুইজন থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বারাই অর্জিত হবে। তারপর ব্যক্তি আবু বকর ও 'উমারকে যে ভালোবাসবে রাফেযীরা তাকে নাসেবী বলবে। তাদের এ বাতিল তালাযুম (تلازم) (কথার দাবী) এর ভিত্তিতে যেটাকে তারা সঠিক বলে বিশ্বাস করে; অথবা তা জেনে শুনে মানতে অস্বীকার করে থাকে, আর এটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটেছে।[১০৫০]

আর যেমন কাদারিয়াদের বক্তব্য: যে কেউ বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের ইচ্ছা করেছেন, বান্দার কর্ম সৃষ্টি করেছেন, সে তো বান্দার ইচ্ছা ও শক্তিকে দূর করে দিল এবং তাদেরকে জড় পদার্থ বানিয়ে দিল, যার কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই।

১০৪৯. শাইখ আব্দুল্লাহ আবু বাতীন রাহিমাহুল্লাহ এ প্রকারগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি বলেন, 'যারা আকীদাতে একমত হয়েছে কিন্তু কথা ও আমলের ক্ষেত্রে অপারগ হয়েছে যেমন আল্লাহর পথে দাওয়াত দান। আরেকদল তারা প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডে তাদের সাথে একমত হয়েছে কিন্তু আভ্যন্তরীন দিক দিয়ে অপারগ হয়েছে, তাদের অন্তর দিয়ে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে। তাদের মধ্যে এ অংশে ত্রুটি রয়েছে। আরেক দল তাদের সাথে একমত হয়েছে প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীন দিক থেকে যতটুকু সম্ভব, কিন্তু তারা তাঁর সেসব প্রথম সারির অনুসারীদের চেয়ে নিম্নমানের, যারা অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টির সাথে আকীদাহ, মধ্যপন্থা, কথা ও কাজে একাত্ম হয়েছিল।' মাজমু'আতুর রাসায়িলিন নাজদিয়্যাহ (৩/১৬৮); আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (১/৩৭১)।
অর্থাৎ যে যত বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবে তার ওপর নিন্দা ও বদনামীর ভাগটা একটু বেশিই পড়বে। যত কম হবে তত কম হবে, একেবারে বাদ যাবে না।

১০৫০. রাফেযীদের নিকট এ নীতির নাম হচ্ছে, (আত-তাওয়াল্লি ওয়াত তাবাররি) অর্থাৎ সম্পর্কস্থাপন ও সম্পর্কচ্যুতি ঘটানোর নীতি। তারা বলে: (লা ওলাআ ইল্লা বি বারাআ) অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আলী ব্যতীত অন্যদের থেকে কেউ সম্পর্কচ্যুতি ঘটাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনোভাবেই কেউ আলীর বন্ধুত্বে আসতে পারে না।

القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.

وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش، فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه.

وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله علمًا وقدرة، فقد زعم أنه جسم مركب، وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعَرَض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم

তেমনি জাহমীর বক্তব্য: যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ 'আরশের উপরে, সে ধারণা করল যে, তিনি সীমাবদ্ধ আর তিনি 'মুরাক্কাব[১০৫১] জিসিম' বা যৌগিক পদার্থ, যার হাদ বা সীমা আছে এবং তিনি স্বীয় সৃষ্টির সদৃশ।

তেমনি জাহমী মু'তাযিলীর বক্তব্য: যে ব্যক্তি বলে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ইলম আছে, ক্ষমতা আছে— এ কথা যে বলবে সে মনে করল যে, তিনি (مركب) যৌগিক পদার্থ এবং সে মুশাব্বিহ বা সাদৃশ্য প্রদানকারী। কেননা এ সিফাতগুলো তো 'আরদ্ব (عرض)[১০৫২] বা পরিবর্তনশীল।

১০৫১. যারা সিফাত অস্বীকার করে তাদের বড় সন্দেহগুলোর অন্যতম হচ্ছে, 'জিসিম সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত সন্দেহ' আর 'তারকীব সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত সন্দেহ।'
তন্মধ্যে যারা জিসিম নিয়ে সন্দেহে পড়ে আছে তারা বলে, যদি আল্লাহর জন্য এসব সিফাত সাব্যস্ত করা হয় তবে সেটার দাবি হচ্ছে আল্লাহ 'জিসিম' হবেন। কারণ আমরা দৃশ্যমান জগতে এসব গুণে গুণান্বিত কাউকে 'জিসিম' ছাড়া দেখতে পাচ্ছি না। আর 'জিসিম' সবসময় সাদৃশ্যপূর্ণই হয়ে থাকে। তাহলে তো তাশবীহ হয়েই গেল।
আর যারা 'তারকীব' শব্দ নিয়ে সন্দেহে পড়ে আছে তারা বলে, যদি আল্লাহর জন্য এসব সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে অনেকগুলো সিফাতের সমষ্টি। আর অনেকগুলো সিফাত এর অর্থ দাঁড়ায় তারকীব হওয়া বা যৌগিক হয়ে যাওয়া। আর আল্লাহ মুরাক্কাব হবেন তা হতে পারে না।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তাদের এ দু'টি সন্দেহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অপনোদন করেছেন এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৩৫,৪০; মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/২১২-২২৫, ৪২১-৪৩৫; ৬/৩৩-৫১, ৭৩-৭৫, ১০২-১০৪, ৩৪৪-৩৫১, ১৩/২৯৮-৩০৫; ১৭/৩১২।

১০৫২. 'আরদ্ব' শব্দটির বহুবচন 'আ'রাদ্ব'। আর তা হচ্ছে এমন জিনিস, যা কখনও স্বয়ং বেশিক্ষণ অবশিষ্ট থাকা বিশুদ্ধ হতে পারে না। বরং তা সর্বদা অন্যের ওপর ভর করে থাকে, সেজন্য 'আরদ্ব' সর্বদা জাওহার ও জিসিমে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়বার কোনো জাওহার বা জিসিমের অস্তিত্ব হলে সেটা বাতিল হয়ে যায়।
দেখুন, আল-বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ৩৮।
আল্লাহর সিফাতকে কি 'আরদ্ব' বলা যাবে? শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এর বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন, তিনি এটাও বলেছেন এগুলো কালামশাস্ত্রবিদরা বিদ'আত হিসেবে তৈরি করেছে। সরাসরি হ্যাঁ বা না বলা যাবে না। জিজ্ঞেস করে যা বিশুদ্ধ অর্থ হয় তার অর্থ গ্রহণ করা হবে, আর যা ভুল অর্থ হবে তা শব্দ ও অর্থ উভয়টিই বাতিল করা হবে। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৯০-৯১, ১০৩-১০৪।
হাফেয কিওয়ামুস সুন্নাহ আবুল কাসেম আল-আসফাহানী বলেন, সালাফে সালেহীন জাওয়াহির ও আ'রাদ্ব নিয়ে কথা বলতে রাযী হননি। তারা বলেন, এ শব্দটি দু'টি সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'য়ীগণের যুগে ছিল না। আল্লাহ সাহাবায়ে কিরামের ওপর সন্তুষ্ট হোন, আর তাবে'য়ীগণের ওপর রহম করুন। তারা এসব শব্দ নিয়ে কথা বলা থেকে চুপ ছিলেন, এর কারণ হয় তারা এগুলো জেনেও কথা বলতে চাননি, তাহলে আমাদের এ ব্যাপারে চুপ থাকতে অসুবিধা কোথায়? তারা যেভাবে চুপ ছিলেন, আমরাও তেমনি চুপ থেকে যাব। অথবা তারা না জেনে চুপ ছিলেন, তাহলে যে জিনিস তারা না জেনেও সমস্যা হয়নি, সেগুলো না জানলে আমাদেরও সমস্যা হবে না। দেখুন,

مركب، أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن

আর 'আরদ্ব (عرض) যা কখনো 'স্থানে সীমাবদ্ধ' (মুতাহাইয়্যিয)[১০৫৩] 'জাওহার'[১০৫৪] (جوهر) ছাড়া অস্তিত্বে আসতে পারে না। আর প্রত্যেক 'স্থানে সীমাবদ্ধ'ই যৌগিক পদার্থ। আর যে এমনটি বলবে সে মুশাব্বিহা; কেননা জিসিম বা পদার্থসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ।[১০৫৫]

আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/৯৯-১০০)।

১০৫৩. মূল আরবী হচ্ছে 'হাইয়্যেয' যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে স্থান, অথবা স্থান ধরে নেয়া। কালামশাস্ত্রবিদদের কেউ কেউ প্রত্যেক জিসমকেই মুতাহাইয়্যেয বা স্থান জুড়ে আছে বলে থাকে। দেখুন, আমেদী, আল-মুবীন ফী শারহি মা'আনী আলফাযিল হুকামায়ি ওয়াল মুতাকাল্লিমীন, পৃ. ৯৬; ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৫৫৫)।

প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহকে মুতাহাইয়্যেয বা স্থান জুড়ে আছে বলা যাবে কি না?

হাইয়্যেয বা মুতাহাইয়্যেয উভয় শব্দটি মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দ। কুরআন ও সুন্নায় তা আসেনি। সুতরাং তাতে হক্ব ও বাতিল উভয় সম্ভবনা বিদ্যমান। যতক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা এর প্রবক্তাকে জিজ্ঞেস করে নির্ধারণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এটি জিসিম, জিহা, তারকীব ইত্যাদি নতুন বানোনো মুজমাল শব্দের মতোই। তবে মৌলিক নীতি হচ্ছে তা আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে না; কিন্তু কেউ যদি ব্যবহার করে ফেলে তখন কেবল তার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করা হবে, অর্থ শুদ্ধ হলে অর্থটি অন্য বিশুদ্ধ শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হবে, আর যদি অর্থ শুদ্ধ না হয় তবে তার শব্দ ও অর্থটি উভয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "পরবর্তী লোকেরা যেসব শব্দ আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা নিয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক যে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে, তাতে কারও জন্য জায়েয নয় নিজে তা আল্লাহর জন্য ব্যবহার করবে অথবা অন্য কেউ ব্যবহার করলে তার সাথে সেটাতে একমত হবে; যতক্ষণ না সেটার প্রবক্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। যদি হক্ব কোনো অর্থ হয় তবে অর্থটি গ্রহণ করা হবে। আর যদি বাতিল হয়, তবে সেটি প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর যদি তার বক্তব্য হক্ব ও বাতিল উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে মোটেই তা গ্রহণ করা হবে না, তবে সকল অর্থ প্রত্যাখ্যান করা হবে না। শব্দটিকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অর্থকে ব্যাখ্যা করে বিশুদ্ধ আকারে বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমনটি দেখা যায়, কিছু মানুষ জিহা ও হাইয়্যেয নিয়ে মতভেদ করেছে।" দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আত-তাদমুরিয়্যাহ ৬৫-৬৬; মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/২৯৮-৩০৯), (১২/১১৪-১১৬), (১৩/১৪৫-১৪৬, ৩০৪-৩০৫); ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১৩৫, ৫২৭, ৫৫৫, ৫৬১); নাকদুত তা'সীস (১/৪৭৭-৪৭৮), (২/১৩-১৪)।

১০৫৪. 'জাওহার' হচ্ছে এমন কোনো জিনিস যা নিজের ওপর নিজে অবস্থান নিতে পারে, আর যা জায়গা জুড়ে থাকে (মুতাহাইয়্যিয)। জাওহার দু' প্রকার:

এক. জাওহার 'বাসীত্ব', সেটি এমন জাওহার যাকে 'আল-জাওহার আল-ফারদ' বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ জাওহারটি এত ছোট এটম যে, তা আর বাস্তবে বা ক্ষমতা কোনোভাবেই ভাগ করা যায় না।

দুই. 'জাওহার মুরাক্কাব', সেটি এমন জাওহার যাকে জিসিম বলা হয়। এর পরিচয় হচ্ছে যে, তাতে দুই বা ততোধিক 'আল-জাওহার আল-ফারদ' দিয়ে গঠিত।

আল-মুবীন ফী শারহি মা'আনী আলফাযিল হুকামায়ি ওয়াল মুতাকাল্লিমীন, পৃ. ১০৯-১১০।

১০৫৫. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অন্য জায়গায় এসব শব্দ অর্থাৎ জিসিম, তারকীব, তাহাইয়্যুয ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, জিসিম, তারকীব, তাহাইয়্যুয... এ শব্দগুলোতে ইশতেরাক (একাধিক সম অর্থ) ও ইজমাল (সংক্ষিপ্ত ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ) রয়েছে, যা বিস্তারিত আলোচনা ও বর্ণনার দাবি রাখে।

আর সিফাত বা গুণাবলিকে আরাদ্ব নাম দেয়া, আর সকল 'আরাদ্ব' জিসিম ও জাওহার ছাড়া থাকতে পারে না, এটি একটি বাতিল কথা। কারণ সিফাত বা গুণাবলি কখনো জিসিম বা জাওহারের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আরাদ্ব আরাদ্বের ওপর ভিত্তি করেও থাকতে পারে, সেজন্য 'আরাদ্ব' এরও গুণ হতে পারে, যেমন বলা হয় (حر شديد) কঠিন গরম, (محبة قوية) শক্তিশালী ভালোবাসা...।

الناس «المقالات» وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناءً على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه. والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

[أقسام الناس في نصوص الصفات] :

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. «قسمان» يقولان: تجرى على ظواهرها. «وقسمان» يقولان: هي على خلاف ظاهرها. «وقسمان» يسكتون.

যারা মানুষদের 'মাকালাত' তথা 'মতবাদ' বর্ণনা করেছে আর নিজেদের আকীদাহ'র ওপর নির্ভর করে তাদের আকীদাহ'র বিরোধী লোকদের ওপর এসব মিথ্যা নামকরণ করেছে, সুতরাং বিষয়টি তারা এবং তাদের রব বোঝাপড়া করবেন, আল্লাহ তাদেরকে পিছন থেকে পাকড়াও করবেন আর জানা কথা যে, খারাপ কুটকৌশল কেবল ঐ কৌশলকারীকেই পাকড়াও করে।(১০৫৬)

[আল্লাহর সিফাতের ভাষ্যসমূহের সাথে আচরণের ব্যাপারে মানুষের প্রকারভেদ]

মোটকথা, সিফাতের আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে সম্ভাব্য ছয়টি প্রকার পাওয়া যায়(১০৫৭); প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে ক্বিবলার অনুসারী কোনো না কোনো গোষ্ঠী রয়েছে।

(প্রথম) দু'প্রকার: তারা বলে, এ সিফাতগুলো 'যাহির' এর ওপর পরিচালিত হবে।

অন্য দু প্রকার বলে: এ সিফাতগুলো যাহির এর বিপরীতে পরিচালিত হবে।

আর বাকী দু' প্রকার: এ ব্যাপারে নীরব থাকে।

আর তাদের দাবি, প্রতিটি জিসিমই 'জাওয়াহির মুফরাদাহ' (একাধিক জাওহার আল ফার্দ) দ্বারা সৃষ্ট, এ তো দিশেহারা, থেমে যাওয়া, মতভেদ ও অস্থিরতার জায়গা (এ ব্যাপারে এগুলো সবই রয়েছে)। তারপর তারা যে 'জাওহার আল-ফার্দ' এর দাবি করছে তার অস্তিত্বের ওপরই কোনো প্রমাণ নেই। এজন্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'জাওহার আল-ফার্দ' এটি রাফেদ্বী সম্প্রদায়ের মা'সূম (নিরপরাধ) নীতির মতো, মুন্তাযির (অপেক্ষমান) ব্যক্তির মতো এবং সূফীদের গাউস এর মতো।' দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/২৫৯)।

আর তারা যে তামাসুলুল আজসাম (تماثل الأجسام) 'সকল জিসিম একই রকম' এ নীতির দাবি করছে এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাতিল ও অসার কথা; বরং এটি যে বিনষ্ট নীতি তা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জানা যায়। কেউ কি বলবে যে, মাটি কখনো সর্বদিক থেকে সোনার মতো?! দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (১/১০০, ১৫৮), (৫/২৪৭); মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৫৪০); মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৪০, ৪৩৬); আল-আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ৪৪৮; আস-সাফাদিয়্যাহ (২/১৭); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/২৫৩), (৪/১৫৪)।

১০৫৬. যেমন গ্রন্থকার যদি আশ'আরী মতবাদের হয় তখন তিনি সালাফীদেরকে মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা নাম দিয়েছে, নিজেদের জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত দাবি করেছে। আমরা তা স্পষ্ট দেখতে পাই উস্তাদ আবু মানসূর আল-বাগদাদীর আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব গ্রন্থে, শাহরাস্তানীর আল-মিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থে, অনুরূপভাবে ইবন হাযমের আল-ফাসলু গ্রন্থে। এর মধ্যে কেবল ইমাম আশ'আরী তার মাকালাত গ্রন্থে কিছুটা ইনসাফ করেছেন, যা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র উল্লেখ করেছেন। তবে আশ'আরীর সমস্যা হচ্ছে তিনি সালাফ ও আসহাবুল হাদীসের আকীদাহ ও বিশ্বাস পুরোপুরি জানতেন না।

১০৫৭. এ ছয় প্রকার লোকদের কথা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তার মাজমূ' ফাতাওয়ার অন্যত্রও বর্ণনা করেছেন। যেমন, (১৬/৩৯৮)।

أما الأولان: فقسمان:

[من يقول تجرى على ظاهرها: ١. أهل السنة. ٢. المشبهة] :

أحدهما: من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل، أنكره السلف، وإليهم توجه الرد بالحق.

والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجرى ظاهر اسم «العليم، والقدير، والرب، والإله، والموجود، والذات» ونحو ذلك، على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن

[যারা বলে এসব ভাষ্যকে প্রকাশ্য অর্থের ওপর পরিচালিত করা হবে তাদের পরিচয়]

তন্মধ্যে প্রথম দু' প্রকারের লোকেরা নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত:

প্রথম. যারা সেগুলোকে যাহিরের ওপর চালায় আর তাদের নিকট এসব সিফাতের যাহির বা প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে এগুলো সৃষ্টির সিফাতের শ্রেণিভুক্ত; এরাই হলো মুশাব্বিহা।(১০৫৮) এদের মত বাতিল, সালাফগণ সেটা অস্বীকার করেছেন। হক্কপন্থীদের পক্ষ থেকে যখন 'তাশবীহ' মতবাদ খণ্ডন করা হয় তখন তা তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।(১০৫৯)

দ্বিতীয়. যারা এসব ভাষ্যকে আল্লাহর জন্য উপযোগী এমন যাহিরের ওপর পরিচালিত করে; যেমন তারা 'আলীম, ক্বাদীর, রব্ব, ইলাহ, মওজুদ, যাত ইত্যাদি সবগুলোকে আল্লাহর জন্য মানানসই এমন যাহিরের ওপর পরিচালিত করে। কেননা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসব সিফাতের

১০৫৮. মুশাব্বিহাদের সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে, আল-হিকামিয়্যাহ সম্প্রদায়, যারা হিশাম ইবনুল হিকাম আর-রাফেদ্বীর অনুসারী। সে মনে করত যে, আল্লাহ জিসিম; তাঁর রয়েছে নির্দিষ্ট সীমা ও শেষ ঠিকানা। আর তিনি বেশ দীর্ঘ ও বেশ চওড়া। তার লম্বা ও চওড়া সমপর্যায়ের।
তাদের মধ্যকার আরেক সম্প্রদায় হচ্ছে, আল-জাওয়ালীকিয়্যাহ, যারা হিশাম ইবন সালেম আল-জাওয়ালীকী এর অনুসারী। সে ছিল কঠিন রাফেদ্বী, তার মত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সূরতে।
তাদের মধ্যে আরেক সম্প্রদায় হচ্ছে, আল-হুওয়ারিয়্যাহ, যারা দাঊদ আল-হুওয়ারীর অনুসারী। তাদের মতে তাদের মা'বুদ মানুষের সকল অঙ্গের মতো তবে লজ্জাস্থান ও দাঁড়ি ব্যতীত।
তাদের মধ্যে আরেক সম্প্রদায় হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী সূফী সম্প্রদায়, যারা হুলুল ও ইত্তেহাদে বিশ্বাস করে।
তাদের মধ্যে আরেক সম্প্রদায় হচ্ছে কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়, যারা বলে আল্লাহ তা'আলা জিসম। এভাবে মুশাব্বিহাদের সংখ্যা অনেক।
বর্তমান সময়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুশাব্বিহা। তারা আল্লাহকে সামুদ্রিক অক্টোপাসের মতো মনে করে। আলেমগণ যুগ যুগ ধরে তাদের এসব কথা অস্বীকার করেছেন, তাদের অনেককে কাফেরও বলেছেন, বরং তাদেরকে এমন বাড়াবাড়ি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা ৭৩ ফির্কা থেকে বের হয়ে সরাসরি কাফির হয়ে গেছে।
এদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন (১/২৮১); বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনার ফিরাক, পৃ. ২১৪-২১৯; উসূলুদ্দীন, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮; রাযী, ই'তিক্বাদাতু ফিরাকিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৯৭-১০০; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/১১৮-১৩১); ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/৫৯৮)..; মাজমূ'আতুর রাসায়িলিল কুবরা (১/১১৫); মাজমূ' ফাতাওয়া (৩/১৮৬), (৪/১৩৮), (৬/৩৫-৩৬), (১২/২৬৪-২৬৫)।

১০৫৯. অর্থাৎ আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা সালাফীদের পক্ষ থেকে যখন তাশবীহ বা তামসীল নীতির খণ্ডন করা হয় তখন তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়। কিছু মু'তাযিলী, আশআরী, মাতুরিদী, কাররামীরা এদের ছাড়াও অন্যদের উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে।

ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين: إما جوهر محدث، وإما عرض قائم به.

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا، والغضب، ونحو ذلك: في حق العبد أعراض. والوجه واليد والعين في حقه أجسام.

فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة. وإن لم يكن ذلك عرضًا، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين. جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.

[القول في الصفات كالقول في الذات]:

وهذا هو المذهب الذي حكاه «الخطابي» وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات،

যাহির হয় সৃষ্ট 'জাওহার' হবে, না হয় তার সাথে যুক্ত 'আরদ্ব' হবে।

তাই ইলম (জানা), কুদরত (ক্ষমতা), কালাম (কথা), মাশীয়াত (ইচ্ছা), রহমত (দয়া), রিদ্বা (সন্তুষ্টি), গাদ্বাব (ক্রোধ), ইত্যাদি বান্দার ক্ষেত্রে 'আরদ্ব' হিসেবেই ধরা হবে। আর চোখ, চেহারা, হাত এগুলো বান্দার ক্ষেত্রে 'জিসম'।

সুতরাং (সিফাতী তথা) গুণ সাব্যস্তকারীদের সবার নিকট[১০৬০] আল্লাহ যখন ইলম, ক্ষমতা, কালাম (কথা) ইচ্ছা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত, যদিও সেগুলো আরদ্ব নয়, তখন তার ওপর সেটা ব্যবহার জায়েয যেটা মাখলুকের জন্য ব্যবহার জায়েয; তাহলে[১০৬১] আল্লাহর হাত, চেহারা এগুলো সিফাত হবে; এগুলো জিসিম হবে না, তার ওপর সেটা ব্যবহার জায়েয যেটা মাখলুকের জন্য ব্যবহার করা জায়েয।

[আল্লাহর যাত বা সত্তার ব্যাপারে যে বক্তব্য গুণের ব্যাপারেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য]

এটিই হচ্ছে সালাফদের মাযহাব যা খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন[১০৬২]। যারা সালাফদের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন এটাই তাদের অধিকাংশের কথা। বাকীদের কথা এর বিপরীত নয়।[১০৬৩] এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয়; কেননা সিফাত (গুণাবলি) তো যাত

১০৬০. যেমন আশ'আরী মতবাদের লোকেরা বলে থাকে। তাদের নিকট এগুলো সাব্যস্ত করা হবে। এগুলো আরদ্ব নয়। এগুলোর এসব নাম সৃষ্টির জন্য থাকলেও আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হতে কোনো অসুবিধা নেই।

১০৬১. যেমন সালাফে সালেহীন ও তাদের অনুসারীদের বক্তব্য। তাদের নিকট এগুলো সাব্যস্ত করতে হবে। এগুলো জিসিম নয়। এগুলোর এসব নাম সৃষ্টির জন্য থাকলেও আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হতে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ কিছু গুণের ব্যাপারে যা বলা হবে, অপর গুণের ব্যাপারেও একই নীতি অনুসৃত হতে হবে।

১০৬২. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ইতোপূর্বে ইমাম খাত্তাবী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, 'সালাফে সালেহীনের অভিমত ছিল এসব আয়াত ও হাদীসের অর্থ সাব্যস্ত করা, এগুলোকে তাদের যাহের বা প্রকাশ্য অর্থে পরিচালিত করা। আর এগুলোর জন্য কোনো ধরণ ও সাদৃশ্য নির্ধারণ না করা।'

১০৬৩. অর্থাৎ, এ কথাটি সালাফে সালেহীনের অধিকাংশ থেকে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে; যদিও তাদের

فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.

فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. قيل له: فكيف تعقل ذاتًا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب. الذي ليس كمثله شيء. إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه.

[من سأل عن كيفية الصفات سئل عن كيفية الذات]:

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى، وكيف ينزل إلى السماء الدنيا، وكيف يداه ونحو ذلك؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ . فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر.

(সত্তা) এর মতোই।[১০৬৪] কাজেই আল্লাহর যাত যেমন মাখলুকের মতো না হয়েও সেটা প্রকৃতভাবেই বিদ্যমান থাকতে পারলো, তেমনিভাবে তার সিফাতও মাখলুকের মতো না হয়েও সেটা প্রকৃতভাবেই বিদ্যমান থাকতে পারে।

এখন কেউ যদি বলে: আমি জ্ঞান, হাত এগুলো দ্বারা পরিচিত জ্ঞান ও হাত যেগুলো আছে সে যাতের ছাড়া আর কিছু বুঝি না, তখন তাকে বলা হবে: (যখন তুমি আল্লাহর জন্য সত্তা সাব্যস্ত করো, অথচ তুমি সে সত্তাকে দেখনি), তাহলে তুমি পরিচিত (সৃষ্টির) সত্তা ছাড়া আল্লাহর যাত কীভাবে বুঝলে? আর এটা জ্ঞাত যে, প্রত্যেক গুণওয়ালার গুণ তার সত্তা ও প্রকৃত অবস্থার সাথে উপযোগী ও সামঞ্জস্যশীল হিসেবে হয়ে থাকে। কাজেই যে আল্লাহর সিফাত— যার মতো কোনো কিছুই নেই- সেগুলোকে কেবল সৃষ্টির উপযোগী করেই বুঝেছে সে তো তার দীন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

[যে কেউ গুণের ধরন জিজ্ঞেস করবে তাকে আল্লাহর সত্তার ধরন জিজ্ঞেস করা হবে]

জনৈক সালাফ[১০৬৫] কতইনা সুন্দর বলেছেন: তোমাকে যখন কোনো জাহমী বলে: তিনি কীভাবে ('আরশে) আরোহন করেছেন, তিনি কীভাবে অবতরণ করেন, কেমন তাঁর হাত ইত্যাদি? তাহলে তুমি তাকে বল: কেমন তিনি তাঁর সত্তায়? অতঃপর যখন সে বলবে: তিনি কেমন এটা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না, সৃষ্টিকর্তার আসল স্বরূপ মানুষের অজানা।

সকলে এ কথাটি স্পষ্টভাবে বলেননি। উদ্দেশ্য এটা নয় যে সেখানে কোনো বিরোধী মত রয়েছে। বাকীদের কারো কথা এর বিপরীতে আসেনি এটাই বলা উদ্দেশ্য।

১০৬৪. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ গ্রন্থে এ মূলনীতিটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, 'গুণের ব্যাপারে কথা যাত বা সত্তার ব্যাপারে কথা বলার মতোই'। এ বিষয়ে আরো দেখুন খত্বীবে বাগদাদীর বক্তব্য, যা ইমাম যাহাবী, তার আল-উলু লিল আলিয়্যিল আযীম গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন, পৃ. ১৮৫।

১০৬৫. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহতেও অনুরূপ কথা বলেছেন (পৃ. ৪৪), যা থেকে মনে হয় এটা ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহরই বক্তব্য। তবে ইতোপূর্বে ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী রাহিমাহুল্লাহ অনুরূপ কথা বলেছেন। দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৯৩।

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة لموصوف، ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي [ينبغي له، بل هذه] المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس. رضي الله عنهما. أنه قال: «ليس في الجنة مما الدنيا إلا الأسماء».

তাহলে তাকে বল: সিফাত (গুণ) এর ধরণ জানার জন্য মাওসুফ (যার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে তাঁর) ধরণ জানা আবশ্যক। তাহলে তুমি কীভাবে এমন মাওসূফের সিফাত জানতে চাও যার (সত্তার) ধরণ তোমার জানা নেই? বরং তাঁর যাত-সত্তা, তাঁর গুণাবলির বিষয়ে তো তাঁর জন্য উপযোগী হিসেবে মোটের ওপর এজমালিভাবে জানা যাবে, বিস্তারিত নয়।

বরং দুনিয়াতে আমরা জান্নাতের যেসব মাখলুকের কথা শুনেছি, (যেমন জান্নাতের আঙ্গুর, কলা, ফল-ফলাদি ইত্যাদি) সেগুলো নজীর হিসেবে জান্নাতে থাকবে[১০৬৬]; যেমনটি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, "দুনিয়াতে জান্নাতের যা যা থাকবে বলা হচ্ছে তাতে শুধু নামের দিক থেকে মিল থাকবে"।[১০৬৭]

১০৬৬. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার একাধিক গ্রন্থে জান্নাতের উদাহরণ টেনেছেন, যেমন: ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১৫৭); আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৫৪৬); আস-সাফাদিয়্যাহ (১/২৮৮); আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৪৬; মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২০৭, ২৫৭, ৩৪৭), (৯/২৯৫), (১১/৪৮২), (১৭/৩২৬)।

১০৬৭. ইবন জরীর আত-ত্বাবারী (১/১৭৪); আবু নু'আইম আল-আসফাহানী, সিফাতুল জান্নাহ, হাদীস নং ১২৪; বাইহাক্বী, আল-বা'সু ওয়ান নুশূর, হাদীস নং ৩৩২; ইবন আসাকির, মু'জামুশ শুয়ূখ, নং ১১৯৪; দ্বিয়াউদ্দীন আল-মাক্বদেসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (১০/১৬), হাদীস নং ৬; সিলসিলাহ সহীহাহ, নং ২১৮৮; ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (১/৯১); সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (১/৯৬)।
ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, 'যদি এসব বাস্তব জিনিস, যার নাম আল্লাহ জানিয়েছেন, তা দুনিয়াতে অস্তিত্বশীল বাস্তব জিনিসের নামের সাথে মিলে যায়, কিন্তু তা একরকম না হয়, বরং উভয়ের মধ্যে এমন পার্থক্য রয়েছে যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, তাহলে রাব্বুল আলামীন খালেক জাল্লা জালালাহুর সাথে অবশ্যই সৃষ্টিকুলের বড় রকমের পার্থক্য থাকবে। বরং দুনিয়ার অস্তিত্বশীল জিনিসের আখেরাতে অস্তিত্বের পার্থক্যের চেয়েও সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে বড় পার্থক্য সেখানে থাকবে; কারণ নামের দিক থেকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির মিল থাকা বেশি কাছে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিল হওয়ার চেয়ে। আর এ বিষয়টি বেশি প্রকাশিত ও স্পষ্ট।' আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৪৭।
অন্যত্র বলেন, 'এসব বাস্তব জিনিস যা জান্নাতে থাকবে বলে আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, দুনিয়াতে এ নামে যেসব অস্তিত্বশীল বস্তু রয়েছে সেগুলোর সমান নয়; যাতে করে দুনিয়ার বস্তুগুলোর জন্য যা বৈধ হিসেবে প্রযোজ্য আখেরাতে একই নামের বস্তুগুলোর জন্য তা প্রযোজ্য হওয়া বৈধ হতে পারে, অনুরূপ দুনিয়ার বস্তুগুলোর ওপর যা প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক আখেরাতের বস্তুগুলোর জন্যও তা প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক হতে পারে, তদ্রুপ দুনিয়ার বস্তুগুলোর জন্য যা প্রযোজ্য হওয়া নিষিদ্ধ আখেরাতের বস্তুগুলোর জন্যও তা প্রযোজ্য হওয়া নিষিদ্ধ হতে পারে, তেমনি দুনিয়ার বস্তুগুলোর সৃষ্টির উপাদান আখেরাতের বস্তুগুলোর সৃষ্টি উপাদানে একই হতে হয়, অনুরূপভাবে দুনিয়ার বস্তুগুলো যেভাবে সময়ের আবর্তে অন্যকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, আখেরাতের বস্তুগুলোও তেমনি অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হতে হয়। বস্তুত এগুলোর কোনোটিতেই দুনিয়ার জিনিসের সাথে আখেরাতের জিনিসে মিল নেই; কারণ আমরা জানি আখেরাতের পানি বিনষ্ট হবে না, তার দুধের স্বাদ পরিবর্তন হবে না, তার মদিরা পানে মাথাব্যাথা হবে না, বিবেক বিকারগ্রস্ত হবে না, কেননা জান্নাতের পানি মাটি ভেদ করে বের হবে না, মেঘ থেকেও পড়বে না, যেমনটি দুনিয়ার মেঘের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, অনুরূপ আখেরাতের দুধ চতুস্পদ জন্তু থেকে হবে না, যেমনটি দুনিয়ার বুকে হয়ে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

[لا يلزم من الاشتراك في الأسماء العلم بالكيفية] :

وقد أخبر الله: أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: «أن في الجنة ما لا عين رأتْ، ولا أُذن سمعت، ولا خَطَر على قلب بَشَر».

فإذا كان نعيم الجنة وهو خلقٌ من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى.

وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، وإمساك النصوص عن

[নাম একই হওয়ার কারণে ধরণ নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক নয়]

আর আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, "সেখানে চক্ষু শীতলকারী যা গোপন করে রাখা হয়েছে তা কোনো আত্মা জানতে পারেনি।"(১০৬৮) অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে এমন কিছু থাকবে যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, কোনো মানুষের অন্তরেও উদিত হয়নি।'(১০৬৯) জান্নাতের নি'আমতগুলো মাখলুক হয়েও যখন দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে সেগুলোতে এত পার্থক্য, তাহলে সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে আমাদের ধারণা কেমন হওয়া উপযোগী?(১০৭০)

তেমনি রূহ (আত্মা)(১০৭১) যা বনি আদমের মধ্যে রয়েছে, এটা তার শরীরের মধ্যেই আছে। রূহের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের যে টলটলায়মান অবস্থা প্রত্যেক বিবেকবানই তা জানে। ভাষ্যসমূহ সেটার ধরণ বর্ণনা করতে অপারগ।(১০৭২) এ আত্মার

অতঃপর যদি আখেরাতের সেসব সৃষ্ট জিনিস তার নামে দুনিয়ার সৃষ্ট জিনিসের সাথে মিলে যায়, অথচ উভয়ের মধ্যে মিল হওয়ার একক একটি পরিমাণ ও সাদৃশ্যতা রয়েছে, আর আমাদেরকে যে সম্বোধনে তা জানানো হয়েছে তা আমরা জানতে পেরেছি, অথচ এ হাকীকত ঐ হাকীকতের মতো নয়; তাহলে জান্নাতের সৃষ্ট জিনিসের সাথে একই নামের দুনিয়ার জিনিসের দূরত্বের চেয়েও মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির কারও মত হওয়া থেকে অনেক অনেক দূরে। মাজমূ' ফাতাওয়া (৯/২৯৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'যদি সেসব অদৃশ্য সৃষ্টগুলো এসব দৃশ্য সৃষ্টগুলোর মতো না হয়, যদিও তাদের নাম একই, তাহলে সৃষ্ট জিনিস থেকে অপর সৃষ্ট জিনিসের যে পার্থক্য, মহান স্রষ্টার সাথে তার সৃষ্টির পার্থক্য আরও বেশি উপরে ও বেশি পৃথক, যদিও নাম একই হয়।' মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২৫৮)।

১০৬৮. সূরা আস-সাজদাহ: ১৭।

১০৬৯. বুখারী, আল-জামে'উস সহীহ, হাদীস নং ৩২৪৪, ৪৭৭৯; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮২৪।

১০৭০. দুনিয়াতে যা আছে আর আখেরাতে যা আছে বলে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোর কিছুর মাঝে নামের মিল রয়েছে, যেমন, দুধ, মধু, গোস্ত ইত্যাদি। আর জানা কথা যে এসব নামধারী জিনিসের মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। অথচ দু'টিই আল্লাহর সৃষ্টি। তাহলে স্রষ্টা তো সৃষ্টি থেকে আরও বেশি ভিন্ন হবেন, যদিও নাম বা গুণের দিক থেকে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বরং এ দু'য়ের মাঝে তুলনা করার কোনো সুযোগই নেই। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৪৬-৫০; মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৩৪৭)।

১০৭১. রূহ এর উদাহরণ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অনেক জায়গায় এনেছেন। যেমন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৩২, ২৪৩), (৫/৪৫৮-৪৫৯, ৫২৭) (শারহু হাদীসিন নুযূল), আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৫০।

১০৭২. রূহ এর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লোকেরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত:
কারও কারও মতে, রূহ হচ্ছে জিসিম, আর তা নাফস।
অপর কারও মতে, রূহ হচ্ছে 'আরদ্ব। [যা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করতে হয়]
আবার অন্য গোষ্ঠী বলে, আমরা জানি না, রূহ জাওহার [যা নিজের ওপর নিজে নির্ভর করতে পারে

بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح

বিষয়টি সম্পর্কে (প্রকৃত অবস্থা জানতে অক্ষম হওয়া) বিবেকবান মানুষের জন্য আল্লাহর ধরণ সম্পর্কে কথা বলা থেকে বিরত থাকা কি উচিত নয়?(১০৭৩) অথচ আমরা দৃঢ়ভাবে

পারে আর যাতে কোনো বাড়তি কিছু নেই] নাকি 'আরদ্ব।
কারও কারও মতে, রূহ হচ্ছে চারটি প্রকৃতির সমতা বিধান হওয়া। সে চারটি হচ্ছে, উষ্ণতা, ঠাণ্ডা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা।
কারও কারও মতে, রূহ উক্ত চারটি ব্যতীত পঞ্চম আরেকটি অর্থ।
কারও কারও মতে, রূহ হচ্ছে বিশুদ্ধ খাটি রক্ত, যাতে পঁচা ও ময়লা কিছুই নেই। আরও বহু কথা রয়েছে।
ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, রূহ হচ্ছে একটি জিসিম যা মূল দিক থেকে আমাদের এ অনুভূত জিসিম থেকে ভিন্ন। এটি আলোকময়, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হাল্কা, জীবিত, সচল, যা বিভিন্ন অঙ্গের 'জাওহার' বা মূল অংশে প্রবেশ করে, আর তাতে এমনভাবে বিচরণ করে থাকে যেমন গোলাপ ফুলে পানি থাকে, যাইতুনে তেল বিচরণ করে থাকে, কয়লায় আগুন বিচরণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব অঙ্গ তার উপর সে সূক্ষ্ম শরীর থেকে প্রভাব গ্রহণের যোগ্য থাকবে ততক্ষণ সে সূক্ষ্ম শরীর উক্ত অঙ্গসমূহের সাথে ওৎপ্রোৎভাবে জড়িত থাকে। এসব প্রভাবের কারণে অনুভূতি, ইচ্ছাকৃত সচলতা আসে। আর যখন এসব অঙ্গ বিভিন্ন প্রকার মোটা মিশ্রণের মাধ্যমে বিনষ্ট হয়ে যায়, আর তাতে প্রভাব গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকে না, তখন রূহ শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং রূহের জগতে চলে যায়।
তারপর তিনি বলেন, এ কথাটিই হচ্ছে এ মাসআলায় সঠিক। এটি ব্যতীত অন্যগুলো শুদ্ধ নয়। বাকী কথাগুলো সবই বাতিল। এর ওপরই কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের ইজমা', বিবেকের যুক্তি ও ফিত্বরাত বা স্বাভাবিক মানব মনের আহ্বানের প্রমাণ রয়েছে।
আর এ কথাটিই ইমাম ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী প্রাধান্য দিয়েছেন।
তবে রূহের ধরণ ও তার প্রকৃত রূপ, তা তো কেবল আল্লাহই জানেন, আল্লাহ বলেন, "আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, 'রূহ আমার রবের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্যই।" [সূরা আল-ইসরা: ৮৫]
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, কুরআন, সুন্নাহ'তে এটি নেই যে, মুসলিমদেরকে রূহ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ যা প্রমাণ করছে তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, রূহের সত্তার ব্যাপারেও নয়, রূহের গুণের ব্যাপারেও নয়। তবে বিনা ইলমে কথা বলা তা সবকিছুতেই হারাম।
তিনি আরও বলেন, আবশ্যক হচ্ছে শরী'আতের নস বা ভাষ্য যা বলেছে সেখানে অবস্থান করা, যা কুরআন হাদীসে এসেছে তা সাব্যস্ত করা হবে, আর যা আসেনি তা সাব্যস্ত করা হবে না। তিনি আরও বলেন, তিনি রূহের যেসব গুণ ও অবস্থা জানা যায় তা জানেন, আরও জানেন যে, যেসব দেহ বা শরীর দৃশ্যমান হয় সেগুলোতে তিনি রূহের কোনো দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছেন না।
দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, আর-রূহ: ২৪৫-২৪৯; ইবন তাইমিয়্যাহ, আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৫০-৫২; মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/২১৬-২৩১), (৯/২৮৯-৩০২)। আরও দেখুন, আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৩৩৩-৩৩৬; জুওয়াইনী, আল-ইরশাদ, পৃ. ৩৭৭; আবু সা'ঈদ আন-নাইসাপূরী, আল-গুনইয়াতু ফী উসূলিদ দীন, পৃ. ১৬৫; ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (২/৫৬৪-৫৬৫)।

১০৭৩. কারণ, রূহ জীবিত, উপরে উঠে, নিচে নামে, আসে ও যায়। রূহের জন্য এসব গুণাবলি সাব্যস্ত হওয়ার পরও কেউ সেটার ধরণ বলতে পারে না, সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। কারণ আমরা যা দেখি তাতে সেটার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তারপরও কথা হচ্ছে যে, রূহ সৃষ্ট আর তা মানুষের সবচেয়ে কাছের বস্তু। তাহলে স্রষ্টার সত্তা ও গুণের ধরণ না জানা, স্রষ্টার হাকীকত জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জন করতে না পারার বিষয়টি আরও বেশি উত্তমভাবে প্রমাণিত হলো।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'অনুরূপভাবে বনী আদমের রূহ শোনে ও দেখে, কথা বলে, নামে ও উঠে, যেমনটি সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত, আর যা স্পষ্ট বিবেক দ্বারাও প্রমাণিত, তারপরও সেটার গুণ ও কর্ম কখনও শরীরের গুণ ও কর্মের মত নয়।
তাহলে যখন এটা বলা না যায় যে, রূহ এর গুণাবলি ও তার কর্ম তার জিসিম যা তার শরীর সেটার গুণাবলির মত, অথচ তা তার সাথে মিশেই আছে, আর এ দু'টো মিলেই একজন মানুষ, এভাবে যখন

في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تُسَلّ منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم؛ حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير

জানি যে, এ আত্মা আমাদের দেহের মধ্যেই আছে। এটাকে দেহ থেকে বের করা হয়, আসমানের উপরে উঠে যায়, মৃত্যুর সময় এটাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, যেমনটি সহীহ নসসমূহ স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে আমরা রূহকে গুণশূন্য বানিয়ে বাড়াবাড়ি করে ঐসব দার্শনিকদের মতো বলি না যারা বলে যে, এটা নামেও না, উঠেও না, শরীরে যুক্তও হয় না, আবার শরীর থেকে বিচ্ছিন্নও হয় না। তাতে তারা এতই উল্টাপাল্টা কথা বলেছে

একজন মানুষের রূহ তার জিসিম এর মতো নয় যা একটি শরীর, তাহলে মহান রাব্বুল আলামীনের সত্তা, গুণাবলি ও কর্ম কীভাবে জিসিম, তার গুণাবলি ও তার কর্মের মত হওয়া বৈধ হয়? মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৫৪) শারহু হাদীসিন নুযূল।

ইমাম যাহাবী বলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা অপারগ, অযোগ্য, অসহায় হয়ে যাই আমাদের মাঝে থাকা রূহ এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে, কীভাবে প্রতি রাতে তার মালিক রাব্বুল আলামীন মৃত্যু দিলে সেটা উপরে উঠে যায়, কীভাবে আবার ফেরৎ পাঠায়, মৃত্যুর পর কীভাবে আলাদা সত্তা হিসেবে থাকে, শহীদদের জীবনই বা কেমন যাদের হত্যা করার পর তারা তাদের রবের কাছ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত হয়, আর নবীদের জীবনই বা এখন কেমন?....' যাহাবী, আল-'উলু লিল 'আলিয়্যিল 'আযীম (২/১৩৩০)।

একদল আলেম রূহ এর ব্যাপারে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন জুনাইদ ইবন মুহাম্মাদ, তিনি বলেন, 'রূহ এমন যে তার জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে প্রাধান্য দিয়ে রেখে দিয়েছেন, তার সৃষ্টির কাউকে সেটার জ্ঞান প্রদান করেননি, সুতরাং সেটার অস্তিত্ব আছে এর বাইরে আর কোনো কথা জায়েয নয়।' হাফেয ইবন হাজার এর পরে যোগ করে বলেন, 'আর এ নীতির ওপরই চলেছেন ইবন 'আতিয়্যাহ ও একদল মুফাসসির'। ফাতহুল বারী (৮/৪০৩-৪০৪)। আর বাইজুরী (আশ'আরী) জুনাইদের কথা থেকে বুঝেছেন যে, তিনি এটা নিয়ে কথা বলাকে হারাম হিসেবে নিষেধ করেছেন। দেখুন, শারহুল জাওহারাহ, পৃ. ৩৫৭।

বাইজুরী এরপর বলেন, হে মুকাল্লাফ (আদিষ্ট) ব্যক্তি, তুমি রূহ এর হাকীকত খোঁজার কাজে লিপ্ত হয়ো না, কারণ এতে প্রবৃত্ত হওয়া মাকরূহ; কারণ এ ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না।' [প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯]

বস্তুত রূহের ব্যাপারে আলোচনা না করার এ নীতি একদল উসূলশাস্ত্রবিদেরও। যেমন মুরতাদ্বা আয-যাবীদী বলেন, 'অধিকাংশের মত হচ্ছে রূহ এর ব্যাপারে আলোচনায় না যাওয়া; কারণ সেটার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবীভাবে জানা রয়েছে। আর অধিকাংশ উসূলবিদ এটাতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহ এটা বর্ণনা করা হতে বিরত ছিলেন সুতরাং আমরাও বিরত থাকবো। যেমনটি বলেছেন সুবুকী ও অন্যান্যরা।' যাবীদী, তাজুল আরূস (৬/৪০৮)।

বরং রূহ এর ব্যাপারে আলোচনা না করা এটা কোনো কোনো দার্শনিকের অভিমত। যেমন আবুল কাসেম তার 'আল-ইফসাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, প্রসিদ্ধ দার্শনিকরা রূহ এর বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত ছিলেন। তারা বলতো, এটি তো আমাদের ইন্দ্রীয়ানুভূতির বাইরের ব্যাপার, বিবেক কখনো এটার কুল কিনারা করার পথ খুঁজে পায় না। দেখুন, মার'ঈ আল-কারামী, আক্বাওয়ীলুস সিকাত, পৃ. ১৯১।

এটিই পছন্দ করেছেন আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী ও জামালুদ্দীন আল-কাসেমী। দেখুন, ইবনুল জাওযী, সাইদুল খাতির, পৃ. ৪৫০; কাসেমী, মাহাসিনুত তা'ওয়ীল (৯/২৮২)। বরং আল-কাসেমী কারও কারও থেকে বর্ণনা করেছেন সে রূহ এর ব্যাপারে কথা বলাকে দীনের মধ্যে বিদ'আত প্রবর্তনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ কুরআনের আয়াতে যা এসেছে এর বাইরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশি বর্ণনা করেননি। সুতরাং রূহ এর ব্যাপারে অতিরিক্তি তদন্ত এমন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যাবে যা কুরআনের আসেনি, যার পক্ষে কোনো প্রমাণাদি নেই, আর যা এ পর্যায়ের হবে তাতে অযথা গবেষণা করা সীমালঙ্ঘন ও বিরোধিতা।। দেখুন, ড. আলী আল-উবাইদী, আর-রূহ ইনদা আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতি, পৃ. ২৯ ও তার পরের অংশ।

جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطؤوا في اللفظ، وأنى لهم بذلك؟

(ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وإنها مختلفة الأجساد، ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا، فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟)

যে, (তাদের নিকট) এটি শরীর বা তার শরীরজাতভুক্ত কিছু নয়, শরীরের গুণভুক্তও নয়।

বস্তুত এভাবে আত্মা, কোনো শরীরের মতো না হয়েও এসব গুণসহ তার মতো করে তার অস্তিত্ব থাকা অস্বীকার করা হয় না। তবে যদি তাদের (ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকদের) কথাকে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে বলতে হবে যে, তারা শব্দে ভুল করেছে। কিন্তু তারা কি আর সেটা করবে?

আর আমরা বলি না যে, আত্মা তো কেবল শরীরের অঙ্গসমূহের একটি অঙ্গ। যেমন, রক্ত, বায়ু ইত্যাদি অথবা দেহ ও জীবনের গুণসমূহের একটি গুণ, তা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে, তবে সকল শরীরে সেটার সীমা ও বাস্তবতা সম পর্যায়ে, যেমনটি কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদরা বলে থাকে। বরং আমরা দৃঢ়ভাবে বলি, রূহ বা আত্মা মানুষের দেহ ব্যতীত ভিন্ন অস্তিত্বশীল একটি সত্তা। আর তা শরীরের মতো নয়, আর রূহের যেসব গুণ কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা তা প্রকৃত পক্ষেই গুণান্বিত, সেখানে কোনো রূপক কিছু নেই। সুতরাং যদি রূহের হাকীকত ও রূহের গুণের ব্যাপারে এটিই আমাদের অভিমত হয়, যা (এসব গুণকে) নিষ্ক্রীয়কারী সম্প্রদায় ও (এসব গুণকে শরীরের মতো করে) সাদৃশ্য সাব্যস্তকারী সম্প্রদায়ের মাঝামাঝিতে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলির ব্যাপারে আমাদের কেমন ধারণা করা উচিত?![১০৭৪] (অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতও সৃষ্টিকুলের সিফাতের জাতভুক্ত না হয়ে থাকতে পারে।)

১০৭৪. রূহ ও জান্নাতের সামগ্রীর উদাহরণ দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সিফাত বুঝানোর বিষয়টি উঁচু পযায়ের উদাহরণ। আর তার সারকথা হচ্ছে, সৃষ্টের জন্য যেসব গুণাবলি পূর্ণতার অর্থ জ্ঞাপক, যাতে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই, সেসব রাব্বুল আলামীনের জন্য সাব্যস্ত করা আরও বেশি উপযোগী। আর যে ত্রুটি থেকে একজন মানুষকে মুক্ত ও পবিত্র বলা হবে, রাব্বুল আলামীন তা থেকে অবশ্যই মুক্ত ও পবিত্র হবেন।

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা সাব্যস্ত করা যে, অনেক সৃষ্ট জিনিস নামে পূর্ণ মিল থাকার পরও একটি আরেকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায় না। তাহলে নাম বা গুণে মিল হলেও স্রষ্টা অবশ্যই সৃষ্টির সাদৃশ্য হয়ে যাওয়া থেকে মুক্ত হবেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রূহ ও জান্নাতের ফল-ফলাদি, অনেক গুণে গুণান্বিত, তারপরও দৃশ্যমান অনুরূপ সৃষ্ট জিনিস তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তাহলে রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা হওয়ার আরও বেশি উপযোগী, যদি নামের দিক থেকে মিল হয়ে যায়। দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ৫০,৫৬।

[من يقول تجرى على خلاف ظاهرها]:

وأما «القسمان» اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات. السبعة، أو الثمانية أو الخمس عشرة. أو يثبتون الأحوال دون الصفات.

[যারা বলে সিফাত বিষয়ক ভাষ্যের যাহির বা প্রকাশ্য অর্থকে নাকচ করা হবে তাদের পরিচয়]

অতঃপর অন্য দু প্রকার লোকের আলোচনা[১০৭৫], যারা বলে: কুরআন ও হাদীসে আসা সিফাত সংক্রান্ত ভাষ্যগুলো যাহির এর বিপরীতে পরিচালিত হবে, তাদের নিকট এসব নসের যাহিরী অর্থ নাকচ করা হবে, অর্থাৎ যারা বলে এসব ভাষ্যের অভ্যন্তরে কখনও এমন কোনো কিছু নেই যা আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণের ওপর প্রমাণবহ। বরং আল্লাহ তা'আলার কোনো ইতিবাচক গুণই নেই। তাঁর গুণাবলি হয় সেটি নেতিবাচক[১০৭৬], নয় তো আপেক্ষিক[১০৭৭] অথবা এ দু'টোর সমন্বয়ে ঘটিত হবে অথবা তারা হাতে গোনা কিছু গুণ সাব্যস্ত করে[১০৭৮], তা সাত[১০৭৯] বা

১০৭৫. তারা হয় তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যার নীতি অনুসারে চলবে, যা নসকে বিকৃতি করার অপর নাম, অথবা তারা তাফওয়ীদ্ব বা তাজহীল নীতি অবলম্বন করবে। যা নসকে অর্থহীন করা।

১০৭৬. নেতিবাচক গুণের সংজ্ঞা কারও কারও মতে, গুণের আগে (লা, লাইসা, মা) নয়, নাই, নন এভাবে প্রবেশ করানো। যেমন বলা যে, তিনি শ্রোতা নন, তিনি দর্শক নন, তিনি 'আরশের উপর উঠেননি, তিনি ক্রোধান্বিত হন না, তিনি নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন না, তিনি জাহেল নন, তিনি অপারগ নন ইত্যাদি ইত্যাদি।

১০৭৭. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ নেতিবাচক গুণ ও আপেক্ষিক গুণের উদাহরণ দিয়েছেন। নেতিবাচক গুণ যেমন আল্লাহর আল-আলীম (সর্বজ্ঞ), আল-কাদীর (সর্বক্ষম) নামের ব্যাপারে এটা বলা যে, তিনি আল্লাহ জাহেল নন, তিনি আল্লাহ অপারগ নন। আর আপেক্ষিক গুণ এর উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে বলা যে, তিনি অন্যকে জ্ঞানী করেন, অন্যকে ক্ষমতা প্রদান করেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৫৫); শারহু হাদীসিন নুযূল। আরও দেখুন, ইমাম আহমাদ এর আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ১০৫।

আপেক্ষিক গুণের সংজ্ঞা কারও কারও মতে, দু'টি জিনিস থাকবে যার একটি বুঝতে হলে দ্বিতীয়টি লাগবে, যেমন পিতা বুঝতে সন্তান আসবে, আর সন্তান বললে পিতার কথা আসবেই।

অথবা আপেক্ষিক গুণ সেটাকে বলে যার আসল রূপ বুঝতে হলে অন্য কিছুর ওপর কিয়াস করতে হবে। যেমন: রহীম, রহমত করেন, তবে রহমত তার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং তা সৃষ্ট, যার অর্থ নি'আমত প্রদান করা। অনুরূপ তিনি সামী' শোনেন, তবে শ্রবণ তার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং সেটি সৃষ্ট, আর তা হচ্ছে তত্ত্বাবধান করা... ইত্যাদি।

অথবা ব্রেনে একই কাজে দু'টি জিনিসের ধারণা একত্রিত করা, আর সম্বন্ধ পদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যখন একটি সম্বন্ধ জানা যাবে তখন অপরটিও জানা যাবে।

দেখুন, আমেদী, আল-মুবীন ফী শারহি মা'আনী আলফাযিল হুকামায়ি ওয়াল মুতাকাল্লিমীন, পৃ. ১১২; মাজমূ' ফাতাওয়া (৭/১৪৮-১৫০), (১১/১৪৬-১৫১); ঈজী, আল-মাওয়াকিফ ফী ইলমিল কালাম, পৃ. ১৭৯, ১৮০; জামীল সালীবা, আল-মু'জামুল ফালসাফী (১/১০১-১০৩)।

১০৭৮. এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সিফাত সাব্যস্তকারীদের মধ্যকার আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়।

১০৭৯. সাত সিফাত সাব্যস্ত করার ওপরই আশ'আরী মতবাদের লোকদের সর্বশেষ অবস্থান এসে থেমেছে। আর তা হচ্ছে, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্ষমতা, জীবন, দেখা, শোনা ও কথা বলা। তবে তারা কথা বলা গুণটিকে 'কালামে নফসী' বলে নির্ধারণ করে। অর্থাৎ অন্তরে কথা বলা। তাদের অধিকাংশ অবশ্য অষ্টম একটি সিফাত সাব্যস্ত করে থাকে। তা হচ্ছে 'বাক্কা' বা অবশিষ্ট থাকা।

আট অথবা(১০৮০) পনেরোটি(১০৮১) অথবা তারা এগুলোকে সিফাত(১০৮২) (গুণ) না বলে হাল বা

১০৮০. আট সিফাত সাব্যস্ত করার উপরেই মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকদের সর্বশেষ অবস্থান এসে শেষ হয়েছে। আর তা হচ্ছে, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্ষমতা, জীবন, দেখা, শোনা, কথা বলা ও তাকওয়ীন বা হওয়ার নির্দেশনা প্রদান।

তারা কেবল এ গুণগুলোকে সাব্যস্ত করেছে অন্য কোনো গুণ নয়; কারণ তাদের মতে বিবেক শুধু এগুলোই সাব্যস্ত করছে, অন্যগুলোকে সাব্যস্ত করে না।

তাছাড়া তারা বাকী সকল গুণ যা কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যে প্রদান করা হয়েছে সেসব সিফাতে খবরিয়্যাহকে অস্বীকার করে থাকে; এ যুক্তিতে যে এগুলো তার প্রকৃত অর্থে সাব্যস্ত করলে সাদৃশ্য প্রদান ও দেহবাদী হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আর তারা আল্লাহর সকল (আফ'আলে মুতা'আদ্দিয়াহ) কর্মযুক্ত ক্রিয়ার গুণকে 'তাকওয়ীন' গুণের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ সেগুলো সব তাকওয়ীন গুণের অর্থে। তারা বলে যে তিনি 'আযালী' নতুন করে তিনি কিছু করেন না, তাঁর সাথে নতুন করে ইচ্ছা করা ও ক্ষমতা প্রয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই।

আর তারা আল্লাহর যাবতীয় (আফ'আলে লাযিমাহ) অকর্ম ক্রিয়ার গুণকে অস্বীকার করে থাকে। কারণ এগুলো কেবল কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে এসেছে। অথচ এগুলো আল্লাহর ইখতিয়ার করা (পছন্দনীয়) গুণ। যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, ক্রোধান্বিত হওয়া, খুশী হওয়া ইত্যাদি।

তারা বাকী গুণগুলো অস্বীকার কারণ হিসেবে বলে, এর বাইরে অন্য গুণগুলো সাব্যস্ত করা হলে আল্লাহর জন্য তাশবীহ বা তাজসীম এসে যায়। যেমনিভাবে তারা আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় (আফ'আলে মুতা'আদ্দিয়া বা) সকর্ম ক্রিয়া (যেমন সৃষ্টি করা, জীবন দেয়া ইত্যাদি)র ক্ষেত্রে 'তাকওয়ীন' এ গুণটিকে যথেষ্ট মনে করে। আবার এটাও বলে যে, তাকওয়ীন গুণটি আযালী, নতুন করে হয় না, এটার সাথে ইচ্ছা ও কুদরতের কোনো সম্পর্ক নেই। এর বাইরে বাকী সব আবশ্যক (আফ'আলে লাযিমাহ) অকর্ম ক্রিয়া (যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা ইত্যাদি) অস্বীকার করে, কারণ এগুলো কেবল খবর তথা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা গিয়েছে (বিবেকের যুক্তি দ্বারা নয়), অথচ তা আল্লাহর পছন্দ করা গুণাবলি।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ড. আহমাদ আল-হারবী, আল-মাতুরিদিয়্যাহ দিরাসাতান ওয়া তাক্বওয়ীমান।

১০৮১. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এখানে পনেরোটি বলে সম্ভবত আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়্যাদেরকেই বুঝাচ্ছেন। কারণ তারা সবাই সাত বা আট এ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তাদের কেউ এমন কিছু সিফাত সাব্যস্ত করেছে যা তাদের অন্য কেউ সাব্যস্ত করেনি, তবে সব মিলে সেগুলোর সংখ্যা পনেরো পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যেমন, সে সাতটির সাথে আরও যোগ করেন, চেহারা, চোখ, দু' হাত, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, 'আরশের উপর উঠা, ভালোবাসা ইত্যাদি।

দেখুন, বাকেল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ২২৭,২৯৮-২৯৯; বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ৯০; জুওয়াইনী, আল-ইরশাদ, পৃ. ১৩৮-১৪০, ১৫৫, ১৫৮; আবু সা'ঈদ আন-নাইসাপূরী, আল-গুনইয়াতু ফী উসূলিদ্দীন, পৃ. ১১০, ১১৩-১১৭; শাহরাস্তানী, নিহায়াতুল ইক্বদাম, পৃ. ১০৬-১০৮; ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি (৩/৩৮০-৩৮৩); ঈজী, আল-মাওয়াক্বিফ, পৃ. ২৯৬-২৯৯।

১০৮২. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সিফাত বিষয়ক ভাষ্যসমূহের সাথে তিনটি জিনিস জড়িত:

১- এর দ্বারা খবর বা সংবাদ দেয়া। যেমন, তিনি জীবিত, তিনি জ্ঞানী, তিনি সর্বক্ষম; এটা সাব্যস্ত করার বেলায় সকলেই একমত।

২- এগুলো সম্পর্কে এটা বলা যে, এগুলো এমন সব অর্থ যা তার অস্তিত্বের ব্যাপারে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। যারা সিফাত সাব্যস্ত করে, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণ তারা এটাতেও একমত। বরং এটা এমন সকলের মত সকল গোষ্ঠীর মধ্য হতে যারা সুন্নাত এর দিকে নিজদের সম্পৃক্ত করে।

৩- আল-আহওয়াল বা অবস্থা। আর তা হচ্ছে আলেম অর্থ আলেমিয়্যাহ, কাদের অর্থ কাদেরিয়্যাহ। অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়ার অবস্থায়, ক্ষমতাবান হওয়ার অবস্থায়; এটা সাব্যস্ত করা নিয়ে সিফাত সাব্যস্তকারী ও সিফাত অসাব্যস্তকারী অনেকের মাঝেই ঝগড়া হয়েছে। তন্মধ্যে আবু হাশেম ও তার অনুসারীরা আহওয়াল সাব্যস্ত করে কিন্তু সিফাত সাব্যস্ত করে না। কাযী আবু বকর আল-বাকেল্লানী ও তার অনুসারীরা আহওয়াল ও সিফাত উভয়টিই সাব্যস্ত করে। তবে অধিকাংশ জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলারা

আহওয়াল (অবস্থা) বলে থাকে(১০৮৩)।

আহওয়াল ও সিফাত উভয়টিই অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ সিফাত সাব্যস্ত করে কিন্তু আহওয়াল সাব্যস্ত করে না।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৩৯); শারহু হাদীসিন নুযুল, পৃ. ৯৩-৯৪।

১০৮৩. সিফাত বা গুণ না বলে এগুলোকে যে আহওয়াল বা অবস্থা বলে সে হচ্ছে আবু হাশেম আব্দুস সালাম ইবন মুহাম্মাদ আল-জুব্বাঈ। তার জীবনী দেখুন, ইবনুল মুরতাদ্বা, ত্বাবাক্বাতুল মু'তাযিলাহ, পৃ. ৯৪; শারহুল উসুলিল খামসাহ, পৃ. ১৮২-১৮৩; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/৮২)।
আবু হাশেম সর্বপ্রথম আল্লাহর গুণাবলিকে 'আহওয়াল বলেছিল। পরবর্তীতে আশায়েরাদের মধ্য হতে ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী ও ইমাম আল-বাকেল্লানীও সিফাতকে 'আহওয়াল' বলেছিলেন।
আমেদী বলেন, 'আহওয়াল হচ্ছে, সাব্যস্তকৃত কিছু গুণ যেগুলোকে অস্তিত্বশীল কিংবা অস্তিত্বহীন কিছুই বলা যায় না। কখনও কখনও এটাও বলা যায় যে, তা হচ্ছে বিভিন্ন সত্তার মধ্যে একসাথ হওয়া ও ভিন্নতা হওয়া।
ঈজী বলেন, আহওয়াল হচ্ছে, অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীনের মাঝখানে যা আছে।
শাহরাস্তানী বলেন, বাস্তবে 'হাল' এর কোনো সংজ্ঞা দেয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, তবে তার একটি নিয়ম ও সীমা নির্ধারণ করা যায় ভাগ করার মাধ্যমে। প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা হবে, এক. যার কারণ নির্ণয় করা যায়, দুই. যার কারণ নির্ণয় করা যায় না। আর যার কারণ নির্ণয় করা যায় তা হচ্ছে কোনো সত্তার সাথে সম্পৃক্ত অর্থের বিধান। আর যার কারণ নির্ণয় করা যায় না তা হচ্ছে গুণাবলি, তবে সেগুলো কোনো অর্থের বিধান নয়।
ইবন হাযম বলেন, আশ'আরীরা যে 'আহওয়াল' এর দাবি করেছে তা হচ্ছে তারা বলে, এখানে কিছু 'হাল' বা অবস্থা রয়েছে যা হক্বও নয়, বাতিলও নয়। সৃষ্টও নয় অসৃষ্টও নয়, অস্তিত্বশীলও নয়, অস্তিত্বহীনও নয়, অজানাও নয়, জানাও নয়। বস্তুও নয়, অবস্তুও নয়। তারা আরও বলেন, এর থেকে, আলেম জানলো যে তার ইলম আছে.. অনুরূপভাবে ক্বাদীমের কাদিম হওয়া, বাকী এর অবশিষ্ট থাকা, ধ্বংসপ্রাপ্ত এর ধ্বংস হওয়া... তারা আরও বলে, যদি বাকী (অবশিষ্ট থাকে যে) সে অবশিষ্ট থাকা লাগে তাহলে তো আবার অবশিষ্ট থাকতে হয়, এভাবে সর্বদা চলতে থাকবে... যার কোনো শেষ নেই। তারা আরও বলে, এটা তো এমন কিছু বিষয় অত্যাবশ্যক করে তোলে যার কোনো শেষ নেই। আর এটা অসম্ভব..." তারপর আবু মুহাম্মাদ ইবন হাযম তাদের সন্দেহের জবাব প্রদান করেন এবং বলেন এ হচ্ছে বাজে বকওয়াস।' ইবন হাযম, আল ফাসলু (৫/১৬৫-১৬৭)।
(তবে এটা অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার যে, ইবন হাযম এ আহওয়াল নীতি বাতিল করার জন্য বেশ কিছু মূলনীতি সেখানে উল্লেখ করেছে যেগুলো বাতিল ও ফাসিদ মূলনীতি। তন্মধ্যে এটা বলা যে, 'আহওয়াল তো আ'রাদ্ব', আর আল্লাহ তা'আলা আ'রাদ্ব থেকে পবিত্র, এভাবে বলে মূলত ইবন হাযম সিফাত অস্বীকার করার আরেকটি বীজ রোপন করেছে। অথচ আবু হাশেম আল-জুব্বাই আহওয়ালকে আ'রাদ্ব বলেনি, যা তার আলোচনা পড়লেই বুঝা যায়।)
মু'জামুল ফালসাফীতে বলা হয়েছে, হাল বা আহওয়াল মূলত অন্তরে একটি দিকের খেয়াল আনয়ন করা।
বস্তুত আহওয়াল এর পরিচয় লাভে এসব বিভ্রান্তির কারণে আলেমগণ আবু হাশেম এর 'আহওয়াল' তত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছেন। এমনকি তারা তাকে জাহেলও বলেছেন, এর জন্য তার ওপর দোষারোপও করেছেন।
বাগদাদী 'আহওয়াল' এর ওপর কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'আর সে (আবু হাশেম) মনে করেছে 'আল্লাহ তা'আলা জানেন কারণ তিনি একটি 'হাল' এ থাকেন। তিনি ক্ষমতাবান, কারণ তিনি একটি 'হাল' এ থাকেন। সে মনে করেছে, আল্লাহ তা'আলা সব জানার বিষয় জানার জন্য এমন 'হাল' এ থাকেন, অন্য বিষয় জানার জন্য আগের হাল এর চেয়ে ভিন্ন হাল এর থাকেন। অনুরূপভাবে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করার মত জিনিসে ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য তিনি এমন 'হাল' এ থাকেন, যার সম্পর্কে বলা যাবে না যে, তিনি অপর কোনো কিছুর ওপর ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য পূর্বের হাল এ আছেন।... তারপর তিনি বলেন, আর সে মনে করেছে, 'আহওয়াল' এমন কিছু যাকে অস্তিত্বশীলও বলা যাবে না, অস্তিত্বহীনও বলা যাবে না.... তারপর বলেন, বস্তুত এ মতবাদ সে নিজেও বুঝে বলে মনে হয় না, তাহলে সে সেটি বিশুদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠার করার জন্য বিপক্ষের সাথে মুনাযারা কীভাবে করবে?'

ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، كما عرف من مذاهب المتكلمين.

فهؤلاء قسمان: «قسم» يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى

আর তারা কুরআনে আসা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানান দেয়া গুণাবলি সাব্যস্ত করে কিন্তু হাদীসে আসা সিফাতগুলো অস্বীকার করে। যেমনটি কালামশাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন মতবাদ হিসেবে জানা যায়।[১০৮৪]

তারা আবার দু' ভাগে বিভক্ত: একভাগ এগুলোর তা'ওয়ীল বা ব্যাখ্যা করে এবং এগুলোর

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কেউ কেউ বলেছেন, 'আশ্চর্যজনক কথা হচ্ছে তিনটি, যেগুলোর পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই, নাযযামের তুফরাহ, আবু হাশেম এর আহওয়াল আর আশ'আরীর কাসব।' আস-সাফাদিয়্যাহ (১/১৫১)।

আর সম্ভবত সে জন্যই বলা হয়ে থাকে,

مما يقال ولا حقيقة عنده ... معقولة تدنـو إلى الأفهام

الكسب عند الأشعري والحال ... عند البهشمي وطفرة النظام

"যা বলা হয়ে থাকে যে, যেখানে কোনো বাস্তব কিছু নেই যা বিবেকসম্মত আর যা বুঝের নিকটে যাবে তা হচ্ছে,

আশ'আরীর আল-কাসব, আবু হাশেম এর আল-হাল আর নাযযাম এর ত্বাফরাহ।"

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জ্ঞান, ক্ষমতা এ দুটি দ্বারা জ্ঞানী হওয়া ও ক্ষমতাবান হওয়াকেই বুঝায়। এ হচ্ছে অধিকাংশের মত, যারা মনে করে 'সিফাত' এর বাইরে এসব 'আহওয়াল এর অতিরিক্ত কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে যারা সিফাত সাব্যস্তের পরেও তার বাইরে 'আহওয়াল'কে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করে যেমন, কাযী আবু বকর আল-বাকেল্লানী, আবু ইয়া'লা, আবুল মা'আলী তার এক মতে, তারা বলেন, এসব সিফাত সাব্যস্ত করা দ্বারাই অতিরিক্তভাবে 'আহওয়াল' সাব্যস্ত হয়ে যায়, কারণ (ইসবাতুল মালযূম ইয়াক্তাদ্বী সুবূতাল লাযিম) যা আবশ্যিকভাবে যা হয় তা সাব্যস্ত করতে গেলে বা আবশ্যিকভাবে হওয়ার কারণ হয় তাও সাব্যস্ত করতে হয়। (যেমন, ছেলে সাব্যস্ত করতে গেলে পিতা সাব্যস্ত করতে হয়), বস্তুত বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, 'এসব 'আহওয়াল' এমন সব ধরে নেয়া মূলনীতির মতো, যার অস্তিত্ব কেবল ব্রেনেই পাওয়া যায় বাইরে কোনো সত্তায় নয়।' ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৫/৩৫); আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (২/১২৫-১২৬)।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাকিল্লানী, আত-তামহীদ, পৃ. ২৩০-২৩৩; বাগদাদী, উসূলুদ্দীন, পৃ. ৯২-৯৩; আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব, পৃ. ১৮০-১৮২; আসফারাঈনী, আত-তাবসীর ফিদ-দীন, পৃ. ৫৩-৫৪; জুওয়াইনী, আল-ইরশাদ, পৃ. ৮০-৮৪; ইবন হাযম, আল-ফাসলু (৫/৪৯-৫৪); রাযী, ই'তিক্বাদু ফিরাকিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন, পৃ. ৪০-৪১; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১/৯২-৯৪); শাহরাস্তানী, নিহায়াতুল ইক্বদাম, পৃ. ১৩১; আল-আমেদী, আল-মুবীন ফী শারহি মা'আনী আলফাযিল হুকামায়ি ওয়াল মুতাকাল্লিমীন, পৃ. ১২১; ঈজী, আল-মাওয়াক্বিফ, পৃ. ৫৭-৫৯; জামীল সলীবা, আল-মু'জামুল ফালসাফী, পৃ. ৬৬।

১০৮৪. কুরআনে আসা যাবতীয় সিফাতে খাবারিয়্যাহ বা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো গুণাবলি স্বীকার করা, কিন্তু হাদীসে আসা গুণাবলি অস্বীকার করা এ হচ্ছে অধিকাংশ আশ'আরী মতবাদের লোকদের কারও কারও নীতি। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো কোনো আশ'আরী মতবাদের ইমাম সিফাত নিষ্ক্রীয়কারী মু'আত্তিলাদের সাথে মিলে যাবতীয় 'সিফাতে খবরিয়্যাহ' অস্বীকার করলেও অধিকাংশ আশ'আরী মতবাদের লোক (মু'আত্তিলাদের সাথে একাত্ম হয়ে) কেবল হাদীসে আসা 'সিফাতে খবরিয়্যাহকেই অস্বীকার করে থাকে। আর কুরআনে আসা সিফাতে খবরিয়্যাহ'র ব্যাপারে তাদের দু'টি মত রয়েছে, আশ'আরী ও বাকেল্লানী তা স্বীকার করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাও অস্বীকার করে থাকে।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/৫২), (৪/১৪৭-১৪৮); শারহুল আসফাহানিয়্যাহ, পৃ. ৩২।

علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين.

و«قسم» يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.

[من يفوض المعنى ولا يقول ظاهرها مراد أو غير مراد]:

وأما «القسمان» الواقفان: «فقسم» يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.

وقوم يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم

উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে।[১০৮৫] যেমন, 'ইস্তেওয়া (استوى) অর্থ (استولى) বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন বা সম্মান ও মর্যাদায় উঁচু হলেন অথবা 'আরশে তার আলো প্রকাশিত হলো অথবা সৃষ্টি সেখান গিয়ে শেষ হলো ইত্যাদি ইত্যাদি কালামপন্থীদের করা বিভিন্ন অর্থ।

আর দ্বিতীয় ভাগ বলে: এগুলোর দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন তা তিনিই ভালো জানেন; তবে আমরা নিশ্চিত জানি যে, তিনি কোনো বাহ্যিক সিফাত সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য করেননি।[১০৮৬]

[যারা বলে সিফাত বিষয়ক ভাষ্যের ব্যাপারে আমরা নীরবতা অবলম্বন করবো, তাদের পরিচয়][১০৮৭]

যে দুই গোষ্ঠীর লোক কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে তাদের একভাগ বলে: এগুলোর দ্বারা আল্লাহর মহানত্বের সাথে উপযোগী (যাহির) প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া জায়েয। আবার সেগুলো দ্বারা যা উদ্দেশ্য তা আল্লাহর গুণ বা সিফাত নাও হতে পারে। এটি হচ্ছে অনেক ফকীহদের তরীকা।

আরেক সম্প্রদায় এসব কিছু থেকে বিরত থাকে। তারা কুরআন তিলাওয়াত এবং হাদীস

১০৮৫. এটি মূলত জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের মতবাদ; যারা সিফাত অস্বীকার ও সিফাত বিকৃতিকে একসাথে করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, পরবর্তী আশ'আরী ও মাতুরিদীদের মাঝে এ মতটিই বেশি প্রবল। তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের বর্তমান ওয়ারিস কারা? আশ'আরী ও মাতুরিদী মতবাদের লোকেরা যতই মুখে জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের বিরোধিতা করার কথা বলুক কার্যত কিন্তু তারা দিন শেষে তাদের গুরুদের কথাই ধারণ করেছে, আর মুখে বলে তারা জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের বিরোধিতায় লিপ্ত।

১০৮৬. অর্থাৎ এ দু'টি গোষ্ঠী যারা সিফাত সংক্রান্ত ভাষ্যসমূহের প্রকাশ্য অর্থ অস্বীকার করে, তারা দু'টি জিনিসকে একসাথ করেছে, আল্লাহর গুণাবলিকে 'না' করা, আর আল্লাহর গুণাবলিকে তা'ত্বীল বা নিষ্ক্রীয়করণ করা। তাদের মধ্যকার প্রথম দলটি অপব্যাখ্যা করে, বাক্যকে তার স্থানচ্যুত করে ভিন্ন অর্থ বের করে, কিন্তু দ্বিতীয় দলটি এসব সিফাতের ভাষ্যসমূহের সাথে তাফওয়ীদ্ব বা তাজহীল নীতি ব্যবহার করে থাকে, তাদের মত হচ্ছে এসব ভাষ্যের অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৩৯৯)।

১০৮৭. এরা দ্বিধান্বিত থাকে, হয়রান, হতভম্ব ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। এ গোষ্ঠীর লোকেরা উভয়টিই জায়েয মনে করে থাকে। সিফাত সাব্যস্ত করা যাবে, আবার করা যাবে না। তারা বলে, 'আমরা জানি না আল্লাহ এগুলো দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন।' দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৩৯৯)।

والستهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها.

[الطريقة الصحيحة في آيات الصفات وأحاديثها]:

الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها، القطعُ بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع

অধ্যায়নের উপরে কিছুই বেশি করে না। তাদের জবান ও অন্তরকে এসব দ্বারা কিছু নির্ধারণ করা থেকে বিমুখ রাখে।[১০৮৮]

এই ছয় ভাগ থেকে কোনো লোক বাইরে যেতে পারে না।

[আল্লাহর গুণাবলি সম্বলিত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ভাষ্যের ব্যাপারে বিশুদ্ধ পদ্ধতি]

অধিকাংশ সিফাতের আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে: নিশ্চিতভাবে ও অকাট্যভাবে তা দ্বারা (সিফাত) প্রমাণকারী পদ্ধতির অনুসরণ; যেমন "আল্লাহ্ 'আরশের উপরে" এর আয়াত ও হাদীস। আর এ ব্যাপারে এবং অনুরূপ ব্যাপারে সঠিক নীতি জানা যাবে এর ওপর কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা'র এমন প্রমাণের মাধ্যমে যে প্রমাণের বৈপরীত্য হয়ে কিছু আসার সম্ভাবনা রাখে না।

অন্যদিকে সিফাতের আয়াত ও হাদীসের কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার মাধ্যমে এরকমটি সাব্যস্ত হবে, যদিও সেখানে বিপরীতটির সম্ভাবনাও থাকে।[১০৮৯] এ ব্যাপারে

১০৮৮. উভয় গোষ্ঠীর মাঝে এরা সবচেয়ে বেশি হতভম্ব, দিকভ্রান্ত। তারা এসব আয়াত ও হাদীসের দ্বারা সিফাত সাব্যস্ত করা যাবে কি যাবে না, তা নিয়ে মোটেই ভাবে না। এ হচ্ছে তাদের মাঝে ও তাদের পূর্বে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য।

তাহলে আমরা সিফাতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টদেরকে মোটের ওপর তিন ধরনের লোক পেয়েছি:

এক. মু'আত্তিলা, যারা শব্দকে তাফওয়ীদ্ব করে, শব্দের ব্যাপারে মত দেয় যে, তা সিফাত কি না কেবল আল্লাহই জানেন, তবে তারা অর্থের ব্যাপারে এটা বলেন না। অর্থের ব্যাপারে বলেন যে এগুলার অর্থ নেই। অধিকাংশ কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে যারা আল্লাহর কিছু সিফাত সাব্যস্ত করে তারা এ মতের প্রবক্তা।

দুই. ওয়াক্বিফা, তারা শব্দ ও অর্থ উভয়টিই তাফওয়ীদ্ব করে। সাথে সাথে তারা এগুলো দ্বারা সিফাত সাব্যস্ত করা জায়েয বা জায়েয নয় উভয়টিই গ্রহণ করে।

তিন. ওয়াক্বিফা, তারা শব্দ ও অর্থ উভয়টিই তাফওয়ীদ্ব করে। কিন্তু তারা এগুলো দ্বারা সিফাত সাব্যস্ত করা জায়েয কিংবা না জায়েয এ বিষয়ে আলোচনাও করতে নারায।

১০৮৯. যেমন, আল্লাহর বাণী, [القلم : ٤٢] ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ "স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে।" [সূরা আল-ক্বালাম: ৪২] অনুরূপ আল্লাহর বাণী ﴿فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة : ١١٥] "সেদিকই আল্লাহর তা'আলারই।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১১৫] অনুরূপ হাদীস وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً "আর যে আমার কাছে হেঁটে আসবে, আমি তার কাছে দ্রুতবেগে যাই।" [মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৪২৮] আর তা এই হিসেবে যে, আহলুস সুন্নাহ'র সালাফদের মাঝে এ আয়াত ও তাফসীরের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ হয়েছে। এগুলো কি আসলেই সিফাতের আয়াত কী না? যেমনটি এর অনুমিত জায়গা আকীদা, তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখা গ্রন্থে আলোচনা এসেছে।

احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور.

[المخرج لمن اشتبه عليه الأمر]:

ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»، وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة

কোনো কোনো মুমিনের দ্বিধা আসতেও পারে, তার ইলম ও ঈমানের অবস্থার আলোকে। বস্তুত যাকে আল্লাহ আলো দেননি তার তো কোনো আলো নেই।

[কারো কাছে সিফাত এর আয়াত ও হাদীসসমূহ ব্যাপারে সন্দেহ হলে তার কী করণীয়]

আর যার কাছে এ (সিফাত) অধ্যায়ে কিংবা অন্য অধ্যায়ে কেনো কিছু সন্দেহপূর্ণ মনে হয়, সে যেন সেই দো'আ করে যেটি ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে সালাত আদায় করতেন তখন বলতেন:

«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»

"হে আল্লাহ! জিবরীল, মিকাঈল, ইসরাফীলের রব্ব, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবকিছুর জ্ঞানী, আপনি আপনার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতভেদ করে সেটার ফয়সালাকারী, তারা যে সত্যের বিষয়ে মতভেদ করে তাতে আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন। নিশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথপ্রদর্শন করেন।"[১০৯০]

অন্য বর্ণনায় আবু দাউদ কর্তৃক সংকলিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের তাকবীর দেয়ার পর এটা বলতেন।"[১০৯১]

সুতরাং যখন বান্দা মুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহর নিকট দো'আ করে[১০৯২], অতঃপর আল্লাহর

১০৯০. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৭৭০।

১০৯১. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৭৬৮।

১০৯২. বান্দা সবসময় জ্ঞান ও হিদায়াতের মুখাপেক্ষী। চাইবে, যাচ্ঞা করবে, আল্লাহর যিকির ও তাঁর কাছে নিজের নিঃস্বতা তুলে ধরলে আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিবেন ও তাকে পথ দেখাবেন। যেমন হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ»

"হে আমার বান্দারা, তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট, তবে যাকে আমি হিদায়াত দিই, সুতরাং তোমরা

المسلمين: انفتح له طريق الهدى.

[سبب ضلال كثير من المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب]:

ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانًا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له،

বাণী, রাসূলের বাণী, সাহাবী, তাবে'য়ী ও ইমামগণের বাণীর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তখন তার নিকট হিদায়াতের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

[এ অধ্যায়ে অধিকাংশ দার্শনিক, কালামশাস্ত্রবিদদের পথভ্রষ্টতার মূল কারণ]

অতঃপর যদি সে (হক জানতে আগ্রহী ব্যক্তি) দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের এ বিষয়ে পদচারণার সর্বশেষ সীমা সম্পর্কে অবগত হয় এবং তারা যাকে অকাট্য প্রমাণ বলে জানে সেগুলো সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে সে দেখতে পাবে, তারা যা প্রমাণ[১০৯৩] বলে মনে করেছে তা আসলে সন্দেহ।[১০৯৪] আরও দেখতে পাবে, তারা যেসব কিছুর ওপর নির্ভর করেছে তা কেবল দাবি সর্বস্ব, তার কোনো বাস্তবতা নেই অথবা তা নষ্ট কিয়াস[১০৯৫] থেকে

আমার কাছেই হিদায়াত চাও আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দিব।" মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৫৭৭।

অনুরূপ 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীসেও তা এসেছে।

১০৯৩. প্রমাণ তো তখনই হবে যখন তা জ্ঞানের ফায়েদা দিবে। সে অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান হোক বা প্রবল ধারণার জ্ঞান।

১০৯৪. সন্দেহ-সংশয় সেটার নাম যা হক্কের মতো মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

১০৯৫. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের পথভ্রষ্টতার বড় কারণ হচ্ছে নষ্ট কিয়াস। যেমন, দু'টি জিনিসের মধ্যে কোনো কোনো দিক থেকে মিল পাওয়া গেলেই দু'টি জিনিসকে একই রকম মনে করা। অথচ উক্ত দু'টি জিনিসের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে তা বর্ণনা করা হলে উভয়ের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য বিরাট আকার ধারণ করবে। তিনি এর উদাহরণ দিয়েছেন, রবের অস্তিত্ব ও সৃষ্টির অস্তিত্ব এ দু'টি দিয়ে।

অন্য জায়গায় তিনি কিছু নষ্ট কিয়াস এর উদাহরণ পেশ করে বলেন,

১- "যে কিয়াসকে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য নষ্ট বলবে তা অবশ্যই নষ্ট"।

২- "যে কিয়াস দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ'র এক ভাষ্যকে অপর ভাষ্যের বিপরীত হুকুম হওয়া সত্ত্বেও তার সামনে দাঁড় করানো হয় সেটি নষ্ট কিয়াস।"

৩- যে কিয়াস দ্বারা দু'টি জিনিসকে এক রকম করে নেয়া হয়েছে অথবা দু'টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করে নিয়েছে অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানে সেখানে যেসব গুণাবলি দেখতে বলা হয়েছে তাতে তা দেখা হয়নি, তাহলে তা নষ্ট কিয়াস। মাজমূ' ফাতাওয়া (১৯/২৮৭-২৮৮)। আরও দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এর কিয়াস সংক্রান্ত পুস্তিকা, যা রয়েছে, মাজমূ' ফাতাওয়া এর (২০/৫০৪-৫৮২)।

খত্বীবে বাগদাদী বলেন, কিয়াস দু' প্রকার: তাওহীদের ব্যাপারে কিয়াস ও আহকাম এর ব্যাপারে কিয়াস।

তন্মধ্যে তাওহীদের ব্যাপারে কিয়াস দু' প্রকার: বিশুদ্ধ কিয়াস, নষ্ট কিয়াস। তারপর তিনি বলেন, "সেটিই নিন্দিত নষ্ট কিয়াস যা বিদ'আত ও ইলহাদের দিকে নিয়ে যায়, যেমন স্রষ্টাকে সৃষ্টির মতো মনে করা, অনুরূপ স্রষ্টার সিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা। অনুরূপ সে কিয়াসও

أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.

গঠিত সংশয় অথবা এমন কিছু মূলনীতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার সামান্য অংশই কেবল সঠিক[১০৯৬] অথবা এমন ইজমা'র[১০৯৭] দাবি করেছে যার কোনো হাকীকত বা

নষ্ট কিয়াস বলে বিবেচিত হবে, যে কিয়াস তার কিয়াসকারীকে আল্লাহ তা'আলা যা তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, আর যা দিয়ে তাঁর রাসূলগণ তাকে গুণান্বিত করেছেন তার বিরোধিতা করতে বাধ্য করে।" দেখুন, আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (১/২০৯)।

১০৯৬. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এখানে বলতে চেয়েছেন যে, তথাকথিত দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদরা একটি মৌলিক ধরে নেয়া বিষয়ের ওপর কথা বলে থাকেন। আর তারা বলে, হাকীকত হচ্ছে যা বাস্তবে সে রকম যে রকম তা বাস্তবে আছে! তারপর যদি তাদেরকে বলা হয়, আচ্ছা বুঝলাম তোমরা যা বলেছ, এখন বাইরে সেটাকে দেখান, তখনই তাদের মূর্খতা স্পষ্ট হয়ে যায়, তারা বুঝতে পারে যে, তারা যা বলছে তা কেবল ব্রেনে একটি জিনিস নির্ধারণ করা মাত্র, বাইরে সেটার কোনো অস্তিত্ব নেই। নতুবা এটাই হচ্ছে নীতি যে, অস্তিত্বশীল জিনিসের যদি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করা হয়, তবে তার বাস্তব জ্ঞান বাইরে অবশ্যই পাওয়া যাবে। সুতরাং যতক্ষণ বাইরে এর অংশ বিশেষের অস্তিত্ব না পাওয়া যাবে ততক্ষণ এটাকে মৌলিক কিছু বলার সুযোগ নেই। দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল মানতিক্বিয়্যীন, ৩২৬; দারউত তা'আরুদ্ব (১/২৯১)।

১০৯৭. কালামশাস্ত্রবিদরা যে ইজমা'র দাবি কথায় কথায় করে থাকে তার বাস্তব চিত্র শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ তুলে ধরেছেন তার একাধিক গ্রন্থে। যেমন তিনি বলেন, 'তারা সাম'ইয়্যাত (মৃত্যু পরবর্তী জীবনের) বিষয়ে নির্ভর করে থাকে যেটাকে তারা ইজমা' মনে করে থাকে সেটার ওপর। অথচ তারা কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞানই রাখে না। বরং তারা আক্বলী কিয়াসের ওপর নির্ভর করে যা তাদের মূলকথা, আর তারা নির্ভর করে ইজমা'র ওপর।

তাদের এসব আক্বলী কিয়াস এমনিতেই বাতিল, আর যে ইজমা'র কথা তারা ধারণা করে বলে থাকে তা কেবল তাদের নিজেদের বা তাদের মত অপরাপর কালামশাস্ত্রবিদদের ইজমা', এগুলো কখনো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ইজমা' নয়, উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যাহ'র আলেমগণের ইজমা'ও নয়। আল্লাহ তা'আলা তো কেবল উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যাহ'র মুমিনগণের ইজমা'কে নির্ভুল বলে নির্ধারণ করেছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর মুমিনগণই কেবল পথভ্রষ্টতা ও ভুলের ওপর একমত হবে না। যেমনটি বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত।' আন-নুবুওয়াত (১/৫৯১-৫৯২)।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'কুরআন ও সুন্নাহ'র বাইরে যারা চলে সেসব বিদ'আতী প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাধারণ মূলনীতির দিকে তাকালে দেখতে পাবে যে, সেগুলো বিভিন্ন প্রকার কিয়াসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেসব কিয়াস তারা নিজেরা আবিষ্কার করেছে, এ কিয়াসকে তারা রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার বিপরীতে এনে দাঁড় করায়। আরও দেখতে পাবে যে, তাদের সেসব মূলনীতি তথাকথিত ইজমা'র ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা তারা দাবি করে থাকে। এভাবে তারা আক্বলী কিয়াস ও শ্রুত ইজমা'র ওপর তাদের দীনের ভিত্তিকে দাঁড় করায়।

এজন্য আপনি দেখবেন, আবুল মা'আলী (জুওয়াইনী)কে, যিনি তাদের পরবর্তীদের মাঝে খুবই বুদ্ধিমান, তিনি তার তথাকথিত করা অকাট্য নীতিসমূহের ব্যাপারেও অনুরূপ কিছু (আকলী কিয়াস ও শ্রুত ইজমা') এর উপর ভর করে কথা বলেছে ও অনুরূপ কিছুর ওপর (বাস্তবে সেসব কিছুই নেই)। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির অনুসারী কালামশাস্ত্রের অন্যান্য নেতারা, যেমন আবুল হুসাইন আল-বসরী, তার উস্তাদরা ও তাদের মতো লোকেরা, অধিকাংশ স্থানে কোনো কিছুর ওপরই নির্ভর করে না, না কুরআনের ওপর, না হাদীসের ওপর, না গ্রহণযোগ্য ইজমা'র ওপর। বরং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইজমা', যা সবার জানা, তার বিরোধিতা করে তাদের দাবি করা যৌগিক ইজমা'র ওপর নির্ভর করে; অনুরূপভাবে তারা স্পষ্ট বিবেকের যুক্তিরও বিরোধিতা করে থাকে তাদের কথাকথিত দাবি করা বিবেকের যুক্তির ওপর নির্ভর করে। তদ্রূপ তারা কুরআন ও সুন্নাহ'র বিরোধিতা করে, যা দীনের দু'টি মৌলিক প্রমাণ, তারা এ দু'টির বিরোধিতায় নিয়ে আসে তাদের নিজেদের বানানো দীনের মূলনীতিকে।' আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৬৩১)। আরও দেখুন, আত-তিস'ঈনিয়্যাহ (২/৪৯২), (৩/৮৩৭), দারউত তা'আরুদ্ব (৮/৯৬); বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৫৬১); মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/২৫)। আরও দেখুন, ইয়াসির ইবন আব্দুর রহমান আলে ইয়াহইয়া, দা'আওয়া আল-ইজমা'

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغِرَّ ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانًا وعلمًا بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضِدَّ يُظهِر حُسْنَه الضدُّ، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيمًا، وبقدره أعرف.

[حال المتوسطين من أهل الكلام] :

فأما المتوسط من المتكلمين، فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه

বাস্তবতা নেই অথবা এক্ষেত্রে তারা কোনো মাযহাব পাকড়াও করে আছে, আর মুশতারিক (বিবিধ অর্থবোধক) শব্দাবলি[১০৯৮] দিয়ে দলীল এনেছে।

অতঃপর এগুলো যখন তাদের দীর্ঘ দুষ্প্রাপ্য, অতি লম্বা শব্দাবলি দ্বারা গঠিত করে বর্ণনা করা হয়, তাদের পরিভাষা অবগত না হলে যেগুলো জানা দুষ্কর[১০৯৯], তখন এটা বোকা ধোঁকাগ্রস্ত লোকের কাছে তেমন ধারণা প্রদান করে যেমন পিপাসার্ত ধারণ করে থাকে মরীচিকার ব্যাপারে। তারপর ঐ ধোঁকাগ্রস্ত যখন এ ধোঁকা জানতে পারে তখন কুরআন ও সুন্নাহ যা নিয়ে এসেছে সেগুলোর ওপর তার ঈমান ও ইলম বৃদ্ধি পায়। কেননা "বিপরীত কিছু দ্বারা বিপরীত কিছুর আসল সৌন্দর্য প্রকাশ পায়"। আর যখনই কেউ বাতিল সম্পর্কে বেশি অবহিত হবে তখনই সে সত্যের অধিক সম্মানকারী হবে[১১০০], আর যখন সে কুরআন ও সুন্নাহ'র নির্দেশিত পথের দিশা পাবে তখন সে এর মর্যাদাও অধিক জানতে সক্ষম হবে।

[কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে যারা মাঝামাঝি অবস্থানে আছে তাদের অবস্থা]

কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে যারা মাঝামাঝি অবস্থানে আছে তাদের ব্যাপারে বেশি ভয় থাকে, যেটা থাকে না তাদের ব্যাপারে যারা কালামশাস্ত্রে প্রবেশ করেনি বা যারা তার শেষ সীমা

ইনদাল মুতাকাল্লিমীন ফী উসূলিদ্দীন।

১০৯৮. অর্থাৎ এমন সব শব্দের পিছনে পড়ে থাকে যাতে বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থাকে, যে শব্দগুলোর মাঝে রয়েছে ইশতিরাক, ইজমাল ও ইবহাম। অর্থাৎ যেগুলোতে বহু অর্থ করা যায়, যেগুলোতে অনেক রকম ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে, আর যেগুলোতে রয়েছে অস্পষ্টতা।

১০৯৯. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা যেসব আক্বলী বা বিবেকের যুক্তির দাবি তুলে দলীল হিসেবে পেশ করে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, বিশুদ্ধভাবে পরীক্ষা করে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। এগুলো মূলত খালি কলসিতে আঘাত করে বাচ্চাদেরকে ভয় দেখানো অথবা যারা বাচ্চাদের মতো অল্প বুঝ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তাদের ভয় দেখানোর মতো। দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আক্বলি ওয়ান নাক্বলি (৪/১৮১), বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (৪/১১৮)।

১১০০. অনুরূপ কথা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ অন্যত্র বলেছেন, 'আর আমরা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আমাদের কাছে এমনভাবে এসব বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তার বিপরীতটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, আমাদের কাছে দার্শনিক ও জাহমিয়্যাদের পেশকৃত প্রমাণাদির অসারতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর আমরা সুস্পষ্ট বিবেকের যুক্তির মাধ্যমে তারা যেসব বড় বড় জিনিসির ওপর নির্ভর করে থাকার দাবী করে তার অসারতা ও ফাসাদ স্পষ্ট হয়ে গেছে। এটি, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, এমন যে, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের হিদায়াত ও ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ বিপরীত পক্ষের ভ্রান্তি বা অসারতা জানলে হক্ব বুঝতে ও হক্বের ওপর দৃঢ় শক্তভাবে থাকতে সহায়তা হয়। আর যে কেউ বাতিলকে অসার হিসেবে বেশি জানবে তার কাছে হক্বের সত্যতা তত বেশি প্রতিভাত হবে।..' দারউত তা'আরুদ্ব (৫/২৫৮)।

نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدًا لمعظمه وتهويلاً.

وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان.

অতিক্রম করেছে। কেননা যে তাতে প্রবেশ করেনি সে নিস্তার লাভ করেছে। আর যে তা শেষ করেছে সে সর্বশেষ সীমা জানতে পেরেছে।(১১০১) তার অন্য কিছুতে আর ভয় অবশিষ্ট নেই। অতঃপর যখন তার নিকট সত্য প্রকাশিত হয়, আর সে তো তার প্রতি পিপাসার্ত হয়েই আছে, তখন সে তা কবুল করে নেয়। কিন্তু যে মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থানকারী হয়ে আছে সে বড়দের থেকে যা লাভ করে তা বড়দের সম্মানে, তাদের মতকে বিশাল মনে করে অন্ধ অনুকরণ করে গ্রহণ করে নেয়।(১১০২)

এ জন্যই কেউ কেউ বলেছেন: "দুনিয়াকে বেশি নষ্ট করেছে অর্ধেক কালামপন্থী, অর্ধেক ফকীহ, অর্ধেক চিকিৎসক এবং অর্ধেক ব্যাকরণবিদ। এ (অর্ধেক কালামপন্থী) দীনকে নষ্ট করে, এ (অর্ধেক ফকীহ) দেশ নষ্ট করে, এ (অর্ধেক চিকিৎসক) শরীর নষ্ট করে, আর এ (অর্ধেক ভাষাবিদ) ভাষাকে নষ্ট করে।"(১১০৩)

১১০১. যেমন আবু হামিদ আল-গাযালী বলেছেন, 'তার থেকে এ নসীহত শোন, যে এসব কালাম শাস্ত্রবিদদের কথার যথাযথ পরীক্ষা করেছে, তারপর সেটাকে ঘৃণা করেছে তার প্রকৃত অবস্থা জানার পর, কালামশাস্ত্রবিদদের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে সেখানে যথাযথ অবগাহন করার পর, তারপর সেটি অতিক্রম করে কালামশাস্ত্রের সাথে মত অন্যান্য ইলমে ডুব দেয়ার পর। তার কাছে তখন স্পষ্ট হয়েছে যে, এ দিক দিয়ে আল্লাহর মা'রিফত হাসিলের পথ রুদ্ধ, তাঁকে জানার পথ বন্ধ।' এহইয়ায়ে উলুমিদ্দীন (১/৩৫৫); আরও দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউত তা'আরুদ্ব (৭/১৬৩)।

১১০২. ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এখানে কালামশাস্ত্রবিদদের বিভ্রান্তির পিছনে দু'টি কারণ নির্দেশ করছেন:

এক. কালামশাস্ত্রবিদরা যেসব বিষয়কে আক্বলী দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাতে তারা তাদের পূর্ববর্তী দর্শনশাস্ত্রের নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছে, যেমন এরিস্টটল। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৪/২৭৯), (৩/৪৫৪), (৫/৩১৬), (৮/৮৫)।

দুই. আর তাদের মাঝে যারা অর্ধেক কালামশাস্ত্রবিদ মূলত তারা যাদেরকে সম্মান করে তাদের বিশাল ব্যক্তিত্বের তথাকথিত বিশালত্ব, বাগড়ম্বর, বাড়াবাড়ির কারণে, তাদের বক্তব্যের অনুকরণ করার কারণে তাদের পিছনে ছুটে চলেছে, যেমন ইবন সীনা, জুব্বাঈ প্রমুখদেরকে বড় মনে করে নিজেদের দৈণ্যতার কারণে এদেরকে না বুঝেই ইমাম বানিয়ে নিয়েছে। দেখুন, দারউত তা'আরুদ্ব (৫/৩১৬); মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/৬০)।

১১০৩. সম্ভবত এটি ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেছেন, তার বিভিন্ন গ্রন্থে তা এসেছে, কিন্তু কোথাও কে বলেছেন তা আসেনি। দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল বিকরী (২/৭৩০)।

[المتكلمون في قول مختلف]:

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في ﴿قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ - يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ [الذاريات:٨، ٩] يعلم الذكي منهم العاقل: أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بيِّنة، وإنما هي كما قيل فيها:

حججٌ تهافتُ كالزجاج تخالها ••• حقًا وكلٌّ كاسر مكسور

[النظر إلى أهل الكلام بعين الشرع وبعين القدر]:

ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي. رضي الله عنه. حيث قال: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا

[কালামশাস্ত্রবিদরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত]

আর যে জানতে পারবে যে, দার্শনিক কালামপন্থী এবং অন্যরা সাধারণত বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হয়ে আছে, ﴿قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞﴾ [الذاريات: ٨، ٩] "পরস্পর-বিরোধী কথায় লিপ্ত। সে ব্যক্তিকে তা হতে বিরত রাখা হয়, যাকে বিরত রাখা হয়েছে।" [সূরা আয-যারিয়াত: ৮, ৯] তখন তাদের মধ্যকার বুদ্ধিমান, মেধাবী এটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, সে যা বলছে তাতে সে দিব্যদৃষ্টির উপরে নেই। তার পেশকৃত দলীলগুলো সত্যিকার অর্থে প্রমাণ নয়, বরং সেগুলো ঐরকম যেমনটি বলা হয়েছে: কবিতা—

حججٌ تهافتُ كالزجاج تخالها ... حقًا وكلٌّ كاسر مكسور

"এমনসব প্রমাণ যা কাঁচের ন্যায় টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়েছে, তুমি তাকে মনে করছো সত্য, বাস্তবে সেসব ভাঙ্গা টুকরোর সমষ্টি" (১১০৪)

[কালামশাস্ত্রবিদদের দিকে শরী'আতের দৃষ্টি ও তাক্বদীরের দৃষ্টিতে অবলোকন]

তাদের সম্বন্ধে জ্ঞানী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি জানতে পারে যে, একদিক দিয়ে তারা সেটার উপযুক্ত যা ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

«حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام».

"কালামপন্থীদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডালা(১১০৫) ও

১১০৪. এ কবিতাটি ইমাম হামাদ ইবন সুলাইমান আল-খাত্তাবী তার 'আল-গুনইয়াতু 'আনিল কালাম' গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। তবে তিনি কারও দিকে সম্পৃক্ত করেননি, যা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার একাধিক গ্রন্থে চয়ন করেছেন। দেখুন, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/২৮); দারউ তা'আরুদ্বিল 'আকলি ওয়ান নাক্বলি (৭/৩১৪); নাক্বদুল মানতিক, পৃ. ২৬; বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/২৫৩)। শাইখুল ইসলাম তার দারউত তা'আরুদ্ব গ্রন্থে খাত্তাবী থেকে তার পুরো ভাষ্য চয়ন করেছেন, যা থেকে বুঝা যায় যে, এটি খাত্তাবীর কবিতা নয়। তিনি অন্যের কবিতা বর্ণনা করেছেন মাত্র। আরও দেখুন, সুয়ূত্বী, সাওনুল মানত্বিক, পৃ. ৯৯।

১১০৫. সম্ভবত ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ এটি বলেছেন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বিচার থেকে। কারণ

جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام».

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر. والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم. رحمتهم ورفقتَ عليهم، أوتُوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً، وأعطوا فهومًا وما أعطُوا علومًا

জুতাপেটা করে বিভিন্ন গোত্রের নিকট ঘোরানো হবে এবং বলা হবে, যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে ইলমুল কালামের দিকে ঝুঁকবে তার শাস্তি এটাই।"(১১০৬)

অন্যদিক দিয়ে তুমি যদি তাদের দিকে তাক্বদীরের চোখে তাকাও অর্থাৎ তাদের জাগতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দাও, তবে দেখবে পেরেশানী তাদের ওপর চড়াও হয়েছে, শয়তান তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, তখন তুমি তাদের প্রতি দয়া করবে, তাদের প্রতি কোমল হবে।(১১০৭) তাদেরকে মেধা দেয়া হয়েছে, কিন্তু পবিত্রতা দেয়া হয়নি; তাদেরকে

তিনি এমনি আজে বাজে কথা মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার করার কারণে সাবীগ ইবন 'ইসলকে খেজুরের ডাল দিয়ে পিটিয়ে ছিলেন।

আছারটি যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন,

১- আজুররী, আশ-শরী'আহ (১/৪৮৩), নং ১৫৩; (৫/২৫৫৬), নং ২০৬৪।
২- ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা (২/৬০৯), নং ৭৮৯।
৩- লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৪/৭০২, ৭০৩), নং ১১৩৭ ও ১১৪০।
৪- ইবন আব্দিল বার, আল-ইস্তেযকার (৫/৭০)।
৫- ইবন হাজার, আল-ইসাবাহ (৫/১৬৯) এবং এর সনদ সহীহ বলেছেন।

১১০৬. এ আছারটি যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন,

১- আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৯/১১৬)।
২- খত্বীবে বাগদাদী, শারাফু আসহাবুল হাদীস, পৃ. ৭৮।
৩- বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (১/২১৮)।
৪- আসফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/২০৮)।
৫- গাযালী, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (১/৯৫)।
৬- ইবন আব্দিল বার, আল-ইন্তেকা, পৃ. ৮০।
৭- ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/২৯)।
৮- সুয়ূত্বী, আল-আমরু বিল ইত্তেবা ওয়ান নাহইয়ু 'আনিল ইবতিদা', পৃ. ২৭।
৯- সুয়ূত্বী, সাওনুল মানতিক, পৃ. ৩১, ৬৫।
১০- ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/১৭-১৮)।
১১- ইবন মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়্যাহ (১/২২৫)।

১১০৭. এভাবেই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহ হক জেনে নেয়, সাথে সাথে তারা সৃষ্টির প্রতি দয়াও করে। যখনই কোনো মানুষের জ্ঞান ও ফিকহ বৃদ্ধি পাবে তখনই তার রহমত ও দয়া বৃদ্ধি পাবে। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ, ইলম ও ঈমানে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মাঝে রয়েছে জ্ঞান, ইনসাফ, দয়া। তারা হক শিক্ষা গ্রহণ করে যার দ্বারা তারা সুন্নাত অনুযায়ী চলতে পারে, বিদ'আত থেকে বাঁচতে পারে, যারা সুন্নাহ থেকে বের হয়ে গেছে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারে, যদিও তাদের কেউ এদের ওপর যুলুম করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾ [المائدة : ٨] "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা

وأُعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

ومن كان عليمًا بهذه الأمور: تبيَّنَ له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا [عن الكلام ونهوا عنه، وذمُّوا] أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدًا.

فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

تمت الحموية

বোধশক্তি দেয়া হয়েছে, কিন্তু ইলম দেয়া হয়নি; তাদেরকে কান, চোখ, হৃদয় দেয়া হয়েছে, কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছে যে,

﴿فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الاحقاف: ٢٦]

“অতঃপর তাদের কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোনো কাজে আসেনি; যখন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।” [সূরা আল-আহকাফ: ২৬]

এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে যে ভালোভাবে জানবে, এর মাধ্যমে তার নিকট ফুটে উঠবে সালাফদের বিচক্ষণতা, তাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা। যেহেতু তারা কালামশাস্ত্র থেকে সতর্ক করেছেন, তা থেকে নিষেধ করেছেন, কালামপন্থীদের নিন্দা করেছেন, তাদের প্রতি দোষারোপ করেছেন। আর সে আরও জানতে পারবে, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্যত্র হিদায়াত খুঁজে, আল্লাহ থেকে তার শুধু দূরত্বই বাড়ে।

তাই আমরা মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সরল-সঠিক রাস্তা প্রার্থনা করি, তাদের রাস্তা যাদের ওপর তিনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের রাস্তা নয় যাদের ওপর তাঁর ক্রোধ আপতিত হয়েছে এবং তাদেরও নয় যারা পথভ্রষ্ট। আমীন!!

সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

সমাপ্ত

কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-মায়েদাহ: ০৮] আর তারা সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, তাদের জন্য যাবতীয় কল্যাণ, হিদায়াত ও ইলম পৌঁছানোর মধ্যে সর্বদা নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কেবল হক্ব বর্ণনা করা, সৃষ্টির প্রতি রহমত করা। [আর-রাদ্দু আলাল বিকরী, পৃ. ২৫৬-২৫৭]

الفتوى الحموية الكبرى

شيخ الإسلام ابن تيمية

قدس الله روحه

شرح وتعليق باللغة البنغالية

الأستاذ الدكتور أبو بكر محمد زكريا
(بكالوريوس في الشريعة وماجستير ودكتوراه في العقيدة
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)
قسم الفقه والدراسات القانونية
الجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلادش

CWI

مبادرة رعاية المجتمع، بنغلادش

الفتوى الحموية الكبرى

شيخ الإسلام ابن تيمية

قدس الله روحه

شرح وتعليق باللغة البنغالية

الأستاذ الدكتور أبو بكر محمد زكريا

978-984-35-1815-6

978-984-35-1815-6